সৌভাগ্য-স্পর্শমণি।

মহাত্মা ইমাম মোহাম্মদ গাজ্জালী রহমতুল্লার

কিমিয়া সাআদৎ

গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

পঞ্চম খণ্ড

পরিত্রাণ পুস্তক

মূল ভাগ।

মৌলবী মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী মরহুম

কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও সম্পাদিত।

নূর-অল ঈমান সিরিজ ১—৬

P
R
HEMA CLEAR PRINT
S
RAJSAHI

রাজশাহী
হেমায়েত ইসলাম ক্লিয়ার প্রিণ্ট প্রেসে
শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র কর কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মির্জা মোহাম্মদ ইয়াকুব
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ
(পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত)

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

সূচীপত্র

পূর্ব্বাহ্ন

সূরা 'আদ্দোহা'র পদ্যানুবাদ

আলোক উজল প্রথম প্রহর শপথ জানিও তার,
নিশারও শপথ যখন উহারে ঢাকিছে অন্ধকার।
প্রভু যে তোমার করেনিক তোমা করেনিক বর্জ্জন;
তোমার উপরে রুষ্ট বিরাগ হয়নিক কদাচন।
অতীতের চেয়ে ভাবি কাল তব হবে হবে সুখময়,
অচিরে প্রভুর পাবে দান, রবে তুষ্ট যে অতিশয়।
পায়নি কি তোমা পিতামাতাহীন দিল শেষে যে শরণ?
ভ্রান্তির মাঝে হেরিয়ে, সুপথ করিল প্রদর্শন।
অভাবের মাঝে পেয়ে সে অভাব করিয়াছে যে পূরণ;
পিতামাতাহীনে করনাক কভু করনাক নিপীড়ন।
ভিখারী কাঙ্গাল দেখে কা'রে কভু করোনা তিরস্কার;
প্রভুর সকল দানের বাখানি, গাও হে মহিমা তার।

— মীর ফজলে আলী বি, এল,

(মোয়াজ্জিন—১৩৩৭)

সৌভাগ্য-স্পর্শমণি।

(পঞ্চম খণ্ড)

পরিত্রাণ পুস্তক।

উদ্ধারকারী গুণাবলীর শ্রেণীভেদ ও পরিচয়। পাঠক! জানিয়া রাখ—যে সকল গুণে মানুষ উদ্ধার পায় তাহার দুই শ্রেণী আছে। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর গুণ—নৈমিত্তিক। তাহা কেবল আল্লার পথে চলিবার সাহায্য করে মাত্র, কিন্তু তাহা চির সহচর হইতে পারে না এবং উহাই উপার্জ্জন করা মানবের মুখ্য উদ্দেশ্যও নহে। যথা—তওবা (অনুতাপ), ছবর (ধৈর্য্য), খওফ (ভয়), জোহদ (বৈরাগ্য), দরিদ্রতা, মহাছবা (কৃতকর্ম্মের দোষ বিচার); এরূপ গুণগুলি পরকাল পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইতে পারেনা—কেবল ইহারা প্রেমাদি চির সহচর গুণ উপার্জ্জনে সাহায্য করে মাত্র। দ্বিতীয় শ্রেণীর গুণ—মানবের চির সহচর। তাহা উপার্জ্জন করাই মানব জীবনের প্রকৃত ও চরম উদ্দেশ্য। তদ্রূপ গুণার্জ্জনে যথা-সর্ব্বস্ব ব্যয় করাও কর্ত্তব্য। এই শ্রেণীর গুণ যথা—মহব্বৎ (প্রেম), শওক (উৎসাহ), রেজা (সন্তোষ), তওহীদ (একত্বজ্ঞান), তওয়াক্কোল (আল্লার প্রতি নির্ভরতা), শোকর (কৃতজ্ঞতা)। এই শ্রেণীর গুণ উপার্জ্জন করা মানব জীবনের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। এই গুণগুলি মৃত্যুর পরেও আত্মার সঙ্গে থাকে। (টীঃ ২৬৩)

টীকা—২৬৩। মূলগ্রন্থে এই প্যারাটী, পরবর্ত্তী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের 'শোকর' বিষয়ক বর্ণনার প্রথম প্যারার তারকা চিহ্নিত স্থানে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা হইল।

এই সকল উদ্ধারকারী বা পরিত্রাণকারী গুণের বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড (টীঃ ২৬৪) **পরিত্রাণ পুস্তকে** লিখা হইবে। এ পুস্তকে নিম্নলিখিত দশটী পরিচ্ছেদ হইবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ— توبة (তওবা) আল্লার পথে অনুতাপের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— صبر (ছবর) ধৈর্য্য ও شكر (শোকর) কৃতজ্ঞতা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ— خوف (খওফ) ভয় ও رجاء (রজা) আশা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ— فقر (ফকর) দরিদ্রতা ও زهد (জোহদ্) বৈরাগ্য

পঞ্চম পরিচ্ছেদ— نيت (নীয়ৎ) সঙ্কল্প, اخلاص (এখ্লাছ্) বিশুদ্ধতা ও صدق (ছেদ্‌ক্) সত্যতা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ— مرا قبة (মোরাকবা) প্রবৃত্তির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এবং محاسبة (মোহাছবা) প্রবৃত্তির হিসাব লওয়া।

সপ্তম পরিচ্ছেদ— تفكر (তফকোর্) সদ্‌ভাব চিন্তা করা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ— توكل (তওয়াক্কোল্) আল্লার প্রতি ভরসা এবং توحيد (তওহীদ) একত্ব জ্ঞান।

নবম পরিচ্ছেদ— محبت (মহব্বৎ) প্রেম। شوق (শওক) অনুরাগ رضا (রেজা) প্রসন্নতা।

দশম পরিচ্ছেদ— মৃত্যু চিন্তা ও মৃত্যু ভয়।

টীকা—২৬৪। এই গ্রন্থের বিনাশন পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম টীকা দ্রষ্টব্য।

মূল গ্রন্থে এ পুস্তকের নাম منجيات মনজীয়াৎ। ইহা نجات 'নজাৎ' শব্দ হইতে উৎপন্ন—অর্থ 'উদ্ধার বা পরিত্রাণ'। আমরা অনুবাদের প্রারম্ভে এ পুস্তকের নাম 'উদ্ধারকারী গুণ প্রদর্শন' রাখিয়াছিলাম; কিন্তু নামটী উচ্চারণে কঠিন, দীর্ঘ এবং শুনিতেও তত ভাল নহে বলিয়া অনেক মেম্বর আপত্তি করেন। এজন্য এখন হইতে 'পরিত্রাণ পুস্তক' নাম দেওয়া গেল।

মূলগ্রন্থে ইমাম ছাহেব পূর্ব্বাবর্ত্তী প্রথম প্যারার বর্ণনায় 'পরিত্রাণ পুস্তক' লিখিত সমুদয় উদ্ধারকারী গুণকে নৈমিত্তিক গুণ' ও 'মানবের চিরসহচর গুণ' এই দুই ভাগে বিভাগ করিয়া দেখান নাই। এই পুস্তকের যে গুণ গুলিকে ঐরূপ বিভাগ করিয়া দেখান হয় নাই, আমাদের বিবেচনায়, তাহাদিগকে প্রথম শ্রেণীর নৈমিত্তিক গুণ বলা যাইতে পারে। পঞ্চম পরিচ্ছেদ বর্ণিত 'সঙ্কল্প, বিশুদ্ধতা ও সত্যতা'কে অনেকে চিরসহচর গুণ বলিতে চান, কেননা পঞ্চম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় প্যারায় লিখিত আছে যে 'মহাবিচারক কেবল ক্রিয়াকলাপের সঙ্কল্প দেখিয়া বিচার করেন।' কিন্তু তৃতীয় পরিচ্ছেদে ধর্ম্মজীবন পথে ধর্ম্মভাব বা গুণাবলীর ক্রমবিকাশের ধারা' শীর্ষক প্যারায় ইমাম ছাহেব যাহা লিখিয়াছেন তদনুষ্টে ইহাদিগকে নৈমিত্তিক গুণ বলা যাইতে পারে। (আল্লাই ভাল জানেন)।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তওবা।

ধর্ম্মপথযাত্রীগণের প্রথম ধাপ ও একমাত্র পথপ্রদর্শক—তওবা।

পাঠক, জানিয়া রাখ— توبة তওবা (টী ২৬৫) করিয়া আল্লার নির্দ্ধারিত নিয়মের পথে ফিরিয়া আসা উৎসুক মুরীদগণের প্রথম ধাপ এবং যাঁহারা ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে একমাত্র পথ-প্রদর্শক। তওবা ব্যতিরেকে মানবের গত্যন্তর নাই। (টীঃ২৬৬) জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল নিষ্পাপ থাকা এবং ত্রুটীহীন ভাবে জীবন যাপন করা মানবের সাধ্যাতীত। চিরকাল নিষ্পাপ অবস্থায় জীবন যাপন করা কেবল ফেরেশ্‌তা-গণের পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে। অপর পক্ষে, চিরজীবন পাপে ডুবিয়া থাকা এবং চিরকাল নিয়ম লঙ্ঘন করা শয়তানের কার্য্য। মানবের অবস্থা এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী। প্রবৃত্তির প্ররোচনায় ভুলিলে মানবের পদস্খলন হয় এবং পাপপথে সে পিছলিয়া পড়ে; ভুল বুঝিবামাত্র লজ্জিত মনে সুপথে আসিতে চেষ্টা করে। বিপথে গমন ও সুপথে প্রত্যাবর্ত্তন মহাত্মা হজরৎ আদম নবী عم এর এবং তস্য সন্তান মানবগণের কার্য্য। যে ব্যক্তি অনুতপ্ত হৃদয়ে অতীত পাপের

টীকা—২৬৫। কর্ত্তব্য কার্য্য না করিলে বা তন্মধ্যে ত্রুটী করিলে যে ক্ষতি হয়, তাহা বুঝিতে পারিলে, মনের মধ্যে এক বিষম অনুতাপ জ্বলিয়া উঠে। সেই অনুতাপ, মানুষকে সুপথে ফিরাইয়া আনে এবং ক্ষতি সংশোধনে প্রবৃত্ত করিয়া দেয়; ইহাই তওবার কার্য্য। ত্রুটী করিয়া অনুতপ্ত মনে সুপথে ফিরিয়া আসিয়া ক্ষতি সংশোধনে প্রবৃত্ত হওয়াকে তওবা বলে। তওবার তিনটী ভাগ আছে। কর্ত্তব্য কার্য্য না করিলে বা ত্রুটী করিলে যে পাপ হয়—অর্থাৎ তাহাতে আত্মার যে ক্ষতি হয়, তাহা (১) বুঝিতে পারা (২) অনুতপ্ত হওয়া এবং (৩) সেই ক্ষতি সংশোধনে তৎপর হওয়া।

টীকা—২৬৬। সংসারের কাজে এবং ধর্ম্মগুণ উপার্জ্জনের পথে 'তওবা' একটী অপরিহার্য্য কার্য্য। স্বীয় ত্রুটী চিনিতে পারিয়া ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হওয়া এবং তৎক্ষণাৎ ক্ষতি সংশোধনে প্রবৃত্ত হওয়া একটী অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। ভ্রান্ত পথিক নিজের ভ্রম চিনিতে পারিবা মাত্র সুপথে ফিরিবার চেষ্টা না পাইলে তাহাকে বিনাশ পাইতে হয়। তাঁতী কাপড় বুনাইতে ভুল ফেলিলে 'বেজো' পড়ে। তাহা বুঝিতে না পারিলে ও সেই 'বেজো' সংশোধন করিয়া না লইলে পরিশ্রম ব্যর্থ ও কাপড় নষ্ট হয়। মাঝি বুঝিতে না পারিয়া বিপরীত দিকে হাইল ঘুরাইলে নৌকা বিপদে পড়িয়া ডুবিতে পারে। কিন্তু ভ্রম বুঝিবামাত্র আল্লার নির্দ্ধারিত নিয়ম-পথে হাইল চালাইলে জীবন রক্ষা পায়। প্রলোভনে পড়িয়া বিষ-মিশ্রিত মধু পান করিলে যে ক্ষতি আরম্ভ হয়, তাহা বুঝিতে পারিয়া সংশোধন না করিলে মৃত্যু ঘটে। সেইরূপ প্রলোভনে পড়িয়া পাপ কার্য্য করিবার পর ক্ষতি করা হইল বুঝিতে পারিয়া সংশোধন না করিয়া লইলে ধর্ম্ম-জীবন বিনাশ পায়।

ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে পারিয়াছে, সে ব্যক্তি হজরৎ আদমের সহিত নিজের সম্বন্ধ দৃঢ় করিয়া লইতে পারিয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি চির জীবন 'হঠপাকুড়িয়া' মৃত্যু পর্য্যন্ত পাপে লিপ্ত থাকে; সে ব্যক্তি শয়তানের সহিত স্বীয় সম্বন্ধ মজবুৎ করিয়া লইয়াছে। জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত কেবল এবাদতে লিপ্ত থাকা মানুষের পক্ষে অসম্ভব কথা। ইহার কারণ এই যে, মানব প্রথমে নিতান্ত অসহায়, অপূর্ণ ও বুদ্ধিহীন অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গেই

আজন্ম এবাদতে লিপ্ত থাকা অসম্ভব হইবার কারণ

সৃষ্টিকর্ত্তা মানব-মনে অভিলাষ ও লোভ সংযোগ করিয়া দেন। এ দুটী প্রবৃত্তি শয়তানের অস্ত্রগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। সর্ব্বপ্রথমে অভিলাষ-প্রবৃত্তি মানব হৃদয়ে উৎপন্ন হয়। শিশু-হৃদয়, অভিলাষ কর্তৃক সম্পূর্ণ রূপে অধিকৃত হইবার অনেক দিন পরে বুদ্ধির সৃষ্টি হয়। বুদ্ধি অভিলাষের শত্রু এবং ফেরেশ্‌তাগণের মৌলিক নূরের (আলোকের) সমজাতীয়। অভিলাষ, বুদ্ধির বহু পূর্ব্বে মানব-মন অধিকার করিয়া লয় বলিয়া বিজয়ী অভিলাষের সঙ্গে মনকে একটু সখ্যতা স্থাপন করিয়া লইতে হয়। যথা কালে বুদ্ধি আসিয়া দেখিতে পায় যে, অভিলাষ ইতিপূর্ব্বেই মানবের হৃদয়-রাজ্যটী দখল করিয়া লইয়া প্রবল ভাবে বসিয়া গিয়াছে এবং মনও তাহার অনুগত হইয়া পড়িয়াছে। এমন অবস্থায়, হৃদয়-দুর্গ অধিকার করিবার জন্য বুদ্ধিকে যুদ্ধ সজ্জা করিতে হয়, কিন্তু নবজাত বুদ্ধিকে প্রথমে প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধে বারংবার পরাস্ত হইতে হয় এবং সেই ধাক্কায় মানবকে কিছুদূর বিপথে পিছ্‌লিয়া পড়িতে হয়। সে সময় তওবা অর্থাৎ প্রত্যাবর্ত্তন ভিন্ন মানবের পক্ষে অন্য গতি থাকে না। এই জন্য আল্লার পথে গমনোৎসুক মুরীদগণের পক্ষে তওবাকে প্রথম ধাপ বলা যায়। আল্লার পথে গমনোৎসুক ছুফীগণের পদস্খলন ঘটিবামাত্র সুপথে প্রত্যাবর্ত্তন নিতান্তই প্রয়োজনীয় বিষয়। বুদ্ধির আলোকে এবং ধর্ম্মবিধানের জ্যোৎস্নায় জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া গেলে, মানব যখন কুপথ হইতে সুপথ নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম হয়, তখন তাহার সম্মুখে 'তওবা' ভিন্ন অন্য কিছুই ফরজ কার্য্য থাকে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে সর্ব্বপ্রথমে অজ্ঞানতার অন্ধকূপ ত্যাগ করতঃ জ্ঞানের রাজপথে ফিরিয়া আসিতে হয়—ইহাই তওবার প্রকৃত অর্থ।

তওবার কল্যাণ। পাঠক ! জানিয়া লও—মহাপ্রভু সকল ব্যক্তিকে 'তওবা' করিতে আদেশ করিয়াছেন—

وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে মোমেনগণ! যদি কল্যাণ পাইতে চাও, তবে সকলে আল্লার সমীপে তওবা কর।" (১৮ পারা। সূরা নূর। ৪ রোকূ।) মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ বলিয়াছেন—"পশ্চিম দিক হইতে সূর্য্যোদয়ের অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তওবা করিলেও কবুল হইবে।' তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়াকেই তওবা বলে।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"আমি প্রত্যহ ৭০ সত্তর বার তওবা করিয়া থাকি।" তিনি ইহাও বলিয়াছেন—"পাপ করিয়া তওবা করিলে, আল্লা সেই পাপ এমন ভাবে মিটাইয়া দেন যে, লিখক ফেরেশ্‌তা সে পাপের কথা ভুলিয়া যায়—যে অঙ্গ দ্বারা পাপ করা হইয়াছিল, সে অঙ্গও সে কথা ভুলিয়া যায় এবং যে স্থানে পাপ করা হইয়াছিল, সে স্থানও সে কথা ভুলিয়া যায়, সুতরাং আল্লার দরবারে বিচারার্থ আনীত হইলে সে পাপের কোন প্রমাণ পাওয়া যাইবে না। প্রাণ কণ্ঠাগত হওয়া পর্য্যন্ত তওবা করিলে করুণাময় তাহা কবুল করিয়া থাকেন।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত মহাপ্রভু স্বীয় করুণার হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক বলিবেন—'হে মানব! দিবসে পাপ করিয়া রজনীতে তওবা করিলে আমি তাহা গ্রহণ করিতে হস্ত পাতিয়া রহিয়াছি। আবার রাত্রিতে পাপ করিয়া দিবসে তওবা করিলে তাহাও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।'" মহাত্মা হজরৎ ওমর বলিয়াছেন—"মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ দিবা রজনীর মধ্যে শত বার তওবা করিতেন।" মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ বলিয়াছেন—"ত্রুটী না করে, এমন লোক পৃথিবীতে নাই; তবে যে ব্যক্তি তওবা করে, সে মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" তিনি অন্য সময়ে বলিয়াছেন—"পাপ করিয়া তওবা করিলে এমন নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হওয়া যায়, যেন আদৌ পাপ করা হয় নাই।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"পাপ করিয়া তদ্রূপ পাপ পুনরায় না করিবার অটল সঙ্কল্পের নাম তওবা।" তিনি এক দিন মহামাননীয়া হজরৎ বিবী আয়শা ছিদ্দীকাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"দেখ আয়শা! আল্লা বলিতেছেন—

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا...

"যাহারা আপন ধর্ম্মের কথা লইয়া প্রভেদ ঘটায় এবং পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে, (তাহাদের সম্বন্ধে তোমার কিছু দায়িত্ব নাই ; তাহাদের কার্য্যফল আল্লার হাতে এবং তিনিই তাহাদের সমুচিত শাস্তিদাতা।)" (৮ পারা। সূরা আন্আম। ২০ রোকু।) আল্লার এই কথা বেদাৎ লোকের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। পাপীর তওবা আল্লা কবুল করিবেন, কিন্তু বেদাৎ লোকের তওবা কবুল করিবেন না। "আমিও তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট এবং তাহারাও আমার উপর অসন্তুষ্ট।" অন্য এক সময়ে তিনি বলিয়াছেন—"মহাত্মা হজরৎ এব্রাহীম নবী عم আকাশে উন্নীত হইয়া, ভূতলে এক ব্যক্তিকে পরস্ত্রীর সহিত কুকর্ম্মে রত দেখিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন—তাহাতে সেই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই মারা পড়ে। পরক্ষণে অন্য দিকে দৃষ্টি করাতে আর এক জনকে অন্যবিধ পাপকর্ম্মে রত দেখিয়া তাহাকেও অভিসম্পাত করেন। ইতিমধ্যে প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল--'হে এব্রাহীম! আমার পাপী সন্তানের উপর ক্রুদ্ধ হইও না। সম্ভবতঃ তাহারা তওবা করিবে; আমিও কবুল করিব। অথবা ক্ষমা চাহিতে পারে, ক্ষমা চাহিবামাত্র আমি ক্ষমা করিব; কিম্বা উহাদের বংশে সাধু সন্তান জন্মিয়া আমার এবাদৎ করিতে পারে। হে এব্রাহীম! তুমি কি জান না যে, আমার নাম صبور ধৈর্য্যশীল?'" মহামাননীয়া বিবী আয়শা ছিদ্দীকার মুখে শুনা গিয়াছে যে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ বলিয়াছেন—"পাপ করিয়া লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলে, ক্ষমা প্রার্থনার অগ্রেই করুণাময় সমস্ত পাপ মার্জ্জনা করিয়া থাকেন।" তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"পশ্চিম দিকে এক দুয়ার আছে, তাহার বিস্তার ৭০ সত্তর বৎসরের রাস্তা; পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টি অবধি সেই দুয়ার তওবা গ্রহণের জন্য খোলা আছে। পশ্চিম দিক হইতে সূর্য্যের উদয় হইলে উহা বন্ধ হইয়া যাইবে।" তিনি বলিয়াছেন—"সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের অনুষ্ঠিত কার্য্য আল্লার সমীপে নীত হয়। ইতিমধ্যে যে ব্যক্তি তওবা করে, তাহার তওবা কবুল হয় এবং যে ব্যক্তি ক্ষমা চায়, তাহাকে মার্জ্জনা করা হয়। কিন্তু যে কিছুই করে না, সে পাপী অবস্থায় রহিয়া যায়।" মানব তওবা করিলে মহাপ্রভু কিরূপে

সন্তুষ্ট হন, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) এক জন পল্লীবাসীর উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন :—পল্লীগ্রামের কোন এক জন সরল লোক উষ্ট্র-পৃষ্ঠে খাদ্য পানীয় যথাসর্ব্বস্ব স্থাপন পূর্ব্বক এক উত্তপ্ত মরু-প্রান্তর পার হইতেছিল। পথিমধ্যে বৃক্ষ দেখিয়া তাহার ছায়া তলে উষ্ট্র বাঁধিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছিল। জাগরিত হইয়া দেখে, উষ্ট্রটী তথায় নাই। তখন নিতান্ত ব্যাকুল ভাবে উষ্ট্রের অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছিল; কিন্তু উষ্ট্রের সন্ধান না পাইয়া ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ে। শেষে খাদ্য পানীয় প্রাপ্তির আশায় নিরাশ হইয়া মৃত্যু অবধারিত জ্ঞানে পুনরায় বৃক্ষতলে গিয়া অবসন্ন দেহে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। কিছুক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে চক্ষু মেলিয়া দেখে যে, উষ্ট্রটী যথাস্থানে পূর্ব্ববৎ বদ্ধ রহিয়াছে এবং খাদ্য পানীয় সমস্তই পূর্ব্বের ন্যায় সজ্জিত আছে। ইহা দর্শন পূর্ব্বক পল্লী-বাসীর আনন্দের সীমা রহিল না। 'হে আল্লা! তুমি আমার প্রভু—আমি তোমার দাস' এই অর্থে আল্লাকে ধন্যবাদ দিতে গিয়া সে আনন্দোন্মত্ত ভাবে বলিতে লাগিল—'হে আল্লা! তুমি আমার দাস, আমি তোমার প্রভু।' যাহা হউক, যথাসর্ব্বস্ব সহকারে হারান উট পাইয়া পল্লীবাসী যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিল, বিপথগামী ভ্রান্ত মানব তওবা করিয়া সুপথে ফিরিয়া আসিলে স্বয়ং করুণাময় তদপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইয়া থাকেন।

তওবার প্রকৃত পরিচয় ও তাহার কার্য্যফল—পাঠক! জানিয়া রাখ—জ্ঞানের আলোক ও বিশ্বাসের জ্যোতিঃ হইতে তওবার উৎপত্তি হয়, এই জন্য 'বুঝ সমঝ'কে তওবার শিকড় বলা যায়; মারেফৎ জ্ঞান হইতে 'বুঝ সমঝ' উৎপন্ন হইলে মানুষ পাপকে মারাত্মক বিষ বলিয়া জানিতে পারে। মানব যখন বুঝিতে পারে যে, সেই বিষ আমি বহু পরিমাণে পান করিয়াছি এবং তাহার প্রভাবে আমাকে শীঘ্র বিনাশ পাইতে হইবে, তখন তাহার মনে এক বিষম ভয় ও তীব্র অনুতাপ উৎপন্ন হয়। দেখ, যে ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে বিষ মিশ্রিত মধু পান করে, সে জানিবা মাত্র, মৃত্যু-ভয়ে অস্থির হইয়া পড়ে এবং বমন করিয়া তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে—গলার মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া দিয়া উদরস্থ পদার্থ উদ্গার করিয়া ফেলে। উদর মধ্যে বিষের লেশ রহিল কি না ভয়ে ব্যাকুল হয় এবং প্রতিষেধক ঔষধ সেবনে ব্যস্ত হয়। এইরূপ পাপী লোক যখন বুঝিতে পারে যে, আমি

প্রবৃত্তির কুহকে পড়িয়া মিষ্টতার লোভে পাপ কার্য্য করিয়াছি—সেই পাপ পরিশেষে আমার আত্মার বিনাশ সাধন করিবে ; তখন অনুতাপ, লজ্জা ও ভয়ের অগ্নি তাহার অন্তর মধ্যে তীব্র ভাবে জ্বলিয়া উঠে, তাহার জ্বালায় সে নিতান্ত অধীর ও অস্থির হইয়া পড়ে। সেই জ্বালা পাপীর অন্তর-রাজ্যে এক চমৎকার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দেয়। অনুতাপাগ্নির তেজে 'খাহেশ' পুড়িয়া অনুশোচনার আকার ধারণ করে। অতীত পাপ এবং তজ্জনিত ক্ষতি সংশোধনে সচেষ্ট হয় এবং পুনর্বায় পাপের দিকে না যাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প করে। আত্মদ্রোহিতার পরিচ্ছদ দূরে ফেলিয়া হিতৈষণায় বিনীত শয্যা পাতিয়া লয়। অনুতাপাগ্নির তেজ কেবল যে অন্তর রাজ্যের হিত পরিবর্ত্তন করে, তাহা নহে। শরীরের বাহ্য অবস্থা ও হাব ভাব পর্য্যন্ত বদলাইয়া দেয় ; অপ্রিয় অঙ্গচেষ্টাগুলিকে মনোরম করিয়া তুলে ; দর্পের কথাকে বিনয় ও মধুর বচনে পরিণত করে ; হঠকারিতার তীব্র চাহনীকে, দীনতার নম্র দৃষ্টিতে পরিণত করে, গর্ব্বের পদবিক্ষেপকে দীনতার মধুর চলনে আনয়ন করে ; আত্মাভিমানকে বিনয়ে এবং উৎসবের কেলী-কোলাহলকে জ্ঞান-গাম্ভীর্য্যে পরিণত করে, মোহমুগ্ধ (গফলৎ) ভাবকে দূর করিয়া তৎস্থানে সচেতন-মর্ম্ম-বেদনা আনয়ন করে ; প্রথমে অর্ব্বাচীন দলে বাস করিতে ভাল লাগিয়া থাকিলে এখন তাহা বিষবৎ তিক্ত লাগে এবং জ্ঞানী লোকের সহবাস লাভে লালায়িত হয়। তওবাকে বাস্তবিকই **সচেতন অনুতাপ** কহা যায়। জ্ঞানের আলোক ও ঈমানের নূর হইতে তওবার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তওবার কার্য্যফল নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া অন্তর-রাজ্য ও দেহ রাজ্যের অবস্থা সম্পূর্ণ রূপে বদলাইয়া দেয় এবং শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিকে পাপ ও অবাধ্যতার দিক হইতে ঘুরাইয়া এবাদৎ ও বাধ্যতার দিকে আনয়ন করে।

তওবার কার্য্যফল—অন্তর রাজ্যের আত্মার পরিবর্ত্তন

—দেহ রাজ্যের অবস্থার পরিবর্ত্তন

তওবা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি ওয়াজেব। পাঠক! কেন তওবা সকলের প্রতি ওয়াজেব, এই কথা যদি তুমি বুঝিতে চাও, তবে অগ্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যত্নের সহিত বুঝিয়া লও। (১) কাফের ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লা ও আল্লার কার্য্যের প্রতি বিশ্বাস করে না, বয়ঃপ্রাপ্ত ও বুদ্ধি বিশিষ্ট হইবা মাত্র তাহাকে অবিশ্বাস হইতে তওবা করা ওয়াজেব। (২) যে মুছলমান সন্তান কেবল পিতা মাতার দেখাদেখী

কার্য্য করে, এবং তাঁহাদের ধর্ম্মমত ও বিশ্বাসের কালমাগুলি শুনিয়া বিনা অর্থ-গ্রহণে মুখে আওড়ায়. বয়ঃপ্রাপ্ত ও বুদ্ধি বিশিষ্ট হইবামাত্র তাহাদিগকে সেই অমনোযোগ ভাব হইতে তওবা করিয়া সচেতন-অর্থ-গ্রহণের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করা ওয়াজেব এবং যে বিষয়গুলি বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে, তাহার পরিচয় পরে স্বীয় পরিশ্রমে সুন্দর মত হৃদ্গত ভাবে বুঝিবার জন্য মনকে উৎসুক করিয়া লওয়া আবশ্যক। পাঠক! আমাদের এই কথাতে ইহা বুঝিও না যে, প্রত্যেক মুছলমান সন্তানকে যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে বক্তৃতা-বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে। উহা সকলের প্রতি ওয়াজেব নহে। কিন্তু ঈমান রূপ বাদশার সিংহাসনটী প্রত্যেক মুছলমানের হৃদয় মধ্যে মজবুৎ ভাবে বিছাইয়া লওয়া ওয়াজেব। তাহা করিতে পারিলে তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস-জ্ঞানের অনুরূপ হইয়া চলিতে পারে। (টীঃ২৬৭) কাজ কাম সমস্তই যখন ঈমান রূপ বাদশার আদেশ মত চলিতে থাকিবে—তন্মধ্যে শয়তানের কর্ত্তৃত্ব কিছু মাত্র থাকিবে না এবং যে লোভ, শয়তানের প্রধান চর, তাহারও প্ররোচনা খাটিবে না, তখন বুঝিবে, হৃদয়ের উপর ঈমানের সিংহাসন অটল ভাবে স্থাপিত হইয়াছে; পাপ কার্য্য ঘটিলে, কিম্বা পাপের দিকে মন ধাবিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, ঈমানের প্রভুত্ব পূরাভাবে হৃদয়ের উপর স্থাপিত হয় নাই। এই কারণে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ছাঃ)

প্রত্যেক মুছলমানের হৃদয়ে ঈমানের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য

টীকা— ২৬৭। ঈমান শব্দের অর্থ ইতিপূর্ব্বে লিখা উচিত ছিল। ইহকাল ও পরকালের কার্য্যে জ্ঞান পরম হিতকর বন্ধু। আল্লার বিধিবদ্ধ নিয়মের পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে বুদ্ধি সর্ব্বদাই সচেষ্ট আছে। সেই আবিষ্কারের ফলই জ্ঞান। উহা বুদ্ধির হাতে মশালের কার্য্য করে এবং বুদ্ধিকে আরও অধিক পরিমাণে আবিষ্কার কার্য্যে সাহায্য করে। জ্ঞানের দুই অংশ আছে। প্রথম অংশ যাহা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে লব্ধ হয়, তাহাকে অভিজ্ঞতা বলে এবং যে জ্ঞান কোন সত্যবাদী বিশ্বস্ত লোকের জ্ঞান হইতে শুনিয়া বিশ্বাস করিয়া লইতে হয় তাহাকে ঈমান বলে। 'আগুণে পোড়ে' ইহা আমাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান। 'পাপে আত্মা পোড়ায়' ইহা পয়গম্বরগণ হইতে লব্ধ বিশ্বাস-জ্ঞান। 'আল্লা এক', 'পরকাল আছে', "পরকালে পাপ পুণ্যের বিচার হইবে', 'মিথ্যা কথা চুরী, ব্যভিচার, নরহত্যা ইত্যাদি পাপ আত্মার ক্ষতি করে'—ইত্যাদি জ্ঞানকে ঈমান বলে। আমরা ঈমান-জ্ঞানে যাহা বিশ্বাস করিয়া লই, তাহা পয়গম্বরগণের প্রত্যক্ষ-লব্ধ অভিজ্ঞতা-মূলক-জ্ঞান। সাধারণ লোকের ঈমান-জ্ঞানের অধিকাংশ, দরবেশ, উদাসীন ও সন্ন্যাসীদিগের নিকট প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান মধ্যে আসিতে পারে। ফলকথা, যে জ্ঞান এখন আমাদের নিকট ঈমান শ্রেণীর অন্তর্গত অর্থাৎ যাহা আমরা পয়গম্বরের কথায় বিশ্বাস করিয়া লইয়াছি, সমুচিত পরিশ্রম করিলে এবং আল্লার ইচ্ছা হইলে তাহাও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে আসিতে পারে।"

বলিয়াছেন—"যাহারা পরনারী হরণ করে বা চুরি করে, তাহাদের ঈমান তৎ তৎ কার্য্য কালে থাকে না।" হজরতের ঐ বাক্যে ইহা বুঝিও না যে, তদ্রূপ কার্য্যের সময়ে তাহারা কাফের হইয়া যায়। পাপ কার্য্যের সময়ে ঈমানের নূর অর্থাৎ বিশ্বাস-জ্ঞানের আলোক লোপ পায়, ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ। বিশ্বাস-জ্ঞানের বহু শাখা প্রশাখা আছে। তন্মধ্যে একটী শাখায় এই কথা বুঝাইয়া দেয় যে, "পরনারী হরণ একটী হলাহল বিষ তুল্য মারাত্মক পাপ; উহা আত্মাকে বিনাশ করিয়া ফেলে।" হলাহল বিষকে মারাত্মক জানিয়া কেহই পান করিতে পারে না। পান করিলে ইহাই বুঝায় যে, লোভ বা মোহ উহাকে এমন করিয়া কাবু করিয়া লইয়াছিল যে, বিষের ক্রিয়া ও ফলাফল তাহাকে ভুলাইয়া দিয়াছিল। মুছলমান হইয়া কেহ পরনারী-গমন করিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তাহার কাম-প্রবৃত্তি এমন প্রবল ভাবে উত্তেজিত হইয়াছিল যে, যে জ্ঞানে হলাহল বিষকে মারাত্মক বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল, তাহা ভুলাইয়া দিয়াছিল; এবং ঐ জ্ঞানটী লোপ করিয়া ব্যভিচার করাইয়া লইয়াছিল। অথবা ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, তাহার ঐ জ্ঞানটী অমনোযোগিতার আচ্ছাদনে তৎকালে ঢাকা পড়িয়াছিল ; অথবা ইহাও অর্থ হয় যে তাহার উক্ত জ্ঞানের আলোক, কাম-প্রবৃত্তির ধূমান্ধকারে পড়িয়া নির্ব্বাপিত হইয়াছিল ।

যাহা হউক, পাঠক! এ পর্য্যন্ত যাহা বলা গেল, তাহাতে বুঝিতে পারিলে—(১) সর্ব্ব প্রথমে কোফর অর্থাৎ নাস্তিকতা হইতে তওবা করা ওয়াজেব। (২) তাহার পর দেখ কাফেরী হইতে ফিরিয়া, 'দেখাদেখী' মুছলমান হইলে বা মুখে কাল্‌মা পড়িলেও চলিবে না। মুছলমান পরিবারের অবোধ সন্তানেরাও দেখাদেখী ধর্ম্ম-কাজ করে ও মুখে মুখে কাল্‌মা আওড়ায়; এমন অবস্থা হইতে তওবা করিয়া ফিরিয়া কাল্‌মার অর্থ-জ্ঞান সচেতন ভাবে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করতঃ তদনুসারে জীবন্ত ভাবে কার্য্য করা ওয়াজেব। (এখন পুনরায় দেখ, কাফের প্রথমে মুছলমান হইয়া মুছলমান ঘরের সন্তানের ন্যায়, تقليد তক্‌লীদ মতে অর্থাৎ 'অন্যের দেখাদেখী' চলিতে লাগে। কিন্তু তদ্রূপ চলা নব মুছলমান ও মুছলমান সন্তানের পক্ষে প্রচুর নহে; তখন 'দেখাদেখী' কার্য্য হইতে তওবা করিয়া সচেতন ভাবে অর্থ গ্রহণ-পূর্ব্বক জীবন্ত ভাবে আন্তরিকতার সহিত কার্য্য করা ওয়াজেব।) (৩) কাল্‌মার

ক্রমোন্নত মঙ্গলের পথে ওয়াজেব তওবার ধারা বাহিক বিবরণ

অর্থ অন্তরের সহিত বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিলেও সর্ব্বদা পাপ পরিশূন্য হইয়া চলা দুর্ঘট। (অর্থাৎ তদবস্থায় ঘটনাক্রমে পাপকার্য্য করিতে পারে।) অতঃপর সর্ব্ববিধ পাপ হইতে তওবা করিয়া কেবল পুণ্যের দিকে ফিরা ওয়াজেব। (৪) এখন দেখ, সর্ব্ববিধ পাপকার্য্য হইতে বাঁচিতে পারিলেও পাপের চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাওয়া কঠিন। তখন সর্ব্ববিধ পাপ হইতে তওবা করিয়া (সদ্ভাব চিন্তার দিকে) ফিরিয়া আসা ওয়াজেব। (৫) পাপ চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারিলেও, যে প্রবৃত্তিগুলি পাপের মূল তাহা হইতে পবিত্র হইতে পারা দুষ্কর। ভোজনেচ্ছা, কথন-প্রবৃত্তি, ধন মানের লালসা, অহঙ্কার প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়া বড় কঠিন। ঐ সকল প্রবৃত্তি মনের ময়লা ও পাপের মূল, সুতরাং তৎসমুদয় হইতে তওবা করা ওয়াজেব। (দেহরাজ্যের রক্ষার জন্য প্রবৃত্তিগুলির সৃষ্টি, সুতরাং তৎসমুদয়কে নির্ম্মূল করা যায় না তবে) তৎ সমুদয়কে সাম্য ভাবে আনয়ন করতঃ বুদ্ধি ও (শরীঅৎ) ধর্ম্ম-বিধানের অধীন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। (৬) প্রবৃত্তিগুলিকে আজ্ঞাধীন করিতে প্রাণান্ত পরিশ্রম ও অসীম আত্ম-নিগ্রহের প্রয়োজন; সেই দুঃসাধ্য কঠিন কার্য্য সমাপন করিতে পারিলে সম্মুখে নানা বিষয়ক অমূলক সন্দেহ ও শূন্য-চিন্তা উদিত হইয়া মানবের পদস্খলন ঘটাইতে পারে। সে বাধা পার হওয়াও কঠিন ব্যাপার। সুতরাং অমূলক সন্দেহ ও শূন্যচিন্তা হইতে তওবা করা ওয়াজেব। (৭) এই ব্যাপারে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, আর একটী কঠিন ব্যাপার সম্মুখে উপস্থিত হয়— অর্থাৎ সদা সর্ব্বদা আল্লার স্মরণে ডুবিয়া থাকিতে পারা যায় না— হাজার চেষ্টা করিলেও আল্লার স্মরণ হইতে অন্য দিকে মন যায় এবং তজ্জন্য কিছু না কিছু সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে। আল্লাকে ভুলিয়া জীবনের এক মুহূর্ত্ত অপচয় করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ক্ষতি, সুতরাং তাহা হইতে তওবা করা কর্ত্তব্য। (৮) যাহা হউক, সর্ব্বদা তন্ময় ভাবে আল্লার স্মরণে ও চিন্তনে নিমগ্ন থাকিতে পারিলেও মানবের সম্মুখে অনির্ব্বচনীয় উন্নতির আর একটী প্রশস্ত রাজপথ উন্মুক্ত হয়। সে পথের প্রত্যেক ধাপে অসীম মঙ্গল পাওয়া যায়। এবং সে পথের প্রত্যেক পরবর্ত্তী ধাপ, পূর্ব্ববর্ত্তী ধাপ অপেক্ষা অধিক কল্যাণ দায়ক সেই অনির্ব্বচনীয় ক্রমোন্নত মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে মানবের অধিকার

ও যোগ্যতা আছে। মানব সে পথের কোন এক ধাপে আরোহণ পূর্ব্বক সন্তুষ্ট চিত্তে দাঁড়াইয়া গেলে অর্থাৎ আর অধিক উন্নতির দিকে অগ্রসর না হইলে তাহাকে অধিক সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। উন্নত সৌভাগ্যে বঞ্চিত হওয়াকেও এক হিসাবে ক্ষতি বলা যায়। তদ্রূপ ক্ষতি না করিবার জন্য দাঁড়ান হইতে তওবা করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) প্রত্যহ ৭০ সত্তর বার তওবা করিতেন; উহা সম্ভবতঃ এই মর্ম্মেরই কথা হইবে। কেননা অনবরত উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়া এবং অধিক লাভ করা তাঁহার কার্য্য ছিল। তিনি যে ধাপে আরোহণ করিতেন, তাহা পশ্চাতের ধাপ অপেক্ষা অধিক লাভ-উৎপাদক বলিয়া বুঝিতে পারিতেন, এবং তথা হইতে পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিতেন, তিনি অতীত অবস্থায় বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা অল্প লাভ করিয়াছেন। এই ভাবিয়াই তিনি অনুতাপের সহিত তওবা করিয়াছেন। মনে কর কোন ব্যক্তি এক দণ্ড কার্য্য করিয়া একটী পয়সা উপার্জ্জন করতঃ আনন্দিত হইয়াছিল—এখন দেখিতেছে বর্ত্তমান কর্ম্মনৈপুণ্য সহকারে এক দণ্ড কর্ম্ম করিলে তখন একটী মোহর উপার্জ্জন করিতে পারিত; ইহা বুঝিতে পারিলে সে ব্যক্তি কি দুঃখিত হইবে না? আবার দেখ, যে ব্যক্তি এখন এক দণ্ডে এক মোহর উপার্জ্জন করিয়া আনন্দিত হইতেছে এবং ভাবিতেছে ইহা বড় লাভ হইল, কিন্তু পরক্ষণেই তদপেক্ষা উচ্চ নিপুণতা প্রাপ্ত হইয়া এক দণ্ডে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার হীরক উপার্জ্জনে সক্ষম হইল। এমন অবস্থায় অতীত দণ্ডের নিকৃষ্ট নৈপুণ্য ও অল্পলাভ স্মরণ করতঃ সে ব্যক্তি অবশ্যই লজ্জিত ও দুঃখিত হইবে। এই কারণে জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—

حسنات الابرار سيات المقربين

"সাধুগণ যাহা লাভ মনে করেন, সিদ্ধ পুরুষেরা তাহা ক্ষতি বলিয়া বিবেচনা করেন।" অর্থাৎ সাধু লোক নিজের সাধুতায় যে পুরস্কার পাইয়া আনন্দিত হন, সিদ্ধ পুরুষগণ তাহা নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং মনে করেন,—"উক্ত সাধুর পক্ষে যাহা লাভ করা উচিত ছিল, তাহা না করিয়া নিজের ক্ষতি করিলেন।"

অনবধানতা হইতে বা উন্নতি লাভের অপারগতা হইতে তওবা ওয়াজেব হইবার কারণ। এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে,—

"কাফেরী হইতে ও পাপ হইতে তওবা করিলেই ত যথেষ্ট হয়, (গাফলৎ) অনবধানতা বা অসতর্কতা হইতে তওবা করা কিম্বা উন্নতি লাভের অপারগতা হইতে তওবা করা কেবল অতিরিক্ত কর্ম্ম মাত্র; তদ্রূপ তওবা ফরজ (অতি কর্ত্তব্য) নহে। তবে কেন এস্থলে ওয়াজেব (কর্ত্তব্য) বলা হইল ? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা এই কথা বলিতেছি যে, ওয়াজেব (কর্ত্তব্য) **দুই** প্রকার। ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধানগুলি প্রতিপালন করা **প্রথম** প্রকারের ওয়াজেব। সর্ব্ব সাধারণ লোককে সেই বিধান মানিয়া কাজ করা কর্ত্তব্য; না করিলে পাপগ্রস্ত হইতে হয়। ধর্ম্মশাস্ত্র, সর্ব্ব সাধারণ লোকের পক্ষে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। সেই সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জীবনের কার্য্যাবলী করিয়া গেলে পরকালে আত্ম-বিনাশ ও দোজখের শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। **দ্বিতীয়** প্রকারের ওয়াজেব (কর্ত্তব্য) পালনে সাধারণ লোকের সাধ্য নাই। তাহা অপ্রতিপালনে দোজখের ভয় না থাকিলেও পরকালে উচ্চ আসন লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। পরকালে উচ্চ আসনে বঞ্চিত হইলে ক্ষুব্ধ হইতে হইবে। নিজের সমশ্রেণীস্থ অথবা অপকৃষ্ট লোককে আপনার অপেক্ষা উচ্চ আসনে উন্নত সম্মানে বিভূষিত দেখিলে, যে ক্ষোভ জন্মে তাহাও এক বিষম যাতনা। ভূতল হইতে নক্ষত্র লোকের উচ্চতা যতদূর, পরকালে আপন অপেক্ষা কোনও কোনও লোককে তদপেক্ষা অধিক উন্নত দেখিয়া নিজের অযোগ্যতা ও অনুপযুক্ততা স্মরণ করতঃ বহু নিষ্পাপ সাধু লোককেও ক্ষোভ ও মনোকষ্ট পাইতে হইবে। এরূপ মনঃকষ্টকেও এক প্রকার যাতনা বলা যায়। তদ্রূপ যাতনা পাইতে না হয় তজ্জন্য তওবা করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া দ্বিতীয় প্রকারের ওয়াজেব। দেখ' ইহসংসারে নিজের সমশ্রেণীস্থ লোককে উচ্চ সম্মানে বিভূষিত দেখিলে সকলের মনেই তীব্র ক্ষোভ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সংসারকে আনন্দ-শূন্য কষ্টের স্থান বুঝা যায়; মন ক্ষোভানলে দগ্ধ হইতে থাকে। ফৌজদারী বিচারে যদিও তাহাকে বেত্রাঘাত, যষ্টী প্রহার, হস্ত কর্ত্তন, বা অর্থদণ্ড ভোগ করিতে হয় না, তথাপি তদপেক্ষা অধিক যাতনা মনের মধ্যে ঘটিতে থাকে। পরকালের অবস্থাও ঠিক সেই প্রকার। যাহারা শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট প্রথম প্রকারের ওয়াজেবগুলি পালন পূর্ব্বক দোজখের শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিবে, তাহাদিগকেও দ্বিতীয় প্রকার কর্ত্তব্য (ওয়াজেব) লঙ্ঘনে পরকালে উন্নত গৌরবে বঞ্চিত হইয়া

ওয়াজেবের প্রকারভেদ ও অর্থ

তীব্র মানসিক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। এই জন্য পরকালের-বিচার-দিনের আর এক নাম يوم التغابن 'ইয়াওমোৎ তাগাবেন' অর্থাৎ গতানু-শোচনার দিন; সে দিন কেহই অনুশোচনা শূন্য হইতে পারিবে না। যে ব্যক্তি পাপ কার্য্য করিয়াছে, নরক-যন্ত্রণায় জড়িত হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিবে,—"হায়! আমি কেন পাপ করিয়াছি?' যে ব্যক্তি সৎকার্য্য করে নাই, সেও দোজখে পড়িয়া বলিতে থাকিবে,—"হায়! আমি কেন সৎকার্য্য করি নাই?" যে ব্যক্তি সৎকার্য্য করিয়াছে, সেও অনুতাপ করিয়া বলিতে থাকিবে,—"হায় আমি কেন অধিক সৎকার্য্য করি নাই?" যাহা হউক, জগতের সমস্ত পয়গম্বর চিরকাল এক বাক্যে এই কথা বলিয়া আসিতেছেন—"যাহার যতদূর সাধ্য সৎকার্য্য করিয়া চল; ক্ষণকালের জন্যও সৎকার্য্যে বিরত হইও না এবং এমন ভাবে কার্য্য কর, যেন পরকালে ত্রুটী প্রকাশ না পায়।" জগতের শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্ষুধিত থাকিতেন। যদিও তিনি জানিতেন যে, অন্ন আহার করা হারাম নহে, তথাপি তিনি নিজকে কঠিন ক্ষুধার যন্ত্রণায় আবদ্ধ রাখিতেন। মহামাননীয়া বিবী আয়শা ছিদ্দীকা বলিয়াছেন—"মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ কোন কোন সময়ে ক্ষুধার জ্বালায় এমন অস্থির হইয়া পড়িতেন যে, আমি তাঁহার পবিত্র উদরে হাত বুলাইয়া বলিতাম—"হে রসুলুল্লা! আপনার স্বাস্থ্যের উপর আমার প্রাণ উৎসর্গ হউক—দুনিয়াতে তৃপ্তির সহিত পান ভোজন করিতে কি আপনার ক্ষতি আছে?' তদুত্তরে তিনি বলিতেন—'অয়ি আয়শা! আমার الوالعزم "উলুল আজম" (টীঃ ২৬৮) ভাই সকল আমার অগ্রে আল্লার সমীপে গিয়া মহৎ গৌরবের উৎকৃষ্ট সম্মানে পুরস্কৃত হইয়াছেন; আমার ভয় হয়, সাংসারিক সুখে রত হইলে, তাঁহাদের উচ্চ মর্য্যাদা অপেক্ষা আমার মর্য্যাদা লঘু হইতে পারে। ভ্রাতৃগণের অপেক্ষা মর্য্যাদায় লঘু হওয়া অপেক্ষা সংসারে এই কয়েকটী দিন

টীকা—২৬৮। الو উলু=অধিকারী এবং عـزم আজম=অধ্যবসায়। 'উলুল আজম' শব্দের অর্থ উন্নত অধ্যবসায়ের অধিকারী। যে সকল পয়গম্বরের ইচ্ছা ও অধ্যবসায় অতীব উচ্চ ছিল, তাঁহারা ঐ নামে সম্মানিত। নয় জন পয়গম্বর 'উলুল আজম' শ্রেণীর অন্তর্গত; যথা:—(১) হজরৎ নূহ। (২) হজরৎ এব্রাহীম। (৩) হজরৎ দাউদ। (৪) হজরৎ ইয়াকুব। (৫) হজরৎ ইয়ুছোফ। (৬) হজরৎ আইয়ুব। (৭) হজরৎ মুছা (৮) হজরৎ ঈছা। (৯) হজরৎ মোহাম্মদ (দঃ)। ইঁহারা প্রত্যেকে সত্য ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য নানা বিপদ আপদ সহ্য করিয়া অলৌকিক অধ্যবসায়ের সহিত মনুষ্য জাতির নৈতিক উন্নতির সোপান গড়িয়া গিয়াছেন।

কষ্ট সহ্য করা আমি অধিক ভালবাসি ।'" এই কথার উপর আমাদের প্রশ্নকারী কি বলিতে চান? দেখ, এক দিন মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী প্রস্তর খণ্ডের উপর মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক শয়ন করিয়াছিলেন; ইতিমধ্যে শয়তান আসিয়া বলিয়াছিল—"আপনি দুনিয়ার সুখ ভোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এখন দেখিতেছি আপনি তজ্জন্য অনুতাপ করিতেছেন।" হজরৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি কি করিয়াছি?" শয়তান বলিল—"আপনি পাথরের উপর মস্তক রাখিয়া বালিশের সুখ ভোগ করিতে চাহিতেছেন।" হজরৎ বাম হস্তে পাথরখানি দূরে নিক্ষেপ করতঃ বলিলেন—"এই লও, দুনিয়ার সহিত ইহাও লইয়া যাও। ইহাও তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম।" এক দিন মহাপুরুষ হজরৎ রসুল এর কাষ্ঠ পাদুকায় নূতন ফিতা লাগান হইয়াছিল। তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়াতে উহা সুন্দর বলিয়া বুঝা গিয়াছিল, এই জন্য তিনি নূতন ফিতা দূর করিয়া পুরাতন গাছী পরাইয়া দিতে আদেশ দিয়াছিলেন। একদা মহাত্মা হজরৎ আবুবকর ছিদ্দীক দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন। পানের পর সেই দুগ্ধ, যে উপায়ে উপার্জ্জিত হইয়া তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল তন্মধ্যে কিছু সন্দেহ অনুমান করিয়াছিলেন। সন্দেহ জন্মা মাত্র তিনি স্বীয় গলদেশে অঙ্গুলী প্রবেশ করিয়া দিয়া বমন করিয়াছিলেন। শেষে মনে করিয়াছিলেন দুগ্ধের কিয়দংশ নাড়ীর মধ্যে লাগিয়া থাকিতে পারে। এই সন্দেহে গলার মধ্যে পুনঃ পুনঃ অঙ্গুলী প্রবেশ করিয়া দিয়া বমন করিতে করিতে দুগ্ধের সহিত প্রাণ পর্য্যন্ত বাহির করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। আচ্ছা, এস্থলেই বা আমাদের প্রশ্নকারী কি বলিতে চান? তাঁহার কি জানা নাই যে শুধু সন্দেহ মাত্র অবলম্বনে সাধারণ ব্যবস্থা শাস্ত্রে বমন করার বিধান নাই। সর্ব্বসাধারণের জন্য সহজসাধ্য সরল ব্যবস্থা হইয়াছে। সে ব্যবস্থা এক প্রকার; আর ছিদ্দীকগণ সতর্ক দৃষ্টিতে নিজের উপরে যে কঠিন ব্যবস্থা করিয়া লন তাহা অন্য প্রকার। ছিদ্দীকগণ প্রত্যেক ব্যাপারের দোষ গুণ স্বচক্ষে দেখিতে পান এবং বিশেষ সাবধানে দোষের স্পর্শ পর্য্যন্ত পরিহার করিয়া চলেন। মনুষ্যজাতির মধ্যে ছিদ্দীকগণই প্রকৃত চক্ষুষ্মান লোক। তাঁহারা আল্লাকে দেখিতে পান—সৃষ্টি-কৌশল দেখিতে পান এবং আল্লার পথে চলিবার কালে যে সকল বাধা বিঘ্ন আপদ বিপদ উপস্থিত হয় তাহাও দেখিতে পান। হে প্রশ্নকারী! ইহা মনে করিও না যে, ঐ সকল মহাত্মা বিনা কারণে তদ্রূপ মহা কষ্ট ও কঠিন পরিশ্রম

আপনাদিগের উপর চাপাইয়া লইয়াছেন বরং তাঁহারা প্রতি মুহূর্তে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে এবং পারলৌকিক গৌরব হস্তগত করিতে বান্ধা কোমরে সর্ব্বদা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহারা তদ্রূপ কষ্ট অনর্থক সহ্য করেন নাই, ইহা বিশ্বাস কর। পাঠক! তোমরা কেবল সাধারণ ব্যবস্থা শাস্ত্রের সাধারণ ব্যবস্থা মানিয়া সাধারণ লোকের পন্থা অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট হইও না, বরং ছিদ্দীকগণের সতর্ক ব্যবহারের অনুসরণ কর। যাহা হউক, উপরে যাহা লেখা গেল, তাহা হইতে মোটামুটি বুঝিতে পারিলে যে মানব কোন অবস্থায় তওবা না করিয়া থাকিতে পারে না।

অপচিত সময়ের জন্য মৃত্যুকালে অনুশোচনা বা তওবা বিফল —আবু ছোলায়মান দারানী বলিয়াছেন—মানব অন্য কোন ক্ষতিতে রোদন না করিলেও আসে যায় না, কিন্তু সময়ের অপচিত অংশের সহিত যে উপকার হাত ছাড়া হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলে হৃদয় ফাটিয়া ক্ষোভে ও অনুতাপে যে রোদন আসে, তাহা মৃত্যু পর্য্যন্ত শেষ হয় না। এমন অবস্থায় যে ব্যক্তি অতীত জীবন বৃথা নষ্ট করিয়া সম্মুখস্থ ভবিষ্যৎ সময়ও অপচয় করিতে বসিয়াছে, তাহার দুরবস্থার কথা আর কি জিজ্ঞাসা কর?" পাঠক! বুঝিয়া দেখ—এক ব্যক্তি অসাবধানতা হেতু হাতের মাণিক হারাইয়া ফেলিল; ইহাতে সে অবশ্যই অনুতাপে রোদন করিবে। কিন্তু তাহার উপর মাণিক হারানের অপরাধে তাহার উপর তৎপ্রভু যদি কোন শাস্তি দেন তবে বল দেখি তাহার ক্রন্দন কেমন কঠিন হইবে? জীবনের প্রত্যেক নিশ্বাস এক একটী অমূল্য মাণিক। উহার বিনিময়ে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য হস্তগত হইতে পারে। উহা অপচয় হইলেই এক মহা ক্ষতি; তাহার উপর উহার বিনিময়ে পাপ কিনিয়া লওয়া কেমন ভয়ঙ্কর হৃদয়-বিদারক ক্ষতি। পাপে, আত্মার বিনাশ সাধন করে। যে পরমায়ু দিয়া স্থায়ী সৌভাগ্য ক্রয় করা যাইত, তদ্দ্বারা ভীষণ আত্ম-বিনাশ ক্রয় করা হইতেছে—এ সংবাদটী যদি কাহাকে দেওয়া যায়, তবে বল দেখি তাহার কেমন মানসিক যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে? মানব কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর ক্ষতির সংবাদ এমন অসময়ে প্রাপ্ত হইবে যে, তখন অনুতাপ পরিতাপে কোন ফল হইবে না। এই উপলক্ষে আল্লা বলিতেছেন—

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ
اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ

رب

رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِيْ إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبٍ ۝

"তোমাদিগকে যে জীবিকা দান করিয়াছি, মৃত্যু আসিবার পূর্ব্বে তাহার সদ্‌ব্যয় কর। (মৃত্যু আসিলে) এ কথা বলিও না যে—"হে প্রভো! কিছু সময় দিলে ভাল হইত।" (২৮ পারা। সূরা মোনাফেকুন। শেষ রোকূ।) জ্ঞানী লোকেরা এই আয়াতের ব্যাখ্যা কালে বলিয়াছেন—"মৃত্যু কালে মানুষেরা যমকে দেখিতে পায় এবং তাহাকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারে, এখনই মরিতে হইবে। তৎকালে মানবের মনে বিষম ক্ষোভ অনুতাপ আবির্ভূত হয় এবং যমকে বলিতে থাকে—'দয়া করিয়া একটী দিনের অবসর দিউন; সেই অবসরে তওবা করিয়া লই।' যম বলিয়া থাকে—'তুমি তো বহু দিনের অবসর পাইয়াছিলে, এখন একটী দিনও বাকী নাই—ঠিক মৃত্যুর দিন উপস্থিত।' একথা শুনিয়া সে ব্যক্তি অধীর হইয়া বলিতে থাকে, 'তবে এক ঘণ্টা সময় দিউন।' ফেরেশ্‌তা বলেন—'তোমাকে বহু ঘণ্টা সময় দেওয়া হইয়াছে; এখন একটী ঘণ্টাও অবসর দেওয়া যায় না।' তখন মানুষ নিরাশ হইয়া পড়ে এবং তাহার মনে এমন ব্যাকুলতা আবির্ভূত হয় যে, ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস-জ্ঞানের মধ্যে গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। যাহার অদৃষ্টে সৃষ্টির আদিম সময়ে দুর্ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সে তৎকালে বিষম হুড়বড়ির মধ্যে পড়িয়া বিশ্বাস-জ্ঞানের স্থৈর্য্যতা হারাইয়া ফেলে। সন্দেহ ও ব্যাকুলতা লইয়া পরকালে চলিয়া যায় এবং তথন গিয়া অনন্ত দুর্ভাগ্যে পতিত হয়। পক্ষান্তরে, আদিম কালে যাহার অদৃষ্টে সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সে উপার্জ্জিত জ্ঞানবিশ্বাস অটল ও অবিকল ভাবে লইয়া শান্তির সহিত পরকালে পার হইয়া যায়; এবং সুখে বাস করিতে থাকে।" এই উপলক্ষে আল্লা বলিতেছেন—

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۝

حَتّٰى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ

"মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিজের পাপ টের পাইয়া যে ব্যক্তি বলে, আমি তওবা করিতেছি, তাহার তওবা কোন কাজেরই নহে।" (৪ পারা। সুরা নেছা। ৩ রোকু।) জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—"মহাপ্রভু আল্লা প্রত্যেক মানবকে দুইটী গুপ্ত কথা বলিয়া দিয়াছেন। প্রথমটী জন্ম কালে বলেন, তাহা এই—'হে মানব! তোমাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সৃজন করিলাম—তোমার হিতের জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা প্রচুর পরিমাণে দিলাম—সর্ব্বোপরি পরমায়ু রূপ মূলধন তোমার হাতে সমর্পণ করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইতেছি। সাবধান, মূলধনের কিছুমাত্র অপচয় করিও না, উহা কি ভাবে আমার নিকট ফিরিয়া আন তাহাই আমি দেখিতে চাই।' দ্বিতীয় কথাটী মৃত্যু সময়ে বলিবেন, যথা-'যে মূলধন তোমার হাতে আমানৎ রাখিয়াছিলাম, তাহা দিয়া কি করিয়াছ? যদি সযত্নে সদ্ব্যবহার করিয়া থাক, তবে পুরস্কার পাইবে, কিন্তু অযত্নে অপচয় করিয়া থাকিলে দোজখে নিক্ষিপ্ত হইয়া পুড়িতে থাকিবে। এখন পুরস্কার বা শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও।'

তওবা গ্রাহ্য হইবার কথা। পাঠক! জানিয়া রাখ—যথারীতি নিয়ম সহকারে তওবা করা গেলে তাহা মহাপ্রভু অতি নিশ্চয় কবুল করিয়া থাকেন। তওবা করিয়া তাহা আল্লা গ্রহণ করিবেন কি না বলিয়া সন্দেহ করা উচিৎ নহে। তবে তওবাটী নিয়ম মত যথারীতি হইল কি না এই ভাবিয়া ভয় রাখিবে। যে ব্যক্তি আত্মার পরিচয় পাইয়াছেন, শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ জানিতে পারিয়াছেন এবং আল্লার সহিত আত্মার মিলনপথের বাধা বিঘ্নগুলি চিনিতে পারিয়াছেন, তিনি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছেন, পাপই আল্লার পথের পর্দ্দা এবং তওবা সেই পর্দ্দা সরাইয়া দিবার একমাত্র উপায়। আল্লার দিকে যাইবার পথে আত্মার সম্মুখে যে পর্দ্দা উপস্থিত হয়, তাহা বিদূরিত হওয়ার নাম 'তওবা কবুল' হওয়া। আত্মা বাস্তবিক পক্ষে ফেরেশ্‌তাজাতির সমশ্রেণীস্থ এক প্রকার পবিত্র পদার্থ। আত্মা প্রথমে স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় মসৃণ ও পরিষ্কার থাকে। পরে পাপ কার্য্য করিলে তাহা মলিন হইয়া পড়ে। পৃথিবী হইতে আত্মা নিজের স্বাভাবিক নির্ম্মলতা ও স্বচ্ছতা লইয়া পরকালে পার হইতে পারিলে তন্মধ্যে আল্লার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইতে পারে। পৃথিবীতে অবস্থান কালে পাপ

কার্য্য করিলে তজ্জনিত ধূম আত্মাকে আচ্ছন্ন করে; আবার এবাদৎ ও সৎকার্য্য করিলে তদুৎপন্ন আলোক আত্মাকে নির্ম্মল করিয়া দেয়। এখন দেখ, পৃথিবীতে অবস্থান কালে আত্মার উপর দুটী প্রভাব অনবরত পড়িতেছে—পাপ কার্য্য করিবামাত্র অন্ধকার জন্মিয়া আত্মাকে মলিন করিয়া ফেলে; আবার পুণ্য কার্য্য করিলে এক প্রকার আলোক উৎপন্ন হইয়া পাপের মলিনতা দূর করিয়া দেয়। পাপের অন্ধকার ও পুণ্যের আলোক পর পর আত্মার উপর ক্রমাগত পড়িতেছে। একবার পাপের অন্ধকার, পুণ্যের আলোক নির্ব্বাণ করিয়া দিতেছে; আবার পুণ্যের আলোক, পাপের মলিনতা সরাইয়া দিতেছে। এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধের মধ্যে তওবা আসিয়া পাপের মলিনতা দূর করিয়া দিলে আত্মা নিজের স্বাভাবিক পবিত্রতা ও উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়; তাহার পর এবাদৎ ও সৎকার্য্য করিলে তাহার আলোকে আত্মার উজ্জ্বলতা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইস্থলে এ কথাটীও মনে রাখিতে হইবে যে, কঠিন মহাপাপ করিলে কিম্বা লঘু পাপই বরাবর করিয়া চলিলে আত্মার উপর গাঢ় মরিচার এক শক্ত আবরণ পড়িয়া যায় এবং আস্তে আস্তে সে মরিচা অভ্যন্তর ভাগে এমন গভীর হইয়া প্রবেশ করে যে, কোন উপায়ে সে কলঙ্ক দূর করা যায় না। দেখ, আয়নার উপর মরিচা জমিয়া বহু দিন রহিয়া গেলে, তাহার দাগ অধিক ভিতরে প্রবেশ করে; তখন তাহাকে পরিষ্কার করা দুষ্কর হয়। আত্মার অবস্থাও তদ্রূপ। বহুদিন ধরিয়া পাপ কার্য্য করিলে মরিচা আত্মাকে এমন গাঢ় কাল আচ্ছাদনে ঢাকিয়া অভ্যন্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে যে তাহার মধ্যে তওবা করিবার ইচ্ছা আদৌ প্রবেশ করিতে পারে না। মুখে তওবা করিলেও তাহা অন্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে না—জিহ্বাগ্র হইতেই উড়িয়া যায়। মলিন বস্ত্রে ছাবুন মাখিয়া ধুইলে যেমন তাহা পরিষ্কার হইতে পারে, তদ্রূপ বিশেষ মনোযোগের সহিত এবাদৎ ও সৎকার্য্য করিলে তাহার আলোকে মলিন হৃদয় পরিষ্কার হইতে পারে।

আল্লার নিকটে তওবা গৃহীত হওয়া সম্বন্ধে মহাজন উক্তি ও উপাখ্যান। এই জন্য মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) বলিয়াছেন—"মন্দকার্য্য ঘটিয়া গেলে অবিলম্বে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান কর, তাহাতে পাপের ক্ষতি সংশোধিত হইবে।" তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"পাপ

আকাশের সমান উচ্চ হইলেও তওবা করিবামাত্র ক্ষমা হইবে।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"কোন কোন ব্যক্তি পাপ করিয়া বেহেশ্‌তে যাইবে।" ইহা শুনিয়া ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হে রসুলুল্লা, তদ্রূপ হইবার কারণ কি?" তিনি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, "কেহ পাপ করিয়া এমন তীব্র অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইতে পারে যে, ঐদ্‌যাতনা তাহাকে আর পাপের দিকে দৃষ্টি করিতে অবসর দেয় না। সেই অনুতাপ লজ্জায় তাহাকে সোজাসুজী বেহেশ্‌তে লইয়া গিয়া উপস্থিত করে!" জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—"তওবাকারী লোককে দেখিয়া শয়তান ভয় পায় এবং হতাশ হইয়া দুঃখের সহিত বলিতে থাকে—'হায়, উহাকে পাপে নিক্ষিপ্ত না করিলেই ভাল হইত।'" মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—"অপবিত্র বস্তু সংযোগে বস্ত্র কলুষিত হইলে, জলে যেমন তাহা ধুইয়া পরিষ্কার করে, পুণ্যও তদ্রূপ পাপ ধুইয়া ফেলে।" তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"শয়তান আল্লার দরবার হইতে বিতাড়িত হইবার কালে বলিয়াছিল—'হে মহাপ্রভো! তোমার গৌরবের শপথ—মানবের প্রাণ, দেহ পিঞ্জর হইতে বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত আমি তাহার হৃদয় হইতে বাহির হইব না।' তদুত্তরে করুণাময় বলিয়াছিলেন—'আমিও নিজের গৌরবের শপথ করিয়া বলিতেছি—"মানুষের প্রাণ যে পর্য্যন্ত দেহে থাকিবে, আমিও সে পর্য্যন্ত তাহার তওবার পথ বন্ধ করিব না।"' এক হাব্‌শী হজরতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিয়াছিল—"হে রসুলুল্লা! আমি অসীম পাপ করিয়াছি। আমার তওবা কি কবুল হইবে?" হজরৎ বলিয়াছিলেন—"হাঁ, কবুল হইবে।" হাব্‌শী উত্তর শুনিয়া প্রস্থান করিল। কিছু দূর গমনের পর পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হে রসুলুল্লা! পাপ করিবার সময় আল্লা কি আমাকে দেখিতেছিলেন? উত্তর হইল—"হাঁ, তিনি তোমাকে পাপ করিতে দেখিয়াছেন।" এই কথা শুনিবা মাত্র হাব্‌শী এক বিকট চীৎকার করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। মহাত্মা ফাজীল বলিয়াছেন—"মহাপ্রভু কোন এক পয়গম্বরকে বলিয়াছিলেন 'তুমি আমার পাপী লোকদিগকে সুসমাচার দাও যে, তাহারা তওবা করিলে আমি কবুল করিব এবং ছিদ্দীকদিগকে বলিয়া দাও যে, আমি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার করিলে তাহাদের কেহই শাস্তি হইতে বাঁচিতে পারিবে না।'"

মহাত্মা তালেক এব্‌নে হবীব বলিয়াছেন—"আল্লা সম্বন্ধে মানবের কর্ত্তব্য এত বড় দুঃসাধ্য যে, অসীম অধ্যবসায়, অগাধ যত্ন ও প্রাণান্ত পরিশ্রম সহকারে করিতে গেলেও যথোচিত ভাবে সম্পন্ন করিতে পারিবে না। এই জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে প্রাতে শয্যা ত্যাগ করা এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে রজনীতে শয়ন করা কর্ত্তব্য।" মহাত্মা হবীব এব্‌নে আবি ছাবেৎ বলিয়াছেন—"মহাবিচার কালে মানবের সম্মুখে পাপ কার্য্যগুলি উপস্থিত করা হইলে, যে কোন ব্যক্তি নিজের যে পাপটী দেখিয়া সভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া বলিতে পারিবে যে, আমি ইহার জন্য ভয় পাইতাম; তবে তাহার সে পাপ ক্ষমা করা হইবে।"

উপাখ্যান—বাণী এছরায়েল বংশে এক ব্যক্তি ঘোর পাপী ছিল। শেষ বয়সে সে অতীত পাপের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং তওবা করিতে ইচ্ছা করে। আল্লার দরবারে তাহার তওবা কবুল হইবে কি না জানিবার জন্য জ্ঞানী লোকের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। ইতিমধ্যে একজন প্রধান সাধুর সন্ধান পাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল—"আমি এক জন ঘোর পাপী, নিরনব্বই জন নিরপরাধ ব্যক্তিকে অকারণ হত্যা করিয়াছি; আপনি দয়া করিয়া বলুন, আমার তওবা কবুল হইবে কি না?" সাধু বলিলেন—"তোমার তওবা কবুল হইবে না।" তখন সে ব্যক্তি হতাশে দিশাহারা হইয়া ঐ সাধুকেও হত্যা করতঃ নরহত্যার সংখ্যা এক শত পূর্ণ করিল। পরে আর একজন জ্ঞানীর সন্ধান পাইয়া তাহার নিকট গমন করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল—"আমি এমন এমন গুরুতর পাপ করিয়াছি, আমার তওবা কবুল হইবে কি না?" জ্ঞানী উত্তর দিয়াছিলেন—"তোমার তওবা কবুল হইতে পারে, কিন্তু তোমার বাসস্থানই পাপের কারণ। নিজ গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমুক স্থানে যাও, তথায় কতকগুলি সাধু লোক বাস করেন তাঁহাদের সংসর্গে বাস কর।" পাপী লোকটী সেই সাধুগণের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার আত্মা বেহেশ্‌তে লইয়া যাওয়া হইবে, কি দোজখে ফেলিবে বলিয়া করুণার ফেরেশ্‌তা ও নিগ্রহের ফেরেশ্‌তার মধ্যে মতভেদ জন্মিল। মহাপ্রভু ফেরেশ্‌তাদিগকে বলিলেন—"তোমরা পাপীর গৃহ ও সাধুগণের আবাস স্থানের মধ্যবর্ত্তী দূরত্ব জরীপ করিয়া দেখ, মৃতদেহ কোন্ প্রান্তের নিকটবর্ত্তী। গৃহের নিকটবর্ত্তী

হইলে দোজখে যাইবে, আর সাধুদিগের নিকটবর্ত্তী হইলে বেহেশ্‌তে যাইবে।" ফেরেশ্‌তারা জরীপ করিয়া দেখিল, মৃতদেহ ঠিক মধ্যপথের চিহ্ন হইতে অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ সাধুদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তখন করুণার ফেরেশ্‌তা তাহার আত্মা লইয়া বেহেশ্‌তে প্রস্থান করিল। যাহা হউক, এই উপাখ্যান হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পাপের পাল্লা একেবারে পাপশূন্য না হইলে যে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে না, তাহা নহে, বরং পাপের পাল্লা অপেক্ষা পুণ্যের পাল্লা অধিক ঝুলিয়া পড়িলেই পরিত্রাণের আশা আছে।

লঘু পাপ—পাঠক! জানিয়া রাখ—বিপথে গমন হইতে যেমন সুপথে প্রত্যাবর্ত্তনের উদয় হয়, তদ্রূপ পাপ হইতে তওবার জন্ম হয়। মহাপাপ হইতে তওবা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা কঠিন এবং পাপ যত লঘু ধরণের হয়, তাহা হইতে বিমুখ হওয়া তত সহজ। কিন্তু صغير ছগীরা বা লঘু পাপও পুনঃ পুনঃ করিতে থাকিলে এবং তন্মধ্যে লিপ্ত ও আবদ্ধ হইয়া পড়িলে পরিত্যাগ করা কঠিন হইয়া থাকে। হদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে যে, মহাপাপ ব্যতীত লঘু গুলির ক্ষতি দৈনিক ফরজ কার্য্যে পূরণ হয়। লঘু পাপের মধ্যে যে গুলি দৈনিক ফরজ নমাজেও সংশোধিত হয় না, তাহা সাপ্তাহিক জুমার নামাজে বিদূরিত হইয়া যায়। করুণাময় আল্লা বলিতেছেন—

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ
نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

"যে মহাপাপ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা হইতে দূরে থাকিলে ত্রুটীগুলি তোমাদিগ হইতে মুছিয়া ফেলা হইবে।" (৫ পারা। সূরা নেছা। ৫ রোকু।) অর্থাৎ মহাপাপ না করিলে লঘু পাপ গুলি আল্লা মাফ করিবেন।

মহাপাপ ও তাহার বিবরণ ও প্রকার ভেদ। যাহা হউক كبير কবিরা বা মহাপাপ কোন্‌গুলি চিনিয়া লওয়া প্রত্যেক মানুষের পক্ষে ফরজ। মহাপাপের সংখ্যা সম্বন্ধে ছাহাবাগণের মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলিয়াছেন মহাপাপ সাতটী। আবার কেহ বা তদপেক্ষা অধিক আবার

কেহবা অন্য বলিয়াছেন। মহাত্মা এব্‌নে ওমরের মুখে শুনিয়া মহাত্মা এব্‌নে আব্বাছ বলিয়াছেন—"মহাপাপ সাতটী, ঐ সাতটীর প্রকার ভেদ ধরিলে প্রায় ৭০ সত্তরটী মহাপাপ হইয়া থাকে।" মহাত্মা আবুতালেব মক্কী বলিয়াছেন—"হদীছের সহিত ছাহাবাগণের উক্তি মিল করিয়া, 'কুওতোল্ কলুব' নামক যে গ্রন্থ লিখিয়াছি তাহাতে দেখান হইয়াছে—মহাপাপের সংখ্যা **সতেরটী**; তন্মধ্যে চারিটী **অন্তরের সহিত সম্বন্ধ** রাখে, যথা—(১) নাস্তিকতা, (২) পাপের পুনরাবৃত্তি; লঘু পাপ হউক না কেন তাহা ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনঃ পুনঃ করিবার ইচ্ছা করিলে, এবং কুকর্ম্মকে মন্দ বলিয়া জানিয়াও পুনঃ পুনঃ করিলে; কিম্বা মন্দ কর্ম্ম হইতে বিরত হইবার ইচ্ছা না করিলে লঘু পাপ ও মহাপাপ হইয়া দাঁড়ায়। (৩) আল্লার অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হওয়া। এই নৈরাশ্যকে আরবীতে قنوط কোনুৎ বলে। (৪) আল্লার শাস্তি হইতে নিরাপদ হইয়াছি, এইরূপ বিবেচনা করা। আবার চারিটী মহাপাপ **বাক যন্ত্রের সহিত সম্পর্ক** রাখে, যথা—(৫) মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া, যাহার ফলে কেহ ন্যায্য স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। (৬) সাধু ও সচ্চরিত্র নর নারীর উপর ব্যভিচারের দোষারোপ করা, যে দোষের জন্য আইনে কঠিন শাস্তির বিধান আছে। (৭) মিথ্যা শপথ করা; যে শপথের ফলে কেহ স্বীয় ধন বা অন্য কোন হক হইতে বঞ্চিত হয়। (৮) যাদু বা মন্ত্র মুখে উচ্চারণ করা। তিনটী মহাপাপ **উদরের সহিত সম্পর্ক** রাখে যথা—(৯) মাদক দ্রব্যের সেবন যাহাতে নেশা জন্মে ও বুদ্ধি লোপ পায়। (১০) অনাথ ও অসহায় বালক বালিকার ধন কাড়িয়া খাওয়া। (১১) সুদ খাওয়া। দুইটী মহাপাপ **কামেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্পর্ক** রাখে; যথা—(১২) জেনা পরস্ত্রী (গমন)। (১৩) لواطت (লওয়াতাৎ) অস্বাভাবিক মৈথুন (পশুর সঙ্গেই হউক বা পুরুষের সঙ্গেই হউক)। দুইটী মহাপাপ **হস্তের সঙ্গে সম্পর্ক** রাখে, যথা—(১৪) নরহত্যা, (১৫) চুরী করা; যে অবস্থায় এ চুরীর জন্য আইন মত দণ্ডিত হইবার যোগ্য হয়। একটী মহাপাপ **পদের সঙ্গে সম্পর্ক** রাখে, যথা—(১৬) কাফেরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করা; এস্থলে পলায়নের অবস্থা ভেদ আছে। কাফের শত্রু মুছলমানের দ্বিগুণ হইলে অর্থাৎ এক মুছলমানের সঙ্গে দুই কাফের কিম্বা দশ মুছলমানের বিরুদ্ধে

বিশ কাফের যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও মুছলমানকে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করা মহাপাপ। কাফের শত্রু মুছলমানের দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক হইলে পলায়ন করা সঙ্গত। একটী মহাপাপ সমস্ত শরীরের সহিত সম্বন্ধ রাখে যথা—

যুদ্ধ হইতে পলায়ন কখন সঙ্গত ?

(১১) পিতা মাতাকে দুঃখ দেওয়া। পাঠক! যে কয়েকটী মহাপাপের পরিচয় দেওয়া গেল, তন্মধ্যে আইনে কতকগুলির কঠিন দণ্ডের বিধান আছে এবং আর কতকগুলির জন্য কোর্‌আন্ শরীফে কঠিন শাস্তির ভয় বহুবার প্রদর্শন করা হইয়াছে। এই জন্য ঐ সকল মহাপাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। বিস্তৃত পরিচয় 'এহ্ইয়া-অল উলুম' নামক গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তৎ সমুদয়ের সমাবেশ হইবে না। মোটামুটী কয়েকটীর পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। আশা করা যায় এই কয়েকটীর পরিচয় পাইলে মানুষ মহাপাপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবে।

পরপীড়নোৎপন্ন পাপ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত—পাঠক! স্মরণ কর, লঘু পাপ পুনঃ পুনঃ করিলে মহাপাপে পরিণত হয়, এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, দৈনিক ফরজ কাজে লঘু পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায়। এই কথা ধ্রুব সত্য—কেহই এই কথার প্রতিবাদ করিতে পারে না। তবে এ কথাটীও সত্য যে, কেহ অত্যাচার **উৎপীড়ন দ্বারা অর্থোপার্জ্জন** করতঃ তাহার এক কপর্দ্দকও অধিকারে রাখিয়া নমাজ রোজা প্রভৃতি ফরজ কার্য্য করিলেও উৎপীড়নার্জ্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। তদ্রূপ স্থলে প্রথমে উৎপীড়ন হইতে ক্ষান্ত হইয়া, পরে উপার্জ্জিত ধন সমস্তই তাহার প্রকৃত অধিকারীদিগের হাতে ফিরিয়া দিলে ফরজ কার্য্যে, উৎপীড়ন পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ফল কথা, আল্লার প্রতি কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করিলে যে পাপ জন্মে, তাহা মাফ পাইবার অধিক সম্ভাবনা. কিন্তু যে পাপ মানুষের প্রতি অত্যাচার হইতে উৎপন্ন, তাহা উৎপীড়িত লোকের ক্ষমা ভিন্ন মাফ পাইবার উপায় নাই। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে যে—"মানবের কার্য্য তালিকা (আমল নামা) তিন খানি। এক খানির মধ্যে মহাপাপ লিপিবদ্ধ হয়; সে পাপ কোন কারণেই মাফ হয় না, যথা—শেরেক অর্থাৎ আল্লার অংশী বা শরীক আছে,

মানবের ত্রিবিধ আমল নামার বিবরণ

এমন

এমন বিশ্বাস করা। অপর তালিকার মধ্যে লঘু পাপ লিপিবদ্ধ হয়, সে পাপ আল্লার সম্বন্ধেই হউক, বা মানুষের সম্বন্ধেই হউক, পরে মার্জ্জনা হইতে পারে। আর এক খানির মধ্যে মানুষের প্রতি উৎপীড়ন হইতে উৎপন্ন পাপ লিপিবদ্ধ হয়, তাহাও মাফ হইবার আশা নাই।' পাঠক! বুঝিয়া রাখ, যে কার্য্যে 'মুছলমান লোকের মনঃকষ্ট' দেওয়া হয়, তাহা এই শেষোক্ত কার্য্য-তালিকায় লেখা হয়। কোন মুছলমানকে শারীরিক বা মানসিক কষ্ট দিলে বা তাহার আর্থিক ক্ষতি করিলে কিম্বা তাহার মান সম্ভ্রম বা এজ্জৎ হরমৎ নষ্ট করিলে, অথবা সমাজের লোকের ধর্ম্ম জীবনের ব্যাঘাত ঘটাইলে আল্লার স্থানে মাফ পাইবার আশা নাই। নিম্নলিখিত কার্য্যে ধর্ম্ম-জীবনের ব্যাঘাত করা হয়; যথা বেদাৎ (নব প্রথা) সমাজ মধ্যে প্রচলন করিয়া লোকের গুণ, ধর্ম্ম বিনাশ করা কিম্বা সভা গঠন পূর্ব্বক তন্মধ্যে কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করতঃ সাধারণ লোকের মন হইতে পাপ-ভীতি বা কুকর্ম্মের প্রতি ঘৃণা কমাইয়া দেওয়া।

সমাজের ধর্ম্ম-জীবনে বিঘ্ন উৎপন্নকারী কার্য্য

লঘু পাপ, মহাপাপে পরিণত হইবার কারণ। পাঠক স্মরণ কর—লঘু পাপে লোকের আশা থাকে যে, করুণাময় দয়া করিয়া মার্জ্জনা করিতে পারেন। কিন্তু কতকগুলি কারণে উহা মহাপাপের অন্তর্গত হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য মহা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার এবং কঠিন দণ্ড পাইবার উপযুক্ত হইতে পারে। **ছয়টী** কারণে লঘু পাপ মহাপাপে পরিণত হয়। **প্রথম কারণ**—পুনঃ পুনঃ পাপের পুনরাবৃত্তি। পাপ যতই লঘু হউক না কেন, তাহা হইতে বিরত না হইয়া পুনঃ পুনঃ করিতে লাগিলে মহাপাপের আকার ধারণ করে এবং আত্মার ক্ষতি করিয়া থাকে। দেখ, অসাক্ষাতে পরনিন্দা করা একটী লঘু পাপ। কিন্তু সর্ব্বদা পরনিন্দা করিয়া বেড়াইলে উহা মহাপাপের ন্যায় আত্মার ক্ষতি করে। এইরূপ রেশমী বস্ত্র পরিধান করা এবং নির্দ্দোষ গান বাদ্য করা বা শ্রবণ করা লঘু পাপ; এবম্বিধ কার্য্যও সদাসর্ব্বদা করিতে গেলে হৃদয় মলিন হইয়া পড়ে এবং পরিত্যাগ করিতে না পারিলে শেষে আত্মার মহা ক্ষতি করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র কার্য্য বরাবর করিলে যে গুরুতর ফল উৎপন্ন হয়, তাহা মহাপুরুষ হজরৎ রছুল ﷺ অন্য বিষয় অবলম্বনে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"সৎকার্য্য নিতান্ত তুচ্ছ

হইলেও বরাবর করিলে, সে অভ্যাসে মহা কল্যাণ উৎপাদন করে।" দেখ, তরল জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু, কঠিন প্রস্তরের একই স্থানের উপর পুনঃ পুনঃ পড়িতে থাকিলে সেই ক্ষুদ্র শক্তির প্রভাবে ঐ কঠিন প্রস্তরেও ছিদ্র উৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু সমস্ত জলরাশি, প্রস্তরের উপর একবারে ঢালিয়া দিলে, তাহা তদুপরি কোনই চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে না। যাহা হউক, পাপ যতই লঘু হউক না কেন, কোন কারণে ঘটিবামাত্র অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লার স্থানে ক্ষমা প্রার্থনা করা ও ক্ষতি সংশোধনে চেষ্টা করা উচিত এবং তদ্রূপ কার্য্য পুনরায় না করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প করাও কর্ত্তব্য। জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন, মহাপাপ করিয়া নিতান্ত অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, তাহা লঘু পাপে পরিণত হয়; এবং লঘু পাপ উৎসাহের সহিত পুনঃ পুনঃ করিতে থাকিলে মহাপাপের আকার ধারণ করে। **দ্বিতীয় কারণ—** পাপকে ক্ষুদ্র জ্ঞান। পাপ যতই সামান্য হউক না কেন, তাহাকে ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ জ্ঞানে উপেক্ষা করিলে মহাপাপের আকার ধারণ পূর্ব্বক মহা ক্ষতি উৎপাদন করে। আবার পাপকে গুরুতর বলিয়া ভয় করিলে, সে পাপ লঘু হইয়া পড়ে এবং তত ক্ষতি করিতে পারে না। পাপ যে গুরুতর, এই বিবেচনাটী বিশ্বাস-জ্ঞান (ঈমান) ও ভয় এই দুই কারণে উৎপন্ন হয়। উহা আত্মাকে এমন ভাবে পাহারা দিয়া রাখে যে, পাপের অন্ধকার, আত্মাকে আক্রমন করিতে পারে না। অপর পক্ষে, পাপকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, মোহ, ভ্রম ও পাপের প্রতি আসক্তি হইতে উৎপন্ন হয়। পাপকে তুচ্ছ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলে ইহাই বুঝা যায় যে, পাপ, হৃদয়ের সহিত এক প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লইয়াছে এবং হৃদয়ও সে সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া লইয়াছে। মানব হৃদয়ের স্বভাব এই যে, অভিলষিত পদার্থের মধ্যে যাহা মনের উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করে, তাহাই গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে "মুছলমান লোক স্বীয় পাপকে মাথার উপর পাহাড় প্রমাণ লট্‌কান দেখে এবং কখন ভাঙ্গিয়া পড়ে এই ভয়ে ত্রস্ত থাকে এবং মোনাফেক লোক পাপকে ক্ষুদ্র মাছির ন্যায় হাল্‌কা দেখে এবং বিবেচনা করে এখন নাকের উপর বসিতেছে পরক্ষণেই উড়িয়া যাইবে।" জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন— "যে ব্যক্তি আপন পাপকে তুচ্ছ বলিয়া বিবেচনা করে এবং আশা করে যে, সমস্ত পাপই এইরূপ তুচ্ছ হইবে তাহার পাপ মার্জ্জনা হইবে না।"

এক পয়গম্বরের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল—"পাপের ক্ষুদ্রতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না, আল্লার মহত্ত্বের দিকে দর্শন কর এবং জানিয়া দেখ সেই মহান্ সর্ব্বব্যাপী আল্লার কত নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছ।" মানব যতই আল্লার মহত্ত্ব অধিক পরিমাণে জানিতে পারে, ততই ছোট পাপকে বড় বলিয়া বুঝিতে পারে। এক জন ছাহাবা বলিয়াছেন—"লোকে কাম করে অথচ তাহাকে পশমের ন্যায় হাল্‌কা মনে করে, আমি কিন্তু প্রত্যেক কামকে পর্ব্বত প্রমাণ গুরুতর বলিয়া মনে করি।" পাপের উপর আল্লার ক্রোধ গুপ্ত ভাবে থাকে। যে পাপকে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করা যায়, হয় তো, তৎপ্রতি আল্লার ক্রোধ অধিক মাত্রায় থাকিতে পারে। আল্লা স্বয়ং বলিতেছেন—

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

"তোমরা তাহা ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিতেছ কিন্তু উহা আল্লার নিকট গুরুতর।" (১৮ পারা। সূরা নূর। ২ রোকূ।) **তৃতীয় কারণ—** পাপ করিয়া আনন্দ লাভ। পাপ করিয়া আনন্দিত হইলে লঘু পাপও গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। অন্যায় কার্য্য দ্বারা লাভ হইল মনে করিলে কিম্বা গর্হিত কার্য্যে জয় হইল বলিয়া গর্ব্ব করিলে, নিজের সর্ব্বনাশ ঘটে। যদি কেহ গর্ব্ব করিয়া বলে যে—'আমি অমুককে ঠকাইতে পারিয়াছি—অমুককে খুব প্রহার করিয়াছি—অমুককে বিশেষ লাঞ্ছনা দিয়াছি—অমুকের ধন মাল কাড়িয়া লইয়াছি—অমুককে যথেষ্ট গালি দিয়া অপমান করিয়াছি—ঝগড়া বা তর্কে অমুককে হারাইয়া দিয়াছি' তবে তাহার আত্মার মহা ক্ষতি হইয়া থাকে। তদ্রূপ গর্হিত কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়া যে ব্যক্তি বাহাদুরী দেখায় সে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিয়া আনন্দিত হইতেছে বলিয়া বুঝা যায়। যাহারা নিজের সর্ব্বনাশ করিয়া আনন্দিত হয়, তাহাদের ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে? তাহাদের হৃদয় পাপের মলিনতায় জর্জ্জরিত হইতেছে। পাপই বিনাশের কারণ। **চতুর্থ কারণ—**ইহকালে পাপগুপ্তি দৃষ্টে পরকালেও পাপগুপ্তির আশা পোষণ। পাপ করিয়া উহা গোপনে থাকিল দেখিয়া যে ব্যক্তি মনে করে যে—আল্লা আমাকে বড় ভালবাসেন বলিয়া আমার পাপ ইহকালে গোপনে রাখিলেন, পরকালেও

গোপনে রাখিবেন, তাহার লঘু পাপ গুরুতর মহাপাপে পরিণত হয়। হায়! সে ব্যক্তি বুঝে না যে, করুণাময় স্বীয় দাস গণের পাপ এই উদ্দেশ্যে ইহকালে গোপনে রাখেন যে, তওবা করিয়া ক্ষমা চাহিলে তিনি মাফ করিবেন। বরং পাপ করিয়া উহা গোপনে থাকিল দেখিয়া এই ভাবিয়া ভয় করা উচিৎ যে আল্লা দয়া করিয়া পাপ গোপনে রাখিলেন এবং ঢিল দিলেন ইহাতে তাহার পাপের পথ সহজ ও সরল হইল। পাপের বোঝা ভারি করিয়া লইলে সর্ব্বনাশের পথে ডুবিয়া মরিতে হইবে। **পঞ্চম কারণ**—নিজের দ্বারা নিজের পাপ প্রকাশ। নিজের পাপ নিজেই প্রকাশ করিয়া দিলে লঘু পাপ গুরুতর হয়। করুণাময়, মানবের পাপ যে স্বাভাবিক আবরণে ঢাকিয়া রাখেন তাহা ছিন্ন করতঃ প্রকাশ করিয়া দিলে সমাজের অপর লোকে সহজেই জানিতে পারে। তাহাতে সমাজের মহা ক্ষতি হয়, সাধারণ লোকের মন হইতে পাপের প্রতি ঘৃণা কমিয়া যায় এবং অন্যায় কার্য্যে তাহাদের সাহস বাড়ে, এক জনের দেখাদেখী যত লোক পাপ করে সকলের পাপের বোঝা পাপপ্রদর্শকের মস্তকে নিপতিত হয়। প্রকাশ্যে পাপ করিলে যেমন অপরকে পাপ কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়, তেমনই পাপের আস্‌বাব, উপকরণ অপরের সম্মুখে সংগ্রহ করিয়া দিলেও পাপ-শিক্ষা দেওয়া হয়। এই উভয় স্থলে পাপ শিক্ষককে দ্বিগুণ পাপী হইতে হয়। প্রাচীন কালের জ্ঞানীগণ এক বাক্যে বলিয়াছেন—"মুছলমান লোকের দৃষ্টি হইতে পাপকে হাল্‌কা করিয়া দিলে তাহাদের যতদূর ক্ষতি করা হয় তত ক্ষতি আর কোন প্রকারে করা যায় না।" (টীঃ২৬৯) **ষষ্ঠ কারণ**—আলেম ও সমাজপতি কর্ত্তৃক পাপ ও ত্রুটীর অনুষ্ঠান। ক্ষুদ্র পাপ ও ত্রুটী যদি আলেম বা সমাজের সরদার ব্যক্তির দ্বারা ঘটে, তবে তাহা মহা পাপের ন্যায় ক্ষতি করে। তদরূপ লোক অন্যায় কার্য্য করিলে সাধারণ লোকের মনে পাপের প্রতি সাহস বাড়ে কেননা তাহারা মনে করে এরূপ কার্য্য অন্যায় হইলে অমুক আলেম বা সরদার ব্যক্তি কখনই করিতেন না। কোন আলেম রেশমী পোষাক পরিধান করিলে কিম্বা রাজা বা রাজপুরুষ গণের নিকট সম্মান প্রদর্শনের

টীকা—২৬৯। পাপগুপ্তির উপকারিতা সম্বন্ধে বিনাশন পুস্তকের অষ্টম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। অষ্ট্রেলিয়ায় ইংরাজ উপনিবেশের ইতিহাস হইতে পাপ প্রকাশের কুফল ও তদ্‌গোপনের সুফল বিষয়ক একটী উদাহরণ উক্ত পুস্তকের ২৪৯ নং টীকায় বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে।

জন্য যাতায়াত, করিতে থাকিলে বা তাঁহাদের দান গ্রহণ করিলে অথবা তর্ক বিতর্কের কালে অসত্যের মত কুকথা বলিলে কিম্বা অপর আলেমের নিন্দা করিতে থাকিলে অথবা নিজের ধন ও মানের গর্ব্ব করিলে, তাহার শিষ্য মণ্ডলী ও সাধারণ লোকেরা ঐরূপ বিষয়ে আলেম সাহেবের পদানুসরণ করে বরং তাঁহা অপেক্ষা অধিক বাড়াবাড়ী করে। আলেম সাহেবের দৃষ্টান্ত দেখিয়া শিষ্যগণ যেরূপ গর্হিত কাজ করে, তাহার অনুশিষ্য ও অন্য শিষ্যগণও ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব শিক্ষকের দেখাদেখী পাপ কার্য্য করিতে দ্বিধা বিবেচনা করে না। এই প্রকারে গ্রামকে গ্রাম ও শহরকে শহর বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দেশের যত লোক কুদৃষ্টান্তের অনুসরণে পাপ কার্য্য করিবে, সমস্ত পাপরাশির বোঝা প্রাথমিক আলেম বা সরদারের আমলনামার মধ্যে লিপিবদ্ধ হইবে। জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—"যাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পাপও মরিয়া যায় সেই ব্যক্তি ধন্য।" কোনও কোন ব্যক্তি এমন হতভাগ্য যে তাহার মৃত্যুর পরেও হাজার বৎসর পাপ জীবিত থাকে। বাণী এছরায়েল বংশের এক আলেম পাপ করিয়া শেষে তওবা করিয়াছিল। তৎকালে যে পয়গম্বর ছিলেন তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল যে—"সে আলেমকে বলিয়া দাও তাহার পাপ শুধু তাহার ও আমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে আমি ক্ষমা করিতাম। এখন সে আলেম একাকী তওবা করিতেছে বটে কিন্তু তাহার অনুগামী শিষ্য মণ্ডলী এখনও পাপ কার্য্য করিয়া যাইতেছে সুতরাং তাহাদের পাপরাশি আসিয়া ঐ আলেমের মস্তকে পড়িতেছে। পাপের এ পথ কিরূপে বন্ধ হইবে?" আলেমগণের অবস্থা বড় ভয়-সঙ্কুল ও বিপদপূর্ণ। তাঁহাদের এক পাপ হাজার হাজার পাপের সমান। আবার পক্ষান্তরে তাঁহাদের একটী সৎকার্য্য হাজার হাজার সৎকার্য্যের সমান। ইহার কারণ এই যে আলেমের দৃষ্টান্ত দেখিয়া যত লোকে এবাদত ও সৎকার্য্য করে এবং পুণ্যের অধিকারী হয়, তাহাদের সকলের পুণ্যের সমষ্টি সেই আলেমের 'আমলনামা'তে লিখিত হইয়া থাকে। এই কারণে পাপ বা ত্রুটী একেবারে না করা আলেমগণের পক্ষে 'ওয়াজেব'। ঘটনাক্রমে যদি তাঁহার দ্বারা কোন পাপ ঘটিয়া যায়, তবে যত্ন পূর্ব্বক বিশেষ সাবধানতার সহিত তাহা গোপন রাখা কর্ত্তব্য। পাপ তো দূরের কথা নির্দ্দোষ আনন্দদায়ক 'মোবাহ' কার্য্য আলেমকে করিতে দেখিলে সাধারণ লোকের মনে তৎপ্রতি

লালসা জাগিয়া উঠে—সতর্কতা কমিয়া গিয়া নিরুদ্বেগ ভাব উৎপন্ন হয় এবং তজ্জন্য তাহাদের মন অধিক আনন্দের দিকে ধাবিত হইতে থাকে। এই ক্ষেত্রে পড়িলে সাধারণ লোকের মন হইতে ত্রুটীর প্রতি ঘৃণা কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা ঘটে। যে সকল নির্দ্দোষ মোবাহ কার্য্যে এরূপ ঘটে তেমন মোবাহ কাজ আলেমকে পরিত্যাগ করা আবশ্যক। মহাত্মা জহরী বলিয়াছেন—"আমি আগে হাসি খেলা করিতাম কিন্তু যখন বুঝিতে পারিলাম যে, লোকে আমার অনুকরণ করিতে চায় তখন হইতে মৃদু হাস্য করাও সঙ্গত মনে করি না।" আলেমগণের ভুল চুক ও পদস্খলনের উল্লেখ করিয়া গল্প করাও মহাপাপ। তাহার কারণ এই যে তদ্রূপ গল্প শুনিলে বহু লোক পথভ্রান্ত হইতে পারে এবং তাহাদের মন হইতে পাপের প্রতি ঘৃণা কমিয়া যাইতে পারে। 'সর্ব্বসাধারণ লোকের ত্রুটী গোপন করাই যখন ওয়াজেব' তখন আলেমগণের ত্রুটী গোপন করা যে কত বড় গুরুতর ওয়াজেব কার্য্য, মনে মনে ভাবিয়া দেখ।

প্রকৃত তওবার চিহ্ন—(দ্বিবিধ, যথা লজ্জা এবং সাধুইচ্ছা।) পাঠক ! জানিয়া রাখ—তওবার মূল হইতেছে লজ্জা, এবং ফল হইতেছে সাধু ইচ্ছা। (লজ্জায় প্রকৃত তওবার সূচনা এবং সাধু ইচ্ছায় তাহার পরিণতি।)

প্রকৃত তওবার প্রথম চিহ্ন—লজ্জা। প্রকৃত লজ্জার চিহ্ন ভিতরে ও বাহিরে প্রকাশ পায়। **লজ্জার আভ্যন্তরিক চিহ্ন,** অনন্ত অনুতাপ ও উৎকট মনস্তাপ এবং **বাহিরের চিহ্ন,** অশ্রুবর্ষণ, দীনতা ও মিনতি। যে ব্যক্তি নিজকে ভয়ঙ্কর বিনাশের দ্বারে দেখিতে পায়, সে কি কখনও ভয়ে বিহ্বল না হইয়া এবং ক্রন্দন না করিয়া স্থির থাকিতে পারে ? একমাত্র পুত্র সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যাগত হইয়াছে এবং একজন বিধর্ম্মী চিকিৎসক আসিয়া পীড়ার অবস্থা দৃষ্টে বলিয়া দিল যে রোগীর বাঁচিবার আশা নাই। এই কথা শুনিয়া পিতা মাতা কি কখনও শোকে দুঃখে বিহ্বল না হইয়া এবং বিলাপ রোদন না করিয়া কি স্থির থাকিতে পারে ? সকলেই জানে নিজের প্রাণ, সন্তান অপেক্ষাও প্রিয়তর এবং ইহাও জানে যে আল্লা ও আল্লার রসুলের কথা বিধর্ম্মি চিকিৎসকের কথা অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস যোগ্য; আবার পরকালের বিনাশ ভয়, ইহকালের মৃত্যু ভয় অপেক্ষা অধিক কঠিন ; ইহকালের পীড়া-জনিত মৃত্যু-যন্ত্রণা

অপেক্ষা পাপোত্থিত আল্লার ক্রোধ বড় শক্ত। এমন অবস্থায় আল্লা ও রছুলের সত্য সংবাদে—যে সংবাদে এই কথা পুনঃ পুনঃ পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে যে, পাপে আত্মার ভীষণ ক্ষতি ও অনন্ত দুর্গতি আনয়ন করে, সে সংবাদে—যাহার হৃদয়, বিনাশ-ভয়ে বিচলিত না হয়, বুঝিবে সে ব্যক্তি আল্লা ও রছুলের কথা বিন্দু মাত্র বিশ্বাস করে নাই। যাহা হউক; ফল কথা এই যে লজ্জা ও অনুতাপানল যে পরিমাণে তীক্ষ্ণ ও খরতর হয়, পাপ সেই পরিমাণে পুড়িয়া নষ্ট হয়। পাপে মানবাত্মার উপর এক প্রকার মরিচা জন্মাইয়া দেয়, অনুতাপানলের তেজে সেই মরিচা ভস্ম হইয়া উড়িয়া যায়। আত্মাকে পাপ এক প্রকার গাঢ় অন্ধকার-আবরণে ঢাকিয়া ফেলে, অনুতাপাগ্নির আলোকে সেই আঁধার ঘুচিয়া যায়। যাহা হউক, পাপের প্রভাবে আত্মার যে ক্ষতি হয় তাহা অনুতাপ ভিন্ন আর কিছুতে পূরণ হইতে পারে না। অনুতাপের তেজে মানবাত্মা পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয়। যাহারা তওবা করে তাহাদের সংসর্গ অবলম্বনের নিমিত্ত হদীছ শরীফে উপদেশ আছে। তওবাকারী লোকের হৃদয় পরিষ্কার ও স্বচ্ছ থাকে। হৃদয় যে পরিমাণে পরিষ্কার থাকে, পাপের প্রতি ঘৃণা ও ভয় সে পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। পূর্ব্বে পাপের প্রতি আসক্তি থাকিলে তাহা বদলিয়া গিয়া ঘৃণায় পরিণত হয়। পূর্ব্বে পাপ কার্য্যে আনন্দ ও সুখ বোধ হইলে এখন তাহা বিষাদ ও তিক্ত লাগে। বাণী এছরায়েল বংশে এক জন ঘোর পাপী ছিল—পাপ কাজ করিতে তাহার মনে টান ছিল। তাহার পাপ বিমোচনের এবং তওবা কবুলের জন্য সে সময়ের পয়গম্বর আল্লার দরবারে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল —"হে পয়গম্বর! আমার স্বীয় গৌরবের শপথ, গগনরাজ্যের সমস্ত ফেরেশ্‌তা আসিয়া উহার জন্য অনুরোধ করিলেও, যতক্ষণ তাহার মনে পাপের আসক্তি দেখিতে পাইব ততক্ষণ তাহার তওবা কবুল করিব না।" পাঠক! বুঝিয়া রাখ, পাপ কার্য্য নিতান্ত মিষ্ট ও অতীব প্রলোভনের সামগ্রী। তওবাকারীকে উহা দেখিয়া বিষ মিশ্রিত মধুর ন্যায় ভয় করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি একবার বিষ মিশ্রিত মধু পান করিয়া বিষম যন্ত্রণা ও মহাকষ্ট ভোগ করিয়াছে সে ব্যক্তি কি আর পুনরায় তৎপ্রতি আগ্রহ করিতে পারে? তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়িলেই ভয়ে তাহার শরীর শিহরিয়া উঠে, মিষ্টত্বের প্রলোভনে তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। বিষের ভয়ে;

মধুর লোভকে সে সহজেই দমন করিতে পারে। সে ব্যক্তি পাপের মিষ্টত্বের সহিত বিষ যন্ত্রণার তুলনা করিয়া দেখিয়াছে সে কখনই মিষ্টত্বের জন্য পাগল হইতে পারে না। তাহার নিকট পাপের মিষ্টত্ব লুকাইয়া গিয়া সমস্তই হলাহল বিষবৎ যন্ত্রণাদায়ক হইয়া পড়ে। এই মহা পরিবর্ত্তন শুধু এক ধরণের পাপের সম্বন্ধে সীমাবদ্ধ নহে, বরং সর্ব্ববিধ পাপের মিষ্টত্বই এক অনুতাপের প্রভাবে কটু ও তিক্ত হইয়া যায়। লোভই পাপ কার্য্যের মধ্যে মিষ্টত্ব আনিয়া দেয়, কিন্তু পাপের মধ্যে আল্লার যে অসন্তুষ্টি গুপ্ত ভাবে থাকে তাহা তওবাকারীর দৃষ্টিতে পড়িবা মাত্র সে মিষ্টত্ব হলাহল বিষবৎ যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সর্ব্বপ্রকার পাপের সম্বন্ধেই এই নিয়ম।

প্রকৃত তওবার শেষ চিহ্ন—সাধুইচ্ছা। তওবাকারীর হৃদয়ে অনুতাপ জ্বলিয়া উঠিলে, যে সাধু ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, তাহা বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ও অতীত এই তিন কালের সহিতই সম্পর্ক রাখে। **বর্ত্তমান সময়ে** এই সাধু ইচ্ছা, তাহাকে সমস্ত পাপ একেবারে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেয় এবং পাপের ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত সর্ব্ববিধ আয়োজন উদ্যোগে প্রস্তুত করে। **ভবিষ্যতের জন্য** তওবাকারী এমন দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া লয় যে প্রাণান্তেও সে কখন পাপের ত্রিসীমায় যাইতে চাহিবে না। পাপের প্রলোভন যতই মিষ্ট হউক না কেন একেবারে লোভ সম্বরণ পূর্ব্বক ধৈর্য্য ধারণে কমর বান্ধিয়া প্রস্তুত রহিবে এবং পাপ হইতে দূরে থাকিবার নিমিত্ত আল্লার সম্মুখে অন্তরে ও বাহিরে পাকা অঙ্গীকার করিয়া লইবে। তদ্ব্যতীত জীবনের অবশিষ্ট কালে সর্ব্ববিধ ফরজ কাজ যত্নের সহিত প্রতিপালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিবে। দেখ, যে ব্যক্তি কোন বিশেষ ফল যতবার খাইয়াছে ততবারই সে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে এবং অশেষ কষ্ট পাইয়াছে, সে ব্যক্তি যেমন সেই ফল পুনরায় না খাইবার নিমিত্ত পাকা সঙ্কল্প করিয়া থাকে, তওবাকারীকেও তদ্রূপ ভবিষ্যতে পুনরায় পাপ না করিবার জন্য মজবুৎ অঙ্গীকার করিয়া লওয়া আবশ্যক। দৃঢ় অঙ্গীকারের পরেও কোন কুপ্রবৃত্তি পুনরায় উত্তেজিত ও উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে এবং তাহার তাড়নায় পুনরায় পাপ কার্য্য ঘটিতে পারে; এই ভয়ে তওবা করিতে ইতস্ততঃ করা কিম্বা পাপ পরিত্যাগের সঙ্কল্প "আ'জ করিব না, কা'ল করিব—এখন করিব না, তখন করিব" বলিয়া

দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন করা কখনই উচিৎ নহে। কুপ্রবৃত্তিকে পুনরায় মাথা তুলিতে সুযোগ না দিবার জন্য নির্জ্জন-বাস, সংযম (টীঃ২৭০) এবং বৈধ উপার্জ্জনে জীবিকা নির্ব্বাহ করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি নির্জ্জনবাস ও সংযম অবলম্বন করিতে না পারে তাহাকে অন্ততঃ হালাল উপায়ে জীবিকা অর্জ্জনে দিনপাত করা নিতান্তই প্রয়োজন। ইহাও যে ব্যক্তি অবলম্বন করিতে না পারে তাহার তওবা মজবুৎ হইতে পারে না। নির্জ্জনবাস ও সংযম বড় উচ্চ সাধনার ফল; তদ্বিষয়ে চিন্তা না করিয়া কেবল এক হালাল অন্নের সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখ—মানুষ যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ হালাল জীবিকা উপার্জ্জন করিতে না পারিবে ততক্ষণ সন্দেহ মূলক ধন হইতেও হস্ত সঙ্কুচিত করিতে পারিবে না। সুতরাং তওবাও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারিবে না। আবার দেখ, যে পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ লোভকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে না পারিবে সে পর্য্যন্ত সন্দেহ মূলক ধন হইতে হস্ত সঙ্কুচিত করিতে পারিবে না। জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—কোন দ্রব্যের উপর প্রবল লোভ জন্মিলে তাহার উপর সাতবার হাত রাখিয়া সাতবার টানিয়া লইতে পারিলে উহা পরিত্যাগ করা সহজ হয়। এখন **অতীত পাপের সম্বন্ধে** তওবাকারীকে যেরূপ ইচ্ছা করিতে হয় সে কথা কিছু শুন—অতীত পাপে যে ক্ষতি করিয়াছে সর্ব্বাগ্রে তাহার সংশোধন করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়।

গতানু দর্শন

আল্লার প্রতি কর্ত্তব্য এবং মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য কার্য্যগুলির মধ্যে কোন্ স্থলে কিরূপ ত্রুটী করা হইয়াছে প্রথমে তাহার এক হিসাব খাড়া করিবে।

আল্লার প্রতি কর্ত্তব্যপালনে অতীত ত্রুটীর প্রতিবিধান।

আল্লার প্রতি কর্ত্তব্য দুই ভাগে বিভক্ত (১) ফরজ কার্য্য সম্পন্ন করা এবং (২) পাপ হইতে দূরে থাকা। (এই দ্বিবিধ কর্ত্তব্যের ত্রুটী সংশোধনের জন্য তওবাকারীর হৃদয়ে সাধু ইচ্ছা যে কার্য্যে উৎসাহ দেয় তাহা নিম্নে পর্য্যায়মত লিখা যাইতেছে।) **প্রথম**—ফরজকার্য্য সম্পাদনের

টীকা—২৭০। মূল গ্রন্থে خاموشی খামুশী শব্দ আছে। তাহার অর্থ চুপ থাকা। আমরা তৎস্থানে সংযম লিখিতেছি। খামুশী শব্দ এক মাত্র বাক্‌যন্ত্রকে আটকাইয়া রাখা বুঝায়, সংযম অর্থে সমস্ত ইন্দ্রিয় ও সকল কুপ্রবৃত্তিকে আটক রাখা বুঝায়। সংযম শব্দে যেমন বাক্য-সংযম বুঝায় তেমনই নিষিদ্ধ দর্শন হইতে দৃষ্টি-সংযম, বাজে কথা হইতে কর্ণ-সংযম এবং এইরূপ কাম-সংযম, লোভ-সংযম, হস্ত-সংযম পদ-সংযম ও মন-সংযম ইত্যাদি বাহিরের ইন্দ্রিয় ও অভ্যন্তরের রিপুর সংযম বুঝায়।

ত্রুটি সংশোধন করে। অতীত কালে যতগুলি ফরজ কার্য্য ছুট পড়িয়াছে বা যাহা সুন্দররূপে যথা নিয়মে করা যায় নাই, বয়ঃপ্রাপ্তির পর হইতে তওবা করার সময় পর্য্যন্ত, তদ্রূপ যাহা ছুট পড়িয়াছে তাহা পুনরায় যথারীতি সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। ফরজের মধ্যে প্রথমে নমাজের সম্বন্ধে বিবেচনা কর।

অতীত অসম্পন্ন ফরজ নমাজের প্রায়শ্চিত্ত

বয়ঃপ্রাপ্তির দিন হইতে অদ্যাবধি, এই দীর্ঘ কালের মধ্যে, হয় তো অনেকদিন আলস্যের বশে বা শৈথিল্যে বহু নমাজ পড়া হয় নাই, অথবা অপবিত্র বস্ত্র সহকারে বহুবার নমাজ পড়া হইয়াছে অথবা সে নমাজের মধ্যে কোন নমাজে নিয়তের দোষ ছিল, কোন নমাজে অন্য কোন ভুল ছিল। আবার মূল عقائد বিশ্বাস মধ্যে ত্রুটী বা সন্দেহ ছিল, ইত্যাকার অসম্পন্ন বা ত্রুটী যুক্ত নমাজগুলি হিসাব করিয়া যথারীতি সম্পন্ন করা উচিত। অতীত জীবনের অসম্পন্ন ও ত্রুটীযুক্ত নমাজগুলি পরে সম্পন্ন করিয়া লওয়াকে قضاء عمری ওমরী কাজা বলে। (যাহা হউক এই প্রকার অন্যান্য ফরজ কার্য্যেরও অসম্পন্ন গুলি যথারীতি পুনরায় সম্পন্ন করিয়া লইবে।) যে সময় হইতে তুমি ধনবান্ বলিয়া গণ্য হইয়াছ—নাবালগ

অতীত অসম্পন্ন জকাতের প্রায়শ্চিত্ত

থাকিলেও তদবধি হিসাব করিয়া যত জকাৎ দেওয়া হয় নাই বা অপাত্রে দেওয়া হইয়াছে অথবা স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার পত্রাদি তোমার অধিকারে ছিল অথচ তজ্জন্য জকাৎ দেওয়া হয় নাই সে সমস্তেরই হিসাব করিয়া জকাৎ দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ বয়ঃপ্রাপ্তির পর হইতে এ পর্য্যন্ত যতগুলি

অতীত অসম্পন্ন ফরজ রোজার প্রায়শ্চিত্ত

রমজানের রোজা ছুট পড়িয়াছে বা যতগুলির নীয়ৎ মধ্যে ত্রুটী ছিল বা যাহা যথারীতি পালন করা হয় নাই তৎসমুদয় হিসাব করিয়া সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। উহার মধ্যে ছুট পড়া রোজাগুলি যথারীতি সম্পন্ন করিতে হয় অথবা যতগুলি রোজা শর্‌ৎ ও নিয়ম মত করা হয় নাই, নিজে নিজে তাহার হিসাব করিয়া দেখিবে, তন্মধ্যে যাহা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে তাহা পুনরায় দোহরাইয়া সম্পন্ন করিবে আর যতগুলির সম্বন্ধে কেবল মাত্র সন্দেহ হইয়াছে তজ্জন্য নিজকে ধিক্কার ও তিরস্কার করিবে। এরূপ অন্যান্য ফরজ কার্য্যের ক্ষতি পূরণ করার পর অতীত পাপের ক্ষতি সংশোধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। **দ্বিতীয়—পাপের**

সংশ্রব ত্যাগের ক্রটী সংশোধন করে—। বয়ঃপ্রাপ্তির আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ, রসনা, উদর, প্রভৃতি অঙ্গ হইতে কি কি লঘু পাপ বা গুরু পাপ জন্মিয়াছে তৎসমস্তেরই হিসাব করিবে। পর স্ত্রী-গমন, অস্বাভাবিক-সংসর্গ, চুরী, মদ্যপান, প্রভৃতি যেরূপ অপকর্ম্ম করিতে আল্লা পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন এবং যাহার বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তির বিধান আছে তদ্রূপ মহাপাপ করা হইয়া থাকিলে সর্ব্বান্তঃকরণে তওবা করিবে। কিন্তু এই ধরণের পাপ করিয়া কাজী প্রভৃতি বিচারকের নিকট যাওয়া এবং পাপ স্বীকার করতঃ দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করা ওয়াজেব নহে। বরং স্বীয় পাপ গোপনে রাখিয়া গভীর অনুতাপের সহিত তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ চিরকালের জন্য পাপে বিরত থাকিতে পারিলে এবং প্রভূত পরিমাণে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে করিতে থাকিলে তদ্রূপ পাপ করুণাময় ক্ষমা করিতে পারেন।

অতীত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত

পর-স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা, বিনা ওজুতে কোর্‌আন শরীফ স্পর্শ করা; অপবিত্র শরীরে মছজেদে প্রবেশ করা; গান বাজনা শ্রবণ করা ইত্যাদি লঘু পাপ। এই ধরণের লঘু পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য তদ্বিপরীত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। কেননা লঘু পাপ করিলে যে ক্ষতি হয়, সৎকার্য্য করিলে তাহা ঘুচিয়া যায়। এই মর্ম্মে আল্লাও বলিতেছেন

অতীত লঘু পাপের প্রায়শ্চিত্ত

إِنَّ الْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّـَٔاتِ

"নিশ্চয়ই সৎকার্য্য, মন্দ কার্য্যকে দূর করে।" (১২ পারা। সূরা হুদ। ১০ রোকু।) লঘু পাপের ক্ষতি সংশোধন নিমিত্ত যে সৎকার্য্য করিতে হয় তাহা ঠিক উহার বিপরীত এবং বিশেষ বলবান এবং পরিমাণে যথেষ্ট হওয়া আবশ্যক। গান বাজনা শ্রবণের প্রায়শ্চিত্ত জন্য প্রভূত পরিমাণে কোর্‌আন শরীফ শ্রবণ ও আলেমগণের উপদেশ গ্রহণ করা আবশ্যক। অপবিত্র শরীরে মছজেদে প্রবেশ করিলে যে পাপ জন্মে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে বহুক্ষণ মছজেদে অবস্থান করিয়া এবাদৎ করিতে হয়। বিনা ওজুতে কোর্‌আন ছুঁইবার পাপ, কোর্‌আন দেখিয়া অধিক পরিমাণে পাঠ করিলে খণ্ডিয়া যায়। মদ্যপানে যে পাপ হয় তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত নিজকে

বিশুদ্ধ ও সুমিষ্ট পানীয় দ্রব্য পানে বঞ্চিত রাখিয়া তাহা গরীব তৃষ্ণাতুরদিগকে পান করাইতে হয়। ফল কথা, পাপ কার্য্য করিলে আত্মার উপর যে মলিনতা জন্মে ঠিক তাহার বিপরীত সৎকার্য্য করিলে, তদুৎপন্ন আলোকে মলিনতা দূর করিয়া দেয়। লঘু পাপের প্রায়শ্চিত্তের নমুনা দেখান গেল, এখন

নির্দ্দোষ আনন্দ-ভোগের প্রায়শ্চিত্ত

নির্দ্দোষ আনন্দের কথা শুন। পাপ কার্য্যের যেমন প্রলোভন আছে, সংসারে নির্দ্দোষ ভোগ্য বস্তুরও তদ্রূপ আনন্দদায়ক প্রলোভন আছে। এই জন্য নির্দ্দোষ আনন্দ ভোগেরও প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত; না করিলে সংসারেরপ্রতি মন আবদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। এই জন্য প্রত্যেক নির্দ্দোষ আনন্দের বিপরীত এক একটী কষ্ট সহ্য করা আবশ্যক। সুখের বিরুদ্ধে কষ্ট ভোগ করিলে মন সংসারের উপর বিরক্ত হইতে পারে। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে "মুছলমানের প্রতি যে দুঃখ অবতীর্ণ হয় তাহাতে তাহার পাপ

পারিবারিক দুঃখ কষ্টই পাপ বিশেষের প্রায়শ্চিত্ত

ক্ষয় হয়; এমন কি মুছলমানের পায়ে কাঁটার একটী আঁচড় লাগিলেও তাহাতে উহার পাপ ঘুচিয়া যায়।" মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ছাঃ) বলিয়াছেন—"কতকগুলি পাপ এ ধরণের আছে যে কষ্টভোগ বিনা অন্য কোন প্রকারে তাহা ক্ষয় হয় না। হদীছের অন্য বচনে উক্ত হইয়াছে যে—"এমন কতকগুলি পাপ আছে তাহা পারিবারিক দুঃখ ও জীবিকা উপার্জ্জনের কষ্ট ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে দূর করা যায় না।" মহামাননীয়া বিবী আয়শা বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি বহু পরিমাণে পাপ করিয়াছে অথচ তৎ প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত কোন এবাদৎ বা সৎকার্য্য করে নাই তেমন লোকের উপর করুণাময় আল্লা কখন কখন দুঃখ কষ্ট নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। সেই কষ্টের প্রভাবে তদ্রূপ লোকের পাপক্ষয় হয়।" পাঠক! তোমরা এস্থলে বলিতে পার যে—"তদ্রূপ দৈব দুঃখের উপর লোকের হাত নাই। অনেক সময়ে লোকে সাংসারিক কার্য্য করিতে গিয়া ক্ষতিগ্রস্ত ও দুঃখিত হইয়া থাকে। সেরূপ স্থলেও তদ্রূপ দুঃখকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না বলিয়া সাংসারিক ত্রুটীর শাস্তি বলিতে পারা যায়।' তোমাদের এ তর্কের উত্তর শুন—যে কার্য্য বা ঘটনা মানুষের মনকে সংসারের প্রতি বিরক্ত করিয়া দেয়, তাহা হইতেই মানুষের মঙ্গল উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ কার্য্য বা ঘটনা—দৈবই হউক বা ইচ্ছা কৃতই হউক—আয়ত্তই হউক বা অনায়ত্তই হউক মনের মধ্যে সংসার-বিরক্তি জন্মাইতে পারিলেই মঙ্গল

কিন্তু যাহা হইতে আনন্দ জন্মে এবং যে জন্য মনে সংসারাসক্তি বৃদ্ধি পায়, তাহাই ক্ষতির কারণ। সংসারে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও সুখ ভোগ করিতে পাইলে দুনিয়াকে বেহেশ্‌তের ন্যায় মনে হইতে পারে। মহাত্মা হজরৎ ইয়ুসোফ নবী عم এক দিন হজরৎ জেব্‌রায়েলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আমার সেই বৃদ্ধ পিতার উপর কি পরিমাণ শোক দুঃখের ভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"একশত জন পুত্র-বিয়োগ কাতরা স্নেহময়ী জননীর শোক তাঁহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"সেই শোক দুঃখের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে কি দেওয়া হইবে ?" হজরৎ জেবরায়েল বলিয়াছিলেন—"এক শত শহীদের ও এক শত উৎপীড়িত ইমামের পুণ্য তাঁহাকে দেওয়া হইবে।

মানুষের প্রতি মানুষের কর্ত্তব্য পালনে অতীত ত্রুটীর প্রতি-বিধান। পাঠক! এখন মানুষের প্রতি মানুষের কর্ত্তব্য (হক) পালনে যে ত্রুটী ঘটে তাহার প্রতিবিধানের কথা শুন—যত লোকের সহিত সাংসারিক কার্য্য করা হইয়াছে নিজে নিজে তাহার এক হিসাব খাড়া করা কর্ত্তব্য। কেবল আদান প্রদান কার্য্যের হিসাব তৈয়ার করিলে চলিবে না; কাহার সহিত কিরূপ ভাবে কথা কহিয়াছ, কাহার বিরুদ্ধে কি বলিয়াছ বা ভাবিয়াছ তাহারও হিসাব নিজে নিজে খাড়া করিবে। কাহারও নিকট হইতে অন্যায় করিয়া কিছু লওয়া হইয়া থাকিলে ফেরৎ দিবে। ফেরৎ দিবার উপায় না থাকিলে তাহার স্থানে ক্ষমা লইবে। যাহাকে তাহার প্রাপ্য বস্তু দেওয়া হয় নাই, তাহাকে সে বস্তু দিয়া দিবে; উপায় না থাকিলে মাফ লইবে কাহারও কোন ক্ষতি করিয়া থাকিলে বা কাহারও মনে দুঃখ দিয়া থাকিলে তাহাদের স্থানে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। কথা দ্বারাও লোকের ক্ষতি হইতে পারে যথা—পরনিন্দা, কটু কথা বলা, গালী দেওয়া, আশা দিয়া নিরাশ করা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ইত্যাদি। নরহত্যা করিয়া থাকিলে হত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিবে। তাহারা প্রতিশোধ লইতেও পারে অথবা ক্ষমা করিতেও পারে। যদি কোন ব্যক্তি হইতে ভ্রম ক্রমে একটী কপর্দ্দকও বেশী লওয়া হইয়া থাকে তবে তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক খুঁজিয়া উহা ফেরৎ দিবে। তদ্রূপ লোককে খুঁজিতে যদি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিতে হয় তাহাও করিবে। কিন্তু নিতান্তই না পাওয়া গেলে তাহার উত্তরাধি-

কারীকে খুঁজিয়া তাহার হাতে ফেরৎ দিবে। অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের পর ফেরৎ দেওয়া, দোকানদার ও তহশীলদারগণের পক্ষে বড় কঠিন ব্যাপার। কেননা তাহাদিগকে অসংখ্য লোকের সহিত আদান প্রদান করিতে হয়। (পরনিন্দা সম্বন্ধেও ঐরূপ নিয়ম। যাহার বিরুদ্ধে নিন্দা করা হইয়াছে নিন্দার কথাগুলি শুনাইয়া তাহার স্থানে ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য) কিন্তু এ কার্য্যটীও বড় কঠিন; কেননা কাহার বিরুদ্ধে কি কি কথা বলা হইয়াছে তাহা ঠিক ঠিক স্মরণ থাকে না; তাহার পর, উহাদের মধ্যে কে কোথায় আছে সন্ধান পাওয়া দুর্ঘট। যাহা হউক, মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি পালন না করিলে বা অকর্ত্তব্য কার্য্য করিলে যে পাপের বোঝা মাথার উপর চাপে, তাহা হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত সুধু তাহাদের মনস্তুষ্টি করতঃ তাহাদের স্থানে ক্ষমা ভিক্ষা লওয়া ভিন্ন ইহজগতে অন্য কোন উপায় নাই। এই পৃথিবী হইতে তাহাদের স্থানে ক্ষমা লইয়া না গেলে পরকালে নিজের পুণ্য তাহাদিগকে দিতে হইবে অথবা তাহাদের পাপ নিজের মাথায় লইতে হইবে। ইহা ভিন্ন অন্য কোন পন্থা নাই। এই হেতু পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার কালে এত অধিক পুণ্য উপার্জ্জন করিয়া লওয়া আবশ্যক যে পরকালে গিয়া যেন উক্ত প্রকার ঋণশোধের পরেও রিক্ত হস্ত হইতে না হয়—পৃথিবীতে যাহার যাহা পাওনা ছিল তদ্‌বিনিময়ে পরকালে পুণ্য বাঁটিয়া দিয়াও যেন নিজের ভাগে কিছু থাকিতে পারে।

পাপ ক্ষয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রকার ভেদ ও বর্ণনা। পাপ কার্য্যের পর যাহার হৃদয়ে অনুতাপানল জ্বলিয়া উঠে, তাহাকে শীঘ্র —অতি শীঘ্র পাপ ক্ষয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ জনিত ক্ষতি পূরণে তৎপর হওয়া আবশ্যক। জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—পাপ কার্য্য ঘটিবার পর ক্ষণেই নিম্ন লিখিত **আট প্রকার কার্য্য** করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। সেই আট কার্য্যের মধ্যে চারিটী মনের সহিত ও অন্য চারিটী শরীরের সহিত সম্পর্ক রাখে। যে চারিটী **অন্তরের সহিত সম্পর্ক** রাখে, তাহার **প্রথমটীর** নাম তওবা অর্থাৎ লজ্জা সহকৃত অনুতাপ। **দ্বিতীয়**—তদ্রূপ পাপ পুনরায় না করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প। **তৃতীয়**—সেই পাপের জন্য পরকালে শাস্তি পাইতে হইবে এই ভয়। **চতুর্থ**—ক্ষমা পাইবার আশা। যে চারিটী কার্য্য **শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক** রাখে তন্মধ্যে **প্রথমটী** দুই রাকাৎ নমাজ পড়া। **দ্বিতীয়**—৭০ সত্তর বার

এস্তেগফার অর্থাৎ ক্ষমাপ্রার্থনা করা এবং তাহার পর এই কালমা এক শত বার পড়া

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ

"আল্লা পবিত্র মহৎ এবং প্রশংসিত।" **তৃতীয়**—ছদ্‌কা দেওয়া অর্থাৎ অভাবগ্রস্থ দরিদ্রকে কিছু দান করা। সে দান অতি সামান্য হউক না কেন। **চতুর্থ**—এক দিন রোজা রাখা। অন্য জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন, পাপ কার্য্য ঘটিবামাত্র যথারীতি সুন্দর মত ওজু গোছল করিয়া মছ্‌জেদে গিয়া দুই রকাৎ নমাজ পড়া আবশ্যক। হদীছ শরীফে আদেশ আছে—"গোপনে পাপকার্য্য করিয়া থাকিলে গোপন ভাবে এবাদৎ কর এবং প্রকাশ্যে পাপ ঘটিলে প্রকাশ্যে এবাদৎ কর, তাহাতে পাপমুক্তি হইবে।" (টীঃ২১১)

ক্ষমা প্রার্থনার বিবরণ। পাঠক! জানিয়া রাখ অন্তরের সহিত استغفار (এছতেগ্‌ফার) অর্থাৎ ক্ষমা-প্রার্থনা না করিয়া কেবল মুখে বলিলে কোন ফল পাওয়া যায় না। ক্ষমা-প্রার্থনা করিবার সময়ে ভয় ও অনুতাপ মনের মধ্যে জলন্ত ভাবে জাগরুক রাখিতে পারিলে উহাকে আন্তরিক ক্ষমা-প্রার্থনা বলে। তদ্রূপ করিতে পারিলে তওবার ইচ্ছাটী পাকা না হইলেও পাপমুক্তির আশা করা যাইতে পারে। এস্থলে ইহাও

আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনার কল্যাণ

টীকা—২১১। সৃষ্টি কর্ত্তা জড় জগৎ আধ্যাত্মিক জগতে একই প্রকার নিয়ম স্থাপন পূর্ব্বক একই ধরণের কৌশল পরিচালন করিতেছেন। পাঠকগণের বোধ পরিতৃপ্তির জন্য জড়-জগতের একটী দৃষ্টান্ত দওয়া যাইতেছে। একজন শ্রমিক লোক মজুরী পাইবার লোভে অধিক খড় কাটিতে গিয়া 'নিয়ম বহির্ভূত রূপে' তাড়াতাড়ি কাচী (কাস্তে) চালনা করতঃ হাতে লাগাইয়া ঘা করিল। এখন সে ক্ষত হস্তখানি সর্ব্ববিধ সঞ্চালন হইতে বিরত রাখিয়া এবং সে ক্ষতে পুনরায় আর খোচা না লাগে এমন ভাবে রাখিতে পারিলে সৃষ্টিকর্ত্তার বিধিবদ্ধ নিয়মে ক্রমে সে ক্ষত আরাম হয়; আবার: সেই ক্ষতের উপর ঔষধ লাগাইলে তদপেক্ষা শীঘ্র ক্ষত পূরণ হইতে পারে। কিন্তু অধিক মজুরী পাইবার লোভে সেই কর্ত্তিত হস্ত কাজে লাগাইয়া পুনঃ পুনঃ সঞ্চালন করিলে বা ক্ষত স্থানে পুনঃ পুনঃ অস্ত্রের আঘাত লাগাইলে সে ক্ষত আর আরাম হইবে না। আবার দেখ, ক্ষতের উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত লাগাইলে ক্ষতবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নালী ঘা, বেদনা, জ্বর ইত্যাদি নানা পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে এবং মূল ক্ষতের কারণ হইতে একেবারে বিরত হইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে থাকিলে উহা এবং তৎ সংক্রান্ত অন্যান্য পীড়া ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইতে থাকে। তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার প্রভাবে আত্মার পীড়াও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে দূর হয়।

;জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, মনের মধ্যে অনুতাপ ও লজ্জা না রাখিয়া কেবল মৌখিক প্রার্থনা করিলেও একেবারে কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে না। কেবল মৌখিক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও কিছু ফল পাওয়া যায়। জিহ্বাকে বাজে কথা হইতে আটক রাখা একটী উৎকৃষ্ট লাভ। বেহুদা বাজে কথা বলা অপেক্ষা চুপ থাকা ভাল; আবার চুপ থাকা অপেক্ষা মঙ্গলময় কলমা ও আল্লার পবিত্র নাম লওয়া ভাল। তাহতে জিহ্বাকে আল্লার নাম লইবার অভ্যাস শিখান হয়। জিহ্বাকে আল্লার পবিত্র নামোচ্চারণের অভ্যাস শিখাইতে পারিলে উহা আপনা আপনি গালী কুৎসা, পরনিন্দা প্রভৃতি হইতে ক্ষান্ত থাকে এবং তজ্জনিত পাপ হইতে আত্মরক্ষা করা যায়। তদ্ব্যতীত আরও একটী লাভ আছে—পুনঃ পুনঃ আল্লার নাম উচ্চারণ করিতে থাকিলে তাঁহার প্রতি প্রেম জন্মে। মহাত্মা আবু ওছমান মগ্‌রেবী মহোদয়ের এক জন শিষ্য তাঁহার সমীপে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আল্লার নাম উচ্চারণ করিতে আমি জিহ্বাকে শিক্ষা দিতে পারিয়াছি কিন্তু মনকে আল্লার দিকে লাগাইতে পারিতেছি না—মন ছুটাছুটী করিয়া বেড়ায়।" ইহা শুনিয়া শেখ মহোদয় বলিয়াছিলেন—"তুমি আল্লাকে এই জন্য ধন্যবাদ দাও যে, তিনি দয়া করিয়া তোমার এক অঙ্গকে তাঁহার সেবায় লাগাইয়া লইয়াছেন।"

মৌখিক ক্ষমা-প্রার্থনার কল্যাণ

মৌখিক ক্ষমা প্রার্থনার বিরুদ্ধে শয়তানী ধোকা ও তাহার ত্রিবিধ পরিণাম। পাঠক! জানিয়া রাখ—শয়তান এই স্থানে মানুষকে বিষম ধোকা দিয়া বলিতে থাকে "তুমি যখন সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে পারিতেছ না তখন মুখে কতকগুলি কথা আওড়াইলে কি লাভ? তদ্রূপ করা নিতান্ত বে-আদবী, অতএব মৌখিক প্রার্থনা করিও না।" শয়তানের এই কুপরামর্শ শুনিলে মানুষের অবস্থা তিন প্রকার হয়। **প্রথম** প্রকারের লোক বুদ্ধিমান—তাহারা শয়তানের যুক্তি শুনিবা মাত্র প্রত্যুত্তরে বলিতে থাকে শয়তান ঠিক কথাই বলিতেছে কেবল মৌখিক ক্ষমাপ্রার্থনায় কোন ফল নাই। লজ্জিত অনুতপ্ত ও ভয়াতুর মনে ক্ষমা-প্রার্থনা করা আবশ্যক। ইহা স্থির করতঃ তাহারা তৎক্ষণাৎ নিতান্ত দীনতার সহিত মনে ও মুখে ক্ষমাপ্রার্থনায় নিযুক্ত হয়। এই শ্রেণীর লোক যেন শয়তানের কাটা ঘায়ে লবণ নিক্ষেপ করিয়া থাকে। **দ্বিতীয়**

অবস্থায় লোক শয়তানের কুযুক্তির প্রত্যুত্তর পূর্ব্বোক্ত প্রকার কার্য্য দ্বারা দিতে না পারিয়া মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লয় যে "আমি মনঃ প্রাণে যখন ক্ষমা চাহিতে পারিলাম না তখন জিহ্বাকেই তৎকার্য্যে সম্পূর্ণ-রূপে নিযুক্ত করিয়া রাখি। চুপ চাপ বসিয়া থাকা অপেক্ষা মৌখিক প্রার্থনা অবশ্যই ভাল হইবে।" দেখ, রাজ্য শাসন কার্য্যে জ্ঞান বুদ্ধি ও বলের আবশ্যক; এমন রাজ্য শাসন কার্য্য অবশ্যই পোদ্দারের টাকা গণনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আবার পোদ্দারের কার্য্য নিশ্চয়ই মলমূত্র-বহনকারী মেথরের কার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি বুদ্ধি-বল-সাধ্য রাজ্য শাসনে অক্ষম, তাহাকে টাকা গণনার কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া বরং ভাল, কিন্তু মল মূত্র-বহন কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া কখনই উচিত নহে। (টীঃ২৭২)

টীকা—২৭২। মূল গ্রন্থের এই স্থানে যে দৃষ্টান্তটী দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রথম দৃষ্টিতে বেমিল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একটুকু মনোযোগ দিলে চমৎকার অর্থ ও সুন্দর সামঞ্জস্য দেখা যাইবে। রাজ্যশাসন কার্য্যে বাদশাকে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে হয়। দেহ রক্ষা করিয়া আল্লার-পথে-গমনোৎসুক ব্যক্তিকেও কুপ্রবৃত্তির দমন ও 'আল্লার নৈকট্য লাভের প্রবৃত্তিকে' সযত্নে রক্ষা করতঃ তাহার বল বৃদ্ধি করিয়া দিতে হয়। 'আল্লার পথে গমন' এবং 'আল্লার নৈকট্য লাভ' এইরূপ কথার অর্থ করিতে আমরা বড় ভুল করিয়া থাকি। আমরা মনে করি—এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন বন্ধুর নৈকট্য লাভের ইচ্ছায় আমরা যেমন এক একটী ধাপ দিয়া সেই পথটী চলিয়া যাই, আল্লার নৈকট্য লাভের জন্য তাঁহার পথে গমনও বোধ হয় তদ্রূপ কিছু হইবে। কিন্তু তদ্রূপ অর্থ করা বড় ভুল। 'আল্লা সর্ব্ব জ্ঞানী'—'আল্লা জ্ঞানময়।' আমরা প্রথমে অজ্ঞান অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকি; পরে ক্রমে আমাদিগকে জ্ঞান লাভ করিতে হয়। প্রথমে, ইন্দ্রিয়-জাত জ্ঞান; তাহার পর বুদ্ধি-লব্ধ জ্ঞান, পরিশেষে বুদ্ধি ও ঈমান সঙ্কৃত মারেফত জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্ব-পরিচয় ক্রমে ক্রমে লাভ হইতে থাকে। এইরূপ আমরা জ্ঞান লাভ বিষয়ে যতই উন্নত হইতে থাকি ততই জ্ঞান বিষয়ে আল্লার নিকটবর্ত্তী হইতে যাই। এইরূপ' 'আল্লা পবিত্র।' আমরা ক্রমে ক্রমে পবিত্রতা লাভ করিয়া যতই পবিত্রতা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিব ততই আল্লার নৈকট্য পাইতে থাকিব। আল্লার গুণ অসীম ও অনন্ত; যথা—তিনি করীম (দাতা) রহীম (দয়ালু ইত্যাদি)। ঐ সকল গুণ আমরা যতই উপার্জ্জন করিয়া উন্নত হইতে থাকিব ততই আল্লার নৈকট্য পাইতে থাকিব। মৃত্যু ঘটিলে একেবারে আল্লার ক্রোড়ে স্থান পাইব। কিন্তু পৃথিবীতে অবস্থান কালে আল্লার গুণের সমজাতীয় গুণে বিভূষিত হইবার পথে নানা প্রকার বাধা দিবার বহু শত্রু আছে তাহাদিগকে দমন করিয়া আল্লার নৈকট্য লাভের ইচ্ছাকে সাহায্য করতঃ উত্তরোত্তর বলবান করাই সর্ব্ববিধ এবাদত ও সাধনার চরম লক্ষ্য। এইরূপ কুপ্রবৃত্তির দমন ও সৎপ্রবৃত্তির পালন কার্য্যকে বাদশা কর্ত্তৃক দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের সহিত তুলনা করা যায়। যে ব্যক্তি সূক্ষ্ম বিচার ও অমোঘ ক্ষমতার সহিত বাদশার ন্যায় 'দমন ও পালন' কার্য্য পরিচালনা করিতে না পারে তাহাকে আল্লার এক একটী গুণ প্রকাশক নাম যথা—ছোবহান আল্লা (আল্লা পবিত্র), করীম (দাতা), রহীম (দয়ালু) ইত্যাদি নাম জপ করা উচিত। ঐরূপ গুণ প্রকাশক আল্লার এক কটী নাম মনে মুখে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে থাকিলে, ক্রমে ক্রমে ঐ সমস্ত গুণ আত্মাতে

তৃতীয় অবস্থায় লোক শয়তানের ধোকা শুনিয়া প্রার্থনা কার্য্য ছাড়িয়া দেয়। এ প্রকারের লোক আত্মদ্রোহী। শয়তানের কুযুক্তি শুনিয়া তাহারা ইহাই বুঝে যে, কেবল জিহ্বা সঞ্চালন দ্বারা প্রার্থনা করিলে যখন ফল হইবে না তখন নীরবে চুপ থাকাই ভাল। জিহ্বা সঞ্চালনের পরিশ্রম টুকু স্বীকার না করাকে তাহারা বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া মনে করে।

তওবা করিতে অনিচ্ছার কারণ—পাঠক! জানিয়া রাখ—যে ব্যক্তি তওবা করিতে চায় না তাহার হৃদয় কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। সে পীড়ার ঔষধ করা অতীব আবশ্যক। প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে কি কারণে সে পুনঃ পুনঃ পাপ কার্য্য করিতেছে এবং কেনই বা সে তওবা করিতে চায় না? নিম্নলিখিত **পাঁচ** কারণে মানুষ পুনঃ পুনঃ পাপ করে এবং তওবা করিতে চায় না। প্রত্যেকটীর ঔষধ পৃথক ধরণে করিতে হয়। **প্রথম** কারণ—পরকাল বিশ্বাস না করা অথবা পরকাল হইবে কিনা বলিয়া সন্দেহ করা। বিনাশন পুস্তকে দশম পরিচ্ছেদে ইহার ঔষধ লিখিত হইয়াছে। **দ্বিতীয়** কারণ—লোভের প্রবলতা সামলাইতে না পারা এবং সাংসারিক আনন্দ সুখে মুগ্ধ হওয়া। লোভ বৃদ্ধি হইলে পাপ পরিত্যাগ করা দুষ্কর হইয়া উঠে এবং আনন্দ সুখে উন্মত্ত হইলে মনে পরকালের ভয় উদয় হয় না। অধিকাংশ লোকের

সংক্রামিত হইতে থাকে। এরূপ ঘটনা, আল্লার কৌশল পূর্ণ চমৎকার বিধানে ঘটিয়া থাকে। এইরূপ নাম জপ করা এবং তছবীহ্ (মালা) দ্বারা সংখ্যা গণনা করা কার্য্যকে খাজাঞ্চির টাকা গণনার সহিত তুলনা করা যায়। কিন্তু যে সকল লোক আল্লার নাম জপ করিতে চায় না তাহারা লোকের চরিত্র সমালোচনায় কিম্বা কুৎসা বর্ণনারূপ জপে নিযুক্ত হইয়া থাকে। স্মরণ করুন বর্ত্তমান সময়ে ভদ্র নামধারী ২।৪ জন সভ্য লোক একত্র মিলিত হইলে তাম্বুল চর্ব্বণ, তামাকু সেবন ও চা বিস্কুট ভক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে যে কত লোকের চরিত্র সমালোচনা ও আচার ব্যবহারের কুৎসা রটনা করিতে থাকেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। অসভ্য লোকের ২।৪ জন একত্র হইলে যে কুৎসিৎ বাক্যালাপ আরম্ভ করে তাহা শুনিলে উক্ত সভ্য লোকেরাও কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া থাকেন কিন্তু এই সভ্য লোকগণের সুসভ্য আলাপ শুনিয়া সাধু দরবেশগণও মর্ম্মাহত হন। শহরের রাজপথে মেহতর লোক মল-মূত্র-পূর্ণ ভার লইয়া চলিবার কালে যে দুর্গন্ধ বিস্তার করিয়া চলে তাহাতে স্বাস্থ্য ভঙ্গের ভয়ে পথিকগণ নাকে মুখে কাপড় দিয়া সরিয়া যায়। সমাজের গণ্য মান্য লোকের চরিত্র আচার ব্যবহার সমালোচনা পূর্ব্বক দোষ ও ত্রুটী উদঘাটন করিলে সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্য বিনাশ পায়; ইহা বুঝিয়া সাধু লোক মর্ম্মাহত হন আশা করি এখন মূল গ্রন্থের দৃষ্টান্তটী বুঝিবার চেষ্টা করিলে অর্থ ও সাদৃশ্য সহজে বুঝা যাইবে।

পক্ষে পাপ পরিত্যাগের পথে লোভ এক বিষম অন্তরায় হয়। এই কথা বুঝাইবার জন্য মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—সৃষ্টি-কর্ত্তা দোজখ সৃজন করিয়া, জেব্‌রায়েল্‌কে দেখিতে বলেন। জেব্‌রায়েল পরিদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—'হে মহাপ্রভো! তোমার গৌরবের শপথ, দোজখের সংবাদ জানিলে কেহই উহার দিকে যাইবে না।' সৃষ্টিকর্ত্তা পরে দোজখের চারি ধারে নানা প্রলোভনের পদার্থ স্থাপন করিয়া পুনরায় জেব্‌রায়েলকে দর্শন করিতে অনুমতি করেন, সেবার জেব্‌রায়েল পরিদর্শন করতঃ নিবেদন করিয়াছিলেন—'হে প্রভো! এখন এমন দেখিতেছি যে কোন মানবই দোজখ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না—প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া দোজখে নিপতিত হইবে।' সৃষ্টি-কর্ত্তা ঐরূপ বেহেশ্‌ৎ সৃজন করতঃ জেব্‌রায়েলকে দর্শন করিতে আদেশ করেন; জেব্‌রায়েল পরিদর্শনান্তে নিবেদন করিয়াছিলেন—'হে মহা-প্রভো! যাহারা বেহেশ্‌তের প্রশংসা শুনিবে তাহারাই মুগ্ধ চিত্তে, অধৈর্য্য ভাবে, ইহার দিকে দৌড়িয়া আসিবে।' অতঃপর সৃষ্টিকর্ত্তা বেহেশ্‌তের চারি ধারে দুঃখ, কষ্ট পরিশ্রম স্থাপন পূর্ব্বক পুনরায় জেব্‌রায়েলকে দর্শন করিতে আদেশ দিলেন। জেব্‌রায়েল পরিদর্শনান্তে নিবেদন করিলেন —'হে প্রভো! বেহেশ্‌তের পথে যে সকল দুঃখ, কষ্ট ও পরিশ্রম দেখা যাইতেছে তাহাতে আমার ভয় হইতেছে যে কেহই বেহেশ্‌তে যাইতে ইচ্ছা করিবে না।''' তৃতীয় কারণ—পরকালের সুখকে লোকে কেবল ভবিষ্যৎ অঙ্গীকার বলিয়া বুঝে এবং দুনিয়ার সুখকে হাতের নগদ টাকার ন্যায় সম্মুখে দেখিয়া পাগল হয়। মানব হস্তস্থিত উপস্থিত ধনে আসক্ত হয় এবং অঙ্গীকৃত দ্রব্যকে পরহস্তস্থিত জ্ঞানে পাওয়া যাইবে কিনা ভাবিয়া মন হইতে দূরে রাখে। চতুর্থ কারণ—দীর্ঘসূত্রিতা। অনেক মুছলমান লোক তওবা করিতে ইচ্ছা করেন বটে, কিন্তু কাজের বেলায় 'এখন না, তখন করিব, বলিয়া বিলম্ব করে। কখনও বলে—এই সুখটী এখন ভোগ করিয়া লই, কল্য হইতে এদিকে আর দৃষ্টিপাত করিব না। পাপ পরিত্যাগে এইরূপ দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন না করিয়া ঝটপট ত্যাগ করিয়া ফেলা উচিত। মনে রাখিবে, মৃত্যু তোমাকে চক্ষুর পলকে সংহার করিতে পারে। পঞ্চম কারণ—আল্লার অনুগ্রহের উল্টা অর্থ করা এবং তাঁহার অনুগ্রহের উপর অন্যায় নির্ভর করা। কেহ কেহ মনে করে,

পাপ করিলেই যে দোজখে যাইতে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই—করুণাময় দয়া করিয়া ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন। ক্ষমারই সম্ভাবনা অধিক। অধিকাংশ লোক নিজকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করে এবং তজ্জন্য বলিয়া থাকে, সম্মুখস্থ সুখটী ভোগ করিয়া লই—দয়াময় দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন। আল্লার দয়া পাইবার এইরূপ আশা করা অন্যায়।

তওবা করিতে অনিচ্ছুক হৃদয়ের ঔষধ—পঞ্চ কারণ ভেদে— এখন পূর্ব্বোক্ত রূপ অবস্থায় যেরূপ ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক, তাহা ক্রমান্বয়ে বলা যাইতেছে—(১) পরকাল-অবিশ্বাসের ঔষধ যথাস্থানে লিখা গিয়াছে। (২) লোভের প্রবলতা ও সুখাস্বাদের মত্ততা হেতু পাপ পরিত্যাগে অক্ষম হইলে, এই কথা বুঝিয়া লওয়া উচিত যে, এখন লোভের এই সামান্য উত্তেজনা সহ্য করিতে পারিতেছ না, দোজখের অগ্নির তেজ কেমন করিয়া সহ্য করিতে পারিবে? আবার বেহেশ্তের মনোমুগ্ধকর আনন্দের লোভ কি প্রকারে দমন করিতে পারিবে? দেখ, পীড়িত লোকের পক্ষে সুশীতল জল অতীব লোভনীয় হইলেও যদি এক জন বিধর্ম্মী চিকিৎসক উহা পান করিতে নিষেধ করে, তবে সুখময় আরোগ্য লাভের আশায় পীড়িত লোকটী জল পানের লোভকে নিশ্চয় দমন করিতে পারিবে। বিধর্ম্মী ডাক্তারের কথা অপেক্ষা আল্লা ও রসুলের বাক্য অবশ্যই ধ্রুব সত্য। আল্লা ও তাঁহার রসুল বলিতেছেন —"সংসার ক্ষণস্থায়ী। ঐ অল্প সময়ের প্রলোভন দমন করিতে পারিলে আত্মা পরকালে গিয়া চিরস্থায়ী স্বাস্থ্য সুখ ভোগ করিতে পাইবে।" তাঁহাদের এই সত্য সংবাদ শুনিয়া কি দুনিয়ার এই সামান্য প্রলোভনের পদার্থ ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে? (৩) যাহারা পরকালের সুখকে ভবিষ্যতের ভুয়া অঙ্গীকার বলিয়া জানে ও দুনিয়ার সুখকে হস্তগত সামগ্রী বলিয়া মানে এবং পরকালকে চক্ষে দেখিতে না পাইয়া মন হইতে দূরে রাখে, তাহাদের হৃদয়ের ঔষধ স্বরূপ এই কথাগুলি বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক যে, যাহা নিশ্চয়ই আসিবে, তাহা যেন এখনই আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃত্যু নিশ্চয়ই আসিবে। উহা যেন এখনই আসিল। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনে ভাব, যেন মৃত্যু ঘটিল। মৃত্যু ঘটিলেই পরকাল আসে। তখন পরকালই হস্তস্থিত সামগ্রী হইল। যে দুনিয়াকে ইতিপূর্ব্বে হস্তগত মনে করিতে, তাহা এখন বিনাশ পাইল।

দুনিয়ার যাবতীয় পদার্থ এখন স্বপ্নবৎ অতীত হইল। "চক্ষু বন্ধ করিয়া, মৃত্যু ঘটিল" এইরূপ কল্পনা করিতে যে বলা গেল, তাহা কল্পনা না হইয়া প্রকৃত মৃত্যুই ঘটিতে পারে অর্থাৎ চক্ষু বন্ধ করিবা মাত্র সত্য সত্যই মরিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। (টীঃ২৭৩) (৪) পাপ পরিত্যাগে দীর্ঘসূত্রী হইলে তাহাকে এই কথা বলা যাইতে পারে—তুমি কি মহাভ্রমে পড়িয়াছ? তওবা অদ্য না করিয়া কল্য করিব বলিয়া কেন বিলম্ব করিতেছ? কল্যকার দিনটী হয়তো তুমি না দেখিতেও পার। অদ্যই তুমি মরিতে পার। হদীছ শরীফেও এই মর্ম্মের সংবাদ আছে—"দোজখবাসীদিগের অধিকাংশ লোক পাপ পরিত্যাগ করিতে বিলম্ব করিয়াছিল বলিয়া বিলাপ করিবে।" পাপ পরিত্যাগে দীর্ঘসূত্রীদিগকে এ কথাও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—"তুমি কেন বিলম্ব করিতেছ? তুমি কি মনে কর যে অদ্য পরিত্যাগ করা কঠিন, কল্য সহজ হইবে? যদি ইহাই মনে করিয়া থাক তবে বড় ভুল করিতেছ। লোভের দ্রব্য পরিত্যাগ করা অদ্য যেমন কঠিন দেখিতেছ কল্যও তদ্রূপ কঠিন দেখিবে বরং আগামী কল্য একটুকু কঠিনতর দেখিতে পাইবে। সৃষ্টিকর্ত্তা এমন দিন সৃষ্টি করেন নাই যে, সে দিন লোভনীয় পদার্থ পরিত্যাগ করা সহজ হইতে পারে। তুমি যদি অদ্য পাপের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে না পার এবং কল্য দমন করিবে বলিয়া রাখিয়া দাও তবে তোমার অবস্থা কেমন হইবে বুঝাইবার জন্য একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মনে কর—কোন ব্যক্তিকে বলা গেল—তুমি ঐ ক্ষুদ্র চারা গাছটী এখনই উপড়াইয়া ফেল। সে বলিল—অদ্য উৎপাটন করা কঠিন ও শ্রমসাধ্য দেখিতেছি; আমি এক বৎসর শরীরে বল সঞ্চয় করিয়া আগামী বৎসর উহা উপড়াইয়া ফেলিব। এস্থলে সেই নির্ব্বোধকে জানা উচিত যে এক বৎসরের মধ্যে ক্ষুদ্র চারা, বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইবে, শিকড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে; মূল ও শিকড় অধিকতর বলবান হইয়া গভীর মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করতঃ বহু দূর পর্য্যন্ত মৃত্তিকা জড়াইয়া ধরিবে। তাহার শরীরে কিন্তু বল তদ্রূপ ঘনীভূত ভাবে সঞ্চিত

টীকা—২৭৩। যে পাঁচটী কারণে মানুষ পুনঃ পুনঃ পাপ করেও তওবা করিতে চায় না, তাহা মূল গ্রন্থে প্রথমে একাদিক্রমে উল্লেখ করিয়া শেষে ঔৎসমুদয়ের ঔষধ প্রদর্শন কালে পূর্ব্বোক্ত ক্রম রক্ষা করা হয় নাই—প্রথমের পর তৃতীয়, তাহার পর দ্বিতীয় লেখা আছে। আমরা স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া কারণগুলি যে পর্য্যায়ক্রমে আছে, ঔষধও সেই পর্য্যায়ক্রমে দিলাম।

হইতে পারিবে না বরং কোন পীড়ায় ঘটনা ক্রমে দুর্ব্বল হইয়াও পড়িতে পারে। বৎসরের শেষে বৃক্ষটী উৎপাটন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এইরূপ কুপ্রবৃত্তি রূপ বৃক্ষ অধিক দিন হৃদয় মধ্যে থাকিতে পাইলে ক্রমে ক্রমে তাহার শিকড় সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং হৃদয়ের গভীর তল পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া সমস্ত হৃদয়-ভূমি জড়িয়া লইয়া মজবুৎ হইয়া দাঁড়ায়। তুমি কিন্তু প্রতিক্ষণ কুপ্রবৃত্তির আদেশ পালনে এদিক সেদিক ছুটাছুটী করিয়া দিন দিন শক্তি হীন হইতে থাকিবে। পরিশেষে কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবে না। এই সমস্ত কারণে কুপ্রবৃত্তির অঙ্কুরের প্রারম্ভেই উৎপাটন করা উচিত। তখন উৎপাটন করাও সহজ। (৫) আল্লার করুণার উপর অন্যায় ভরসা করিয়া অনেকে বলিয়া থাকে—আমি মুছলমান; মুছলমানকে আল্লা বড় ভাল বাসেন এবং সর্ব্বদাই তাহাকে ক্ষমা করিয়া থাকেন। তেমন ব্যক্তিকে এই কথা বলা যাইতে পারে—আল্লা মুছলমান লোককে ক্ষমা করিয়া থাকেন সত্য কিন্তু তাহাকে যে তিনি ক্ষমা করিবেন তাহার প্রমাণ কি? ক্ষমা করা না করা তাঁহার ইচ্ছা। যদি ক্ষমা না করেন তবে উপায় কি? দেখ ঈমান বা বিশ্বাস-জ্ঞান এক-রূপ বৃক্ষ সদৃশ। উহা হৃদয় ক্ষেত্রে জন্মে; এবং এবাদৎ রূপ জলে জীবিত থাকিয়া বর্দ্ধিত ও বলবান হয়। কোন মুছলমান বিশ্বাস-জ্ঞান লাভ করিয়াও যদি এবাদৎ না করে তবে তাহার বিশ্বাস-জ্ঞানরূপ বৃক্ষ দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এরূপ লোক অন্তিম কালে মৃত্যু যন্ত্রণায় পতিত হইলে যন্ত্রণার চোটে তাহার বিশ্বাস-জ্ঞানরূপ বৃক্ষের মূল হৃদয় হইতে ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। যাহারা অনেক পাপ করিয়াছে অথবা এবাদৎও করে নাই তাহাদের ঈমান (বিশ্বাস-জ্ঞান) মুমূর্ষু রোগীর ন্যায় কখন মরে তাহার স্থিরতা নাই। তেমন মুমূর্ষু জ্ঞান লইয়া ভীষণ মৃত্যুর সঙ্কটপূর্ণ দ্বার দিয়া পরকালে পার হইবার কালে ঘাত প্রতিঘাতের টক্করে সে ঈমান জ্ঞান একেবারে বিনষ্ট হইতে পারে। যদিও বা কেহ তদ্রূপ মৃতবৎ জ্ঞান সঙ্গে লইয়া পরকালে পার হইতে পারে কিন্তু তাহা এমনই নিকৃষ্ট ও দুর্ব্বল যে তজ্জন্য মহাপ্রভু তাহার পাপ মার্জ্জনা করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন। এমন স্থলে শুধু সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে শৈথিল্য করা নির্ব্বোধের কার্য্য। এই ধরণের আহাম্মকী বুঝাইবার জন্য এক জন কৃষকের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

সে বিশেষ রূপে জানে যে, যথোচিত পরিশ্রম সহকারে কৃষিকার্য্য করিলে তদ্বারা সচ্ছন্দে পরিবার প্রতিপালন করিতে পারা যায়—আবার এ কথাটী শুনিয়াছে যে, উজাড় শহরের ভূগর্ভে বহু স্বর্ণ রৌপ্য পাইবার সম্ভাবনা আছে। এমন অবস্থায় নিজের স্বর্ণ-প্রসূ ক্ষেত্র ফেলিয়া, পরিবারবর্গকে অনাহারে রাখিয়া, উজাড় শহরে সোনা পড়িয়া পাইবার আশায় যাওয়া এবং তথায় বসিয়া থাকা সে কৃষকের পক্ষে কেমন আহাম্মকী হয় ? তাহাকে নিরেট গণ্ডমূর্খ ভিন্ন আর কি বলা যায় ? ইহকালে মঙ্গল-প্রসূ এবাদৎ কার্য্যে পরিশ্রম না করিয়া, বিনা পরিশ্রমে পরকালে আল্লার অনুগ্রহ পাইবার আশা করাও তদ্রূপ মূর্খতা। অথবা তদ্রূপ লোককে এমন একজন নির্ব্বোধের সহিত তুলনা করা যায় যে ব্যক্তি স্বচক্ষে দেখিতেছে যে গ্রামে ডাকাইত পড়িয়াছে—সকল গৃহস্থের ধন সম্পত্তি লুটিয়া লইতেছে অথচ সে মনে করিতেছে 'ডাকাইত দল আমার গৃহ পর্য্যন্ত আসিতে পারিবে না; আসিলেও আমার গৃহ লুণ্ঠন করিতে ইচ্ছা করিবে না। আবার লুণ্ঠন করিতে ইচ্ছা করিলেও গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে না-লুটের অগ্রেই মরিয়া যাইবে অথবা অন্ধ হইবে।' এইরূপ সমস্ত কথাই কাল্পনিক—ঐরূপ বিপদ সম্ভাবনা মাত্র না হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটিতে পারে। পরকালে আল্লার স্থানে ক্ষমা পাইবার আশা তো তদ্রূপ সম্ভাবনা মাত্র। কিন্তু শাস্তি পাইবার ভয়ই অধিক প্রবল। আল্লার অনুগ্রহ প্রাপ্তির সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া সতর্কতা পরিত্যাগ করা নিতান্তই আহাম্মকী।

একযোগে অথবা ক্রমান্বয়ে পাপ পরিত্যাগ ভাল তদ্বিষয়ক মতভেদের মীমাংসা। প্রিয় পাঠক ! এস্থলে একটী জটিল কথা বুঝিবার চেষ্টা কর। সমস্ত পাপ এক সঙ্গে একেবারে পরিত্যাগের সঙ্কল্প করা ভাল, কি এক একটী পরিত্যাগ করা ভাল, ইহার মীমাংসা উপলক্ষে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলেন—সর্ব্ববিধ পাপ পরিত্যাগ এক দমেই করা আবশ্যক—এক আধটী করিয়া পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করা বৃথা। তাহারা নিজের মত সাব্যস্ত করিতে এই প্রমাণ উত্থাপন করেন যে, পরনারী-হরণ ও মদ্যপান উভয়ই হারাম। যে ব্যক্তি এই পাপে লিপ্ত, সে একটী ত্যাগ করিলে কি প্রকারে নিষ্পাপ হইতে পারে ? দুই মটকা শরাবের মধ্যে একটী ত্যাগ পূর্ব্বক অন্যটী হইতে মদ্য লইয়া

পান করিলে, পাপ হইতে বাঁচা যায় না। উভয় মটকারই শরাব সমান হারাম ও ক্ষতিকর। একটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যটী হইতে শরাব লইয়া পান করিলে একই প্রকারের অনিষ্ট হইয়া থাকে। তদ্রূপ পরনারী-হরণ ও মদ্যপান উভয়ই হারাম। একটী ছাড়িয়া অপরটীতে লিপ্ত থাকিলে পাপমুক্তির আশা অসম্ভব। তাঁহাদের এ যুক্তিটী তওবা সম্বন্ধে খাটে না। পরিত্যাগকে তওবা বলে। যে পাপকে যখন মন্দ বলিয়া চিনা যায়, তাহাকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। দেখ, পরনারী হরণ হইতে যেমন এক শ্রেণীর বহু পাপ উৎপন্ন হয়, তেমনই মদ্যপানে অন্য শ্রেণীর বিবিধ পাপ উদ্গত হয়। কিন্তু তাহাদের অনিষ্টকারিতা একই সময়ে সুস্পষ্ট চিনা যায় না। উহাদের মধ্যে যাহার অনিষ্টকারিতা সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিতে মনে ব্যাকুলতা জন্মে। আবার উক্ত দুই শ্রেণীর পাপ মধ্যে যাহার ক্ষতি অধিক দেখা যায় তাহাকে অগ্রে পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। মদ্য পানে ও তাহার আনুসঙ্গিক কার্য্যে যত পাপ ও ক্ষতি জন্মে; পরনারী-হরণে ও তাহার আনুসঙ্গিক ব্যাপারে তদপেক্ষা অধিক পাপ ও ক্ষতি উৎপন্ন হয়, এই কথাটী যখনই সুস্পষ্ট জানা যাইবে তখনই অধিক ক্ষতিকর ব্যভিচার পাপটী পরিত্যাগ করিতে মানুষ সক্ষম হইবে। কেহবা মদ্যপানকে পরনারী-গমন অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর বুঝিয়া অগ্রে তাহাকেই পরিত্যাগ করে। আবার কেহ বা পরনিন্দাকে মদ্যপান অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর বলিয়া বুঝে, কেননা পরনিন্দার কুফল সমাজের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া সর্ব্বসাধারণ সকলেরই ক্ষতি করিয়া থাকে। এই জন্য সে ব্যক্তি পরনিন্দাকে সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয়। আবার দেখ, এরূপও হইতে পারে যে, কোন কোন মদ্যপায়ী অপরিমিত পানের দোষ সুস্পষ্ট বুঝিতে পারে কিন্তু মদ্যপানের লোভ একেবারে দমন করিতে সক্ষম হয় না। এরূপ লোক অপরিমিত পান হইতে বিরত হয় কিন্তু অল্প পান ত্যাগ করিতে পারে না। এরূপ লোক মনে করে —"যত অধিক মদ্যপান করা যাইবে আত্মার ক্ষতি তত অধিক মাত্রায় হইবে এবং তত শাস্তি পাইতে হইবে। আমি মদ্যপানের লোভ সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করিতে পারিতেছি না বলিয়া অপার্য্যমানে পান করিয়া থাকি, কিন্তু অধিক পানে অধিক ক্ষতি হয় ইহা যখন বুঝিতে পারিয়াছি

তখন অপরিমিত পান অবশ্যই পরিত্যাগ করিব। শয়তান একটী প্রলোভন আমার মনে নিক্ষেপ করতঃ আমাকে পরাস্ত করিয়া আমার দ্বারা সেই পাপটী করাইয়া লইতেছে কিন্তু যে প্রলোভনে আমাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই—যে পাপ পরিত্যাগে আমার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে—তদ্রূপ পাপ করিতে কেন আমি নিযুক্ত হইব?" যাহা হউক, পাপরাশির মধ্য হইতে, কোন একটী বিশেষ পাপ পরিত্যাগ করিতে মানবের ক্ষমতা আছে—এবং তাহা পরিত্যাগ করিলে তজ্জনিত ক্ষতি হইতেও মানব অব্যাহতি পাইতে পারে।

এস্থলে দুইটী মহাবাক্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন—

اَلتَّائِبُ حَبِيْبُ اللهِ

"তওবাকারী আল্লার প্রিয় পাত্র।" এবং কোর্‌আন শরীফে আল্লা বলিতেছেন—

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ

"নিশ্চয়ই আল্লা তওবাকারীদিগকে ভাল বাসেন।" (২ পারা। সুরা বকর। ২৮ রোকু।) এই উভয় পবিত্র বচনে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায় যে উক্ত কথা ভালবাসার সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। যাহারা অনুতপ্ত হৃদয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে সমস্ত পাপ চিরজীবনের জন্য পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাহাদিগকে আল্লা বড় ভালবাসেন এবং তাহাদের সম্বন্ধেই উক্ত প্রকার উচ্চ সম্মানের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। যে সকল জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন—সম্পূর্ণরূপে পাপ পরিত্যাগ না করিয়া কিয়দংশ ত্যাগ করা সঙ্গত নহে, তাঁহারা উক্ত প্রকার উচ্চ শ্রেণীর লোকের সম্বন্ধেই বলিয়াছেন। নতুবা বহু পাপের মধ্যে নিতান্ত লঘু ধরণের গুলি ক্ষুদ্র সৎকার্য্যের প্রভাবে অগ্রে লুপ্ত হয়, তাহার পর গুরুতর গুলি গুরুতর সৎকার্য্যে লোপ পাইতে থাকে। ফল কথা, সকল পাপ এক সঙ্গে দূর হয় না। অধিকাংশ স্থলে তওবার কার্য্য আস্তে আস্তে প্রকাশ পায় —অর্থাৎ তওবা ক্রমে ক্রমে পাপ বিনাশ করে—একটী পাপ লোপ করিয়া ও তজ্জনিত ক্ষতি সংশোধন করিয়া আর একটী লোপ করিতে আরম্ভ করে। যাহা হউক, মার্জ্জনা পাইবার জন্য তওবা করিবার সুযোগ যতটুকু ঘটে, সেই পরিমাণে ফলও হস্তগত হয়। (আল্লাই ভাল জানেন।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ধৈর্য্য এবং কৃতজ্ঞতা।

ছবর বা ধৈর্য্যের কল্যাণ সম্বন্ধে কোরআন, হদীছ ও মহাজন উক্তি—পাঠক! বুঝিয়া লও صبر ছবর (টীঃ২৭৪) ভিন্ন 'তওবা বা পাপনিবৃত্তি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। এমন কি ছবরের অভাবে কোন কর্ত্তব্য-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে কিম্বা কোন প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। মহাপুরুষ হজরত রসুল ﷺ কে ঈমান (বিশ্বাস-জ্ঞান) এর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"ছবরকেই ঈমান বলে।" অন্য এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন—"ছবর ঈমানের অর্দ্ধেক।" ছবর একটী পরমোৎকৃষ্ট গুণ, ইহার কল্যাণ অতীব মহৎ। এই কথার সত্যতার প্রমাণ জন্য ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মহাপ্রভু আল্লা কোরআন শরীফের মধ্যে ৭০ সত্তর বারেরও অধিক ছবরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মানুষের ভাগ্যে যত উন্নতি নির্দ্ধারিত আছে, তৎসমুদয়ই এক মাত্র ছবর হইতেই লব্ধ হয়। আল্লাও বলিতেছেন—

টীকা—২৭৪। 'ছবর' আরবী কথা; ইহাকে বাংলায় 'ধৈর্য্য' বলা যাইতে পারে; কিন্তু 'ধৈর্য্য' শব্দের অর্থ অপেক্ষা 'ছবর' শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক। সাধারণতঃ বিপদ, আপদ, দুঃখ-কষ্ট, অটল ভাবে সহ্য করিবার শক্তিকে সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য্য বলে। ছবর শব্দের অর্থ তদপেক্ষা অনেক ব্যাপক। ভোগের আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তির লোভ, কামের উত্তেজনা প্রভৃতির দংশন তাড়নায় অটল থাকা এবং আনন্দের আস্বাদে উৎফুল্ল ও সুখের স্পর্শে হতচেতন না হইয়া অটল ভাবে প্রকৃতিস্থ থাকার শক্তিও ছবরের অন্তর্গত। ফল কথা, মানব মনে যে শক্তি থাকিলে উহা বিপদ ভয়ে না হটিয়া স্থিরপদে দণ্ডায়মান থাকে; দুঃখ-কষ্টের ভরে দমিয়া না গিয়া—ভাঙ্গিয়া না পড়িয়া—উন্নত মস্তকে থাকিতে পারে; প্রবৃত্তির তাড়নায় বিচলিত না হইয়া স্থির-পদ বিক্ষেপে গন্তব্য পথের সূক্ষ্ম রেখা ধরিয়া চলিতে পারে; এবং সফলতার ফুৎকারে না ফুলিয়া—না উড়িয়া স্ব স্থানে স্থির থাকিতে পারে; আনন্দ ও সুখের স্পর্শে দিশা না হারায়—পথ না ভুলে অথবা হতজ্ঞান বা অচেতন না হয় সেই শক্তির নাম ছবর।

'শোকর'ও আরবী কথা; ইহাকে বাঙ্গলায় কৃতজ্ঞতা বা 'উপকার-প্রাপ্তি বোধ' বলা যায়। উহা মনের একটী গুপ্ত ভাব বা অবস্থা। বাক্যে ও কার্য্যে বাহিরে প্রকাশ পায়। মুখে প্রকাশ করিলে ধন্যবাদ বলে। মুখে কথা বলিয়া বা ধন্যবাদ দিয়া যেমন 'শোকর' করা হয় তদ্রূপ কাজে, আচরণে এবং ব্যবহারেও 'শোকর' করা হয়।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ؕ

"যখন যখন তাহারা ছবর করিতে পারিয়াছে তখন তখনই আমি তাহাদের মধ্য হইতে সর্দার উদ্ভব করিয়াছি—তাহারাও আমার আদেশে (অপরকে) সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছে।" (২১ পারা। সূরা ছেজদা। ৩ রোকূ।) মহাপ্রভু ছবর হইতে অসীম মঙ্গল উৎপন্ন করেন এবং ছবরের জন্য অনন্ত পুরস্কার নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তিনি বলিতেছেন—

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

"নিশ্চয় ছবরকারীগণকে অনন্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে।" (২৩ পারা। সূরা জোমর। ২ রোকূ।) আবার দেখ, তিনি ছবরকারীগণের সাহায্যার্থ সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিবার অঙ্গীকার করিয়া বলিয়াছেন—

وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ○

"এবং আল্লা ছবরকারীগণের সঙ্গে আছেন।" (২ পারা। সূরা বকর। ৩৩ রোকূ।) ছালাৎ (আশীর্ব্বাদ), রহমৎ (করুণা), এবং হেদায়েত (সৎপথে চলিবার সুযোগ) এই ত্রিবিধ অমূল্য পদার্থ করুণাময় আল্লা অন্য কোনও সম্প্রদায়কে এক সঙ্গে দান করেন না, কেবল ছবরকারীগণকে এক সঙ্গে দান করেন। এতদুপলক্ষে তিনি বলিয়াছেন—

ছবর হইতে এক যোগে প্রাপ্ত ত্রিবিধ কল্যাণ

أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ○

"তাহাদের (ছবরকারীদের) উপর তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে ছালাৎ (আশীর্ব্বাদ) ও রহমত (করুণা) অবতীর্ণ হয় এবং তাহারাই সৎপথগামী।"

(২ পারা। সূরা বকর। ১৯ রোকু।) ছবরের আরও বহু মাহাত্ম্য ও গৌরব আছে, তন্মধ্যে ইহাও একটী মহা গৌরব যে মহাপ্রভু ছবরকে নিতান্ত ভালবাসেন। এই ভালবাসার বস্তু তিনি, যেমন তেমন লোককে দেন না—যাঁহারা তাঁহার নিতান্ত প্রিয় বন্ধু কেবল তাঁহাদিগকেই উহা উপহার দিয়া থাকেন। মহপুরুষ হজরত রসুল (ﷺ) স্বীয় ধর্ম্মবন্ধুদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"মহাপ্রভু আল্লা তোমাদিগকে যে সকল অমূল্য পদার্থ দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'ইয়াকিন' বা 'ধ্রুব বিশ্বাস-জ্ঞান' ও 'ছবর' এর মাত্রা অতি অল্পই আছে (যদি পূরা মাত্রায় এখনই দান করিতেন তবে তোমরা বহন করিতে পারিতে না)। যাহাদিগকে এই দুইটী পদার্থ এক সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে সুসমাচার দাও যে রোজা নমাজ অল্প মাত্রায় করিলেও তাহাদের কোন ভয় নাই। হে আমার বন্ধুগণ! তোমরা এখন যে অবস্থায় আসিয়াছ যদি তোমরা সেই অবস্থায় ছবরের সহিত স্থিরপদে দণ্ডায়মান থাকিতে পার—এ অবস্থা হইতে ফিরিয়া না যাও—তবে ইহাই আমার নিকট অধিক প্রিয়তর। কিন্তু এই ছবরের অবস্থা হইতে ফিরিয়া যদি তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি তোমাদের সকলের এবাদৎ সমষ্টির সমান এবাদৎ করে তথাপি উহা আমার নিকট তত প্রিয় হইবে না। আমার ভয় হইতেছে, আমার পরে তোমাদের সম্মুখে সংসারের পথ প্রশস্ত হইবে এবং তোমাদের নিকট সংসারের উন্নতির পথ এরূপ প্রশস্ত ভাবে খোলা হইবে যে, তোমাদের এক জন অপরের উপর অসন্তুষ্ট হইতে থাকিবে এবং ঈমানদার লোকও তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইতে থাকিবে। সে অবস্থায় যে ব্যক্তি ছবর করিবে এবং ছবরের জন্য পুরস্কার পাইবার আশা রাখিবে তাহাকে পূর্ণ মাত্রায় পুরস্কার দেওয়া হইবে। অতএব তোমরা ছবর কর—ছবরকে মজবুৎ ভাবে ধারণ কর। দুনিয়া চিরকাল থাকিবে না; কিন্তু আল্লার প্রদত্ত পুরস্কার চিরকাল বর্ত্তমান রহিবে।" এই পর্য্যন্ত কথা বলিয়া মহাপুরুষ হজরত রসুল (ﷺ) পরবর্ত্তী আয়াৎটী সমস্ত পাঠ করিয়াছিলেন—

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ

بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

"যাহা তোমাদের নিকট আছে, তাহা ফুরাইয়া যাইবে; কিন্তু যাহা আল্লার নিকট আছে, তাহা চিরস্থায়ী থাকিবে। যাহারা ছবর করিয়াছে, তাহাদের কার্য্য, উৎকৃষ্ট পুরস্কারে নিশ্চয়ই অলঙ্কৃত করিব।" (১৪ পারা। সুরা নহল। ১৩ রোকু।) মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ বলিয়াছেন—"বেহেশ্‌তের রত্ন সমূহের মধ্যে ছবর একটী অমূল্য রত্ন।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"ছবরকে যদি মানুষের আকার দেওয়া হইত, তবে সে নিতান্ত দয়ালু হইত।" তিনি পুনরায় বলিয়াছেন—"ছবরকারী লোককে আল্লা বড় ভালবাসেন।" মহাত্মা হজরৎ দাউদ নবী عم কে আল্লা বলিয়াছিলেন—"হে দাউদ! তুমি আমার স্বভাবের অনুকরণ কর। আমার স্বভাব ছবর করা, এই জন্য আমার একটী নাম 'ছবুর' অর্থাৎ সহিষ্ণু।" মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী عم বলিয়াছেন—"হে মানব! তোমরা যে পর্য্যন্ত অকৃতকার্য্যতার উপর ছবর করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত সফলতার মুখ দেখিতে পাইবে না।" মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ এক দিন কতিপয় 'আনছারী' লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তোমরা কি মুছলমান?" তদুত্তরে তাঁহারা বিনীত ভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন। হজরত্‌ৎ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তোমরা যে মুছলমান তাহার প্রমাণ কি?" তাঁহারা নিবেদন করিয়াছিলেন—"হে রসুলুল্লা! আমরা আল্লার অনুগ্রহে কিছু পাইলে شكر শোকর (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) করি; কষ্ট উপস্থিত হইলে ছবর করিয়া থাকি এবং আল্লার বিধানে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকি।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"কাবা শরীফের প্রভুর শপথ করিয়া বলিতেছি—'তোমরা পাকা মুছলমান।'" মহাত্মা হজরৎ আলী করমুল্লা বলিয়াছেন—"শরীরের সম্বন্ধে মস্তক যেরূপ, ঈমানের সম্বন্ধে ছবর তদ্রূপ, মস্তক না থাকিলে শরীরে যেমন কোন কাজ হয় না, ছবর না থাকিলে ঈমানেও কোন ফল দেয় না।"

ছবর বা ধৈর্য্যের প্রকৃত পরিচয়। পাঠক! শুনিয়া রাখ—ছবর কেবল মানুষের জন্য খাস বস্তু। ইতর জন্তু সর্ব্বদা খাহেশের অধীনে থাকিয়া, কেবল উহারই তাড়নায় পরিচালিত হয়। খাহেশ ভিন্ন অন্য কোন ভাব বা প্রবৃত্তি তাহাদিগকে চালাইতে পারে না। খাহেশ

তাহাদিগকে যে দিকে চালায়, সেই দিকেই চলিতে থাকে—তদ্বিরুদ্ধে তাহারা দাঁড়াইতে পারে না। এই জন্য ইতর জন্তুর উপর ছবরের অধিকার নাই। আবার ফেরেশ্‌তাগণ পূর্ণ সাম্য ভাবাপন্ন—কোন খাহেশ তাহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না; এজন্য তাহাদের পক্ষে ছবরের প্রয়োজন নাই। ফেরেশ্‌তাগণ আল্লার প্রেমে সর্ব্বদা ডুবিয়া রহিয়াছে এবং সর্ব্বদা কর্ত্তব্য-জ্ঞানের উপদেশে কাজ করিয়া থাকে। তাহাদিগকে বাধা দিবার কোন প্রতিবন্ধকতাও নাই। সুতরাং প্রতিবন্ধকতা দূর করিবার কষ্ট তাহাদিগকে সহ্য করিতে হয় না। সৃষ্টিকর্ত্তা প্রথমতঃ মানবকে ইতর প্রাণীর স্বভাব দিয়া সৃজন করিয়াছেন; তাহার পর পান ও আহারের লোভ, পরিচ্ছদ পারিপাট্যের ইচ্ছা, আনন্দ ও সুখভোগের খাহেশগুলি তদুপরি চাপাইয়া দিয়াছেন। মানব যে সময়ে যৌবনে পদার্পন করিতে যায়, সেই সময়ে ফেরেশ্‌তাগণের সমশ্রেণীস্থ একটী ফেরেশ্‌তাকে নূর (আলোক) সহকারে মানব-মনে সৃষ্টি করিয়া দেন। সেই ফেরেশ্‌তা সেই আলোকের সাহায্যে কার্য্যের কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। সেই ফেরেশ্‌তাকে 'বুদ্ধি' এবং তাহার হস্তস্থিত অলোককে 'জ্ঞান' বলে। এতদ্ব্যতীত আরও একটী ফেরেশ্‌তাকে মানব হৃদয়ে স্থাপন করা হয়, তাহাকে শক্তি, বল বা ক্ষমতা বলা যায়। এই দুটী উৎকৃষ্ট পদার্থ হইতে ইতর জন্তু বঞ্চিত আছে। প্রথম ফেরেশ্‌তা, জ্ঞানের আলোক সঙ্গে লইয়া মানব-হৃদয়ে প্রবেশ করে, সুতরাং সেই আলোকের প্রভাবে মানব প্রত্যেক কার্য্যের কারণ ও ফলাফল দেখিতে পায়। কার্য্যটী কিভাবে নির্ব্বাহিত হইলে সুফল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাও জানিতে পারে এবং নিজের অবস্থা ও আল্লার পরিচয় পাইতে পারে, তৎসঙ্গে ইহাও জানিতে পারে যে, খাহেশকে পরিতৃপ্ত করিবার কালে যদিও একটী চমৎকার আনন্দ আরাম ও সুখ পাওয়া যায়, তথাপি পরিণামে ভীষণ বিনাশ ও মহাকষ্ট আনয়ন করে। আবার ইহাও সুন্দর মত জানিতে পারে যে সুখভোগের আনন্দ ও আরাম শীঘ্র ফুরাইয়া যায়; কিন্তু তজ্জনিত দুঃখ ও কষ্ট বহুদিন পর্য্যন্ত রহিয়া অশেষ যন্ত্রণা দিতে থাকে। এরূইপ 'বুঝ' ইতর প্রাণীর ভাগ্যে কখনই ঘটে না—ইহা কেবল মানবের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু কেবল সেই বুঝ মানুষের পক্ষে প্রচুর নহে—তৎসঙ্গে চলিবার প্রচুর ক্ষমতা থাকাও একান্ত আবশ্যক।

যে ব্যক্তি নিজের খাহেশকে ক্ষতিকর বলিয়া সুন্দর মত বুঝিয়াছে, অথচ তাহাকে নিরস্ত করিবার ক্ষমতা রাখেনা, তাহার পক্ষে শুধু বুঝ সমঝে ফল কি? দেখ, পীড়িত ব্যক্তি যদি উত্তম রূপে বুঝিতে পারে যে, এই পীড়ায় তাহার বহু ক্ষতি করিয়াছে ও করিবে অথচ তাহা দূর করিবার কোন ক্ষমতা না থাকে, তবে তাহার সে 'বুঝ' বা জ্ঞানে কি উপকার করিবে? এই কারণে করুণাময় সৃষ্টিকর্ত্তা মানবের সঙ্গে আর একটী ফেরেশ্‌তা যোগ করিয়া দেন। যে বিষয়কে ক্ষতিকর বলিয়া বুঝে, তাহা পরিত্যাগ করিতে মানবকে এই ফেরেশ্‌তা, বল দ্বারা সাহায্য করিয়া থাকে। আজন্ম শৈশব কাল হইতে খাহেশের আদেশ মত চলিবার জন্য যেমন একটী শক্তি মানবের আবশ্যক ছিল, তদ্রূপ যৌবনের প্রারম্ভ হইতে আর একটী শক্তি প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে চলিবার এবং ভবিষ্যৎ ক্ষতি হইতে বাঁচিবার জন্য প্রয়োজন হয়। খাহেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া চলিবার শক্তিটী ফেরেশ্‌তা-সৈন্যের অন্তর্গত; আর উহার আদেশ মত চলিবার শক্তি শয়তান-সৈন্যের দলভুক্ত। খাহেশের বিরুদ্ধে চলিবার শক্তিটী পরকালের হিতকর ও জ্ঞান-উপার্জ্জনের হেতু এবং উহার আদেশ মত চলিবার শক্তি সেই গুণ-বিনাশের কারণ।

মানবের অন্তররাজ্যে এই দুই বিরোধী সৈন্যদলের যুদ্ধ সর্ব্বদার জন্য লাগিয়া রহিয়াছে। ফেরেশ্‌তা-সৈন্য মানবকে খাহেশের বিরুদ্ধে চলিতে অনুরোধ করে, আর শয়তান সৈন্য উহার অনুগত হইয়া চলিতে কুপরামর্শ দেয়। বেচারা মানব, এই দুই বিবদমান সৈন্যদলের টানাটানির মধ্যে পড়িয়া হয়রান আছে। দুই পক্ষই মনকে আপন আপন দিকে টানি-তেছে। মন কাহার কথা মানিবে, আর কাহার কথা অমান্য করিবে—কোন্ দিকে যাইবে, আর কোন্ পক্ষ পরিত্যাগ করিবে, স্থির করিতে পারিতেছে না। যে সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করে, মন তাহার দিকেই ঝুকিয়া পড়ে। শয়তান সৈন্যের সহিত যুদ্ধ কালে ফেরেশ্‌তা-সৈন্য যদি স্বস্থানে দৃঢ় পদে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে, অর্থাৎ নিজের অবস্থান-স্থান হইতে হটিয়া না যায় তবে সেই স্থৈর্য্যকে 'ছবর' বা ধৈর্য্য বলে। স্বস্থানে স্থির থাকিতে পারিয়া আবার শয়তান-সৈন্যকে যদি হারাইয়া ও তাড়াইয়া দিতে পারে তবে সেই প্রবল ভাবকে ظفر (জফর) বিজয় বলে। মানব অন্তরে এই দুই সৈন্যদলের যে যুদ্ধ চলে তাহাকে 'প্রবৃত্তির সহিত জেহাদ' বলে। যাহা হউক, 'কুপ্রবৃত্তি'র উত্তেজনা সহ্য করিয়া যে শক্তি মনকে

প্রশান্ত ভাবে 'নিবৃত্ত' করিয়া রাখিতে পারে তাহারই নাম 'ছবর'। যে স্থলে 'কুপ্রবৃত্তি ও "নিবৃত্তির' মধ্যে সংঘর্ষণ নাই তথায় ছবরেরও আবশ্যকতা নাই। এই কারণে ফেরেশ্‌তাদিগের জন্য ছবরের প্রয়োজন হয় না। অন্য পক্ষে, ইতর জন্তু ও শিশুদিগের পক্ষে ছবর করিবার শক্তি নাই।

পাঠক! আমরা এতক্ষণ যে দুই ফেরেশ্‌তার আলোচনা করিলাম তাহাদিগকেই کراما کاتبین কেরামান্ কাতেবীন্ বলে। সৃষ্টিকর্তা দয়া করিয়া যাহাদিগের সম্মুখে চিন্তা ও যুক্তি-অনুসন্ধানের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন তাহারা

কেরামান্ কাতেবীন্

বুঝিতে পারে—কারণ না হইলে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। যে স্থলে কোন নূতন বস্তু দেখা যায়; তথায় নূতন কারণের সমাবেশেই তাহা উৎপন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যে স্থানে কোন পুরাতন পদার্থের বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন অন্য কোন নূতন পদার্থ দেখা যায় তথায় সেই পুরাতন কারণের বিরোধী অন্য নূতন কারণ অবশ্যই সমাগত হইয়াছে। সকলেই জানে ইতর জন্তু ও মানব শিশুর হৃদয়ে জন্মাবধি কেবল খাহেশ একাকী থাকে—জ্ঞান ও বিচার শক্তি থাকেনা। সুতরাং তাহারা কার্য্যের পরিণাম জানিতে পারে না; তদ্‌ব্যতীত প্রবৃত্তির বিরুদ্ধেও দাঁড়াইবার শক্তি রাখে না। মানব-শিশু যখন যৌবনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তখন 'জ্ঞান' ও 'নিবৃত্তি শক্তি' নূতন ভাবে হৃদয়ে উৎপন্ন হয়। যাহা হউক, এই নূতন দুই পদার্থ অবশ্যই নূতন দুইটী কারণের প্রভাবে উৎপন্ন হয় বলিয়া বুঝা যাইবে। শেষোক্ত দুইটী নূতন কারণকেই দুটী ফেরেশ্‌তা বলা যাইতেছে। উহাদের নামই 'কেরামান্ কাতেবীন"। সকলেই জানে—জ্ঞান ও শক্তির মধ্যে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ পদার্থ, যৌবনের প্রারম্ভে প্রথমেই বিচার-মূলক জ্ঞান হৃদয়ে আবির্ভূত হইতে থাকে। জ্ঞান জন্মিবার পরে তদনুসারে কার্য্য করিবার ইচ্ছা ও শক্তি উৎপন্ন হয়। যে কারণ অর্থাৎ ফেরেশ্‌তাটী মানব-হৃদয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া দেন, তিনি একটী শ্রেষ্ঠ ফেরেশ্‌তা। এই জন্য হৃদয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহার স্থান নির্ণীত হইয়াছে। হৃদয় বা আত্মা বলিলে তোমার নিজকেই বুঝায়। ঐ জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানের ফেরেশ্‌তাকে তোমার উপর উপদেশক স্বরূপ নিযুক্ত করিয়া তোমার দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই কারণে উহাকে দক্ষিণ পার্শ্বের ফেরেশ্‌তা বলা যায়। ঐ ফেরেশ্‌তা তোমাকে ভাল মন্দ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সদসৎ পথ
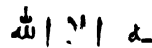
দেখাইবার

দেখাইবার জন্য নিযুক্ত আছেন। তিনি তোমাকে সর্ব্বদা সৎ পরামর্শ দানে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। তুমি যদি কাণ পাতিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ কর তবে তিনি স্বীয় পরিশ্রম সার্থক হইল দেখিয়া প্রসন্ন হইবেন এবং তোমার "আমলনামার" অর্থাৎ কার্য্য-তালিকার মধ্যে একটী পুণ্য লিখিয়া রাখিবেন; পক্ষান্তরে যদি তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার মূল্যবান্ পরিশ্রম ব্যর্থ করিয়া দেও এবং পশু ও শিশুর ন্যায় তুমি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারে বঞ্চিত থাক, তবে ঐ ফেরেশ্‌তার সমীপে তোমার নিজের পক্ষে ক্রটী করা হইবে। ঐ ক্রটী জনিত পাপ তোমার নামে লিখিত হইবে। (জ্ঞানের উপদেশ মানিলে পুণ্য লিখা এবং অমান্য করিলে পাপ লিখা যে ফেরেশ্‌তার কাজ তিনি প্রধান ফেরেশ্‌তা)। জ্ঞানের উপদেশ মত কাজ করিতে মানবকে দ্বিতীয় ফেরেশ্‌তা বল দিয়া সাহায্য করেন। তিনি উপযাচিত হইয়া যে বল দান করেন তাহা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিলে বা প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিলে এক প্রকার পুণ্য উৎপন্ন হয়; আবার তাহা না করিলে পাপ জন্মে। এ পাপ পুণ্যও তোমার নামে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। যাহা হউক, উক্ত দুই লিখক ফেরেশ্‌তা, পাপ ও পুণ্য তোমার আমলনামা ও আত্মা উভয়ের উপর লিখিয়া থাকেন। তুমি দেখিতে পাও না। তোমার আত্মার উপর লিখিলেও তাহা শরীর বর্ত্তমান থাকা পর্য্যন্ত তুমি দেখিতে পাইবে না। এই দুই ফেরেশ্‌তা ও তাঁহাদের লিখন এই জড় জগতের পদার্থ নহে, সুতরাং এই চর্ম্ম-চক্ষে দেখা যাইতে পারে না। মৃত্যু-ঘটনায় এই প্রকাশ্য চক্ষু চলিয়া গেলে, আধ্যাত্মিক-জগতের-পদার্থ-দর্শনের-উপযুক্ত চক্ষু ফুটিবে, তখন ঐ লিখনগুলি তোমার সঙ্গে যুক্ত দেখিতে ও পড়িতে পারিবে। তখন হইতেই قیامت صغری 'ক্ষুদ্র কেয়ামৎ' আরম্ভ হইল বলিয়া টের পাইতে থাকিবে। ঐ লিখনগুলির বিস্তৃত মর্ম্ম قیامت کبری 'মহা কেয়ামতের' দিন প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। মৃত্যু সময়েই ক্ষুদ্র কেয়ামৎ আরম্ভ হয়। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ সেই মর্ম্মে বলিয়াছেন যে—"যে মরিল তখনই তাহার কেয়ামৎ উপস্থিত হইল।" মহা কেয়ামতে যাহা ঘটিবে তাহার আভাস মৃত্যুকালে লঘু কেয়ামতেও পাওয়া যাইবে। এ বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা 'এহ্‌ইয়া-অল্‌-উলুম' গ্রন্থে লিখা গিয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তৎ সমুদয়ের সমাবেশ হইবে না।

লঘু কেয়ামৎ ও মহা কেয়ামৎ

যাহা হউক, এ পর্যন্ত যাহা বলা গেল তাহাতে ইহা বুঝিতে পারিয়াছ যে, যে স্থলে যুদ্ধ বাধে তথায় বিপক্ষের আক্রমণ সহ্য করিয়া স্বীয় অবস্থান রক্ষা করিবার জন্য অটল ভাবে ছবর করিতে হয়। আবার দেখ, দুইটী বিপক্ষ সৈন্যদলের সাক্ষাৎ হইলেই যুদ্ধ বাধে। মানবহৃদয়েও দুইটী বিরোধী সৈন্যদলের একত্র সংযোগ ঘটে। এক দল ফেরেশ্‌তা-সৈন্য ও আর এক দল শয়তান-সৈন্য। এই দুই দলের একত্র সমাবেশ ঘটিলে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। এই যুদ্ধে ব্যাপৃত হওয়া ধর্ম্মপথের প্রধান কার্য্য। শৈশব-কাল হইতে মানবের হৃদয়রাজ্য শয়তানের প্রধান সৈন্য, প্রবৃত্তি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া থাকে। যৌবনের প্রারম্ভে ফেরেশ্‌তা-সৈন্য সৃষ্ট হইয়া হৃদয়-রাজ্যে প্রবেশ করে; তখন সে দেখিতে পায় যে, প্রবৃত্তি মানব-মন দখল করিয়া লইয়াছে। উহার হাত হইতে হৃদয়-রাজ্য কাড়িয়া লইতে না পারিলে সৌভাগ্যের পথে চলা যাইতে পারে না। যুদ্ধ না করিলে হৃদয়-রাজ্য কাড়িয়া লওয়াও যায় না। আবার ছবর সহকারে প্রাণপণে ঘোরতর যুদ্ধ না করিলে বিজয় লাভ করাও ঘটে না। যে ব্যক্তি এই যুদ্ধে লিপ্ত হয় না, সে আপন হৃদয়-রাজ্যটী শয়তানের হস্তে সমর্পণ করে। যে ব্যক্তি শরীঅৎ অর্থাৎ ধর্ম্ম-বিধানের অধীন হইয়া চলিতে পারে সেই ব্যক্তি প্রবৃত্তিগুলিকে পরাস্ত করিয়া হৃদয়-রাজ্যটী দখল করিয়া লইতে সক্ষম হয়। এই উপলক্ষে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ ও বলিয়াছেন—"আল্লা কিন্তু আমাকে আমার শয়তানের উপর জয়ী হইতে সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্যই আমি মুছলমান হইতে পারিয়াছি।" মানুষ স্বীয় প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধ কালে কখনও জয়ী হয়, আবার কখনও বা পরাস্ত হইয়া থাকে, কখনও প্রবৃত্তির হস্তে বন্দী হইয়া তাহার গোলাম হয়, আবার কখনও বা তাহাকে পরাস্ত ও অধীন করিয়া ধর্ম্ম বিধানের আদেশ মত তাহাকে পরিচালনা করিয়া থাকে। ফল কথা এই যে—ছবর করিতে না পারিলে এবং নিজের অবস্থান স্থানে অটল ভাবে স্থির হইয়া থাকিতে না পারিলে হৃদয়-দুর্গ দখল করা যায় না।

ঈমানের স্বরূপ—পাঠক! জানিয়া রাখ—ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস একটি একক পদার্থ নহে এবং উহা নানা প্রকার এবং তাহাদের বহু ভাগ আছে এবং প্রত্যেক ভাগে অসংখ্য শাখা প্রশাখা আছে। এই কারণে পবিত্র হদীছ বচনে বলা হইয়াছে—"ঈমানের ৭০ সত্তরের অধিক বিভাগ আছে, তন্মধ্যে 'একত্ব-জ্ঞান' অর্থাৎ لا اله الا الله (লা এলাহা

ইল্লাল্লাহো) এই কাল্‌মার অর্থ ও মর্ম্ম জানা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান জ্ঞান এবং পথিকের অসুবিধা দূর-করণ-মানসে পথ হইতে কাঁটা কুটা সরাইয়া দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা লঘু অনুষ্ঠান।" ঈমান যদিও নানা ভাগে বিভক্ত এবং ইহার শাখা প্রশাখা অগণিত, তথাপি তাহার প্রকৃত সত্তা তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে—(১) পরিচয়-জ্ঞান, (২) মনের অবস্থা (৩) অনুষ্ঠান। ঈমানের বর্ত্তমানতা, এই তিন পদার্থের বিদ্যমানতা ভিন্ন আর কিছুই নহে. (টীঃ ২১৫) যেমন তওবা। বাস্তবিক পক্ষে

ধর্ম্ম ভাবের উন্নতি ও বিকাশের তিনটী ক্রম

টীকা—২১৫। ঈমানের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য ইমাম সাহেব দার্শনিক যুক্তির যে শৃঙ্খলা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকটী কথা তিনি নিতান্ত সহজ-বোধ্য বিবেচনায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। নিতান্ত সহজ বলিয়া তিনি যাহা ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা এ স্থলে যোগ করিয়া না দিলে আমরা কিছুই বুঝিতে পারিব না।

কোন একটী কথা বা পদার্থের নাম মনের মধ্যে গ্রহণ করিলে মন প্রথমেই তাহা ভাল কি মন্দ, হিতকর কি ক্ষতিকর ইত্যাদি পরিচয় লইতে ব্যস্ত হয়। যে কোন উপায়েই হউক না কেন, পরিচয় পাইলে মনের মধ্যে একটা নূতন ভাব জন্মে; তাহা প্রীতি কিম্বা ভীতি, অনুরক্তি বা বিরক্তি অথবা ঐরূপ কোন দ্বন্দ্ব ভাবের একটী হইবে। সেই ভাব মনে এক নূতন অবস্থা আনয়ন করে। কোন ক্ষতিকর পদার্থের নাম অন্তরে প্রবেশ করিলে, মন তাহার পরিচয় লইয়া বিরক্ত হয়। পরে সেই পদার্থের সম্ভাবনা বা অস্তিত্ব নিজের সঙ্গে আছে কিনা বিচার করিয়া দেখে। যদি দেখিতে পায় তবে ভয়ে শিহরিয়া উঠে. পরে তাহা সংশোধনে বা বিতাড়নে সচেষ্ট হয়। তাহারই ফল সদনুষ্ঠান বা সৎকার্য্য। উদাহরণ স্বরূপ 'পাপ' কথাটী গ্রহণ কর। পাপ, হলাহল বিষ তুল্য. আত্মার ক্ষতি করে; পাপের এই ক্ষতিকর পরিচয় পাইলে এবং ইতি পূর্ব্বে বহু পাপ করা হইয়াছে বুঝিতে পারিলে বিনাশ ভয়ে অস্থির হইতে হয় এবং সৎকার্য্য দ্বারা সেই ক্ষতি সংশোধনের জন্য অনুষ্ঠান আরম্ভ করিতে হয়। অপর পক্ষে কোন হিতকর পদার্থের নাম মনে প্রবেশ করিলে এবং তৎপরিচয় প্রাপ্ত হইলে মনে তৎপ্রতি প্রীতি বা অনুরক্তি জন্মে এবং তাহা উপার্জ্জনে মন প্রলুব্ধ হয় ... সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'পুণ্য' কথাটী গ্রহণ কর। উহা আত্মার বল, পুষ্টি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। এই পরিচয় পাইলে উহা নিজের মধ্যে লইতে মন প্রলুব্ধ হয়। তাহাতেও সদনুষ্ঠানের ইচ্ছা জন্মে। যাহা হউক. চুম্বক কথা এই যে—'পরিচয় জ্ঞান' জন্মিলে মনে তদনুরূপ এক 'অবস্থা' জন্মে। তাহা হইতে ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়া গিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি চালাইয়া দিয়া কার্য্যে 'অনুষ্ঠান' করিয়া লয়। 'পরিচয় জ্ঞান' এবং তদুৎপন্ন মনের 'অবস্থান্তর' এবং তজ্জন্য অনুষ্ঠান এই ত্রিবিধ পদার্থকেই 'ঈমান' বলে। ইহাদের মধ্যে পরিচয়জ্ঞান মূল কারণ, সুতরাং ঈমান বলিলে অনেক সময়ে উহাকেই বুঝা যায়। এই পরিচয়জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে, অথবা উপদেশ বা যুক্তি মূলে হৃদয়ে আগত হয় বলিয়া উহাকে 'প্রাপ্ত বস্তু' বলা যায়। আবার ভাবান্তরিত হৃদয় হইতে একটী বিশেষ প্রভাব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনুষ্ঠান বা কার্য্য রূপে প্রকাশ পায়। ইহা হইতে বুঝা যায় পরিচয়জ্ঞান হৃদয়ে আসিয়া পরে অনুষ্ঠান রূপে প্রকাশ পায়। হৃদয় মধ্যবর্ত্তী স্থান। মৃত্তিকাস্থ জল ইক্ষু দণ্ডে প্রবেশ করিবার পরে মিষ্ট রস রূপে যেমন বাহির হয় ইহাও প্রায় তদ্রূপ।

ইহা একটী 'সচেতন অনুতাপ' উহা হৃদয়ের একটী চমৎকার অবস্থা ঘটাইয়া দেয়, সেই অবস্থাটী পাপের পরিচয়-জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পাপ, হলাহল বিষ তুল্য আত্মার ক্ষতি করে। সেই ক্ষতিকর পাপ, অনেক পরিমাণে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারিলে হৃদয়ে অনুতাপ, ক্ষোভ ও লজ্জা যুগপৎ জন্মিয়া উঠে এবং হৃদয়কে অস্থির করিয়া তুলে। তজ্জন্যই মানব পাপ হইতে বিরত থাকে এবং সৎকার্য্য করিতে নিযুক্ত হয়। যাহা হউক, এস্থলে পাপের 'পরিচয়-জ্ঞান' হৃদয়ের 'অনুতপ্ত অবস্থা' এবং 'সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান' এই তিনটীর সমবেত নাম ঈমান। আবার ইহাদের প্রত্যেকটীও ঈমান নামে কথিত হয়। তথাপি অনেক সময়ে ঈমান বলিলে শুধু পরিচয়-জ্ঞানকেই বিশেষ রূপে বুঝা যায়। কেননা উক্ত তিন পদার্থের মধ্যে পরিচয়-জ্ঞানই প্রধান বস্তু, উহার প্রভাবেই মনের অবস্থা বদলিয়া যায়, এবং তদনুরূপ কার্য্য ঘটিয়া থাকে। যাহা হউক ঈমান রূপ বৃক্ষের 'কাণ্ড' বা 'ধরণা' হইতেছে পরিচয়-জ্ঞান। সেই জ্ঞানের প্রভাবে মনের যে অবস্থান্তর ঘটে তাহাকে ঐ বৃক্ষের শাখা বলা যায়। আবার মনের অবস্থা প্রভাবে যে সকল সাধু কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহাকে ফল বলা যাইতে পারে।

পুনরায় ষোল আনা ঈমানকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১ دیدار (দীদার) 'দর্শন' বা 'পরিচয় জ্ঞান' এবং (২) کردار (কেরদার) 'কার্য্য' বা 'অনুষ্ঠান' (টীঃ ২৭৬)। কার্য্য বা অনুষ্ঠান কখনই বিনা ছবরে সম্পন্ন হইতে পারে না; কেননা প্রত্যেক কার্য্য করিতে গেলে শ্রম-কষ্ট সহ্য করা অপরিহার্য্য। এই কারণে ছবরকে ঈমানের অর্দ্ধেক বলা যায়।

ছবরই অর্দ্ধেক ঈমান এবং রোজা অর্দ্ধেক ছবর

আবার দেখ, কার্য্য করিবার কালে মানবকে দুই শ্রেণীর প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে ছবর করিয়া চলিতে হয়; তন্মধ্যে এক শ্রেণীর বাধা খাহেশ বা কামনা হইতে উৎপন্ন হয় এবং অন্য শ্রেণীর বাধা, ক্রোধ ও তদ্‌-বংশীয় রিপু হইতে উপস্থিত হয়। রোজা রাখিলে খাহেশের উত্তে-

তবেই দেখা যাইতেছে হৃদয় বাদ দিলে ঈমানের দুইটী প্রধান ভাগ হইল; এক ভাগ 'পরিচয়জ্ঞান' অন্য ভাগ 'অনুষ্ঠান'। হৃদয়ের মধ্যে পরিচয়জ্ঞান আসিলে উহাকে জ্ঞানবান্ করে মাত্র। জল যেমন শূন্য কলসীতে প্রবেশ করিয়া উহাকে জল পূর্ণ অবস্থায় আনে, এ ঘটনাও তদ্রূপ। এ কথাগুলি বুঝিলে গ্রান্থর অংশটী বুঝা সহজ হইবে।

টীকা—২৭৬। এরূপ দুই ভাগের যুক্তি পূর্ব্বোক্ত নোটের শেষ ভাগে দেখান গিয়াছে।

জনার বিরুদ্ধে ছবর করা হয় বলিয়া রোজাকে অর্দ্ধেক ছবর বলা যায়। অন্য দিক দিয়া দেখিলে ছবরকে অর্দ্ধেক ঈমান বলা যায়।

কার্য্য বা অনুষ্ঠান কি ধরণের পদার্থ তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝা যায় উহাই ঈমানের আসল এবং প্রধান অংশ, সুতরাং কার্য্যকেই ঈমান বলিয়া ধরা যায়। কার্য্য পরিচালনা কালে মুছলমান লোককে বহু বাধা ও নানা কষ্ট সহ্য করিতে হয়—তখন পরিশ্রমের যাতনা সহ্য করিয়া, সাবধানতার শিকলে বান্ধা থাকিয়া, আরও অধিক যাতনা ভোগ করিতে হয়। সুতরাং দেখা যায়, কার্য্য পরিচালনা কালে এক মাত্র 'ছবরই' মানবের প্রধান অবলম্বন। কার্য্য-পরিসমাপ্তি হইলে (সুযোগ ও উপকরণ পাইতে পারিয়াছি বলিয়া,) এক পরম আনন্দ উপভোগে আসে। তবেই দেখ মুছলমানকে কার্য্য-পরিচালনা কালে ছবর অবলম্বন করিতে হয় এবং কার্য্যের অন্তে শোকর (কৃতজ্ঞতা) প্রকাশ করিতে হয়, এই জন্য ছবরকে ঈমানের এক অর্দ্ধ এবং শোকরকে অপরার্দ্ধ বলা যায়। এই কারণে মহাপুরুষ হজরৎ রছুল (ﷺ) 'শোকরকেও' ঈমানের অর্দ্ধেক বলিয়াছেন।

ঈমানের একার্দ্ধ ছবর ও অপরার্দ্ধ শোকর

এস্থলে আর একটী কথা বুঝিয়া রাখ—কার্য্যের যে অংশ নিতান্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য তাহাকেই লোকে মূল কার্য্য বলিয়া গণ্য করে। অনুষ্ঠিত কার্য্যের মধ্যে ছবর অপেক্ষা অন্য কোন কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার নাই। এই জন্য ছবরকে ঈমান বলিয়াও ধরা হয়। ঈমান কি পদার্থ? এই প্রশ্ন মহাপুরুষ হজরৎ রছুল (ﷺ) কে লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"ছবরই ঈমান।" কেননা ঈমানের অংশগুলির মধ্যে অনুষ্ঠান প্রধান এবং তাহা সম্পন্ন করিবার কালে ছবর অপেক্ষা কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার আর কিছুই অবলম্বন করিতে হয় না। সকল দেশেই কোন কার্য্যকে তাহার কঠিন ও দুঃসাধ্য অংশের নাম দ্বারা প্রকাশ করা হয় (টীঃ ২৭৭)। এই কারণেই মহাপুরুষ হজরৎ রছুল (ﷺ) 'হজ্‌কে 'আরফা' বলিয়াছেন। ইহার অর্থ এই

ছবরই ঈমান—কেন না ইহা ঈমানের মধ্যে কঠিন ব্যাপার

টীকা—২৭৭। যথা কৃষি কার্য্যকে হল কর্ষণ বা হাল বহা, বিদ্যোপার্জ্জনকে লেখা পড়া করা বলে, ইত্যাদি—

যে হজ্ কালের অনুষ্ঠিত কার্য্যগুলির মধ্যে আরফা নামক স্থানের আচরিত কার্য্যগুলি বিশেষ আবশ্যকীয় এবং নিতান্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য। আরফা কার্য্যগুলি সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হইলে হজ্ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, কিন্তু তন্মধ্যে কিছু অসম্পন্ন থাকিলে বা কোনটী যথোচিত মতে নির্ব্বাহিত না হইলে হজ নষ্ট হইয়া যায়, অন্য স্থানের আচরিত কার্য্য অসম্পন্ন বা ত্রুটী যুক্ত হইলেও হজ নষ্ট হয় না। (টীঃ ২১৮)

টীকা—২১৮। "ছবর' ঈমানের অর্দ্ধেক' ইহা প্রমাণ করিতে গিয়া ইমাম সাহেব দর্শন শাস্ত্রের কয়েকটী সংজ্ঞ সত্যের প্রতি লক্ষ্য মাত্র করিয়া দ্রুত ভাবে লিখনী চালাইয়া গিয়াছেন, সুতরাং লক্ষিত সত্য অস্পষ্ট থাকায় মর্ম্ম-বোধে একটু অসুবিধা ঘটিয়াছে। তিনি ঈমানকে প্রথমে তিন ভাগ করিয়াছেন—(১) 'মারেফৎ' বা জ্ঞান; (২) মনের অবস্থা; (৩) সদনুষ্ঠান। এই তিনটীর মধ্যে প্রথমে জ্ঞানকেই প্রধান ও মূল বিষয় বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন—জ্ঞানের কারণেই মনের অবস্থা বদলিয়া যায়। উহার প্রভাবেই মনে সদিচ্ছা উৎপন্ন হয়—সেই ইচ্ছা মানুষকে সৎকার্য্যে প্রণোদিত করে। সুতরাং বুঝা যায় জ্ঞানই প্রধান এবং উহা মনকেই আশ্রয় করিয়া থাকে—একাকী থাকিতে পারে না। জল যেমন কলসে থাকিয়া কলসের 'শূন্যতা' ঘুচাইয়া 'জলপূর্ণ' অবস্থায় আনয়ন করে জ্ঞানও তদ্রূপ মনে উদয় হইয়া মনকে জ্ঞানশালী করে মাত্র। এই কারণে ইমাম সাহেব ঈমানকে শেষে দুই ভাগ করিলেন—প্রথম, 'জ্ঞান সম্বলিত মন' ও দ্বিতীয় 'অনুষ্ঠান'। এবার তিনি অনুষ্ঠানকেই প্রধান বলিয়া প্রমাণ করিলেন, কেননা হাজার জ্ঞান থাকিলেও তদনুসারে কাজ না করিলে সে জ্ঞানে মানুষের কোন উপকার হয় না। অনুষ্ঠানহীন জ্ঞান কোন কাজেরই নহে। অপর পক্ষে দেখ, কেহ নিজে জ্ঞান উপার্জ্জন না করিয়াও অন্যের দেখাদেখি কাজ করিলে ফল হইতে বঞ্চিত হয় না। যে শিশু অগ্নির দাহিকা-শক্তির পরিচয় পায় নাই, সেও যদি শুষ্ক তৃণরাশির মধ্যে অগ্নি নিক্ষেপ করে তবেও তৃণ পুড়িয়া যায়। অভাবগ্রস্ত লোকের অভাব মোচন করিলে অভাবমোচকের আত্মার যে কিরূপ চমৎকার মঙ্গল ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় তাহা প্রত্যক্ষ জানিতে না পারিলেও তদ্রূপ আচরণে আত্মার মঙ্গল, স্বাভাবিক নিয়মে আপনা আপনি ঘটিয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে তিনি অনুষ্ঠানকে জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। জ্ঞানেরও আবার প্রকার ভেদ এবং উপার্জ্জনের পন্থা ভেদ আছে—(১) স্বাভাবিক জ্ঞান; (২) দেখিয়া শিক্ষিত জ্ঞান, (৩) শুনিয়া শিক্ষিত জ্ঞান; (৪) ভুগিয়া শিক্ষিত জ্ঞান ইত্যাদি। এ সমস্ত জ্ঞানকে এক 'দীদার' শ্রেণীর মধ্যে স্থাপন করিয়া তিনি পুনরায় ঈমানকে দুই ভাগ করিলেন—(১) 'দীদার' (প্রত্যক্ষ-দর্শন) এবং (২) 'কেরদার' (অনুষ্ঠান।) এবার দীদার ও কেরদার অর্থাৎ জ্ঞান ও অনুষ্ঠান উপলক্ষে দর্শন-শাস্ত্রের এক মনোহর বিচারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জ্ঞানকে শাখা কাণ্ড সম্বলিত বৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়া 'অনুষ্ঠানকে' তাহার ফল বলিয়াছেন। 'বীজ আদিম কি বৃক্ষ আদিম' এই তর্কটী দার্শনিক পণ্ডিত মহলে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা বীজকে আদিম বলেন তাঁহারা স্বকীয় মতের সমর্থন জন্য পদ্মবীজকে উদাহরণ স্বরূপ আনয়ন করেন। পদ্মবীজের মধ্যে পদ্মলতা ক্ষুদ্রাকারে লুকাইয়া থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে বিকাশ পায়। কাঁঠাল বীজের মধ্যেও বৃক্ষ, ভ্রূণ ও শিকড় দেখা যায়। ধান্য গোধূমাদি শস্যের এক প্রান্তে উহাদেরও ভ্রূণের স্থান আছে। যাহা হউক, বীজ হইতে যেমন বৃক্ষ জন্মে, তদ্রূপ আনুষ্ঠানিক কার্য্য হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। সকলেই জানে, চক্ষু না

ছবর সর্ব্বদাই অবলম্বনীয়। পাঠক জানিয়া রাখ—(মানব-মন সর্ব্বদাই চঞ্চল—কখনই প্রশান্ত থাকিতে পারে না, কখন বা কোন প্রবৃত্তি কর্ত্তৃক উত্তেজিত ও সংক্ষুব্ধ হয়, কখন বা তদ্বিরুদ্ধে প্রবুদ্ধ হইয়া উহার আক্রমণ ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করে।) মন এই দুই ভাব হইতে শূন্য থাকিতে পারে না, সুতরাং প্রত্যেক অবস্থায় মানবকে ছবর অবলম্বন করা আবশ্যক হয়।

প্রবৃত্তির অনুযায়ী পদার্থ সম্পর্কে ছবরের আবশ্যকতা— ধন, মান, স্বাস্থ্য, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি পদার্থ প্রকৃতির অনুযায়ী এবং এই ধরণের পদার্থ পাইতে খাহেশ শ্রেণীর প্রবৃত্তিগুলি সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা

খেলিলে দর্শন জ্ঞান লাভ হয় না—পাঠাভ্যাস না করিলে বিদ্যা লাভ ঘটে না। শিল্প বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এই নিয়ম—কার্য্য না করিলে তদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করা যায় না। জ্ঞান আবার মনে প্রবেশ করিয়া ইচ্ছা জন্মাইয়া দেয়; সেই ইচ্ছা শেষে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি চালাইয়া কার্য্য করাইয়া লয়। কার্য্য হইতে পুনরায় জ্ঞানের জন্ম। এই শৃঙ্খলাটী যেমন ঘূর্ণায়মান, ফল হইতে বৃক্ষ, আবার বৃক্ষ হইতে ফলের উৎপত্তিও তদ্রূপ চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান। যাহা হউক, ঈমানের অংশদ্বয়ের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কার্য্যকে জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। আবার 'কোন পদার্থের শ্রেষ্ঠাংশ দ্বারা সেই পদার্থের নামকরণ হয়' এই রীতি অনুসারে 'অনুষ্ঠান কার্য্যকেই ষোল আনা ঈমান' বলিয়া ধরিয়াছেন। আবার, ছবর বিনা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না এই কারণে 'ছবরকেও ষোল আনা ঈমান' বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। অতঃপর দেখান হইয়াছে প্রত্যেক কার্য্য সম্পাদন কালে মানবকে দুই শ্রেণীর বাধা অতিক্রম করিয়া এবং তৎসমুদয়ের আক্রমণ বা উত্তেজনা ছাড়াইয়া ধীর স্থির ও অটল ভাবে চলিতে হয়। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর বাধা, খাহেশ নামক প্রবৃত্তিগুলির আকর্ষণ জনিত এবং অন্য শ্রেণীর বাধা, ক্রোধ ও তদ্বংশীয় প্রবৃত্তিগুলির উত্তেজনা সম্ভূত। এই দুই শ্রেণীর বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক ধৈর্য্যের সহিত কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া চলা অসীম বীরত্ব ও অশেষ বাহাদুরীর কথা। ফল কথা, খাহেশ ও ক্রোধ শ্রেণীভুক্ত প্রবৃত্তির আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া ধীর ও অটল ভাবে কর্ত্তব্য কার্য্য করিবার কালে ছবর ভিন্ন অন্য উপায় নাই। একমাত্র রোজা উক্ত দুই শ্রেণীর প্রবৃত্তির মধ্যে, খাহেশ শ্রেণীর প্রবৃত্তির আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া মনকে অটল রাখে। এই জন্য 'রোজাকে অর্দ্ধেক ছবর' বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

পুনরায় ইমাম সাহেব অন্য প্রকারেও 'ছবরকে ঈমানের অর্দ্ধেক' প্রমাণ করিয়াছেন। তখনও তিনি অনুষ্ঠান কার্য্যকেই ষোল আনা গোটা ঈমান বলিয়া ধরিয়াছেন। অনুষ্ঠান কার্য্যের দুই ভাগ আছে—প্রথম—প্রচলন ও দ্বিতীয়—সমাপ্তি বা ফল। কার্য্যের প্রচলন কেবল ছবরের প্রভাবেই সম্পন্ন হয়। সমাপ্তি বা ফল আসিলে মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দ জন্মে। মুছলমান লোক, কার্য্যের ফল নিজের কৃতিত্ব বা বাহাদুরী জন্য হইয়াছে বলিয়া মনে করেন না—তাঁহারা এই বলিয়া বুঝেন যে করুণাময় বিশ্বপ্রভু কার্য্য-সমাপ্তির সমস্ত উপায়, সুযোগ, উপকরণ, উপাদান দয়া করিয়া দান করিয়াছেন। তৎসমুদয়ের কারণেই কার্য্যের সমাপ্তি ঘটিয়াছে ও ফল হস্তগত হইয়াছে। এইরূপ বিমল আনন্দভোগকে 'শোকর' বা কৃতজ্ঞতা বলে। যাহা হউক, কার্য্য-পরিচালন সময়ে মুছলমানকে 'ছবর' অবলম্বন করিতে হয় এবং ফল হস্তগত হইলে 'শোকর' বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হয়। সুতরাং 'ঈমান অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের এক অর্দ্ধ ছবর ও অন্য অংশ শোকর'।

প্রারম্ভে নীয়ৎ বা সঙ্কল্পটী শুধু আল্লার জন্য বিশুদ্ধ ভাবে মনে জমাইয়া লইতে হয় এবং মন হইতে রিয়া (সাধুতা-প্রদর্শন-প্রবৃত্তি) ধুইয়া ফেলিতে হয়, এই উভয় স্থলেই বিশেষ দৃঢ়তার সহিত ছবর অবলম্বন করা আবশ্যক। সঙ্কল্পের মধ্যে বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য ছবর অবলম্বন করিতে গুরুতর আধ্যাত্মিক বলের প্রয়োজন হয়। এবাদতের মধ্যে অর্থাৎ পরিচালনা কালে নিয়ম ও বিধি রক্ষা করা এবং তন্মধ্যে কিছু মাত্র ক্রটী ঘটিতে না দেওয়া আবশ্যক। এস্থলেও বিশেষ নৈতিক বল ও ছবরের প্রয়োজন। এক নমাজের সম্বন্ধেই চিন্তা করিয়া দেখ,—উহা নির্ব্বাহ-কালে চারি ধারের পদার্থ হইতে দৃষ্টি সংযম করা, এদিক ওদিক না দেখা এবং সর্ব্ববিধ সাংসারিক চিন্তা ও খেয়াল হইতে মন সংযম পূর্ব্বক একমাত্র আল্লার চিন্তায় নিযুক্ত থাকা আবশ্যক। এরূপ প্রত্যেক ব্যাপারেই বিশেষ ছবরের প্রয়োজন। এবাদতের অন্তেও ছবর করিবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে; কেন না, কার্য্য সমাপ্ত হইলে উহা প্রকাশ করিয়া দিয়া, অপরের নিকট হইতে প্রশংসা বা সম্মান আদায় করিয়া লইতে মানব স্বভাবতঃ লোলুপ হয়; সেই লোভ দমন করিতে বিশেষ ছবর ও নৈতিক বলের প্রয়োজন।

(২) পাপ ও পাপের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে কিরূপ কঠিন ছবরের প্রয়োজন হয় একবার ভাবিয়া দেখ। বিনা ছবরে কখনই পাপ পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না; যে ধরণের পাপের প্রতি খাহেশ যত অধিক প্রবল হয় এবং যাহা করিবার কালে পরিশ্রম যত অল্প লাগে, তদ্রূপ পাপ হইতে বিরত থাকা ও ধৈর্য্য ধারণ করা তত কঠিন হইয়া থাকে। মুখের কথা বলিতে পরিশ্রম লাগে না আবার তাহা বলিতে ও শুনিতে বড়ই ভাল লাগে, তজ্জন্য কথার পাপ হইতে বিরত থাকা বড়ই কঠিন। আবার মন্দ কথা শুনিতে ও বলিতে থাকিলে শীঘ্রই অভ্যস্ত হইয়া প্রকৃতিগত হইয়া। দাঁড়ায়। মন্দ কথা শয়তানের সৈন্যগণের মধ্যে প্রধান। এই জন্য মানুষের রসনা, কুকথা ও মিথ্যা বলিবার কালে এবং আত্ম-প্রশংসা ও পরনিন্দার সময়ে বিদ্যুৎ-শক্তি প্রাপ্ত হয়। যেরূপ কথা শুনিলে অপর লোক চমৎকৃত হয় অথবা কাণ লাগাইয়া শুনিতে ভালবাসে তদ্রূপ কথা হইতে বিরত থাকা বিশেষ

কথার পাপ হইতে বিরতি বড়ই কঠিন ছবর

ধৈর্য্য ও ছবরের প্রয়োজন। সচরাচর দেখা যায়—জন-সমাজে বা গোষ্ঠী মজলিসে বসিলে উক্ত প্রকার জন-মন-রঞ্জন বাক্যালাপ হইতে বিরত থাকা ইহা দায় হইয়া পড়ে। 'গল্পী' লোক মজলিছে বসিলে গল্প না করিয়া চুপ থাকিতে পারে না, আবার উপস্থিত লোকেরাও না শুনিয়া ছবর করিতে পারে না। যাহা হউক, নির্জ্জন-বাসের কল্যাণে মানব এ সকল আপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

প্রবৃত্তিবিরুদ্ধ দ্বিতীয় শ্রেণীর পদার্থ সম্পর্কে ছবর—যাহার উৎপত্তির উপর নিজের হাত নাই যেমন অপরের হস্ত ও বাক্য হইতে উৎপন্ন দুঃখ বা কষ্ট—এরূপ দুঃখ কষ্টের উৎপত্তি নিবারণে মানুষের হাত না থাকিলেও উহার প্রতিশোধ লইতে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে। প্রতিশোধ লইবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ না লইয়া ক্ষমা করা বিশেষ বাহাদুরী ও পূর্ণ ছবরের কথা। আবার ক্ষমা না করিয়া প্রতিশোধ লইবার সময়ে নিজের প্রতি যতটুকু দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে ঠিক তত টুকু দুঃখ প্রতিপক্ষকে দেওয়া এবং তদপেক্ষা বেশী দিয়া সীমা লঙ্ঘন না করা পূর্ণ ছবর ও বাহাদুরীর কথা। এক জন ছাহাবা বলিয়াছেন—"অন্যের প্রদত্ত দুঃখ সহ্য করিতে যত দিন আমার ক্ষমতা পূর্ণ ভাবে বিকশিত না হইবে তত দিন আমি ঈমানকে প্রকৃত ঈমান বলিয়া গণ্য করিব না।" এই কারণেই মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ কে সম্বোধন করিয়া মহাপ্রভু আল্লা বলিয়াছেন—

ক্ষমা কিংবা পরিমিত প্রতিশোধ দুইই ছবরের কথা

دَعْ اَذٰهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۝

"তাহাদের প্রদত্ত অত্যাচার গ্রাহ্য করিও না। আল্লার উপর ভরসা কর।" (২২ পারা। সুরা আহ্‌জাব। ৬ রোকু।) আবার অন্যত্র বলিয়াছেন—

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَ اهْجُرْهُمْ

هَجْرًا جَمِيْلًا ۝

"তাহারা যাহা বলিতেছে তাহার উপ ছবর কর এবং সৎভাবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও।" (২৯ পারা। সূরা মোজাম্মেল। ১ রোকু। পুনরায় বলিয়াছেন—

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

"নিশ্চয়ই আমি জানি যে তাহাদের কথায় তোমার হৃদয় বিমর্ষ হইতেছে যাহা হউক, তোমার প্রভুর প্রশংসা সহ তছবীহ্ পড়।" (১৪ পারা। সূরা হেজর। ৬ রোকু।) একদিন মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) গরীব দুঃখীর মধ্যে ধন বিতরণ করিতেছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল যে "এ বিতরণ আল্লার উদ্দেশ্যে হইতেছে না।' অর্থাৎ অবিচারের সহিত বণ্টন হইতেছে। ইহা শুনিয়া হজরৎ নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, তাঁহার প্রশান্ত মুখশ্রী লোহিত বর্ণ ধারণ করিল, অথচ ধৈর্য্যের সহিত দুঃখ মিশ্রিত স্বরে বলিলেন—"আমার ভাই মুছার উপর আল্লার করুণা বর্ষিত হউক! লোকে তাঁহাকে আমা অপেক্ষা অধিক দুঃখ দিয়াছিল, অথচ তিনি সমস্তই প্রশান্ত ভাবে সহ্য করিয়াছেন।" মহাপ্রভু বলিতেছেন—

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ۝ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ ۝

"এবং কাহার প্রতি দুঃখ দিতে যদি তোমরা (ধর্ম্মের অনুরোধে) বাধ্য হও তবে তাহারা যেরূপ দুঃখ দিয়াছে ঠিক তদনুরূপ দুঃখ তোমরাও দেও; কিন্তু যদি ছবর করিতে পার তবে নিশ্চয়ই ছবরকারীর পক্ষে বহু মঙ্গল আছে।" (১৪ পারা। সূরা নহল। ১৬ রোকু।) ইন্জীল অর্থাৎ বাইবেল গ্রন্থে মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী (আঃ) এর একটী উপদেশ এরূপ লিখা আছে যে তিনি বলিয়াছেন—

পরিমিত প্রতিশোধ সিদ্ধ কিন্তু ছবরই উত্তম এবং অনিষ্ঠকারীর ইষ্টসাধন আরও উত্তম

"যে সকল পয়গম্বর আমার পূর্ব্বে আসিয়াছেন তাঁহারা বলিয়াছেন—

'হস্তের পরিবর্ত্তে (শত্রুর) হস্ত কাটিয়া ফেল; চক্ষুর বদলে চক্ষু নষ্ট কর; দন্তের বিনিময়ে দন্ত ভাঙ্গিয়া দাও, 'আমি কিন্তু তাঁহাদের এ বিধান রদ করিতেছি না—আমি কেবল তোমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছি যে, অনিষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট করিও না বরং এক ব্যক্তি তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারিলে তুমি বাম গাল ফিরাইয়া দিয়া বল—'ভাই! এ গালেও একটী চড় লাগাইয়া দাও।' কেহ তোমার পাগড়ীটী কাড়িয়া লইলে তাহাকে তোমার পিরাহানটীও খুলিয়া দাও। কেহ তোমাকে বেগার ধরিয়া তোমার দ্বারা এক মাইল পর্য্যন্ত ভার বহাইয়া লইলে তুমি তাহার সঙ্গে দুই মাইল পর্য্যন্ত যাও।" মহাপুরুষ হজরৎ রছুল (ﷺ) বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাহাকে কিছু নজর দাও। যে তোমার অনিষ্ট করে তুমি তাহার মঙ্গল কর।" এরূপ ছবর ছিদ্দীক লোক ভিন্ন অন্যে করিতে পারে না।"

প্রবৃত্তিবিরুদ্ধ তৃতীয় শ্রেণীর পদার্থ সম্পর্কে ছবর—এরূপ পদার্থ পরিহার করিতে মানুষের ক্ষমতা নাই যথা—দৈব বিপদ আপদ। ইহার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কোন স্থানেই তৎপ্রতিবিধানের ক্ষমতা মানুষের হাতে নাই। যথা—সন্তান সন্ততির মৃত্যু; ধনের বিনাশ; চক্ষু, হস্ত, পদাদি অঙ্গের ক্ষতি; তদ্‌ব্যতীত আরও নানাবিধ ছোট বড় বিপদ আপদে ছবর ভিন্ন অন্য কোন গতি নাই। এই জন্য এবম্বিধ দৈব বিপদে ছবর করিলে যত পুণ্য ও যত মঙ্গল পাওয়া যায় অন্য কোন ছবরে তত পাওয়া যায় না।

দৈব বিপদে ছবর

মহাত্মা এব্‌নে আব্বাছ বলিয়াছেন—"কোর্‌আন শরীফে তিন প্রকার ছবরের সংবাদ আছে,—প্রথম, এবাদতের অন্তর্গত ছবর; তাহার পুণ্য তিন শত প্রকার। দ্বিতীয়—হারাম পরিত্যাগের অন্তর্গত ছবর; উহার পুণ্য ছয় শত প্রকার। তৃতীয়—দৈব বিপদে ছবর; ইহার পুণ্য নয় শত প্রকার।" পাঠক! জানিয়া রাখ—বিপদে ছবর করা ছিদ্দীকগণের কার্য্য। ছিদ্দীক লোক ভিন্ন অন্য কেহই বিপদে নির্ব্বিকার ও অটল থাকিতে পারে না। এই কারণেই মহাপুরুষ হজরৎ রছুল (ﷺ) আল্লার স্থানে প্রার্থনা করিয়া বলিতেন—"হে আমার আল্লা! আমাদিগকে এমন অটল বিশ্বাস (ইয়াকীন) দান কর যেন সাংসারিক বিপদ আমাদের উপর সহজ হইয়া যায়।" তিনি সুসমাচার দিয়াছেন যে—"করুণাময় বলিতেছেন—'আমি

কিন্তু চীৎকার করিয়া কাঁদিলে বা পরিধান বস্ত্র ছিন্ন করিলে এবং অধিক দুঃখ প্রকাশ করিলে ছবরের পুণ্য নষ্ট হইয়া যায়। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) এর প্রিয় পুত্র মহাত্মা এব্রাহীম প্রাণত্যাগ করিলে হজরৎ অশ্রু মোচন করিতে ছিলেন, তদ্দর্শনে ছাহাবাগণ নিবেদন করিয়াছিলেন,—"হে রসুলুল্লা! আপনি তো ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।" হজরৎ বলিয়াছিলেন—"এ রোদন, সশব্দে ক্রন্দন নহে; ইহা রহম অর্থাৎ স্নেহের চিহ্ন। যে ব্যক্তি রহীম অর্থাৎ স্নেহশীল, আল্লাও তাহাকে স্নেহ করিয়া থাকেন।" জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—"কাহারও উপর বিপদ পড়িলে, বাহ্য আকার দর্শনে যদি তাহাকে দুঃখিত বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী লোক হইতে চিনিতে পারা না যায়, তবে তাহার সেই ছবরকে جميل জমীল অর্থাৎ 'পূর্ণ' বা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ছবর বলা যায়।" যাহা হউক, শোক দুঃখে পড়িয়া পরিধান বস্ত্র ছিন্ন করা, মুখে বা বক্ষে চাপড় মারা, চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করা, এ সব হারাম।

শোক দুঃখে উদ্বিগ্ন বিমর্ষ হওয়া বা নীরবে রোদন করা ক্ষতি জনক নহে

এমন কি শোক প্রকাশের জন্য শরীরের কোন বাহ্য অবস্থা পরিবর্ত্তন করাও উচিৎ নহে; যথা—চাদর দ্বারা মুখ ঢাকিয়া রাখা, পাগড়ী ছোট করা; (নীল বা কৃষ্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করা, জুতা পরিত্যাগ করা, মস্তক উলঙ্গ করা ইত্যাদি)। এ বিষয়ে ইহা জানিয়া রাখা উচিৎ যে, সৃষ্টি কর্ত্তা আল্লা তোমাদের প্রতীক্ষা না করিয়া নিজের অভিপ্রায়ে যাহাকে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন বা তুলিয়া লন। এমন অবস্থায় আল্লার কার্য্যে দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। এ সম্বন্ধে মহাত্মা আবু তাল্হার জ্ঞানবতী পত্নী রমীজা উম্মে ছলীমের আত্ম-বর্ণনা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছেন—"আমার

শোক দুঃখে যে আচরণ হারাম ও যে আচরণ অনুচিত

"স্বামী, পীড়িত পুত্র ঘরে রাখিয়া কোন গুরুতর কার্য্যে বাহিরে গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে আল্লার বিধানে আমাদের সে পুত্রটী মারা যায়। আমি মৃত পুত্রকে চাদরে ঢাকিয়া রাখিয়াছি, এমন সময়ে তিনি গৃহে আসিয়া পুত্রের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সংক্ষেপে বলিলাম—'অন্য দিন অপেক্ষা অদ্য আরামে আছে।' পরে আমি আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া স্বামীর সম্মুখে স্থাপন করিলাম। তিনি আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক বিশ্রামার্থ

প্রিয়জন বিয়োগে আদর্শ আচরণ

শয়ন করিলেন। আমি নিজ শরীর অন্যান্য রজনী অপেক্ষা সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইয়া স্বামীর পার্শ্বে গিয়াছিলাম, তিনিও আমাকে লইয়া আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন। পরিশেষে আমি বলিয়াছিলাম— 'আমি কোন প্রতিবেশীকে একটী সুন্দর দ্রব্য ধার দিয়াছিলাম। যখন আমি তাহা ফেরৎ চাহিয়াছিলাম, তখন সেই প্রতিবেশী শোক দুঃখে রোদন করিতে লাগিল!' আমার স্বামী বলিলেন —'এ বড় অন্যায় কথা! বোধ হয় সে প্রতিবেশী নিতান্তই আহাম্মক।' তখন আমি বলিলাম,—'আল্লা একটী শিশুকে আমাদের হস্তে গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, এখন তিনি সেই শিশুটী ফেরৎ লইয়াছেন।' ইহা শুনিয়া আমার স্বামী বলিলেন—

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ .

"নিশ্চয় (সমস্তই) আল্লার এবং আল্লার দিকে সকলকেই যাইতে হইবে।' (২ পারা। সুরা বকর। ১৯ রোকু।) প্রাতে আমার স্বামী মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) এর সমীপে গিয়া রজনীর সমস্ত কথা নিবেদন করেন। হজরৎ বলিয়াছিলেন—গত রজনী তোমাদের পক্ষে বড় মঙ্গলদায়ক শুভ রজনী ছিল।' পরিশেষে বলিয়াছিলেন—'আমি বেহেশ্ৎ-দর্শন কালে আবু তাল্‌হার পত্নী রমীজাকে তথায় দেখিতে পাইয়াছিলাম।'" (টী: ২৮০)

পাঠক! এ পর্য্যন্ত যাহা বলা গেল, তাহাতে ইহা একরূপ বুঝিতে পারিয়াছ যে, বিনা ছবরে ইহ সংসারে মানুষ কখনও কোন কাজ করিতে পারে না।

শূণ্যচিন্তারূপ অন্তরায় হইতে নিষ্কৃতির উপায়—কোন ব্যক্তি যদি সর্ব্ববিধ অভিলাষ ও কামনার অধিকার অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়া থাকে এবং নির্জ্জনবাস অবলম্বন পূর্ব্বক সংযম বিষয়ে প্রচুর অভ্যাস ও ক্ষমতা জন্মাইয়া লইতে পারে, তথাপি শত শত শূন্য-চিন্তা ও অমূলক খেয়াল তাহার মনে উৎপন্ন হইয়া আল্লার চিন্তা ভুলাইয়া দিতে পারে। তদ্রূপ চিন্তা, বিধি সঙ্গত বিষয় লইয়া হইলেও মানব জীবনের পুঁজী স্বরূপ পরমায়ুর কিয়দংশ অবশ্যই বৃথা অপচিত হইয়া

টীকা—২৮০। এই পরিচ্ছেদের সর্ব্বশেষ প্যারার পূর্ব্ববর্ত্তী প্যারা দ্রষ্টব্য।

যায়। তদ্রূপ অপচয়কে মহা ক্ষতি বলিতে হইবে। এ ক্ষতি হইতে বাঁচিবার নিমিত্ত মানবকে আল্লার স্মরণে ও জেকের ফেকেরে মগ্ন হওয়া আবশ্যক। নমাজের মধ্যেও ঐরূপ দিগ্‌দিগন্তরের শূন্যচিন্তা মনে প্রবেশ করিলে, এই প্রকার তদ্‌বীরই বিশেষ যত্নের সহিত করিতে হয়। শূন্যচিন্তা ও খেয়াল হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য মানুষকে এমন বিষয় বা ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হয়, যাহা মনকে তদ্রূপ চিন্তার দিক হইতে টানিয়া লইতে পারে। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে "সদ্‌ভাব-চিন্তা-বিহীন নিষ্কর্ম্মা যুবককে শত্রু বলিয়া আল্লা জানেন।" ইহা এই উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে, যে যুবক সচ্ছল ভাবে নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় বসিয়া থাকে, দিগ্‌দিগন্তরের হাজার হাজার শূন্যচিন্তা ও খেয়াল আসিয়া তাহার মনের মধ্যে ঘর বানাইয়া লয় এবং শয়তানও তাহার পাশে সুযোগের প্রতীক্ষায় ডাকু লাগাইয়া বসিয়া যায়। এবম্বিধ আপদ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত আল্লার স্মরণে নিযুক্ত হওয়া উচিত। আল্লার স্মরণ এবং জেকের ফেকের দ্বারাও উহা দূর করিতে না পারিলে অবিলম্বে কোন শিল্প বা পেশা বা চাকুরী অবলম্বন করা উচিত। এইরূপ তদ্‌বীরে শূন্যচিন্তা ও খেয়াল মন হইতে দূর হইতে পারে। যে সকল ব্যক্তি মানসিক উন্নতি—কর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে অক্ষম তাহাদিগের পক্ষে নির্জ্জনবাস অবলম্বন করা উচিত নহে, বরং তদ্রূপ লোককে শরীর খাটাইয়া সৎকার্য্য করা কর্ত্তব্য।

ছবর করিবার শক্তি বৃদ্ধির ঔষধ। পাঠক! জানিয়া রাখ, ছবর একটী বিষয় অবলম্বনে ঘটে না বরং বহু বিষয়ে ছবর করিতে হয়। প্রত্যেক বিষয়ে ছবরের জন্য নূতন নূতন সময় আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার তন্মধ্যে নব নব কাঠিন্য দেখা যায়। সেই সমস্ত কাঠিন্য দূর করিবার তদ্‌বীর এবং ছবরের শক্তি বৃদ্ধি করিবার ঔষধও পৃথক্ পৃথক্ আছে, তথাপি জ্ঞান ও অনুষ্ঠান-মূলক ঔষধ সকল অবস্থায় ব্যবহার করিতে পারিলে সুফল হস্তগত হইতে পারে। ধ্বংসকর দোষ সংশোধন জন্য 'বিনাশন পুস্তকে' যে সকল উপায় লিখা গিয়াছে, তৎসমুদয়ই ছবরের বল বৃদ্ধির ঔষধ। এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ তদ্রূপ ঔষধের **একটী ব্যবস্থা-পত্র** লিখিয়া দেওয়া যাইতেছে। ইহাকে আদর্শ নমুনা স্বরূপ সম্মুখে রাখিয়া বিশেষ বিশেষ ঘটনায় ও কার্য্যে আবশ্যক মত ইহার অনুরূপ ঔষধ বিরচনা পূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়া লইবে। পাঠক! স্মরণ কর—আমরা

ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ধর্ম্মজ্ঞানের যুদ্ধ বাধিলে যদি ধর্ম্মজ্ঞান অটল ভাবে স্বীয় অবস্থার উপর দণ্ডায়মান থাকিতে পারে, তবে তাহাকে ছবর বলে। উক্ত দুই প্রকার মনোভাবের মধ্যে যুদ্ধ বাধাইয়া দিয়া যে ব্যক্তি একটীকে জিতাইয়া দিবার ইচ্ছা করে, তাহার উচিত যে, যাহাকে বিজয়ী বানাইবার ইচ্ছা থাকে—তাহাকে বল ও সাহায্য দ্বারা বলবান করা এবং যাহাকে হারাইয়া দিবার ইচ্ছা থাকে, তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া দেওয়া এবং তাহার সাহায্য প্রাপ্তির পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

কুপ্রবৃত্তিকে দুর্ব্বল ও বশীভূত করিবার উপায়। সর্ব্ববিধ প্রবৃত্তিকে উচ্ছৃঙ্খল পশুর সহিত তুলনা করা যায়। উহাকে বশীভূত করিতে হইলে (১) উহার আহার—দানা—চারা কমাইয়া দিতে হয়; (২) অথবা তাহার দৃষ্টি হইতে 'দানা বা চারা' একেবারে দূরে সরাইয়া দিতে হয়; (৩) অথবা নির্দ্দিষ্ট আহার দানে তাহাকে শান্ত করিতে হয়। প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিতেও এই তিন প্রকার ঔষধের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এ পর্য্যন্ত উপরে প্রবৃত্তিগুলিকে দুর্ব্বল ও বশীভূত করিবার উপায় লেখা গেল। (টীঃ ২৮১) এখন উদাহরণ স্বরূপ কামপ্রবৃত্তির বিষয় চিন্তা কর। যাহার অন্তরে কামভাব প্রবল ভাবে উদবেলিত হইয়া উঠে সে কিছুতেই নিরস্ত হইতে পারে না। যদিও বা কোন কারণে প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া হইতে ক্ষান্ত থাকিতে পারে, তথাপি সে ব্যক্তি স্বীয় চক্ষুকে কুদৃষ্টি হইতে এবং অন্তরকে "সেই খেয়াল হইতে বাঁচাইতে পারে না। তেমন স্থলে জ্ঞান-মূলক "নিবৃত্তি" পরাস্ত হইয়া যায়। কিন্তু নিবৃত্তিকে তাহার স্বাভাবিক অবস্থার উপর ধৈর্য্যের সহিত অটল রাখিবার ইচ্ছা থাকিলে কামভাবের মূল কারণগুলিকে দুর্ব্বল করা উচিত। কাম রিপুর মূল কারণগুলিকে দুর্ব্বল করিবার তিনটী উপায় আছে। **প্রথম** উপায় এই, যদি বুঝা যায় যে, উপাদেয় খাদ্য হইতে কামভাব বল প্রাপ্ত হইতেছে, তবে সে পথটী বন্ধ করিয়া দিবে; তজ্জন্য দিবসে রোজা রাখিয়া রজনীতে অল্প পরিমাণ শুষ্ক রুটী আহার করিবে। মাংস বা অন্য কোন পুষ্টিকর খাদ্য কখনই আহার করিবে না। **দ্বিতীয়** উপায়—যে সকল কারণ উপকরণে

কাম রিপুর মূল দুর্ব্বল করিবার ত্রিবিধ উপায়

টীকা—২৮১। এই টীকা চিহ্ন পর্য্যন্ত প্যারার প্রথম অংশটী মূলগ্রন্থে এই প্যারার শেষে ছিল। সুশৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা হইল।

কামাগ্নি অন্তরে জলিয়া উঠিতে পারে, তাহা হইতে দূরে পলায়ন করিবে। মনমোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে যদি এই অগ্নি জ্বলিয়া উঠে, তবে নির্জ্জনবাস অবলম্বন করিবে। নিষিদ্ধ-দর্শন হইতে স্বীয় চক্ষুকে ফিরাইয়া লইবে। যে স্থানে যুবক যুবতীর সমাগম হয়, তথায় ক্ষণ কালও দাঁড়ান উচিত নহে। **তৃতীয়** উপায়—বিধি-সঙ্গত কার্য্যে কাম রিপুকে চরিতার্থ করিবে; তদ্রূপ করিতে পারিলে হারামের আপদে পড়িতে হইবে না। বিধি-সঙ্গত বিবাহ করিলে কাম রিপু চরিতার্থ ও ঠাণ্ডা হইয়া থাকে। অধিকাংশ নর নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হইলে হারাম কাম রিপু হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না।

ধর্ম্মজ্ঞান বা ধর্ম্মভাবকে বলবান করিবার উপায় এখন লেখা যাইতেছে। এ সম্বন্ধে **দুইটী** উপায় আছে। **প্রথম** উপায় এই যে, প্রবৃত্তির সহিত লড়াই করিলে যে কল্যাণ ও উপকার পাওয়া যায়, তাহার মিষ্ট আস্বাদ মনকে চাখাইয়া দিতে হয় এবং প্রবৃত্তির প্রলোভন ও আকর্ষণের বিরুদ্ধে ছবর করিলে যে পুণ্য পাওয়া যায় তাহার বর্ণনা, যে সকল হদীছ বচনে উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ ও মর্ম্ম সুন্দর মত বুঝিয়া লইতে হয়। এবম্বিধ উপায়ে নিম্নবর্ণিত প্রকারের বিশ্বাস জ্ঞানটী বলবান হইয়া উঠিতে পারে যথা—প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইলে যে আরাম ও সুখ পাওয়া যায়, তাহা ক্ষণস্থায়ী—কিন্তু প্রবৃত্তির প্রলোভনে ছবর করিতে পারিলে চিরস্থায়ী রাজত্বের অধিকারী হইতে পারা যায়। এই প্রকার বিশ্বাস-জ্ঞান যে পরিমাণে পুষ্ট ও বলবান হইবে, ধর্ম্মজ্ঞান বা ধর্ম্ম ভাবও তদনুরূপ বলবান হইবে। ধর্ম্মজ্ঞানকে বলবান করিবার **দ্বিতীয়** উপায় এই যে, তাহাকে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত ও শিক্ষিত করা উচিত। তাহাতে ধর্ম্মজ্ঞান ক্রমে ক্রমে সাহসী ও বলবান হইতে পারে। দেখ, যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে বল উপার্জ্জন করিবার ইচ্ছা রাখে, তাহাকে অন্যের সহিত কুশ্‌তী লড়া ও ব্যায়াম চর্চ্চা করা আবশ্যক। প্রথমে দুর্ব্বল লোকের সহিত কুশ্‌তী লড়িয়া জয়ী হইলে এবং সামান্য বলসাধ্য কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইলে ক্রমশঃ বলবান হইতে বলবানতর লোকের সহিত কুশ্‌তী লড়িতে এবং কঠিন হইতে কঠিনতর কার্য্যে হাত দিতে সাহস বাড়ে। ভাগ্য-ক্রমে তৎ তৎ বিষয়ে জয়ী ও কৃতকার্য্য হইলে ক্রমে এমন বল ও সাহস

বাড়িয়া যায় যে, পরিশেষে বড় বড় বীর পুরুষকে পাছড়াইতে পারে এবং অসীম শ্রমসাধ্য কার্য্যও অক্লেশে সমাধা করিবার ক্ষমতা জন্মে। এই কারণেই কঠিন হইতে কঠিনতর কার্য্য করিবার অভ্যাস করিলে ক্ষমতাও ক্রমে বাড়িয়া যায়, ছবরের সম্বন্ধেও এই নিয়ম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে ছবর করিয়া চলিলে ক্রমে গুরুতর কার্য্যে ছবর করিবার ক্ষমতা বাড়িয়া যায়।

কৃতজ্ঞতার কল্যাণ ও তৎসম্বন্ধে কোরআন, হদীছ ও মহাজন উক্তি—পাঠক। জানিয়া রাখ, 'শোকর' (কৃতজ্ঞতা-জ্ঞান) টী হৃদয়ের একটী উন্নততম অবস্থা। ইহার কল্যাণ অতীব মহৎ। যে সে ব্যক্তি সেই উন্নত সোপানে আরোহণ করিতে পারে না। এই জন্য আল্লা বলিতেছেন—

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

"আমার দাসগণের মধ্যে অতি অল্প লোকই শোকর করে।" (২২ পারা। সূরা ছাবা। ২ রোকু।) শয়তানও আল্লার সম্মুখে মানুষের নিন্দা করিয়া বলিয়াছিল—

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝

"(হে আল্লা!) তাহাদের (মানুষের) অধিকাংশকে তুমি 'শাকের' (কৃতজ্ঞ) পাইবে না।" (৮ পারা। সূরা এরাফ। ২ রোকু।) * * * * (টীঃ ২৮২) কৃতজ্ঞতা গুণটী মানবের চির সহচর। ইহা মৃত্যুর পরেও আত্মার সহিত থাকিবে। স্বয়ং আল্লাও বলিতেছেন—

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

"সমস্ত প্রশংসা (অর্থাৎ ধন্যবাদ) আল্লার জন্য; এই বচনই তাহাদের শেষ বচন হইবে।" (১১ পারা। সূরা ইয়ুনুছ। ১ রোকু।) শোকর (কৃতজ্ঞতা) সম্বন্ধে কথাগুলি গ্রন্থের শেষ ভাগে লিখা উচিত ছিল, কিন্তু ছবরের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় এই স্থানেই লিখা গেল। 'শোকর বা

টীকা—২৮২। পারিত্রাণ পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম পারা মূল গ্রন্থে এই তারকা চিহ্নিত স্থানে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ২৬৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

কৃতজ্ঞতা যে অতীব উন্নত গুণ তাহার প্রমাণ এই যে, মহাপ্রভু স্বীয় 'জেকের' অর্থাৎ স্মরণের সহিত একত্র করিয়া ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন—

فَاذْكُرُونِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ
وَلَا تَكْفُرُوْنِ ۝

"যাহা হউক, আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাকে স্মরণ করিব এবং আমার শোকর কর—কিন্তু অকৃতজ্ঞ হইও না।" (২ পারা ; সূরা বকর। ১৮ রোকু।) মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি আহার করিবার পর কৃতজ্ঞ-মনে আল্লাকে ধন্যবাদ দেন, আল্লার নিকট তাহার মর্য্যাদা রোজাদার ও ছবরকারীদের মর্য্যাদার সমতুল।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"কেয়ামতের দিন—'ধন্যবাদকারী লোক গাত্রোত্থান করুক' এই বাণী উচ্চারিত হইলে যাহারা প্রত্যেক অবস্থায় আল্লার শোকর করে, কেবল তাহারাই দণ্ডায়মান হইবে।" যে সময়ে আবশ্যকের অতিরিক্ত ধন সঞ্চয়ে নিষেধ করিয়া আল্লা এই আদেশ প্রেরণ করেন—

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ۝

"যাহারা সোনা রূপা জমা করে, অথচ আল্লার পথে তাহা খরচ করে না, তাহাদিগকে বিষম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও"—(১০ পারা। সূরা তওবা। ৫ রোকু।) তখন মহাত্মা ওমর মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ এর সমীপে নিবেদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'হে রসুলুল্লা! তবে আমরা কোন ধন্ রাখিব ?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"জেকের-কারিণী রসনা, শোকর-কারী মন ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসিনী পত্নী। এই তিন বস্তু ইহ-

সংসারে মহামূল্য ধন। তোমরা ইহা সঞ্চয় করিয়া সন্তুষ্ট থাক।” ধর্ম্মবিশ্বাসিনী পত্নী, আল্লার স্মরণে ও কৃতজ্ঞতার কার্য্যে পুরুষকে সাহায্য করিয়া থাকে। মহাত্মা এব্‌নে মছ্‌উদ বলিয়াছেন—“শোকর ঈমানের অর্দ্ধেক।” মহাত্মা আতাম বলিয়াছেন—“মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) এর অলৌকিক অবস্থার কিছু বিবরণ শুনিবার মানসে আমি একদা মোমেন মাতা মহামান্যা বিবী আয়শা ছিদ্দীকার সমীপে গিয়াছিলাম। স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে তিনি রোদন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন —“মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) এর সমস্ত কার্য্যই অলৌকিক।” রোদনবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিয়াছিলেন “এক রজনীতে তিনি আমার সঙ্গে শয়ন করিবার মানসে আমার গৃহে আসিয়া এক শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার পবিত্র দেহ আমার শরীরের সহিত সংলগ্ন হইলে আমি অপার আনন্দ ও আরাম অনুভব করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে তিনি সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বলিলেন—‘অয়ি আয়শা! আমি আল্লার এবাদতে যাইতেছি।’ আমি নিবেদন করিলাম—‘হে রসুলুল্লা! আপনার পবিত্র সংসর্গে আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত করি—ইহা আমার প্রবল ইচ্ছা, তথাপি আল্লার কার্য্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিতেছি— বিছ্‌মেল্লা আপনি গমন করুন।’ তিনি উঠিয়া মোশক হইতে পানীয় জল লইয়া ধীরে ধীরে ওজু করিলেন। ওজুর অবশিষ্ট জল ক্রমে ক্রমে ভূপৃষ্ঠে ঢালিয়া দিলেন, পরে নমাজ পড়িতে দাঁড়াইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রোদন করিতে লাগিলেন। সমস্ত রজনী এই ভাবে কাটিয়া গেল। ফজরের নমাজের সময়ে হজরৎ বেলাল আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইলেন এবং নমাজের জন্য বাহিরে যাইতে অনুরোধ করিলেন। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—‘হে রসুলুল্লা! আপনি নিষ্পাপ—মহাপ্রভু আপনার সমস্ত ত্রুটী ক্ষমা করিয়াছেন তবে কেন আপনি রোদন করিতেছেন?’ তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—‘দেখ আয়শা, বিশ্ব জগতের সর্ব্বত্র—প্রত্যেক অণু পরমাণু—আল্লার অপার অনুগ্রহে ভরপূর হইয়া রহিয়াছে, ইহা দর্শন করিয়া আমি রোদন না করিয়া তিষ্ঠিতে পারিতেছি না। এ অবস্থায় রোদন না করিলে আমি আল্লার কৃতজ্ঞ দাসগণের শ্রেণীতে স্থান পাইব না। আমার উপর নিম্নলিখিত যে আয়াৎ অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া আমি রোদন না করিয়া কেমনে থাকিতে পারি?’

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ
الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ٥
الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا
وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ

'নিশ্চয়—গগনমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির মধ্যে এবং দিবা রাত্রির পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকের জন্য উজ্জ্বল চিহ্ন বিদ্যমান আছে। তাহারা দাঁড়াইয়াই হউক, বা বসিয়া থাকিয়াই হউক বা শয়ন করিয়াই হউক, আল্লার বিষয়ে স্মরণ করিয়া থাকে।'" (৪ পারা। সুরা আল এমরান। ২০ রোকু।) যাহারা প্রত্যেক অবস্থায় আল্লার কার্য্যে ও গুণ স্মরণে নিমগ্ন থাকে এবং বিশ্ব-জগতের প্রত্যেক পদার্থের অন্তর্গত আশ্চর্য্য ক্রিয়া-কৌশল পর্য্যবেক্ষণ করে তাহারাই বুদ্ধিমান। তদ্রূপ কার্য্যে, সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি অপার ভক্তি, অন্তর মধ্যে উথলিয়া উঠে এবং আপনা আপনি রোদন আসে। সে রোদন আনন্দের আবেগে উদয় হয়—ভয়ের জন্য হয় না। কথিত আছে কোন এক পয়গম্বর একটা ক্ষুদ্র প্রস্তরের ধার দিয়া যাইবার কালে দেখিয়াছিলেন যে, তাহা হইতে প্রভূত পরিমাণে জল বাহির হইতেছে। তদ্দর্শনে তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। তখন সৃষ্টিকর্ত্তা প্রস্তরকে কথন-শক্তি দান করেন। তাহাতে সে বলিয়াছিল —"যে দিন হইতে আমি শুনিয়াছি—

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

(১ পারা। সুরা বকর। ৩ রোকু।) 'মনুষ্য ও প্রস্তর দোজখের ইন্ধন হইবে' সেই দিন হইতে আমি ভীত হইয়া এইরূপ রোদন করিতেছি।" ইহা শুনিয়া পয়গম্বর ছাহেব আল্লার দরবারে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—'হে করুণাময়! ইহার ভয় দূর কর।' আল্লা তাঁহার প্রার্থনা মত প্রস্তরের মন হইতে

ভয় দূর

ভয় দূর করিয়া দেন। কিছু দিন পরে ঐ পয়গম্বর সেই প্রস্তরের নিকট দিয়া যাইবার কালে পুনরায় দেখিয়াছিলেন প্রস্তর-খণ্ড হইতে জল ঝরিতেছে। তখন তিনি প্রস্তরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'এখন তুমি কেন রোদন করিতেছ?' প্রস্তর-খণ্ড বলিয়াছিল—'পূর্ব্বে ভয়ে রোদন করিতেছিলাম এখন কৃতজ্ঞতার আবেগে রোদন করিতেছি।' মনুষ্য হৃদয়ও এইরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু হায়! মানবহৃদয় প্রস্তর অপেক্ষাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ভয়ে ও আনন্দে রোদন করিলে মানব-হৃদয় কোমল হইতে পারে।

কৃতজ্ঞতার চিহ্ন বা পরিচয়। পাঠক! স্মরণ কর, ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ধর্ম্মভাবের উন্নতি ও বিকাশের তিনটী ক্রম বা পর্য্যায় আছে যথা—'এলেম' বা জ্ঞান, 'হাল' বা অবস্থা ও 'আমল্' বা অনুষ্ঠান। তন্মধ্যে জ্ঞানকে মূল কারণ বলা যায়। মনের মধ্যে জ্ঞানের উদয় হইলে অন্তর-রাজ্যে এক নূতন অবস্থা বা ভাবের আবির্ভাব হয়। সেই ভাব মনকে সৎকার্য্য করিতে প্রেরণা করে। সর্ব্ববিধ সুখ সম্পদ, আল্লার অনুগ্রহ হইতে পাওয়া গিয়াছে, এই জ্ঞান বা বুঝকে কৃতজ্ঞতার মূল জ্ঞান বলা যায়। উক্ত সুখ সম্পদের অনুভূতি হইতে হৃদয়ে যে আনন্দ জন্মে তাহাই হৃদয়ের অবস্থান্তর ঘটাইয়া দেয়। তাহার পর, করুণাময় যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উক্ত সম্পদ দিয়াছেন তাহা ঠিক ঠিক সেই কার্য্যে খরচ করিলে অনুষ্ঠান কার্য্য করা হয়। অনুষ্ঠান কার্য্য, মানবের অন্তর, রসনা ও অন্য পদাদি শরীরের সহিত সম্পর্ক রাখে। যাহা হউক, কৃতজ্ঞতার প্রকৃত পরিচয় পাইতে হইলে প্রথমে (১) কৃতজ্ঞতা সম্বন্ধীয় জ্ঞান, (২) মনের অবস্থা, ও (৩) অনুষ্ঠান, এই তিনটীর ধরণ করণ ও পরিচয় সুন্দর মত বুঝিতে পারা দরকার। (নিম্নে এ সম্বন্ধে ধারাবাহিক লেখা যাইতেছে।)

(১) কৃতজ্ঞতা মূলক জ্ঞানের পরিচয়—কৃতজ্ঞতা মূলক জ্ঞানটী কি প্রকার প্রথমে তাহা একে একে বুঝিয়া লও। ১। যে সম্পদ তুমি পাইয়াছ, তাহা স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা তোমাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দিয়াছেন —অন্য কেহই দেয় নাই বা সে দান ব্যাপারে অন্য কেহ তাঁহার অংশীও ছিল না, এই প্রকার বুঝ সমঝকে সেই জ্ঞান বলে। কোন মধ্যবর্ত্তী কারণে বা ঘটনায় কিছু পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিলে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞান বিকশিত হয় নাই বলিয়া বুঝিবে। রাজা তোমাকে কিছু

দান করিলেন; সে দানের মধ্যে মন্ত্রীর দয়াও কিছু অনুভব হইলে কেবল রাজার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে পারা যাইবে না—সে কৃতজ্ঞতা রাজা ও মন্ত্রীর মধ্যে ভাগাভাগী হইয়া পড়িবে। রাজার দানলব্ধ আনন্দ কেবল রাজার দয়ার জন্য হওয়া উচিত। তবে ঐ দান পাইয়া যদি এ কথাটিও দৃঢ় ভাবে বুঝিতে পার যে, দানটী বাস্তবিক রাজার আদেশেই পাওয়া গিয়াছে—তাঁহার আদেশ কলম কাগজের উপর দিয়া চলিয়া আসিয়াছে তবে তদ্রূপ বিবেচনায় কৃতজ্ঞতার কোন ক্ষতি হইবে না। তাহার কারণ এই যে, সে স্থলে তুমি ইহা সুন্দর মত বুঝিতে পারিয়াছ যে, কাগজ কলমের কোন ক্ষমতা নাই—উহারা অধীন ও পরিচালিত পদার্থ; দানের মধ্যে উহাদের কিছু মাত্র অধিকার নাই। এইরূপ যদি বুঝা যায় যে, রাজার আদেশ ক্রমে মন্ত্রী বা খাজাঞ্চীর হাত হইতে দান পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও কৃতজ্ঞতার কোন ক্ষতি হইবে না। এ স্থলেও মন্ত্রী বা খাজাঞ্চীর কোন স্বাধীন ক্ষমতা নাই; তাহারাও কাগজ কলমের ন্যায় রাজার আজ্ঞাধীন। রাজা আদেশ দিলে লঙ্ঘন করিবারও তাহাদের ক্ষমতা নাই এবং আদেশ না দিলে একটী কপর্দ্দকও দান করিতে পারে না। ঠিক এইরূপ, তোমরা যে সকল খাদ্য সামগ্রী পাইয়া থাক তৎসমুদয় মেঘের বারিধারা হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। বৃষ্টির জলে নদীর উৎপত্তি হয়, নদীপথে নৌকা-যোগে বাণিজ্য কার্য্য চলে। অনুকূল বাতাসে নৌকা নিরাপদে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়। এরূপ স্থলে মেঘ ও বায়ুকে যদি তোমরা কৃষি ও বাণিজ্যের কারণ মনে করিয়া আনন্দিত হও তবে তোমাদের কৃতজ্ঞতা সঙ্গত হইবে না; কিন্তু মেঘ, বৃষ্টি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদি লেখকের হস্তস্থিত কলমের ন্যায় বিশ্বপতি আল্লার হস্তে পরিচালিত হইয়া কাজ করিতেছে। কলম যেমন নিজে কিছুই করিতে পারে না, ঐ সকল পদার্থও তদ্রূপ কিছু করিতে পারে না। যদি এইরূপ বুঝিয়া লও তবে কৃতজ্ঞতার কোন ক্ষতি হইবে না।

২। অন্যের হাত হইতে কোন বস্তু পাইয়া তাহাকেই দাতা বলিয়া জানিলে এবং তাহার উপর কৃতজ্ঞ হইলে তুমি মহা ভ্রমে পতিত হইবে এবং প্রকৃত কৃতজ্ঞতার উচ্চ কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইবে। অন্যের স্থানে কোন দ্রব্য পাইলে বরং এই মনে করিবে যে, বিশ্বনিয়ন্তা মহাপ্রভু সেই ব্যক্তির মনের উপর একটী প্রবল দণ্ডধারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন;

সে উহাকে দণ্ড তাড়নার বাধ্য করিয়া সেই বস্তু তোমাকে দেওয়াইয়া দিয়াছে। সে ব্যক্তি প্রথমে কিছুই দিবেনা বলিয়াই শক্ত ছিল এবং দণ্ডধারীর আদেশও অমান্য করিতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু কাজের বেলায় পারে নাই বলিয়া তোমাকে উহা দিয়াছে। সে যদি দণ্ডধারীর আদেশ অমান্য করিতে পারিত, তবে তোমাকে কিছুই দিত না। যাহাকে দণ্ডধারী পিয়াদা বলা গেল সে দাতার মনে স্থাপিত একটী ইচ্ছা। সৃষ্টিকর্তা সেই ইচ্ছাকে দাতার মনের মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। সে দাতাকে এই কথাটী সুন্দর মত বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, তোমাকে কিছু দিলে তাহার ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্য হস্তগত হইবে—এরূপ একটী সামান্য বস্তু দিলে ভবিষ্যতে মহা উপকার পাইতে পারিবে। সেই লোভেই ঐ দাতা তোমাকে উহা দিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে সে তোমাকে কিছু দেয় নাই—সে তাহার নিজকেই দিয়াছে। কেননা দাতা যাহা তোমার হস্তে দিয়াছেন তাহা দ্বারা সে নিজের জন্য কোন উৎকৃষ্ট বস্তু পাইবার উপায় করিয়া লইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে উহা আল্লারই দান, কেননা তিনি দাতার মনের মধ্যে ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য প্রাপ্তির আশা জন্মাইয়া দিয়া দান করিতে ইচ্ছুক করিয়া লইয়াছিলেন, সুতরাং সে তোমাকে কিছু দিয়াছে। যাহা হউক, তুমি যখন সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে—যাহার হাত হইতে কিছু পাওয়া যায়, সে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত খাজাঞ্চির ন্যায় এবং খাজাঞ্চী আবার হুকুম লেখকের হস্তস্থিত কলমের ন্যায় মধ্যবর্ত্তী কারণ মাত্র ইহাদের কাহারই নিজের স্বাধীন ক্ষমতা নাই; পক্ষান্তরে, মহাপ্রভু আল্লা দাতার মনে ভবিষ্যৎ মঙ্গল প্রাপ্তির আশা নিক্ষেপ করতঃ তদ্দ্বারা দাতাকে জবরদস্তী বাধ্য করিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিয়া লইতেছেন তখন এইরূপ বিবেচনায় তুমি আল্লার প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞ হইতে শিখিবে। উক্ত প্রকার বুঝকে শোকর বা কৃতজ্ঞতার জ্ঞান কহে। মহাত্মা হজরত মুছা নবী আঃ আল্লার দরবারে নিবেদন করিয়াছিলেন—"হে প্রভু! তুমি মহাত্মা হজরৎ আদম আঃ কে স্বীয় ক্ষমতার হস্তে সৃজন করিয়াছিলে এবং পর্য্যাপ্ত সম্পদ দিয়াছিলে, তিনি কি ভাবে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন?" উত্তর আসিয়াছিল—"আদম সুস্পষ্ট জানিয়াছিল, সমস্ত সম্পদই সে আমা হইতে পাইয়াছে সেই জ্ঞানই শোকর (কৃতজ্ঞতা)।"

৩। প্রিয় পাঠক! জানিয়া রাখ, ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস-জ্ঞানের বহু পন্থা আছে, তন্মধ্যে এক পথ—تقديس (তক্‌দীছ্) আল্লাকে পবিত্র বলিয়া জানা—সৃষ্ট পদার্থে যে সকল গুণ বা ধর্ম্ম আছে এবং মানুষ যাহা কল্পনা ও খেয়ালে আনিতে পারে তৎ সমস্ত হইতে আল্লা পবিত্র অর্থাৎ আল্লা 'নির্গুণ'। এইরূপ জ্ঞানই سبحان الله (ছোব্‌হান আল্লা) অর্থাৎ 'আল্লা পবিত্র' এই কালেমার অর্থ। দ্বিতীয়—পথ توحيد (তওহীদ) আল্লাকে এক বলিয়া জানা। আল্লা পবিত্র অর্থাৎ 'নির্গুণ' হইয়াও একাকী সমস্ত বিশ্বজগৎ অধিকার করিয়া আছেন তাঁহার সঙ্গে কেহ অংশী স্বরূপ নাই। এইরূপ আল্লাকে 'একামেবাদ্বিতীয়ং' বলিয়া জানাই لا اله الا الله (লাএলাহা ইল্লাল্লাহো) কালেমার অর্থ। (টীঃ ২৮৩।) তৃতীয় পথ تحميد (তহ্‌মীদ) আল্লাকে সমস্ত ব্যাপারের মূল বলিয়া জানা। বিশ্বজগতে যে সকল গুণ, ধর্ম্ম, অবস্থা, গতি, স্থিতি, হ্রাস, বৃদ্ধি, উত্থান পতন ইত্যাদি যাহা কিছু দেখা যায়, তৎসমুদয়ই আল্লা হইতে উৎপন্ন এবং ঐরূপ সমস্ত ব্যাপার তিনি জগতের মঙ্গলের জন্য করিতেছেন, তিনি 'জ্ঞানময় ক্রিয়াশীল' এইরূপ জানাই الحمد لله (আল্‌হাম্‌দো লিল্লা) 'সমস্ত প্রশংসা আল্লার জন্য' এই কালেমার অর্থ। উক্ত তিন প্রকার জ্ঞানের মধ্যে শেষোক্ত জ্ঞান অর্থাৎ 'সমস্ত কার্য্য তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য করিতেছেন অতএব তিনি প্রত্যেক ব্যাপারেই ধন্যবাদের পাত্র' এইরূপ জ্ঞানটী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বোক্ত দুই জ্ঞান এই জ্ঞানেরই অন্তর্গত। এই জন্য মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ বলিয়াছেন—'ছোব্‌হান আল্লা' বা 'আল্লা পবিত্র' এই কালেমা হইতে দশটী মঙ্গল এবং 'লাএলাহা ইল্লাল্লাহো' বা 'আল্লা এক' ইহা হইতে কুড়িটী মঙ্গল উৎপন্ন হয়, আর কেবল 'আলহাম্‌দো লিল্লা' বা 'সমস্ত প্রশংসা আল্লার জন্য' এই কালেমা হইতে ত্রিশটী মঙ্গল উৎপন্ন হয়। যাহা হউক, ঐ তিন কালেমা কেবল মুখে পড়িলে তত মঙ্গল পাওয়া যায় না। উহাদের অর্থ হৃদবোধ মতে বুঝিয়া পড়িলে প্রভুত মঙ্গল

ঈমান জ্ঞান লাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা—তহ্‌মীদ এবং তদন্তর্গত অপর দুই পন্থা—তক্‌দীছ্ ও তওহীদ

টীকা—২৮৩। 'তক্‌দীছ' ও 'তওহীদ' কলেমাকে যথাক্রমে 'তছ্‌বীহ্' ও 'তহ্‌লীল' বলিয়া থাকে। এযাবৎ পুস্তকের ১২২ নং টীকা ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী তিন পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত 'আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহে' কালেমার অর্থ হৃদ্‌গত ভাবে বুঝিয়া লওয়াই 'শোকরের এল্‌ম' বা কৃতজ্ঞতাজ্ঞান।

(খ) **কৃতজ্ঞমনের অবস্থার পরিচয়** এখন শোকরের হাল অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা-জ্ঞান অন্তরে আসিলে কি প্রকার অবস্থা ঘটে তাহা বুঝিয়া লও। কৃতজ্ঞতা অন্তরে জন্মিলে মনে যে আনন্দ আসে তাহাকেই উহার 'হাল' বা অবস্থা বলে।

লোকে সম্পদ পাইলে আনন্দিত হইয়া থাকে, সে আনন্দ তিন প্রকার। **প্রথম** প্রকার—প্রাপ্ত বস্তুর জন্য আনন্দ।

সম্পদ প্রাপ্তি জনিত আনন্দ—ত্রিবিধ

যে বস্তুর অভাবে লোকে অসুবিধা ভোগ করে সেই বস্তু পাইলে তাহার মনে আনন্দ জন্মে। সে আনন্দ কেবল ঐ বস্তু পাইতে পারিয়াছে বলিয়া হইলে, অথচ দাতার জন্য না হইলে উহাকে 'শোকর' বলা যায় না। কোন রাজা দূরদেশ ভ্রমণার্থ যাত্রার আয়োজন করিলেন; সঙ্গে ভৃত্যগণকেও এক একটী অশ্ব আরোহণের জন্য দান করিলেন। রাজার সঙ্গে যাইবার জন্য ভৃত্যগণের অশ্বের অভাব ছিল। অশ্ব প্রাপ্তিতে অভাব মোচন হইল দেখিয়াই যদি ভৃত্যগণ আনন্দিত হয় তবে সে আনন্দে রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে না। কেন না সে অশ্ব রাজার স্থানে না পাইয়া ময়দানের মধ্যে পড়িয়া পাইলেও তাহাদের অভাব মোচন হইত এবং তাহাতে আনন্দও জন্মিত। **দ্বিতীয়** প্রকার অধিক প্রাপ্তির সূচনা কল্পনায় আনন্দ। এ আনন্দ কেবল ঐ প্রাপ্ত বস্তুর জন্য হয় না—ঐ দানকে ভবিষ্যতে আরও অধিক পাইবার চিহ্ন বলিয়া আশা করে এবং তজ্জন্য আনন্দিত হয়। যথা, রাজা দয়া করিয়া ঘোড়া দিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে ঘোড়ার দানা দিবেন, সইস দিবেন এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় পদার্থও দিবেন; এই ভাবিয়া আনন্দিত হইলে সে আনন্দ, কৃতজ্ঞতা শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে বটে, কিন্তু নিতান্ত হীন ও জঘন্য হইবে। কেননা সে আনন্দ রাজার জন্য নহে; কেবল রাজার নিকট হইতে আরও অধিক পাইবার আশা হইতে উৎপন্ন। ময়দানের মধ্যে ঘোড়া পাড়িয়া পাইলে সে ব্যক্তি তদ্রূপ আনন্দ পাইত না। **তৃতীয়** প্রকার—কেবল দাতার জন্য আনন্দ। রাজ-ভৃত্য অশ্ব পাইয়া যদি এই ভাবিয়া আনন্দিত হয় যে, এই সুযোগে সে রাজার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে পারিবে

—রাজার দর্শন লাভে চরিতার্থ হইবে, ইহা ভিন্ন সে আর কিছু চায় না, তবে সে আনন্দ কেবল রাজার জন্যই হইবে এবং তাহাকে পূর্ণ কৃতজ্ঞতা বলা যাইবে।

এইরূপ, যে ব্যক্তি আল্লার নিকট হইতে কোন আবশ্যকীয় পদার্থ পাইয়া সেই পদার্থের জন্য আনন্দিত হয়—আল্লাকে পাইবার সুযোগ হইল বলিয়া আনন্দিত না হয়—তাহার সেই আনন্দকে শোকর (কৃতজ্ঞতা) বলা যায় না। পক্ষান্তরে, যে বস্তু পাওয়া গিয়াছে তাহাকে যদি আল্লার সন্তুষ্টি ও করুণার নিদর্শন মনে করিয়া আরও অধিক পাইবার আশায় আনন্দিত হয় তবে সে আনন্দকে শোকর বলা যাইবে বটে কিন্তু তাহা নিতান্ত হীন ও হেয় হইবে। আবার কোন ব্যক্তি যদি আল্লার দান প্রাপ্ত হইয়া উহাকে পুণ্য ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনের হেতু ও সুযোগ মনে করতঃ আনন্দিত হয় এবং যথাশক্তি যত্নের সহিত জ্ঞানোপার্জ্জনে এবং এবাদৎ কার্য্যে রত হয় তবে উহাকে 'শোকর' বলে। ফল কথা, প্রাপ্ত দানকে আল্লার নৈকট্য পাইবার উপায় হইল বলিয়া আনন্দিত হইলে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা নাম প্রাপ্ত হয়। এই শ্রেণীর আনন্দ কখনই প্রাপ্ত বস্তুর জন্য হয় না; অথবা আরও অধিক দান পাইবার আশা হইতে জন্মে না। উহা কেবল আল্লাকে পাইবার সুযোগ ও উপায় হস্তগত হইল বলিয়া উৎপন্ন হয়।

প্রকৃত কৃতজ্ঞতার চিহ্ন—এই শ্রেণীর প্রকৃত 'শোকরের' চিহ্ন এই যে, যে বস্তু আল্লাকে পাইবার পথে বাধা উৎপাদন করে, তাহা হাতে আসিলে দুঃখ জন্মে। সে পদার্থকে সম্পদ মনে না করিয়া বিপদ বলিয়া মনে হয়। তদ্রূপ পদার্থ হইতে বঞ্চিত হওয়াকে সম্পদ্ বলিয়া আনন্দ জন্মে এবং তজ্জন্য শোকর করিয়া থাকে। যাহা হউক, ফল কথা এই যে, যে পদার্থ ধর্ম্ম-পথে সহায় না হয় অথবা সাহায্য না করে, তাহা পাইয়া আনন্দিত হওয়া কখনই উচিত নহে। মহাত্মা শিব্‌লী বলিয়াছেন—"প্রাপ্ত পদার্থের দিকে দৃষ্টি না করিয়া দাতার দিকে দৃষ্টি করার নাম 'শোকর'।" যে ব্যক্তি কেবল চক্ষু কর্ণ, উদর, কাম প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া আনন্দ পায় তদ্‌ভিন্ন অন্য কোন বিষয় হইতে আনন্দ পায় না তাহার ভাগ্যে কখনই প্রকৃত শোকর জুটিবে না। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিলে যে আনন্দ জন্মে তাহা শোকর নহে।

(৩) কৃতজ্ঞতা প্রকাশক অনুষ্ঠানের পরিচয়—এখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশক 'আমল্' বা ব্যবহারের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। আন্তরিক, বাচনিক ও কায়িক এই ত্রিবিধ উপায়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়। (১) নিজের ন্যায়, অন্যের সম্পদ্ দর্শনে আনন্দিত হইলে—সকলের মঙ্গল কামনা করিলে—এবং অপরের সম্পদ্ দর্শনে ঈর্ষা না করিলে, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। (২) সকল অবস্থায় এবং প্রত্যেক কার্য্যে আল্লাকে ধন্যবাদ দিলে এবং আল্লার জন্য আনন্দ প্রকাশক কথা বলিলে বাচনিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তুমি কেমন আছ?" সে উত্তর দিয়াছিল—"আল্লার ধন্যবাদ, আমি মঙ্গলের সহিত আছি।" হজরৎ বলিয়াছিলেন—"তোমার মনে ঐ প্রকার আনন্দানুভূতি আছে কি না তাহাই আমি অনুসন্ধান করিতেছি।" পূর্ব্বকালের জ্ঞানী লোকেরা অপরের মুখ হইতে আনন্দানুভূতি শ্রবণ-মানসে সমাচার জিজ্ঞাসা করিতেন। উত্তরের মধ্যে আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইলে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই পুণ্য পাইয়া থাকে। সমাচার জিজ্ঞাসা করিলে যে ব্যক্তি দুঃখের কথা উত্থাপন করে সে পাপী হয়। দুঃখের কথা লইয়া আলাপ করিতে থাকিলে ইহাই বুঝায় যে, এক জন অসহায় দুর্ব্বল মানব, আর এক জন নিঃসহায় অক্ষম ব্যক্তির সম্মুখে যেন করুণাময় বিশ্বপতির নিন্দা করিতেছে। ইহা অপেক্ষা আর কি বড় অন্যায় কথা হইতে পারে? যাহার সম্মুখে দুঃখ জানান হয়, তাহার কি কোন প্রতিবিধানের ক্ষমতা আছে? বরং বিপদ আপদে পতিত হইলে তাহা হইতে ভবিষ্যতে মঙ্গল উৎপন্ন হইবে ভাবিয়া আল্লাকে ধন্যবাদ দেওয়া আবশ্যক। তুমি এখন যে অবস্থায় পড়িয়াছ—যাহাকে তুমি বিপদ বলিতেছ—হয়তো তাহাই তোমার অনন্ত সৌভাগ্যের প্রসূতি হইবে। বিপদ আপদকে যদি কল্যাণকর সৌভাগ্যের মূল বলিয়া বুঝিতে না পার এবং তজ্জন্য যদি তোমার মনে আনন্দ জন্মিতে না পারে তবে 'ছবর'করা কর্ত্তব্য। (৩) শারীরিক কৃতজ্ঞতা নিম্নবর্ণিত প্রকারে প্রকাশ পায়;—শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ করুণাময় সৃষ্টিকর্ত্তার প্রদত্ত এক একটী অমূল্য দান। যে কার্য্য

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ত্রিবিধ উপায়

পরস্পরের সমাচার অনুসন্ধানকালে আল্লার কৃতজ্ঞতা-প্রকাশক উত্তর বাঞ্ছনীয়

সম্পাদনের জন্য যে অঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে যত্নের সহিত সেই কার্য্যে নিযুক্ত কর। প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সৃষ্টিকর্ত্তা গুণ ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনের হেতু করিয়া সৃজন করিয়াছেন। তুমিও এ সংসার হইতে ধর্ম্মার্জ্জন করিয়া সঙ্গে লইয়া যাও, ইহাই তাঁহার একান্ত অভিপ্রায়। তুমি যদি শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপ অমূল্য পদার্থগুলি তাঁহার প্রিয় কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে পার তবে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইবে।

আল্লার প্রিয় কার্য্যে কাহার লাভ—আল্লার না মানবের? তাঁহার প্রিয় কার্য্য বলিলে এ কথা বুঝিও না যে, তদ্রূপ কার্য্যে তাঁহার নিজের কোন স্বার্থ বা লাভ আছে বরং ইহাই বুঝিবে যে তদ্রূপ কার্য্য করিলে তোমার নিজেরই মঙ্গল হইবে। জগতের মঙ্গল সাধনই তাঁহার প্রিয় কার্য্য। এই কথাটী বুঝাইবার জন্য একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতেছে—মনে কর, কোন এক দুর্গতিগ্রস্ত দাসের উপর নরপতির অনুগ্রহদৃষ্টি পতিত হইল। সে ভৃত্য অপরের কুপরামর্শে বিপথে যাইতেছিল। নরপতি স্বীয় অনুগ্রহে, বাহনের জন্য একটী অশ্ব ও কিছু পাথেয় দ্রব্য সম্ভার তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন, উদ্দেশ্য এই যে ভৃত্য অশ্বে আরোহণ করতঃ পাথেয় দ্রব্য ভোগে রাজসভায় আগমন পূর্ব্বক প্রধান অনুচর মধ্যে গণ্য হইয়া রাজার অসীম অনুগ্রহ ও বিপুল সম্মানের অধিকারী হইবে। সে ভৃত্য দূরে গেলে বা দরবারে আসিলে রাজার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই—সে আসিলে, রাজার রাজ্য বৃদ্ধি হইবে না, এবং না আসিলেও কোন দেশ অধিকারচ্যুত হইবে না। আসিলে সেই দাসেরই মঙ্গল। সভায় আগমনে ভৃত্যেরই মঙ্গল হইবে বলিয়া উহা তাঁহার প্রিয় কার্য্য। নরপতি দাতা ও দয়ালু। সমস্ত প্রজারই তিনি মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন—নিজের জন্য তিনি কিছু করেন না। ভৃত্য যদি রাজ-দত্ত অশ্বারোহণে দরবারের অভিমুখে আসিতে লাগে এবং তাঁহার প্রদত্ত পাথেয় দ্রব্য ব্যবহার করিতে থাকে, তবে বুঝিবে অশ্ব ও পাথেয় দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করা হয়; এবং তদ্দ্বারা প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। কিন্তু ভৃত্য যদি পাথেয়-দ্রব্য-ভোজনে বল বৃদ্ধি করিয়া অশ্বারোহণে বিপরীত দিকে গমন করিতে লাগে, এবং প্রতি ধাপে রাজসভা হইতে দূরে চলিয়া যায় তবে বুঝিবে যে, ভৃত্য অকৃতজ্ঞ হইল। আর যদি সে কোন দিকে না গিয়া, বসিয়া বসিয়া অশ্ব ও

পাথের দ্রব্য বিফলে ব্যয় করে তবুও সে অকৃতজ্ঞ। কিন্তু এই ধরণের অকৃতজ্ঞতা হইতে পূর্ব্বোক্ত অকৃতজ্ঞতা কঠিন ও জঘন্যতর। এইরূপ, আল্লার দানগুলি লইয়া তাঁহার সান্নিধ্য পাইবার চেষ্টায় তাঁহার প্রিয় এবাদৎ ও সৎকার্য্য করিতে থাকিলে আল্লার প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা দেখান হয়, কিন্তু তাহা না করিয়া তদ্দ্বারা পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করতঃ আল্লা হইতে দূরবর্ত্তী হইতে থাকিলে ঘোর অকৃতজ্ঞতা করা হইবে। আবার যদি ঐ দানগুলি এমন কোন নির্দ্দোষ আমোদ আহলাদে ব্যয় করা হয় যে তাহাতে পাপও নাই পুণ্যও নাই তবে তাহাতেও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে; কিন্তু ইহা, পাপ কার্য্যে ব্যয়ের ন্যায় তত জঘন্যতর হইবে না।

আল্লার প্রিয় ও অপ্রিয় কার্য্যের পার্থক্য চিনিবার আবশ্যকতা—যাহা হউক, ইহা যখন বুঝা গেল যে—আল্লা-প্রদত্ত সম্পদগুলি তাঁহার প্রিয় কার্য্যে ব্যয় করিতে পারিলে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হয়, তখন আল্লার অপ্রিয় কার্য্য হইতে প্রিয় কার্য্যগুলি বাছিয়া লইতে বিশেষ যত্নবান হইবে। যদি বাছিয়া লইতে না পার তবে আল্লার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে পারিবে না। তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য হইতে প্রিয় কার্য্য নির্ব্বাচন করিতে শিক্ষা করা একটী অতীব সূক্ষ্ম ও আবশ্যকীয় বিদ্যা। প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তার বহু উদ্দেশ্য নিহিত আছে এবং তিনি তৎসমুদয় অতীব কৌশল সহকারে সম্পন্ন করিতেছেন। সেই উদ্দেশ্য ও কৌশল যতক্ষণ পর্য্যন্ত সুন্দর মত বুঝিতে না পারিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন্ কার্য্য তাঁহার প্রিয় এবং কোন্টী অপ্রিয়, নির্ণয় করিতে পারিবে না। আমরা কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিতেছি। বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেখিতে ইচ্ছা থাকিলে "এহ্‌ইয়া-অল-উলুম" নামক আরবী গ্রন্থ পাঠ করা আবশ্যক। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সে সমস্ত ব্যাখ্যার সমাবেশ হইবে না।

সম্পদের অপব্যবহার। পাঠক জানিয়া রাখ—সৃষ্টিকর্ত্তা যে উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য যে কৌশলে যে বস্তু সৃজন করিয়াছেন, তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইলে বা অন্যথা করিলে এবং তিনি যে কার্য্য সম্পাদনে যে পদার্থ প্রস্তুত করিয়াছেন সে কার্য্যে উহা প্রয়োগ না করিলে প্রাপ্ত-পদার্থের অপব্যবহার করা হয়। পাঠক! জানিয়া রাখ—আল্লার প্রদত্ত

বস্তু, তাঁহারই প্রিয় কার্য্যে প্রয়োগ করিলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়, কিন্তু তাঁহার অপ্রিয় কার্য্যে ব্যয় করিলে পদার্থের অপব্যবহার করা হয়। আল্লার প্রিয় ও অপ্রিয় কার্য্যের বিস্তৃত পরিচয় না পাইলে উভয়ের পার্থক্য চিনা যায় না। এই জন্য সংক্ষিপ্ত মোটা কথায় বলা যাইতেছে যে আল্লার প্রদত্ত সম্পদ্ তাঁহারই এবাদৎ কার্য্যে খরচ করা কর্ত্তব্য—পাপ কার্য্যে কখনই খরচ করা উচিৎ নহে। এ সম্বন্ধে আল্লার আদেশও আছে।

আল্লার প্রিয় ও অপ্রিয় কার্য্যের বিস্তৃত পরিচয়জ্ঞান ও উহাদের পার্থক্য উপলব্ধির ধারাবাহিক উপায়। (আল্লার প্রিয় ও অপ্রিয় কার্য্যের বিস্তৃত পরিচয় না পাইলে উহাদের পার্থক্য চিনা যায় না। এই পরিচয়জ্ঞানের জন্য কোন্ কোন্ বিষয় কি উপায়ে হৃদগত ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা আবশ্যক তাহা নিম্নে ধারাবাহিক বর্ণনা করা যাইতেছে। এইগুলি সম্যক বুঝিতে পারিলেই আল্লার প্রিয় ও অপ্রিয় কার্য্যের পার্থক্য চিনিতে পারা সহজ হইবে।)

(১) **জগতের প্রত্যেক কার্য্যের অন্তর্গত কৌশল ও উদ্দেশ্যের সম্যক উপলব্ধি**—যাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গিয়াছে তাঁহাদের সম্মুখে, আল্লার প্রিয় ও অপ্রিয় কার্য্যের পার্থক্য চিনিবার একটী প্রশস্ত পথ খোলা হয়। সেই পথে তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ ও যুক্তি প্রমাণে কিংবা প্রত্যাদেশ বলে প্রত্যেক কার্য্যের অন্তর্গত কৌশল ও উদ্দেশ্য দেখিতে পান। তদ্রূপ জ্ঞানী লোকের কথা স্বতন্ত্র; সাধারণ লোকেও মেঘকে বারিবর্ষণের কৌশল বলিয়া বুঝিতে পারে। বৃষ্টিপাতের মধ্যে তৃণ লতাদি উদ্ভিদ উৎপত্তির কৌশল দেখিতে পায় এবং উদ্ভিদসৃষ্টির মধ্যে জীব জন্তুর আহার সংস্থানের কৌশল নিহিত আছে বলিয়া বুঝিতে পারে। সূর্য্য সৃষ্টি দ্বারা আল্লা কেমন আশ্চর্য্য কৌশল চালাইতেছেন! উহারই প্রভাবে ইহ জগতে অসংখ্য বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটাইতেছেন; সূর্য্যের জন্যই দিবা রাত্রি ঘটিতেছে। রাত্রিকে বিশ্রাম ও আরামের সময় করা হইয়াছে। দিনমান, জীবিকা সংগ্রহের নিমিত্ত পরিশ্রমের কাল বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। এই বিষয়ে এবং এই ধরণে, অন্যান্য ব্যাপারেও সৃষ্টিকর্ত্তার প্রকাশ্য কৌশল সকলেই বুঝিতে পারে; কিন্তু সূর্য্য দ্বারা তদ্ব্যতীত আরও যে অসংখ্য গুপ্ত কৌশল পরিচালিত হইতেছে এবং তৎপ্রভাবে যে কত অনন্ত অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার

ঘটিতেছে তাহা সকল লোকে জানে না। সৃষ্টিকর্ত্তা যেমন সূর্য্যের সাহায্যে চমৎকার চমৎকার কৌশল পরিচালন করিতেছেন, তদ্রূপ কৌশল-পরিচালক আরও অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র ও জ্যোতিষ্ক গগনমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু সকল লোক তাহার সন্ধান রাখে না। তৎ-সমুদয় জ্যোতিষ্কের দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা কিরূপ কৌশলে কাজ করিয়া লইতে-ছেন তাহাও সকলে জানে না। আবার দেখ, প্রত্যেক ব্যক্তি জানে যে, তাহাদের হস্ত, ধারণের জন্য; পদ, গমনের নিমিত্ত; চক্ষু, দর্শনের কারণ, কিন্তু হৃৎপিণ্ড ও প্লীহা কি উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা সাধা-রণ লোকে বুঝে না, আবার চক্ষু-গোলকের উপর কি কারণে ১০ দশটী পরদা স্থাপন করা হইয়াছে, তাহাও সম্ভবতঃ কেহই জানে না। যাহা হউক, সৃষ্টিকর্ত্তার কৌশল-পরম্পরার মধ্যে কতকগুলি সূক্ষ্ম আর কতকগুলি সূক্ষ্মতর হইতে আরও সূক্ষ্মতম; বিশেষ জ্ঞানবান লোক ব্যতীত অপরে সে সমস্ত বুঝিতে পারে না। সৃষ্টিকর্ত্তা যে উদ্দেশ্য সাধন-মানসে যে পদার্থে যে কৌশল স্থাপন করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের বিস্তৃত পরিচয় বহু বিস্তৃত, তথাপি সংক্ষেপে এই টুকু জানা নিতান্ত আবশ্যক যে, সৃষ্টিকর্ত্তা মানবকে পরকালের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন— দুনিয়ার জন্য করেন নাই; আশ্চর্য্য কৌশল ও অসীম উদ্দেশ্য সম্পা-দন জন্য জগতে অনন্ত পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে, তন্মধ্যে যে যে পদার্থের সহিত মানবের ভাগ্য জড়িত আছে সে গুলিকে পরকালের পাথেয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। • • • •

(৯) আল্লাহর সৃষ্টি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর—এই কথায় পূর্ণ উপলব্ধি। যাহা হউক, করুণাময় যাহা সৃজন করিবার অভি-প্রায় করিয়াছেন তাহাই স্বীয় বদান্যতায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া বানাইয়া-ছেন। সৃজন কালে তিনি প্রত্যেক পদার্থ, জীব জন্তু উদ্ভিদ ধাতু-গুলিকে নিতান্ত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর আকার দান করিয়াছেন, এবং সুন্দর আকারের উপযুক্ত রূপ গুণ উপযোগিতা, উন্নতি, উৎকৃষ্টতা ইত্যাদিও প্রদান করিয়াছেন, এবং তন্নিমিত্ত যেরূপ উপাদান উপকরণ ও সাজ সরঞ্জামে সাজান আবশ্যক তাহাও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দিয়াছেন; দান কার্য্যে তিনি কিছু মাত্র কৃপণতা করেন নাই অথবা তদ্‌বিষয়ে কেহ তাঁহার হাতও আটক রাখিতে পারে নাই। সৃষ্টির মধ্যে কথন কথন

দেখা যায় যে, কোন কোন পদার্থে, পূর্ণতা, সৌন্দর্য্য, বা অবয়ব সম্পূর্ণ ভাবে বিকশিত হয় নাই। সে স্থলে এই বিশ্বাস করিবে যে, তদ্রূপ পূর্ণ বিকাশ বহন করিবার শক্তি উহার ছিল না। অথবা ইহাও বিশ্বাস করিতে পার যে, যাহা পূর্ণ ভাবে বিকশিত হয় নাই তাহার বিরোধী কোন পদার্থ তথায় বিদ্যমান ছিল, অথবা উহা বিকশিত না করিবার পক্ষে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। দেখ—অগ্নি কখনই জলের শীতলতা বা আর্দ্রতা গ্রহণ করিতে পারে না। অগ্নি কেন? প্রত্যেক উষ্ণ দ্রব্য শীতলতা গ্রহণ করিতে পারে না, ইহার কারণ এই যে শীতলতা উষ্ণ দ্রব্যের বিরোধী। উষ্ণ দ্রব্যের মধ্যে, উষ্ণতা গুণটী রক্ষা করা সৃষ্টিকর্ত্তার বাঞ্ছনীয়। উষ্ণ দ্রব্যের মধ্য হইতে উষ্ণতা লোপ করা ক্ষতির কারণ। যে পদার্থ যতদূর পর্য্যন্ত ক্রমোন্নতি পাইবার যোগ্যতা রাখে, তাহাকে ততদূর উন্নত করিতে সৃষ্টিকর্ত্তা কখনই কৃপণতা করেন না। দেখ—আর্দ্রতা একটী পদার্থ; সৃষ্টিকর্ত্তা উহাকে ক্রমে উন্নত করিয়া মশা মাছি করিয়া তোলেন। আর্দ্রতাই পূর্ণ উন্নত হইলে মক্ষিকারূপে পরিণত হয়। যে আর্দ্রতা ক্রমে উন্নত হইয়া মক্ষিকা হইবার যোগ্যতা রাখে, সৃষ্টিকর্ত্তা তাহাকে তদ্রূপ উন্নতি হইতে বঞ্চিত রাখেন নাই। বঞ্চিত রাখিলে কৃপণতা প্রকাশ পাইত। মক্ষিকার মধ্যে গতি, স্থিতি, ক্ষমতা, আকার, দেহ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি আছে। আর্দ্রতার আদিম অবস্থায় উহার মধ্যে ঐ গুণ বা অবস্থাগুলি কিছুই ছিল না কিন্তু তৎসমুদয় ধারণ করিবার যোগ্যতা ও ক্ষমতা আর্দ্রতা রাখিত বলিয়া ঐ সকল অবস্থা ক্রমে ক্রমে আসিয়া আর্দ্রতায় যুক্ত হইয়াছে বলিয়া ক্রমে ক্রমে মক্ষিকার আকারে উপনীত হইয়াছে। কিন্তু যে আর্দ্রতার পূর্ণ পরিণতি, মক্ষিকা, তাহা হইতে মানবকে বানান হয় নাই। ইহার কারণ এই যে মানবের আবশ্যকীয় পদার্থ ও গুণাবলী মক্ষিকা-প্রসূ আর্দ্রতার সঙ্গে যুক্ত হইবার যোগ্যতা রাখে না, আবার সে আর্দ্রতাও মানবের গুণ ও অঙ্গাদি ধারণ করিবার শক্তি পায় নাই। মক্ষিকা-প্রসূ-আর্দ্রতার মধ্যে যে যে গুণ আছে তাহা মানবের আবশ্যকীয় গুণের বিপরীত, সুতরাং সে গুণগুলি মক্ষিকা-প্রসূ-আর্দ্রতার মধ্যে বিকাশ পাইতে পারে না। কিন্তু মক্ষিকার উৎপত্তি নিমিত্ত যে যে গুণ ও

সৃষ্টিতত্ত্ব—ক্রমবিবর্ত্তন বাদ

পদার্থ আবশ্যক তাহা হইতে মক্ষিকা বঞ্চিত হয় নাই। দেখ—মক্ষিকার জন্য, পালক, হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ, উদর, অন্নবাহী নালী, অন্নস্থলী, পাকস্থলী, অন্নের অসার ভাগ ধারণের স্থান ইত্যাদি নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আবশ্যক। তদ্ব্যতীত ক্ষুদ্রত্বের সহিত পরিচ্ছন্নতা লঘুতা ইত্যাদি যাহা কিছু আবশ্যক, তৎসমুদয়ও পরম-শিল্পী ঐ মূল আর্দ্রতা হইতে বিকসিত করিয়া দিয়াছেন। মক্ষিকার জন্য দর্শনশক্তি বিশেষ তীক্ষ্ণ হওয়া আবশ্যক। ঘূর্ণায়মান ও পলকদার অক্ষি-গোলকে দর্শন কার্য্য সুন্দর মত সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু মক্ষিকার মস্তক নিতান্ত ক্ষুদ্র হওয়াতে তন্মধ্যে পলকদার ও ঘূর্ণায়মান চক্ষুর সমাবেশ করিলে অনেক অসুবিধা উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া তিনি মক্ষিকাকে পলকহীন চক্ষু দান করিয়াছেন এবং দুই খানি পরকলা দ্বারা তাহার চক্ষুমণি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ দর্শনের উপায় করিয়া দিয়াছেন। সেই বিধানে চারিধারের পদার্থের প্রতিবিম্ব অতি শীঘ্র চক্ষুর উপর সুন্দর মত পড়িতে পারে। চক্ষে পলক পড়িবার উপায় থাকিলে ধূলী ধূসরাদি পলকের নড়ন চড়নে বিদূরিত হইতে পারিত; কিন্তু মক্ষিকা-চক্ষু পলক-হীন হওয়াতে সে উপকার পাইবার আশা নাই, সুতরাং পলক-নড়ন-শক্তির পরিবর্ত্তে তাহাকে চক্ষু পরিষ্কারের জন্য দুই খানি অতিরিক্ত ক্ষুদ্র হস্ত দান করা হইয়াছে। মক্ষিকাগণ সে দুই খানি ক্ষুদ্র হস্ত সর্ব্বদাই চক্ষের উপর আমর্ষণ করে—ধূলি ধূসরাদি পড়িবা মাত্র সেই হস্ত দ্বারা মুছিয়া ফেলে—এবং অবিলম্বে হস্ত দুখানি পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া হস্ত সংলগ্ন ময়লা দূরে নিক্ষেপ করিয়া দেয়।

মক্ষিকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনা—(বিজ্ঞান সম্মত)

(৩) সৃষ্টির শোভার পরিপূর্ণতায় আল্লার বিশ্ব-ব্যাপক করুণার বিকাশ—এই কথার উপলব্ধি—

প্রিয় পাঠক! এতগুলি কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, বিশ্বপতি মহা বাদশার করুণা ও দান সর্ব্বব্যাপী এবং বিশ্ব ব্যাপক। তাঁহার করুণা কেবল মানুষের উপর সীমাবদ্ধ নহে। অতি ক্ষুদ্র ও সামান্য পোকা মাকড়, কীট পতঙ্গেরও যাহা কিছু আবশ্যক, তৎসমুদয় তিনি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পূর্ণমাত্রায় তাহাদিগকেও দিয়াছেন। একটী প্রকাণ্ড হস্তীকে যে আকারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর

করিয়াছেন সামান্য গোবরা পোকাকেও তদনুরূপ আকৃতি ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সুশোভিত করিয়াছেন। কোন পোকা মাকড়ই মানুষের জন্য সৃষ্ট নহে—বরং প্রত্যেক প্রাণী তাহার নিজের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। সৃষ্টিকর্তা তোমাদিগকে তোমাদের নিজের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। দেখ—সৃষ্টির প্রারম্ভে তুমি এমন কোন পদার্থ ছিলে না বা এমন কোন সম্পর্ক বা উপযোগিতা রাখিতে না, যাহার জন্য তোমাকে উৎপন্ন করার প্রয়োজন ছিল। তোমার ন্যায় অন্যান্য পদার্থও কোন ব্যক্তি বা বস্তুর আবশ্যকতায় বা সম্বন্ধের অনুরোধে সৃষ্ট হয় নাই। বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থই আল্লার করুণা-সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছে। সেই সমুদ্রে তুমিও ডুবিয়া রহিয়াছ এবং পিপীলিকা, মক্ষিকা, পশু, পক্ষী, অশ্ব, হস্তী সমস্তই ডুবিয়া আছে। তৎসমুদয়ের মধ্যে যে গুলি অপূর্ণ ও দুর্বল তাহাদিগকে পূর্ণ ও বলবানের জন্য উৎসর্গ করা হইয়াছে—(উদ্দেশ্য এই যে, সমস্ত বস্তু তদ্রূপ শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবে)। ভূতলস্থ যাবতীয় পদার্থের মধ্যে মানুষ পূর্ণ ও বলবান, সুতরাং অধিকাংশ পদার্থ মানুষের জন্য উৎসর্গিত হইয়া রহিয়াছে।

সৃষ্টির ক্রমবিবর্তনের উদ্দেশ্য

ভূগর্ভের অভ্যন্তরে এবং সমুদ্রের গভীর তলে, এমন বহু পদার্থ আছে, যাহা মানুষের কোন হিতে লাগে না, তথাপি তৎসমুদয়ের বাহ্য আকৃতি ও আভ্যন্তরিক গঠনের মধ্যে বিশ্বশিল্পীর অপার করুণা, অনন্ত শিল্প-নৈপুণ্য ও বিচিত্র কারুকার্য্য জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। বিশ্বজগতের সামান্য ও মহৎ প্রত্যেক বস্তুর নির্ম্মাণে সৃষ্টিকর্তার যে কি পরিমাণে দয়া, জ্ঞান ও শিল্প-নৈপুণ্য ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা চিন্তা ও পর্য্যালোচনা করিতে গেলে মানব-শক্তি একেবারে শ্রান্ত ও অক্ষম হইয়া পড়ে। সৃষ্টিকর্তার জ্ঞান-সমুদ্র সন্তরণ করিতে গিয়া জ্ঞানীগণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এ সকল কথা বহু বিস্তৃত।

(৪) জগতের সমস্ত পদার্থই মানবের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে—এরূপ ধারণার অসারতা উপলব্ধি—এ কথা মনে করিও না যে বিশ্ব জগতের সমস্ত পদার্থই মানবের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। তদ্রূপ বিবেচনা করিলে এই ফল হয় যে, যখন দেখিতে পাও যে, বহু পদার্থে মানবের কোন সাধ্য নাই বরং কতক-

গুলি হইতে ক্ষতিই উৎপন্ন হয়, তখন মানব এইরূপ অন্যায় প্রশ্ন করিয়া বসে যে—"এই পদার্থ আল্লা কেন করিয়াছেন?" মশা পিপীলিকা মানুষকে বিরক্ত করে দেখিয়া বলিতে পারে উহাদিগকে আল্লা কেন সৃজন করিয়াছেন? সর্পদংশনে মানুষ মরে দেখিয়া বলিতে পারে উহা-দিগকে কেন সৃষ্টিকর্তা বানাইয়াছেন। যাহা হউক, পিপীলিকাগণও মানুষকে দেখিয়া বলিতে পারে—"হায়! সৃষ্টিকর্তা মানুষকে কেন সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষেরাও বিনা কারণে আমাদিগকে পদদলিত করিয়া হত্যা করে।" মানুষও আবার পিপীলিকা দেখিয়া ঐ প্রকার বিরক্তি-কর মন্তব্য প্রকাশ করে। (টী:২৮৪।) যাহা হউক, মূল কথা এই যে, উপরি লিখিত কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে তুমি কখনই নিজকে জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান জীব বলিয়া মনে করিতে পারিবে না, এবং 'জগতের সমস্ত পদার্থ যে তোমার জন্য সৃষ্ট' এই ভ্রমও তোমার মনে থাকিতে পারিবে না, তৎসঙ্গে এ প্রশ্নও মনে উঠিবে না যে, যাহাতে উপকার নাই তাহা কেন সৃষ্ট হইয়াছে? যাহা হউক, ইহা যখন বুঝিতে পারিলে যে—পিপীলিকা তোমার জন্য সৃষ্ট নহে, তখন ইহাও বুঝিতে পারিবে যে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা, আকাশ, ফেরেশ্‌তা ইত্যাদিও তোমার জন্য সৃষ্ট নহে। যদিও ঐরূপ বহু পদার্থ হইতে তুমি উপকার পাইয়া থাক তথাপি তৎসমুদয় তোমার জন্য নহে। দেখ তোমরা মক্ষিকা হইতে অনেক উপকার পাও—কোন স্থানে দুর্গন্ধ উৎপন্ন হইলে মক্ষিকাগুলি আসিয়া তথা হইতে দুর্গন্ধের মূল কারণ বস্তুগুলি চুষিয়া লয়; তজ্জন্যই দুর্গন্ধ হ্রাস পায়। মক্ষিকাগণ যদিও বিরক্তি-জনক দুর্গন্ধ দূর করিয়া তোমাদের উপকার করে তথাপি উহারা তোমাদের জন্য সৃষ্ট নহে। দেখ—মাংসবিক্রেতার দোকানে মক্ষিকাগণ প্রচুর পরিমাণে মাংস-রস ও রক্তবিন্দু খাইতে পায়। এ স্থলে মাংসবিক্রেতা হইতে মক্ষিকা উপকার পায় বলিয়া ইহা মনে করিতে পার না যে মক্ষিকার জন্যই কসায়ীর সৃষ্টি হইয়াছে বা মক্ষিকার জন্যই সে দোকান খুলিয়া থাকে। মাছিকে আহার দিতে কসায়ী প্রত্যহ দোকান খুলে এই বিবেচনাটী, আর তোমার জন্য সূর্য্য প্রত্যহ আকাশে উঠে এই বিশ্বাসটী উভয়ই

টীকা—২৮৪। এই টীকাচিহ্ন পর্য্যন্ত প্যারার প্রথম অংশটী মূলগ্রন্থে পূর্ব্ববর্ত্তী প্যারা দুইটীর উপরে তারকাচিহ্নিত স্থানে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা হইল।

সমান ভ্রম-মূলক। যে সময়ে মাছি, কসাইয়ের দোকান হইতে রক্তবিন্দু ও মাংস-রস পেট পুরিয়া আহার করিতে থাকে, তখন হয়তো কসাই অন্য কার্য্যে বা ভিন্ন চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে পারে। মাছিগুলি খাদ্য, খাইতে পাইল, কি না খাইয়া মরিতেছে, সে চিন্তা হয়তো তাহার মন পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে না। যদিও দোকানের অনাবশ্যক পদার্থই মাছির জীবিকা এবং উহা আহার করিয়াই উহারা প্রাণ ধারণ করে —এক হিসাবে কসাইয়ের অনুগ্রহেই মাছির জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয়— তথাপি কসাই কিন্তু সে দিকে খেয়ালও করে না। তাহার দোকান খোলার উদ্দেশ্য মক্ষিকা-পালন নহে—তাহার দোকান খোলার উদ্দেশ্য অন্য প্রকার। এখন সূর্য্যের সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখ—সে স্বীয় প্রভুর আদেশ মত গগন-মার্গে ভ্রমণ করিতেছে। ভ্রমেও সে তোমাদের কথা মনে করে না! যদিও সূর্য্যের আলোকে তোমাদের চক্ষে দৃষ্টিক্ষমতা জন্মে এবং তাহারই রৌদ্রে মৃত্তিকার মধ্যে সম-শীতোষ্ণতা ও সম-শুষ্কার্দ্রতার আবির্ভাব হয় এবং তজ্জন্যই বীজ হইতে অঙ্কুর বৃক্ষ ও ফল পুষ্প উৎপন্ন হয় এবং তোমাদের আহার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে তথাপি সে সূর্য্য, তোমার কি হইল—কি না হইল—সে দিকে দৃকপাতও করে না। সূর্য্য, আপন মনে নিজের কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছে। সূর্য্যের ন্যায় আরও বহু জ্যোতিষ্ক আছে, তাহা হইতেও আমাদের উপকার হয় বটে কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা আমাদের কাজ করিতে সৃষ্ট নহে। তৎব্যতীত আরও এমন অসংখ্য পদার্থ আছে যাহা হইতে আমরা কিছু মাত্র উপকার পাই না অথবা তাহাদের সঙ্গে আমাদের কোন এলাকা বা বাধ্য বাধকতা নাই।

সম্পদের অপব্যবহার—উদাহরণ সহ বর্ণনা—যে সকল পদার্থ হইতে মানবের কোন উপকার প্রাপ্তি ঘটে না বা যাহাদের সঙ্গে মানবের কোন সম্বন্ধ বা এলাকা নাই কৃতজ্ঞতার অর্থ বর্ণনা করিতে গিয়া, তদ্রূপ পদার্থের গুণ-ধর্ম্ম প্রদর্শন করাতে আমাদের কোনই লাভ নাই। যে সকল পদার্থের সঙ্গে মানবের এলাকা ও বাধ্য বাধকতা আছে তাহাদেরও সংখ্যা এত অধিক যে, সমস্তের কথা বলাই অসম্ভব। কয়েকটী প্রধান প্রধান ঘনিষ্ঠ পদার্থের কথা বলা যাইতেছে।

প্রথম ধর তোমার চক্ষু—ইহা দুটী কার্য্যের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। (১) ইহার সাহায্যে তুমি অভাবমোচনের পথ চিনিতে পার—কোন্ পদার্থ তোমার কাজে লাগে—কোন্ পদার্থ দ্বারা তোমার কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে তাহা চিনিয়া লইতে পার। (২) চক্ষুর সাহায্যে সৃষ্টিকর্ত্তার আশ্চর্য্য শিল্প-নৈপুণ্য ও বিচিত্র কারুকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার অনন্ত মহিমা ও অদ্ভুত ক্ষমতা জানিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু সেই চক্ষু দ্বারা কোন পরস্ত্রীর প্রতি দর্শন করিলে, চক্ষু যে তোমার একটী প্রধান সম্পদ, তাহার অপব্যবহার করা হইবে। এখন পুনরায় বুঝিয়া দেখ, সূর্য্য-কিরণের প্রভাবেই তুমি দেখিতে পাও—সূর্য্যের আলোক না পড়িলে তুমি দেখিতে পাইতে না। আবার দেখ, আকাশের মধ্যে সূর্য্য থাকে; তুমিও পৃথিবীর উপর দাঁড়াইয়া দর্শন কার্য্য করিয়া থাক—পৃথিবীর অভাবে তুমি থাকিতে পারিতে না। সূর্য্যের কারণে যে দিবা রজনী ঘটে তাহা কেবল আকাশ ও পৃথিবীর উপরেই প্রকাশ পায়। এখন দেখ, পরনারীর প্রতি এক বার দর্শন করিলে চক্ষুরূপ ধনের যেরূপ অপব্যবহার করা হয়, সূর্য্যালোকরূপ সম্পদেরও তদ্রূপ অপব্যবহার করা হয়, এমন কি সূর্য্য এবং তৎসঙ্গে ভূমণ্ডল, গগনমণ্ডল সমস্ত সম্পদেরই অপব্যবহার করা হইয়া থাকে। এই জন্য হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—"যে ব্যক্তি পাপ করে তাহার উপর জমীন ও আছমান ধিক্কার দিয়া থাকে।"

তাহার পর হস্ত সম্বন্ধে বিবেচনা কর। হস্তের সাহায্যে তুমি নিজের কাম করিতে পার—মুখে আহার তুলিয়া দাও, অপ্রিয় ও অপবিত্র বস্তু দূর কর, এইরূপ নানা কার্য্য সম্পাদন জন্য করুণাময় তোমাকে হস্ত দিয়াছেন। হস্তও তোমার জন্য একটী উৎকৃষ্ট সম্পদ। সেই হস্তে পাপ কার্য্য করিলে উক্ত সম্পদের অপব্যবহার করা হইবে। এমন কি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা 'আবদস্ত' করিলে বা বাম হস্তে কোরআন শরীফ ধরিলেও হস্তের অপব্যবহার করা হয়। ইহার কারণ এই যে মহাপ্রভু 'আদিল' বা সুবিচার পছন্দ করেন। উত্তমের জন্য উত্তম এবং অধমের জন্য অধম বস্তু ব্যবহার করা বিচারের অন্তর্গত। ইহা সচরাচর দেখা যায় যে, দুই হস্তের মধ্যে দক্ষিণ হস্ত খানি বাম হস্ত অপেক্ষা বলবান হইয়া থাকে। এ পার্থক্য জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায়। এই কারণে দক্ষিণ হস্ত উত্তম ও বাম হস্ত অধম। আবার দেখ, তোমাদের কার্য্যের মধ্যেও

উত্তম ও মধ্যম দুই প্রকার কার্য্য আছে, যে সকল কার্য্য উত্তম তাহা দক্ষিণ হস্তে এবং অধমগুলি বাম হস্তে করা কর্ত্তব্য। তাহাতে বিচার পূর্ব্বক কাজ করা হয়। মানুষকেই বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করিতে হয়। বিচার পূর্ব্বক কাজ কাম করা ও চলা ফিরা মানুষের ব্যবসায়। কাজ কর্ম্ম হইতে বিচার লোপ পাইলে তৎসমুদয় ইতর জন্তুর আচরণের ন্যায় হইয়া পড়ে। সদুদ্দেশ্যের সহিত বিচার পূর্ব্বক কাম করা আল্লা ভাল বাসেন।

'কেবলা' অর্থাৎ গৌরবান্বিত দিকে মুখ করিয়া থুক্ ফেলিলে, 'কেবলা' ও দিক্ রূপ পদার্থের অপব্যবহার করা হয়। গৌরব বিষয়ে চারি দিক্ সমান নহে। তোমাদের কল্যাণ ও উৎকর্ষ বিধান জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা চারিটী দিকের মধ্যে এক নির্দ্দিষ্ট দিক্‌কে গৌরব মণ্ডিত করিয়াছেন। এবাদৎ কালে সেই দিকে মুখ স্থাপন করিলে তোমরা মনে শান্তি ও আরাম পাইতে পারিবে।

তোমাদের জন্য জঘন্য কার্য্যও আছে, যথা—বাহ্য যাওয়া, থুক ফেলা, এবং উত্তম কার্য্যও আছে, যথা—ওজু করা, নমাজ পড়া; এই উভয় শ্রেণীর কার্য্য সমান ভাবিয়া করিতে থাকিলে পশু তুল্য জীবন যাপন করা হইবে এবং বুদ্ধিরূপ অমূল্য ধন যাহা হইতে বিচার ও শিল্প কৌশল পাওয়া যায় তাহার অপব্যবহার করা হইবে।

এইরূপ বিনা কারণে বৃক্ষের শাখা বা পুষ্প-কলিকা ছিন্ন করিলে হস্ত ও বৃক্ষ উভয়ের অপব্যবহার করা হইবে। সৃষ্টিকর্ত্তা বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হইতে শাখা পল্লব উৎপন্ন করিয়া থাকেন বৃক্ষ-দেহের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা-সূত্র বিস্তারিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই শিরা-সূত্র-পথে বৃক্ষ, স্বীয় দেহের পোষণোপযোগী আহার্য্য-রস আকর্ষণ পূর্ব্বক শাখা প্রশাখা পর্য্যন্ত প্রেরণ করে সুতরাং বৃক্ষ দেহ ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তুমি যদি ডাকাতি করিয়া বৃক্ষের শাখা পল্লব ছিঁড়িয়া লও, তবে হস্ত ও বৃক্ষ উভয়েরই অপব্যবহার করা হইবে। কিন্তু তোমরা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবার পথে তোমাদের কোন কঠিন অভাব মোচনার্থ যদি শাখা পল্লব ছেদন কর তবেও উহাদের অপব্যবহার করা হইবে না বরং কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পাইবে। মানব, শ্রেষ্ঠ জীব; ইহাদের অভাব মোচন ও পূর্ণতা-বিধানের জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা বৃক্ষের উন্নতি উৎসর্গ করিয়াছেন। অপূর্ণ পদার্থকে পূর্ণ পদার্থে সমর্পণ করতঃ উন্নতির দিকে

প্রেরণ করা বিশ্বরাজ্যের একটী শ্রেষ্ঠ সুবিচার। (টীঃ২৮৫) কিন্তু নিতান্ত অভাবে পড়িয়াও যদি অপর ব্যক্তির * অধিকার-ভুক্ত বৃক্ষ হইতে শাখা পল্লব ছিঁড়িয়া লও তথাপি শোকর (কৃতজ্ঞতা) প্রকাশ না পাইয়া অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পাইবে। কেননা ঐ বৃক্ষ যাহার অধিকারভুক্ত আছে, অগ্রে তাহারই অভাব মোচন হওয়া বিচার সঙ্গত।

সৃষ্টিরক্ষার তত্ত্ব—ক্রম বিবর্ত্তন বাদ (অযোগ্যের ক্ষয়)

প্রকৃত বিশ্বজগতের সমস্ত বস্তুই সেই মহা বাদশা আল্লার অধিকৃত। মনুষ্য মাত্রেই তাঁহার দাস। প্রভুর কোন পদার্থের উপর দাসের অধিকার নাই। তথাপি মনে কর, ভূতল যেন একখানি 'দস্তরখান'—মহাপ্রভু তাঁহার দাসগণের সম্মুখে উহা বিছাইয়া দিয়া সর্ব্ববিধ ভোগ্য বস্তু তদুপরি সাজাইয়া রাখিয়াছেন। মনুষ্যগণ সেই দস্তরখানে ভোজনে বসিয়াছে। যদিও কোনও ব্যক্তি ভূতলরূপ দস্তরখানে স্থাপিত পদার্থের মালেক নহে—বিশ্বপতি মহা বাদশাই বাস্তবিক মালেক—তথাপি এ কথাটী বুঝিয়া রাখ যে, এক লোকমায়

কমিউনিষ্টমতবাদ

টীকা—২৮৫। প্রত্যেক পদার্থকে পূর্ণ উন্নতি দান করা এবং কাহাকেও উন্নতি দানে কৃপণতা না করা বিশ্বপতির পরম সুবিচার। ইহা, জগতের সর্ব্বত্র জাজ্জল্যমান দেখা যায়। দেখ—কর্কশ বালুকাকণাকে সরস কর্দ্দমে পরিণত করা হয়। সরস কর্দ্দম কর্কশ বালুকাকণার উন্নতি; এবং পরিষ্কার জল, বালুকার মধ্যে মিশ্রিত হইয়া রাসায়নিক পরিবর্ত্তনে রসে পরিণত হওয়া আদিম জলের উন্নতি। ঐ রস ও কর্দ্দমাংশ, ভূপতিত বীজ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমোন্নতি পাইয়া অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত, পুষ্পিত, ফলিত হয়। পরে তৃণ বৃক্ষাদির প্রত্যেক পারণতি অর্থাৎ দণ্ড, শাখা, পল্লব, ফলাদি, পোকা মাকড় বা ছাগল গবাদি প্রাণীর উদরস্থ হইয়া তাহাদিগকে বর্দ্ধিত করতঃ পূর্ণাবয়বে আনয়ন করে। আবার ঐ সকল প্রাণী মানুষের খাদ্যরূপে উদরস্থ হইয়া মানব দেহে বল-বুদ্ধি-বীর্য্য বর্দ্ধিত করে। সর্ব্ব প্রথমে যে পরিষ্কার জল ছিল তাহাই উন্নত হইয়া কর্দ্দম মধ্যে রস রূপে পরিণত হয়। পরে তাহা তৃণাদির দেহ নির্ম্মাণ করে। তৃণাদি আবার ছাগলাদি কর্ত্তৃক ভুক্ত হইয়া তাহাদের শরীর গঠন করে। ছাগলাদি প্রাণী মনুষ্য কর্ত্তৃক ভুক্ত হইয়া চরম উন্নতি প্রাপ্তে মনুষ্যের বল, বীর্য্য বুদ্ধি জন্মাইয়া দেয়। মানুষেরা আবার বল-বুদ্ধি প্রভাবে শিল্প ও বিজ্ঞান ক্রমে কত আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়া মানব সমাজের কত উন্নতি করিতেছে। যাহা হউক, একটী অপূর্ণ পদার্থ অপর উন্নত পদার্থের মধ্যে ভুক্ত হইয়া ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাতে পদার্থের মধ্যে, পরস্পরের আসক্তি এবং মিলনে সৃষ্টিকর্ত্তার অনুগ্রহ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। যাহা হউক উৎকৃষ্ট বস্তু অপকৃষ্টকে আদরের সহিত নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলে উৎকৃষ্টের আরও উন্নতি হয়; এই বুঝকে প্রীতি-মূলক মিলনের বুঝ বলে। ইয়ুরোপে কিন্তু নির্ম্মম ধ্বংসকর মত Destruction Theory প্রচলিত আছে। তাহারা বলে Survival of the fittest অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও উপযুক্তই টিকিবে আর অপকৃষ্ট বিনাশ পাইবে।" এই জন্য ইয়ুরোপে উৎকৃষ্ট জাতি অপকৃষ্ট জাতিকে সংহার ও গ্রাস করিয়া বড় হইতে ব্যস্ত হইয়াছে।

কাহারও পেট পুরিতে পারে না। এক লোকমা তুলিয়া লইলে আর একটী লইবার প্রয়োজন হয়। এমন অবস্থায় যে ব্যক্তি যে লোকমা হাতে তুলিয়া লইয়াছে বা মুখে দিবার উপযুক্ত করিয়া লইয়াছে তাহা কাড়িয়া খাওয়া অপরের উচিত নহে। কোন ব্যক্তি আহারের জন্য যাহা ধরিয়াছে তাহাকে সেই ব্যক্তির অধিকারভুক্ত বলা যায়। এইরূপ ভোজনে উপবিষ্ট লোকের মধ্যে যদি কেহ 'সাধারণ দস্তরখান' হইতে খাদ্য দ্রব্য সরাইয়া এমন স্থানে রাখে যে তথায় অন্যের হাত বাড়াইবার উপায় নাই, তবে তেমন ভাবে রক্ষকের ব্যবহার নিতান্তই গর্হিত হইবে। ইহসংসারে নিজের অভাবমোচনে যতটুকু ধনের আবশ্যক তদপেক্ষা অধিক ধন, অপর অভাব-গ্রস্ত লোকের সম্মুখ হইতে সরাইয়া বাক্সে বা গোলায় পুরিয়া রাখা বা মাটীর নীচে পুঁতিয়া রাখাও তদ্রূপ গর্হিত। নিজের অভাব-মোচনের পর উদ্বৃত্ত ধন অপর অভাবী লোকের মধ্যে বিলাইয়া দিবার আদেশ, প্রচলিত আইনে বা প্রকাশ্য ফৎওয়া শাস্ত্রের বিধানে নাই। তাহার কারণ এই যে আবশ্যকতার সীমা নির্ণয় করা বড় দুষ্কর। কি পরিমাণ ধনে এক জনের অভাব ঘুচিতে পারে তাহা জানা যায় না। অভাব-মোচনের পর, যে ধন উদ্বৃত্ত রহিবে তাহা অপরে লইতে পারিবে বলিয়া আইন করিলে মহা হট্টগোল বাধিত। তখন কেহ বলিত অমুকের এত ধনের প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া তাহার ধন কাড়িয়া লইত। সমাজ-স্থিতির অনুরোধে তদ্রূপ বিধান পরিত্যাগ করা হইয়াছে। কিন্তু পরিত্যাগ করিয়াও ভাল কাজ করা হয় নাই। ইহা বিশ্ব-পতির হেকমৎ মূলক আদিম উদ্দেশ্যের বিপরীত হইয়াছে। কেননা তিনি ধন জমা করিয়া বান্ধিয়া রাখিতে নিষেধ করিতেছেন।

ধন দওলতের মধ্যে বিশেষ করিয়া খাদ্য শস্য আদি আবদ্ধ রাখা আল্লার বড়ই অপ্রিয় কার্য্য—কেননা এই খাদ্য শস্যই মানুষের জীবনোপায়। 'দুষ্প্রাপ্য হইলে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিব' এই উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি খাদ্য শস্য গোলা-বন্দ করিয়া আবদ্ধ রাখে সে ব্যক্তি আল্লার অভিশাপগ্রস্ত। এমন কি যে ব্যবসায়ী ব্যক্তি খাদ্য শস্য ধার দিয়া 'দেড়ী' কি 'দুনা' আদায় করে সে ব্যক্তিও অভিশপ্ত। ইহার কারণ এই যে, খাদ্য শস্য সমাজ-রূপ দেহের বল। শস্যের ক্রয় বিক্রয় করিতে গেলে সেই

খাদ্যশস্য ও স্বর্ণ রৌপ্য আবদ্ধ রাখা হারাম কেন?

বল আটক রাখিতে হয়—খাদ্য শস্য অবাধে সর্ব্বত্র প্রচলিত রাখিবার বন্দোবস্ত করা বাঞ্ছনীয়। এক স্থানে গোলাবন্দি করিয়া রাখিলে অভাবগ্রস্ত স্থানে শীঘ্র পহুঁছিতে পারে না। স্বর্ণ রৌপ্য আবদ্ধ রাখাও হারাম। দুইটী উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য মহাপ্রভু স্বর্ণ রৌপ্যকে একটী কৌশল করিয়া সৃজন করিয়াছেন। প্রথম উদ্দেশ্য উহার সাহায্যে আবশ্যকীয় পদার্থের মূল্য নির্ণয় করা। একটী অশ্বের বিনিময়ে কয়টী ছাগল পাওয়া যায় বা একটী ছাগলের বদলে কয়খানি বস্ত্র মিলে তাহা লোকে প্রথমে স্থির করিতে পারে না। কিন্তু ঐরূপ আবশ্যকীয় দ্রব্যের বিনিময় করা সংসারে নিতান্ত প্রয়োজন। আবশ্যকীয় দ্রব্য নানা প্রকার এবং তৎসমুদয় দ্রব্য, একজনকে অন্যের নিকট বিনিময়ে আদান প্রদান করা প্রায় সদা সর্ব্বদা আবশ্যক হয়। এই বিনিময় কার্য্যে পদার্থের মূল্য নির্ণয় করিয়া দিবার জন্য সমাজে এক জন বিচক্ষণ বিচারককে সর্ব্বদার জন্য নিযুক্ত রাখিতে হইত। এবং তাঁহার কার্য্যও বহু বিস্তৃত হইত। বিশ্বপতি অতি সহজ কৌশলে সেই মূল্য নির্ণয় কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য স্বর্ণ রৌপ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। ফল কথা, মনুষ্য সমাজে প্রত্যেক পদার্থের মূল্য নির্ণয়ে, স্বর্ণ রৌপ্য, বিচক্ষণ বিচারকের কার্য্য করিতেছে। যে ব্যক্তি সেই স্বর্ণ রৌপ্যকে বাক্স মধ্যে বন্ধ করিয়া বা মাটীর মধ্যে পুঁতিয়া রাখে, সে যেন, সেই বিচারককে বন্দী করিয়া রাখিল বুঝিতে হইবে। যে ব্যক্তি স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা জলপাত্র বা পান পাত্র প্রস্তুত করে সে যেন সমাজের সেই শ্রেষ্ঠ বিচারককে নিকৃষ্ট জলবাহী বানাইয়া রাখিল বুঝিতে হইবে। জলপাত্র বা পানপাত্র মৃত্তিকা বা তাম্র হইতে প্রস্তুত হইতে পারে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—জন-মনোরঞ্জন করা। মানবের মনোরঞ্জন মানসে সৃষ্টি-কর্ত্তা স্বর্ণ রৌপ্যকে এক চমৎকার কৌশল স্বরূপ প্রস্তুত করিয়াছেন। এই দুই ধাতুকে আল্লা মনোহর রত্ন স্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। নর নারী সকলেই উহা পাইতে ভালবাসে। এই কারণে তৎ পরিবর্ত্তে যে কোন পদার্থ পাওয়া যায়। তাঁতী কাপড় প্রস্তুত করে—কাপড় তাহার হাতে থাকে, কিন্তু তাহার ঘরে আহারের চাউলের অভাব হয়; কৃষক ধান্যের আবাদ করে—চাউল তাহার হাতে প্রচুর পরিমাণে থাকে, অথচ তাহার কাপড়ের প্রয়োজন না থাকিলে নিজের চাউল দিয়া তাঁতীর কাপড় লইতে

বিনিময়ের উৎকৃষ্ট বাহন—স্বর্ণ রৌপ্য। (দ্বিবিধ কারণ)

সম্মত হয় না। এই জন্য সৃষ্টিকর্তা স্বর্ণ রৌপ্যকে সর্ব্বজনমনোহর করিয়াছেন। সকলেই আপন আপন দ্রব্যের বিনিময়ে লোভনীয় স্বর্ণ রৌপ্য লইতে আগ্রহ করিয়া থাকে। এই কৌশলের প্রভাবেই মানব-সমাজে ক্রয় বিক্রয়—আদান প্রদান প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা সুন্দর মত বুঝিতে পারা যায় যে, স্বর্ণ রৌপ্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন অভাব মোচনই করিতে পারে না। ক্ষুধা হইলে কেহই উহা খাইতে পারে না, আবার উহা খাইলেও ক্ষুধা দূর হয় না; বরং পীড়া জন্মে। স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা এই কার্য্যটুকু সম্পাদিত হয় যে, উহার বিনিময়ে ক্ষুধা নিবারণের উপযোগী খাদ্য পাওয়া যাইতে পারে। ফল কথা, অভাব নিবারণের উপযুক্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দেওয়াই স্বর্ণ রৌপ্যের কাজ। এই কারণে যদি কেহ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে স্বর্ণের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য ক্রয় বিক্রয়ের কারবার খোলে, তবে আল্লার উদ্দেশ্যের বিপরীত বলিয়া অন্যায় কার্য্য হইবে। অভাব-মোচনোপযোগী দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিতে স্বর্ণ রৌপ্যের যে ক্ষমতা আছে, তদ্রূপ কারবারে তাহাদিগকে স্ব স্ব ক্ষমতাশূন্য করা হয়; সুতরাং যে উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সৃষ্টিকর্ত্তা সোনা রূপা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইতে উহাদিগকে নিষ্কর্ম্মা করিয়া রাখা হয়। (এই জন্য শরীঅতে (ধর্ম্মশাস্ত্রে) সোনা চান্দীর বদলে সোনা রূপার কারবার করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।) সেই নিষেধের মূল কারণ হয়তো তোমরা এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছ। এইরূপ শরীঅতের প্রত্যেক বিধানের যৌক্তিকতা ও আবশ্যকতার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করা যায়।

শরীঅতের বিধান অযৌক্তিক বা উদ্দেশ্যহীন নহে। যাহা হউক, ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন বিধানকে অযৌক্তিক বা উদ্দেশ্যহীন বলিয়া কখনই মনে করিও না, বরং বিধানটী যেরূপ হওয়া আবশ্যক ঠিক সেই প্রকারই হইয়াছে। তবে কতকগুলি বিষয়ের মধ্যে উদ্দেশ্য এত সূক্ষ্ম ও হেকমৎ এত বিজড়িত যে পয়গম্বর লোক ব্যতীত অন্যে তাহা জানিতে পারে না। আর কতকগুলি বিষয়ের উদ্দেশ্য ও হেকমৎ এত গুপ্ত যে পরিপক্ক আলেম লোক ভিন্ন সাধারণ আলেম তাহা বুঝিতে পারে না। যে সকল আলেম পরিপক্ক নহে, তাহাদিগকে অন্য পরিপক্ক আলেমের

শরীঅতের বিধান সাধারণের জন্য প্রকাশ্য ও সহজ কিন্তু ধর্ম্মপথে গমনোৎসুকের জন্য হেকমতের সূক্ষ্ম ও গুপ্ত তথ্যে পূর্ণ।

পদানুসরণ করিতে হয়। অপরিপক্ক আলেম প্রায় সাধারণ লোকেরই তুল্য। সাধারণ ব্যবস্থাশাস্ত্রে যে কর্ম্মকে অপ্রিয় বলা হইয়াছে, তাহাকে সূক্ষ্মদর্শী আলেমগণ হারাম বিবেচনা করেন। এক জন জ্ঞানী আলেম ভ্রম বশতঃ প্রথমে স্বীয় বাম পদ জুতার মধ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই ক্রটীর প্রায়শ্চিত্ত করিতে তিনি কয়েক বস্তা গোধুম গরীব দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাজে লোকের তদ্রূপ ক্রটীকে আদৌ ক্রটী বলিয়া ধরা হয় না। কোন বাজে লোক বিনা কারণে বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিলে বা কাবা শরীফের দিকে থুক্ ফেলিলে, কিম্বা বাম হস্তে কোরআন শরীফ ধারণ করিলে আমরা তত অপ্রিয় বলিয়া ধরি না। কিন্তু কোন বিশিষ্ট জ্ঞানী লোক হইতে ঐ প্রকার ক্রটী প্রকাশ পাইলে আমাদের দৃষ্টিতে অতীব কঠোর অপ্রিয় বলিয়া বাধে। কাজ কর্ম্মে ক্রটী ও বেআদবী কেবল বাজে লোক হইতেই প্রায় ঘটে। তাহার কারণ এই যে তাহারা সৎস্বভাবের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবার পথ পায় নাই; শৈশব কাল হইতে এখনও তাহারা পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিয়া থাকে; কোন কাজ তাহারা বিচার পূর্ব্বক করিতে পারে না। সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লা কি অভিপ্রায়ে কোন্ কার্য্য কিরূপ কৌশলে নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাহার সূক্ষ্ম তত্ত্ব তাহারা জানে না। যে সকল মূর্খ লোক বড় বড় গর্হিত কাজ করে, তাহাদিগকে সামান্য ক্রটীর জন্য নিন্দা করিলে কি ফল? যদি কোন মূর্খ লোক এক জন স্বাধীন ব্যক্তিকে বান্ধিয়া আনিয়া ঠিক জুমার নমাজের আজানের সময়ে বিক্রয় করে, তবে আজানের সময়ে সে বিক্রয় করিল বলিয়া তাহাকে তিরস্কার করা বৃথা। কেননা তৎকালে ক্রয় বিক্রয় করা অবশ্যই অপ্রিয় কার্য্য। কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া বিক্রয় করা একটী গুরুতর পাপ। যে ব্যক্তি গুরুতর পাপ করে, তাহাকে সামান্য ক্রটীর জন্য ধমক দেওয়া বৃথা। এইরূপ পশ্চিম দিকে পিঠ করিয়া বাহ্যে বসা অপ্রিয়। কিন্তু যে ব্যক্তি মছ্‌জেদে মেহ্‌রাবের মধ্যে পশ্চিম দিকে পিঠ করিয়া বাহ্য করিয়াছে, তাহাকে 'পশ্চিম দিকে পিঠ করিয়া বাহ্য করিল' বলিয়া ধমক দেওয়া বৃথা। পশ্চিম মুখে বাহ্য করা একটী ক্রটী, কিন্তু মছ্‌জেদের মধ্যে বাহ্যে যাওয়া পাপ আবার মেহ্‌রাবের মধ্যে বাহ্য করা তদপেক্ষা গুরুতর পাপ। যাহা হউক, সাধারণ লোকের ক্রটী, উপেক্ষার চক্ষে দর্শন করিতে পারা যায়।

তাহাদের জন্য ব্যবস্থাশাস্ত্রের আদেশগুলি নিতান্ত সহজ ও সদয় ভাবে করা হইয়াছে। পরকালের উন্নতিপথে গমনোৎসুক ব্যক্তিদিগকে সাধারণ ব্যবস্থাশাস্ত্রের প্রকাশ্য বিধানে সন্তুষ্ট থাকা প্রচুর নহে—তাহাদিগকে হেকমতের সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য চিনিয়া বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করা কর্ত্তব্য। তদ্রূপে কার্য্য করিবার অভ্যাস জমাইয়া লইলে ফেরেশ্‌তার সমান উন্নতি পাইতে পারা যায়। কিন্তু যাহারা তদ্রূপ সতর্কতার সহিত কার্য্য না করিয়া শিথিলতা অবলম্বন করে, তাহারা পশু ও বাজে লোকের শ্রেণীতেই রহিয়া যায়—উন্নতির পথে চলিতে স্থান পায় না।

মানবের সম্পদ ও বিপদের ক্রমিক শ্রেণী বিভাগ—পাঠক! জানিয়া রাখ, **চারি প্রকার** পদার্থকে সৃষ্টিকর্ত্তা, মানুষের ভাগ্যের সহিত জড়িত করিয়া সৃজন করিয়াছেন। **প্রথম** প্রকার পদার্থ—ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে হিতকর; যথা—জ্ঞান ও সৎস্বভাব। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দুইটী মানবের জন্য সর্ব্বপ্রধান সম্পদ। **দ্বিতীয়** প্রকার পদার্থ—উভয় জগতে ক্ষতিকর, যথা—মূর্খতা ও মন্দ স্বভাব। এই দুই পদার্থই প্রকৃত প্রস্তাবে মানবের বিপদ। **তৃতীয়** প্রকার পদার্থ—ইহকালে আরাম ও আনন্দ দিতে পারে বটে কিন্তু পরকালে দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। সাংসারিক ধনৈশ্বর্য্যের আধিক্য, এবং তৎসম্ভোগে প্রমত্ত হওয়া এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মূর্খ লোকেরা ধনৈশ্বর্য্যের সুখভোগকে সম্পদ জ্ঞান করে; কিন্তু জ্ঞানী ও চক্ষুষ্মান লোক তৎসমুদয়কে বিপদ বলিয়া জানেন। দেখ—ক্ষুধিত ব্যক্তির সম্মুখে বিষ মিশ্রিত মধু একটী সুখকর লোভনীয় দ্রব্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু জ্ঞানী লোকেরা উহাকে বিনাশের কারণ বলিয়া ভয় করেন। **চতুর্থ** প্রকার দ্রব্য—ইহকালে কষ্ট ও দুঃখ প্রদান করে বটে কিন্তু তাহার ফলে পরকালে অতুল আরাম ও আনন্দ উপভোগে পাওয়া যায়। সদ্‌গুণ উপার্জ্জনের জন্য পরিশ্রম এবং প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া চলা ইহার অন্তর্গত। এইরূপ কার্য্যে গুরুতর কষ্ট পাইতে হয়; চক্ষুষ্মান লোক এরূপ কষ্টকে সম্পদ্‌ বলিয়া জানেন কিন্তু নির্ব্বোধ লোক তদ্রূপ কষ্টকে বিপদ বলিয়া বিবেচনা করে।

মানবের সম্পদ ও বিপদের প্রকৃত পরিচয়—প্রিয় পাঠক! এস্থলে এই কথাটীও জানিয়া রাখ যে ইহসংসারের অধিকাংশ পদার্থের মধ্যে লাভ ও ক্ষতি বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। যে পদার্থে ক্ষতি অপেক্ষা লাভ

 অধিক

অধিক পাওয়া যায় তাহাকেই সম্পদ বলা যায়; সেই লাভ বা ক্ষতির মাত্রা লোকের অবস্থা অনুসারে বদলিয়া যায়। দেখ—ধন একটী প্রধান সম্পদ; ইহার মধ্যে লাভ ও ক্ষতি উভয়ই নিহিত আছে। অভাব-মোচনের-পরিমিত ধন অধিকাংশ স্থলে ক্ষতি অপেক্ষা মঙ্গল অধিক মাত্রায় উৎপন্ন করিয়া থাকে। আবার কোন স্থলে ইহাও দেখা যায় যে অতি অল্প পরিমিত ধনও হাতে আসিলে কোন কোন ব্যক্তির মনে লোভ ও লালসা জন্মাইয়া দেয়, সুতরাং ক্ষতি করিয়া থাকে। যদি কিছু মাত্র ধন তাহার হস্তগত না হইত, তবে সে ব্যক্তি লোভ ও লালসার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত। আবার কোন কোন লোকের মন এমন অটল ও মজবুৎ যে অসীম ধনেও তাহার মনে লোভ লালসা উৎপন্ন করিয়া দিতে সক্ষম হয় না সুতরাং প্রভূত ধনেও তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। আবার তদ্রূপ অতুল ধনের অধিপতি যদি অকাতরে স্বীয় ধন অভাব গ্রস্ত লোকদিগকে বিতরণ করিয়া দিতে পারে তবে প্রচুর মঙ্গলের অধিকারী হইতে পারে। এই কারণে বুঝা যায় একই বস্তু অবস্থাগতিকে কোন ব্যক্তির মঙ্গল উৎপন্ন করে সুতরাং সম্পদ্ বলিয়া গণ্য হয় আবার অন্যের পক্ষে অনিষ্ট করিয়া থাকে বলিয়া আপদ হইয়া দাঁড়ায়।

পদার্থ বিশেষ মানবের পক্ষে কতদূর হিতকর বা অনিষ্টকর তাহার আলোচনা—পাঠক! আর একটী জটিল কথা বুঝিয়া লও। লোকে যে পদার্থকে হিতকর বলিয়া জানে তাহার তিনটী অবস্থা আছে। প্রত্যেক হিতকর পদার্থের মধ্যে সেই তিন অবস্থার কোন না কোন অবস্থা অবশ্যই থাকিবেই থাকিবে; যথা—(১) বর্ত্তমানে, বস্তুটী বাঞ্ছনীয়। (২) বর্ত্তমানে হিতকর। (৩) ভবিষ্যতে হিতকর। আবার যে পদার্থ মন্দ তাহারও তিন অবস্থা আছে; যথা—(১) বর্ত্তমানে অপ্রিয়। (২) বর্ত্তমানে ক্ষতিকর। (৩) ভবিষ্যতেও ক্ষতিকর। উত্তম পদার্থের মধ্যে যাহাতে উপরোক্ত তিনটী অবস্থা একত্র দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ বর্ত্তমানে যাহা প্রিয় ও হিতকর এবং ভবিষ্যতেও হিতকর তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও নিতান্ত হিতকর পদার্থ। এরূপ পদার্থ, জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নহে। ইহার বিপরীত পদার্থ, পূর্ণ-অজ্ঞানতা; ইহা সদ্য অপ্রিয়, অহিতকর ও ভবিষ্যৎ অহিতকর। পাঠক! অবশ্য জানিতে পারিয়াছ, জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হিতকর পদার্থ আর কিছুই নাই। তবে ইহাও জানিয়া রাখ—

যাহার অন্তরে কোন প্রকার পীড়া নাই, তাহার পক্ষেই উহা অসীম হিত উৎপাদন করে। অজ্ঞানতা বর্ত্তমান অবস্থায় অপ্রিয় এবং মনে দুঃখ উৎপাদন করে। যে ব্যক্তি কিছু জানে না এবং তজ্জন্য মনোবেদনা পায়, সে যদি জানিবার জন্য ইচ্ছা করে তবে অবশ্যই জ্ঞান লাভ করিতে পারে। সে স্থলে তাহার মূর্খতা পরিণামে মঙ্গল আনয়ন করিতে পারে। কিন্তু জ্ঞানলাভের জন্য যাহার আদৌ ইচ্ছা নাই তাহার অজ্ঞানতা বড় ক্ষতিকর। অজ্ঞানতা অনিষ্টকর ও মন্দ হইলেও উহা বাহিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন অনিষ্ট করে না—কেবল অন্তরের মধ্যে সে অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া দেয় অর্থাৎ অজ্ঞানতা, হৃদয়ের আকার প্রকার বদলাইয়া নিতান্ত কুৎসিৎ করিয়া দেয়। শরীরের উপরিভাগের ক্ষতি অপেক্ষা আত্মার আভ্যন্তরিক ক্ষতি অধিক অনিষ্টকর। যাহা হউক, আর কতকগুলি পদার্থ আছে—তাহা হইতে মঙ্গল উৎপন্ন হইলেও প্রথমে তৎসমুদয়কে অপ্রিয় ও কষ্টকর বলিয়াই বুঝা যায়। যাহার অঙ্গুলে পচনশীল ক্ষত হইয়াছে এবং তৎপ্রভাবে সমস্ত হস্ত অকর্ম্মণ্য হইবার উপক্রম হইয়াছে তাহার দূষিত অঙ্গুলীটী কাটিয়া ফেলিলে সমস্ত হস্তখানি রক্ষা পাইতে পারে বলিয়া উপকার মনে করা যায়। আবার এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে, তাহা এক হিসাবে হিতকর, অন্য হিসাবে ক্ষতিকর। মনে কর, ক্ষুদ্র নৌকায় অতিরিক্ত মাল বোঝাই করিয়া দুস্তর ভীষণ নদী পার হইবার কালে গুরু ভারে নৌকা ডুবিবার উপক্রম হয় সে সময়ে নিজের জীবন রক্ষার জন্য কিয়দংশ মাল নিক্ষেপ করিয়া জীবন রক্ষা করা লাভকর (টীঃ ২৮৬)।

আনন্দ ও আরামের শ্রেণী বিভাগ—লোকে সচরাচর বলিয়া থাকে যে, যাহা ভাল লাগে—যাহা হইতে আনন্দ ও আরাম পাওয়া যায়, তাহাই ধন সম্পদ্। কিন্তু সে কথা ঠিক নহে। আনন্দ ও আরামের **তিন** শ্রেণী আছে। **প্রথম** শ্রেণীর আনন্দ নিতান্ত জঘন্য কার্য্য হইতে পাওয়া যায়; যেমন—পান আহার জনিত আনন্দ এবং স্ত্রী-সম্ভোগের সুখ। অধিকাংশ লোক এই দুই কার্য্যকে আনন্দদায়ক ও আরামের কারণ বলিয়া মনে করে এবং তদ্রূপ কার্য্যে দিবা রজনী ডুবিয়া থাকে। তাহারা ইহসংসারে

টীকা—২৮৬। হিতকর প্রিয় কার্য্যের তিন অবস্থা ও অনিষ্টকর অপ্রিয় কার্য্যের তিন অবস্থা প্রদর্শন করিতে যে যুক্তি অবলম্বিত হইয়াছে তাহাতে অর্থ তত প্রস্ফুটিত হয় নাই তদর্থে একটী তালিকা দেওয়া গেল— (পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যে সকল কার্য্য করিয়া থাকে তৎসমুদয় কেবল ঐ দুই শ্রেণীর আনন্দ-ভোগের উপায় হস্তগত করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই দুই শ্রেণীর আনন্দ যে নিতান্ত জঘন্য তাহার প্রমাণ এই যে পশু পক্ষী ইতর জন্তুও উহা ভোগের অধিকারী। বরং কোন কোন ইতর জন্তু আহার ও স্ত্রী-সম্ভোগ বিষয়ে মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এমন কি সামান্য কীট পতঙ্গের মধ্যেও এমন প্রাণী আছে তাহারা ঐ দুই বিষয়ে মনুষ্য অপেক্ষা অধিক আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। এমন স্থলে যে মানব পান-ভোজনে ও স্ত্রী-সম্ভোগে নিজকে ডুবাইয়া রাখিয়াছে সে ব্যক্তি কেবল উক্ত প্রকার নিকৃষ্ট প্রাণীর ন্যায় নিকৃষ্ট আনন্দ ভোগের জন্য জীবিত থাকে। **দ্বিতীয় শ্রেণীর আনন্দ**—অপরের উপর প্রাধান্য ও সর্দ্দারী করিতে পাইলে জন্মে। ক্রোধাদি কতকগুলি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিলে এই আনন্দ পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর আনন্দ, উদরপূর্ত্তি ও স্ত্রী-সম্ভোগ জনিত আনন্দ অপেক্ষা

কার্য্যের নাম।	প্রিয় বা অপ্রিয়।	বর্ত্তমানে ভাল কি মন্দ।	ভবিষ্যতে ভাল কি মন্দ।
জ্ঞান	প্রিয়	হিতকর	হিতকর
মূর্খতা	অপ্রিয়	অহিতকর	অহিতকর
মূর্খতা (জানিবার ইচ্ছাযুক্ত)	ঐ	কষ্টকর	হিতকর
রোগ গ্রস্ত অঙ্গুলী কর্ত্তন	ঐ	কষ্টকর	মঙ্গলকর
প্রাণ রক্ষার জন্য নৌকা হইতে বোঝা নিক্ষেপ করা	ঐ	মাল নিক্ষেপ অপ্রিয়	নৌকা রক্ষা বাঞ্ছনীয়
ঐ	ঐ	মাল নষ্ট ক্ষোভ জনক	প্রাণ রক্ষা বাঞ্ছনীয়
দুগ্ধ পান	প্রিয়	পরিমিত পান হিতকর	বল বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়
ঐ	ঐ	অপরিমিত পান অনিষ্টকর	উদরাময় জনক অজীর্ণ—মন্দ

উৎকৃষ্ট হইলেও অধম আনন্দের মধ্যে গণ্য। ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুও এরূপ আনন্দের অধিকারী। তৃতীয় শ্রেণীর আনন্দ—কেবল জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা এবং আল্লার দর্শন ও তাহার বিচিত্র শিল্পনৈপুন্য পর্য্যবেক্ষণ হইতে উৎপন্ন হয়। এই শ্রেণীর আনন্দ অতীব উৎকৃষ্ট পদার্থ, কোন ইতর জন্তু এরূপ আনন্দের অধিকারী হইতে পারে না। ফেরেশ্‌তাগণ এ ধরণের আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। যাহারা এই শ্রেণীর আনন্দ উপভোগে অভ্যস্ত, তাহারা পূর্ণ গুণগ্রাহী এবং তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর আনন্দে (টীঃ ২৮৭) পরিতৃপ্ত করিতে পারে না কিন্তু যাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আল্লার দর্শন হইতে আনন্দ পায় না তাহাদের হৃদয় পীড়িত ও অকর্ম্মণ্য। অধিকাংশ মুছলমান লোক আল্লার দর্শন-জ্ঞান হইতেও আনন্দ পায় এবং ভোগ-সম্ভোগ ও সরদারী হইতেও আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু যাহার অন্তরে 'মারেফৎ' বা দর্শন-জ্ঞান-জনিত আনন্দের মধুরতা, প্রবল এবং ভোগ-সম্ভোগ ও সরদারীর আনন্দের মাধুর্য্য লঘু ও গুপ্ত সে ব্যক্তি পূর্ণ উন্নত শ্রেণীর নিকটবর্ত্তী। আর যাহার অন্তরে শেষোক্ত ধরণের আনন্দ, প্রথোমক্ত দর্শনজ্ঞানের আনন্দ অপেক্ষা প্রবল থাকে এবং সে যদি সেই দুর্ব্বল দর্শন-জ্ঞান-পিপাসাকে প্রবল ও বলবান করিয়া তুলিবার চেষ্টা না করে তবে সে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণীর নিকটবর্ত্তী। ইহাই পুণ্যের পাল্লা ভারী বা হাল্‌কা হইবার অর্থ।

পারলৌকিক সৌভাগ্যই মানবের একমাত্র প্রকৃত সম্পদ— পাঠক! জানিয়া রাখ—প্রকৃত সম্পদ, পারলৌকিক সৌভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরকালের সৌভাগ্যই মানুষের প্রকৃত অভিলষিত পদার্থ। উহা মোটামুটী একটী পদার্থ হইলেও উহার চারিটী ভাগ আছে। (১) অনন্ত কালস্থায়ী জীবন—যাহার শেষ নাই। (২) অনন্ত সুখ—যাহার মধ্যে দুঃখের লেশ নাই। (৩) পূর্ণ জ্ঞান বা সর্ব্বদর্শনের ক্ষমতা—যাহার মধ্যে অজ্ঞানতান্ধকারের স্পর্শ নাই। (৪) পূর্ণ তৃপ্তি—যাহার মধ্যে আকাঙ্খার অধিকার নাই। এই চারিটী একত্রে এক সৌভাগ্য নামেই কথিত হয়। আল্লার অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে সর্ব্বতোভাবে মগ্ন হইবার সৌভাগ্য পাইতে পারিলে উক্ত চতুর্ব্বিধ সৌভাগ্য হস্তগত হইতে পারে। উহাই প্রকৃত সম্পদ।

টীকা—২৮৭। (১) উদর তৃপ্তি ও স্ত্রী-সম্ভোগ-জনিত আনন্দ এবং (২) প্রভুত্ব-জনিত আনন্দ।

পার্থিব পূর্ণ নেআমতের পরিচয়—পৃথিবীতে যে সকল পদার্থকে সম্পদ বলিয়া ধরা যায়, তৎসমুদয় ঐ প্রকৃত সম্পদ হস্তগত করিবার উপায় বা উপকরণ মাত্র। পৃথিবীর সম্পদগুলি প্রকৃত পক্ষে অভিলষিত পদার্থ নহে। তৎসমুদয় কেবল পরকালের প্রকৃত সৌভাগ্য লাভ করিবার উপকরণ মাত্র। এই মর্ম্মেই মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন "পরকালের আরামই প্রকৃত আরাম" এই বাক্য তিনি একবার দরিদ্রতার কঠিন নিপীড়নে পড়িয়া বলিয়াছিলেন, সে সময়ে বলিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, সাংসারিক কষ্ট যেন মনে তীব্র যাতনা না দিয়া মনে সন্তোষ ও শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখে। আর একবার ঠিক ঐ বাক্যটী তিনি চূড়ান্ত আনন্দের সময়ে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ইহা সেই বিখ্যাত শেষ বিদায়ী-হজ সমাপনান্তে পূর্ণ আনন্দের দিনের কথা। এছলাম ধর্ম্মের পূর্ণতা বিধানে যে শিক্ষা দীক্ষা ও উপদেশ আবশ্যক ছিল. তৎসমুদয় সে সময় পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইয়াছিল। তিনি উষ্ট্রের উপর উপবিষ্ট ছিলেন ; হজ ব্যাপারে সমাগত জনবৃন্দ তাঁহার পবিত্র মনোমুগ্ধকর মুখশ্রীর প্রতি অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়াছিল এবং হজের নিয়মাবলী সম্বন্ধে উপদেশ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছিল। কেহ অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সস্নেহ বচনে বুঝাইয়া দিতেছিলেন। এমন আনন্দের সময়ে উক্ত পবিত্র মর্ম্ম-কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে সাংসারিক আনন্দ-মাধুর্য্য যেন হৃদয় স্পর্শ না করে। উক্ত কৃতকার্য্যতা-মূলক পূর্ণ-আনন্দোৎসবের সময়ে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিয়াছিল—"হে আল্লা! তোমার স্থানে 'তামাম নেআমৎ' (পূর্ণ সম্পদ) চাহিতেছি।" এই প্রার্থনা বাক্য শ্রবণ করতঃ হজরৎ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হে ভ্রাতঃ! তুমি কি জান, পূর্ণ নেআমৎ কি প্রকার পদার্থ ?" সে ব্যক্তি জানে না বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। তখন হজরৎ বলিয়াছিলেন—"পূরা নেআমৎ সেই গুলি, যাহার জন্য বেহেশ্‌তে প্রবেশ লাভ ঘটে।" ইহকালের পদার্থগুলির মধ্যে, যাহা পরকালে সৌভাগ্য প্রাপ্তির উপায় না হয়, সেগুলি বাস্তবিক নেআমৎ (সম্পদ) নহে।

পারলৌকিক সৌভাগ্য প্রাপ্তির উপকরণগুলির সংখ্যা ও বিবরণ। যে সকল পদার্থ পারলৌকিক সৌভাগ্য প্রাপ্তির হেতু হয়, তৎসমুদয়ের সংখ্যা মাত্র **ষোলটী**। ইহারা চারিভাগে বিভক্ত। **প্রথম**—মনের সঙ্গে সম্পর্কিত পদার্থ—ইহারা চারিটী। **দ্বিতীয়**—শরীরের সঙ্গে

সম্পর্কিত পদার্থ—ইহারা চারিটি। তৃতীয়—শরীর হইতে দূরে থাকিয়া শরীরের হিতকর পদার্থ—ইহারা চারিটী। চতুর্থ—উপরি উক্ত তিনশ্রেণীস্থ ১২ বার প্রকার পদার্থ একত্র সমাবেশ ও পরিচালিত করিবার উপযোগী আর চারি প্রকার পদার্থ।

পারলৌকিক সৌভাগ্য প্রাপ্তির উপকরণগুলির প্রথম শ্রেণী—মনের সঙ্গে সম্পর্কিত পদার্থ। ইহারা চারি প্রকার। যথা—দর্শন-জ্ঞান, কর্ত্তব্যজ্ঞান, শান্তি ও বিচার।

(১) 'মারেফৎ' বা দর্শন জ্ঞান। আল্লা ও তাঁহার গুণ, পরকাল, ফেরেশ্‌তা ও পয়গম্বর সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ-জ্ঞানকে এ স্থলে দর্শন-জ্ঞান বলা গেল। (মূলগ্রন্থে এই প্রকার প্রত্যক্ষ-জ্ঞানকে 'মোকাশফা বলা হইয়াছে)।'

(২) কর্ত্তব্য-জ্ঞান। ইহাকে علم معاملہ 'এল্‌মে মোআমেলা' বলা হইয়াছে। 'এবাদৎপুস্তকে' ও 'ব্যবহার পুস্তকে' যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্যের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, বিনাশন পুস্তকে যে সকল মারাত্মক দোষের বিভীষিকা দেখান হইয়াছে এবং 'পরিত্রাণ পুস্তকে' যে সকল গুণ উপার্জ্জনের সন্ধান দেওয়া হইবে, সমস্তই এই কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অন্তর্গত।

(৩) শান্তি। লোভ লালসাদি কুপ্রবৃত্তি ও ক্রোধাদির শক্তি চূর্ণ করিয়া পূর্ণ সাম্যভাব ও সৎস্বভাব অর্জ্জনকে 'শান্তি' বলা হইয়াছে।

(৪) বিচার। লোভ কামনাদি প্রবৃত্তি ও ক্রোধকে হৃদয়রাজ্য হইতে নির্ম্মূল করিয়া ফেলাও ক্ষতির কারণ এবং সর্ব্বদা তাহাদের আদেশ মত পরিচালিত হওয়াও বিনাশের লক্ষণ; বরং তৎসমুদয় কুপ্রবৃত্তিকে আজ্ঞাধীন করিয়া সাম্যভাবে আনয়ন করা সৌভাগ্যের হেতু। ঐ সকল কুপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতে লাগিলে খাটো করা এবং দমিয়া গিয়া নির্মূল হইতে চলিলে বাড়াইয়া দেওয়া বিচারের কার্য্য। ঐরূপ নিক্তির মাপে, হ্রাস বৃদ্ধি নিবারণ পূর্ব্বক সাম্যাবস্থায় আনয়ন করিতে বিশেষ বিচার-দক্ষতার প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলিতেছেন—

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ○ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ

بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ○

"পরিমাপ কার্য্যে সীমা লঙ্ঘন করিও না। এবং বিচারের সহিত ওজন করিতে (দাঁড়ী পাল্লা) খাড়া কর এবং পরিমাপ কম করিও না।" (২৭ পারা। সুরা রহমান। ১ রোকু)। উপরি লিখিত চারিটী পদার্থ অন্তরস্থ সম্পদ।

পারলৌকিক সৌভাগ্য প্রাপ্তির উপকরণগুলির দ্বিতীয় শ্রেণী—শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ লাগাইয়া যে চারি প্রকার সম্পদ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সাহায্য ব্যতীত উপরিবর্ণিত অন্তরস্থ সম্পদ্ কোন কাজ করিতে পারে না। শারীরিক সম্পদ্ চারি প্রকার যথা—(৫) স্বাস্থ্য; (৬) বল; (৭) মনোহর চেহারা; (৮) পরমায়ু।

(৫, ৬, ৮,) স্বাস্থ্য, বল ও পরমায়ু। এই তিন পদার্থের সহিত পারলৌকিক কার্য্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সকলেই বুঝিতে পারে। এই তিন পদার্থের অভাবে জ্ঞান, সৎকার্য্য বা সৎস্বভাব প্রভৃতি আন্তরিক গুণ কোন কাজে লাগে না।

(৭) মনোহর চেহারা। জ্ঞানাদি আন্তরিক সম্পদের সহিত স্বাস্থ্য বল ও জীবনের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সুন্দর চেহারার তত ঘনিষ্টতা নাই। তথাপি সুন্দর লোকের কার্য্যে, সকলেই ইচ্ছা পূর্ব্বক সাহায্য করে। ধন ও প্রতিপত্তির প্রভাবে লোকে যেমন অন্যের নিকট হইতে সাহায্য পায়; ভক্তিজনক সুন্দর আকৃতির প্রভাবেও তদ্রূপ সাহায্য পাইয়া থাকে। যে বস্তু সাংসারিক কাজ কর্ম্মে সাহায্য করে, সে বস্তু পারলৌকিক ব্যাপারেও সাহায্য করিয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সাংসারিক অভাব মোচন হইলে মন নিরুদ্বিগ্ন হইয়া পারলৌকিক কার্য্যে অবসর পায়। এই কারণে ইহসংসারকে পরকালের শস্যক্ষেত্র বলে। দ্বিতীয় কথা এই যে বাহিরের সুন্দর আকৃতি, আন্তরিক সৎভাবের পরিচায়ক। শারীরিক সৌন্দর্য্য করুণাময়ের প্রদত্ত একটী জ্যোতিঃ। তাহা ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেহের উপর চমকিতে আরম্ভ করে। ইহা প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, সৃষ্টিকর্ত্তা যাহার বাহিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুন্দর মত সজ্জিত করিয়াছেন, তাহার আন্তরিক মনোবৃত্তি অর্থাৎ স্বভাবও সুন্দর করিয়াছেন। এই কারণেই জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—মন্দ লোকেরা, স্বীয় কুস্বভাবের বিরুদ্ধে কখনই সুন্দর আকৃতি পাইতে পারে না। মহাপুরুষ হজরৎ রসুলে (ﷺ) বলিয়াছেন—"যদি কিছু চাহিতে হয়, তবে সুন্দর লোকের স্থানে চাও।" মহাত্মা হজরতৎ ওমর বলিয়াছেন—"যদি কোন কার্য্য উদ্ধারের জন্য দূত পাঠাইবার প্রয়োজন হয়, তবে উত্তম নাম বিশিষ্ট, দৃষ্টিধারী সুপুরুষকে

দূত করিয়া পাঠাও।" ধর্ম্মব্যবস্থাপক আলেমগণও বলিয়াছেন—ইমামতী করিবার জন্য দুই ব্যক্তি সমান উপযুক্ত ও সমান গুণবান হইলে, যে ব্যক্তি অধিক সুন্দর হইবে তাহাকে ইমাম করিয়া লইবে। প্রিয় পাঠক। এস্থলে 'সুন্দর আকৃতি' শব্দের অর্থ বুঝিয়া রাখ। যাহার আকার দর্শনে কাম ভাব জাগিয়া উঠে তাহার আকৃতিকে সুন্দর বলা হইতেছে না। তদ্রূপ আকৃতি কামিনীগণের সৌন্দর্য্য। যাহার দেহ উন্নত, সুঠাম, অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি সুগঠিত, একটির সহিত অন্যটী হিসাব মত বর্দ্ধিত দেখিলে দর্শকের মনে ভক্তির উদ্রেক হয়—বিরক্তি জন্মে না, চক্ষেও কোনরূপ বিরক্তিকর দৃশ্য পড়ে না তেমন লোককে সুন্দর বলা যায়।

পারলৌকিক সৌভাগ্য প্রাপ্তির উপকরণগুলির তৃতীয় শ্রেণী —যে সকল পদার্থ শরীর হইতে দূরে থাকিয়া শরীরের হিতে লাগে বলিয়া সম্পদ নাম প্রাপ্ত হয়, তাহার সংখ্যাও চারিটী; যথা—(৯) ধন; (১০) প্রতিপত্তি; (১১) স্ত্রী পুত্রাদি পরিজন; (১২) বংশ-মর্য্যাদা।

(৯) ধন। পরকালের কার্য্যে ধনের আবশ্যকতা এই কারণে দেখা যায় যে, ধনহীন দরিদ্র লোককে জীবিকা সংগ্রহে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিতে হয়, সুতরাং জ্ঞানার্জ্জনে ও সৎকার্য্য সম্পাদনে যথেষ্ট সময় পায় না। যাহা হউক, অভাব-মোচনের-পরিমিত ধন, ধর্ম্মজীবনে একটী বড় সম্পদ্।

(১০) প্রতিপত্তি। প্রতিপত্তি বা সম্মান এই কারণে ধর্ম্মপথে সম্পদ্ বলিয়া ধরা গিয়া থাকে; কেন না উহার প্রভাবেও অনেক অভাব বিমোচিত হয়। প্রতিপত্তি বা সম্মান না থাকিলে, সাধারণ লোকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং শত্রু লোক অনিষ্ট করিতে সাহসী হয়। তদ্রূপ ঘটনায় মন চঞ্চল হইয়া পড়ে —নিশ্চিন্ত মনে কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে পারা যায় না। আবার সেই ধন-দওলৎ ও প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি অসীম বর্দ্ধিত হইলে ধর্ম্মপথে আপদ হইয়া দাঁড়ায় এবং আত্মার বহু ক্ষতি করিয়া থাকে। এই কারণে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) বলিয়াছেন—"প্রাতে শয্যা-ত্যাগের সময়ে যদি শরীর সুস্থ, মন ভয়-শূন্য এবং দৈনিক খোরাকের সংস্থান থাকে তবে যেন সমস্ত পৃথিবী হস্তগত হইয়াছে এমন বুঝিতে হইবে।" ঐ অবস্থাটী বিনা ধনে ও বিনা সম্মানে লব্ধ হইবার উপায় নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন—"আল্লার জন্য পরহেজগারীর পথে, ধন কেমন সুন্দর সাহায্য করিয়া থাকে।"

(১১) স্ত্রী পুত্রাদি পরিজনবর্গ। ইহারা মানুষকে বহু কার্য্য-ব্যাপৃতি হইতে অবসর দিয়া থাকে। এই জন্য পরিবারবর্গকে একটী সম্পদ বলা যায়। তদ্ব্যতীত, পুরুষ যখন কাম প্রবৃত্তির অন্যায় উত্তেজনায় পতিত হয় তখন পত্নী আসিয়া সে উত্তেজনা থামাইয়া দিয়া পতির মন শান্ত করিয়া দেয়। এই কারণে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন—"সতী রমণী, ধর্ম্ম-কার্য্যে পুরুষকে মূল্যবান সাহায্য দিয়া থাকে।" স্বর্ণ রৌপ্য সঞ্চয় করিতে নিষেধ আজ্ঞা প্রচারিত হইলে মহাত্মা হজরৎ ওমর (রাজী আল্লা) মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তবে আমরা কোন্ ধন সঞ্চয় করিব?" তদুত্তরে হজরৎ বলিয়াছিলেন—"জেকের-কারিণী জিহ্বা, কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ হৃদয় ও ধর্ম্ম-পরায়ণা-রমণী।" সাধু সন্তান ইহসংসারে পিতা মাতাকে বহু সৎকার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকে এবং পিতা মাতার মৃত্যু হইলে তাঁহাদের পাপ মোচনের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকে। এই জন্য সুসন্তান আল্লার প্রদত্ত এক অমূল্য সম্পদ্। কিন্তু পিতামাতা অনেক স্থলে সন্তান-স্নেহে অতিরিক্ত মুগ্ধ হইয়া, সমস্ত বল দুনিয়ার জন্য খরচ করে; সে স্থলে সন্তান সন্ততি সম্পদ্ না হইয়া আপদ্ হয়।

(১২) বংশ-মর্য্যাদা। ইহাও একটী নেআমৎ (সম্পদ্)। সম্ভ্রান্ত বংশের সহিত সম্পর্ক থাকিলে লোকে স্বভাবতঃ সম্মান প্রদর্শন করে। এই জন্য সম্মানিত কোরেশ বংশীয় লোক সরদার হইবার উপযুক্ত। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন—"পবিত্র স্থানে বীজ বপন কর; অপবিত্র ভাগাড় ভূমি-জাত সবুজ বৃক্ষ পরিত্যাগ কর।" লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"হে রসুলুল্লা! ভাগাড়-ভূমি-জাত-সবুজ বৃক্ষ কি প্রকার?" তিনি বলিয়াছিলেন—"নিকৃষ্ট-বংশ-সম্ভূতা সুন্দরী রমণী।" যাহা হউক, পাঠক! উচ্চ বংশের সহিত সম্বন্ধ হইতে এ কথা বুঝিও না যে, সাংসারিক ধনৈশ্বর্য্যবান্ কোন বড় লোকের সহিত সম্পর্ক আছে। বরং ধর্ম্মজীবনে সাধু পরহেজগার আলেম লোকের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া বুঝিয়া লইবে। পরহেজগার আলেম-বংশের সহিত সম্বন্ধ এক বড় নেআমৎ—মহা সম্পদ্। পূর্ব্ব পুরুষগণের স্বভাব চরিত্র সন্তানের মধ্যে প্রবেশ করে। বৃক্ষের মূল ভাল হইলে শাখা প্রশাখাও ভাল হয়। এতদ্ উপলক্ষে সৃষ্টিকর্ত্তাও বলিতেছেন—

وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا

"এবং তাহাদের পিতৃপুরুষ সাধু ছিল।" (১৬ পারা। সুরা কাহাফ্। ১০রোকু)।

পারলৌকিক সৌভাগ্য প্রাপ্তির উপকরণগুলির চতুর্থ শ্রেণী— উপরি লিখিত তিন শ্রেণীস্থ বার প্রকার সম্পদ্ পরিচালিত করিবার জন্য আরও চারি প্রকার সম্পদের আবশ্যক যথা—(১৩) هدايت হেদায়েৎ —পথপ্রাপ্তি। (১৪) رشد রোশদ্—ইচ্ছা। (১৫) تشديد তশদীদ —চেষ্টা। (১৬) تائيد তাঈদ—সাহায্য। এই চারিটীকে একত্র করিলে সমবেত নাম হয় توفيق তওফীক্—সুযোগ। এই সুযোগই সমস্ত নেআমৎ বা সম্পদের মূল বস্তু। পূর্ব্বোক্ত ১২ বার প্রকার সম্পদ্, সমস্ত হস্তগত হইলেও যদি দয়াময় তৎসমুদয় গ্রহণ ও পরিচালনের সুযোগ না দেন তবে সে নেআমতে কিছুই ফল হয় না। 'তওফীক্' শব্দের প্রকৃত অর্থ আল্লার বিধানের সঙ্গে মানুষের ইচ্ছা ও চেষ্টার উত্তম যোগ বা মিল হওয়া অর্থাৎ আল্লার বিধান ও মানবের চেষ্টা পরস্পর বিরোধী না হওয়া। সৎ ও অসৎ উভয় কর্ম্ম পথে আল্লার নির্দ্ধারিত বিধান-চক্রের সহিত মানুষের চেষ্টায় গতি মিল খাইতে পারে, তথাপি ব্যবহারতঃ উহা সৎকার্য্যের মধ্যে মিল খাওয়াকে, তওফীক্ বা সুযোগ বলা যায়। পূর্ব্বোক্ত 'হেদায়েৎ' বা "পথ প্রাপ্তি" 'রোশদ্' বা ইচ্ছা, 'তাঈদ' বা সাহায্য এবং 'তশদীদ' বা চেষ্টা, এই চারি পদার্থের একত্র মিলনে তওফীক্ বা সুযোগ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়।

'তওফীক' বা সুযোগের প্রকৃত ব্যাখ্যা।

(১৩) 'হেদায়েৎ' বা পথপ্রাপ্তি। বিনা পথে কেহই লক্ষ্য স্থানে যাইতে পারে না। পরকালের-সৌভাগ্য-লোলুপ ব্যক্তিকে প্রথমে নিজের গন্তব্য-পথ চিনিয়া লইতে হয়। সুপথ চিনিতে না পারিয়া, বিপথকে সুপথ বলিয়া ধরিয়া লইলে লক্ষ্য স্থানে যাওয়া যায় না। প্রাণান্ত পরিশ্রমে পাথেয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইয়াছ কিন্তু পথের সন্ধান পাইলে না, এমন অবস্থায় সে পাথেয় দ্রব্য কি কাজে লাগিবে? বরং পথ না পাওয়াতে, পাথেয় দ্রব্যগুলি বৃথা খরচ করা হইবে। এই উপলক্ষে করুণাময় বলিতেছেন—

رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ○

"(মুছা বলিয়াছিলেন) আমার প্রভু, তিনি প্রত্যেক পদার্থকে তাহাদের স্ব স্ব প্রকৃতি দিয়াছেন, পশ্চাৎ (তদনুসারে চলিতে) পথও দিয়াছেন।" (১৬ পারা। সুরা তাহা। ২ রোকু)। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۝

'যিনি (প্রত্যেক পদার্থকে) ঠিক ঠিক পরিমাণ অনুযায়ী করিয়াছেন পশ্চাৎ (তদনুসারে চলিতে) পথও দিয়াছেন।" (৩০ পারা। সূরা আ'লা। ১ রোকু)

পাঠক! জানিয়া লও—হেদায়েৎ বা পথ প্রাপ্তির **তিনটী** শ্রেণী আছে। **প্রথম** শ্রেণীর পথ প্রাপ্তি——ইহা ভাল হইতে মন্দ নির্ব্বাচন করিবার সাধারণ ক্ষমতা। ভাল কি মন্দ তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই নির্ব্বাচন করিতে পারে। এ ক্ষমতা বুদ্ধিমান লোক মাত্রকেই দয়াময় দান করিয়াছেন। কেহ নিজের বুদ্ধিবলে ভাল মন্দ বাছিয়া লইতে পারে, কেহ বা পয়গম্বরগণের উপদেশ-ক্রমে ভাল মন্দের প্রভেদ চিনিয়া লইতে পারে। এই উপলক্ষে মহাপ্রভু বলিতেছেন—

হেদায়েৎ বা পথ প্রাপ্তির ত্রিবিধ শ্রেণীর বিভাগ

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝

"এবং তাহাকে (মানবকে ভাল মন্দ) দুই পথ দেখাইয়া দিয়াছি।" (৩০ পারা। সূরা বলদ। ১ রোকু।) এবং মহাপ্রভু পুনশ্চ বলিয়াছেন—

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ
عَلَى الْهُدَىٰ

এবং অতঃপর "ছমুদ (জাতীয় লোকের কথা শুন) তাহাদিগকে (ভাল মন্দ উভয়) পথ দেখাইয়াছি, কিন্তু তাহারা সৎপথ ফেলিয়া কুপথ ভালবাসিয়া লইয়াছিল।" (২৪ পারা। সূরা হামীম ছেজদা। ২ রোকু)। এ উভয় স্থলে পয়গম্বরগণের সহিত যে উপদেশ পাঠাইয়াছেন সেই কথাই বলা হইয়াছে। যাহা হউক, স্বীয় বুদ্ধির উদ্ভাবিত উপদেশ বা পয়গম্বর কর্তৃক প্রচারিত উপদেশ উভয়ই বুদ্ধিমানের জন্য অবধারিত। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই এই উভয় প্রকার উপদেশ গ্রহণ করিতে সক্ষম। তবে যাহারা গ্রহণ করে না বা করে নাই সে স্থলে নিম্নলিখিত দুই কারণের কোন একটী থাকিতে পারে (১) হয় তো অহঙ্কার করিয়া বা ঈর্ষা বশতঃ সে উপদেশ

গ্রহণ করে নাই অথবা (২) সংসার-মোহে মুগ্ধ ছিল বলিয়া সে উপদেশে কান দিতে পারে নাই। **দ্বিতীয়** শ্রেণীর পথপ্রাপ্তি, খাছ (বিশিষ্ট) লোকেরা পরিশ্রম সহকারে লাভ করিয়া থাকেন। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া চলিলে এবং স্বেচ্ছায়ই হউক বা অনিচ্ছায়ই হউক, নিজের শরীর দ্বারা সৎকার্য্য করিয়া লইতে লাগিলে অল্পে অল্পে হেকমতের পথ নিজের সম্মুখে খুলিয়া যাইতে লাগে। এই ধরণের পথ-প্রাপ্তি বাস্তবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে চলিলেই লব্ধ হয়। এ সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"এবং যাহারা আমার (নির্দ্ধারিত নিয়মের সীমার) মধ্যে পরিশ্রম করিয়াছে, নিশ্চয় আমি তাহাকে আমার পথ দেখাইব।" (২১ পারা। সূরা আনকবুৎ। ৭ রোকু)। আল্লা এ কথা কখনই বলেন নাই যে পরিশ্রম না করিলেও তিনি স্বীয় ইচ্ছায় সুপথ খুলিয়া দিবেন। ইহা ভিন্ন আল্লা পুনরায় বলিতেছেন—

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى

"যাহারা পথ চলে (আল্লা) তাহাদিগকে অধিক মাত্রায় সুপথ খুলিয়া দেন।" (২৬ পারা। সূরা মোহাম্মদ। ২ রোকু)। যাহা হউক, এই ধরণের পথ-প্রাপ্তি যার তার ভাগ্যে ঘটে না—কেবল বিশেষ পরিশ্রমী লোকের ভাগ্যে এই শ্রেণীর পথ প্রাপ্তি ঘটে। **তৃতীয়** শ্রেণীর পথ-প্রাপ্তি অতীব অসাধারণ। খাছ লোকের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ প্রকারে শ্রেষ্ঠ, কেবল তাহাদিগকেই আল্লা এই উচ্চ ধরণের পথ খুলিয়া দেন। নবী ও স্বাভাবিক ওলীদিগকে সুপথ দেখাইবার জন্য স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা স্বীয় অস্তিত্ব হইতে এক আলোক প্রেরণ করেন তাহারই প্রভাবে তাঁহারা সুপথ দেখিতে পান। বুদ্ধির এমন ক্ষমতা নাই যে, সে নিজে নিজে সেই দুর্লক্ষ্য অসাধারণ পথ চিনিয়া লইতে পারে। এই জন্য আল্লা বলিতেছেন—

قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ

("হে রসুল! লোকদিগকে) বল আল্লার পথ-প্রদর্শনই প্রকৃত পথ-প্রদর্শন।" (১ পারা। সূরা বকর। ১৪ রোকু)। এস্থলে সেই অতীব অসাধারণ পথ-

প্রাপ্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই সর্ব্বোন্নত পথে গমনকে আল্লা حيات (হায়াৎ) জীবন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ؕ

"এবং যে ব্যক্তি মৃত ছিল, পশ্চাৎ আমি তাহাকে জীবিত করিয়াছি এবং তাহার জন্য نور আলোক প্রস্তুত করিয়াছি—সেই আলোকের প্রভাবে সে মানুষের মধ্যে (বিশেষ ধরণে) চলা ফেরা করে, সে কি তাহার তুল্য যে অন্ধকারের মধ্যে (পতিত) আছে তাহা হইতে বাহির হইতে পারিতেছে না?" (৮ পারা। সূরা আনআম। ১৫ রোকূ)।

(১৪) 'রোশদ' বা ইচ্ছা। এ পর্য্যন্ত তিন প্রকার পথপ্রাপ্তির কথা শুনিলে; এখন 'রোশদ' শব্দের অর্থ বুঝ। পথ প্রাপ্ত হইলে তদবলম্বনে চলিবার ইচ্ছাকে 'রোশদ' বলে। এ উপলক্ষে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ

"এবং নিশ্চয়ই আমি প্রথম হইতে এবরাহীমকে রোশদ (সৎপথে চলিবার প্রবল ইচ্ছা) দিয়াছি।" (১৭ পারা। সূরা আম্বীয়া। ৫ রোকূ)। দেখ, কোন বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ধন সঞ্চয়ের পন্থা ও উপায় শিক্ষা করিল কিন্তু তদনুসারে কার্য্য করিতে অভিলাষী হইল না; এমন স্থলে তাহার পক্ষে ধনাৰ্জ্জনের পন্থা জানাতে কি লাভ? ধন উপার্জ্জনের উপায় জানাকে পথপ্রাপ্তি বলে আর সেই পথে চলিয়া উপার্জ্জন করিবার ইচ্ছাকে 'রোশদ' বলে।

(১৫) 'তশদীদ' বা চেষ্টা। এখন 'তশদীদ' কথার অর্থ বুঝিয়া লও। মঙ্গল হস্তগত করিবার মানসে শরীরের চেষ্টা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিকে সহজে আনন্দের সহিত ঝটপট সঞ্চালন করাকে তশদীদ কহে। যাহা হউক, জ্ঞানের মধ্যে 'হেদায়েৎ' বা পথপ্রাপ্তিরূপ ফল অবস্থিত আছে। 'রোশদ'

এর ফল ইচ্ছা এবং 'তশ্‌দীদ্‌' এর চরম ফল বল ও অঙ্গাদির সঞ্চালন। (টীঃ২৮৮)

(১৬) 'তাঈদ' বা সাহায্য। এখন 'তাঈদ' শব্দের অর্থ বুঝ। অলক্ষিত স্থান হইতে সহসা যে সাহায্য বা উত্তেজনা মানব অন্তরে প্রবেশ করে, তাহাকেই তাঈদ্‌ বলে, ইহা স্বয়ং আল্লা কর্তৃক প্রেরিত। কোথা হইতে কি কারণে সে সাহায্য বা উত্তেজনা আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলিতেছেন :—

وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ

এবং তাহাকে (ঈছাকে) পবিত্র আত্মা সহযোগে সাহায্য করিয়াছি।" (১ পারা। সূরা বকর। ১১ রোকূ)।

'এছমৎ' বা বাধা। সৎকার্য্যের মধ্যে বিনা কারণে, কখন কখন আল্লার দিক হইতে সাহায্য আসিয়া মানবকে পরিচালনা করে ; সেই সাহায্যের নাম যেমন 'তাঈদ্‌' তেমনই অলক্ষিত বাধা দিয়া সর্ব্ববিধ পাপ ও শেরেক্‌ হইতে মনকে ক্ষান্ত রাখাকে عصمت 'এছমৎ' বা বাধা বলে। তাঈদ্‌ (সৎকার্য্যে অলক্ষিত সাহায্য) এবং 'এছমৎ' (মন্দ কর্ম্মে অলক্ষিত বাধা) এই উভয়ের কার্য্য, প্রায় সমান সমান। এই দুইটী কি কারণে কোথা হইতে আসে, জানা যায় না (টীঃ ২৮৯) যেমন মহাপ্রভু বলিতেছেন—

টীকা—২৮৮। ইমাম সাহেব 'রোশ্‌দ্‌' ও 'তশ্‌দীদ্‌' পৃথক্‌ করিয়াছেন ; অন্যে তাহা করেন না। লাভের পথ পাইলে চলিতে ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু সেই ইচ্ছা নানা ঘটনায় দমিয়া গিয়া লুপ্ত হইতেও পারে। সদিচ্ছাকে আল্লার প্রদত্ত এক সম্পদ বলা যায়। সেই ইচ্ছা, যতক্ষণ মনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ রোশদ্‌ বলে। আবার উহা হস্ত পদাদি অঙ্গে ফুটিয়া কার্য্য রূপে প্রকাশ পাইলে তশ্‌দীদ্‌ নাম পায়। হিন্দু দার্শনিকগণ 'রোশ্‌দ্‌'ও 'তশ্‌দীদ' উভয়কে সাধারণ ভাবে এক 'চেষ্টা' নাম দিয়াছেন। উহা যতক্ষণ মনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে আন্তরিক চেষ্টা বলে ; উহাই এ স্থলে 'রোশ্‌দ্‌'। আবার অন্তরের চেষ্টা বাহিরে ফুটিয়া অঙ্গাদিকে চালাইয়া দেয় তখন তাহাকে শারীরিক চেষ্টা বলে। এই শারীরিক চেষ্টাকে 'তশ্‌দীদ্‌' বলা হইয়াছে। তবে একটা বিশেষত্ব আছে—'রোশ্‌দ্‌' ও 'তশ্‌দীদ্‌' সৎ বিষয়ে, আল্লার পথপ্রাপ্তি পক্ষে হয়, সুতরাং তাহা 'নেআমত' (সম্পদ)। যাহাকে 'চেষ্টা' বলে তাহা সৎ ও অসৎ উভয় বিষয়ে হইতে পারে।

টীকা—২৮৯। দার্শনিক পণ্ডিতগণের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে 'বিনা কারণে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না' কিন্তু বিনা বা অলক্ষিত কারণে অনেক সময়ে কার্য্যের উৎপত্তি দেখিয়া তাঁহারা চিরকাল হইতে হয়রান আছেন ; পরিশেষে এই অনুমান করিয়াছেন যে কোন অলক্ষিত শক্তি অজ্ঞাত স্থল হইতে আসিয়া' কার্য্য উৎপন্ন করিয়া থাকে। সেই অলক্ষিত শক্তিকে চিকিৎসাশাস্ত্রে 'প্রভাব' বলা হইয়াছে। যাহা হউক দার্শনিক ও চিকিৎসকগণ

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ

اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ

"এবং নিশ্চয়ই সেই স্ত্রীলোক, তাঁহার (ইয়ুছোফের) প্রতি (মন্দ) ইচ্ছা (প্রকাশ করিয়াছিল—যদি তিনি স্বীয় প্রভুর প্রমাণ না দেখিতেন, তবে তিনিও (ইয়ুছোফও) তাহার দিকে মন্দ ইচ্ছা করিতেন।" (১২ পারা। সূরা ইয়ুছোফ। ৩ রোকু।) ইহার ভাবার্থ এই যে, সে স্থলে যেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল ও যেরূপ কারণ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে সেই স্ত্রীলোকের প্রতি মহাত্মা হজরৎ ইয়ুছোফ নবী عم এর ব্যভিচার সংঘটিত হইত। কিন্তু মহাপ্রভু অলক্ষিত স্থান হইতে সাহায্য করিয়া তাঁহাকে কুকর্ম্ম হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন)।

উপরি লিখিত ষোল প্রকার নেআমৎ (সম্পদ) গুলি পরকালের পাথেয় বলিয়া গণ্য হয় কিন্তু উহারা একাকী কোন হিত উৎপন্ন করিতে পারে না, তবে অন্যের সাহায্য পাইলে করিতে পারে। আবার যে সকল পদার্থের সাহায্য আবশ্যক, তাহারাও একাকী সাহায্য দিতে পারে না—অন্যের স্থানে কিছু বল লইয়া কাজ করে। আবার এই শেষোক্ত পদার্থকে সাহায্য দানের উপযোগী করিতে আবার অন্য পদার্থের আবশ্যক। এইরূপ এক পদার্থের জন্য অন্য পদার্থ আবশ্যক; আবার তাহার জন্য ভিন্ন পদার্থ। এই রূপে যোগ-সাহায্যের একটী শিকল বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। সেই শিকলের শেষ প্রান্ত ঘুরিয়া আসিয়া অবশেষে সেই সর্ব্বব্যাপী আল্লার উপরে গিয়া পড়ে। যেরূপ কৌশলের সহিত এই 'আবশ্যকতা-শিকল' জোড় লাগান আছে, তাহা অতীব বিস্ময়কর। এবং তাহার 'আবশ্যকীয়' টুকরাগুলির উপযোগিতা এবং সম্বন্ধের বিচার অপার সমুদ্রবৎ।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মানবের ত্রুটীর কারণ—পাঠক! জানিয়া রাখ—**দুই** কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটী হয়। **প্রথম কারণ**—করুণাময়ের নেআমৎ (সম্পদ্) অসংখ্য। সুতরাং অসংখ্য সম্পদের পূর্ণ পরিচয়

যাহাকে অলক্ষিত শক্তি বলিয়া অনুমান করেন, তাহাকেই পয়গম্বর ও সিদ্ধপুরুষ দরবেশগণ দিব্যচক্ষে দেখিতে পান যে উহা এক 'অজড়-শক্তি' সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আল্লা হইতে আসিয়া কার্য্য উৎপত্তির সাহায্য করে অথবা প্রবল কারণ স্বত্বেও কার্য্যের উৎপত্তিতে বাধা প্রদান করে।

না পাইতে পারার জন্য ত্রুটী ঘটে। আল্লার সম্পদ যে অসংখ্য তাহা স্বয়ং তিনি বলিয়া দিয়াছেন—

وَ اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

"এবং যদি আল্লার নেআমৎ গণনা করিতে যাও (তবে) গণিয়া শেষ করিতে পারিবে না।" (১৩ পারা। স্বরা এব্রাহীম। ৫ রোকু।) আল্লার দত্ত সম্পদরাশির মধ্যে, যে সামান্য অংশটুকু আহার দানের মধ্যে প্রকাশ্য ভাবে দেখা যায়, তাহার কিছু আলোচনা 'এহ্ইয়া অল-উলুম' গ্রন্থে করা হইয়াছে। তাহা দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, আল্লার সমস্ত নেআমৎ চিনিতে পারা মানুষের সাধ্যের অতীত। এ ক্ষুদ্র পুস্তকে তৎসমুদয়ের আলোচনার স্থান হইবে না। দ্বিতীয় কারণ—করুণাময়ের দত্ত নেআমৎ সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ আপামর সাধারণ সকলেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইয়াছে বলিয়া তৎসমুদয়কে অমূল্য পদার্থ বলিয়া মনে হয় না; সুতরাং কৃতজ্ঞতাও মনে আসে না। দেখ—এই পবিত্র বায়ু, যাহা আমরা সদা সর্ব্বদা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে ব্যবহার করিতেছি, তাহা নাসিকা পথে উদর অভ্যন্তরে গিয়া অসংখ্য প্রকারে জীবনের সাহায্য করিতেছে - হৃদয় কোটরস্থ উষ্ণতার তেজ খর্ব্ব করিয়া সমতা বিধান করিতেছে, শরীরের সর্ব্বত্র রক্ত সঞ্চালন করিয়া দিতেছে। যদি এক মুহূর্ত্ত বায়ুর অভাব হয়, তবে সমস্ত মানুষ—মানুষ কেন—সমস্ত জীব জন্তু উদ্ভিদ বিনাশ পাইবে। এমন অমূল্য বায়ু সর্ব্বব্যাপী হইয়া, যথা তথা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে জন্য উহাকে অমূল্য সম্পদ্ বলিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে না। এরূপ লক্ষ লক্ষ অমূল্য সম্পদ চতুর্দ্দিকে ছড়াছড়ি যাইতেছে বলিয়া মানব তৎসমুদয়ের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না। তথাপি যদি কোন ব্যক্তিকে দুর্গন্ধ পূর্ণ কূপের মধ্যে অথবা উত্তপ্ত হাম্মাম খানায় পুরিয়া কিছুক্ষণ রাখা যায় তবে সে ব্যক্তি দুর্গন্ধে বা গরমে ছটফট করিতে থাকিবে। তাহার পর তাহাকে বাহির করিয়া আনিলে পবিত্র শীতল বায়ু তাহার নিকট অমূল্য পদার্থ বলিয়া আদৃত হইবে। যাহার চক্ষু উৎপাটিত হয় নাই বা "চোখ উঠে নাই" সে কখন নীরোগ সুস্থ চক্ষুর মর্য্যাদা বুঝেনা। যে ভৃত্যের পৃষ্ঠে প্রহার পড়ে নাই, সে কখন স্নেহ-পরিপালিত অবস্থার মূল্য বুঝে না। দাসের পিঠে চাবুক না পড়িলে সে ক্রমে শিথিল, অমনোযোগী ও অবাধ্য হইয়া পড়ে।

স্থল বিশেষে ভৃত্যকে প্রহারের আবশ্যকতা

আল্লা দত্ত সম্পদের জন্য কৃতজ্ঞতা শিক্ষার সহজ উপায়। যাহা হউক, আল্লা প্রদত্ত সম্পদের মর্য্যাদা চিনিবার ও উপকার স্মরণ করিবার উপায় করাই কৃতজ্ঞতা শিক্ষার একমাত্র পন্থা। কতকগুলি নেআমতের পরিচয় 'এহ্‌ইয়া-অল-উলুম' গ্রন্থে দেওয়া গিয়াছে, কিন্তু সে সমস্ত চিনিয়া লইয়া কৃতজ্ঞতা শিক্ষা করা জ্ঞানবান আলেম লোকের কার্য্য। অজ্ঞান ও স্বল্প-বুদ্ধি লোকের পক্ষে সে পন্থা অবলম্বন করিতে যাওয়া বৃথা। তাহাদের জন্য কৃতজ্ঞতা শিক্ষার সহজ উপায় বলা যাইতেছে। তাহারা যেন সরকারী আতুরাশ্রম, জেল খানা ও গোরস্থান পরিদর্শন করে। তদ্রূপ স্থানে গেলে, পীড়া ও দুরবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিলে নিজের স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা ও জীবনের মর্য্যাদা মনে পড়িতে পারে এবং তথাকার দৃশ্যের সহিত নিজের অবস্থা তুলনা করিলে সম্ভবতঃ হৃদয়ের গভীর-তল হইতে কৃতজ্ঞতার স্রোত উত্থিত হইতে পারে। (১) মৃত ব্যক্তির অস্থি পঞ্জরাদি দর্শন করিলে এই কথা মনে হইতে পারে যে ঐ সকল মৃত লোকেরা বেকার হইয়া পড়িয়া আছে। তাহারা এই আশা করিতেছে যে, যদি তাহাদিগকে একটী দিনের তরেও জীবন দিয়া সংসারে ফিরিয়া পাঠান যাইত, তবে উহারা সে সময়ে স্ব স্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিতে পারিত। সে সুযোগ কিন্তু উহারা পাইতেছে না। আমরা এখনও জীবিত আছি. যে কয় দিন বাঁচিতে পারি সে কয়েক দিনের সদ্ব্যবহার করি, যতদূর পারি অতি শীঘ্র অতীত পাপের ক্ষতি পূরণ করিয়া লই। এ সময়টুকু আমাদের পক্ষে অতি মূল্যবান বস্তু। ইহা বৃথা নষ্ট করা উচিত নহে, কিন্তু জীবিত লোকগুলা আশ্চর্য্য নির্ব্বোধ! জীবনের অনেক দিন হাতে পাইয়াও তাহার মূল্য বুঝিতেছে না এবং সদ্ব্যবহারও করিতেছে না। (২) মানব এমন নির্ব্বোধ যে, জল, বায়ু, রৌদ্র, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি সর্ব্ব-জন-সুলভ সাধারণ নেআমৎ গুলিকে অমূল্য পদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারে না। সুতরাং কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তৎসমুদয়ের সদ্ব্যবহারও করে না। ইহারা কেবল ধন এবং অন্য প্রকার বিশেষ পদার্থকে সম্পদ্ বলিয়া জানে। মানুষের জানা উচিত যে, যে পদার্থ অধিক হিতকর—যাহা না হইলে চলে না—তাহাই করুণাময় সাধারণ ভাবে সর্ব্বঘাত্রী করিয়া অপর্য্যাপ্ত দান করিয়াছেন। সাধারণ সুলভ ও সর্ব্বঘাত্রী হইয়া আছে বলিয়া সেই অমূল্য বস্তুগুলি নেআমতের শ্রেণী হইতে বহির্ভূত হইতে পারে না। (৩) তাহার পর বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখ, বিশেষ

বস্তুর মধ্যে কোন কোন পদার্থ কাহাকে অপর্য্যাপ্ত দেওয়া হইয়াছে। ইহা প্রায় সচরাচর দেখা যায় যে, মনুষ্য মাত্রেই মনে করে আমার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর কাহারও নাই অথবা আমার স্বভাবের ন্যায় সুন্দর সৎস্বভাব আর কেহ পায় নাই। এই কারণেই তাহারা অপরকে নির্ব্বোধ ও অসভ্য বলিয়া জানে কিন্তু এ কথাটী বুঝিতে পারে না যে, তেজ বুদ্ধি ও সৎস্বভাব প্রাপ্তির জন্য আনন্দিত হওয়া এবং আল্লার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়াই কর্ত্তব্য ; কিন্তু তাহা না করিয়া অপর লোকের মধ্যে যাহারা সেই প্রকার অমূল্য পদার্থ পাইতে পারে নাই তাহাদের দোষ অনুসন্ধান বা তাহাদিগকে তিরস্কার করা উচিত নহে। (৪) আবার ইহাও চিন্তা করা উচিত যে, ইহ-সংসারে কেহই ত্রুটী শূন্য নহে। করুণাময় মানুষের ত্রুটী, সুকৌশলে গোপনে রাখিয়াছেন। এই কারণে নিজের ত্রুটী নিজে যেমন চিনা যায় অপরের ত্রুটী তেমন পারা যায় না। মহাপ্রভু যদি সকলেরই দোষ উদ্‌ঘাটন করিয়া দিতেন এবং লোকের অন্তরস্থ মন্দ খেয়াল ও অসৎ চিন্তা অপরকে জানিতে দিতেন তবে পৃথিবী একটী ভীষণ লজ্জাকর স্থান হইত। তজ্জন্যই করুণাময় দয়া করিয়া তোমার দোষ অন্যের চক্ষুর অন্তরালে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, এবং অন্যের দোষও তোমা হইতে গোপনে রাখিয়াছেন। আল্লা-কর্ত্তৃক দোষ-গুপ্তি, প্রত্যেক লোকের পক্ষে খাছ নেআমৎ। দোষগুপ্তির জন্য আল্লাকে ধন্যবাদ দেওয়া প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া, পরের দোষানু-সন্ধান কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া কেমন ভয়ানক দোষ। উহা আল্লার নিকট বড়ই অপ্রিয় কার্য্য। (৫) যাহা হউক, কেহ কোন খাছ নেআমৎ না পাইতে পারিলেও দুঃখ করা উচিত নহে। দুঃখিত হইলে এই কথা বুঝা যায় যে, সাধারণ সম্পদ্ যাহা, সে ব্যক্তি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইয়াছে, তাহা পাইয়াও সে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছে না। মহাপ্রভু তোমাকে অযাচিত ভাবে যে সকল অমূল্য পদার্থ দান করিয়াছেন তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য দুঃখ ঘুচিয়া যাইতে পারে। এক ব্যক্তি কোন জ্ঞানী লোকের সম্মুখে গিয়া স্বীয় দরিদ্রতার উল্লেখ করতঃ দুঃখ প্রকাশ করিতেছিল। জ্ঞানী মহোদয় জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমাকে দশ হাজার টাকা দিয়া তোমার দুইটী চক্ষু উৎপাটন করিতে চাহিলে তুমি কি সম্মত হইবে?' সে ব্যক্তি উত্তর করিল—'দশ হাজার টাকার বিনিময়ে চক্ষু দিতে কখনই পারিব না।' জ্ঞানী ব্যক্তি পুনরায় বলিলেন—'তোমার হস্ত পদ কর্ণ নষ্ট করিয়া প্রত্যেকের

পরিবর্ত্তে দশ দশ হাজার টাকা দিলে তুমি সন্তুষ্ট হইতে পার কি ?' সে বারেও অসম্মতি প্রকাশ করিল। পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচ্ছা! তোমার বুদ্ধির বিনিময়ে দশ হাজার মুদ্রা লইতে ইচ্ছা কর কি না ?' সে বারেও লোকটী অসম্মতি প্রকাশ করিল। পরিশেষে উক্ত জ্ঞানী লোক বলিলেন—'তোমার অধিকারে পঞ্চাশ হাজার মুদ্রারও অধিক মূল্যের সম্পত্তি আছে; তবে কেন দুঃখ প্রকাশ করিতেছ ?' পাঠক! প্রত্যেক মানুষকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ যে, তাহারা স্বীয় অবস্থা অপরের অবস্থার সহিত বিনিময় করিতে ইচ্ছা করে কি না ? এ অনুসন্ধানের ফলে অবশ্যই দেখিতে পাইবে যে, কেহই নিজের অবস্থা বদল দিয়া অপরের অবস্থা লইতে ইচ্ছা করে না। ইহাতে এই কথা বেশ বুঝা যায় যে এক জনকে আল্লা যে খাছ নেআমৎ দিয়াছেন অন্যকে তাহা দেন নাই এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রাপ্ত নেআমৎকে অপরের নেআমৎ অপেক্ষা মূল্যবান মনে করে, এই জন্য লোকে নিজের অবস্থা বদলাইতে চায় না। নিজের ভাগে প্রাপ্ত পদার্থগুলি উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কি উচিত নহে ?

বিপদে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আবশ্যকতার পঞ্চ কারণ—পাঠক! স্মরণ কর, বিপদ আপদে পতিত হইলেও শোকর করা আবশ্যক। কাফেরী ও পাপ ভিন্ন এমন কোন বিপদ আপদ নাই যাহা হইতে মঙ্গল উৎপন্ন না হয়। কোন্ কোন্ স্থান হইতে তোমার ভাগ্যে মঙ্গল আসিয়া যোটে তাহা তুমি নিজে জান না কিন্তু করুণাময় মহাপ্রভু তোমাদের মঙ্গলের পথ উত্তম রূপে জানেন। বিপদ আপদে পতিত হইলে নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার বিবেচনা পূর্ব্বক শোকর করা কর্ত্তব্য।

সুধু কাফেরী ও পাপরূপ বিপদ মঙ্গল-প্রসূ নহে

প্রথম প্রকার বিবেচনা—সাংসারিক বিপদ উপস্থিত হইলেও যদি ধর্ম্ম পথ নিরাপদ থাকে তবে ধর্ম্ম-জীবন নিরাপদ আছে বলিয়া কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। "আমার ঘরে চোর আসিয়া সমস্ত ধন মাল চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে" এই বলিয়া এক ব্যক্তি মহাত্মা সহল তসতরীর সমীপে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল। শেখ মহোদয় বলিয়াছিলেন—"শয়তান যে তোমার হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ঈমান ধন চুরী করিতে পারে নাই তজ্জন্য শোকর কর।"

দ্বিতীয় প্রকার বিবেচনা—কোন বিপদ বা রোগ উপস্থিত হইলে তদপেক্ষা কঠিন ধরণের বিপদ বা রোগ উপস্থিত হয় নাই বিবেচনায় কৃতজ্ঞ হওয়া

উচিত। যে ব্যক্তি হাজার দণ্ড প্রহারের উপযুক্ত তাহাকে এক শত দণ্ড প্রহার করিলে কি তাহার প্রতি দয়া করা হয় না? কোন ব্যক্তি এক জন সাধুর মস্তকের উপর এক ডালি ছাই ফেলিয়া দিয়াছিল। সাধু ক্লান্ত ভাবে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন—'আঃ! আমি আগুণে পুড়িবার উপযুক্ত, এমন অবস্থায় মাথার উপর ছাই পড়া সুখের কথা।'

তৃতীয় প্রকার বিবেচনা—"সাংসারিক বিপদে, পরকালের বিপদ, খণ্ডাইয়া দেয়—"এ কথাটী বিশ্বাস করিয়া লও। সংসারে বিপদ অবতীর্ণ না হইলে পরকালে কঠিন বিপদের দায়ে ঠেকিবার সম্ভাবনা। ইহকালের সামান্য বিপদ যদি পরকালে কঠিন বিপদ খণ্ডাইয়া দেয় তবে কি তাহা আনন্দের কারণ হইবে না? মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) বলিয়াছেন—"মহাপ্রভু যাহাকে ইহকালে বিপদ দিয়াছেন পরকালে তাহাকে আর কঠিন কষ্ট দিবেন না। বহু পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইহকালের বিপদে শোধ হইয়া যায়। সাংসারিক আপদ বিপদে বা রোগ শোকে যদি ইহকালেই পাপ ক্ষয় হইয়া যায় তবে পরকালে আর কিসের ভয়? চিকিৎসক তোমাকে কটু ঔষধ সেবন করিতে দিয়া তোমার রোগ দূর করেন এবং 'ফছ্দ' খুলিয়া তোমার দূষিত রক্ত বাহির করিয়া দেন, ইহাতে অবশ্যই তোমাকে কিছু কষ্ট ভোগ করিতে হয়। এরূপ কষ্ট তোমাকে আনন্দের সহিত বহন করা উচিত, কেননা তদ্রূপ বিধানে রোগের মহা কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিবে।

চতুর্থ প্রকার বিবেচনা—ইহসংসারে তোমার ভাগ্যে যাহা যাহা ঘটিবে তাহা সৃষ্টির প্রারম্ভে 'লওহ্ মহ্ফুজ্' নামক ভবিতব্য-ফলকে একাদি-পর্য্যায়-ক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। পৃথিবীতে আসিলে সেই সমস্ত ঘটনার এক একটী পর্য্যায়ক্রমে আসিয়া প্রকাশ পায়। সুতরাং এক একটী বিপদ পার হইতে পারিলে শোকর করা কর্তব্য। এক দিন মহাত্মা শেখ আবু ছঈদ গর্দ্দভ পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক পথ চলিতেছিলেন, এমন সময়ে ভূতলে পতিত হন, আছাড় পড়িবা মাত্র 'আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহে' (টীঃ২৯০) বলিয়া গাত্রোত্থান করেন। এতদ্দৃষ্টে পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"এস্থলে আনন্দ প্রকাশের কারণ কি?" শেখ মহোদয় বলিয়াছিলেন—

টীকা—২৯০। ইহার অর্থ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লার জন্য।' এই বাক্যটী মুছলমানেরা আনন্দের সময়ে উচ্চারণ করেন। কিন্তু বিপদে পড়িলে বা শুনিলে "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন" বলেন ইহার অর্থ—'নিশ্চয়ই এ সমস্ত আল্লার জন্য এবং নিশ্চয় আল্লার দিকে সকলকে যাইতে হইবে।'

আমার ভাগ্যে যে সকল বিপদ লিপিবদ্ধ হইয়া আছে তন্মধ্যে অন্য পন্দায় হইতে পড়িয়া যাইবার বিপদটি আমি করুণাময়ের করুণায় নির্বিঘ্নে পার হইতে পারিলাম এই জন্য আমি আনন্দিত চিত্তে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

পঞ্চম প্রকার বিবেচনা—সংসারিক বিপদে পরকালের মঙ্গল উৎপন্ন হয় এ কথা বিশ্বাস করা। ইহকালের বিপদে পরকালের মঙ্গল হয় এ কথা বিশ্বাস করিবার দুইটি পন্থা আছে। প্রথম—মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) এর বহু হদীছ বচনে এই কথার সত্যতা সাব্যস্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় পন্থা যুক্তি,—সংসারের প্রতি আসক্তি, সর্ববিধ পাপের প্রস্রবণ। উহা হইতে সকল পাপ ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া আসে। সংসারের সফলতা সহজেই যাহাদের হস্তগত হয় এবং যাহারা সর্ববিধ সুখ ও আনন্দ ভোগ করিতে পায় তাহাদের নিকট দুনিয়া বেহেশতের ন্যায় মনোরম হইয়া উঠে, তেমন মনোহর দুনিয়া ছাড়িয়া পরকালে যাওয়া বিশেষ কষ্টের কারণ হইয়া থাকে এবং পরকালকে তাহারা দূর হইতে কারাগার বলিয়া ভয় করে। ইহসংসারে করুণাময় যাহাদের উপর বিপদ চাপাইয়া দিয়াছেন তাহারা সংসারের উপর বিরক্ত হইয়া পড়ে এবং সংসারকে কারাগার তুল্য কষ্টের স্থান বলিয়া মনে করিয়া থাকে এবং ইহা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক পরকালে পার হইতে সমুৎসুক হইয়া থাকে। সংসার হইতে বাহির হইয়া পরকালে যাইবার, মৃত্যুই, একমাত্র পথ। সংসারের বিপদ আপদকে আল্লার প্রদত্ত করুণা-মূলক শাসন বলা যায়। সন্তানের ত্রুটী দেখিয়া পিতা যেমন স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার মঙ্গলের জন্য শাসন করেন এবং বুদ্ধিমান পুত্রও সে শাসনকে মঙ্গলের হেতু ও করুণা মনে করিয়া পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, আল্লার-প্রদত্ত বিপদ আপদকেও সেই চক্ষে দেখা কর্ত্তব্য।

ইহকালের বিপদে পরকালের মঙ্গল—ইহার সমর্থনে হদীছ ও মহাজন উক্তি—হদীছ শরীফে কথিত আছে—"তোমরা যেমন পান-আহারের দ্রব্য সহকারে পীড়িত বন্ধুর তত্ত্বাবধান করিতে গিয়া থাক; মঙ্গলময় আল্লাও তদ্রূপ বিপদ আপদ সহকারে স্বীয় বন্ধুদিগকে দেখা করিতে আসেন।" এক ব্যক্তি মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) এর সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিয়াছিল যে, চোরে তাহার ধন সম্পত্তি সমস্তই চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে। হজরৎ বলিয়াছিলেন—"যাহার ধন চুরি না যায় এবং শরীরে রোগ না হয় তাহার মঙ্গল নাই। আল্লা যাহাকে ভাল বাসেন তাহার উপর বিপদ অবতীর্ণ করিয়া থাকেন।" তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—

"বেহেশ্‌তের মধ্যে গৌরবের তারতম্য অনুসারে আসনের বহু শ্রেণী-ভেদ হইবে। তন্মধ্যে এমন কতকগুলি উন্নত স্থান আছে তথায় তপস্যা বা সাধনার পরিশ্রমে প্রবেশ করিতে পারা যাইবে না। তদ্রূপ স্থান, মানব-চেষ্টার অনায়ত্ত। তবে করুণাময় স্বীয় প্রিয়তমদিগকে বিপদ আপদের ফাঁদে আবদ্ধ পূর্ব্বক আকর্ষণ করতঃ তাহাদিগকে সেই সকল উন্নত স্থানে উঠাইয়া লন।" এক দিন মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাসিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন—"মানুষের ভাগ্যে বিশ্বপ্রভু যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি। যাহার ভাগ্যে তিনি সম্পদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেই সম্পদ হইতেই তিনি তাহার মঙ্গল উৎপন্ন করিতেছেন। আর যাহার অদৃষ্টে বিপদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেই বিপদ হইতেও তিনি তাহার মঙ্গল উৎপন্ন করিতেছেন।" এই হদীছের অর্থ এই যে, মানুষের উপর বিপদ পড়িলে সে যদি ছবর করিতে পারে তবে তাহা হইতে মঙ্গল উৎপন্ন হয়; আর যদি সম্পদ্ পাইয়া শোকর করিতে পারে তবেও মঙ্গল প্রাপ্ত হয়। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"ইহকালের নিরাপদ ও সুখী লোকেরা পরকালে গিয়া, সংসারের বিপদ-গ্রস্ত দুঃখীদিগের উচ্চ পদগৌরব দর্শনে বলিতে থাকিবে—'হায়! পৃথিবীতে আমাদের শরীরের মাংস সাঁড়াশী দ্বারা ছিঁড়িয়া লওয়া হইলে ভাল হইত।'" এক পয়গম্বর, মহাপ্রভু আল্লার দরবারে নিবেদন করিয়াছিলেন—"হে প্রভো! তুমি কাফেরদিগকে ধন জন সুখ সন্তোষ অসীম ভাবে দান করিতেছ, আর মোমেন মুছলমানদিগের উপর বিপদ আপদ নিক্ষেপ কর; ইহার কারণ কি? প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল—"দেখ, বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থই আমার, মনুষ্য ও সম্পদ বিপদ সমস্তই আমার সম্পত্তি। মোমেন মুছলমানের পাপ দেখিলে আমি এই ইচ্ছা করি যে মৃত্যুর পূর্ব্বেই সে যেন সমস্ত পাপ হইতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়। সংসারেই বিপদ আপদ দ্বারা তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লইয়া থাকি। কাফেরগণের সম্বন্ধে এই কথা বুঝিয়া লও যে, তাহারা সৎকার্য্য করিলে সংসারেই তাহাদিগকে ধন সম্পত্তি, সুখ সন্তোষ দান করিয়া সেই সৎকার্য্যের পুরস্কার শোধ করিয়া থাকি। মৃত্যুর পর আমার দরবারে উপস্থিত হইলে সৎকার্য্যের পুরস্কার পাইবার আর আশা থাকিবে না; তখন কেবল কাফেরীর জন্য শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবে।"

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَ بِهٖ

"যে ব্যক্তি মন্দ কার্য্য করিবে, সে তজ্জন্য প্রতিফল পাইবে।" (৫ পারা ; সুরা নেছা। ১৮ রোকু।) এই আয়াৎ অবতীর্ণ হইলে মহাত্মা হজরৎ আবুবকর ছিদ্দীক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হে রসুলুল্লা! পাপ করিলেই শাস্তি পাইতে হইবে, তবে আমরা কেমন করিয়া শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইব? তদুত্তরে হজরৎ বলিয়াছিলেন—"কেন তোমরা কি পীড়িত হইবে না? তোমাদের উপর আপদ বিপদ পড়িলে কি দুঃখিত হইবে না? মোমেন মুছলমানগণের পক্ষে ইহাই শাস্তি।"

মহাত্মা হজরৎ ছোলায়মান নবী عم এর এক পুত্র প্রাণত্যাগ করিলে তিনি দুঃখিত হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে দুই ফেরেশ্‌তা মনুষ্যের আকার ধারণ করতঃ বাদী ও প্রতিবাদী স্বরূপ তাঁহার নিকট বিচার-প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল। বাদী এই বলিয়া অভিযোগ করিল যে, সে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়াছিল, বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হইলে প্রতিবাদী পদদলিত করিয়া তৎসমুদয় নষ্ট করিয়াছে। প্রতিবাদী উত্তর দিল যে, এ ব্যক্তি ঠিক রাজপথের উপর বীজ বপন করিয়াছিল। রাস্তা দিয়া বাহির হইবার সময়ে ঐ চারাগুলি বাঁচাইয়া বাম বা দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া চলিবার উপায় ছিল না। এই কারণ রাস্তার উপর দিয়া যাতায়াতে চারা গাছগুলি পদদলিত হইয়া নষ্ট হইয়াছে। হজরৎ বাদীকে বলিলেন—"তুমি অবশ্যই জান যে—লোকে রাস্তার উপর দিয়াই চলে, এমন অবস্থায় তুমি কেন জানিয়া শুনিয়া রাজপথে বীজ বুনিয়াছ?" বাদী বলিল—"আপনি ও তো জানেন যে মানুষ মৃত্যুর রাজপথের উপর আছে তবে কেন আপনি পুত্রের মৃত্যুতে শোক-বসন পরিধান করিয়াছেন?" ইহা শুনিয়া নবী মহোদয় লজ্জিত হইলেন এবং অনুতাপের সহিত আল্লার স্থানে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মহাত্মা ওমর এব্‌নে আব্‌দুল আজীজ, স্বীয় প্রিয় পুত্রের আসন্ন-মৃত্যু-কালে পুত্রের শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া বলিয়াছিলেন—"বৎস! আমার অগ্রে তুমি চলিয়া গেলে আমার পাপ-পুণ্যের নিক্তিতে পুণ্যের পাল্লার উপর তোমাকে পাইব; আর তোমার আগে আমি গেলে তুমি আমাকে তোমার সেই নিক্তিতে পুণ্যের পাল্লার উপর পাইবে। কিন্তু আমি তোমাকে স্বীয়

প্রিয়জন-মৃত্যুতে নবী ও মহাজনগণের আচরণ

পুণ্যের পাল্লার উপর পাইতে পারনা রাখি।" মহাত্মা হজরত এবনে আব্বাছকে তাঁহার প্রিয়তমা কন্যার মৃত্যুসংবাদ কেহ আনিয়া দিয়াছিল। মহাত্মা সেই সংবাদ শুনিয়া—"ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন্" ছবর-প্রকাশক এই কালমা পড়িয়া বলিয়াছিলেন—"এজ্জৎ হুরমৎ ঢাকা পড়িল; খরচ কমিয়া গেল; নকদ পুণ্য হাতে আসিল।" তদনন্তর দাঁড়াইয়া দুই রকাৎ নমাজ সমাপন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—(১ পারা। সূরা বকর। ৫ রোকু।)

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

"তোমরা ছবর ও নমাজ সহকারে (আল্লার স্থানে) সাহায্য চাও।" আমি ছবরও করিলাম, নমাজও পড়িলাম (এখন আল্লার সাহায্য চাই)।

ধনবান, দাস, দরিদ্র ও বিপদে ধৈর্য্যশীলগণের আদর্শ স্থানীয়

মহাত্মা হাতেম আছেম বলিয়াছেন—"কেয়ামতের দিন মহাবিচারক আল্লা চারি দল লোকের সম্মুখে চারি জন মহাপুরুষকে প্রমাণ স্বরূপ আনয়ন করিবেন—(১) ধনৈশ্বর্য্যবান বড় লোকের সম্মুখে মহাত্মা হজরত ছোলায়মান নবী عم কে। (২) পরাধীন গোলামগণের সম্মুখে মহাত্মা হজরত ইয়ছোফ নবী عم কে। (৩) দরিদ্রগণের সম্মুখে মহাত্মা হজরত ঈছা নবী عم কে। (৪) যাহারা বিপদে ছবর করিতে পারে না, তেমন লোকের লোকের সম্মুখে মহাত্মা হজরত আয়ুব নবী عم কে।"

ছবর ও শোকর সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখা গেল তাহাই প্রচুর মনে করি। এ সম্বন্ধে আল্লাই ভাল জানেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভয় এবং আশা।

ভয় ও আশার প্রয়োজনীয়তা—পাঠক! জানিয়া রাখ—سالک ছালেক অর্থাৎ ধর্ম্মপথের পথিকদিগের জন্য خوف (খওফ) ভয় ও رجا (রজা) আশা নামক দুটী পদার্থ, পক্ষীর দুটী ডানার ন্যায় কাজ করে। ঐ দুই পদার্থের বলে তাঁহারা উচ্চ হইতে উচ্চতর উন্নতির রাজ্যে উপনীত হন। পরাৎপর পরম রমণীয় আল্লার দরবারে যাইবার পথে সর্ব্বদাই গুরুতর অন্তরায় ও কঠিন কঠিন বাধার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়। যে পর্য্যন্ত পথিকের অন্তরে সতেজ ইচ্ছার উদয় না হয়, এবং যে পর্য্যন্ত আল্লার অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শনের জন্য চক্ষু অধৈর্য্য হইয়া না উঠে সে পর্য্যন্ত সেই বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। উক্ত পথের স্থানে স্থানে 'খাহেশ' নামক কুপ্রবৃত্তিগুলি পথিককে দোজখের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবার মৎলবে আড্ডা গাড়িয়া বসিয়া আছে। তাহারা বড় বলবান, প্রতারক ও ধূর্ত্ত। উহাদের হাতে নানা পেচের ফাঁদ ও ফাঁসী দড়ী আছে। তদ্দ্বারা পথিকদিগের হাত পা বদ্ধ করিয়া দোজখের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। পথিকের মনে উহাদের অনিষ্টকারিতার প্রবল ভয় ও ত্রাস উৎপন্ন না হইলে তাহারা সে সকল আড্ডা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পার হইতে পারে না। (ভয় যত প্রবল হইবে, পলায়নও তত বেগে ঘটিবে।) যাহা হউক, সুখের আশা ও বিপদের ভয় এই দুই পদার্থ মানুষকে উন্নতির পথে পরিচালিত করে। এই কারণে আশা ও ভয় উভয়েরই কল্যাণ অতীব মহৎ।

আশা ও ভয়ের তুলনা—আশা যেন পশুর গল-রজ্জুর ন্যায়, মানবকে সুখের উদ্যানের দিকে টানিয়া লইয়া যায় এবং ভয়, চাবুকের ন্যায়, বিপদের দিক হইতে তাড়াইয়া সুখের দিকে চালাইয়া দেয়। * * * পাঠক! জানিয়া রাখ—আল্লার শাস্তির ভয়ে এবাদৎ করা অপেক্ষা তাঁহার প্রসন্নতা ও সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় এবাদৎ করা অতীব উৎকৃষ্ট। আশা হইতে প্রেমের উৎপত্তি। প্রেম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই। ভয় হইতে ঘৃণার উদয় হয়।

যাহাকে দেখিলে ভয় জন্মে তাহাকে কেহই ভাল বাসে না—বরং ঘৃণা করিয়া থাকে। পাঠক! এক্ষণে প্রথমে আশার কথা বলা যাইতেছে, পরে ভয়ের সম্বন্ধে বলা যাইবে। (টীঃ২৯১)

আশার কল্যাণ সম্বন্ধে হদীছ ও মহাজনোক্তি—মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** ﷺ ও বলিয়াছেন—"আল্লার সম্বন্ধে সাধু ভাব ধারণ না করা পর্য্যন্ত যেন কেহ প্রাণ ত্যাগ না করে।" তাঁহার মুখে শুনা গিয়াছে, আল্লা বলিতেছেন—"মানব আমাকে যেরূপ মনে করে, আমি তদ্রূপই কার্য্য করি। তাহাদিগকে বলিয়া দাও তাহারা যথা-ইচ্ছা আমার সম্বন্ধে বিবেচনা করুক।" মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** ﷺ কোন ব্যক্তিকে তাহার মৃত্যু সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তুমি স্বীয় অবস্থা কেমন দেখিতেছ?" সে ব্যক্তি বলিয়াছিল—"আমি স্বীয় পাপ স্মরণ করিয়া ভয় পাইতেছি এবং আল্লার অনুগ্রহের আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।" হজরৎ বলিলেন—"এমন সময়ে যাহার মনে ভয় ও আশা একত্র হয় করুণাময় তাহাকে ভয়ের ব্যাপারে নিষ্কৃতি দেন এবং আশাও সফল করিয়া থাকেন।" মহাত্মা হজরৎ ইয়াকুব নবী ‌عم কে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—"হে ইয়াকুব! তোমাকে কেন তোমার প্রিয় পুত্র ইয়ুছোফ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলাম, তুমি কি জান? তোমাকে এই জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলাম যে, তুমি তোমার পুত্রগণের সম্মুখে বলিয়াছিলে—'আমি ভয় করি যে, বাঘে তাহাকে খাইতে পারে এবং তোমরা উহার সম্বন্ধে অসতর্ক হইতে পার।' ব্যাঘ্রের জন্য কেন ভয় করিয়াছিলে? আমার করুণার আশা কেন কর নাই? তোমার পুত্রগণ অসতর্ক হইবে এ খেয়াল কেন করিয়াছিলে? আমার রক্ষার আশা কেন কর নাই?" মহাত্মা হজরৎ আলী কোন ব্যক্তিকে পাপাধিক্য-চিন্তায় হতাশ হইতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"ভ্রাতঃ! হতাশ হইও না। করুণাময়ের দয়া তোমার পাপ অপেক্ষা বহু বিস্তৃত।" মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** ﷺ বলিয়াছেন—"পুনরুত্থানের দিন মানবদিগকে করুণাময় বলিবেন—'তোমরা কেন আমার করুণার সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছিলে? যদি আমার করুণার উপর নির্ভর করিতে পারিতে এবং এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে পারিতে যে—'হে আল্লা! মানুষের জন্য ভয় করিয়াছি কিন্তু তোমার দয়ার আশাধারী হইয়াছি—তবে

টীকা—২৯১। এই প্যারার শেষ বাক্যটী মূল গ্রন্থে এই প্যারার অন্তর্গত তারকা চিহ্নিত স্থানে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা হইল।

নিশ্চয়ই আমি দয়া করিতাম।'" এক দিন হজরৎ উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বলিয়াছিলেন—"হে লোক সকল! আমি যাহা জানি, তাহা যদি তোমরা জানিতে পাইতে তবে সর্ব্বদা তোমাদিগকে রোদন করিতে হইত—হাস্য পরিহাসের সময় পাইতে না; বিজন প্রান্তরে গিয়া বুক চাপড়াইয়া চীৎকার পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে হইত।" এই বাক্য শেষ হইলে হজরৎ জেব্রায়েল অবতীর্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন—"হে রসুলুল্লা! করুণাময় বলিয়া পাঠাইলেন —'কেন আমার দাসগণকে হতাশ করিতেছেন?'" এই অনুযোগ শ্রবণের পর মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ গৃহের বাহিরে আসিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় উপস্থিত লোকদিগকে আল্লার করুণার প্রতি আশা উদ্দীপক কথা শুনাইতে লাগিলেন। মহাত্মা হজরৎ দাউদ নবী عم কে মহাপ্রভু আল্লা প্রত্যাদেশ সহকারে বলিয়াছিলেন—"হে দাউদ! তুমি আমাকে ভালবাসিতে থাক এবং আমার দাসগণের মধ্যে ভালবাসা জন্মাইয়া দাও।" হজরৎ নিবেদন করিয়াছিলেন—"হে প্রভু! অপরের মনে কেমন করিয়া তোমার প্রতি ভালবাসা জন্মাইয়া দিব?" প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল—"আমার দয়া ও করুণা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দাও এবং আমার প্রত্যেক কার্য্য যে তাহাদের মঙ্গলের জন্য হইতেছে, তাহা বুঝাইয়া দাও।" এক ব্যক্তি স্বপ্নে মহাত্মা ইয়াহীয়া এব্নে আক্‌ছামকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"মহাপ্রভু আল্লা আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন?" তিনি স্বপ্নাবস্থায় বলিয়াছিলেন—"আল্লা আমাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—'তুমি ইহা কেন করিয়াছ? উহা কেন করিয়াছ?' প্রশ্নের ভাব গতিক দেখিয়া আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল; আমি উপায় না দেখিয়া শেষে নিবেদন করিলাম—'হে মহাপ্রভো! অদ্য আমাকে এরূপ ঝুকিতে পড়িতে হইবে, সে সংবাদ আমি পাই নাই।' তখন আদেশ হইল—'আচ্ছা! কোন্ সংবাদ পাইয়াছ?' আমি সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিলাম—'আপনি নাকি এই কথা বলিয়াছেন যে, আপনার বান্দা (দাস) আপনাকে যেরূপ ভাবে জানে এবং আপনার স্থানে যাহা পাইতে আশা রাখে, আপনি নাকি তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এ সংবাদ আমি আবদুর রাজ্জাকের মুখে শুনিয়াছি। তিনি নাকি উহা মোআম্মরের মুখে শুনিয়াছেন; তিনি নাকি জহরীর মুখে, জহরী আবার আনেছের মুখে, আনেছ, মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ এর মুখে, তিনি আবার জেব্রায়েলের মুখে এবং

জেব্‌রায়েল স্বয়ং আপনার নিকট সেই সংবাদ শুনিয়াছেন। আমি সেই সংবাদ শ্রবণ করা অবধি আপনাকে করুণাময় বলিয়া জানি এবং মজবুৎ আশা করিয়া আছি যে, আপনি আমার উপর দয়া করিবেন।' আমার এই নিবেদন শ্রবণ পূর্ব্বক মহাপ্রভু বলিলেন 'জেব্‌রায়েল সত্য কথাই বলিয়াছেন ; আমার রসুলও সত্যই বলিয়াছেন ; আনেছ, জহুরী, মোআম্মর, আব্‌দুর রাজ্জাক সকলেই সত্য কথাই বলিয়াছেন। আচ্ছা! এখনই তোমাকে দয়া করিতেছি'—বলিয়া আমাকে গৌরবের পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দিলেন, বেহেশ্‌তের বালক ভৃত্যগণকে আমার সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাহারা এখন আমার অগ্র পশ্চাতে চলিতেছে। আমি এখন এমন আনন্দ সাগরে নিমগ্ন আছি যে, তাহা কোন দিন কল্পনাতেও উদয় হয় নাই।'' হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে যে—''এছরায়েল বংশে এক জন লোক ছিল, সে ব্যক্তি প্রত্যেক নর নারীকে আল্লার দয়া হইতে নিরাশ করিয়া দিত এবং সকলের সহিত কর্কশ ব্যবহার করিত। মহাপ্রভু তাহাকে কেয়ামতের দিন বলিবেন—'তুমি যেমন আমার করুণা হইতে আমার দাসদিগকে নিরাশ করিতেছিলে, অদ্য আমি তোমাকেই আমার দয়া হইতে বঞ্চিত করিতেছি।''' হদীছ শরীফের অন্যত্র কথিত আছে—''এক ব্যক্তি হাজার বৎসর পর্য্যন্ত দোজখের আগুনে পুড়িতে থাকিবে এবং যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া—'হে দয়ালু! হে করুণাময়!' বলিয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকিবে। তখন করুণাময় তাহাকে দোজখ হইতে বাহির করিয়া আনিবার জন্য জেব্‌রায়েল ফেরেশ্‌তাকে আদেশ দিবেন। সে সম্মুখে আনীত হইলে, জিজ্ঞাসা করা হইবে—'দোজখ কি প্রকার স্থান দেখিলে?' সে উত্তর দিবে—'দোজখ সকল স্থান অপেক্ষা অধম ও ভীষণ যন্ত্রণার স্থান।' পরিশেষে উহাকে পুনরায় দোজখে লইয়া যাইতে আদেশ হইবে। ফেরেশ্‌তাগণ উহাকে দোজখের দিকে সজোরে টানিয়া লইয়া যাইতে থাকিবে। সে ব্যক্তি প্রত্যেক পাদে আল্লার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে থাকিবে। মহাপ্রভু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন—'তুমি ফিরিয়া ফিরিয়া কি দেখিতেছ?' সে বলিবে—''হে প্রভো!—তুমি যে সময়ে দয়া করিয়া আমাকে দোজখ হইতে বাহিরে আসিতে আদেশ দিয়াছ, তখন হইতে আমি এই আশা করিতেছি যে, পুনরায় আর দোজখে নিক্ষিপ্ত হইব না। এখনও আশা করিতেছি এবং ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছি যে, কখন

বা ফিরাইয়া লইতে আদেশ হয়।' মহাপ্রভু তখন আদেশ করিবেন—'আচ্ছা! ইহাকে বেহেশ্‌তে লইয়া যাও।' আশার কল্যাণে সে ব্যক্তি দোজখ হইতে অব্যাহতি পাইবে।"

আশার ত্রিবিধ অবস্থা ও দৃষ্টান্ত সহ তাহাদের পরস্পরের প্রভেদ বর্ণনা—পাঠক! জানিয়া রাখ, ভবিষ্যতে মঙ্গলের আকাশে رجا রজা কহে; উহাই স্থল বিশেষে تمنا তমান্না (অস্বাভাবিক আশা) এবং স্থল বিশেষে غرور গোরুর (ভ্রান্ত আশা বা দুরাশা) নামে অভিহিত হয়। অল্প বুদ্ধি লোকেরা উহাদের প্রভেদ বুঝিতে পারে না। তাহারা সকলকেই এক 'আশা' নাম দিয়া থাকে। এস্থলে, ঐ তিন অবস্থার প্রভেদ দেখান যাইতেছে। সুপক্ক সুপুষ্ট বীজ উপযুক্ত সময়ে উর্ব্বরা ভূমিতে বপন করতঃ কাঁটা ঘাস নিড়াইয়া যথা সময়ে জল সেচন পূর্ব্বক যদি কেহ আল্লার স্থানে এই আশা করে যে, তিনি গাছগুলিকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া উত্তম ফল উৎপাদন করিয়া দিবেন তবে সেই আশাকে 'রজা' বলে। পক্ষান্তরে, বীজ না বুনিয়া অথবা পচা সড়া বীজ, প্রস্তর বা কঙ্করের উপর নিক্ষেপ করতঃ বিনা জল সেচনে ফসলের পূরা আশা করাকে 'গোরুর' অর্থাৎ ভ্রান্ত আশা বা দুরাশা বলে। অন্য পক্ষে, উত্তম বীজ উর্ব্বরা ভূমিতে স্থাপন করতঃ জল সেচন না করিয়া এই আশা করে যে, মেঘ আসিয়া বারি বর্ষণ করিবে কিন্তু সে স্থানে বারি বর্ষণ অসম্ভব না হইলেও সচরাচর বৃষ্টিপাত হয় না—তেমন স্থলে বিনা জল সেচনে ও বিনা নিড়ানিতে ফসলের আশা করাকে 'তমান্না' বলে। এইরূপ যে ব্যক্তি ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস-জ্ঞান রূপ বীজ হৃদয়-ক্ষেত্রে বপন করতঃ কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ স্বভাব রূপ কাঁটা গাছগুলি হৃদয়-ক্ষেত্র হইতে দূর করতঃ এবাদৎ কার্য্যরূপ জল দ্বারা 'বিশ্বাস জ্ঞানের' চারা বৃক্ষগুলি সেচন পূর্ব্বক এই আশা করিতে থাকে যে,—করুণাময় সেই জ্ঞান বৃক্ষ গুলিকে সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ বিপদ আপদ হইতে নিরাপদ রাখিয়া মৃত্যুকালে সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বিঘ্নে পরকালে পার করিয়া দিবেন; এইরূপ আশাকে 'রজা' বলে। তদ্রূপ আশা আছে কি না তাহার চিহ্ন এই—যে অবসর টুকু পাওয়া যাইতেছে তন্মধ্যে যত অধিক পুণ্য হস্তগত হইতে পারে, তৎসংগ্রহে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য আসে না; সর্ব্বদা পুণ্য অর্জ্জনে বিশেষ সতর্কতার সহিত ত্রুটী পরিহার পূর্ব্বক কার্য্য করিতে সচেতন থাকে। ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধান পরিত্যাগ করা নৈরাশ্যের চিহ্ন। যে কৃষক শস্য উৎপাদনের আশা রাখে, সে কথনই

নিড়াইতে ও জল সেচনে শৈথিল্য বা ত্রুটী করে না। আবার ফিরিয়া দেখ—ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস-জ্ঞানের বীজ পচা সড়া হইলে বা পরিপুষ্ট না হইলে, অথবা যে হৃদয়-ক্ষেত্রে উহা বপন করা হয়, তাহা কুস্বভাব রূপ কাঁটা ঘাসে বিজড়িত থাকিলে, জ্ঞানের অঙ্কুর উদ্গত হইতে পারে না। আবার পারিলেও ঘাসের চাপে নষ্ট হইয়া যায়। তাহার পর ভাবিয়া দেখ—এবাদৎ রূপ জল দ্বারা হৃদয়স্থ জ্ঞানের ক্ষেত্র সেচন না করিলে জ্ঞান-বৃক্ষ শুকাইয়া মারা পড়িতে পারে। (বহির্জগতে কৃষি কার্য্যের মধ্যে বিশ্বপতি যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন অন্তর্জগতে জ্ঞানার্জনের পথেও সেই নিয়ম অটল ভাবে রক্ষা করিয়াছেন।) উভয় কার্য্যের মধ্যে আমাদের কর্ত্তব্যগুলি পরিত্যাগ করিয়া বা শৈথিল্য পূর্ব্বক ত্রুটী রাখিয়া অথবা বাধা বিঘ্ন খণ্ডাইয়া দিতে চেষ্টা না করিয়া গোড়াগুড়ি আল্লার অনুগ্রহের প্রতি আশা স্থাপন পূর্ব্বক বসিয়া থাকা সুস্পষ্ট দুরাশা ও ভ্রান্ত আশা মাত্র; উহাকে 'রজা' (প্রকৃত আশা) বলা যায় না। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ ও এই মর্ম্মে বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির আদেশ মত চলে, অথচ আল্লার স্থানে দয়ার আশা করে, সে বড়ই আহাম্মক।' স্বয়ং মহাপ্রভু বলিতেছেন—

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتٰبَ
يَأْخُذُونَ عَرَضَ هٰذَا الْأَدْنٰى وَيَقُولُونَ
سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ

"(কর্ত্তব্য-বিমুখ জাতি বিনষ্ট হইবার) পর উহারা তাহাদের এক প্রকার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিল এবং (সেই বিশ্ব-বিধান) গ্রন্থের উত্তরাধিকারীও হইয়াছিল। কিন্তু তৎপ্রতি বিমুখ হইয়া ঐ নিকৃষ্ট (কর্ত্তব্য-বিমুখতা শক্ত করিয়া) ধরিয়াছিল অথচ বলিত আমাদের অপরাধ ক্ষমা হইবে।" ৯ পারা। সূরা আ'রাফ। ২১ রোকূ।) (টীঃ ২৯২)

টীকা—২৯২। এই স্থানের ভাবার্থ এই যে—কর্ত্তব্যের যে অংশ সম্পন্ন করিতে মানব জাতিকে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রতিপালন না করাতে পূর্ব্ব কালের বহু জাতি বিনাশ পাইয়াছে। তাহাদের বিনাশের পর অন্য যে সমাজকে পৃথিবীতে স্থান দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের প্রতিও সেই অটল বিশ্বব্যাপৃত নিয়মাবলী অর্থাৎ কর্ত্তব্যের সেই অংশ পালন করিতে সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহারাও অবহেলায় উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য বিমুখ হইয়া অবাধ্যতা অবলম্বন করিয়াছিল, অথচ মনে প্রবল আশা রাখিত যে, ক্ষেত্র কর্ষণ উৎকৃষ্ট বীজ বপন, কণ্টক ঘাস উৎপাটন, জল সেচন ইত্যাদি কর্ত্তব্য কার্য্যের ন্যায় কর্ত্তব্যগুলি না করিয়া আশা করিত যে, 'তদ্রূপ ত্রুটীতে কোন হানি হইবে না কেবল আল্লার অনুগ্রহেই ফল পাইব।'

আশা, দুরাশা ও অস্বাভাবিক আশার প্রকৃত পরিচয়— যাহা হউক, যে সকল আসবাব-উপকরণ সংগ্রহ করা মনুষ্যের ক্ষমতার মধ্যে আছে, তৎসমুদয় পূর্ণভাবে সংগ্রহ করতঃ নিজের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সমাপনান্তে ফলের প্রত্যাশী হওয়া প্রকৃত 'রজা' বা আশার অন্তর্গত। তদ্বিপরীত আসবাব-উপকরণ গুলি সংগ্রহ না করিয়া অথবা অনর্থক নষ্ট করিয়া ফলের আশা করা ভ্রান্ত আশা ও অতীব মূর্খতা। আবার দেখ, যে স্থলে আসবাব-উপকরণ একেবারে নষ্ট করা হইল না অথচ উপযুক্ত কার্য্যে না খাটাইয়া বিকলে ফেলিয়া রাখা হইল; তথায় ফলের আশা করাকে تمنا তমান্না বা অস্বাভাবিক আশা বলে। মহাপুরুষ হজরত রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—

لیس الدین بالتمنی

"ধর্ম্মপথে তমান্না করা (কাজ না করিয়া ফলের প্রত্যাশা করা) বৃথা।" পাপ হইতে বিরত হইয়া (তওবা করিয়া) পাপ-সম্ভূত ক্ষতি হইতে বাঁচিবার আশা করা সঙ্গত ও কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি পাপকার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তজ্জন্য দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইতেছে এবং আশা করিতেছে যে আল্লা তাহাকে সেই পাপকার্য্য সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করিতে সুযোগ দিবেন ; এরূপ আশা করা 'রজা'র অন্তর্গত। ইহার কারণ এই যে, পাপের জন্য দুঃখিত ও অনুতপ্ত হওয়াকে পাপ হইতে বিরত হওয়ার এক প্রধান উপাদান বা উপকরণ কহা যায়। যে ব্যক্তি পাপ কার্য্য করে অথচ তজ্জন্য লজ্জিত বা দুঃখিত হয় না—কেবল মনে করে যে সে পাপ কার্য্য হইতে ফিরিতে সক্ষম হইবে ; এরূপ আশা করা 'রজা' নহে—উহাকে 'ভ্রান্ত আশা' বা মূর্খতা বলা যায়। এরূপ, পাপ পরিত্যাগে দৃঢ় সঙ্কল্প না করিয়া ক্ষমা পাইবার আশা করাও দুরাশা ও মূর্খতা। নির্ব্বোধ লোকেরা ইহাকেও 'রজা' বা প্রকৃত আশা বলে। স্বয়ং আল্লা বলিতেছেন—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

"নিশ্চয়ই যাহারা (জ্ঞানের কথা) মানিয়া লইয়াছে এবং যাহারা (ত্রুটী) পরিহার করিয়াছে এবং আল্লার (নির্দ্ধারিত) পথে (যথোচিত) পরিশ্রম করিয়াছে, তাহারাই আল্লার রহমতের আশা রাখিতে পারে। আল্লা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (২ পারা। সুরা বকর। ২৭ রোকু)। ইয়াহীয়া এব্‌নে মাজ বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি দোজখের বীজ বপন করিয়া বেহেশ্‌ত রূপ ফলের আশা রাখে, পাপ কার্য্য করিয়া সাধুর মর্য্যাদা পাইবার বাসনা করে এবং বিনা সৎকার্য্যে, পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার ন্যায় মূর্খ আর নাই।"

জায়দ-উল-খায়েল নামক এক ব্যক্তি মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) এর সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"হে রসুলুল্লা! আল্লা, এক জনার মঙ্গল চান; অন্যের চান না, উহার চিহ্ন কি? ইহা বুঝিবার জন্য আমি আসিয়াছি।" হজরৎ বলিলেন—"প্রত্যুষ প্রাতে শয্যা ত্যাগের সময়ে তোমার মনের অবস্থা কেমন থাকে?" সে ব্যক্তি বলিয়াছিল—"তখন আমার মনে সৎকার্য্য ও সাধু লোক বড় ভাল লাগে। কোন সৎকার্য্য সম্মুখে আসিলে সত্বর তাহা করিতে মন নাচিয়া উঠে। (সৎকার্য্যে পুণ্য পাওয়া যায় এ কথাটী আমি ধ্রুব সত্য বলিয়া জানি।) কোন সৎকার্য্য হাত ছাড়া হইলে মনে বড় দুঃখ লাগে, তদ্রূপ কার্য্য পুনরায় সম্মুখে আসিলে সর্ব্বাগ্রে তাহা করিব বলিয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকি।" হজরৎ বলিলেন—"আল্লা যে তোমার মঙ্গল চান; ঐ সমস্ত তাহার চিহ্ন। যদি তিনি তোমার অমঙ্গল চাহিতেন, তবে তোমাকে মন্দ কার্য্যেই রত রাখিতেন, দোজখের কোন্ কূপে ফেলিয়া তোমাকে বিনাশ করা হইবে তাহার ভাবনাও ভাবিতেন না।"

আল্লা আমাদের মঙ্গল চান কি না তাহার চিহ্ন

দুই শ্রেণীর লোকের পক্ষে আশাবৃদ্ধি কারক ঔষধের একান্ত প্রয়োজন—পাঠক! জানিয়া রাখ—নিম্ন লিখিত দুই শ্রেণীর রোগী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির জন্য এই ঔষধের প্রয়োজন নাই। **প্রথম** প্রকারের রোগী,—যাহারা এত অধিক পাপ করিয়াছে যে তজ্জন্য পাপ মুক্তির আশায় নিরাশ হইয়া পাপ পরিত্যাগ করে না, বরং বলিতে থাকে যে আমাদের যখন পাপ মার্জ্জনা হইবে না তখন পাপ প্রলোভনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া অনর্থক কষ্ট ভোগের প্রয়োজন কি? **দ্বিতীয়** প্রকার রোগী,—যাহারা চরিত্রোন্নতি কার্য্যে ও কুপ্রবৃত্তির উচ্ছেদ সাধনে বাড়াবাড়ী করিতে গিয়া এবং অসীম এবাদৎ কার্য্যে সাধ্যের অতীত পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিয়া

নিজের দেহ-পাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই দুই শ্রেণীর লোকের পক্ষে 'আশা বৃদ্ধি কারক' ঔষধ অবশ্যই হিতকর।

আশাবৃদ্ধি কারক ঔষধ কাহার পক্ষে মারাত্মক— غافل গাফেল অর্থাৎ পরকাল সম্বন্ধে উদাসীন ও অমনোযোগী লোকের জন্য 'আল্লার দয়া প্রাপ্তির আশা' ঔষধ নহে—বরং হলাহল বিষ তুল্য মারাত্মক।

আল্লার অনুগ্রহের প্রতি আশা বর্দ্ধিত করিবার দ্বিবিধ উপায়— দুই উপায়ে আল্লার অনুগ্রহের আশা মানব মনে প্রবল ও বলবান্ হইয়া উঠিতে পারে। **প্রথম উপায়—** বিশ্ব জগতের সর্ব্বস্থানে মহাপ্রভুর করুণা অবারিত ধারে অনবরত ঝরিতেছে ইহা বুঝিতে পারিলে মানব, তাঁহার করুণা প্রাপ্তির আশায় প্রলুব্ধ হইতে পারে। ইহজগতে যে সকল অনন্ত আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতেছে এবং ভূতলে যত উদ্ভিদ্ ও জীব জন্তু জন্মিতেছে তৎ সমুদয়ের সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ মনোযোগের সহিত প্রণিধান ও পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে তৎসমস্তই মানবের পক্ষে এক একটী মহা নেআমৎ অর্থাৎ পরমোৎকৃষ্ট সম্পদ্। এরূপ কথা শোকর (কৃতজ্ঞতা) বর্ণনা কালে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে একবার বলা গিয়াছে। যাহা হউক, ঐ সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে প্রত্যেক ঘটনা ও প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে মহাপ্রভুর এরূপ পূর্ণ অনুগ্রহ, অসীম দান ও অপার বদান্যতা সুস্পষ্ট দেখা যায় যে তদপেক্ষা অধিক কল্পনা করিবার উপায়ও পাওয়া যায় না।

মানব স্বীয় শরীরের প্রতি দৃষ্টি করিলেও বুঝিতে পারিবে যে তাহার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক সমস্তই তিনি পূর্ণ মাত্রায় বিশেষ সৌন্দর্য্যের সহিত পরিপাটী করিয়া দিয়াছেন। যে বস্তু না হইলে দেহ রাজ্যের কার্য্য চলিতে পারে না

মানবদেহ গঠনের পর্য্যালোচনায়—

যথা—মস্তক, রক্তাধার, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি, এরূপ পদার্থ তিনি পূর্ণ ভাবে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া প্রদান করিয়াছেন। তাহার পর দেখ, যে যে অঙ্গ দ্বারা মানব স্বীয় কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইতে পারে কিন্তু তাহা না থাকিলেও দেহ রক্ষার ব্যাঘাত হইত না তেমন পদার্থ যথা—হস্ত পদাদি; এরূপ বস্তুকেও যেমন পূর্ণ পারিপাট্যের সহিত সৃষ্টি করা উচিত ছিল করুণাময় তদ্রূপ ভাবেই সৃজন করিয়াছেন। অতঃপর দেখ—যে সকল পদার্থ, মস্তকাদির ন্যায় মানবের অত্যাবশ্যকীয় নহে এবং হস্ত পদাদির ন্যায় কার্য্য উদ্ধারেও প্রয়োজন হয় না—কেবল দেখিতে সুধু সুন্দর মাত্র তৎসমুদয়ও করুণাময় পর্য্যাপ্ত পরি-

মাণে পারিপাট্যের সহিত দান করিয়াছেন; যেমন অধর-ওষ্ঠের লালিত্য, ভ্রূযুগলের বক্রতা, চক্ষু মণির কৃষ্ণতা, পক্ষ্ম পংক্তির সরলতা ইত্যাদি।

সুধু কি মানবের প্রতিই এইরূপ অনুগ্রহ? তাহা নহে; সমস্ত জীব জন্তু কীট পতঙ্গ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণী দেহেও ঐ প্রকার অত্যাবশ্যকীয়, প্রয়োজনীয় ও শোভন-সামগ্রী পর্য্যাপ্ত পারিপাট্যের সহিত পূর্ণ ভাবে দেওয়া হইয়াছে। দেখ, মধুমক্ষিকা সৃষ্টির মধ্যে কেমন সুন্দর সদয় শিল্প-কৌশল দেখা যাইতেছে।

মধুমক্ষিকার স্বভাব পর্য্যালোচনা

তাহার প্রকৃতি কেমন মনোহর, গঠন কেমন চমৎকার আকার কেমন কার্য্যোপযোগী! তাহার উপর পুনরায় কেমন চমৎকার কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন! তাহাদিগকে নিজের আবাস গৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ে কেমন আশ্চর্য্য স্বাভাবিক দক্ষতা দিয়াছেন। তাহারা অতীব কৌশলে গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার উপায় করিয়া, সহজ আকারে, অল্প স্থানে, অধিক কুঠরি নির্ম্মাণ করে এবং বাস গৃহ ও ভাণ্ডার পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নির্ম্মাণ করে। তাহাদের এই সকল কার্য্য চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহার পর, তাহারা ঐ সকল ভাণ্ডার ঘরে কেমন শৃঙ্খলার সহিত মধু সঞ্চয় করে এবং তাহারা স্বীয় রাজার আদেশ কেমন সুন্দর মত পালন করে, রাজা আবার তাহাদের উপর কেমন মনোরম প্রজারঞ্জন-শাসন পরিচালনা করে এ সমস্তই বিস্ময়কর।

যাহা হউক, মানব দেহের ভিতরে বাহিরে এবং সমস্ত সৃষ্ট জীবে যে সকল আশ্চর্য্য করুণা-ব্যঞ্জক কৌশল সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে তৎপ্রতি যে ব্যক্তি মনোযোগ দেয় সে স্পষ্টই বুঝিতে পারে যে মহাপ্রভু দয়ার সাগর, তাঁহার দয়া হইতে কেহই নিরাশ হইতে পারে না এবং তৎসঙ্গে ইহাও বুঝিতে পারে যে দয়াময়ের রাজ্যে কোন ভয়ের প্রবেশাধিকার নাই। তথাপি মুছলমানের মনে ভয় ও আশা দুইটী সমান ভাবে জাগরুক রাখা আবশ্যক। সীমা অতিক্রম করিয়া আশা বাড়িয়া উঠিলেও ক্ষতির কারণ হয়।

অতঃপর দেখ—করুণাময়ের যে সকল দয়া অনুগ্রহ মানব সমাজের

মানবসমাজ সংরক্ষণে আল্লার করুণার বিকাশ

সঙ্গে মিলিত থাকিয়া সমাজ চালাইতেছে তাহাও অনন্ত। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন "কোর্‌আন শরীফের মধ্যে ایت تداینت 'আয়াতে তদাইয়ানাৎ' অর্থাৎ 'ধনের আদান প্রদান' সম্বন্ধে যে নিয়ম ও আদেশ আছে তদপেক্ষা অধিক আশা উদ্দীপক ও সান্ত্বনা দায়ক বচন আর নাই।

(টীঃ ২৯৩) কোর্‌আন্ শরীফের মধ্যে ইহা একটী সুবৃহৎ আয়াৎ। নিজের ধন অপরের হাতে দিলে তাহা কিরূপে নিরাপদে থাকিতে পারে ও ফেরৎ পাওয়া যায় তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম স্থাপন করাতে মনুষ্য সমাজের হিতের জন্য বড় অনুগ্রহ করা হইয়াছে। এইরূপ জগতের যে দিকে দেখা যায় সেই দিকেই আল্লার অনুগ্রহ অনন্ত ও অসীম ভাবে বর্ষিত হইতেছে দেখা যায়; এমন

টীকা—২৯৩। তৃতীয় পারা; দ্বিতীয় সূরা বকর এর ২৯ নম্বরে সমস্ত লোকুকে ঐ আয়াৎ বলে। মনুষ্য সমাজে ধনের আদান প্রদান ও প্রচলন সম্বন্ধীয় নিয়ম ঐ আয়াতে পরিষ্কার ভাবে দেওয়া হইয়াছে। স্থূল অর্থ এইরূপ—

"হে মুছলমানগণ। যখন তোমরা সময় নির্দ্ধারণ করিয়া করজ দেওয়া লওয়া করিতে চাও তখন তাহা লিখিয়া রাখ। তোমাদের মধ্যস্থ এক জন লিখক তাহা বিচার সঙ্গত মত লিখিয়া দিউক। আল্লা যেরূপ লিখিতে শিখাইয়াছেন তদ্রূপ লিখতে লেখক যেন অস্বীকার না করে। যাহা হউক লিখিয়া লও। করজের শরৎ করজ দাতা নিজে বলিয়া দিবে কিন্তু স্বীয় প্রভু আল্লার ভয় মনে জাগরুক রাখিয়া শরৎ ঠিক করিয়া দিবে। (করজ গৃহীতার সুবিধা) কিছু মাত্র সঙ্কোচ করিবে না। করজ দাতা নির্ব্বোধ দুর্ব্বল অথবা মর্ম্ম বলিয়া দিতে অক্ষম হইলে তাহার আসন্ন বন্ধু ওলী সুবিচারের সহিত মৎলব বলিয়া দিবে। করজ আদান প্রদানের সাক্ষী স্বরূপ নিজের মধ্যস্থ দুই জন পুরুষকে সাক্ষী করিয়া লইবে। দুই জন পুরুষ না মিলিলে এক জন পুরুষ ও দুই জন স্ত্রীলোককে তোমাদের পছন্দ মত সাক্ষী করিয়া লইবে। উহাদের মধ্যে কেহ ভুলিয়া গেলে অপর দুই জনের কেহ উহাকে স্মরণ করিয়া দিতে পারে। সাক্ষীকে তলব দিলে সাক্ষ্য দানে অস্বীকার করা উচিত নহে। আদান প্রদান সম্বন্ধীয় ঐ সকল বিষয় ছোটই হউক বা বড়ই হউক, মেয়াদ তক লিখিয়া রাখিতে শৈথিল্য করিবে না। লিখিয়া রাখা আল্লার নজরে সুবিচারের কথা এবং সাক্ষ্যদান কালে সাক্ষীর সম্বন্ধে সুবিধার বিষয় এবং নিঃসন্দেহের নিকটবর্ত্তী। পণ্য দ্রব্য হাতে হাতে উপস্থিত মত, ক্রয় বিক্রয় হইলে না লিখিয়া লইলেও দায় নাই। ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি হইলে সাক্ষী রাখিবে। লিখক বা সাক্ষীর ক্ষতি করিও না। যে করে সে পাপী। আল্লাকে ভয় কর। আল্লা তোমাদিগকে ইহা শিখাইলেন। আল্লা সমস্ত অবগত আছেন। যদি সফরে থাক, লিখক না পাও, তবে বন্ধকীয় বস্তু হাতে রাখ। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ কাহাকে বিশ্বাস করিয়া তাহার নিকট কোন দ্রব্য গচ্ছিত রাখে তবে তাহাকে তাহা ফিরিয়া দাও, তোমার প্রভু আল্লাকে ভয় কর। সাক্ষ্য গোপন করিও না। যে ব্যক্তি সাক্ষ্য গোপন করে তাহার হৃদয় পাপে কলুষিত হয়। তোমরা যাহা কর আল্লা তাহা উত্তম রূপে জানেন।"

আয়াতের অর্থ মোটামুটী দেওয়া গেল। আদান প্রদান সম্বন্ধে ঐরূপ নিয়ম করাতে সমাজের প্রতি যে কিরূপ অনুগ্রহ করা হইয়াছে তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে বুঝা যায় না। বিস্তৃত ভাবে বুঝাইয়া দিতে আমাদের স্থান, সময় ও সামর্থ্য নাই তবে বুদ্ধিমান লোকের জন্য দুই এক কথা বলা আবশ্যক। মনুষ্য দেহ রক্ষণ ও পুষ্টি সাধনের জন্য রক্ত যেমন অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ মনুষ্য সমাজের রক্ষণ ও উন্নতি সাধন জন্য 'ধন' তেমনই অত্যাবশ্যকীয় বস্তু। দেহ ও সমাজ সজীব ও উন্নতিশীল রাখিতে রক্ত ও ধন উভয়েরই 'অবাধ প্রচলন' রাখিবার উপায় করা উচিত। দেহের রক্ত কোন অঙ্গে আবদ্ধ হইয়া পড়িলে যেমন পীড়া উৎপন্ন হয়, ধনও সমাজের কোন অংশে গিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়িলে—গোলাবন্দী ও বাক্‌স বন্দী হইয়া পড়িলে সমাজেরও মহা পীড়া উৎপন্ন হয়। শেষে সমাজের ক্ষতি-কর ও ক্ষতি-গ্রস্ত অংশ বিনাশ পায়। মনুষ্য সমাজকে সবল সুস্থ ও বর্দ্ধনশীল রাখিবার জন্য করুণামূলক ঐ আদেশ প্রতিপালন করা অতীব কর্ত্তব্য।

স্থলে আমাদের ন্যায় পাপী লোকের মার্জনার জন্য তিনি করুণা-মূলক ক্ষমতা পরিচালনে বিরত থাকিবেন এবং আমাদের সমস্ত পাপীকুলকে দোজখে পাঠাইবেন, ইহা কোন মতে হইতে পারে না। আশা বৃদ্ধি করিবার জন্য উক্ত প্রকার পর্য্যবেক্ষণ একটী মহা ঔষধ। ইহার উপকারিতা অসীম। কিন্তু সকল ব্যক্তি উক্ত প্রকার উন্নত পর্য্যালোচনা ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে সক্ষম নহে।

আশা বর্দ্ধিত করিবার দ্বিতীয় উপায় এই যে—এ সম্বন্ধে (১) যে সকল আয়াৎ কোরআন্ শরীফে আছে এবং (২) যে সকল বাণী হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে তৎসমুদয় বিশেষ মনোযোগের সহিত বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। এরূপ আয়াৎ ও হদীছ অনেক আছে তন্মধ্যে এস্থলে কয়েকটীর উল্লেখ হইতেছে।

(১) আল্লার করুণার প্রতি আশাবর্দ্ধক কোরআন বচন—

করুণাময় বলিতেছেন—

لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ

"নিরাশ হইও না আল্লার রহমত হইতে।" (২৪ পারা। সুরা—জোমর। ৬ রোকু।)

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ ۚ

"পৃথিবীতে যাহারা আছে (অর্থাৎ সমস্ত মানব) তাহাদের জন্য উহারা (ফেরেশতাগণ) পাপ মোচনের জন্য প্রার্থনা করিতেছে।" (২৫ পারা। সুরা—শোরা। ১ রোকু।)

ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۚ

"ইহা এই জন্য যে, আল্লা তাহা দ্বারা (দোজখের সংবাদ দ্বারা) তাঁহার দাসগণকে ভয় দেখাইয়া থাকেন মাত্র, (কিন্তু তাঁহার শত্রু কাফেরগণকে সেই দোজখে নিক্ষেপ করতঃ শাস্তি দিয়া থাকেন)।" (২৩ পারা—সুরা জোমর। ২ রোকু)।"

মহাপুরুষ হজরত **রসুল** ﷺ যিনি জগতের উপর আল্লার করুণার সাক্ষাৎ অবতার ছিলেন এবং সর্ব্বদা মানবকুলের পাপ মুক্তি চাহিতেন

তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য করুণাময় নিম্নলিখিত প্রকার আশ্বাস বাণী প্রেরণ করিয়াছেন—

إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ

"হে মোহাম্মদ! নিশ্চয়ই তোমার প্রভু মনুষ্য জাতিকে তাহাদের পাপ রাশির বিরুদ্ধে ক্ষমা করিবার অধিপতি।" (১৩ পারা। সুরা রাদ। ১ রোকু।)

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ

"এবং নিশ্চয়ই অতি শীঘ্র তোমার প্রভু তোমাকে (এমন) দান করিবেন (যাহাতে) তুমি সন্তুষ্ট হইবে।" (৩০ পারা। সুরা জোহা। ১ রোকু।) অর্থাৎ তোমার প্রার্থনা মত তোমার ওম্মৎগণের এত অধিক পাপ মোচন করিবেন যে তুমি সন্তুষ্ট হইবে। এই আশ্বাস বচন সমাগত হইলে, মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ ছাহাবাগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"যে পর্য্যন্ত আমার একটী ওম্মৎও মুক্তি পাইতে অবশিষ্ট থাকিবে সে পর্য্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হইব না।" আল্লা স্বীয় পবিত্র বচনে যেরূপ করুণা-ব্যঞ্জক আশ্বাস দিয়াছেন তাহার নমুনা প্রদর্শিত হইল।

(২) **আল্লার করুণার প্রতি আশাবর্দ্ধক হদীছ বচন**—আল্লার রহমৎ ও করুণার প্রতি আশা-বর্দ্ধক হদীছও বহু আছে। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ বলিয়াছেন—"আমার ওম্মৎগণ আল্লার করুণার অধিকারী। ইহাদের ত্রুটীর শাস্তি এই পৃথিবীতেই চুকিয়া যাইবে। ভূমিকম্প, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি পৃথিবীর শাস্তি। জ্বর জ্বালা দোজখের আঁচ। সেই আঁচ দুনিয়াতে জ্বর স্বরূপ ভোগ করিলে দোজখের শাস্তি শোধ হইবে। এই সংসারেই মুছলমান লোকের শাস্তি শোধ হইবে। পরকালে মহা-বিচারের দিন এক একটী কাফেরের নিষ্কৃতি প্রত্যেক মুছলমানের অনুরোধ ক্রমে দেওয়া হইবে।" মহাত্মা হজরৎ আনেছের মুখে শুনা গিয়াছে যে—"মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ এক সময়ে আল্লার দরবারে প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন—'হে মহাবিচারক! আমার ওম্মতের বিচার তাহাদের সহিত না করিয়া আমার সহিত করিও। তাহা হইলে অন্য পয়গম্বরের ওম্মত হইতে আমার ওম্মতের প্রভেদ থাকিবে।' প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল—'হে

মোহাম্মদ! তোমার ওম্মতগণ আমার বান্দা, আমি তাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসি ও দয়া করি। অন্য কোন ওম্মৎই ইহাদের তুল্য করুণা পাইবে না সুতরাং ইহাদের বিশেষত্ব থাকিবে। তোমার ওম্মতের তুল্য অপর কোন ওম্মৎকে কেহই দেখিতে পাইবে না এবং তুমিও দেখিতে পাইবে না।" তিনি আরও একবার বলিয়াছিলেন—"আমার জীবন ও মৃত্যু উভয়ই তোমাদের মঙ্গলের জন্য—যতদিন বাঁচিয়া থাকিব তোমাদিগকে ধর্ম্মবিধান শিক্ষা দিব আর মরিয়া গেলে তোমাদের ক্রিয়া কার্য্য পরীক্ষা করিব; যে কার্য্য সৎ হইবে তজ্জন্য আল্লার প্রশংসা করিব এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ দিব কিন্তু মন্দ কার্য্য দেখিলে আল্লার স্থানে ক্ষমা ভিক্ষা করিব।" হজরৎ এক দিন আল্লাকে يا كريم العفو (ইয়া কারীমোল্ আফু) বলিয়া সম্বোধন করিলে, জেব্‌রায়েল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনি কি ঐ নামের অর্থ জানেন? উহার অর্থ এই যে, তিনি করীম অর্থাৎ অতীব কৃপালু এবং আফু অর্থাৎ পাপ মোচন পূর্ব্বক তৎপরিবর্ত্তে পুণ্য দিতে বড়ই তৎপর।" হজরৎ অন্য এক দিন বলিয়াছিলেন—"বান্দা, পাপ করিবার পর যখন লজ্জিত হইয়া মার্জ্জনার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগে তখন মহাপ্রভু ফেরেশ্‌তাগণের সম্মুখে বলিতে থাকেন—'দেখ, আমার এই দাস, একটী পাপ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে যে আমি ভিন্ন তাহার এমন কোন প্রভু নাই যে মার্জ্জনা করিতে বা শাস্তি দিতে পারে। যাহা হউক, তোমরা দেখ—আমি উহাকে কেমন সদয় ভাবে ক্ষমা করিতেছি।'" হজরৎ আরও বলিয়াছেন—"মহা করুণাময় আল্লা ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন—'আকাশ পরিপূর্ণ হয় এত পাপ করিয়াও মানব যদিও মুক্তির আশায় ক্ষমা প্রার্থনা করে তবেও আমি তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করিয়া থাকি। আবার পৃথিবী ভরিয়া যায় এত পাপ করিয়াও ক্ষমার প্রার্থী হইলে আমিও পৃথিবীপূর্ণ দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকি।'" হজরৎ আরও বলিয়াছেন—"লোকে পাপ করিলে, ফেরেশ্‌তাগণ সে পাপ লিপীবদ্ধ করিতে ছয় ঘণ্টা কাল বিলম্ব করেন। ইতিমধ্যে পাপী যদি লজ্জিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে ফেরেশ্‌তাগন সে পাপ আর লিপীবদ্ধ করেন না। কিন্তু সেই ছয় ঘণ্টার মধ্যে ক্ষমা প্রার্থনা না করিয়া অন্য কোন এবাদৎ কার্য্য করিলে দক্ষিণ পার্শ্বের ফেরেশ্‌তা বাম পার্শ্বের ফেরেশ্‌তাকে বলিয়া দেন—'তুমি ঐ পাপ লিখিও না, আমি বরং এবাদৎকে দশ ভাগ করিয়া এক ভাগ ঐ পাপের জন্য ছাড়িয়া দিয়া নয় ভাগের পুণ্য লিখিয়া লইতেছি।'" হজরৎ অন্য এক দিন বলিতে-

ছিলেন যে—"মানব পাপ করিলে তাহার নামে সে পাপটী লিখিত হয়।" এমন সময় পল্লী গ্রাম বাসী একটী মূর্খ লোক জিজ্ঞাসা করিল -"সে ব্যক্তি তওবা করিলে কি হয়?" হজরৎ বলিলেন—"সে পাপ মুছিয়া ফেলা হয়।" মূর্খ লোকটী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"যদি সে ব্যক্তি পুনরায় পাপ করে?" তিনি বলিলেন—"পুনরায় পাপ লিখিত হয়।" সে জিজ্ঞাসা করিল—"তাহার পর যদি সে তওবা করে?" তিনি বলিলেন—"পুনরায় মুছিয়া ফেলা হয়।" সে ব্যক্তি অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল—"কতবার ঐরূপ মুছা যাইবে?" হজরৎ বলিলেন—"যত বার পাপী তওবা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, তত বার পাপ মুছিয়া ফেলা যাইবে।" পাপী ব্যক্তি যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনায় পরিশ্রান্ত হইয়া বিরত না হইবে, ততক্ষণ দয়াময়ও ক্ষমা করিতে বিরক্ত হইবেন না।" তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"লোকে, সৎ কার্য্যের ইচ্ছা করিলে তাহাব নামে একটী পুণ্য এবং কার্য্যটী সমাপ্ত করিলে তাহার নামে দশটী পুণ্য লিখিত হয়। আবার সেই সৎকার্য্য পুনরায় করিতে থাকিলে পুণ্যের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে করিতে সাত শত পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। অপর পক্ষে পাপ কার্য্যের ইচ্ছা মাত্র করিলে তজ্জন্য পাপ লিপীবদ্ধ হয় না; কার্য্যটী করিয়া ফেলিলে একটী মাত্র পাপ লিখিত হয় বটে কিন্তু তাহাও আবার আল্লা ক্ষমা করিতে পারেন।" এক ব্যক্তি মহা-পুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) এর সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিয়াছিল,—"হে রসুলুল্লা! আমি কেবল রমজানের রোজা রাখি ও পাঁচ ওয়াক্তের নমাজ পড়ি; তদ্‌ভিন্ন অন্য কোন এবাদৎ করিতে আমার সুযোগ নাই। ধন নাই বলিয়া জকাৎ দিতে বা হজ করিতে পারি না। হে রসুলুল্লা, পরকালে আমার কি গতি হইবে?" হজরৎ প্রফুল্ল বদনে মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন,—"তুমি আমার সঙ্গে থাকিবে; তবে একটী কথা আছে, তুমি যদি স্বীয় মন কপটতা ও ঈর্ষা হইতে পবিত্র রাখিতে পার, জিহ্বাকে পরনিন্দা ও মিথ্যা বচন হইতে বাঁচাইতে পার, এবং পরস্ত্রী প্রভৃতি নিষিদ্ধ দর্শন হইতে ও অপরকে ঘৃণার সহিত দর্শন হইতে চক্ষু দুটী রক্ষা করিতে পার, তবেই আমার সহিত বেহেশ্‌তে বিচরণ করিতে পারিবে এবং আমি তোমাকে স্নেহের সহিত এই হাতের তালুর উপর রাখিব।" আরবের পল্লীবাসী এক জন মূর্খ লোক মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) এর সমীপে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"হে রসুলুল্লা! কেয়ামতের দিন কে বিচার

করিবেন ?" হজরৎ বলিলেন—"আল্লা বিচার করিবেন।" সে ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "তিনি কি নিজেই বিচার করিবেন ?" হজরৎ বলিলেন —"হাঁ, তিনি নিজেই করিবেন।" এই কথা শুনিয়া সেই সরল পল্লীবাসীর বদন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। হজরৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরূপ আনন্দিত হইবার কারণ কি ?" সে উত্তর দিল—"আমার বিলক্ষণ জানা আছে, মহা দয়ালু ব্যক্তির হাতে যখন অপরাধী কাবু হইয়া পড়ে, তখন তিনি তাহার অপরাধ ক্ষমা করেন এবং যখন বিচার আরম্ভ করেন, তখন করুণার সহিত মৃদু ভাবে বিচার করেন আল্লা মহা দয়ালু, তিনি স্বয়ং বিচার করিলে পাপী লোকের নিষ্কৃতির বহু আশা আছে।" ইহা শুনিয়া হজরৎ বলিলেন—"এই গ্রাম্য লোকটী যথার্থ কথাই বলিয়াছে—আল্লার সমান কেহই দয়ালু নাই। এ ব্যক্তি যথার্থই বিচক্ষণ জ্ঞানী লোক।" পরে বলিলেন—"আল্লা নিজে দয়ালু, এই জন্য দয়ালু লোককে মহৎ ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তদ্রূপ গৌরবান্বিত ব্যক্তিকে হত্যা পূর্ব্বক প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করতঃ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিলে যে পাপ হয়, আল্লার কোন এক জন (ওলী) বন্ধুকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিলে তদপেক্ষা অধিক পাপ হইয়া থাকে।" ইহা শ্রবণান্তর সেই গ্রাম্য লোক জিজ্ঞাসা করিল—"হে রসুলুল্লা! কোন্ ব্যক্তি আল্লার (ওলী) বন্ধু ?" উত্তর করিলেন —"সমস্ত মুছলমানই আল্লার বন্ধু। হে ভাই! তুমি কি শুন নাই—মহাপ্রভু আল্লা বলিতেছেন—

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ

الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط

" যাহারা ঈমান আনিয়াছে, অর্থাৎ মুছলমান হইয়াছে, তাহারা আল্লার (ওলী) বন্ধু। তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোতে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে।'" (৩ পারা। সূরা -বকর। ৩৭ রোকূ—আয়াতোল্ কোরছী।) মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) অন্যত্র বলিয়াছেন,—"মহাপ্রভু এই কথা ঘোষণা করিতেছেন যে - মানব আমা হইতে উপকার গ্রহণ করিবে বলিয়া আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের স্থানে কিছু পাইব বলিয়া

সৃষ্টি করি নাই।" তিনি আরও বলিয়াছেন,—"সৃষ্টিকর্ত্তা, মানব সৃষ্টির অগ্রে নিজের সম্বন্ধে এই কথা লিখিয়া লইয়াছেন যে,—'আমার অনুগ্রহ চিরকালই আমার ক্রোধকে অতিক্রম করিবে।'" তিনি ইহাও বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি لا اله الا الله 'লা এলাহা এল্লাল্লাহ্' অর্থাৎ 'আল্লা ব্যতীত অন্য কোন প্রভু নাই' এই বাক্য বলিবে, সে ব্যক্তি বেহেশ্‌তে যাইবে এবং অন্তিম সময়ে যাহার মুখ হইতে ঐ বাক্য বাহির হইবে, সে কখনই দোজখ দেখিতে পাইবে না। আবার যে ব্যক্তি আল্লার অংশী বিশ্বাস করে না, সেও পরকালে কখনই দোজখে যাইবে না।" তিনি ইহাও বলিয়াছেন—"তোমরা যদি একেবারে পাপ না কর, তবে সৃষ্টিকর্ত্তা পাপী লোক সৃজন পূর্ব্বক তাহাদের পাপ সদয় ভাবে মার্জ্জনা করতঃ স্বীয় পতিতপাবন ও দয়ার সাগর নামের অর্থ সফল করিবেন।" তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"দুগ্ধপোষ্য সন্তানের উপর স্বীয় স্নেহময়ী জননীর দয়া যতদূর, দয়াময় আল্লার দয়া তাঁহার বান্দাগণের উপর তদপেক্ষা অধিক।" তিনি এ কথাও বলিয়াছেন—"মহাবিচারের দিন করুণাময় আল্লা এত অপারিমিতভাবে দয়া প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন যে, তদ্দর্শনে শয়তানও তাঁহার দয়া প্রাপ্তির আশায় মাথা তুলিবে।" তিনি ইহাও বলিয়াছেন—"মহাপ্রভু স্বীয় করুণা এক শত ভাগ করিয়া নিরানব্বই ভাগ মহাবিচারের দিন বান্দাগণকে দিবার জন্য রাখিয়া দিয়াছেন, কেবল এক ভাগ মাত্র ইহকালে সমস্ত বিশ্ব জগৎ ব্যাপিয়া বর্ষণ করিতেছেন। সেই এক অংশ দয়া নানা আকারে প্রকাশ পাইতেছে। মাতার দয়া সন্তানের উপর, ইতর প্রাণীর দয়া তাহাদের বাচ্চার উপর দেখা যাইতেছে। কেয়ামতের দিন এই এক অংশ দয়াও সেই গচ্ছিত নিরানব্বই অংশের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ণ মাত্রায় মানুষের উপর বর্ষণ করিতে থাকিবেন। তাঁহার দয়ার প্রত্যেক অংশই পৃথিবী হইতে আকাশের উচ্চতায় কয়েক গুণ উচ্চ ও বিস্তৃত হইবে। সে দিন কেহই উৎপীড়িত হইবে না; তবে সৃষ্টির প্রারম্ভে যাহার অদৃষ্টে যেরূপ অবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহারও অন্যথা হইবে না।" মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ কে করুণাময় আল্লা জগতের উপর করুণার অবতার করিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন —"আমার ওম্মতের মধ্যে যাহারা বড় বড় গুরুতর পাপ করে, আমার 'শাফাআৎ' অর্থাৎ পাপ মোচনের অনুরোধ তাহাদের জন্য গচ্ছিত রাখিয়াছি। যাহারা পাপ হইতে বিরত এবং আল্লার আদেশ পালনে তৎপর তাহাদের

জন্য আমার শাফাআতের (অনুরোধের) প্রয়োজন নাই। কেবল পাপীর পাপ মোচনের জন্যই আমার অনুরোধ হইবে।" মহাত্মা ছঈদ এব্‌নে বেলাল বলিয়াছেন—"মহাবিচারের দিন দুই জন পাপীকে শাস্তি হইতে বাহির করিয়া আল্লার সম্মুখে আনা হইবে। তখন তাহাদিগকে বলা হইবে, "তোমরা যে শাস্তি পাইতেছ, তাহা তোমাদের কৃতকার্য্যের ফল। আল্লা কাহারও উপর অত্যাচার করেন না। আচ্ছা, পুনরায় দোজখে যাও ও শাস্তি গ্রহণ করিতে থাক। হে দোজখের ফেরেশ্‌তাগণ! ইহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে লইয়া যাও।" এই আদেশ শ্রবণ মাত্র একজন পাপী শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মহা কষ্টে দোজখের দিকে দৌড়িতে থাকিবে, আর অন্য জন ধীরে ধীরে যাইবে ও পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে থাকিবে। মহাপ্রভু উভয়কে তদ্রূপ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন। প্রথম ব্যক্তি বলিবে—"হে প্রভো! পৃথিবীতে তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া এই মহা দুঃখে পতিত হইয়াছি, এখন এই আদেশ পালনে শৈথিল্য করিলে কি জানি ইহা অপেক্ষা কঠিন শাস্তিতে আবদ্ধ হইব, এই ভয়ে যথাসাধ্য দৌড়িতেছি। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিবে—"হে করুণাময়! আমি এখনও তোমার করুণার প্রবল আশাধারী হইয়া আছি। দোজখ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম দেখিয়া সেই আশা সফল হইতেছে ভাবিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। মনে মনে আশা করিয়াছিলাম, তুমি দয়া করিয়া নিষ্কৃতি দিলে—আর দোজখে যাইতে হইবে না। ইতিমধ্যে পুনরায় দোজখে যাইবার আদেশ হইল, তথাপি প্রতি ধাপেই তোমার দয়ার আশা করিতেছি; মনে হইতেছে, এই বার বুঝি দয়া করিয়া ফিরাইয়া লইবার আদেশ হইবে। এই আশায় ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছি। সেই সময়ে করুণাময়ের করুণার উচ্ছাস উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিবে এবং উভয়কে বেহেশ্‌তে পাঠাইবেন।" মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) বলিয়াছেন—"কেয়ামতের দিন ঘোষণা করিয়া বলা হইবে—'হে মুছলমানগণ! আমার প্রতি তোমাদের যে সকল কর্ত্তব্য ছিল, তাহার অপ্রতিপালনের ত্রুটী অদ্য আমি ধরিতেছি না—তোমাদের সে ত্রুটী আমি ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু মানবের মধ্যে একের প্রতি অপরের যে কর্ত্তব্য ছিল, তাহা আদান প্রদান করিয়া অথবা পরস্পর ক্ষমা আদানপ্রদান করিয়া তোমরা সকলেই বেহেশ্‌তে চলিয়া যাও।'" হজরৎ আরও বলিয়াছেন—"মহাবিচারের দিন আমার ওম্মৎ মণ্ডলীর এক ব্যক্তিকে বিচার স্থলে দণ্ডায়মান

করা হইবে। সে সময়ে বিচার ক্ষেত্র জগতের সমস্ত মানব মণ্ডলী দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিবে। তাহাদের সম্মুখে অপরাধীর বিচার আরম্ভ হইবে। সম্মুখে নিরানব্বই খানা স্তূপাকার খাতা, যাহার মধ্যে তাহার পাপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, স্থাপিত হইবে। এক এক খানা খাতা এত বড় বিস্তৃত ও উচ্চ যে, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলিবে না, মহাবিচারক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন—"দেখ, এই পাপরাশির মধ্যে কোনও পাপ সম্বন্ধে তোমার আপত্তি আছে কি না; লিখক ফেরেশ্‌তা কিছু অতিরিক্ত লিখিয়াছে কি না?' সে ব্যক্তি নিবেদন করিবে—'হে মহাপ্রভো! ইহার মধ্যে আপত্তি বা অস্বীকার করিবার কিছুই নাই। ফেরেশ্‌তাও কিছু অতিরিক্ত লিখেন নাই।' তখন পাপীর মনে দৃঢ় ভয় ও বিশ্বাস হইবে যে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। কিন্তু সে সময়ে করুণাময় বলিবেন—'দেখ! তুমি আমার নিকট একটী পুণ্যকার্য্য করিয়াছ, অদ্য তাহাও বিচারের মধ্যে ধরা যাইবে—তোমার উপর এক বিন্দুও অবিচার হইবে না। ইহার পর এক টুকরা কাগজ বাহির করা হইবে, তাহার উপর শাহাদৎ কল্‌মা 'বিশ্বাস মূলক সাক্ষ্য বচন' লিখিত থাকিবে যথা—

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লা ব্যতীত অপর কোন প্রভু নাই এবং আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ আল্লার রসুল।' কাগজের টুকরা খানি দেখিয়া পাপী মনে মনে বলিবে—'হায়! আমার যে পাপরাশি লিখিতে পর্ব্বত প্রমাণ নিরানব্বই খাতা পূর্ণ হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে এই কাগজ খণ্ডে লিখিত পুণ্যে কি ফল হইবে?' এদিকে মহা বিচারকের আদেশে দাঁড়ি পাল্লা খাড়া করা হইবে। এক পাল্লায় পাপরাশির খাতা পত্র স্থাপিত হইবে, অন্য পাল্লায় সেই কাগজ খণ্ড স্থাপিত হইবে। কি আশ্চর্য্য! তন্মধ্যস্থ বিশ্বাস-মূলক সাক্ষ্য বচনের পুণ্য এত বড় ভারী হইবে যে, সেই পাল্লা ঝুলিয়া পড়িবে এবং সে ব্যক্তি বেহেশ্‌তে প্রেরিত হইবে।" এরূপ হইবার কারণ এই যে, আল্লার একত্ব বিশ্বাস হৃদয়ে জাগরুক থাকিলে কোন পাপই তদ্‌বিরুদ্ধে ক্ষতি করিতে পারে না। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) আরও বলিয়াছেন—"মহাবিচারক,

ফেরেশ্‌তাগণকে আদেশ করিবেন—'যে মানবের অন্তরে এক রতি পরিমাণও পুণ্য আছে, তাহাকে দোজখ হইতে বাহিরে আন।' ফেরেশ্‌তাগণ তদনুসারে তদ্রূপ লোকদিগকে দোজখ হইতে বাহির করতঃ নিবেদন করিবে—'যাহাদের সঙ্গে এক রতি প্রমাণ পুণ্য ছিল, তাহাদিগকেও বাহিরে আনা হইয়াছে—তদ্রূপ লোক আর কেহ দোজখে নাই।' তখন আদেশ হইবে,—'যাহাদের মনে অৰ্দ্ধ রতি পুণ্য আছে, তাহাদিগকেও বাহিরে আন।' ফেরেশ্‌তাগণ তদ্রূপ করিবে। পরে আদেশ হইবে—'যাহাদের মনে এক বালুকা কণা তুল্য পুণ্য আছে, তাহাদিগকেও দোজখ হইতে নিষ্কৃতি দাও।' ফেরেশ্‌তাগণ তাহাই করিবে এবং নিবেদন করিবে—'যাহাদের সঙ্গে এক-টুকু ধূলার ন্যায় পুণ্য ছিল তদ্রূপ লোকও কেহই দোজখে নাই।' তখন এই কথা বলা হইবে—'পয়গম্বরগণের অনুরোধ ক্রমে বহু পাপী পরিত্রাণ পাইয়াছে; ফেরেশ্‌তাগণের অনুরোধে বহু লোক উদ্ধার পাইয়াছে। তাহার পর যাহাদের সঙ্গে পুণ্যের একটুক লেশও ছিল, তদ্রূপ লোকও মুক্তি পাইয়াছে। এখন আমার করুণা প্রকাশের সময় উপস্থিত।' ইহা বলিয়া তিনি স্বীয় করুণার হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক স্বীয় অনন্ত মুষ্টি দ্বারা এক মুষ্টি পাপী লোক দোজখ হইতে লইবেন। তাহারা দোজখের অগ্নিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া কয়লার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, বেহেশ্‌তের স্রোতস্বতী জলে ধুইয়া পরিষ্কার করতঃ বেহেশ্‌তে ছাড়িয়া দিবেন। বন্যার স্রোত-বিধৌত-পলী ভূমির উপর যেমন মরকত-মণির ন্যায় উদ্ভিদরাজি উদ্‌গত হয়, তদ্রূপ তাহাদের দেহে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবে। স্বর্গীয় উজ্জ্বল মুক্তামালা তাহাদের গলে ঝুলিতে থাকিবে। বেহেশ্‌তের অধিবাসীবৃন্দ ইহাদের সৌন্দর্য্যের ছটা দেখিয়া পরস্পর বলিতে থাকিবে,—'ইহারা পৃথিবীতে কোন পুণ্য কার্য্য করে নাই। কেবল আল্লার অপার দয়া ও স্নেহের ফলে ইহারা এখন এই মহা সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে।' করুণাময় স্বীয় করুণায় পাপী-দিগকে উদ্ধার করতঃ বেহেশ্‌তে ছাড়িয়া দিয়া বলিবেন—'যাও এখন যাহা কিছু দেখিবে সমস্তই তোমাদের জন্য।' উহারা সৌভাগ্যের মুখ দর্শনে আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইয়া নিবেদন করিবে—'হে মহাপ্রভো! তুমি আমাদিগকে যে সৌভাগ্য দিলে তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও দাও নাই।' উত্তর আসিবে—'এতদপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য অবধারিত আছে।' তাহারা বলিবে—'এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোন্

বস্ত হইতে পারে ?' উত্তর হইবে—'তাহা আমার সন্তুষ্টি ; আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট আছি আর কখনও অসন্তুষ্ট হইব না।'" এই হদীছ ছহী বোখারী ও ছহী মোছলেম গ্রন্থে লিখিত আছে। মহাত্মা ওমর এবনে হাজেম্ বলিয়াছেন—"একদা মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) তিন দিন নির্জ্জন বাসে ছিলেন ; কেবল ফজরের সময়ে (অতি প্রত্যুষে) নমাজে যোগ দিতেন তদভিন্ন তাঁহাকে আর দেখা যাইত না। চতুর্থ দিবস তিনি বাহিরে আসিয়া প্রকাশ করিলেন যে—'আমার ওম্মতের মধ্যস্থ ৭০ সত্তর হাজার লোককে বিনা বিচারে বেহেশ্‌তে দিবেন বলিয়া মহাপ্রভু অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমি তদপেক্ষা আরও অধিক চাহিতেছিলাম। ভাগ্য ক্রমে তাঁহাকে আমি বড় করুণাময় অবস্থায় পাইয়াছিলাম। তিনি সেই ৭০ সত্তর হাজার ব্যক্তির প্রত্যেকের সহিত ৭০ সত্তর হাজার করিয়া পাপীকে বেহেশতে যাইতে দিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। আমি নিবেদন করিয়াছিলাম—'আমার ওম্মৎ কি তত হইবে ?' উত্তর আসিয়াছিল—'প্রান্তরবাসী অসভ্য দিগকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়া সভ্য করিয়া লও।'" কথিত আছে কোনও যুদ্ধে এক বালক বন্দী হইয়া প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে স্থাপিত ছিল। তাম্বুর মধ্য হইতে এক জন রমণী বালকের দুরবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্র চিত্তে বিহ্বল ভাবে তাহার দিকে মহা আবেগে দৌড়িয়া গিয়াছিল। রমণীর অবস্থা দর্শনে পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরাও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়াছিল। দয়াবতী রমণী বালককে কোলে লইয়া ঘর্ম্মাক্ত বদন মণ্ডল মুছিয়া দিতে এবং উত্তপ্ত দেহে হস্তামর্ষণ করিতে লাগিলেন। স্বীয় শরীর রৌদ্রের সম্মুখে বিস্তার করিয়া দিয়া দেহ-ছায়ার মধ্যে বালককে রক্ষা করিলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল, বালকটী রমণীর একমাত্র পুত্র। পুত্রের দুরবস্থা ও কষ্ট দর্শনে দয়াবতী মাতা রোদন করিতে লাগিলেন। উপস্থিত দর্শক বৃন্দও মাতার রোদন ও কাতরতা দর্শন পূর্ব্বক অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দর্শকেরা তাঁহার সমীপে রমণীর কাহিনী বর্ণনা করিলেন। হজরৎ পরম সন্তুষ্ট চিত্তে বালককে মুক্তি দিয়া দর্শকগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—"তোমরা অবশ্যই এই মাতার দয়া ও সন্তান-বাৎসল্য দর্শনে বিস্মিত হইয়াছ।" উপস্থিত জনবৃন্দ সমস্তকে বলিল—"এরূপ অদ্ভুত সন্তান-বাৎসল্য ও দয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে চক্ষে দেখি নাই।" হজরৎ

তখন বলিলেন—"এই মাতা স্বীয় সন্তানের উপর যেরূপ স্নেহ ও দয়া পোষণ করেন, করুণাময় আল্লা তোমাদিগকে তদপেক্ষা অধিক ভালবাসেন ও দয়া করিয়া থাকেন।" উপস্থিত জনবৃন্দ এই সুসমাচার শ্রবণ পূর্ব্বক আল্লার করুণা প্রাপ্তির আশ্বাসানন্দে এমন বিভোর হইয়াছিলেন যে, তদ্রূপ সুখাস্বাদ আর কখনও পান নাই। মহাত্মা এব্রাহীম আদ্হম বলিয়াছেন —"একদা রজনী কালে আমি একাকী কাবা শরীফের গৃহ প্রদক্ষিণ করিতেছিলাম। সে সময়ে মেঘ হইতে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। কাবা প্রদক্ষিণ কালে আমি এই প্রার্থনা করিতেছিলাম—'মহাপ্রভো! আমাকে পাপ হইতে রক্ষা কর—এরূপ ভাবে রক্ষা কর যেন আর কখনও পাপ না করিতে পারি।' ইতিমধ্যে কাবা গৃহ হইতে এক শব্দ উত্থিত হইতে শুনিলাম। তদ্দ্বারা বলা হইতেছে—'দেখ, তুমি নিষ্পাপ অবস্থা চাহিতেছ; সকল মানবই উহা চায়। আমি যদি সকলকেই পাপ হইতে নিষ্পাপ রাখি তবে আমার করুণা কাহার উপর প্রকাশ করিব?'"

মানবের মনে আল্লার জন্য ভয় ও তাঁহার করুণার প্রতি আশা সমান সমান থাকা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, পাঠক! বুঝিয়া রাখ,—আল্লার করুণা প্রকাশক এইরূপ হদীছ ও মহাজন বাক্য আছে। যাহাদের প্রাণে পাপের ভয় অসীম মাত্রায় উদ্বেলিত হইয়াছে এরূপ আশ্বাস বাক্যে তাহাদের মনে শান্তি আসিতে পারে। ভয়পীড়িত মনের সম্বন্ধে দয়াপ্রাপ্তির আশ্বাস বাক্য একটী শান্তিদায়ক ঔষধ। কিন্তু যাহারা মোহাক্রান্ত ও غافل অনাবিষ্ট, হাজার উপদেশ ও দৃষ্টান্তেও যাহাদের মনকে প্রবুদ্ধ করিতে পারে না তাহাদিগকে ঐ প্রকার আশা উদ্দীপক বাক্যের সহিত এ কথাগুলিও জানা আবশ্যক যে—বহু মুছলমানকে দোজখে যাইতে হইবে, এবং তথায় যথা-যোগ্য সময় শাস্তি পাইবার পর অব্যাহতি পাইতে পারিলেও শেষে যাহারা অব্যাহতি পাইবে, তাহাদিগকে সাত হাজার বৎসর দোজখের অগ্নিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া, পরে নিষ্কৃতি পাইতে হইবে। আবার দেখ, 'বহু লোককে দোজখে যাইতে হইবে—এ কথার পরিবর্ত্তে যদি 'একটী লোককে দোজখে যাইতে হইবে' বলিয়া সংবাদ থাকিত, তবেও বুদ্ধিমান লোক ভয় শূন্য হইতে পারিতেন না। কেন না যে লোককে দোজখে যাইতে হইবে, সে ব্যক্তি 'আমি' এই ভয়ে প্রত্যেক লোককে বিহ্বল হওয়া বিচিত্র নহে। এই ভয় মনে জাগরুক রাখিয়া

প্রত্যেক ব্যক্তিকে যত্ন পূর্ব্বক পাপ বিরতির পন্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য এবং যথা-সাধ্য প্রাণপণে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত। আরও সেই দোজখে শাস্তি পাইবার পর যাহারা নিষ্কৃতি পাইবে তাহাদের শেষ ব্যক্তিকেও সাত হাজার বৎসর জ্বলিয়া পুড়িয়া কষ্ট পাইতে হইবে, সেই সাত হাজার বৎসর অল্প কথা নহে। এক রাত্রির শাস্তি ভয়ে যদি সমস্ত আনন্দ ও সুখের বস্তু পরিত্যাগ করিতে হয় তবে তাহাও ভাল, এমন স্থলে সাত হাজার বৎসরের শাস্তি হইতে বাঁচিতে কি প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত নহে? ফল কথা, মানবের মনে ভয় ও আশা সমান সমান থাকা কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব-কালের ছাহাবাগণের মনে ভয় ও আশা সমান ভাবেই ছিল। মহাত্মা হজরৎ ওমর বলিয়াছেন—"পরকালে বিচারের দিন যদি আকাশ-বাণী হয় যে বেহেশ্‌তে এক জন ব্যতীত দুই জন যাইতে পাইবে না তবে আমার আশা আছে যে আমিই যাইব। আবার যদি ঘোষণা হয় যে দোজখে একটী মাত্র লোককে যাইতে হইবে তবে আমাকেই দোজখে যাইতে হইবে বলিয়া আমার মনে প্রবল ভয় জন্মিবে।"

ভয়ের উপকারিতা। পাঠক! জানিয়া রাখ—ভয় মানব-হৃদয়ের একটী উন্নত অবস্থা। ইহা যেমন শ্রেষ্ঠ পদার্থ, ইহার ফল এবং উৎপত্তির কারণও তদ্রূপ উৎকৃষ্ট সামগ্রী। علم জ্ঞান ও معرفت পরিচয় উহার মূল কারণ। (টীঃ ২২৪) অতঃপর এ সম্বন্ধে কিছু বলা যাইবে। মহাপ্রভু আল্লা বলিতেছেন—

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ

"তাঁহার (আল্লার) দাসগণের আলেম লোক ভিন্ন (আর কেহ) আল্লার জন্য ভয় করে না।" (২২ পারা। সূরা ফাতের। ৪ রোকু।) মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ বলিয়াছেন—"আল্লার শাস্তি-ভয় সমস্ত হেকমতের মস্তক।"

টীকা—২২৪। পরিচয় জ্ঞান যেমন ভয়ের মূল, তেমনই ইহা প্রেম এবং ভালবাসার মূল। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর ক্ষতিকর স্বভাব জানিতে পারিলে এবং তাহাদের আকার পরিচয় পাইলে, ভয় আপনা আপনি মনে উদয় হয়। পিতা মাতা বা বন্ধুজনের স্নেহ মমতা জানিতে পারিলে ও ব্যবহারে পরিচয় পাইলে তাঁহাদের প্রতিও ভাল বাসা আপনা আপনি জন্মে। স্বাস্থ্য কেমন সুখের দ্রব্য! কিরূপ ব্যবহারে সেই স্বাস্থ্য স্থির থাকে এবং কোন কার্য্যে তাহা ভাঙ্গে, জানিতে পারিলে ও পরিচয় পাইলে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মমতা এবং তাহা নষ্ট হইবার ভয় আপনা আপনি জন্মে।

رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللّٰهِ

'নিষ্পাপ অবস্থা' ও 'পরহেজগারী' এই উৎকৃষ্ট গুণদ্বয়কে ভয়েরই ফল বলিতে হয় এবং ঐ দুটী পদার্থ অনাবিল সৌভাগ্যের বীজ। প্রবৃত্তির অধিকার অতিক্রম করিতে না পারিলে এবং তদর্থে কষ্ট সহ্য করিতে না পারিলে ধর্ম্ম পথে চলা যায় না। ভয়ের অগ্নি, প্রবৃত্তিকে যেরূপ দগ্ধ করিতে পারে তেমন আর কিছুতেই পারে না। তজ্জন্যই ধর্ম্ম-ভীরু লোকের ভাগ্যে মহাপ্রভু علم জ্ঞান, هدايت পথ-প্রাপ্তি এবং رضوان প্রসন্নতা ও رحمت অনুগ্রহ এই অমূল্য পদার্থ চতুষ্টয় এক সঙ্গে দান করেন। এই সুসমাচার তিনি নিম্নলিখিত তিনটী পবিত্র বচনে প্রকাশ করিয়াছেন—

ধর্ম্মভীরু লোকের প্রতি আল্লার চতুর্ব্বিধ দান

هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ

"যাহারা স্বীয় প্রভুকে ভয় করে তাহাদের জন্য (ইহা যথেষ্ট) পথ-প্রদর্শক ও (প্রচুর অনুগ্রহ)।" (৯ পারা। সূরা এরাফ। ১৯ রোকূ)।

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

"তাঁহার (আল্লার) দাসগণের মধ্যে আলেম লোক ভিন্ন (আর কেহ) আল্লাকে ভয় করে না। (২২ পারা। সূরা ফাতের। ৪ রোকূ)

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ

"আল্লা তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাঁহারাও আল্লার প্রতি সন্তুষ্ট। এইরূপ যে ব্যক্তি তাঁহার প্রভুকে ভয় করে (আল্লা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট)।" (৩০ পারা। সূরা বাইয়েনাৎ। শেষ)

যাহা হউক, 'পরহেজগারী' বা 'পাপ বিরতি' যাহা ভয় হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই কিন্তু মহাপ্রভু নিজের জন্য গ্রহণ করেন; এ সুসমাচার তিনি কোরআন্ শরীফে দিয়াছেন—

ولكن

وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط

(রক্ত মাংস আল্লা গ্রহণ করে না) তিনি কেবল তোমাদের নিকট হইতে পরহেজগারী (পাপ বিরতি) গ্রহণ করেন।”(১৭ পারা। সূরা হজ। ৫ রোকূ।) মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ বলিয়াছেন—“মহাবিচারের দিন জগতের সমস্ত মানবকুল একত্র করতঃ এমন গুরু গম্ভীর স্বরে এই কথা ঘোষণা করা হইবে যে, দূরে ও নিকটে সর্ব্বত্র সমান ভাবে শুনিতে পাওয়া যাইবে—“হে মানব মণ্ডলী! সৃষ্টি কাল হইতে অদ্যাবধি আমি তোমাদের প্রত্যেক কথা শুনিয়া আসিতেছি; অদ্য তোমরা আমার কথা কর্ণ পাতিয়া শুন। এখন তোমাদের আচরিত কার্য্যাবলী তোমাদের সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছে। দেখ, তোমরা শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক, কুলীন বংশের উপর স্থাপন করিয়াছ; আমি কিন্তু অন্য প্রকার করিয়াছিলাম। তোমরা আমার স্থাপিত শ্রেষ্ঠত্বকে তুচ্ছ করিয়া তোমাদের স্থাপিত কৌলীন্য সম্পর্ককে উচ্চতম স্থান দিয়াছ। আমি বলিয়াছি—

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ ط

(যে ব্যক্তি) তোমাদের মধ্যে পরহেজগার (হইবে সেই ব্যক্তি) নিশ্চয় আল্লার নিকট তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।” (২৬ পারা। সূরা হোজরাৎ। ২ রোকূ।) কিন্তু তোমরা অমুকের পুত্র বলিয়া অমুককে শ্রেষ্ঠ করিয়াছ। অদ্য আমি আমার স্থাপিত শ্রেষ্ঠত্বের মর্য্যাদা দেখাইব; আর তোমাদের স্থাপিত কৌলীন্য সম্পর্ক তুচ্ছ করিব।” এই বলিয়া পরহেজগারদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক বলা হইবে—

أَيْنَ الْمُتَّقُوْنَ

“হে পরহেজগারগণ! তোমরা কোথায়? শীঘ্র এস।’ ইহার সঙ্গে সঙ্গে একটী পতাকা উত্তোলিত হইয়া অগ্রে অগ্রে চালিত হইতে থাকিবে; পরহেজগারগণ তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইবেন। এই প্রকার শোভাযাত্রার সহিত পরহেজগারগণকে বিনা বিচারে বেহেশ্‌তে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।”

যাহারা ভয় করে তাহাদিগকে দ্বিগুণ পুণ্য দেওয়া হইয়া থাকে এতদ্ উপলক্ষে আল্লা বলিতেছেন—

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۚ

"যে ব্যক্তি তাহার প্রভুর ভয়ে (ত্রস্ত হইয়া) দণ্ডায়মান হয় তাহার জন্য দুই বেহেশ্‌ৎ।" (টীঃ ২৯৫) (২৭ পারা। সূরা রহমান। ৩ রোকু।)

ভয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে হদীছ ও মহাজন উক্তি। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) পবিত্র বচনে প্রকাশ করিয়াছেন—যে, মহাপ্রভু স্বীয় গৌরবের শপথ পূর্ব্বক বলিয়াছেন—"দুই ভয় ও দুই নিরুদ্বেগ এক সময়ে কোনও ব্যক্তির উপর স্থাপন করি না। সংসারে আমার জন্য ভয় করিলে পরকালে নির্ভয় হইবে; কিন্তু ইহকালে নির্ভয় থাকিলে পরকালে ভয়ের মধ্যে পড়িবে।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি আল্লার জন্য ভয় করে পৃথিবীর সমস্ত জীব জন্তু তাহাকে দেখিয়া ভয় করে; কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লার জন্য ভয় করে না, আল্লা তাহাকে সকল পদার্থ হইতে ভয় দেখাইয়া থাকেন।" তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লার জন্য ভয় করে, সে পরিপক্ক বুদ্ধিমান।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"মক্ষিকার মস্তক তুল্য ক্ষুদ্র অশ্রু বিন্দুও যদি মুছলমান লোকের চক্ষু হইতে বাহির হইয়া গণ্ড স্থলে গড়িয়া পড়ে তবে তাহার সে বদন মণ্ডলে দোজখের তাপ লাগিবে না।" তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"আল্লার ভয়ে যাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে এবং মন বিমর্ষ হয় তাহার পাপ, বৃক্ষ হইতে শুষ্ক পত্রের ন্যায়, ঝরিয়া পড়ে।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি আল্লার ভয়ে রোদন করে তাহাকে দোজখের অগ্নি স্পর্শ করিবে না।" মহামাননীয়া হজরৎ বিবী আয়শা ছিদ্দীকার মুখে শুনা গিয়াছে—"একদা কতকগুলি লোক মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'হে রসুলুল্লা! আপনার ওম্মতের মধ্যে কেহ কি বিনা বিচারে বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে?' তিনি বলিয়াছিলেন—হাঁ, পারিবে—যে ব্যক্তি স্বীয় পাপ স্মরণ করিয়া রোদন করে, সে বিনা বিচারে বেহেশ্‌তে যাইতে পরিবে।" মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) অন্য এক দিন বলিয়াছিলেন—"আল্লার ভয়ে যে অশ্রুবিন্দু চক্ষু হইতে বাহির

টীকা—২৯৫। 'দুই বেহেশ্‌ৎ' শব্দের অর্থ ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল। যে ব্যক্তি ভক্তির ভয়ে নিজের কর্ত্তব্য সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মত নির্ব্বাহ করে তাহাকে আল্লা সাংসারিক ও পারলৌকিক উভয় কার্য্যে সফলতা দেন।

হয় এবং যে রক্তবিন্দু আল্লার পথে যুদ্ধ কালে নির্গত হয় সেই বিন্দুদ্বয় আল্লার দৃষ্টিতে যত প্রিয় অন্য কোন পদার্থ তত প্রিয় নহে।” তিনি ইহাও বলিয়াছেন —“সপ্ত শ্রেণীর লোক স্বয়ং আল্লার ছায়াতলে আশ্রয় পাইবেন, তাহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে সেই লোক থাকিবেন যাঁহারা নির্জ্জনে আল্লাকে স্মরণ করিয়া চক্ষের জল নিক্ষেপ করেন।” মহাত্মা হজরৎ হান্‌জালা বলিয়াছেন—“আমি এক দিন মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) এর পুণ্যময় দরবারে উপস্থিত ছিলাম, হজরৎ সমাগত লোকদিগকে উপদেশ দিতে ছিলেন। উপদেশ শ্রবণে আমাদের সকলেরই অন্তরে ভয়ের আবির্ভাব হইয়াছিল, চক্ষু হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল। উপদেশ অন্তে আমি সেই বিমর্ষ ভাব অন্তরে পোষণ করিয়া গৃহে গিয়াছিলাম। আমার পত্নী আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন: আমিও তাঁহার সঙ্গে গৃহস্থালীর অনেক কথা বার্ত্তা কহিলাম। তদ্রূপ নানা কথা প্রসঙ্গে সংসারের ফেরের মধ্যে পড়িয়া যাওয়াতে মনের সেই বিমর্ষ ভাব চলিয়া গেল; পরক্ষণেই হজরতের উপদেশ এবং আমার অশ্রুপাত ও নিরানন্দ ভাবের কথা মনে পড়িল। আমি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ক্রন্দন সংযুক্ত চীৎকার পূর্ব্বক বলিতে লাগিলাম—‘হায়! হান্‌জালা ‘মোনাফেক’ হইয়াছে—হায়! হান্‌জালা কপটী হইয়াছে।’ ঠিক সেই সময়ে মহাত্মা হজরৎ আবুবকর ছিদ্দীক ঐ পথে যাইতেছিলেন তিনি সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বলিলেন—‘হে হান্‌জালা তুমি কপটী হও নাই।’ তাহার পর আমি মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) এর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলাম—‘হান্‌জালা কপটী হইয়াছে।’ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমার মানসিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের কথা ভাঙ্গিয়া বলিলাম হজরৎ সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—‘হান্‌জালা কখনই মোনাফেক হয় নাই।’ পরে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—‘দেখ, হান্‌জালা! আমার নিকট আসিলে তোমাদের মানসিক অবস্থা যেরূপ হয় সেই অবস্থা যদি সর্ব্বদা রক্ষা করিতে পারিতে তবে ফেরেশ্‌তাগণ তোমাদের ঘরে আসিয়া ‘মোছাফাহ্’ (করমর্দ্দন) করিয়া যাইত। পথে পাইলে, পথেই করমর্দ্দন করিত। কিন্তু মনে রাখিও মনের গতি সর্ব্বদা চঞ্চল; এক ঘণ্টা একরূপ থাকিলে তাহার পরক্ষণেই বদলিয়া যায়।’” মহাত্মা শিবলী বলিয়াছেন—“যে দিন আমার মনে ভয়ের আবির্ভাব হইত, সেই দিন আমার হৃদয়ে হেকমতের পথ খুলিয়া যাইত এবং অন্যের অবস্থা দর্শনে বা শ্রবণে নীতি উদ্ধারের শক্তি বর্দ্ধিত

হইত।" মহাত্মা ইয়াহীয়া এব্‌নে মাজ বলিয়াছেন—"দুইটী ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মাঝখানে একটী শশক স্থাপিত হইলে তাহার যে পরিণাম ঘটে; আল্লার জন্য ভয় ও তাঁহার দয়ায় আশা এই দুইটীর মধ্যস্থলে মুছলমানের পাপ পড়িলেও ঠিক সেই অবস্থাই ঘটে।" তিনি অন্যস্থলে বলিয়াছেন—"মানুষ দরিদ্রতার জন্য যেরূপ ভয় করে, দোজখের জন্য যদি তদ্রূপ ভয় করিত তবে নিশ্চয়ই বেহেশ্‌তে যাইত।" ঐ মহাত্মাকে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"মহাবিচারের দিন কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিরাপদে থাকিবে?" তিনি বলিয়াছিলেন—"যে ব্যক্তি ইহসংসারে ভয় করেন তিনিই তখন সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদে রহিবেন।" মহাত্মা হাছন বছরীকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"কোনও কোন লোক আমাকে এত ভয় দেখায় যে আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়; তাহাদের সঙ্গে বাস করা সম্বন্ধে আপনার কি মত?" তিনি বলিয়াছিলেন—"এখন তদ্রূপ লোকের সহবাসে থাক; তাহা হইলে পরকালে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে। এখানে নির্ভয়ে থাকিলে পরকালে দুঃখের মধ্যে পড়িতে হইবে। যাহার সহিত এখন নির্ভয়ে বাস করা যায়, তাহাদের সহবাস অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত ভয় প্রদর্শক লোকের সহবাস উত্তম।" মহাত্মা আবু ছোলায়মান্ দারাণী বলিয়াছেন—"ভয়শূন্য অন্তর উজাড় মরুভূমির ন্যায়।" মহামাননীয়া হজরৎ বিবী আয়শা ছিদ্দীকা এক দিন মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) এর সমীপে নিবেদন করিয়াছিলেন—"কোরআন্ শরীফে (১৮ পারা। সূরা মোমেনুন। ৪ রোকূ) আল্লা বলিতেছেন—

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ

'এবং সেইসকল লোক যাহা দিয়া থাকে (করিয়া থাকে) তাহাই দেয় (করে) এবং তাহাদের হৃদয় কিন্তু ভয়ে কাঁপিতে থাকে।" হে রসুলুল্লা! এ কথা কি চুরি ব্যভিচার প্রভৃতি কুকর্ম্মের সম্বন্ধে?" তদুত্তরে হজরৎ বলিয়াছিলেন—"না, তাহা নহে। ঐ সকল কাজ রোজা নামাজ ইত্যাদি সৎকার্য্য; ধর্ম্মভীরু লোকেরা ঐরূপ কার্য্য করিবার কালে, আল্লা গ্রহণ করিবেন কিনা, বলিয়া ভয় পাইয়া থাকে।" মহাত্মা মোহাম্মদ এব্‌নে মোন্‌কাদের রোদন করিবার

কালে অশ্রুজল বদন মণ্ডলের উপর লেপিয়া রাখিতেন এবং বলিতেন—"আমি শুনিয়াছি যে স্থান অশ্রু জলে ভিজে তাহা দোজখের অগ্নি স্পর্শ করে না।" মহাত্মা হজরৎ আবুবকর ছিদ্দীক বলিয়াছেন—"রোদন কর; সহজে রোদন না আসিলে চেষ্টা করিয়া রোদন আনয়ন কর—যদি তাহাতেও না হয় রোদনের ভাবটী আনয়ন কর।" মহাত্মা কাব-অল-আহ্‌বার বলিয়াছেন—"সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দীন দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করা অপেক্ষা, ভয়-সম্ভূত এক বিন্দু রোদনাশ্রুকে আমি অধিক মূল্যবান মনে করি।"

ভয়ের পরিচয়। পাঠক! জানিয়া রাখ—মানব-মন যতগুলি উন্নত অবস্থা লাভ করিতে পারে তন্মধ্যে ভয় একটী উন্নত অবস্থা। ভয় এক প্রকার অগ্নি সদৃশ; উহা অন্তরের মধ্যে প্রথমে উৎপন্ন হয়। যেমন উহার উৎপত্তির কারণ আছে—বিনা কারণে উৎপন্ন হয় না, তেমনই উৎপন্ন হইলে ফল প্রসব করে-বিফলে চলিয়া যায় না।

ভয়ের উৎপত্তির কারণ—দ্বিবিধ পরিচয় জ্ঞান। ভয় কি কারণে উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রথমে বলা যাইতেছে—علم জ্ঞান ও معرفت তত্ত্ব-পরিচয় হইতে ভয় উৎপন্ন হয়। মানব যখন কর্ত্তব্য-পথে কোন বিপদ দেখিতে পায় অথবা তাহার সম্মুখে যখন কোনরূপ বিনাশের কারণ উপস্থিত হয় তখন তাহার অন্তরে ভয়ের অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। ইহা দুই প্রকার পরিচয়-জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে **প্রথম** জ্ঞান, স্বীয় অপরাধের পরিচয় হইতে জন্মে। দোষ, পাপ ও এবাদৎ বিনাশক আপদ এবং স্বভাবের অপবিত্রতা ইত্যাদির সুন্দর পরিচয় পাইলে, এবং তৎসঙ্গে করুণাময়ের অনন্ত দয়ার পরিচয় পাইলে অন্তরে ভয় উৎপাদক জ্ঞান জন্মে। এরূপ জ্ঞান জনিত ভয়ের একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—মনে কর কোন মহা প্রতাপশালী নরপতির অনুগ্রহ, যে ব্যক্তি গৌরবের সহিত ভোগ করিয়া থাকে এবং তাঁহার হস্ত হইতে অমূল্য পুরস্কার অযাচিত ভাবে সর্ব্বদা পাইয়া থাকে, সেই ব্যক্তি রাজ অন্তঃপুরে অপব্যবহার ও ধন ভাণ্ডারে অপহরণ আরম্ভ করিলে যদি সে হঠাৎ এক দিন বুঝিতে পারে যে দণ্ড মুণ্ডের অধিকারী ধৈর্য্যশীল নরপতি তাহার অপকর্ম্ম স্বচক্ষে দর্শন পূর্ব্বক কঠিন শাস্তি দানে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া আছেন; তখন ভাবিয়া দেখ সেই ব্যক্তির অন্তরে ভয়ের অগ্নি কেমণ ভীষণ ভাবে জ্বলিয়া উঠে! **দ্বিতীয়** জ্ঞান, স্বীয় ক্ষমতার অভাব দর্শনে অর্থাৎ নিজের অসহায়তা ও দুর্ব্বলতার সুন্দর পরিচয় পাইলে উৎপন্ন হয়। মনে কর এক

ব্যক্তি ব্যাঘ্র কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে; ব্যাঘ্রের অপ্রতিহত বলের সহিত সে ব্যক্তি নিজের দুর্বলতা যত অধিক মাত্রায় বুঝিতে পারিবে ভয়ও তত অধিক প্রবল হইবে। যখন বুঝা যায় ব্যাঘ্রের শক্তি অপ্রতিহত—কোন ক্রমেই তাহাকে নিরস্ত করা যায় না এবং হত্যা করা তাহার স্বভাব—হত্যা না করিয়া সে কিছুতেই নিবৃত্ত থাকিতে পারে না; তাহার উপর ব্যাঘ্রকে পরাস্ত করিতে বা তাড়াইতে তাহার ক্ষমতা নাই, উহার কবল হইতে পলাইবারও ক্ষমতা বা পন্থা নাই, এমন অবস্থায় যে ভয় জন্মে তাহার সীমা থাকে না। নিজের অক্ষমতার পরিচয় পাইলে ভয় যেরূপ পূর্ণ ভাবে উদ্‌বেলিত হয় তদ্রূপ আর কোন অবস্থাতেই হয় না। এই কারণে আল্লার শক্তি, স্বভাব, গুণ ইত্যাদি যে ব্যক্তি যত অধিক জানিতে পারিয়াছে এবং তৎসঙ্গে নিজের অক্ষমতা সুন্দর মত বুঝিতে পারিয়াছে তাহার ভয় তত অধিক। আল্লার অভিপ্রায় অপ্রতিহত—তিনি যাহা করিবেন বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন তাহা কখনই টলিবার নয়। তিনি সমস্ত বিশ্ব জগৎ বিনাশ করিয়া চিরকালের তরে দোজখে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিলে, বাধা দিবার কেহ নাই। তাঁহার ক্ষমতা অন্তর-চক্ষুর পলকে বিশ্ব জগৎ বিনাশ করিয়া দোজখে নিক্ষেপ করিতে পারেন। তাঁহার রাজ্য অসীম—বর্ত্তমান বিশ্ব সংসার নষ্ট করিয়া দিলেও তাঁহার রাজ্যের বিন্দু মাত্র হ্রাস পাইবে না। মানবীয় মনে যেমন স্নেহ মমতাদির উচ্ছ্বাস আছে তদ্রূপ উচ্ছ্বাস হইতে বিশ্বপ্রভু পবিত্র। তাঁহার গুণের মধ্যে জোওয়ার ভাটা নাই। তিনি সর্ব্বদা নির্ব্বিকার। আল্লার গুণ পূর্ণ মাত্রায় বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের অক্ষমতা ও অসহায়তা হৃদ্‌গত ভাবে বুঝিতে পারিলে ভয় পূর্ণ মাত্রায় উৎপন্ন হয়। পয়গম্বরগণের হৃদয় এই ধরণের ভয়ে পরিপূর্ণ ছিল। কেননা তাঁহারা আল্লার গুণ ও স্বভাব বিশেষ ভাবে অবগত ছিলেন। পাপের জন্য শাস্তির ভয় তাঁহাদের ছিল না; কেননা তাঁহারা নিষ্পাপ ছিলেন। যাহারা আল্লার অবস্থা যে পরিমাণে জানিতে পারে তাহাদের অন্তরে ভয় তত অধিক প্রবল হয় এই কারণে শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—"আমি তোমাদের অপেক্ষা অধিক জানি বলিয়া তোমাদের অপেক্ষা অধিক ভয় করি।" এই উপলক্ষে মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—(২২ পারা। সূরা ফাতের। ৪ রোকু।)

আল্লার শক্তি স্বভাব ও গুণের উপলব্ধি

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُا

"তাঁহার (আল্লার) দাসগণের মধ্যে (আলেম) জ্ঞানীগণই অধিক মাত্রায় ভয় করেন।" ইহার বিপরীত যে ব্যক্তি আল্লার সম্বন্ধে যত অল্প জানে সে তত নির্ভয় হয়। মহাত্মা হজরৎ দাউদ নবী عم কে প্রত্যাদেশ সহকারে মহৎ-প্রভু বলিয়াছিলেন—"হে দাউদ! লোকে ব্যাঘ্র দর্শনে যেমন ভয় পায় তুমি আমার জন্য তদ্রূপ ভয় কর।"

যাহা হউক, জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হইতেছে নিজকে ও সৃষ্টি কর্ত্তাকে জানা। নিজকে দোষযুক্ত ও ত্রুটী পুর্ণ বলিয়া জানিতে হয় এবং তৎসঙ্গে সৃষ্টিকর্ত্তাকে পূর্ণ প্রতাপশালী অনন্ত ক্ষমতাশালী এবং বিশ্ব জগৎকে তিনি নিমিষে বিনাশ করিতে সক্ষম—তদ্‌বিষয়ে তিনি কিছু মাত্র পরওয়া করেন না—এইরূপ জানিতে হয়। এই দুই প্রকার জ্ঞানে ভয় ভিন্ন অন্য কোন মানসিক অবস্থা উৎপন্ন হয় না। এই কারণে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ বলিয়াছেন—

أَوَّلُ الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ الْجَبَّارِ وَاٰخِرُ الْعِلْمِ

تَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَيْهِ

"প্রচণ্ড প্রতাপশালীকে জানা প্রথম জ্ঞান এবং (মূলতঃ) সমস্ত কার্য্যই তাঁহার উপর ন্যস্ত করা শেষ জ্ঞান।" ইহার মর্ম্ম এই যে—'আল্লা প্রচণ্ড প্রতাপশালী এবং কঠিন শাস্তি দাতা—তাঁহাকে বাধা দিতে কিছুই নাই'—এই জ্ঞানের সহিত, 'নিজে কোন পদার্থই নহি, আমার কিছুই নাই, সমস্ত কার্য্য তিনি করেন'—এই জ্ঞান পূর্ণ ভাবে বিকসিত হইলে ভয় উৎপাদক জ্ঞান জন্মে। এইরূপ জ্ঞান পাইলে নির্ভয় চিত্তে কেহই তিষ্ঠিতে পারে না। (টীঃ ২০৬)

ভয়ের ফল ও তাহার ত্রিবিধ প্রকাশ। পাঠক! উপরে ভয়ের উৎপত্তির কারণ লিখিত হইল; এখন উহার ফল সম্বন্ধে কিছু বলা হইবে। ভয়ের ফল, অন্তরে, শরীরে, হস্ত পদাদিতে প্রকাশ পায়। **উহা অন্তরে প্রকাশ**

টীকা—২০৬। মূল গ্রন্থে এই প্যারাটি পরবর্ত্তী আট প্যারার অব্যবহিত শেষে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা হইল।

পাইলে সংসার-আসক্তি ও কামনা লুপ্ত হইয়া যায়। যাহার মনে বিবাহ করিবার কামনা বা ভোজনেচ্ছা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাকে যদি ব্যাঘ্রে আক্রমণ করে কিম্বা দুর্দান্ত নরপতি ধরিয়া লইয়া গিয়া কারাগারে আবদ্ধ রাখেন, তবে তাহার সমস্ত অভিলাষ লুপ্ত হইয়া যায়; বরং ভয় তখন তাহার মনে দীনতা হীনতা আনিয়া চাপাইয়া দেয় এবং সে সংসারের অন্যান্য সমস্ত কথা ভুলিয়া সর্বান্তঃকরণে পরিণাম চিন্তায় ব্যাপৃত হয়; তৎকালে অহঙ্কার, ঈর্ষা, শত্রুতা, লালসা, মোহ প্রভৃতি কিছুই মনে স্থান পায় না—সমস্তই হৃদয় হইতে দূর হইয়া যায়। ভয়ের ফল **শরীরের উপর প্রকাশ পাইলে** অবসন্নতা, দুর্বলতা উৎপন্ন হয় এবং শরীর শীর্ণ ও পাণ্ডু বর্ণ ধারণ করে। ভয়ের ফল **হস্ত পদাদিতে প্রকাশ পাইলে** সে গুলি আর পাপ কার্য্যের দিকে চলিতে পারে না—শান্ত হইয়া 'আদবের' সহিত এবাদতে প্রবৃত্ত হয়।

অবস্থাভেদে ভয়ের ক্রমোন্নতি হিসাবে নামকরণ। অবস্থাভেদে ভয়ের কয়েকটী নাম রাখা হইয়াছে। যে ভয়, কামনা প্রবৃত্তিগুলি মানুষের মন হইতে লোপ করে তাহার নাম عفت এফ্‌ফৎ বা **নিস্পৃহা**; যে ভয় মানবকে নিষিদ্ধ বস্তু বা ব্যাপার হইতে ক্ষান্ত রাখে, তাহার নাম ورع ওয়ারা' বা **পাপভয়**; যাহা মানুষকে সন্দেহযুক্ত পদার্থ বা বিষয় হইতে দূরে রাখে তাহার নাম تقوى তাক্‌ওয়া বা **পরহেজগারী** এবং যে ভয়ে মানবকে অভাব মোচন পরিমিত পাথেয় ব্যতীত তদতিরিক্ত প্রত্যেক পদার্থ পরিত্যাগ করায় তাহাকে صدق **ছেদক** বলে। ইহাদের মধ্যে নিস্পৃহা ও পাপভয় পরহেজগারীর অন্তর্গত কিন্তু ঐ তিনটী সমস্তই ছেদ্‌কের মধ্যস্থ। (যাহা হউক, এ সমস্তই ভয়ের উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর ক্রমোন্নতি।)

অপ্রকৃত ভয়ের স্বরূপ—কিন্তু যে ভয় মনে উদয় হইলে চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত করিয়া দেয় এবং চক্ষু মুছিতে মুছিতে মানবকে

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ

"লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা" বলিতে প্রবৃত্ত করে এবং পরক্ষণেই সমস্ত ফুরাইয়া যায়—মনও মোহে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত ভুলিয়া যায়—সে ভয়কে ভয় বলা যায় না। উহাকে স্ত্রী-জনোচিত উচ্ছ্বাস বলা যায়। প্রকৃত ভয় জন্মিলে, মানব ভয়ের বিষয় হইতে দূরে পলায়ন না করিয়া ত্রিসীমায় থাকিতে পারে না।

পারে না। পরিধান-বস্ত্র মধ্যে সর্প লুকাইয়া আছে ইহা বুঝিতে পারিলে কি কেহ উক্ত কাল্‌মা মাত্র মুখে আবৃত্তি করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে? বরং বস্ত্র হইতে সর্প ঝাড়িয়া নিক্ষেপ করতঃ বেগে দূরে পলায়ন করে। কোন্ ব্যক্তি প্রকৃত ভীত? এই কথা মহাত্মা জন্নুন মিছরীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"রোগী যেমন মৃত্যু ভয়ে ক্ষতিকর লোভনীয় পদার্থ পরিত্যাগ করে তদ্রূপ যে ব্যক্তি আত্ম-রক্ষা করিতে পারে সে প্রকৃত ভয়াতুর লোক।"

ভয়ের প্রকার ভেদ। পাঠক! জানিয়া রাখ, ভয় তিন প্রকার—(১) দুর্বল; (২) মধ্যম; (৩) অতি প্রবল। ইহার মধ্যে মধ্যম প্রকারের ভয় উৎকৃষ্ট। যে ভয়, পরক্ষণে লোপ পায়, যেমন নারী জনের উচ্ছ্বাস, তদ্রূপ ভয়কে দুর্বল ভয় বলে। যে ভয় মানবকে হতাশ ও অজ্ঞান করিয়া ফেলে এবং বিনাশের আশঙ্কায় সর্বদা অস্থির রাখে তাহাকে অতি প্রবল ভয় বলে। এ উভয় প্রকারের ভয়ই মন্দ।

ভয়ের স্বরূপ ও প্রকৃতি—ভয় বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণতা পাইবার যোগ্যতা রাখে না। توحيد একত্ব বিশ্বাস معرفت পরিচয় জ্ঞান এবং প্রেম প্রভৃতি যে সকল মানসিক অবস্থা পূর্ণতা পাইবার যোগ্যতা রাখে তৎসমুদয় অবস্থার সহিত ভয়ের সাদৃশ্য নাই, কেননা ভয়, মহাপ্রভুর গুণের মধ্যে স্থান পায় নাই। অজ্ঞানতা ও দুর্বলতা না থাকিলে ভয় জন্মিতে পারে না; যে ব্যক্তি পরিণাম গতি না জানে এবং বিপদ পরিহারের ক্ষমতা না রাখে তাহার মনেই ভয় জন্মে। অবশ্য غافل অসতর্ক লোক প্রবুদ্ধ হইলে তাহার মনে অসীম ভয় জন্মিতে পারে।

মধ্যম প্রকার ভয়ের প্রয়োজনীয়তা। যাহা হউক, ভয়, চাবুকের ন্যায় কার্য্য করে। বেত্র প্রহারে অনাবিষ্ট বালককে পাঠে মনোযোগী করা যায়। চাবুক দ্বারা চতুষ্পদ জন্তুকে চালান যায়। কিন্তু চাবুক নিতান্ত দুর্বল হইলে বা প্রহার না লাগিলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। সামান্য তৃণের আঘাতে অনাবিষ্ট বালককে পাঠে সংযত করিতে বা হঠকারী জন্তুকে চালাইতে পারা যায় না। অপর পক্ষে, প্রহারের জন্য কঠিন দণ্ড ব্যবহার করিলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। শরীর জখম হইতে পারে—হস্ত পদ বা মস্তক ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে এমন প্রহারে বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়। বরং প্রহার মধ্যম ধরণের হওয়া উচিত, ভয়ও তদ্রূপ মধ্যম প্রকারের হওয়া কর্ত্তব্য। মন তাহাতে পাপ হইতে ক্ষান্ত থাকিয়া এবাদৎ কার্য্যে নিবিষ্ট হইতে পারে।

ভয়ের মধ্যম অবস্থা ও তাহার হ্রাসবৃদ্ধিরোধের উপায়। যে ব্যক্তি যত অধিক জ্ঞান উপার্জ্জন করে, তাহার ভয় সেই পরিমাণ মধ্যম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ভয় মধ্য সীমা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিলে, 'আশা'-উদ্দীপক জ্ঞান তৎক্ষণাৎ সম্মুখে আসিয়া ভয়ের তেজ খর্ব্ব করিয়া দেয়। আবার 'আশা' প্রভাবে ভয় হ্রাস পাইবার উপক্রম হইলে, ক্রটীর সম্ভাবনা আসিয়া 'ভয়'কে বাড়াইয়া দেয়।

ধর্ম্মভয়হীন ব্যক্তির জ্ঞানের অসারতা—পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ধর্ম্ম-ভীরু নহে (টীঃ ২৯৭) অথচ জ্ঞানী বলিয়া প্রকাশ করে সে জ্ঞানী পদের বাচ্য নহে। সে যাহা শিখিয়াছে তাহা জ্ঞান নহে বরং নিরর্থক পদার্থ। তদ্রূপ লোককে ভিক্ষাজীবি জ্যোতিষ গণকের সহিত তুলনা করা যায়। তাহারা নিজকে 'অদৃষ্ট জ্ঞানী' বলিয়া পরিচয় দেয় বটে কিন্তু স্বীয় অদৃষ্টের বিন্দু বিসর্গ মাত্র জানে না।

বিষয় ভেদে ভয়ের শ্রেণী ভেদ। পাঠক! জানিয়া রাখ—বিপদ সম্পূর্ণ চিনিতে পারিলে ভয় জন্মে। (বিপদ নানা প্রকার। সকল বিপদ একত্রে এক সময়ে কাহার সম্মুখে আসে না। সুতরাং মানব প্রথমে যে ভয়ের কারণ দেখিতে পাইয়াছে তাহার মনে সেই ভয় অগ্রে জাগিয়া উঠে) তজ্জন্য সকলের ভয় এক প্রকার হয় না। কেহ দোজখের শাস্তি ভয়ে ভীত হয় আবার কেহ বা এমন বস্তু বা বিষয়ের জন্য ভীত হয় যাহা তাহাকে দোজখে লইয়া যাইতে পারে; যথা বিনা তওবায় মরণ ঘটিতে পারে বলিয়া কেহ ভয়ে সশঙ্কিত থাকে; আবার কেহ তওবার পরে পুনরায় সেই পাপে লিপ্ত হই-বার ভয়ে সতর্কিত থাকে। কেহ স্বীয় হৃদয় কঠিন হইতে পারে বলিয়া ভয়

টীকা—২৯৭। কোন কোন গ্রন্থে خائف نبود "ধর্ম্মভীরু নহে" এবং কোন গ্রন্থে خائف "ধর্ম্ম ভীরু" এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায় (দুই স্থলেই মর্ম্ম প্রায় সমান। তথাপি মূল গ্রন্থ ও এ গ্রন্থে প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায় নাই। সংক্ষেপে মর্ম্ম দেওয়া গেল। মানব যতই জ্ঞান উপার্জ্জন করুক না কেন তাহাকে এই বিশ্বাসটী সর্ব্বদা মনে জাগরুক রাখা কর্ত্তব্য যে "আমি কিছুই জানিতে পারিলাম না।" যদি তাহার মনে "জানি" এই ভাবটী উদিত হয় তবে তাহার জ্ঞানোন্নতির পথ বন্ধ হইয়া যায়। সৃষ্টিকর্ত্তা মন ও জ্ঞানার্জ্জনের পথে এই অটল নিয়ম স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। যিনি জ্ঞানী এবং এই তত্ত্ব জানেন তিনি ভয় না করিয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং যিনি জ্ঞানী তিনি নিশ্চয়ই ধর্ম্মভীরু হইবেন—ধর্ম্মভীরু না হইয়া তাঁহার উপায় নাই; কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্ম্মভীরু নহে সে মোহমুগ্ধই হউক বা অজ্ঞানই হউক কখনই জ্ঞানী নহে। তবে আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অনেক সাধারণ লোক "প্রত্যক্ষ জ্ঞানী" না হইয়াও ধর্ম্মভীরু হইতে পারেন।

করে, কেহবা মোহাক্রান্ত হইবার শঙ্কায় ত্রস্ত থাকে। নিজের কুঅভ্যাস তাহাকে পাপের দিকে আকর্ষণ করিতে পারে বলিয়া কেহ ভয় পায়। ধনৈশ্বর্য্যের আধিক্য বশতঃ অহঙ্কার উৎপত্তির আশঙ্কায় কেহ কাতর হয়। আবার সেই ধন-বলে যাহাদের প্রতি ইহকালে উৎপীড়ন করা হইবে পরকালে বিচারের দিন, তাহাদের দ্বারা লাঞ্ছিত হইবার ভয়ে কেহ বিমর্ষ হয়। নিজের দোষ ও পাপ পরকালে মহাবিচারসভায় প্রকাশ পাইলে সকলের দৃষ্টিতে হেয় ও অপদার্থ হইবার ভয়ে কেহ ভীত হয়। আবার কেহ এই বলিয়া ভীত হয় যে আমার মনে যে চিন্তা বা ভাব উদয় হইতেছে তাহা আল্লার দৃষ্টিতে জঘন্য, তিনি সমস্তই দেখিতেছেন। এইরূপ নানা বিষয় অবলম্বনে বিভিন্ন লোকের মনে ভয় জন্মিতে পারে। তজ্জন্যই বলা হইয়াছে ভয় নানা শ্রেণীস্থ।

সর্ব্বশ্রেণীর ভয়ের একই ফল—ভয়ের কারণ পরিহারের চেষ্টা

যাহা হউক, যে বিষয় লইয়া ভয় হউক না কেন সকল স্থলেই এক ফলই ফলিয়া থাকে অর্থাৎ যে বিষয়ের জন্য ভয় জন্মে তাহা পরিত্যাগ করিতে মানব ব্যস্ত হয়। যথা—কুঅভ্যাস পাপের দিকে লইয়া যাইতে পারে বলিয়া ভয় জন্মিলে তাহা পরিত্যাগ করিতে স্বভাবতঃই চেষ্টা জন্মে। অপ্রিয় চিন্তার উপর আল্লার দৃষ্টিপাতের ভয় জন্মিলে তদ্রূপ কুচিন্তা হইতে অন্তর পবিত্র রাখিতে স্বভাবতঃই যত্ন হয়। অন্যান্য বিষয়ের সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিবে।

অধিকাংশ ধর্ম্মভীরু মানবের ভীতির স্বরূপ বর্ণনা—অধিকাংশ স্থলে ধর্ম্ম-ভীরু মানবের মনে পরিণাম-ভয় ও পরকালের ভীতি প্রবল থাকে। মৃত্যু সময়ে ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস-জ্ঞানটী পূর্ণ ভাবে সঙ্গে লইয়া পরকালে পার হইয়া যাইতে পারে কি না এই ভয়ে তাহারা ত্রস্ত থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভে

আদিম অদৃষ্টলিপির আলোচনা অবলম্বনে আল্লার জন্য মহাভয়

অদৃষ্টে কি লিখা গিয়াছে—সৌভাগ্য লিখা গিয়াছে কি দুর্ভাগ্য লিপীবদ্ধ হইয়াছে সেই ভয়টী পূর্ণ মাত্রায় উদয় হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভে যাহা লিখিত হইয়াছে পরিণামে তদনুরূপ ঘটিবে। পরিণামকে প্রারম্ভেরই শাখা বলা যায়। উহার মূল কোথায় তাহা বুঝিতে হইলে অগ্রে নিম্ন লিখিত কথাটী বুঝিতে হইবে—মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (ﷺ) এক দিন মেম্বরের (বেদীর) উপর দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়াছিলেন—'মহাপ্রভু এক কেতাব লিখিয়াছেন; তন্মধ্যে সমস্ত বেহেশ্‌তী লোকের নাম লিখা আছে।' এই কথা সমাপ্ত মাত্র তিনি

স্বীয় দক্ষিণ বাহু দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তৃত করিয়াছিলেন। পুনশ্চ বলিলেন—'তিনি আর একখানি কেতাব লিখিয়াছেন তন্মধ্যে সমস্ত দোজখী লোকের নাম ও ঠিকানা লিখিত আছে।' ইহা বলিয়া স্বীয় বাম বাহু বাম পার্শ্বে প্রসারিত করিয়াছিলেন; অবশেষে বলিয়াছিলেন—'আল্লার সেই লিখনের কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হইবে না। বেহেশ্‌তী লোক পৃথিবীতে যদি এমন পাপাচরণ করিয়া চলে যে লোকে তাহাকে দোজখী বলিয়া মনে করিতে পারে, তথাপি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাকে এক পলকে দুর্ভাগ্যের পথ হইতে সৌভাগ্যের পথে ফিরাইয়া লইবেন।'" যাহার ভাগ্যে মহাপ্রভু সৃষ্টির আদিম দিন সৌভাগ্য লিপীবদ্ধ করিয়াছেন সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান্ এবং যাহার ভাগ্যে সেই দিন দুর্ভাগ্য লিপীবদ্ধ করিয়াছেন সেই ব্যক্তি হতভাগ্য। ইহজীবনের শেষই পরবর্ত্তী জীবনের আরম্ভ। সুতরাং মৃত্যুকালে পরকালের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের চিহ্ন প্রকাশ পায়। সেই চিহ্ন দর্শনে পরকালের অবস্থা বুঝা যায়। এই জন্য চক্ষুষ্মাণ 'আরেফগণ' সর্ব্বদা ভয়ে অস্থির থাকেন। তাঁহাদের ভয় সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ। বিশ্বপ্রভুর প্রভাব-দর্শন-সম্ভূত ভয়, যেমন পাপ ভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আরেফগণের ভয় তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ। (টীঃ ২৯৮) মহাপ্রভুর

টীকা—২৯৮। এস্থলে দৃষ্টান্তটী প্রস্ফুটিত হয় নাই। সে কথা বুঝাইয়া বলিতে গেলে অগ্রে অলঙ্কার শাস্ত্রের দুই এক কথা বলা আবশ্যক দৃষ্টান্ত দুই প্রকারে দেওয়া হয়—উপমা ও রূপক। উপমায় দুই পক্ষ এবং চারিটী অবস্থা থাকে। পূর্ব্ব পক্ষে একটী 'দৃষ্ট' ও অন্য একটী 'অনুভূত' অবস্থা থাকে, উত্তর পক্ষেও তদ্রূপ। 'দৃষ্ট' ও 'অনুভূত' অবস্থাকে 'পদ' এবং 'অর্থ'ও বলা যায়। পুষ্প একটী পদার্থ; এস্থলে পুষ্প শব্দটী 'পদ' বা 'দৃষ্ট অবস্থা' ইহার কতকগুলি 'অনুভূত অবস্থা' বা অর্থ' আছে যথা—সুন্দর, সুগন্ধ, কোমল, নরম, বর্ণ ইত্যাদি। এইরূপ প্রত্যেক পদার্থ যথা চন্দ্র, মুখ ইত্যাদিরও 'পদ' ও 'অর্থ' বা 'দৃষ্ট' ও 'অনুভূত' অবস্থা আছে। পুষ্প ইত্যাদি কথাটী বলিলেই ঐরূপ অর্থ অভিজ্ঞ লোকের মনে উদয় হয়। কখন ঐ অর্থ গুলির মধ্যে একটী লইয়া বিচার হয় যথা 'পুষ্প সুন্দর'। দৃষ্টান্ত দিতে গেলে এইরূপ বলে—পুষ্প যেমন সুন্দর, মুখখানি তেমনই সুন্দর। ইহার পূর্ব্ব পক্ষ পুষ্প' উত্তর পক্ষ 'মুখ,; 'সুন্দর' উভয় পক্ষেরই 'অনুভূত অবস্থা,। উভয় পক্ষে 'অনুভূত' অংশ এক জাতীয় হওয়া চাই। 'পুষ্প যেমন গোল, মুখ তেমনই প্রফুল্ল', এরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় না। 'রূপক দৃষ্টান্ত' বড়ই সংক্ষিপ্ত তাহার 'অনুভূত' অংশ শ্রোতাকে নিজে নিজে বাহির করিয়া লইয়া বুঝিতে হয় যথা—'বদন চন্দ্র'। বদনরূপ চন্দ্র বা চন্দ্র তুল্য বদন বলিলেও স্বভাব অনুভূত অর্থ বাহির হয় না। 'চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর বদন' বা চন্দ্র যেমন সুন্দর বদন তেমনই সুন্দর, এইরূপ অর্থ করিতে হয়। সুন্দর না ধরিয়া উজ্জ্বল, দীপ্তিশালী ইত্যাদি অর্থ বাহির করিলেও চলে। কিন্তু চন্দ্র যেমন কলঙ্কিত মুখ তেমনই কলঙ্কিত অথবা চন্দ্র যেমন প্রকাণ্ড বদনও তেমন ইত্যাদি অর্থ বাহির করিলে 'রসের' হানি হয়। কতকগুলি দৃষ্টান্ত 'আপেক্ষিক,' 'যৌগিক' বা 'বিরোধী' আছে সে সব বলিতে যাওয়া এস্থলে উচিত নহে। তবে তাহারা সকলেই কতকগুলি সরল দৃষ্টান্তের মিশ্রণে উৎপন্ন।

প্রতাপ-দর্শনসম্ভূত-ভয় সর্ব্বদা সমান তেজে থাকে কখনই লোপ পায় না। কিন্তু পাপ ভয় তদ্রূপ নহে; পাপ হইতে বিরত হইলে হয় তো এইরূপ সাহস মনে জন্মিতে পারে যে আমি যখন পাপ পরিত্যাগ করিয়াছি তখন আর ভয় কি ?

আদিম অদৃষ্ট-লিপী সম্বন্ধে এস্থলে কিছু বলা আবশ্যক। পরকালে মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** গৌরবের সর্ব্বোচ্চ আসন পাইবেন এবং আবুজেহেল দুর্ভাগ্যের গভীরতম কূপে নিক্ষিপ্ত হইবে; ইহা সৃষ্টিকর্ত্তা অগ্রেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে কাহারও মধ্যে পুরস্কার যোগ্য গুণ বা শাস্তি যোগ্য দোষ কিছু মাত্র ছিল না। সৃষ্টির পরেও হজরৎকে তত্ত্ব-দর্শনের ও আদেশ পালনের সুযোগ বিনা কারণে দেওয়া হইয়াছিল এবং ইহাও অবধারণ করিয়া রাখা হইয়াছিল যে হজরৎ সাধু কার্য্যের জন্য ইচ্ছা না করিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিবেন না এবং তাঁহার সম্মুখে জ্ঞানের যে পথ খুলিয়া দেওয়া হইবে তাহা বন্ধ করিতে তাঁহার ক্ষমতা থাকিবে না এবং যে পদার্থকে হলাহল বিষতুল্য মারাত্মক বলিয়া তিনি বুঝিতে পারিবেন তাহা হইতে পলায়ন না করিয়া তিষ্ঠিতে পারিবেন না। কিন্তু আবু জেহেলের প্রতি তত্ত্ব-দর্শনের পথ বন্ধ করা হইয়াছিল—তাহাকে ভাল মন্দ নির্ব্বাচন করিতে পথ দেওয়া হয় নাই; যদিও বা কিছু দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু প্রবৃত্তির প্রলোভনে মন্দ হইতে হস্ত সঙ্কুচিত করিতে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। যাহা হউক,

---

*ইক্ষু যেমন বরফ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মিছরী তেমনই জল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কেননা বরফ গলিয়া জল হয় আবার অধিক তেজে শুখাইয়া যায়। ইক্ষু নিষ্পীড়ন করিলে মিষ্ট রস হয় তাহা হইতে গুড়, চিনি ও মিছরী হয়। মিছরী বরফ নিঃসৃত জল অপেক্ষা উত্তম। এ সমস্ত দৃষ্টান্তে পূর্ব্ব পক্ষ ও উত্তর পক্ষ স্পষ্ট উল্লেখ হইল; কিন্তু মূল গ্রন্থে "বিশ্ব প্রভুর প্রতাপ দর্শন সম্ভূত ভয়কে" প্রথম পক্ষ ধরিয়া উহাকে "পাপ ভয়" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে কিন্তু উত্তর পক্ষে কেবল "আরেফগণের হৃদয়স্থিত ভয়কে" বিনা তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। কোন্ ভয়ের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, সেটা দেখান হয় নাই। গ্রন্থের পূর্ব্বাপর কথা হইতে দুটী "ভয়ের" সন্ধান পাওয়া যায়। একটী "অন্তিম কালের ভয়" অর্থাৎ মৃত্যুর প্রাক্কালে মহাপ্রভু তাহাকে কি জানি দুর্ভাগ্যের পথে চালাইয়া দিবেন এই ভয়। আর একটী ভয় "পরকালে শাস্তির ভয়।" চক্ষুষ্মান আরেফ্‌গণ দেখিতে পান বিনা কারণে কার্য্য হয় না। মন্দ কার্য্য করিলে পরকালে শাস্তি পাইতে হয়। আর মন্দ না করিলে শাস্তি হয় না। আরেফগণ এই শেষোক্ত নিয়ম অর্থাৎ মন্দের জন্য শাস্তি হয় ইহা দেখিতে পান। কিন্তু সৃষ্টির আদিম কালে অদৃষ্টে কি লিখা গিয়াছে এবং তাহার ফলে মৃত্যু সময়ে কি ঘটিবে ইহা জানিতে পারেন না এই জন্য তাহারা ভয়ে ত্রস্ত থাকেন। এখন দেখ, দৃষ্টান্তটী নিম্নরূপ সুস্পষ্ট হইলে অর্থ বোধ সহজ হইত—"বিশ্ব প্রভুর প্রতাপ-দর্শন-সম্ভূত ভয়, যেমন পাপ-ভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তদ্রূপ আরেফ্‌গণের অদৃষ্ট-লিপীর মর্ম্ম না জানাতে অন্তিম সময়ের ভয় পরকালের ভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

দুই পক্ষেই দেখা যায় উভয় ব্যক্তিই সর্ব্বদা সমান অক্ষম ও সমান অধীন ছিলেন। সৃষ্টিকর্ত্তা যাহাকে যেরূপ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহাকে তদ্‌রূপই করিয়া লইয়াছেন! আবু জেহেলের কোন দোষ বা ত্রুটী ছিল না। সৃষ্টিকর্ত্তা স্বেচ্ছায় তাহার জন্য দুর্ভাগ্য অবধারণ পূর্ব্বক তাহাকে দোজখের দিকে সজোরে চালাইয়া দিয়াছেন এবং হজরতের প্রতি স্বীয় করুণায় সৌভাগ্যের আদেশ দিয়াছেন এবং তাঁহার হস্ত পদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতঃ সৌভাগ্যের উচ্চ নিকেতনে পাঠাইয়া দিয়াছেন। যে মহাশক্তিশালী প্রভু, স্বেচ্ছায় তদ্‌রূপ অবধারণ করেন এবং সেই অবধারণ অনুসারে কার্য্যগুলি মিল করিয়া লন, এবং যিনি কাহারও পরওয়া করেন না, তাঁহার জন্য ভয় করা অতীব কর্ত্তব্য। (টীঃ ১৯৯) এই জন্য মহাপ্রভু প্রত্যাদেশ সহকারে মহাত্মা হজরৎ দাউদ নবী عم কে বলিয়াছিলেন—"হে দাউদ! ভীষণ ব্যাঘ্র দেখিয়া যেমন ভয় কর আমার জন্য তদ্‌রূপ ভয় করিতে থাক।" সংহার করিতে ব্যাঘ্র কিছু মাত্র ইতস্ততঃ করে না। ব্যাঘ্রের নিকট অপরাধ না করিলেও, সে তোমাকে সংহার করিবে। অপরাধের শাস্তি দিতে, সে সংহার করে না বরং তাহার অদম্য প্রকৃতি ও ইচ্ছাই তাহাকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্তি দেয়। বিনাশ না করিয়া ছাড়িয়া দিলে, এ কথা বুঝিও না যে, দয়া করিয়া বা কোন সম্পর্কের জন্য সে তোমাকে ছাড়িয়া দিল, বরং তোমাকে অপদার্থ তুচ্ছ ভাবিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছে, ইহাই বুঝিয়া লও। যাহা হউক, যে ব্যক্তি মহাপ্রভুর এই স্বভাব অবগত আছে তাহার পক্ষে নির্ভয় হওয়া সম্ভবপর নহে।

টীকা—১৯৯। "আল্লার জন্য ভয়" বা "আল্লাকে দেখিয়া ভয় করা" কথার অর্থ কি? হিংস্র জন্তু বা কোন ক্ষতিকর বস্তু দেখিলে এবং তাহাদের ক্ষতিকর স্বভাবের পরিচয় পাইলে লোকে ভয় করে, কিন্তু 'আল্লা করুণাময়' তিনি এমন দয়ালু যে কেহ অজ্ঞানতা প্রযুক্ত নিজের ক্ষতি করিলে এবং পশ্চাৎ অনুতপ্ত হইয়া তদ্‌রূপ কার্য্য হইতে বিরত হইলে আল্লা দয়া করিয়া সে ক্ষতি পূরণ করিয়া দেন; এমন অবস্থায় আল্লাকে দেখিয়া ভয় করার অর্থ কি? কথাটা বড় গুরুতর। ইহার উপরই মানবের ইহকালের সুখ সন্তোষ এবং পরকালের আনন্দ আরাম নির্ভর করিতেছে।

আল্লা করুণাময় ইহা ধ্রুব সত্য। তিনি বিশ্ব জগতের প্রত্যেক পদার্থকে স্বীয় করুণার নিদর্শন স্বরূপ সৃজন করিয়াছেন। বিশ্বের সমস্ত কার্য্য তাঁহার বিধিবদ্ধ নিয়ম মত হইয়া থাকে। তিনি প্রত্যেক পদার্থে কতকগুলি গুণ ও উপযোগিতা প্রদান করিয়া সৃজন করিয়াছেন এবং তৎসমুদয়ের সংযোগ বিয়োগে বিশ্বজগতের সমুদয় কার্য্য ও ঘটনা নির্ব্বাহ করিতেছেন অথচ তৎকালে তিনি আমাদের ন্যায় পৃথক পৃথক কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্র শস্ত্র বা সহকারী নিযুক্ত করেন না। কেবল একটী সহজ, সরল অথচ অবিচলিত নিয়ম' করিয়াছেন তাহাতেই সমস্ত হইতেছে ও ঘটিতেছে। সে নিয়মটী এই যে, "যাহাতে যে গুণ ও উপযোগিতা দিয়াছেন তাহা নিত্যই কাজ করিবে—কখনই বিফল হইবে না।" কথাটি বুঝাইবার জন্য দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া

অন্তিম কালের ভয় ও তৎসম্বন্ধে মহাজন উক্তি—পাঠক ! জানিয়া রাখ—অন্তিম কালে মনের অবস্থা কোন্ দিকে থাকিবে—আল্লার দিকে থাকিবে কি অন্য দিকে যাইবে, এই ভয়ে ধর্ম্মভীরু লোকের মধ্যে অধিকাংশ লোক, অস্থির থাকেন ; কেননা মানবের মন এক অবস্থায় অপরিবর্ত্তিত ভাবে থাকে না ; তাহার উপর মৃত্যুর সময়, বড় কঠিন ব্যাকুলতার সময় ; কেহই বলিতে পারে না যে ঠিক প্রাণ বায়ু বাহির হইবার সময়ে, মন কোন্ অবস্থায় থাকিবে। এক জন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন—"কোন ব্যক্তিকে আমি পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত আল্লার ধ্যানে এক ভাবে মগ্ন দেখিলেও সে যদি ক্ষণকালের জন্য আমা হইতে প্রাচীরের অন্তরালে যায় তবে তথায় আল্লার ধ্যানে আছে বলিয়া আমি সাক্ষী দিতে পারিব না, কেননা মনের অবস্থা পলকের মধ্যে বদলিয়া যাইতে পারে। আমি বলিতে পারিব না—কি কারণে—কি ভাবে তাহার মনের অবস্থা বদলিয়া গিয়াছে।" অন্য এক জন সাধু জ্ঞানী বলিয়াছেন যে, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে ধ্যানাগার হইতে বাহির হইবার কালে, দ্বারদেশে, মৃত্যু ঘটিলে মন আল্লার দিকে থাকে, কি তথা হইতে যাইয়া বাস গৃহে প্রবেশ কালে মৃত্যু ঘটিলে মন আল্লার দিকে থাকে ? তদুত্তরে আমার বলিতে ইচ্ছা হয়—ধ্যানাগারের দ্বারে মৃত্যু ঘটিলে মন আল্লার দিকে থাকিতে পারে, কিন্তু গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত যাইতে মনের সে ভাব টিকে কি না সন্দেহ। মহাত্মা আবু দরদা, শপথ পূর্ব্বক বলিয়াছেন,—"মৃত্যুর সময়ে ঈমান হারাইয়া যাইতে পারে এই ভয় হইতে কেহই নিশ্চিন্ত হইতে পারে না।" মহাত্মা সহল তস্তরী বলিয়াছেন—"অন্তিম কালে আল্লার

যাইতেছে—অগ্নির মধ্যে দগ্ধ করিবার শক্তি এবং আলোক ও তেজ বিকাশ করিবার গুণ দেওয়া হইয়াছে ; আবার তাহাতে জল সংযুক্ত হইলে নির্ব্বাপিত হইবার উপযোগিতাও আছে ! অগ্নি, আল্লার করুণার এক নিদর্শন। উহার সাহায্যে লোকে অন্ন রন্ধন করে অন্ধকারে আলো জ্বালা, ইঞ্জিন আদি কল চালাইয়া কত কার্য্য নির্ব্বাহ করে কিন্তু সেই অগ্নির মধ্যে পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ বা নিষ্পাপ শিশু নিক্ষিপ্ত হইলে তৃণ কাষ্ঠের ন্যায় দগ্ধ হইয়া থাকে। অগ্নি কাহারও প্রতি সম্মান বা মমতা করিয়া নিজের দহনশক্তি গোপন করে না। ফল কথা, অগ্নি সর্ব্বদাই আল্লার দত্ত গুণ ও শক্তি প্রকাশ করিতেছে—কখনও সে নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে না। ঐ প্রকার গগনবিহারী চন্দ্র সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক এবং আকাশ মণ্ডলস্থ মেঘের কথা ভাবিয়া দেখ। সকলেই আল্লার প্রদত্ত গুণ ও শক্তি তাঁহার স্থাপিত অটল নিয়ম অনুসারে কাজে খাটাইতেছে—কেহই কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্যভিচার ঘটায় না। বরফ, তেজ সংযোগে গলিয়া জল হয় এবং জল তেজ প্রভাবে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। প্রচণ্ড তেজ লাগিলে বাষ্প সজোরে ঊর্দ্ধে উঠে। বাষ্প শীতল হইলে পুনরায় জল এবং জল শীতল হইলে পুনর্ব্বার বরফ হয়। জল শীতল ও উষ্ণ হইবার কালে উভয় অবস্থাতে তাহার আয়তন বৃদ্ধি হয়। এ সমস্তই আল্লার প্রদত্ত গুণ ও উপযোগিতা। এই সমস্ত গুণের কতকগুলি গুণ, লোকে সর্ব্বদা দেখিয়া

ধ্যান ভঙ্গ হইতে পারে এবং অন্য চিন্তা মনে উদয় হইতে পারে এই ভয়ে ছিদ্দীকৃগণ সর্ব্বদাই ভীত।" মহাত্মা সুফিয়ান সুরী আসন্ন মৃত্যু সময়ে অধীর ভাবে রোদন করিতেছিলেন। লোকে প্রবোধ দিয়া বলিতেছিল—"আপনি কেন রোদন করিতেছেন? আল্লার অনুগ্রহ, পাপ অপেক্ষা বৃহৎ।" তিনি বলিয়াছিলেন -"যদি বুঝিতে পারিতাম যে আমি একমাত্র আল্লার ধ্যান লইয়া মরিতে পারিব, তবে পর্ব্বত প্রমাণ পাপ থাকিলেও আমার কিছু মাত্র ভয় ছিল না।" এক জন জ্ঞানী লোক মৃত্যুর অগ্রে কিছু ধন কোন বন্ধুর হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক এই চরম অভিপ্রায় করিয়া বলিয়াছিলেন যে,—'মৃত্যু সময়ে যদি আমি ঈমানের সহিত যাইতে পারি, তবে অমুক অমুক চিহ্ন দেখিতে পাইবে। তদ্রূপ চিহ্ন দেখিলে আমার এই ত্যক্ত ধন দ্বারা বাদাম ও মিছরী ক্রয় করতঃ বাদাম শাঁস ও মিছরী শহরের বালক বৃন্দকে ভোজনার্থ বিতরণ করিবে এবং বলিবে ইহা অমুক ব্যক্তির অন্তেষ্টি উৎসব; যেহেতু সে ঈমানের সহিত মরিতে পারিয়াছে। আর যদি মৃত্যু সময়ে সে চিহ্ন দেখিতে না পাও, তবে লোকদিগকে বলিয়া দিও, কেহ যেন আমার জানাজা নমাজ না পড়ে। মৃত্যুর পরেও যেন আমার সাধুতা প্রদর্শন দ্বারা অপরকে প্রতারণা করা না হয় এবং আমি কপটী না হই। মহাত্মা তস্তরী বলিয়াছেন "শিষ্য মুরীদগণের পক্ষে পাপে পতিত হইবার ভয় থাকে, কিন্তু চক্ষুষ্মান্ মোর্‌শেদ্‌গণের পক্ষে কাফের হইবার ভয় বর্ত্তমান।" মহাত্মা আবু ইয়াজীদ বোস্তামী বলিয়াছেন—"আমি মসজেদে যাইতে দাঁড়াইবার কালে আমার স্কন্ধে পৈতা ঝুলান দেখিতে পাই; অর্থাৎ ভয় হয় কি

শুনিয়া জানিয়া লইয়াছে এবং তাহার দ্বারা কত কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইতেছে। বাষ্পের ঊর্দ্ধগমন শক্তি জানিতে পারিয়া বুদ্ধি প্রভাবে ইঞ্জিন কল প্রস্তুত করিয়া রেল ষ্টীমার চালাইতেছে। বরফের আয়তন বৃদ্ধির তথ্য আবিষ্কৃত হওয়াতে শীত প্রধান দেশে ভূমি কর্ষণের নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে এবং পাহাড় পর্ব্বত বিদীর্ণ করিতেছে। তেজ পাইলে ধাতু গলে এবং তাহাকে পিটিলে পাত ও টানিলে তার হয়; এই সত্য আবিষ্কার করাতে লোকে ধাতু হইতে কত ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে। একাধিক পদার্থের সংযোগে কত আশ্চর্য্য রাসায়ণিক পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে। তৎসমুদয়ের গুণ ও উপযোগিতাও অটল। সে গুলিও করুণাময়ের প্রদত্ত অটল নিয়ম রক্ষা করিতেছে। পারা ও গন্ধকের সাধারণ মিশ্রণে কৃষ্ণ বর্ণ কজ্জলী, অগ্নি তাপে লোহিত বর্ণ হিঙ্গুল হয়, লৌহ ও গন্ধকে হীরাকষ এবং তাম্র ও গন্ধকে তুতিয়া হয়, তাহাদের গুণ ও উপযোগিতা সৃষ্টিকর্ত্তাই তৎসমুদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাদের গুণও পৃথক পৃথক করিয়াছেন। যাহা হউক, আল্লার বিধিবদ্ধ নিয়ম মত পদার্থগুলি ব্যবহার করিলে সুফল এবং নিয়মের বিপরীত ব্যবহারে কুফল উৎপন্ন হয়। খাদ্য ও ঔষধীয় পদার্থ মধ্যে, দেহ গঠন ও পোষণের উপযোগিতা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বিষের মধ্যে রক্ত জমাট করিবার ও সঞ্চারণ বন্ধ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে,

কি জানি মছজেদে যাইবার পরিবর্ত্তে মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করি ; প্রত্যহ পাঁচবার আমার মনের অবস্থা এইরূপ হয়।" মহাত্মা হজরৎ ঈসা নবী [illegible] স্বীয় ধর্ম্ম বন্ধু দিগকে বলিয়াছিলেন—"তোমরা পাপ হইতে ভয় করিয়া থাক কিন্তু পয়গম্বরের দল আমরা কোফর (নাস্তিকতা) হইতে ভয় করি।" এক পয়গম্বর ছাহেব বহু বৎসর ধরিয়া অন্ন বস্ত্রের দারুণ কষ্টে আবদ্ধ ছিলেন। দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া রোদন করিয়াছিলেন। প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল—'দেখ, তোমার হৃদয় আমি নাস্তিকতা হইতে রক্ষা করিতেছি, তুমি কি তাহাতে সন্তুষ্ট নও। তুমি পুনরায় সংসার চাহিতেছ?' পয়গম্বর মহোদয় লজ্জিত হইয়া নিবেদন করিয়াছিলেন,—'হে দয়াময়! আমি নিতান্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলাম।' ইহা বলিয়া স্বীয় মুখে ও মস্তকে ধূলী মাখিলেন এবং আল্লার বিধান সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিলেন। অন্তিম কালে মৃত্যু সময়ে যাহাদের মন আল্লার দিকে না থাকিয়া অন্য বিষয়ে ধাবিত হয়, তাহাদের মধ্যে তৎপূর্ব্বেই কতকগুলি চিহ্ন প্রকাশ পায়। সেই চিহ্নগুলির মধ্যে একটী হইতেছে نفاق কপটতা। মহাত্মা ছাহাবাগণ স্বভাবের কপটতার জন্য বড় ভয় করিতেন। মহাত্মা হাছন বছরী বলিয়াছেন—"আমার মনে কপটতা নাই, ইহা যদি বুঝিতে পারিতাম, তবে সেই অকপট স্বভাবের বিনিময়ে সমস্ত বিশ্ব জগতের ধন সম্পত্তি আমি অকাতরে বিক্রয় করিতে পারিতাম।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"অন্তর বাহিরে ও মনে মুখে পার্থক্য হওয়া কপটতার অন্তর্গত।"

অন্তিম কালে সচরাচর ঈমান নষ্ট হইবার কারণ—দ্বিবিধ। خاتمه (খাতেমা) পরিণাম-ভয় বুঝাইতে আরও দুই এক কথা বলা আবশ্যক। আল্লার সম্বন্ধে যে সকল জ্ঞান ও বিশ্বাস (ঈমান) উপার্জ্জন করতঃ হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয় ; তাহা মৃত্যুর গণ্ডগোলে লোপ পাইতে পারে, এই ভয়ে জ্ঞানী লোকেরা সর্ব্বদা ত্রস্ত থাকেন। যে সকল

সুতরাং রক্তের সঙ্গে বিষ যোগ করিলে প্রাণহানি ঘটে। এ সমস্তই ঘটনা দৃষ্টি যোগ্য জড় পদার্থের মধ্যে ঘটে বলিয়া সকল লোক পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণে জানিতে পারে।

মানব দেহ জড় পদার্থ এবং উহার মধ্যে অসংখ্য পার্থিব সামগ্রী থাকিলেও উহার সঙ্গে অজড় আত্মা অবস্থিত আছে বলিয়া জড়ে ও অজড়ে মিলিত হইয়া রহিয়াছে এবং তজ্জন্য উভয়ের মধ্যে এক আশ্চর্য্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে—একের গুণ বা ক্রিয়া যেমন নিজের মধ্যে প্রকাশ পায় তদ্রূপ অপরের মধ্যেও প্রকাশ পাইতেছে। এই জন্য দেহ পীড়িত হইলে মন নিস্তেজ হয়। ফল কথা, মানবদেহে কোন জড় বা অজড় শক্তি কোন ক্রমেই ব্যর্থ হইতেছে না। বিষ ভক্ষণে শারীরিক দুর্ব্বলতা ও অবসাদ উৎপন্ন হয় এবং পরিশেষে মৃত্যু ঘটে অর্থাৎ

কারণে উহা লোপ পায়, তাহা বড় দুর্লক্ষ্য—তৎসমুদয়ের কারণ পূর্ব্বে কিছুতেই চিনিতে পারা যায় না। ঐ সকল দুর্লক্ষ্য কারণগুলির মধ্যে যে দুইটী প্রধান কারণে সচরাচর ঈমান নষ্ট হইয়া থাকে তাহার প্রথমটী এই প্রকার যথা—বিশুদ্ধ বিশ্বাস জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যদি কেহ পয়গম্বরগণের অননুমোদিত কোন নব (বেদাৎ) কার্য্য বা অসঙ্গত বিশ্বাস অবলম্বন করতঃ জীবন যাপন করিতে থাকে, অথচ তদ্রূপ কার্য্য ও বিশ্বাসকে কখনও অন্যায় বলিয়া মনে না করে, তবে মৃত্যু উপস্থিত হইলে হয়তো তাহার সম্মুখে মহাপ্রভু সেই অসঙ্গত কার্য্য বা বিশ্বাসের অন্তর্গত ত্রুটী প্রকাশ করিয়া দেখাইতে পারেন। সেই ত্রুটী দর্শনে, সে ব্যক্তি প্রকৃত বিশুদ্ধ বিশ্বাসের প্রতিও সন্দিগ্ধ হইতে পারে। তদ্রূপ বিপত্তি ঘটিলে বিশুদ্ধ বিশ্বাস-জ্ঞানের স্থৈর্য্য বিচলিত হয় এবং সেই সন্দিগ্ধ অবস্থায় মৃত্যু ঘটিলে বিশুদ্ধ-বিশ্বাস লোপ পায়। পয়গম্বর-গণের অননুমোদিত নব (বেদাৎ) কার্য্য যাহারা করে, এই কারণে তাহাদের মৃত্যুকালে ঈমান নষ্ট হইবার অধিক সম্ভাবনা ঘটে তদ্রূপ অসঙ্গত-কার্য্য-কারী নব-বিশ্বাস-অবলম্বী লোকের সহিত যাহারা ধর্ম্মের কথা লইয়া তর্ক বিতর্ক করে, তাহারা স্বয়ং পরহেজগার বা সাধু হইলেও মৃত্যু সময়ে ঐ কারণে তাহাদেরও ঈমান নষ্ট হইতে পারে; কিন্তু যে সকল সরল লোক যুক্তি ও তর্কের ফেরে পড়িয়া হয়রান হইতে চায় না; কেবল কোরআন ও হদীছের পবিত্র সরল উপদেশ মত কার্য্য করিয়া চলে, তাহারা মৃত্যুর গণ্ডগোলে ঈমান না হারাইয়া পরকালে অক্ষত ঈমান লইয়া পার হইতে পারিবে। এই কারণে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—

عَلَيْكُمْ بِدِيْنِ الْعَجَائِزِ وَ اَكْثَرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْهُ

"বৃদ্ধ রমণীর ধর্ম্ম অবলম্বন করা তোমাদের কর্ত্তব্য। বেহেশ্‌তের অধিকাংশ লোক, সাদা সিধে 'আলা' ভোলা লোক শ্রেণী (হইতে গৃহীত হইবে)।"

দেহ হইতে আত্মা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। আহার গ্রহণে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক বল ও স্ফূর্ত্তি আসে তাহার ফলে মনেও প্রসন্নতা আনিয়া দেয়। অজড়-শক্তি ক্রোধ, অড়জ মনে উদয় হইলে চক্ষু ও বদন মণ্ডল যে আরক্তিম বর্ণ ধারণ করে তাহা সকলেই জানে; কিন্তু উহা আত্মার মধ্যে যেকি প্রকার পরিবর্ত্তন ও ক্ষতি আনয়ন করে তাহা আমরা দেখিতে পাই না; পয়গম্বরগণ তাহা সূর্য্যের মত দেখিতে পাইয়া মানবজাতিকে অন্যায় ক্রোধ করিতে

যাহা হউক, এই কারণে পূর্ব্ব কালের জ্ঞানী লোকেরা তর্ক বিতর্ক দ্বারা কর্ত্তব্য নির্ণয়ে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে—যে সকল লোক তর্ক বিতর্ক দ্বারা কর্ত্তব্য নির্ণয়ে যায়, তাহারা যতই বিচক্ষণ হউক না কেন, পয়গম্বরগণের অনুমোদিত নহে এমন কোন না কোন নূতন (বেদাৎ) কার্য্যকে তাহারা কর্ত্তব্য মনে করিতে পারে। মৃত্যু কালে ঈমান (বিশ্বাস জ্ঞান) হারাইবার দ্বিতীয় কারণ হইতেছে—অপরিপক্ক দুর্ব্বল জ্ঞান এবং তাহার উপর সংসার আসক্তি প্রবল ও খোদা-প্রীতি দুর্ব্বল হওয়া; এরূপ অবস্থায় মৃত্যু উপস্থিত হইলে বুঝিতে পারা যায় সাংসারিক ভালবাসার সমস্ত বস্তু ক্রমে কাড়িয়া লওয়া হইতেছে এবং সংসার হইতে জোর জবরদস্তীর সহিত এমন স্থানে লওয়া হইতেছে, যেখানে যাইতে তাহাদের মন চায় না; তখন মনমধ্যে এক প্রকার অসন্তুষ্টি আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়. এবং আল্লার প্রতি যে দুর্ব্বল ভালবাসা টুকু ছিল তাহা লুকাইয়া যায়। মনে কর, কোন ব্যক্তি স্বীয় সন্তানকে ভালবাসে বটে, কিন্তু তৎকালে আরও কতকগুলি হস্তস্থিত বস্তুকে অধিক ভালবাসিয়া থাকে। এমন অবস্থায় সেই সন্তান যদি তাহার হস্ত হইতে প্রিয়তম বস্তুগুলি কাড়িয়া লইতে উদ্যত হয়, তবে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই সন্তানের প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে; পূর্ব্বে সন্তানের প্রতি যে একটুকু ভালবাসা ছিল, তাহা লোপ পাইবে।

শহীদের মুক্তির কারণ

এই কারণে, ধর্ম্ম যুদ্ধে হত শহীদ লোকের ভাগ্যে অতীব উন্নত অবস্থা লাভ হইয়া থাকে; তাঁহারা সংসার ও সংসারস্থ সমুদয় প্রিয়-পদার্থ মন হইতে দূর করতঃ একমাত্র আল্লার প্রতি ভালবাসার পূর্ণ উচ্ছ্বাস হৃদয়ে লইয়া যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া থাকেন। ঠিক সেই উচ্ছ্বাসের মধ্যে মৃত্যু ঘটিলে আল্লার প্রতি ভালবাসা লইয়া পরকালে পার হইয়া যাইতে

নিষেধ করিয়াছেন। লোভও অজড় পদার্থ বটে কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জড় পদার্থের সঙ্গে দর্শনাদি ইন্দ্রিয়ের সংযোগে, অজড় হৃদয় মধ্যে উহা উৎপন্ন হয়; পরে উহার সঙ্গে যে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ আছে তাহাকে উহা ভোগের জন্য উত্তেজিত করে। যথা—মনোহর মিঠাই দর্শনে ভোজন-লোভ উৎপন্ন হয়। সেই লোভ উদর জিহ্বা প্রভৃতি এক দল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ভোজনের জন্য উত্তেজিত করিয়া তুলে এবং হস্ত পদাদিকে উহা সংগ্রহ পূর্ব্বক মুখে আনিয়া দিতে আদেশ করে। লোভের আদেশে অপরিমিত মিঠাই ভক্ষণ করিলে অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য কৃমি প্রভৃতি শারীরিক রোগ যেমন উৎপন্ন হয় তেমনই আত্মারও ক্ষতি করিয়া থাকে। শারীরিক ক্ষতি সকলেই দেখিতে পায় কিন্তু আত্মার ক্ষতি পয়গম্বর লোক ভিন্ন অপরে দেখিতে পায় না। অপর পক্ষে, লোভের আদেশ অগ্রাহ্য পূর্ব্বক কেবল মাত্র ক্ষুধা নিবারণের জন্য অল্প পরিমিত মিঠাই ভক্ষণে যেমন শারীরিক পীড়া হয় না তদ্রূপ আত্মারও কোন ক্ষতি

পারেন সুতরাং সৌভাগ্যের উন্নত আসন প্রাপ্ত হন। মানব মন কিন্তু সর্ব্বদা প্রেমের সেই পূর্ণ উচ্ছ্বাসের উপর এক ভাবে স্থির থাকিতে পারে না—সে ভাব শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হয়।

আল্লার প্রতি প্রবল প্রেমের পরিণাম। যাহা হউক, যাঁহার হৃদয়ে আল্লার প্রতি প্রেম, অন্যান্য পদার্থের ভালবাসা অপেক্ষা বলবান, ইহা অতীব সম্ভব যে তাঁহাকে আল্লা সংসারের দিকে ছাড়িয়া না দিয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইবেন। এইরূপ লোকের ভাগ্যে, মৃত্যু কালে আল্লার ধ্যান ও চিন্তা নিরাপদে অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। তাঁহারা মৃত্যুকে স্বীয় প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইবার উপায় মনে করিয়া পুলকিত হন, কিন্তু মৃত্যুকে কখনই অপ্রিয় বা কষ্টদায়ক মনে করেন না। আল্লার প্রেম তাঁহাদের হৃদয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, এবং সংসারের আসক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে পাইতে শেষে লুপ্ত হইয়া যায়। ইহাকে পরিণাম-মঙ্গলের শুভ চিহ্ন বলা যায়।

পরিণামভয় হইতে মুক্তি লাভের জন্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি পরিণাম-ভয় হইতে নিরাপদ হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে পয়গম্বরগণের অপ্রিয় সর্ব্ববিধ নব (বেদাৎ) কার্য্যের ত্রিসীমা হইতে দূরে থাকা কর্ত্তব্য এবং কোর্‌আন ও হদীছের কথা সর্ব্বান্তঃকরণে মানিয়া লওয়া উচিত, তন্মধ্যস্থ যে কথার অর্থ ও পরিচয় সুন্দর মত বুঝিতে পারা যায়, তাহা প্রাণপণে শক্ত করিয়া ধরিতে হয় এবং যেগুলি বুঝিতে পারা না যায়, তাহাও সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়। যাহা হউক, কোর্‌আন ও হদীছের কথা সমস্তই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া জানিবে এবং সর্ব্বদা এইরূপ চেষ্টা করিবে যেন আল্লার প্রেম হৃদয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া প্রবল হইয়া উঠে ও সংসার-প্রেম ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া যায়। সংসারাসক্তি দুর্ব্বল করিতে হইলে ধর্ম্মনীতি (শরীঅৎ) প্রদর্শিত বিধানগুলি যথাযথ পালন করিতে হয় কদাচ ধর্ম্মনীতির সীমা লঙ্ঘন করিতে হয় না। ধর্ম্ম নীতির বিধান মানিয়া চলিবার অভ্যাস

করে না। এইরূপ—দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার, নরহত্যা, চুরী, ব্যভিচার, মিথ্যা কথন, অঙ্গিকার ভঙ্গ, পরনিন্দা প্রভৃতি কার্য্য করিলে দেহের কোন কোন অবয়ব বিশেষের কিছু কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার ভয়ানক ক্ষতি হইয়া থাকে। সে সমস্ত ক্ষতি আমাদের ন্যায় সাধারণ লোক স্পষ্ট দেখিতে বা বুঝিতে পারে না—কেবল পয়গম্বরগণই প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। আকাশ পাতালস্থ জড় ও অজড় পদার্থগুলির মধ্যে কোন্ পদার্থে সৃষ্টিকর্ত্তা কি গুণ ও উপযোগিতা যোগ করিয়া দিয়াছেন, সমস্তই তিনি পয়গম্বর দিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন। সেই সমস্ত পদার্থ মানবের সহিত কি সম্বন্ধ রাখে এবং মানবাত্মাতে কিরূপ হিত ও ক্ষতি যোগ করিয়া দেয় তৎসমুদয় পয়গম্বরগণ, সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট হইতে সম্যক্ রূপে শিক্ষা পাইয়া ও জানিয়া মানবের কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্ধারণ ও প্রদর্শন করিয়াছেন। সে

করিলে সাংসারিক অভাব ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হইয়া আসে; সুতরাং সংসারের প্রতি মনের টান ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, আল্লার প্রতি প্রেম বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সর্ব্বদা আল্লার ধ্যান ও চিন্তনে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা জন্মে, সাধু লোকের সহবাস ভাল লাগে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক লোকের সংসর্গ তিক্ত বোধ হইতে আরম্ভ হয়। সংসারের প্রতি ভালবাসা মনে প্রবল থাকিলে মৃত্যুকালে বিশ্বাস-জ্ঞান (ঈমান) নষ্ট হইবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"যদি পিতা, পুত্র ধন সম্পত্তি এবং যাহা কিছু তোমার নিকট আছে, তৎসমুদয়কে আল্লা অপেক্ষা অধিক ভালবাস তবে জানিয়া রাখ আল্লার 'আদেশ' আসিতেছে, তাঁহার আদেশ না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।" (১০ পারা। সূরা—তওবা। ৩ রোকু)।

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ۴

"আল্লার আদেশ না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।" (উপরে ইহার বিস্তৃত অর্থ দেওয়া গেল)।

ধর্ম্মজীবনপথে উদিত ভাব বা গুণাবলীর ক্রমবিকাশের ধারা। পাঠক! জানিয়া রাখ—ধর্ম্ম জীবনের পথে যে সকল উচ্চ উচ্চ স্থানে আরোহণ করিতে হয়, তৎসমুদয়ের প্রথমটী يقين (ইয়াকীন) ধ্রুব বিশ্বাস ও معرفت (মারেফৎ) বিশুদ্ধ ও পূর্ণ জ্ঞান। বিশুদ্ধ জ্ঞান হইতে ভয় উৎপন্ন হয় এবং সেই ভয় হইতে زهد (জোহদ) পাপ বিরতি صبر ধৈর্য্য ও توبة সুপথে প্রত্যাবর্ত্তন' লাভ হয়। আবার 'পাপ বিরতি' ও 'সুপথে প্রত্যাবর্ত্তন' হইতে اخلاص শুদ্ধ-সঙ্কল্প জন্মে এবং আল্লার ধ্যানে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিবার সুযোগ ঘটে। ইহা হইতে 'প্রেম' জন্মে। এই প্রেমই মানব মনের সর্ব্বোন্নত ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ 'অবস্থা'। এই "অবস্থার মধ্যেই رضا (রেজা) সন্তুষ্টি تسليم (তছ্‌লীম) বশ্যতা এবং شوق (শওক) অনুরাগ—এই ত্রিবিধ 'অবস্থা' আছে; এই তিনটী

পথ 'কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম ও ক্ষুরধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ' একটুকু দক্ষিণে বা বামে সরিলে কিম্বা কিছু এদিকে ওদিকে নড়িলে 'অকর্ত্তব্যের' মধ্যে পড়িতে হয় এবং দেহের ও আত্মার ক্ষতি উৎপন্ন হয়।

এই দার্শনিক কথাটী বুঝাইতে দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। দেখ—অন্ন-ব্যঞ্জন রন্ধনে অগ্নির উত্তাপ আবশ্যক; কিন্তু নিতান্ত মৃদু তাপে তাহা সুসিদ্ধ হয় না আবার প্রচণ্ড তাপে পুড়িয়া যায়। মধ্যম ধরণের তাপই হিত কর। তবেই দেখ, অগ্নি জ্বালাইবার

উক্ত 'প্রেমের'ই অন্তর্গত। (رضـ) ধ্রুব বিশ্বাস ও পূর্ণ জ্ঞানের পরেই 'ভয়'কে সৌভাগ্যের স্পর্শমণি বলা যায়। যে সকল ভাব বা গুণ, ভয়ের পশ্চাতে অন্তরে আবির্ভূত হয়, তৎসমুদয় ভয়-শূন্য মনে প্রকাশ পায় না।

ভয় মনে জাগাইবার ত্রিবিধ উপায়—"ভয়" তিন উপায়ে লাভ করা যায়। ১। পূর্ণ পরিচয় জ্ঞান। ২। ধর্ম্ম ভীরু লোকের সংসর্গ। ৩। তদ্রূপ লোকের জীবন চরিত পাঠ।

প্রথম উপায়—মানব যখন নিজের ও সৃষ্টি কর্ত্তার পূর্ণ পরিচয় পায়, তখন ভয় আপনা আপনি তাহার মনে জন্মে। দেখ, যে ব্যক্তি ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে এবং উহাকে ব্যাঘ্র বলিয়া সুস্পষ্ট চিনিতে পারিয়াছে, তাহাকে ব্যাঘ্র-ভয় শিক্ষা দিবার আর কোন উপায় অবলম্বন করিতে হয় না। বরং আপনা আপনি তাহার সর্ব্ব শরীর ব্যাঘ্র ভয়ে জর্জ্জরিত হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি বিশ্বপতিকে পূর্ণ প্রতাপ শালী, অপ্রতিহত ক্ষমতাবান ও সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে এবং তৎসঙ্গে নিজের অসহায়তা দুর্ব্বলতা সুন্দর মত জানিতে পারিয়াছে, সে ব্যক্তি উক্ত ব্যাঘ্রাক্রান্ত লোকের ন্যায় থরথরি কম্পিত ও ত্রস্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। আল্লাকে সম্পূর্ণ চেনা ও নিজের অসহায়তা জানা তো দূরের কথা, যে ব্যক্তি আল্লার বিধিবদ্ধ নিয়মের ধরণ মাত্র জানিতে পারিয়াছে, অথবা শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিবে, তাহার আদেশ তিনি অগ্রেই দিয়া রাখিয়াছেন, এই কথা যে বিশ্বাস করিয়াছে অথবা কতকগুলি লোকের অদৃষ্টে বিনা কারণে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার ইতর বিশেষ কিছুতেই হইবে না; সুধু এই কথাটী যে ব্যক্তি বুঝিতে পারিয়াছে, সে ব্যক্তি ভয়-ত্রস্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—"এক দিন মহাত্মা হজরৎ মুছা নবী (عم) মহাত্মা হজরৎ আদম নবী (عم) এর সহিত তর্ক কালে বলিয়াছিলেন—'মহাপ্রভু আপনাকে বেহেশ্‌তে স্থান দিয়াছিলেন;

একটী মধ্য পন্থা আছে। ক্ষুধাও অগ্নি সদৃশ; ক্ষুধার তেজের উপর পরিমিত অন্ন স্থাপিত হইলে পরিপাক হইয়া রক্তরূপে দেহের পোষণ ও বর্দ্ধন করে, কিন্তু একেবারেই অন্ন না দিলে দেহস্থ রস রক্তাদি ধাতু পুড়িয়া যায় তাহাতে শরীর শীর্ণ ও আত্মা নিরানন্দ হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে অত্যধিক অন্ন চাপাইয়া দিলে ক্ষুধা রূপ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায় এবং দেহরাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটে; তৎসঙ্গে আত্মারও প্রচুর ক্ষতি হয়। সুতরাং আহার গ্রহণেরও একটী মধ্যপথ আছে; তাহাই হিতকর। একেবারে আহার পরিত্যাগ ও অতিরিক্ত ভোজন উভয়ই ক্ষতিকর। মধ্য-পথের সীমা নির্দ্ধারণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন, কিন্তু পয়গম্বরগণ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ আমাদের জন্য তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের

এবং এমন এমন সুবিধাও দিয়াছিলেন; তবে কেন আপনি তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া পাপ করিয়াছিলেন এবং তৎসঙ্গে আমাদিগকেও বিপদে জড়িত করিয়াছেন?' ইহা শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'হে মুছা! সৃষ্টির প্রারম্ভে আমার অদৃষ্টে তদ্রূপ বিধান লিখিত হইয়াছিল কি না?' হজরৎ মুছা আঃ বলিলেন—'অবশ্যই হইয়াছিল।' হজরৎ আদম আঃ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচ্ছা বল তো, আল্লার সেই আদেশ লঙ্ঘন করিবার আমার ক্ষমতা ছিল কি না?' হজরৎ মুছা আঃ বলিলেন—'না, সে ক্ষমতা আপনার ছিল না।' فحج آدم موسی যাহা হউক হজরৎ আদম আঃ তর্কে হজরৎ মুছা আঃ কে পরাস্ত করিয়াছিলেন।'"

যে পরিচয়-জ্ঞান হইতে ভয় উৎপন্ন হয়, তাহার বহু দ্বার আছে। যে ব্যক্তি সেই দ্বারের যত অধিক খুলিতে পারিয়াছেন, তিনি তত শ্রেষ্ঠ عارف চক্ষুষ্মান্ হইতে পারেন সুতরাং তিনি তত অধিক ভয় পাইয়া থাকেন। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে যে—এক দিন মহাপুরুষ হজরৎ রছুল (দঃ) ও হজরৎ জেব্‌রায়েল উভয়ে, ভয়ে রোদন করিতেছিলেন; এমন সময়ে প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল যে—"দেখ, আমি তোমাদিগকে অভয় দিয়াছি তবে কেন রোদন করিতেছ?" তাঁহারা উত্তরে নিবেদন করিয়াছিলেন—"হে মহাপ্রভো! তোমার ইচ্ছার গুপ্ত রহস্য বুঝিতে না পারিয়া আমরা ভয়াতুর হইয়াছি।' উত্তর আসিল—আচ্ছা, তদ্রূপেই থাক।'" তাঁহাদের সেই ভয় পূর্ণ পরিচয়জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। নির্ভয় হওয়া উচিত নহে এ কথা তাঁহারা সুন্দর মত বুঝিয়াছিলেন। নির্ভয়ে রহিবার জন্য তাঁহাদের প্রতি যে প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল তাহাকে তাঁহারা কোন পরীক্ষা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন অথবা তন্মধ্যে কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বদরের যুদ্ধ কালে প্রথমে মুছলমান দল দুর্ব্বল হইয়াছিল; মহাপুরুষ হজরৎ রছুল (দঃ) ভীতি-বিহ্বল চিত্তে আল্লার দরবারে নিবেদন করিয়াছিলেন—'হে মহাপ্রভো! মুছলমান লোক যদি অদ্য বিনষ্ট হয়, তবে ভূপৃষ্ঠে তোমার নাম লইতে আর কেহ

সতর্কতার জন্য অল্লাহারে পরিতুষ্ট হইতে উপদেশ দিয়াছেন। ক্ষতির ভয়ে, সতর্কতা অবলম্বনে অল্লাহার গ্রহণ করা হিতকর। পারের নৌকা কত ভার বহন করিতে পারে তাহারও একটী সীমা আছে। যদি পঞ্চাশ জন লোকের বোঝাই লইলে না ডুবে তবে হয়তো একান্ন জন লোক চড়িলে ডুবিতে পারে। সে স্থলে পঞ্চাশ জন বা তদপেক্ষা অল্প লোক লইলে সে নৌকা সচ্ছন্দে চলিতে পারে।

থাকিবে না।' সেই সময়ে মহাত্মা আবুবকর ছিদ্দীক বলিয়াছিলেন—'হে রসুলুল্লা! আল্লাকে কি আপনি জেদ্ করিয়া বাধ্য করিতে চান? তিনি তো বিজয় দানের অঙ্গীকার পূর্ব্বেই করিয়াছেন। তিনি স্বীয় অঙ্গীকার নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন।' সে সময়ে মহাত্মা ছিদ্দীকের অন্তর ধ্রুব বিশ্বাসের 'অবস্থায়' আরোহণ করিয়াছিল—মহাপ্রভু নিশ্চয়ই স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ ভাবে পালন করিবেন বলিয়া তাঁহার মনে অটল বিশ্বাস প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াছিল আর সেই সময়ে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ এর মানসিক অবস্থা এতদূর উন্নত হইয়াছিল যে, তিনি আল্লাকে 'খায়রোল মাকেরীন' (মহা কৌশলী) বলিয়া সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়া ভয়ে অস্থির হইয়াছিলেন। তাঁহার ঐরূপ মানসিক ভাব চূড়ান্ত উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে বিশ্ব জগতের মধ্যে আল্লার কার্য্য প্রণালীর গূঢ় রহস্য এবং নির্দ্ধারিত ব্যাপার কেহই অবগত নহে।

দ্বিতীয় উপায়—ধর্ম্মভীরু লোকের সংসর্গে বাস করিলে, ধর্ম্ম-ভয় মনে জাগিয়া উঠে। যে সকল লোক ধর্ম্ম-ভয় উৎপাদক জ্ঞান উপার্জ্জনে অক্ষম, তাহাদিগকে মোহ মুগ্ধ অজ্ঞান লোকের সংসর্গ ত্যাগ করতঃ ধর্ম্ম-ভীরু লোকের সহবাস অবলম্বন করা আবশ্যক। তাহাতে ধর্ম্ম-ভীরু লোকের দেখাদেখী অনুকরণ করিলে মনে ভয় উৎপন্ন হইতে পারে। এই উপায়টী যদিও "দেখাদেখী কার্য্যের" অন্তর্গত তথাপি ইহারও উপযোগিতা আছে। দেখ, শিশুগণ পিতা মাতাকে সর্ব্বদাই সর্প দর্শনে ভয় করিতে ও পলায়ন করিতে দেখে। তদ্দৃষ্টে তাহাদের মনেও সর্প ভয় জন্মে এবং সর্পের নাম শুনিলে পলায়ন করিতে শিখে, কিন্তু তাহারা সর্পের অনিষ্টকারীতা স্বয়ং জানে না। যাহারা অনিষ্টকারীতা শক্তির পরিচয় পাইয়া ভয় করিতে শিখিয়াছে তাহাদের ভয় অপেক্ষা শিশুদের "দেখাদেখী ভয়" নিতান্ত দুর্ব্বল। কেননা তাহারা বহু বার পিতা মাতাকে সর্প হইতে পলায়ন করিতে দেখিয়া যে ভয় শিক্ষা করিয়াছে, কোন সাপুড়িয়াকে কয়েকবার সর্প ধরিতে ও সর্পের গাত্রে হস্ত রাখিতে দেখিলে সে ভয় লোপ পাইয়া যায়। পূর্ব্বে যেমন পিতা মাতার দেখাদেখী সর্প-ভয় জন্মিয়াছিল, এখন তেমনই সাপুড়িয়ার দেখাদেখী সে

এ সমস্ত আল্লার বিধিবদ্ধ অটল নিয়ম। মানবকে করুণাময় দয়া করিয়া বুদ্ধি দিয়াছেন। সেই বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করতঃ সেই অটল নিয়মের হিতকর অংশ গ্রহণ ও ক্ষতিকর অংশ সভয়ে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আল্লার নিয়মের ক্ষতিকর অংশ পরিহারের জন্য ভয় করাকেই আল্লার জন্য ভয় করা কহে এবং ভয় হইতেই পরহেজগারী জন্মে।

ভয় লোপ পায় এবং সর্পের গাত্রে হাত দিতে অবোধ শিশুর সাহস বর্দ্ধিত হইতে পারে। যে সকল বহুদর্শী অভিজ্ঞ লোক সর্পের ক্ষতিকারিতা সুন্দর মত স্বচক্ষে দর্শন পূর্ব্বক ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহারা সাপুড়িয়ার দেখাদেখী কখনই নির্ভয় হইতে পারে না। যাহা হউক, মোহ-মুগ্ধ অজ্ঞান ও চিন্তাহীন লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যে সকল মোহ-মুগ্ধ অজ্ঞান লোক, জ্ঞানী আলেম লোকের পরিচ্ছদ ধারণ করে, তাহাদের সংসর্গ হইতে সভয়ে পলায়ন করা বুদ্ধিমান মাত্রেরই পক্ষে শ্রেয়ঃ।

তৃতীয় উপায়—ধর্ম্ম-ভীরু লোকের জীবনচরিত পাঠ করিলে ধর্ম্ম-ভয় মনে জাগিয়া উঠে। এই যুগে প্রকৃত ধর্ম্ম-ভীরু লোক নিতান্ত বিরল হইয়াছে। তদ্রূপ লোক না পাইলে তাহাদের সংসর্গ কি প্রকারে লাভ করা যায়? সুতরাং তাহাদের সংসর্গের পরিবর্ত্তে তাহাদের উপাখ্যান শ্রবণ করা এবং জীবনচরিত পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক। এই জন্য আমরা, কতকগুলি ফেরেশ্‌তা, পয়গম্বর ও জ্ঞানী লোকের মনে কি প্রকার ভয় ছিল, তাহা এ স্থলে বর্ণনা করিতেছি। যাহাদের মস্তিষ্কে কিঞ্চিৎ মাত্র বুদ্ধি আছে তাহারাও সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, সেই সমস্ত মহাত্মা জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, চক্ষুষ্মান্ ও পাপ-বিরত ছিলেন। তাঁহারাই যখন তদ্রূপ ভয়-ত্রস্ত ছিলেন তখন অপর সাধারণ লোককে কত অধিক ভয়ের সহিত চলা আবশ্যক বুঝিয়া লও।

ফেরেশ্‌তাগণের ভয়ের উপাখ্যান—হদীছ শরীফে বর্ণিত আছে—"আজাজীল ফেরেশ্‌তা অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হইবার পর হজরৎ জেব্রায়েল ও হজরৎ মেকায়েল ফেরেশ্‌তাদ্বয় সর্ব্বদাই ভয়ে রোদন করিতেন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'তোমরা কেন রোদন করিতেছ?' তাঁহারা নিবেদন করিয়াছিলেন—'হে প্রভো! তোমার ক্রোধ দেখিয়া ও তোমার গূঢ় অভিপ্রায়ের অর্থ বুঝিতে অক্ষম হইয়া আমরা ভয়শূন্য ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না।' তখন আদেশ হইয়াছিল—'এই ভাব রক্ষা করাই আবশ্যক—নির্ভয় হওয়া কখনই উচিত নহে।" মহাত্মা মোহাম্মদ এবনে মোন্‌কাদের বলিয়াছিলেন—"সৃষ্টিকর্ত্তা দোজখ্ প্রস্তুত করিলে ফেরেশ্‌তাগণ ভয়ে রোদন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পরে মনুষ্য সৃষ্টি হইলে ফেরেশ্‌তা-গণ শান্ত হয়; তখন তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল দোজখ তাহাদের জন্য

নহে—মনুষ্যের জন্য।" মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ বলিয়াছেন—"জেব্রায়েল ফেরেশ্‌তা যখন তাঁহাদের নিকট প্রত্যাদেশ আনিতেন তখনই তাঁহাকে আপন মস্তক অবনত দেখা যাইত।" মহাত্মা হজরৎ আনেছ বলিয়াছেন যে—"জেব্রায়েল ফেরেশ্‌তাকে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'আমি মিকায়েল ফেরেশ্‌তাকে কখনই হাস্য করিতে দেখি নাই, ইহার কারণ কি?' তিনি বলিয়াছিলেন—'যদবধি দোজখ সৃষ্ট হইয়াছে তদবধি মিকায়েল, ত্রস্ত আছে—হাসিতে পারে নাই।'"

পয়গম্বরগণের ভয়ের উপাখ্যান—মহাত্মা হজরৎ এবরাহীম নবী عم যখন নামাজে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে এমন ভয়ের উচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠিত যে, এক মাইল দূর হইতেও সে শব্দ শুনা যাইত। মহাত্মা মোজাহেদ বলিয়াছেন—"মহাত্মা হজরৎ দাউদ নবী عم চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত ভূতলে ললাট স্থাপন পূর্ব্বক রোদন করিয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে প্রভূত অশ্রু-জল প্রবাহিত হইয়া মৃত্তিকা আর্দ্র করিয়াছিল, তাহাতে ঘাস অঙ্কুরিত হইয়াছিল। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'হে দাউদ! রোদন করিতেছ কেন? যদি অন্ন বস্ত্রের অভাব থাকে; তবে এখনই পাইবে।' এই সদয় বাণী শুনিয়া তিনি 'আহা' শব্দের সহিত এমন এক দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাস নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, সম্মুখস্থ শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি ধরিয়াছিল। যাহা হউক, মহাপ্রভু তাঁহার তওবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ হজরৎ দাউদ নবী عم প্রার্থনা করিয়াছিলেন—'হে আল্লা! পাপ আমার হস্তের তালুর উপর অঙ্কিত করিয়া দাও, তাহা হইলে ভুলিতে পারিব না।' মহাপ্রভু তাঁহার প্রার্থনা ক্রমে তাঁহার হস্ত-তালুতে পাপ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যখন আহার গ্রহণে হস্ত বাহির করিতেন, তখনই অঙ্কিত পাপ দর্শনে অধীর হইয়া রোদন করিতেন। কখন কখন এত রোদন করিতেন যে তাঁহার চক্ষুর নীচে কোন পাত্র ধরিলে অশ্রু জলে তাহা পূর্ণ হইয়া যাইত। বর্ণিত আছে যে, রোদন করিতে করিতে তাঁহার শরীরের বল লোপ পাইয়াছিল। সে সময়ে তিনি নিবেদন করিয়াছিলেন—'হে করুণাময় আমার অবস্থা দেখিয়া কি তোমার দয়া হয় না?' প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল—'হে দাউদ, তুমি রোদন ও তজ্জন্য দুর্ব্বলতার কথা বলিতেছ—পাপের কথা কেন বলিতেছ না, উহা কি ভুলিয়াছ?' তিনি নিবেদন করিয়াছিলেন—'হে করুণাময়! পাপ কেমনে ভুলিতে পারি? পাপ করিবার পূর্ব্বে যখন আমি জব্বুর পড়িতাম তখন

উহা শুনিয়া জলের স্রোত বন্ধ হইত; বায়ু প্রবাহ স্তম্ভিত হইত, গগনবিহারী পক্ষী আসিয়া মস্তকের উপর ঝাঁক বাঁধিত, অরণ্যের পশু আমার চারি ধারে ঘেরিয়া দাঁড়াইত। এখন সে সমস্ত কিছুই হয় না। হে প্রভো! কি অবস্থা আবিল্য আমাকে দূষিত করিয়াছে। কি ভীষণ বিপদে আমাকে ঘেরিয়া লইয়াছে!' উত্তর আসিয়াছিল—'এবাদতের অনুরাগ ও আসক্তি জন্য পূর্ব্বে ঐরূপ হইয়াছে এখন পাপের আধিক্য এইরূপ হইতেছে। হে দাউদ! আদম আমারই দাস; তাহাকে আমি, করুণার হস্তে সৃজন করিয়াছিলাম; আমার রূহ্ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিয়াছিলাম; তাহার প্রতি সম্মান দেখাইতে ফেরেশ্‌তাগণকে ছেজদা করিতে আদেশ দিয়াছিলাম; শ্রেষ্ঠত্বের পরিচ্ছদ তাহার পরিধানে দিয়াছিলাম; সম্ভ্রমের কিরীট তাহার মস্তকে স্থাপন করিয়াছিলাম; নির্জ্জন বাসে, নিরানন্দ দেখিয়া তাহার চিত্ত বিনোদনার্থ হাওয়াকে সৃজন পূর্ব্বক তাহার সঙ্গিনী করিয়া দিয়াছিলাম, উভয়কে মনোরম বেহেশ্‌তে স্থান দিয়াছিলাম। কিন্তু সেই আদমকে একটী মাত্র পাপের জন্য বিবস্ত্র করিয়া অপমানের সহিত আমার সম্মুখ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছি। হে দাউদ! এ কথা শুন এবং নিশ্চয়ই জানিয়া রাখ যে তুমি যেমন আমার আদেশ পালন ও দাসত্ব করিতেছ, আমিও অন্য প্রকারে তোমার আদেশ পালন ও দাসত্ব করিতেছি; দেখ তোমার সমস্ত কার্য্য আমি নির্ব্বাহ করিতেছি; তুমি যাহা চাহিতেছ আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতেছি; তুমি আমার আদেশ অমান্য করিয়া পাপ করিতেছ আমি তোমাকে সময় দিতেছি যে তুমি অনুতপ্ত হইয়া পাপ পরিত্যাগ করতঃ আমার দিকে ফিরিয়া আসিতে অবসর পাও, তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আমি মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত আছি।' মহাত্মা ইয়াহীয়া এবনে আবু কাছীর বলিয়াছেন—'মহাত্মা হজরৎ দাউদ নবী عم অনুতাপে রোদন আরম্ভ করিলে সাত দিন পর্য্যন্ত আহার করিতেন না; স্ত্রী পরিজনের মুখ দেখিতেন না; প্রান্তরে গিয়া রোদন করিতেন। তাঁহার পুত্র মহাত্মা হজরৎ ছোলায়মান عم সর্ব্ব সাধারণকে তাঁহার অনুতাপ-গীতি শ্রবণ করিতে ঘোষণা করিয়া দিতেন। তাঁহার অনুতপ্ত গীতি শ্রবণ জন্য দলে দলে নর নারী জনপদ হইতে প্রান্তরে যাইত। পক্ষিগণ কুলায় ছাড়িয়া চলিয়া আসিত; বন্য পশু অরণ্য হইতে বাহির হইয়া আসিত। হজরৎ দাউদ নবী عم প্রথমে মহাপ্রভুর প্রশংসা-গীত পাঠ করিতেন, জীব জন্ত

সকলেই তচ্ছ্রবণে তন্ময় হইত। তাহার পর দোজখের শাস্তি বর্ণনা করিয়া নিজের অনুতাপ-গীতি আরম্ভ করিতেন, তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক বহু শ্রোতা মর্ম্ম জ্বালায় প্রাণ ত্যাগ করিত। এক দিন চল্লিশ সহস্র শ্রোতা উপস্থিত ছিল তন্মধ্যে তিন হাজার লোক অনুতাপ শ্রবণে মর্ম্ম দাহে মরিয়াছিল। শ্রোতৃবৃন্দ যখন প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ করিত, তখন হজরৎ ছোলায়মান পিতার কর্ণে উচ্চ-স্বরে বলিতেন—অনুতাপ-গীতি বন্ধ করুন—বহু লোক মারা পড়িতেছে। হজরৎ দাউদের অন্তরে ভয়ের আবির্ভাব হইলে শরীরে এমন কম্প উপস্থিত হইত যে বিবেচনা হইত হস্ত পদ শরীর হইতে ছিন্ন হইতে পারে; সেই সময়ে দুই জন দাসী তাঁহাকে রক্ষার্থ ধরিয়া রাখিত। মহাত্মা হজরৎ জাকারীয়া নবী (আঃ) এর পুত্র মহাত্মা হজরৎ ইয়াহীয়া নবী (আঃ) বাল্যকাল হইতেই বয়তুল-মোকাদ্দাস গৃহে এবাদতে তন্ময় ভাবে রত থাকিতেন। সমবয়স্ক বালকবৃন্দ তাঁহাকে খেলা করিতে আহ্বান করিলে তিনি বলিতেন—"ভ্রাতৃগণ! মহাপ্রভু আমাকে খেলার জন্য সৃজন করেন নাই।" তিনি পনর বৎসর বয়সে লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্য বাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মহাত্মা হজরৎ জাকারীয়া নবী (আঃ) এক দিন পুত্রের পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তিনি প্রবল তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল পানের বাসনায় জলের ধারে গিয়াছেন, কিন্তু জল পান না করিয়া আল্লাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন—হে মহাপ্রভো! পিপাসায় আমার বক্ষ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে, কিন্তু প্রভো! পরকালে আমার অবস্থা কেমন হইবে তাহা না জানা পর্য্যন্ত জল স্পর্শ করিব না। যাহা হউক, এই মহাত্মা আল্লার ভয়ে এতই রোদন ও অশ্রুপাত করিতেন যে গণ্ড স্থলের উপর দিয়া অশ্রু ধারা গড়িয়া পড়িতে পড়িতে গণ্ড স্থলের মাংস পেশী গলিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে দন্তপংক্তি বাহির হইয়াছিল; তাহাতে তাঁহার মূর্ত্তি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল, তদ্দর্শনে অপর লোক আতঙ্কে মূর্চ্ছিত হইতে পারে ভাবিয়া তিনি পুরাতন জীনের দুই খণ্ড চর্ম্ম দ্বারা স্বীয় গণ্ডস্থল ঢাকিয়া রাখিতেন। পয়গম্বরগণের ভয় সম্বন্ধে এইরূপ বহু উপাখ্যান বর্ণিত আছে।

প্রাচীন মহাজনগণের ভয়ের উপাখ্যান। পাঠক! অবশ্যই জান, হজরৎ আবুবকর ছিদ্দীক একজন প্রধান ছাহাবা এবং জ্ঞানী লোকের অগ্রগণ্য ছিলেন, তথাপি তিনি এতদূর ভয় করিতেন যে, সামান্য পক্ষি

দর্শনেও বলিতেন—'হায়! আমি যদি পক্ষি হইতাম তবে এমন দায়ে ঠেকিতে হইত না।' মহাত্মা হজরৎ আবু জর বলিয়াছেন—'হায়! আমি যদি বৃক্ষ হইতাম তাহা হইলে হিসাবের দায়ে ঠেকিতে হইত না।' মহামাননীয়া বিবী আয়শা ছিদ্দীকা বলিয়াছেন—'আমি যদি পৃথিবীতে না জন্মিতাম তাহা হইলে ভাল হইত।' মহাত্মা হজরৎ ওমর কোর্‌আন্ শরীফের কোন আয়াৎ শ্রবণ করিলে ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন এবং কখন কখন এমন গুরুতর মূর্চ্ছা ঘটিত যে, কয়েক দিন পর্য্যন্ত শয্যাগত হইয়া পড়িতেন। তিনি বহু রোদন করিতেন; তজ্জন্য বদন মণ্ডলে দুইটী কৃষ্ণবর্ণ রেখা পড়িয়াছিল। তিনি প্রায় সর্ব্বদাই আক্ষেপ সহকারে বলিতেন—'হায়! ওমর যদি মাতৃ গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ না হইত তবে ভাল ছিল।' একদা তিনি উষ্ট্রারোহণে কোন স্থানে যাইতেছিলেন, পথ প্রান্তে এক গৃহে কেহ কোর্‌আন্ শরীফ পাঠ করিতেছিলেন। তিনি যে সময়ে সেই গৃহদ্বার অতিক্রম করিতেছিলেন পাঠক ঠিক সেই সময়ে নিম্নলিখিত আয়াৎটী উচ্চারণ করেন। সেই শব্দ তাঁহার কর্ণ কুহরে পতিত হয়। আয়াৎটী শ্রবণ মাত্র তাঁহার অন্তরে দারুণ ভয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ

"নিশ্চয়ই তোমার প্রভুর শাস্তি ঘটিবেই ঘটিবে। (২৭ পারা। সূরা তুর। ১ রোকূ।) ভয়ে তাঁহার শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। তিনি উষ্ট্রের উপর আর থাকিতে না পারিয়া অবতরণ পূর্ব্বক পার্শ্বস্থ এক গৃহ-প্রাচীরে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িলেন; নড়ন চড়ন শক্তি পর্য্যন্ত লোপ হইয়াছিল, অপর লোকেরা তাঁহাকে ধরাধরী করিয়া গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন; অথচ তাঁহার পীড়ার কারণ কেহই বুঝিতে পারেন নাই। মহাত্মা আলী এব্‌নে হোছেন যে সময়ে অজু করিতে বসিতেন, তখন তাঁহার মনে এমন তীব্র ভয় উৎপন্ন হইত যে, বদন মণ্ডল পাংশু বর্ণ ধারণ করিত। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন—'তোমরা জান না আমি কাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে যাইতেছি?' মহাত্মা মস্‌রূর এব্‌নে মখ্‌রমার হৃদয় এতদূর পর্য্যন্ত ভয়াতুর ছিল যে, কোর্‌আন্ শুনিবার তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। একদা কোন এক অপরিচিত ব্যক্তি না জানিয়া তাঁহার সম্মুখে এই আয়াৎ পড়িয়াছিলেন—

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا
وَّ نَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا

"যে দিন মোত্তাকী (পুণ্যাত্মা) লোকদিগকে রহমানের সমীপে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের ন্যায় (সাদরে) একত্রিত করা হইবে এবং পাপীদিগকে তৃষ্ণার্ত্ত অবস্থায় দোজখের দিকে তাড়াইয়া লওয়া যাইবে।" (১৬ পারা। সুরা মরীয়ম। ৬ রোকু।) এই আয়াৎ শুনিবা মাত্র মহাত্মা মনে মনে ভাবিলেন, আমি তো পাপী - পুণ্যাত্মা নহি। পরে পাঠককে আর একবার ঐ আয়াৎ পাঠ করিতে প্রকাশ্যে অনুরোধ করিলেন। পাঠক পুনরায় উক্ত আবৃত্তি করিলেন। এবার শ্রবণ মাত্র মহাত্মা এক বিকট চীৎকার করতঃ ভূতলে পড়িয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। মহাত্মা হাতেম আছম বলিয়াছেন—"ভ্রাতৃগণ! উন্নত পদ ও উত্তম স্থান পাইয়া অহঙ্কৃত হইও না। বেহেশ্‌ৎ অপেক্ষা তো উন্নত ও মনোরম স্থান আর নাই। মহাত্মা হজরৎ আদম নবী عم সেই স্থানে বাস করিতে পাইয়াছিলেন। তাহার কি দশা হইয়াছিল তাহাতো জান? হে ভ্রাতৃবৃন্দ! অধিক এবাদৎ করিয়াছ বলিয়া সাহসে বুক বাঁধিও না। অবশ্য শুনিয়াছ—আজাজীল বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া এবাদৎ করিয়াছিল; তাহার দশা কি হইয়াছে? হে ভাই সকল! অধিক বিদ্যা অর্জ্জন পূর্ব্বক গৌরবে স্ফীত হইও না। বলীম বাউর এত বিদ্যা ও এত জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছিল যে, 'এছ্‌মে আ'জম' পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছিল (টীঃ ৩০০) তাহার দশা কি হইয়াছে? মহাপ্রভু তাহারই সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ
يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ

টীকা—৩০০। বলীম বাউর নামে এক বড় বিদ্বান্ জ্ঞানী ছিল। সে বিদ্যার প্রভাবে 'এছ্‌মে আ'জম' পর্য্যন্ত শিখিয়াছিল। আল্লার বহু নাম আছে. তন্মধ্যে একটী গুপ্ত নাম আছে; তাহাকে 'এছমে আজম' (অতি শ্রেষ্ঠ নাম) বলে। সে নামে আল্লাকে আহ্বান পূর্ব্বক যাহা প্রার্থনা করা যায় তাহাই সফল হয়। সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি মহাত্মা হজরৎ মুছা নবীকে শাপ দিয়াছিল। তজ্জন্য তিনি নির্ব্বিঘ্নে পৈতৃক 'কেনান দেশে প্রবেশ করিতে পান নাই। মহাত্মা হজরৎ মুছা নবী মিছর দেশ হইতে এছরাইল বংশীয় লোক দিগকে সঙ্গে

“আবা হউক, তাহার দৃষ্টান্ত, কুকুরের সদৃশ কুকুরের উপর বোঝা চাপাইলেও হাঁপায়।” (৯ পারা। সুরা আরাফ। ২২ রোকু।) যাহা হউক ভ্রাতৃগণ! সাধু লোকের সংসর্গ পাইয়াছ বলিয়াও উৎফুল্ল হইও না—মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ছাঃ) এর বহু আত্মীয় কুটুম্ব তাঁহার সঙ্গে একত্রে বাস করিয়াও ধর্ম্ম জীবন পায় নাই।' মহাত্মা আত্তাব সালমী একজন বিখ্যাত ধর্ম্ম ভীরু সাধু পুরুষ ছিলেন। তিনি একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসর ধরিয়া হাসেন নাই বা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করেন নাই। এক দিন কোন ঘটনা ক্রমে আকাশের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে; দৃষ্টিপাত মাত্র তিনি ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাত্রি কালে তিনি নিজের শরীরের উপর অনেক কয়েক বার হাত বুলাইয়া দেখিতেন যে পাপের জন্য তাঁহার কোন অঙ্গ বানর বা অন্য কোন পশুর অঙ্গের ন্যায় হইয়া গিয়াছে কি না? দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন সাধারণ বিপদ উপস্থিত হইলে তিনি মনে করিতেন সে বিপদ তাঁহার পাপের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তিনি মরিয়া গেলে মনুষ্য জাতি সে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। মহাত্মা অজুরী সকতি বলিয়াছেন—“আমি প্রত্যহ নিজের বদন মণ্ডল পরীক্ষা করিয়া দেখি; কি জানি পাপের প্রভাবে মুখশ্রী কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করিয়াছে কি না?” মহাত্মা হজরৎ ইমাম আহ্মদ হাম্বেল বলিয়াছেন—“ভয়ের যতগুলি দ্বার আছে তন্মধ্যে অন্ততঃ একটী দুয়ার আমার উপর উন্মুক্ত পাইতে আল্লার দরবারে প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আল্লা আমার প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন। তাহার পর ভয়

লইয়া নীল নদী পার হন। তাহার পরই তাহাদের সকলেরই পথ ভ্রান্তি ঘটে। এছরায়েল বংশীয় লোক চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত পাহাড় প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়া বাস করিতে বাধ্য হন। অবশ্য উহা আল্লারই উদ্দেশ্য ও বিধান ক্রমে ঘটিয়াছিল, কেন না এছরায়েল বংশীয় লোক মিছরে গিয়া কিছু দিন রাজকীয় সম্মান পাইয়াছিল বটে কিন্তু বিদেশী বলিয়া মিছরের লোকেরা তাহাদিগকে সর্ব্বদাই ঘৃণা করিত, পরে সেই প্রবাসে পরাধীন অবস্থায় ও রাজকীয় অত্যাচার মধ্যে এছরায়েল বংশীয় লোক বহু কাল বাস করাতে মানুষের উৎকৃষ্ট গুণ হইতে ক্রমশঃ বঞ্চিত হয়, শেষে তাহারা ধনে যেমন দরিদ্র হয় মনুষ্যত্ব গুণেও তদ্রূপ কাঙ্গাল হয়। নির্গুণ হীনাত্মা লোক দেশের অধিপতি হইবার যোগ্য নহে। এই কারণে মহাপ্রভু তাহাদিগকে চল্লিশ বৎসর ধরিয়া নির্ম্মুক্ত প্রান্তরে ঘুরাইয়া, স্বাধীন ভাবে রাখিয়া, সে স্থানে তাহাদের যে সন্তান জন্মে তাহাদিগকে মানুষের মত মানুষ করিয়া তুলেন। সন্তানগণ যখন উপযুক্ত হয় তখন পৈতৃক দেশ তাহাদের হস্তে অর্পণ করেন। কিন্তু মহাত্মা হজরৎ মুছা নবীর জীবনে কেনান দখল ঘটে নাই। যাহা হউক, বলীম বাউর হজরৎ মুছা নবীকে শাপ দেয়। পরে ইযুশা পয়গম্বরের প্রার্থনায় আল্লা তাহার ঈমান কাড়িয়া লন। উহার নিজ নাম বলীম এবং তাহার পিতার নাম বাউর। পিতার নাম সংযুক্ত হইয়া বলীম বাউর অর্থাৎ বাউর তনয় বলীম হইয়াছে।

যখন আমার মনে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন বুঝিতে পারিয়াছিলাম আমার বুদ্ধি লোপ পাইতেছে। ইহা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ প্রার্থনা করিয়াছিলাম —'হে মহাপ্রভো! আমি যতটুকু ভয় সহ্য করিতে পারি ততটুকু ভয় আমাকে দাও।' যাহা হউক, তখন হইতে আমার মন স্থির হইয়া গিয়াছে।" এক সাধু পুরুষকে রোদন করিতে দেখিয়া লোকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—'যে সময়ে, ঘোষণা করা হইবে যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের স্ব স্ব কার্য্যের প্রতিদান দেওয়া যাইবে, সেই সময়ের কথা মনে পড়াতে আমি রোদন করিতেছি।' কোন ব্যক্তি মহাত্মা হাছন বছরীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'আপনি কেমন আছেন?' তাহার উত্তর দিবার অগ্রে শেখ মহোদয় প্রশ্নকারীকে বলিয়াছিলেন—'ভাই! সমুদ্রে নৌকা ভাঙ্গিলে যে আরোহী একখানি মাত্র ভাঙ্গা তক্তা অবলম্বনে ভাসিতে থাকে তাহার অবস্থা কেমন?' সে ব্যক্তি বলিয়াছিল—'অবশ্যই তাহার অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়।' তখন শেখ মহোদয় বলিয়াছিলেন—'আমার অবস্থাও তদ্রূপ।' তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—'কোন ব্যক্তিকে হাজার বৎসর পরে দোজখ হইতে বাহির করা হইবে,—এই কথা হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে। হয় তো উহা আমার সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে।" তিনি সর্ব্বদাই অন্তিম কালের ভয়ে ত্রস্ত থাকিতেন বলিয়াই ঐ প্রকার উক্তি করিয়াছেন। খলিফা ওমর এবনে আব্দুল আজীজের কোন দাসী একটী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া তদ্বৃত্তান্ত খলিফা মহোদয়ের সম্মুখে বর্ণনা করিতে গিয়াছিল। খলীফা মহোদয় শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, দাসী বলিতে লাগিল—"আমি দেখিতে পাইলাম কেয়ামৎ যেন উপস্থিত হইয়াছে; দোজখের অগ্নি জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে; তদুপরি পোল ছেরাৎ স্থাপিত হইয়াছে; ফেরেশতাগণ, খলীফাদিগকে একে একে বিচার স্থলে আনিতেছে। প্রথমে আব্দুল মালেক মারওয়ানকে আনা হইল। আদেশ হইল—উহাকে পোলের উপর দিয়া চালাইয়া দাও। তিনি কিছু দূর যাইতে না যাইতে দোজখের মধ্যে পড়িয়া গেলেন।" স্বপ্নের এই কথা শুনিয়া খলীফা মহোদয় দাসীকে শীঘ্র শীঘ্র স্বপ্ন বৃত্তান্ত শেষ করিতে উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। দাসী বলিতে লাগিল—"তাহার পর তদীয় পুত্র ওলীদকে আনা হইল; তাঁহাকেও পোলের উপর দিয়া চালান গেল। তিনিও কিছু দূর গমনান্তর পদ স্খলিত হইয়া দোজখে পড়িলেন।" খলীফা মহোদয় দাসীকে তাড়াতাড়ি স্বপ্ন বৃত্তান্ত শেষ করিতে বিশেষ উত্তেজনা

করিতে লাগিলেন। দাসী বলিতে লাগিল—"তাহার পর ছোলায়মান এবনে আবদুল মালেককে আনা হইল তিনিও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দোজখে পড়িলেন।" খলীফা মহোদয় স্বপ্নের শেষ কথা শুনিতে অতীব অধীর হইতে লাগিলেন। দাসী বলিল—"হে আমীরুল মোমেনীন্! তাহার পর দেখিলাম আপনাকে আনা হইল।" দাসী এই মাত্র উচ্চারণ করিতে না করিতে খলীফা মহোদয় এক চীৎকার ছাড়িয়া মূর্চ্ছিত ও অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং কবুতরের ন্যায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। দাসী উচ্চস্বরে শপথ খাইয়া বলিতে লাগিল—"আপনাকে নির্ব্বিঘ্নে পোল ছেরাৎ পার হইয়া বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলাম।" তথাপি খলীফার সংজ্ঞা হইল না—পূর্ব্বের ন্যায় লুণ্ঠিত ও হাত পা আছড়াইতে লাগিলেন। এমন অজ্ঞান হইয়াছিলেন যে, দাসীর শেষোক্ত চীৎকার ধ্বনি সহকৃত কথাও শুনিতে পাইলেন না। মহাত্মা হাছন বছরীকে বহু বৎসর ধরিয়া হাস্য করিতে দেখা যায় নাই। তাঁহার অবস্থা দেখিলে বোধ হইত যেন কোন ভীষণ অপরাধে তাঁহাকে বন্দী করিয়া শিরচ্ছেদন জন্য কাঠ গাড়ায় লইয়া যাওয়া হইতেছে। তাঁহার এই অবস্থা দর্শন এবং তাঁহার গভীর এবাদৎ ও অমানুষিক আত্ম-নিগ্রহ তুলনা করতঃ লোকে তাঁহাকে ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন—'ইহা সম্ভব যে, মহাবিচারক আল্লা আমার ক্রিয়া কার্য্যের মধ্যে কোনটি অপ্রিয় বিবেচনা পূর্ব্বক, আমাকে শত্রু জ্ঞান করিতেছেন এবং হয় তো তিনি ইহা অবধারণ করতঃ ঢিল দিয়া বসিয়া আছেন যে, আমি নিজের ইচ্ছা মত যাহা ইচ্ছা করিয়া চলি, তিনি কিন্তু কিছুতেই আমার উপর অনুগ্রহ করিবেন না। এমন হইলে আমার সর্ব্বনাশ! আমি অনর্থক বিফলে জীবন পাত করিতেছি।'

যাহা হউক, পূর্ব্বকালের জ্ঞানীগণের এইরূপ ভয় সম্বন্ধে বহু উপাখ্যান আছে। পাঠক! বুঝিয়া রাখ—তাঁহারা কেন তদ্রূপ ভয় করিতেন? তাঁহাদের কি কোন অপরাধ ছিল? অথবা তাঁহারা কি পাপ কার্য্য করিতেন বলিয়া তদ্রূপ ভয়? আর তোমাদের কোন পাপ নাই বলিয়া কি তোমরা এমন নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়াছ? প্রকৃত কথা এই যে, তাঁহারাই নিষ্পাপ ও প্রভূত পুণ্যের অধিকারী ছিলেন। কেবল তাঁহারা প্রকৃত জ্ঞান পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উপার্জ্জন করিয়াছিলেন—তাঁহারা প্রত্যেক বিষয়ের সূক্ষ্ম-পরিচয়-জ্ঞান রাখিতেন বলিয়া তাঁহারা অত ভীত ছিলেন, আর বহু পাপ থাকা সত্ত্বেও

তোমরা মোহ মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছ, ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না; এই জন্য তোমরা নির্ভয় হইয়া রহিয়াছ।

মানবমনের অবস্থার তারতম্যানুসারে ভয় ও আশার উপকারিতা ও ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন—এস্থলে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভয় (খওফ) ও আশা (রজা) এই দুটীর গুণ ও উপকারিতা বর্ণনা কালে বহু উক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তথাপি এতদুভয়ের মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ? যেটী শ্রেষ্ঠ তাহাকেই মনের মধ্যে প্রবল ভাবে রক্ষা করা আবশ্যক। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার অগ্রে এ কথাটী জানিয়া লওয়া আবশ্যক যে, ভয় ও আশা এ দুটী বাস্তবিক পক্ষে দুটী ঔষধ। ঔষধের সম্বন্ধে একটী অপেক্ষা অন্যকে শ্রেষ্ঠ না বলিয়া হিতকর বলিলে ভাল হয়। (১) ভয় ও আশা এ দুটী নিজের ত্রুটী দর্শনে উৎপন্ন হয় সুতরাং এ দুটী অপূর্ণ গুণ। আল্লার প্রেমে সম্পূর্ণ ডুবিতে পারিলে এবং আল্লার ধ্যান মানবকে সম্পূর্ণ ঘিরিয়া লইলে মানবের পুর্ণতা লব্ধ হয়। সে অবস্থায় উপস্থিত হইলে আদি অন্ত সমস্ত ভুলিয়া যাইতে হয়। কেবল বর্ত্তমানে কি হইতেছে তাহাই দেখিতে হয় বরং সময়টি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া সময়ের সৃষ্টি-কর্ত্তা আল্লার দিকে এক ধ্যানে ডুবিয়া যাইতে হয়। ভয় বা আশার দিকে মন প্রবুদ্ধ হইলে সেই 'বোধ' একটি পরদা হইয়া দাঁড়ায়; সুতরাং সে অবস্থায়, | استغراق | (এস্তেগরাক) অর্থাৎ 'প্রেম-নিমজ্জন' ঘটে না। (২) (বরং আশার দিকে মন ঝুকিলে প্রেমের দ্বারের প্রতি মনের কিছু কিঞ্চিৎ দৃষ্টি পতিত হইতে পারে)। এই জন্য যাহাদের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়াছে তাহার মনে আশা প্রবল করিয়া রাখা আবশ্যক; কেননা আশা প্রেমের পরিপোষণ করে। ফল কথা এই, ইহসংসার হইতে যাইবার সময়ে আল্লার প্রেম সঙ্গে লওয়া আবশ্যক। প্রেম সঙ্গে লইলে আল্লার সঙ্গে মিলনের সৌভাগ্য লব্ধ হইবে। যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার নিকট গেলে এক অনির্ব্বচনীয় আরাম পাওয়া যায়। (৩) মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী সময় ভিন্ন অন্য সময়ে মানুষের মন যদি আল্লার চিন্তা হইতে অন্যমনস্ক বা মোহ-মুগ্ধ থাকে তবে সে মনের উপর 'ভয়'কে প্রবল করিয়া দেওয়া আবশ্যক। অন্যমনস্ক বা মোহাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে 'আশা' হলাহল বিষতুল্য ও ধ্বংসকর। (৪) অপর পক্ষে নিষ্পাপ পরহেজগারগণের মনে **ভয় ও আশা** সমান সমান থাকা আবশ্যক। (৫) সাধারণতঃ মানুষ যখন এবাদৎ ও সৎকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন মনে

ভয় ও আশার মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ ও হিতকর।

পুণ্যপ্রাপ্তির আশা স্থাপন করা উচিত। প্রার্থনার সময়ে মনে প্রেমের প্রবাহ চালাইতে পারিলে হৃদয় নির্ম্মল হয়। আশা হইতেই প্রেমের উৎপত্তি। (৬) অপর পক্ষে পাপের সময়ে মনে ভয় প্রবল করা উচিত। (৭) অভ্যাস যাহাদের মনের উপর প্রভাব বা চিহ্ন সংস্থাপন করিতে পারে (টীঃ ৩০১) অর্থাৎ যাহাদের মন সম্পূর্ণ দৃঢ় হয় নাই—অভ্যাস করিলে মনের উপর কিছু, না কিছু চিহ্ন পড়িতে পারে—তেমন লোকদিগকে নির্দ্দোষ আনন্দ দায়ক উৎসব করিবার সময়েও মনে ভয় প্রবল করিয়া রাখা আবশ্যক। নতুবা নির্দ্দোষ আনন্দে আকৃষ্ট হইতে হইতে পরিশেষে পাপে জড়িত হইতে পারে। যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত যাহা বলা গেল তাহাতে বুঝা গেল যে 'ভয়' ও 'আশা' এমন দুটী ঔষধ সদৃশ যাহার উপকারিতা ও ক্রিয়া, মানব মনের অবস্থার তারতম্য অনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়। এই জন্য ভয় ও আশার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। (আল্লাই ভাল জানেন।)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দরিদ্রতা এবং বৈরাগ্য।

দরিদ্রতা ও বৈরাগ্যলব্ধ মূল্যবান সাহায্য — পারলৌকিক পরিত্রাণ লাভের পথে—প্রিয় পাঠক! স্মরণ কর—'দর্শন পুস্তকে' চারিটী পদার্থের পরিচয় লিখা গিয়াছে; যথা (১) আত্মা; (২) আল্লা; (৩) ইহকাল, ও (৪) পরকাল। এই চতুর্ব্বিধ পদার্থের পরিচয় ও জ্ঞানের উপর ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত আছে, ইহা সুন্দর মত, হৃদ্‌গত ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য। উক্ত পদার্থের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়ের পরিচয় লইয়া

টীকা—৩০১। মূল গ্রন্থে اهل عادت। "আহ্‌লে আদৎ" শব্দ লিখা আছে উহার এক অর্থ উপরে লিখা গেল। অন্য অর্থ এই দেশ বা জাতি বিশেষের মধ্যে যে নির্দ্দোষ আনন্দোৎসব করিবার অভ্যাস প্রচলিত আছে তদরূপ উৎসব যাহারা করে তাহাদিগকে আহ্‌লে আদৎ বলে। যথা বঙ্গ দেশের নবান্ন উৎসব, পারস্য দেশের নওরোজ উৎসব ইত্যাদি সন্তানের মুখে প্রথম অন্ন দিবার অন্ন-প্রাসন বা নিমক্ চুশী প্রভৃতিকেও ঐরূপ নির্দ্দোষ উৎসব বলা যায়। এরূপ অর্থ করিলে গ্রন্থের ঐ অংশের অনুবাদ এইরূপ হইবে—"সমাজ-প্রচলিত নির্দ্দোষ উৎসব ভোগ করিবার কালে মনে ভয় প্রবল রাখা আবশ্যক।"

পরিত্যাগ করিবে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থকে চিনিয়া মজবুৎ ভাবে ধারণ করিবে অর্থাৎ আল্লাকে পাইবার জন্য নিজকে ভুলিয়া যাইবে এবং পরকাল লাভ করিবার জন্য সংসারকে পরিত্যাগ করিবে। আবার শুন, নিজের দিক হইতে মুখ ও দৃষ্টি ফিরাইয়া আল্লার দিকে স্থাপন করিবে—সংসারকে পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া দিয়া পরকালের দিকে দৌড়িয়া চলিবে। এরূপ ক্ষমতা লাভের সূচনা—তয়,' ছবর ও তওবা হইতে আরম্ভ হয়; কিন্তু সংসারাসক্তি সে ক্ষমতা ধ্বংস করিয়া ফেলে। সেই বিনাশকারিণী সংসারাসক্তি দমনের ঔষধ আমরা ইতিপূর্ব্বে যথা স্থানে বর্ণনা করিয়াছি। প্রবৃত্তির, বিরুদ্ধাচরণ করিয়া চলা এবং সংসারের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলা পরিত্রাণের উপায়। এমন মঙ্গলজনক কার্য্যে দরিদ্রতা ও বৈরাগ্য মনকে অমূল্য সাহায্য দিয়া থাকে, সুতরাং এ দুটী বস্তু পরিত্রাণকারী গুণের অন্তর্গত। আমরা এক্ষণে এই দুইটী অমূল্য মঙ্গলকর পদার্থের ব্যাখ্যা করিব।

ফকর বা দরিদ্রতার পরিচয়।—পাঠক! জানিয়া রাখ—যাহার হস্তে অভাব মোচনের পরিমিত বস্তু নাই বা তাহা উপার্জ্জন করিবার শক্তি নাই তাহাকে দরিদ্র বলে; মানুষের প্রথম অভাব ছিল অস্তিত্বের। অস্তিত্ব যখন আসিল তখন জীবিত থাকিবার আবশ্যক হইল। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আহারের আবশ্যকতা আসিয়াছে। আহারের সঙ্গে ধনেরও আবশ্যকতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও নানাবিধ অভাব ও আবশ্যকতা আসিয়া জুটিয়াছে। যে সকল পদার্থের দ্বারা অভাব দূর হইতেছে তাহার কোনটাই মানুষের আয়ত্তাধীন নহে, অথচ তাহা না হইলে মানুষ জীবন ধারণ করিতেও পারে না।

দরিদ্রতার ব্যাপক অর্থ—এখন (দরিদ্রতার ব্যাপক অর্থ বুঝিবার প্রথমে প্রকৃত) ধনী শব্দের অর্থ বুঝিয়া লও। যাহার কিছু মাত্র অভাব নাই, যিনি সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত— যাঁহাকে অন্যের আশাধারী হইতে হয় না তাঁহাকে ধনী বলে। মহাপ্রভু আল্লা ব্যতীত এরূপ ধনী আর কেহই হইতে পারে না। মানব, জেন, ফেরেস্তা ও শয়তানের দল বা যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে তৎসমুদয়ের অস্তিত্ব বা জীবন তাহার নিজ ক্ষমতা হইতে হয় নাই এবং উহা তাহাদের আয়ত্তাধীনও নহে; সুতরাং ইহারা সকলেই দরিদ্র। এই কারণে মহাপ্রভু বলিতেছেন—

প্রকৃত ধনী কে?

وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ

"আল্লাই এক মাত্র গণী (ধনী) এবং তোমরা সকলেই ফকীর (দরিদ্র)" (২৬ পারা। সূরা মোহাম্মদ। ৪ রোকু।) মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী عم ফকীর শব্দের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন—

اَصْبَحْتُ مُرْتَهِنًا بِعَمَلِيْ وَالْاَمْرُ بِيَدِ غَيْرِيْ فَلَا

فَقِيْرَ اَفْقَرُ مِنِّيْ

"আমি অনুষ্ঠানের জিম্মাদার হইয়া পড়িয়াছি কিন্তু কার্য্য-ফল অন্যের হাতে আছে। এমন অবস্থায় আমা অপেক্ষা অধিক নিরাশ্রয় ফকীর আর কেহই নাই।" মহাপ্রভুও এই অর্থেই বলিয়াছেন—

وَرَبُّكَ الْغَنِىُّ ذُوالرَّحْمَةِ ۚ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ

وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ

"তোমার প্রভু গণী (ধনী) ও করুণাময়; তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে তোমা-দিগকে দূর করিয়া তোমাদের পরে যাহাকে ইচ্ছা সৃজন করিতে পারেন" (৮ পারা। সূরা আন্‌আম। ১৬ রোকু) ইহাতে বুঝা যাইতেছে সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই ফকির।

দরিদ্রতার অর্থ ছুফী দিগের ভাষায়—যে ব্যক্তি নিজকে সর্ব্ববিধ-গুণ শূন্য দেখে ও সেই কথা প্রবল ভাবে বিশ্বাস করিয়া রাখে, এবং ইহাও সুন্দর মত বুঝে যে, ইহকালে ও পরকালে কোন পদার্থের উপর তাহার কিছু মাত্র ক্ষমতা নাই—জন্মের প্রারম্ভে যেমন কোন ক্ষমতা ছিল না, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে তদ্রূপ কোনই ক্ষমতা নাই—সেই ব্যক্তি ফকীর।

ছুফীবর্ণিত দরিদ্রতার অর্থ অবলম্বনে শয়তানের ধোকা ও তাহার প্রতিকার—ছুফীগণের ঐরূপ অর্থ শ্রবণ করতঃ নির্ব্বোধ লোক বলিতে পারে, ফকীর যেমন সর্ব্ববিধ-গুণশূণ্য হয় সেইরূপ এবাদৎ-ও-পুণ্য-শূন্য হওয়া আবশ্যক। এবাদৎ করিলেই পুণ্য জন্মে এবং সেই পুণ্য এবাদৎকারীর

নামে সঞ্চিত থাকে, সুতরাং তাহাকে ফকীর বলা যাইতে পারে না। শয়তান এরূপ তর্কের বীজ, বিধর্ম্মী লোকের মনে বপন করিয়া থাকে। যে সকল নির্ব্বোধ, নিজকে বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করে তাহাদিগকেই শয়তান ঐরূপ কৌশলে পথভ্রান্ত করিয়া থাকে। হিতকর কথা হইতে শয়তান কুটীল মন্দ অর্থ বাহির করিয়া দেয়; আর নির্ব্বোধ লোক তদ্রূপ অর্থ নিজে বাহির করিতে পারিল বলিয়া গর্ব্বভরে নাচিয়া উঠে। কিন্তু শেষে বিষম ধোকায় পড়িয়া নিজের সর্ব্বনাশ করে। উহারা যেন এই কথা বলিতে চায়—যে ব্যক্তি আল্লাকে পাইয়াছে সে তো সমস্তই পাইয়াছে, সে কেমন করিয়া ফকীর হইবে? তাহারা যেন এ কথাও বলিতে চায় যে, আগে আল্লাকে ছাড়িয়া দাও তবে প্রকৃত ফকীর হইতে পারিবে (টীঃ ৩০২) যাহা হউক, ফকীরকে পূরা এবাদৎ করা আবশ্যক। মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী عم বলিয়াছেন—"এবাদৎ আমার নিজের পদার্থ নহে, উহার উপর আমার কোন ক্ষমতাই নাই; তথাপি আমার উপর এবাদতের জিম্মা দেওয়া হইয়াছে।"

যাহা হউক, পাঠক! বুঝিয়া লও—ছুফীগণ ফকীর বলিয়া যাহা বুঝেন তাহার ব্যাখ্যা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; আবার 'মানব সর্ব্ব বিষয়ের অভাবগ্রস্ত সুতরাং সর্ব্বতোভাবে দরিদ্র' এ কথার ব্যাখ্যা করাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে; কেবল ধনের সম্বন্ধে মানুষের যে দরিদ্রতা ঘটে, সুধু সেই কথাই, আমরা এস্থলে বর্ণনা করিব।

দরিদ্রগণের শ্রেণী বিভাগ—মানব, লক্ষ লক্ষ অভাবের মধ্যে থাকিয়া জীবন যাপন করিতেছে। কেবল ধনের অভাবে মানবের যে দরিদ্রতা ঘটে তাহা (প্রধানতঃ) দুই প্রকার—(১) যে ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্ব্বক ধন পরিত্যাগ করে তাহাকে (زاهد। জাহেদ) অর্থাৎ বিরাগী বলে। (২) যে ব্যক্তি আদৌ ধন প্রাপ্ত হয় নাই তাহাকে فقیر (ফকীর) অর্থাৎ দরিদ্র কহে। ফল কথা ধনের অভাবকে দরিদ্রতা বলে। (আবার দেখ, বিশদ ব্যাখ্যা করিলে) নির্ধন দরিদ্র লোককে

প্রধান শ্রেণী বিভাগ

টীকা—৩০২। "শূন্য" না হইলে "পূর্ণ" হওয়া যায় না। কলস বায়ু শূন্য না হইলে জল পূর্ণ হইতে পারে না। কলস হইতে বায়ু বাহির করিয়া দিলে সে স্থানে জল প্রবেশ করিতে পারে সেইরূপ সদ্গুণ লাভ করিতে গেলে আগে হৃদয় হইতে দোষ বাহির করিয়া ফেলা উচিত। খোদা প্রাপ্তি চরম লাভ। উহা পাইতে হইলে অগ্রে আল্লা ভিন্ন আর সমস্ত ত্যাগ করতঃ দরিদ্র হওয়া আবশ্যক।

(মোটামুটী) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) যাহার ধন নাই কিন্তু উপার্জ্জন করিতে যথাসাধ্য পরিশ্রম করে তাহাকে **লোভী দরিদ্র** কহে। (২) যে দরিদ্র ধনার্জ্জনে চেষ্টা করে না, কেহ ধন দিলেও গ্রহণ করে না, ফলকথা, ধনকে যে ব্যক্তি ঘৃণা করে তাহাকে (জাহেদ) **বিরাগী** বলে। (৩) যে দরিদ্র ধনার্জ্জনে চেষ্টা করে না, আবার বিনা চেষ্টায় যাহা হাতে আসে তাহাও ফেলিয়া দেয় না—কেহ দিলে গ্রহণ করে, না দিলে সন্তুষ্ট ও প্রফুল্ল থাকে তেমন লোককে (কানেএ ফকির) বা তুষ্ট দরিদ্র বলে। (টীঃ ৩০৩) অগ্রে আমরা দরিদ্রতার কল্যাণ বর্ণনা করতঃ শেষে زهد বৈরাগ্যের সুফল প্রদর্শন করিব। অগ্রে দরিদ্রতার কল্যাণ বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যে কোন শ্রেণীর দরিদ্র হউক না কেন, কেহই কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইবে না। লোভী দরিদ্র, ধন লাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইলে উপকার হইতে বঞ্চিত হইবে না।

বিশদ শ্রেণী বিভাগ

দরিদ্রতা সম্ভূত কল্যাণ সম্বন্ধে কোরআন, হদীছ ও মহাজন উক্তি—পাঠক ! স্মরণ কর, মহাপ্রভু ফকীর লোককে এত ভালবাসেন যে 'মোহাজের' লোকের নামের অগ্রে ফকীর লোকের নাম লইয়াছেন (টীঃ ৩০৪।) যথা

ইত্যাদি......... لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ

"ফকীর ও মোহাজেরগণের জন্য" (২৮ পারা। সুরা—হশর। ১ রোকূ।)

টীকা—৩০৩। 'দরিদ্রগণের শ্রেণীবিভাগ' ইমাম ছাহেব মূল গ্রন্থে যেরূপ ভাবে দেখাইয়াছেন তাহা সহজবোধ্য করিবার জন্য নিম্নে শৃঙ্খলার সহিত পুনরায় লিখা হইল।

দরিদ্র প্রধানতঃ দ্বিবিধ—১। বিরাগী জাহেদ (যে দরিদ্র ইচ্ছা পূর্ব্বক ধন পরিত্যাগ করে ধনার্জ্জনে চেষ্টা করে না বা কেহ ধন দিলেও গ্রহণ করেনা) ২। চির-দরিদ্র (যে ব্যক্তি আদৌ ধন প্রাপ্ত হয় নাই)

শেষোল্লিখিত চির-দরিদ্রগণের আবার দুই ভাগ আছে—যথা ১। লোভী দরিদ্র (যাহার ধন নাই কিন্তু উপার্জ্জন করিতে যথা সাধ্য পরিশ্রম করে) ২। তুষ্ট দরিদ্র (যে দরিদ্র ধনার্জ্জনে চেষ্টা করেনা, আবার বিনা চেষ্টায় যাহা হাতে আসে তাহাও ফেলিয়া দেয় না।)

টীকা—৩০৪। যাঁহারা বিশুদ্ধ ধর্ম্ম (ঈমান) অক্ষত রাখিবার জন্য বিধর্ম্মীর অত্যাচার হইতে পলাইয়া দূর দেশে আশ্রয় লন তাঁহাদিগকে 'মোহাজের' বলে। যে সকল মুসলমান মক্কার কাফেরগণের অত্যাচার হইতে পলাইয়া মদীনা শহরে আশ্রয় লন, তাঁহারা 'মোহাজের' বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহারা আল্লার অতীব প্রিয় এবং অসীম পুণ্যের অধিকারী।

মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—"যে দরিদ্র, অন্ন বস্ত্র দানে বৃহৎ পরিবার পালন করে এবং তৎসঙ্গে সাধুভাবে পবিত্র জীবন যাপন করে মহা করুণাময় তাহাকে বড় ভালবাসেন।" তিনি হজরৎ বেলালকে বলিয়াছেন—" দেখ বেলাল! সংসার হইতে যাইবার কালে যেন দরিদ্র হইয়া যাইতে পার তদর্থে চেষ্টা কর।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"আমার ওম্মতগণের মধ্যে দরিদ্র লোক, ধনী লোকের পাঁচ শত বৎসর অগ্রে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।" হদীছের অন্য বচনে এ কথাও প্রকাশ যে—"আমীর লোকের চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে দরিদ্রগণ বেহেশ্‌তে যাইবে।" এই দুই বচনে প্রকাশ্য পার্থক্য দেখা যায়, কিন্তু শেষোক্ত বচনে লোভী দরিদ্রের কথা বলা হইয়াছে। যে দরিদ্র লোভী, সেও আমীর লোকের চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বেহেশ্‌তে যাইবে। যে সকল দরিদ্র, দরিদ্রতাকে অমূল্য হিতকর মনে করিয়া সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের কথা পূর্ব্ববর্ত্তী বচনে কথিত হইয়াছে—তাহারা পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—"আমার ওম্মৎগণের মধ্যে দরিদ্র লোক সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং দুর্ব্বল লোক সর্ব্বাগ্রে বেহেশ্‌তে বিচরণ করিতে লাগিবে।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"আমার দুটী অনুষ্ঠান আছে। যে ব্যক্তি আমার সেই দুই অনুষ্ঠান ভালবাসে সেই যেন আমাকেই ভাল বাসিয়া থাকে। আমার সেই দুই অনুষ্ঠানের একটী 'দরিদ্রতা' অন্যটি 'প্রবৃত্তির সহিত 'জেহাদ' (যুদ্ধ)। হদীছ শরীফে এইরূপ উক্ত আছে যে—"হজরৎ জেব্‌রায়েল ফেরেস্তা একদিন মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) এর সমীপে অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে—'মহাপ্রভু আপনাকে ছালাম দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন—আপনি যদি ইচ্ছা করেন তবে ভূপৃষ্ঠের সমস্ত পাহাড় পর্ব্বত স্বর্ণে পরিণত করিয়া দিবেন। তাহা হইলে আপনি যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিবেন।' ইহা শুনিয়া হজরৎ বলিয়াছিলেন—'হে জেব্‌রায়েল, আমি তাহা পাইতে চাই না। এই সংসারটী গৃহ-শূন্য লোকের গৃহ এবং নির্ধন লোকের ধন। সংসারে ধন জমা করা নির্ব্বোধ লোকের কার্য্য।' এরূপ উত্তর পাইয়া হজরৎ জেব্‌রায়েল বলিয়াছিলেন—'আল্লা, আপনার কথা অটল রাখুন'" মহাত্মা হজরৎ ঈছানবী (আঃ) একদিন কোন নিদ্রিত লোকের পার্শ্ব দিয়া যাইবার কালে তাহাকে ডাকিয়া জাগিতে ও আল্লার স্মরণে নিযুক্ত হইতে বলিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি

জাগিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'হে নবী আমাকে কি করিতে হইবে? আমিতো সংসার ছাড়িয়া দিয়া আরামে নিদ্রা যাইতেছি?' হজরৎ নবী বলিলেন—'হে ভ্রাতঃ! তবে শয়ন কর সুখে নিদ্রা যাও।' মহাত্মা হজরৎ মুছা নবী ع পথে যাইবার কালে দেখিয়াছিলেন কোন ব্যক্তি একখানি ইষ্টকের উপর মাথা রাখিয়া ভূপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে। তাহার শরীরে একখানি কম্বল ভিন্ন অন্য বস্ত্র নাই। নবী মহোদয় আল্লার দরবারে নিবেদন করিলেন—"হে করুণাময়! তোমার এই বান্দার জীবন কেন এইরূপ দুর্গতির মধ্যে নষ্ট হইতেছে?" উত্তর আসিল "হে মুছা! তুমি কি জান না আমি যাহাকে অধিক ভালবাসি তাহাকে সাংসারিক ধনৈশ্বর্য্যের কচ্ কচি ঝক্ ঝকি হইতে নিরাপদ রাখি?" মহাত্মা আবু রাফে বলিয়াছেন—"একদিন মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ এর গৃহে অতিথি আসিয়াছিল। তখন তাঁহার গৃহে কিছুমাত্র খাদ্য দ্রব্য ছিল না। আমাকে নিকটস্থ এক ইয়াহুদী মুদির দোকান হইতে কিছু আটা ধারে আনিতে অনুমতি করিয়াছিলেন। আমি ইয়াহুদীর নিকটে গিয়া হজরতের জন্য কিছু আটা ধারে চাহিয়াছিলাম। ইয়াহুদী নগদ মূল্য ভিন্ন দিবেনা বলিয়া উত্তর দিলে, আমি ফিরিয়া আসিয়া হজরতের সমীপে তৎসমস্ত কথা বলিয়াছিলাম। তিনি শ্রবণ করতঃ একটু বিমর্ষ হইয়াছিলেন এবং শেষে বলিয়াছিলেন—'আল্লার শপথ, আকাশে আমি 'আমীন' (বিশ্বস্ত) বলিয়া পরিজ্ঞাত; ইয়াহুদী কিছু আটা ধারে বিক্রয় করিলে অবশ্যই আমি মূল্য পরিশোধ করিতাম। যাহা হউক, আমার এই বর্ম্মটী লইয়া গিয়া উহার নিকট বন্ধক দিয়া কিছু আটা আন।' তাঁহার আদেশ মত আমি সাঁজোয়াটী বন্ধক রাখিয়া আটা আনিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে হজরতের মন প্রফুল্ল করিবার অভিপ্রায়ে নিম্ন লিখিত আয়াৎ অবতীর্ণ হয়,

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا

بِهٖ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ

الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ

خَيْرٌ وَّأَبْقٰى ○

"বহু সম্প্রদায়কে ধন দওলৎ দিয়াছি ; তদ্দ্বারা তাহাদের পার্থিব জীবনের শোভা সৌষ্ঠব করা হইয়াছে। তুমি সে দিকে কটাক্ষপাত করিও না। উহা তাহাদের পরীক্ষার কারণ হইয়াছে—(তোমার জন্য) তোমার প্রভুর নির্দ্ধারিত জীবিকা অতীব শ্রেষ্ঠ এবং চিরস্থায়ী।" (১৬ পারা। সূরা তাহা। ৮ রোকূ।) অর্থাৎ হে মোহাম্মদ! তুমি ধন ও ধনীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না, সে সব উহাদের বিপদের হেতু ; যে দ্রব্য তোমার জন্য আল্লার নিকট জমা আছে তাহা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী। মহাত্মা কাবল্ আহ্বার বলিয়াছেন—"মহাত্মা হজরৎ মুছা নবী عم কে মহাপ্রভু আল্লা বলিয়াছিলেন—'হে মুছা! দরিদ্রতা ঘটিলে বলিও—

مَرْحَبًا بِشِعَارِ الصَّالِحِيْنَ ○

'ধন্য দরিদ্রতা! তুমি সাধুগণের শরীর রক্ষার্থ অঙ্গরাখা জামা।" মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ বলিয়াছেন—"যখন আমাকে বেহেশ্ৎ ও দোজখ দেখান হয়, তখন অধিকাংশ দরিদ্র লোককেই বেহেশ্তে দেখিয়াছিলাম ; এবং অধিকাংশ ধনীকেই দোজখের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলাম।" তিনি বেহেশ্তে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অল্প দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"স্ত্রীলোকগণ কোথায়?" তদুত্তরে শুনিয়াছিলেন—

شَغَلَهُنَّ الاحمران الذهب والزعفران ○

"স্বর্ণ ও জাফরাণে সুরঞ্জিত হইতে প্রবৃত্ত হইয়া (তাহারা বিলম্বে পড়িয়াছে)।" অর্থাৎ তাহারা স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কারে ও রঞ্জিত বেশ ভূষা করিতে নিযুক্ত হইয়া বেহেশ্তে আসিবার কার্য্যে অবসর পায় নাই। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে যে—"কোন পয়গম্বর, নদীর তীর ধরিয়া গমন কালে দেখিতে পাইয়াছিলেন—একজন ধীবর আল্লার নাম লইয়া জাল ফেলিতেছে অথচ জালে মাছ বাধিতেছে না, কিন্তু অন্য এক ধীবর শয়তানের নাম লইয়া জাল ফেলিতেছে এবং প্রচুর মৎস্য পাইতেছে। এতদ্দর্শনে পয়গম্বর মহোদয় আল্লার দরবারে নিবেদন করিলেন —'হে মহাপ্রভু! এ সমস্তই তোমার আদেশে হইতেছে কিন্তু ইহার মধ্যে কি কৌশল আছে বুঝিতে পারিতেছি না।' বিশ্বপ্রভু এক ফেরেশ্তা দ্বারা তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, প্রথম ধীবরের স্থান বেহেশ্তে আর দ্বিতীয় ধীবরের স্থান দোজখে নির্দ্ধারিত আছে।' ফেরেশ্তা আসিয়া যখন পয়গম্বর ছাহেবকে ধীবরদ্বয়ের

পরিণাম সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিলেন তখন তিনি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া নিবেদন করিলেন—'হে মহাপ্রভো! এখন আমি বুঝিতে পারিলাম ও সন্তুষ্ট হইলাম।'" মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—"পয়গম্বরগণের মধ্যে মহাত্মা হজরৎ ছোলায়মান নবী عم কে ধনৈশ্বর্য্যের জন্য সর্ব্ব শেষে বেহেশ্‌তে যাইতে হইবে। আমার ছাহাবাগণের মধ্যে ধন ও দওলতের জন্য আবদুর রহমান বেন্ আউফ, সকলের শেষে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।" তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"ধনী লোকেরা বহু কষ্টে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পাইবে।" তিনি অন্য সময়ে বলিয়াছেন—"মহাপ্রভু, যাহাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাহাদিগকে ইহসংসারে বিপদ আপদে জড়িত রাখেন। আর যাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন তাহাদিগকেই তিনি قتنا। (এক্‌তনা) করেন।" ছাহাবাগণ 'এক্‌তনা' শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"সংসারে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ নির্ধন হয় এবং যাহার সন্তান সন্ততি ও পরিবারবর্গ সমস্ত মারা যায় তাহাকে 'একতনা' বলে।" *** মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) একদা হজরৎ বিবী আয়শা ছিদ্দীকাকে বলিয়াছিলেন—"দেখ, আয়শা! কেয়ামতের দিন যদি আমার সঙ্গে থাকিবার ইচ্ছা থাকে, তবে দরিদ্রের ন্যায় জীবন যাপন কর; আমীর লোকের ব্যবহার পরিত্যাগ কর; পরিধানের জীর্ণ বস্ত্রে যে পর্য্যন্ত তালী লাগাইবার উপায় থাকে সে পর্য্যন্ত তালী লাগাইয়া পরিধান কর। তালী লাগান হয় নাই এমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিও না।" (টিঃ ৩০৫) মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—"কেয়ামতের দিন মহাবিচার-ভূমিতে সকলকে আনা হইলে দরিদ্রদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক মহাপ্রভু, ত্রুটি স্বীকার করিতে লোকে যে ভাবে কথা বলে, তদ্রূপ ভাবে সান্ত্বনা বাক্যে বলিবেন—'হে আমার প্রিয়তম দরিদ্রগণ। সংসারে তোমাদিগকে ধন দেই নাই, তাহাতে এ কথা মনে করিও না যে তোমাদিগকে অপদার্থ ও তুচ্ছ ভাবিয়া দরিদ্র রাখিয়াছিলাম, বরং এই কথা বুঝিয়া লও যে, তোমাদিগকে এথায় আনিয়া মহা পুরস্কার দিব—মহা সম্মানে গৌরবান্বিত করিব, এই অভিপ্রায়ে তোমাদিগকে সংসারে দরিদ্র করিয়া রাখিয়াছিলাম। এখন তোমরা এই উপস্থিত জনবৃন্দের জনতা মধ্যে প্রবেশ কর, ইহাদের মধ্যে যে যে ব্যক্তি আমার নামে তোমাদিগকে পৃথিবীতে এক লোক্‌মা অন্ন বা এক টুকরা বস্ত্র দিয়াছিল তাহাদিগকে টানিয়া

টীকা—৩০৫। পূর্ব্ববর্ত্তী তারকা চিহ্ন হইতে টীকা চিহ্ন পর্যন্ত অংশটা মূলগ্রন্থে পরবর্ত্তী প্যারার শেষে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা হইল।

লইয়া বেহেশ্‌তে চলিয়া যাও—তোমাদের প্রতি অনুগ্রহকারীদিগকে অদ্য তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম।' ইহা শুনিয়া দরিদ্রগণ অন্নদাতা ও বস্ত্রদাতাদিগকে অনুসন্ধান করিতে জনতার মধ্যে প্রবেশ করিবে। সেই মহা কাঠিন্যের দিন, সমস্ত লোক প্রচণ্ড উত্তাপে ঘর্ম্ম-জলে আপ্লুত হইতে থাকিবে এবং পিপাসায় অস্থির হইয়া রহিবে, তখন দরিদ্রগণ তাহাদের উপকারীদিগকে হস্তে ধরিয়া টানিয়া লইয়া বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।" মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) ছাহাবাদিগকে বলিয়াছিলেন—"তোমরা দরিদ্রদিগের সহিত বন্ধুত্ব রাখ এবং যথাসাধ্য তাহাদের উপকার কর। তাহারা তোমাদের পরকালের ধন ও প্রধান সম্বল।" ছাহাবাগণ নিবেদন করিয়াছিলেন—"তাহারা কি প্রকার ধন?" হজরৎ বলিয়াছিলেন—"কেয়ামতের দিন দরিদ্রদিগের প্রতি আদেশ হইবে যে, যাহারা পৃথিবীতে তোমাদিগকে এক লোকমা অন্ন বা এক ঢোক জল বা এক খণ্ড বস্ত্র দিয়াছে তাহাদিগকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বেহেশ্‌তে চলিয়া যাও।" মহাত্মা হজরৎ আলী করমুল্লার মুখে শুনা গিয়াছে যে, মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) বলিয়াছেন—'যে সময়ে লোকে ধন সম্পত্তি সঞ্চয় করিতে তৎপর হইবে, দালান এমারৎ বানাইতে উৎসাহিত হইবে, এবং তৎসঙ্গে দরিদ্রদিগকে দরিদ্রতার জন্য ঘৃণা করিতে শিখিবে তখন চারি প্রকার বিপদ মহাপ্রভু জনসমাজে প্রেরণ করিবেন—(১) দুর্ভিক্ষ; (২) রাজার অত্যাচার; (৩) বিচারকগণের পক্ষপাত; (৪) কাফের ও শত্রুগণের দৌরাত্ম্য।'

মহাত্মা হজরৎ মুছা নবী (আঃ) আল্লার দরবারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'হে আল্লা! কোন ব্যক্তি তোমার বন্ধু? আমি তাহাকে ভাল বাসিব।" প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল—"যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ ধন হীন সেই আমার বন্ধু।" (টীঃ ৩০৬) মহাত্মা এব্‌নে আব্বাছ বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি দরিদ্রকে দরিদ্রতার জন্য ঘৃণা করে এবং ধনীকে ধনের জন্য সম্মান করে সে আল্লার অভিশাপগ্রস্ত ও ধিক্কার প্রাপ্ত।' জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—'মহাত্মা ছুফীয়ান সুরীর দরবারে ধনী লোক যেরূপ লাঞ্ছিত হইত তেমন আর কুত্রাপি হইত না—তিনি ধনীদিগকে আগের সারিতে স্থান দিতেন না—দরিদ্রদিগকে প্রথম সারিতে নিজের আশে পাশে স্থান দিয়া ধনীদিগকে পশ্চাতের সারিতে রাখিতেন।' মহাত্মা লোকমান স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দান কালে বলিয়াছিলেন—"হে পুত্র! সাবধান! ছিন্ন

টীকা—৩০৬. এই টীকা চিহ্ন পর্য্যন্ত প্যারার প্রথম অংশটা মূল গ্রন্থে পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটী তারকা চিহ্নিত স্থানে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা হইল।

বস্ত্র পরিহিত দরিদ্রদিগকে কখনই ঘৃণা বা তুচ্ছ জ্ঞান করিও না। মনে রাখিও —যিনি তাহাদের প্রভু, তিনি তোমারও প্রভু।" মহাত্মা ইয়াহীয়া এব্‌নে মাজ বলিয়াছেন—"দরিদ্রতা দেখিয়া লোকে যেমন ভয় পায়, দোজখের জন্য যদি তদ্‌রূপ ভয় করিত, তবে দরিদ্রতা ও দোজখ উভয় হইতে অব্যাহতি পাইত; ইহারা সংসার উপার্জ্জনে যেরূপ কঠিন পরিশ্রম করে, বেহেশ্‌ৎ উপার্জ্জনে যদি তদ্‌রূপ পরিশ্রম করিত তবে সংসার ও বেহেশ্‌ৎ উভয় হস্তগত হইত, এবং ইহারা বাহিরে লোকের দৃষ্টির জন্য যেরূপ ভয় করে অন্তরে আল্লার দৃষ্টির জন্য যদি তদ্‌রূপ ভয় করিত তবে উভয় জগতে সৌভাগ্যবান হইত।" মহাত্মা হজরৎ এব্‌রাহীম আদ্‌হমের সম্মুখে কেহ দশ সহস্র মুদ্রা স্থাপন পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেও তিনি গ্রহণ করেন নাই। বহু অনুরোধ উপরোধ করিলেও তিনি প্রত্যাখান করতঃ বলিয়াছিলেন—'হে ভ্রাতঃ! তুমি কি ইচ্ছা কর যে আমি এই মুদ্রা গ্রহণ পূর্ব্বক দরিদ্রের তালিকা হইতে আমার নাম কাটিয়া ফেলি ইহা তো কখনই পারিব না।'

তুষ্ট দরিদ্রের গৌরব। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) বলিয়াছেন—"আল্লা, যাহাকে এছলাম ধর্ম্মে সুপথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং অভাব মোচনের উপযোগী ধন দিয়াছেন, সে ব্যক্তি যদি তাহাতে পরিতুষ্ট হইতে পারে তবে তাহার তুল্য ভাগ্যবান আর কেহ নাই।" তিনি দরিদ্রদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছেন—"হে দরিদ্রগণ! তোমরা দরিদ্রতাকে হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে ভাল বাস ও সন্তুষ্ট থাক। দরিদ্র হইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলে দরিদ্রতার কল্যাণ পাইতে পারিবে, অন্যথায় সে কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইবে।" এই হদীছের প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যায় যে, লোভী দরিদ্র, দরিদ্রতার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত থাকিবে; কিন্তু অন্য বহু হদীছে সুস্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, লোভী দরিদ্রগণের ভাগ্যেও কল্যাণ লিপীবদ্ধ হইবে। হজরৎ আরও বলিয়াছেন—"প্রত্যেক বস্তু লাভ করিতে এক একটী কুঞ্জী (উপায়) লাগে। ছবরকারী দরিদ্রের হৃদয়ে, আল্লার প্রতি যে প্রেম থাকে, তাহা বেহেশ্‌তের কুঞ্জী, তদ্‌রূপ দরিদ্র কেয়ামতের দিন আল্লার সঙ্গে মিলিয়া বসিতে পাইবে।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"নিজের নিকট যে বস্তু আছে তাহাতেই যে দরিদ্র পরিতুষ্ট হয় এবং মহাপ্রভু, যে জীবিকা দিয়াছেন, তাহা পাইয়া যে দরিদ্র সন্তুষ্ট থাকে তাহাকে আল্লা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন।" তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"আমীরই হউক বা গরীবই হউক, কেয়ামতের দিন সকলেই এই বলিয়া অনুতাপ করিবে যে—'হায়! পৃথিবীতে,

কেবল জীবন রক্ষার পরিমিত দ্রব্য ভিন্ন অতিরিক্ত দ্রব্য যদি না পাইতাম তবে অদ্য আমাদের কেমন সৌভাগ্য বাড়িত!'" মহাপ্রভু, একদা হজরৎ এছমায়েল নবী (আঃ) কে প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন--"হে এছমায়েল! ভগ্নহৃদয় মানবের নিকটে আমাকে অনুসন্ধান কর।" নবী মহোদয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হে প্রভো! তদ্রূপ লোকের সন্ধান বলিয়া দাও।" উত্তর আসিয়াছিল—"যে ব্যক্তি সাধু অথচ দরিদ্র।" মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) বলিয়াছেন--"কেয়ামতের দিন মহাপ্রভু, ফেরেশ্‌তাগণকে জিজ্ঞাসা করিবেন—'আমার সেই বিশেষ প্রিয়তম লোকেরা কোথায়?' ফেরেশ্‌তাগণ নিবেদন করিবে—'হে মহাপ্রভো! তাহারা কোন লোক? সন্ধান প্রার্থনা করি।' আদেশ হইবে—'তাহারা মুছলমান দরিদ্র—আমার দান তাহারা নিতান্ত সন্তোষের সহিত গ্রহণ করতঃ কৃতজ্ঞ চিত্তে জীবন যাপন করিয়াছে। তাহাদের সকলকেই বেহেশ্‌তে লইয়া যাও।' ফেরেশ্‌তাগণ আদেশ-প্রাপ্তি মাত্র তাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে বেহেশ্‌তে লইয়া যাইবে। এদিকে আর সমস্ত লোক বিচার ও হিসাব নিকাশের দায়ে আবদ্ধ রহিবে।" মহাত্মা আবু দরদা বলিতেন—"ধন বৃদ্ধি দেখিয়া যে আনন্দিত হব এবং পরমায়ু প্রতিক্ষণ কমিতেছে বলিয়া দুঃখিত না হয়, তাহার বুদ্ধি বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। হায় আল্লা! পরমায়ু কমিয়া যাইতেছে এ অবস্থায় ধন বৃদ্ধি হইলে কি লাভ?" মহাত্মা আমর এবনে আব্‌দুল কায়েছ ব্যঞ্জন অভাবে শাক সহকারে রুটী ভক্ষণ করিতেছিলেন দেখিয়া, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"হে আমর! তুমি পৃথিবীতে এ সামান্য দ্রব্যে তুষ্ট আছ?" মহাত্মা উত্তর দিয়াছিলেন—"আমি এমন লোক দেখিয়াছি, তাহারা এতদপেক্ষা সামান্য ও নিকৃষ্ট পদার্থে সন্তুষ্ট আছে।" সে ব্যক্তি বলিয়াছিলেন—"তদ্রূপ ব্যক্তি আবার কে?" মহাত্মা বলিলেন—"যাহারা পরকালের পরিবর্ত্তে দুনিয়া লইয়াছে তাহারাই এতদপেক্ষা জঘন্য পদার্থে ভুলিয়াছে।" (টীঃ ৩০৭) মহাত্মা আবুজার এক দিন কতকগুলি লোকের সম্মুখে হদীছের কথা লইয়া আলাপ করিতেছিলেন, ইতি মধ্যে তাঁহার পত্নী আসিয়া সংবাদ দিলেন—'অদ্য গৃহে কোন খাদ্য দ্রব্য নাই; তাহার উপর এমন কোন দ্রব্যও নাই যাহার বিনিময়ে খাদ্য দ্রব্য

টীকা ৩০৭। এ স্থলের অর্থ এই যে, মহাত্মা আমর মাংস ঘৃতাদি উপাদেয় দ্রব্য পরিত্যাগ করতঃ শাকান্নে পরিতৃপ্ত ছিলেন। ক্ষুধা রাখিয়া শাকান্ন ভোজনে বল ও স্বাস্থ্য বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু সাংসারিক লোকেরা পরকালের হিতকর বস্তু ত্যাগ করতঃ সংসারে এমন বস্তু ভোগে মুগ্ধ হইয়াছে যে তাহার এক মুষ্টি অধিক ভোজন করিলে পেট ফুলে—অজীর্ণ হয়—শেষে দাস্ত বমন হইয়া জীবন সংশয় ঘটে।

সংগ্রহ করা যাইতে পারে।' মহাত্মা প্রফুল্ল বদনে বলিলেন—"অয়ি রমণী ! ছবর কর—ধৈর্য্য ধর ; আমাদের সম্মুখে যে দীর্ঘ দুর্গম পথ বিস্তৃত আছে তাহা অতিক্রম করিতে হইলে বোঝা ভিড়া না থাকাই ভাল। বোঝা ভিড়া লইয়া কেহই সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে পারিবে না।' পতীর বচন শ্রবণে সেই সৌভাগ্যবতী রমণী হৃষ্ট চিত্তে গৃহে চলিয়া গেলেন।

তুষ্ট দরিদ্র ও লোভী দরিদ্রের মধ্যে তুলনা ধৈর্য্যাবলম্বী (ছাবের) দরিদ্র ও কৃতজ্ঞ-হৃদয় (শাকের) ধনী এতদুভয়ের মধ্যে কোন দল শ্রেষ্ঠ? এ সম্বন্ধে জ্ঞানী আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। তথাপি পাঠক ! ইহা নিঃসন্দেহে জানিয়া রাখ যে, ধৈর্য্যাবলম্বী দরিদ্রই শ্রেষ্ঠ, এ সিদ্ধান্তের মধ্যে ভুল নাই। উপরে যে সকল হদীছ বর্ণিত হইয়াছে তাহা মনোযোগের সহিত বুঝিলে এ কথার সত্যতা প্রমাণ হইবে। তাহার উপরও যদি তোমরা যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ চাও তবে শুন—আল্লার স্মরণ ও তাঁহার প্রেম হইতে যে পদার্থ মানুষকে ক্ষান্ত রাখে তাহাই বাস্তবিক জঘন্য পদার্থ। দরিদ্রতা কখন কখন কাহার পক্ষে এমন কঠিন হয় যে আল্লার স্মরণ ও প্রেমের পথে বাধা উপস্থিত করে ; আবার ধনও অনেকের পক্ষে সে পথের অন্তরাল হইয়া দাঁড়ায়। ফল কথা এই

কৃতজ্ঞ ধনী অপেক্ষা ধৈর্য্যশীল দরিদ্র উত্তম

যে, অভাব মোচন হইতে পারে এমন ধন, একেবারে ধন-শূন্যতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; তদ্রূপ পরিমিত ধনকে কখনই 'দুনিয়া' বলিয়া ধরা হয় না, বরং সে ধনকে পরকালের পাথেয় বলিয়া ধরা হয়। এই কারণে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) আল্লার দরবারে প্রার্থনা কালে বলিতেন--"হে মহাপ্রভো ! আমার সন্তান ও উম্মত দিগকে অভাব মোচনের পরিমিত অন্ন বস্ত্র দান করিও।" অভাব মোচনে যে পরিমাণ ধনের প্রয়োজন তদপেক্ষা অধিক ধন, না পাওয়াই মঙ্গল। যদি অভাব মোচনের পরিমিত ধন ও তদতিরিক্ত অধিক ধন উভয়ই একই প্রকার হইত তবে সন্তোষ ও লোভ এ উভয় অবস্থায় প্রভেদ থাকিত না।

ধনশূন্যতা অপেক্ষা পরিমিত ধন উত্তম

দরিদ্র ও ধনী উভয়েই যদি লোভী হয়—অর্থাৎ ধনোপার্জ্জনে ব্যস্ত থাকে, তবে উভয়েরই মন, ধনের সঙ্গে আবদ্ধ থাকে ; সুতরাং ধনাসক্তি উভয়ের মনে সমান থাকে ; কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যখন ধনোপার্জ্জনে অক্ষম হয় এবং ধনে বঞ্চিত থাকে তখন তাহার মন ভাঙ্গিয়া যায়। বিফল পরিশ্রম-যন্ত্রণা ভোগ

লোভী ধনী অপেক্ষা লোভী দরিদ্র উত্তম

করিতে হইয়াছে বলিয়া সংসারের উপর বিরক্তি জন্মে; তখন হতাশ হইয়া, সংসারের প্রতি স্বভাবতঃ বিমুখ হইয়া পড়ে। মুছলমানের হৃদয়ে যে পরিমাণে সংসারাসক্তি হ্রাস পায়; আল্লার প্রতি প্রেম সেই পরিমাণে বাড়িয়া যায়। দরিদ্র লোক পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ অকৃত-কার্য্য হইতে থাকিলে সংসারকে কারাগার তুল্য কষ্টের স্থান বলিয়া বিবেচনা করে এবং এথা হইতে পলাইয়া পরকালে যাইতে উৎসুক হয়। সুতরাং মৃত্যুকালে সংসারের দিকে মন আকৃষ্ট না থাকিয়া আল্লার দিকে ঝুকিয়া পড়ে। যাহারা সংসারে পুনঃ পুনঃ লাভ করিতে থাকে তাহারাই ধনী হইয়া উঠে এবং ধনের আনুসঙ্গিক ফল ভোগ করিতে পায়। শেষে তাহাদের মন সংসারের আসক্তিতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, এবং মৃত্যু উপস্থিত হইলে, পৃথিবী ছাড়িয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। সুতরাং লোভী ধনী ও লোভী দরিদ্রের অবস্থার মধ্যে মহা প্রভেদ হইয়া পড়ে। এতদ্ভিন্ন এবাদৎ ও প্রার্থনার মধ্যেও পার্থক্য ঘটে। দরিদ্র লোক এবাদৎ ও প্রার্থনায় যে সুমিষ্ট আস্বাদ ভোগ করিতে পায়, ধনীর ভাগ্যে তাহা কখনই সম্ভবে না। ধনীর প্রার্থনা কেবল জিহ্বার অগ্রভাগ এবং মনের বাহির পৃষ্ঠ হইতে উদয় হয়—মানব-মন আঘাত পাইয়া চূর্ণ না হইলে, এবং দুঃখাগ্নিতে দগ্ধ না হইলে, আল্লার স্মরণের মাধুর্য্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

দরিদ্র ও ধনী উভয়ে যদি স্ব স্ব অবস্থায় সমান তুষ্ট থাকিতে পারে তথাপি উক্ত কারণে দরিদ্র ব্যক্তি, ধনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আবার, দরিদ্র ব্যক্তি যদি ধনলোভী এবং ধনী ব্যক্তি যদি স্বীয় ধনে পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হয় তথাপি দরিদ্রের অবস্থা উৎকৃষ্ট হইবে। তুষ্ট ধনীর ধন অপহৃত হইলেও যদি তাহার মনে কিছু মাত্র দুঃখ না জন্মে বরং ধনের অপচয়ে আল্লাকে ধন্যবাদ দিতে রত হয়, তবে সে ধনীর হৃদয়, কৃতজ্ঞতা ও পরিতৃপ্তি-পরিতোষের প্রভাবে, পবিত্র হইতে পারে। সংসারে আরাম ও প্রেমে তাহার হৃদয় যে পরিমাণে দূষিত হয়, তাহা উক্ত দুই গুণের প্রভাবে সংশোধিত হইয়া উঠে। এ দিকে দেখ, লোভী দরিদ্রের হৃদয় ধনের লোভে দূষিত হয় বটে কিন্তু দুঃখ কষ্টের চোটে তাহা পরিষ্কার হইয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে—তুষ্ট ধনী ও লোভী দরিদ্র উভয়ের অন্তর পরিষ্কার পবিত্র হইয়া শেষে প্রায় সমান অবস্থায় দাঁড়ায়; তখন

তুষ্ট ধনী অপেক্ষা তুষ্ট দরিদ্র উত্তম

তুষ্ট ধনী অপেক্ষা লোভী দরিদ্রের অবস্থা উৎকৃষ্ট হইলেও প্রায় সমতুল্য

উভয়ের মনের পার্থক্য কেবল আল্লার নৈকট্য বা দূরত্ব লইয়া বিচার করিতে হইবে। সংসারের প্রতি ঘৃণা হইতে আল্লার নৈকট্য বুঝা যায় এবং তৎপ্রতি আসক্তি ও ভালবাসা দ্বারা আল্লা হইতে দূরবর্ত্তী নির্ণীত হয়। ধনী লোকের মন, যদি সম্পূর্ণ ভাবে ধনের প্রতি অনাসক্ত থাকে— ধনের অস্তিত্ব বা অভাব যদি তাঁহার নিকট সমান বলিয়া গণ্য হয় অথচ অপরের অভাব মোচনে যদি আনন্দ জন্মে তবে সেই ধনীর অবস্থা অবশ্যই লোভী দরিদ্রের অবস্থা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মহৎ হইবে। মহামাননীয়া বিবী আয়শা ছিদ্দীকার অন্তর ঐরূপ উন্নত অবস্থায় ছিল। একদিন তিনি লক্ষ মুদ্রা বিতরণ করিয়াছিলেন। বিতরণ করিতে করিতে সন্ধ্যা সমাগত হইয়াছিল। রোজা এফ্‌তারের সময় তাঁহার গৃহে এমন এক কপৰ্দ্দকও ছিল না যে তদ্‌দ্বারা কোন খাদ্য ক্রয় করিয়া এফ্‌তার করেন। পরিচারিকাগণ বলিয়াছিল—'আমাদের এফ্‌তারের জন্য মাংস ক্রয়ের নিমিত্ত এক দেরেম মুদ্রা রাখিয়া দিলে কি কোন ক্ষতি ছিল? তদুত্তরে বিবী মহোদয়া বলিয়াছিলেন—'বিতরণ-কালে কেন আমাকে জানাইয়াছিলে না? ধনী লোকের মন, নিজের সুখ-চিন্তা ভুলিয়া অপরের অভাব মোচনে ঐ প্রকার উন্নত অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারিলে অবশ্যই সে অবস্থা বড়ই উন্নত। ধনীর হৃদয় যদি তদ্‌রূপ উন্নত অবস্থায় না উঠিয়া শুধু (ছবর) ধৈর্য্যাবলম্বন করে তবে ধনাসক্তি-জাত ক্ষতি, ছবরের প্রভাবে সংশোধিত হইতে পারে। অপর পক্ষে লোভী ফকীরের মন ধনাভিলাষ দ্বারা যে পরিমাণে কলুষিত হয়, তাহা দুঃখ কষ্টের চোটে পরিষ্কার হইয়া যায়; তখন লোভী দরিদ্র ও পরিতুষ্ট ধনীর মানসিক অবস্থা সমান সমান হয়; কিন্তু অভাবগ্রস্ত দুঃখীকে ধন দান করা দুর্গতিগ্রস্ত লোকের তত্ত্বাবধান করা ইত্যাদি নানাবিধ কর্ত্তব্যের বোঝা ধনীর উপর থাকে —দরিদ্রের উপর তেমন কিছু দায়িত্ব থাকে না; সে জন্য লোভী ফকীরের অবস্থা ছবরকারী ধনীর অবস্থা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়।

লোভী দরিদ্র অপেক্ষা অনাসক্ত ধনবান উত্তম

তুষ্ট ধনী ও লোভী দরিদ্রের অবস্থা সমতুল্য হইলেও লঘু দায়িত্বভারের জন্য দরিদ্র উত্তম

প্রকৃত তুষ্ট দরিদ্রের ত্রিবিধ সৌভাগ্যে অধিকার—হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে যে, একদা দরিদ্রগণ আপনাদের দুরবস্থা মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) এর সমীপে নিবেদন করিবার জন্য একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল। প্রতিনিধি তাহাদের এই কথা হজরৎকে জানাইয়াছিল

—"হে রসুলুল্লা! ইহকাল ও পরকালের সমস্ত পুণ্য ধনী লোকেরা লুটিয়া লইতেছে—ধনীরা দুঃখীর দুঃখ মোচন করে, জকাৎ দেয়, হজ করে, জেহাদে যায়; আমরা দরিদ্র সুতরাং ঐ সকল পুণ্য-কার্য্য করিতে পারি না।" দরিদ্রগণের প্রতিনিধিকে হজরৎ পরম সমাদরে গ্রহণ করতঃ উপবেশন করাইয়া বলিয়াছিলেন—"তুমি যাহাদের পক্ষ হইতে আসিয়াছ তাহারা ধন্য। আমি তাহাদিগকে বড় ভালবাসি। তুমি ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগকে বলিবে —যাহারা আল্লার জন্য সন্তোষের সহিত দরিদ্রতা গ্রহণ করে, তাহাদের জন্য এমন তিনটী সৌভাগ্য আছে যাহা ধনী আমীর লোকের ভাগ্যে কখনই ঘটিবে না। (১) বেহেশ্‌তের মধ্যে এক পরম রমণীয় মহোন্নত স্থান আছে। সাধারণ বেহেশ্‌ৎবাসিগণ সে স্থান এত উচ্চে দেখিতে পাইবে, যেমন ভূতল হইতে নক্ষত্র লোকের উন্নতি দেখা যায়। সেই পরমোন্নত রমণীয় স্থান কেবল দরিদ্র পয়গম্বর, দরিদ্র মুসলমান ও দরিদ্র শহিদগণই পাইবেন— তদ্‌ভিন্ন অন্য কেহ সে স্থানে যাইতে পারিবে না। (২) দরিদ্রগণ, ধনী লোকের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। (৩) দরিদ্র লোক যদি একবার এই কাল্‌মা পড়ে

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا

اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ۝

'পবিত্রতা আল্লার এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লার জন্য এবং আল্লা ব্যতীত কোন প্রভু নাই এবং আল্লা শ্রেষ্ঠ'—এবং ধনী লোকও যদি ঐ কাল্‌মা পড়িয়া সহস্র মুদ্রা গরীব দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করে তথাপি ধনীর অবস্থা দরিদ্রের সমান হইবে না।" দরিদ্রগণ যখন এ সুসমাচার প্রতিনিধির মুখে শুনিতে পাইয়াছিল, তখন তাহারা সকলেই নিতান্ত পরিতোষ প্রকাশ করতঃ বলিয়াছিল —"আমরা দরিদ্রতা পাইয়াই পরিতুষ্ট হইলাম।" হজরতের বচন-মধ্যে শেষ ভাগে কাল্‌মার সম্বন্ধে যে কথা উক্ত হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই যে আল্লার নাম এমন তাজা বীজের তুল্য যাহা হৃদয়ে পড়িলে অঙ্কুরিত হয়। হৃদয়-ক্ষেত্র ধন দওলতের সম্পর্ক ও চিন্তা-রূপ-আবিল্য হইতে পরিষ্কার হইলে এবং দুঃখ কষ্টের চোটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইলে কর্ষিত ভূমির ন্যায় উর্ব্বরা হইয়া থাকে; তখন জেকের-রূপ-বীজ হৃদয়ে পতিত হইলে সহজে অঙ্কুরিত

ও বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। ধনী লোকের হৃদয় সাংসারিক মিষ্ট সুখে বিভোর এবং নিরুদ্বেগ ও আরামের শীতলতায় জমাট বান্ধিয়া থাকে; তদ্রূপ হৃদয়ে জেকের-রূপ-বীজ বপন করিলেও অঙ্কুরিত হইতে পারে না। কঠিন প্রস্তরের উপর জল ঢালিয়া দিলে তাহা যেমন ভিতরে প্রবেশ না করিয়া গড়িয়া পড়ে, তদ্রূপ সাংসারিক আরাম প্রভাবে জমাট বান্ধা হৃদয়ে, জেকের-রূপ-বীজ স্থান না পাইয়া গড়িয়া পড়ে।

এক দরিদ্র ব্যক্তি, মহাত্মা বশর হাফী রহমতুল্লার সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিয়াছিল—"আমাকে বৃহৎ পরিবার পালন করিতে হয় অথচ আমি নিঃস্ব—এক কপৰ্দ্দক সম্বল নাই। আপনি আমার জন্য আল্লার দরবারে প্রার্থনা করুন।" মহাত্মা বলিয়াছিলেন—"ভাই! যে সময়ে তোমার পরিজনবর্গ ক্ষুধিত হইবে, তুমি উপার্জ্জনের জন্য বাহিরে গিয়া কিছু মাত্র সংগ্রহ করিতে না পারিয়া শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিবে, পরিজনবর্গকে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির দেখিয়া তোমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িবে, সেই সময়ে তুমি আমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিও। তোমার তৎকালীন প্রার্থনা, আমার প্রার্থনা অপেক্ষা আল্লা পরম প্রীতির সহিত পূর্ণ করিবেন।" (টিঃ ৩০৮)

দরিদ্র ও ধনীর অবস্থার তারতম্য বিচারের একমাত্র উপায়—আল্লার নৈকট্য। যাহা হউক, ফকীর ও আমীর উভয়ের অবস্থার তারতম্য কেবল আল্লার নৈকট্য হইতে জানা যায়। তাঁহার নৈকট্য কেবল প্রেম দ্বারা পরিমিত হয়; এবং প্রেম আবার তাঁহার স্মরণ-ব্যাপৃতি হইতে চিনা যায়। আল্লা ভিন্ন অন্য বস্তুর চিন্তা হইতে অন্তর যত পরিষ্কার থাকে ততই আল্লার স্মরণ গাঢ় ভাবে হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। ধনী লোকের মন কখনই ধন জনের চিন্তা হইতে একেবারে শূন্য হইতে পারে না। এমন স্থলে ধনী ও দরিদ্রের অবস্থা কি প্রকারে সমান হইতে পারে? কোন কোন ধনী মনে করে যে, আমি ধন হইতে সম্পূর্ণ উদাসীন; আমার হস্তে ধন এক দিক দিয়া আসিতেছে; অন্য দিক দিয়া চলিয়া যাইতেছে; ধনের চলাচলের পথে আমি কেবল একটী মধ্যবর্ত্তী স্থান বা বাক্স মাত্র। এরূপ কল্পনা করা ধনীর পক্ষে এক বিষম ধোকা। কেননা, তাহার অন্তরে ধনাসক্তি এমন ভাবে লুকাইয়া থাকে যে, সে কিছুতেই বুঝিতে পারে না। যে ব্যক্তি নিজকে ধন হইতে সম্পূর্ণ উদাসীন মনে করে, সে যদি মহামাননীয়া বিবী আএশা ছিদ্দীকার মানসিক অবস্থায় উন্নত হইতে পারে তবে বরং

তাহার নিজকে ধনে অনাসক্ত ও উদাসীন বিবেচনা করা সত্য হইতে পারে। উক্ত বিবী মহোদয়া লক্ষ মুদ্রা মৃত্তিকাবৎ তুচ্ছ জানিয়া দান করিতেন অথচ তদদ্বারা নিজের কি উপকার হইতে পারে, সে চিন্তাই মনে উদয় হইত না। সংসারে অনাসক্ত থাকিয়া এবং সাংসারিক কোন কথা না ভাবিয়া যদি ধন-সঞ্চয় করা সম্ভব হইত, তবে পয়গম্বরগণ নিজে কেন এত ভয় করিতেন এবং অপরকে ভয় করিতে বলিতেন? পয়গম্বরশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) যে সময়ে 'দুনিয়াকে' মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক নিকটে আসিতে দেখিয়াছিলেন, তখন তিনি "দূর! দূর!" করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী (আঃ) স্বীয় সঙ্গীদিগকে বলিয়াছিলেন—"সাংসারিক ধনী লোকের ঐশ্বর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিও না; তাহাদের ধন দওলতের ছায়া তোমাদের অন্তরে পড়িলে তোমাদের ঈমানের মিষ্টতা উড়িয়া যাইবে।" তাঁহার বাক্যের মর্ম্ম এই যে—পরের ঐশ্বর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মন সেই দিকে আকৃষ্ট হয় এবং আল্লার স্মরণে যে মাধুর্য্য থাকে ও যে একাগ্রতা থাকা উচিত তাহা নষ্ট হয়। দুই আসক্তি এক মনে স্থান পায় না। ধনাসক্তি মনে উদয় হইলে আল্লার প্রেম বা আসক্তি উড়িয়া যায়। বিশ্ব-জগতে এক 'আল্লা' ও 'আল্লা-ভিন্ন-পদার্থ' ব্যতীত আর কিছুই নাই। 'আল্লা-ভিন্ন-পদার্থের' সঙ্গে মন যে পরিমাণে লাগিবে, আল্লা হইতে সেই পরিমাণে দূরবর্ত্তী হইবে; আবার আল্লার সঙ্গে মন যে পরিমাণে লাগিয়া থাকিবে, 'আল্লা-ভিন্ন-পদার্থ' হইতে সেই পরিমাণে দূরবর্ত্তী হইবে। মহাত্মা আবু ছোলায়মান দারানী বলিতেন—"দরিদ্র লোক কোন দ্রব্য পাইতে চেষ্টা করিয়া না পাইলে, হতাশ মনে, যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, তাহা ধনী লোকের হাজার বৎসরের এবাদৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

দরিদ্রের প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য—অভাবের সময়ে—পাঠক! জানিয়া রাখ—অভাবের সময়ে দরিদ্রের পক্ষে কতিপয় কর্ত্তব্য আছে; তন্মধ্যে অন্তরের মধ্যে, সন্তোষ অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করা প্রথম প্রকার কর্ত্তব্য, এবং প্রকাশ্যে, দুঃখ প্রকাশ না করা দ্বিতীয় প্রকার কর্ত্তব্য। (১) আন্তরিক সন্তোষের গাঢ়তা, দুর্ব্বলতা, ও অভাব বিচার করিলে দরিদ্রের তিন শ্রেণী হয়। **প্রথম**—অভাবে পড়িলেও যে দরিদ্র, স্বীয় দরিদ্রতাকে আল্লার প্রদত্ত একটী অমূল্য দান বলিয়া আদর করে এবং সেই দরিদ্রতা, মহাপ্রভু স্বীয় প্রিয়তম দিগকে স্নেহ-পূর্ব্বক দান করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করে এবং

তজ্জন্য পূর্ণ আনন্দ-ভরে আল্লাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা উচ্চ শ্রেণীর সন্তোষাবলম্বী। **দ্বিতীয়**—যাহারা অভাবে পড়িয়া দরিদ্রতার উপর সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু আল্লার কার্য্যের উপরও অসন্তুষ্ট হইতে পারে না—বরং সন্তুষ্টই থাকে, তাহারা মধ্য শ্রেণীর লোক। দেখ, নাপিত যখন ক্ষৌরী কার্য্য করে, তখন কেশ নখাদির কর্ত্তনে লোকের কষ্ট উৎপন্ন হইলেও কেহই নাপিতে উপর অসন্তুষ্ট হইতে পারে না—বরং তাহাকে সকলেই ভাল বাসে। তদ্রূপ দরিদ্রতা, অপ্রিয় কষ্ট-দায়ক হইলেও (তৎ প্রভাবে অহঙ্কারাদি নানা দোষ দূর ও বিনয়াদি বহু সদ্‌গুণ লব্ধ হয়—আত্মার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় বলিয়া) দরিদ্রতা-প্রেরক আল্লার প্রতি বুদ্ধিমান লোক কেহই অসন্তুষ্ট হয় না, বরং তাহাকে ভালবাসিয়াই থাকে। যাহা হউক, ফলকথা এই যে, দরিদ্রতার জন্য দুঃখিত হইয়াও আল্লার উপর সন্তুষ্ট থাকিতে পারা উত্তম কার্য্য। **তৃতীয়**—দরিদ্রতার জন্য আল্লার উপর অসন্তুষ্ট হওয়া নিতান্ত জঘন্য হারাম। সেই অসন্তুষ্টির জন্য দরিদ্রের যাবতীয় মঙ্গল ও পুণ্য নষ্ট হইয়া যায়; বরং দরিদ্রগণকে সর্ব্বদা এই বিশ্বাস মনে জাগরূক রাখা আবশ্যক যে, "আমাদের জন্য যাহা মঙ্গল-জনক ও হিতকর, মহাপ্রভু সর্ব্বদা তাহাই করিতেছেন।" তাঁহার কার্য্যে কাহারও অসন্তুষ্ট হওয়া বা প্রতিবাদ করা উচিত নহে। (২) অভাব ও দরিদ্রতার জন্য লোকের সম্মুখে দুঃখ প্রকাশ করা উচিত নহে; বরং সহিষ্ণুতার আবরণে নিজের দরিদ্রতা ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য। মহাত্মা হজরৎ আলী বলিয়াছেন—"দরিদ্রতা কখন কখন শাস্তি স্বরূপ হইয়া থাকে; কর্কশ স্বভাব, অদৃষ্টের নিন্দা ও আল্লার বিধানের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ, তাহার চিহ্ন। আবার দরিদ্রতা কোন কোন সময়ে সৌভাগ্যের হেতু হইয়া থাকে; মিষ্ট স্বভাব, অদৃষ্টের নিন্দা না করা, এবং আল্লাকে ধন্যবাদ দেওয়া তাহার চিহ্ন।" হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে —"অভাব ও দরিদ্রতা গোপনে রাখা, একটী পূর্ণ ধন ভাণ্ডার।" (৩) ধনী লোকের সঙ্গে মিশামিশী না করা, তাহাদের সম্মুখে নিজকে খাটো না করা এবং তাহাদের প্রশংসাবাদ না করা, দরিদ্র লোকের পক্ষে প্রতি-পাল্য কর্ত্তব্য। মহাত্মা ছুফীয়ান ছুরী বলিয়াছেন—"দরিদ্র লোক যখন ধনী লোকের আশে পাশে ঘোরে তখন বুঝিবে সে কপটী এবং যখন রাজা বা রাজপুরুষগণের নিকট যাতায়াত করে, তখন বুঝিবে সে মিথ্যাবাদী।" (৪) দরিদ্রের আর একটী কর্ত্তব্য এই যে, নিজের অভাব মোচনে টানাটানী

করিয়া কিছু বাঁচাইবে এবং তাহা অপর অভাবী লোকের অভাব মোচনে আনন্দিত চিত্তে দান করিবে। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছিলেন —"একটী মুদ্রা কখনও লক্ষ মুদ্রা অপেক্ষা উচ্চ হয়।" লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল 'হে রসুলুল্লা! কোন্ স্থানে তদ্রূপ হয়?' তিনি বলিয়াছিলেন —'যে স্থলে কোন দরিদ্রের হস্তে দুই মুদ্রার অধিক ধন থাকে না, অথচ সেই দরিদ্র যখন সন্তুষ্ট চিত্তে একটা মুদ্রা দান করিতে পারে, তখন ক্রোড়পতির লক্ষ মুদ্রা দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়।

দান গ্রহণের নিয়ম পাঠক! অন্যের প্রদত্ত দান গ্রহণের সময়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। (১) যাহার উপার্জ্জন পথে অসদুপায়ের সন্দেহ আছে, তাহার দান কখনই লইবে না। (২) নিজের অভাব মোচনে যতটুকু ধনের প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত লইবে না। (৩) যে দরিদ্র, অপর দরিদ্রের অভাব মোচনে নিযুক্ত আছে, সে ব্যক্তি যদি স্বীয় অভাব মোচনের অতিরিক্ত দ্রব্য প্রকাশ্যে লইয়া গিয়া অতি গোপনে অপর দরিদ্রের অভাব মোচনে ব্যয় করে তবে তাহার পক্ষে অতীব উৎকৃষ্ট কার্য্য হইবে কিন্তু তদ্রূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করা বড় কঠিন ব্যাপার। ছিদ্দীক শ্রেণীর সিদ্ধপুরুষ ভিন্ন অন্য কেহই এরূপ কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে না। যে দরিদ্র তদ্রূপ ক্ষমতা লাভ করিতে পারে নাই, তাহাকে নিজের অভাব মোচনের অতিরিক্ত দ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নহে। দাতা নিজেই উপযুক্ত অভাবী অনুসন্ধান পূর্ব্বক দান করা উচিত। (৪) যাহা হউক, দান গ্রহণ করিবার অগ্রে, দাতার সংকল্প জানিয়া লওয়া গৃহীতার পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য। দাতা ভালবাসা দেখাইবার মানসে, সওগাৎ (উপঢৌকন) দিতেছে, কিম্বা অভাবগ্রস্ত লোকের অভাব মোচন জন্য দান করিতেছে, অথবা নাম ও যশ ক্রয়ের জন্য বিতরণ করিতেছে, সর্ব্বাগ্রে তাহা জানিয়া লওয়া গৃহীতার কর্ত্তব্য। উপঢৌকন বা নজর হইলে এবং তাহার মধ্যে উপকার মূলক বাধ্যবাধকতা স্থাপনের আশা না থাকিলে গ্রহণ করা

উপঢৌকন গ্রহণ স্থলাবশেষে জোনৎ

জোনৎ। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) নজর গ্রহণ করিতেন। যদি জানা যায় যে উপস্থিত পদার্থের মধ্যে কিয়দংশ কেবল প্রীতি প্রদর্শনে দেওয়া হইতেছে আর কিছু ভাগ উপকার আদান প্রদানের মানসে দেওয়া হইতেছে, তবে যতটুকু শুধু প্রীতির জন্য উপঢৌকন দেওয়া হইতেছে, ততটুকু লইবে এবং অবশিষ্ট ফিরাইয়া দিবে।

মহাপুরুষ হজরত রসুল (ছাল্লাল্লাহু আলায়হে অছাল্লাম)-এর সমীপে এক ব্যক্তি কিছু ঘৃত, পনীর ও একটী ছাগল আনিয়াছিল; তিনি ঘৃত ও পনীর গ্রহণ পূর্ব্বক ছাগলটী ফেরৎ দিয়াছিলেন। মহাত্মা ফতেহ্ মুছলীর সম্মুখে কোন ব্যক্তি পঞ্চাশ দেরম মুদ্রা স্থাপন করিয়াছিল; তিনি একটী মুদ্রা তুলিয়া লইয়া আর সমস্ত ফিরিয়া দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন "হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে বিনা প্রার্থনায় কোন দ্রব্য কেহ সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক লইবার জন্য অনুরোধ করিলে যদি না লইয়া প্রত্যাখ্যান করা হয় তবে আল্লার দান প্রত্যাখ্যান করা হয়।" মহাত্মা হাছন বছরীও হদীছের এই বচন আবৃত্তি করিতেন কিন্তু একদা কোন ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পূর্ণ থলী এবং কয়েক থান বহুমূল্য বস্ত্র তাঁহার সম্মুখে নজর দিলে, তিনি গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে ব্যক্তি ছুফীর 'মজলেছ' (টীঃ ৩০৯) স্থাপন পূর্ব্বক লোকের নিকট কিছু লয়, সে মহাবিচারের দিন মহাবিচারককে ক্রুদ্ধ অবস্থায় দেখিতে পাইবে এবং আল্লার স্থানে কিছুই পাইবে না। তিনি হয়তো এই কারণে নজর গ্রহণ করেন নাই যে, ছুফীর 'মজলেছ' রক্ষণ হইতে পারলৌকিক পুণ্য-প্রাপ্তি তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আবার ইহাও হইতে পারে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সে ব্যক্তি উক্ত নজর 'ছুফী বিদ্যালয়ের' জন্যই দিতে আসিয়াছিল। তিনি মানুষের নিকট কিছু পাইবার আশা না করিয়া, কেবল আল্লার প্রসন্নতা প্রাপ্তির আশায় 'ছুফী বিদ্যালয়' খুলিয়াছিলেন; উহার জন্য দান গ্রহণ করিলে অভিলষিত পুণ্য হইতে তিনি বঞ্চিত হইবেন, এই ভয়েই তিনি উহা লন নাই। কোন ব্যক্তি তাহার এক বন্ধুকে কিছু দিতে গিয়াছিল। সেই বন্ধু বলিয়াছিল 'ভাই! কিছু বিলম্ব কর। "এই বস্তু দানে তোমার মনে আমার প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি হইবে কি না, বিবেচনা করিয়া দেখি; যদি ভালবাসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতে পাই, তবে গ্রহণ করিতেছি।' মহাত্মা ছুফিয়ান ছুরী কাহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিতেন না। তিনি দানেচ্ছুক ব্যক্তিকে বলিতেন—'আমাকে কিছু দিয়া

(টীকা ৩০৯) ছুফীর মজলেছ শব্দে ছুফীদিগের খানকা বুঝায়। পুস্তকের বিদ্যা শিক্ষার জন্য যেমন বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় এবং বিদ্যালয়ে যাহারা শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়, সকলেরই জ্ঞান ও পুণ্য বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক বিদ্যাশিক্ষার জন্য পূর্ব্বকালে 'মজলেছ' বা 'খানকা' স্থাপন করা হইত; তাহাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণের জ্ঞান ও পুণ্য বৃদ্ধি হইত। মহাত্মা হাছন বছরী একটি ছুফী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

যদি মুখে উচ্চারণ না কর, তবে লইতে পারি। এখন কিছু দিয়া পরে নিজের বাহাদুরী হাঁকিবে এবং আমার উপকার করিয়াছ বলিয়া গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিবে, তেমন দান লইতে পারি না।' কোন এক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি নিজের বিশেষ ধর্ম্মবন্ধুগণ ভিন্ন অপরের নিকট হইতে কিছুই লইতেন না। জ্ঞানী লোক মাত্রেই দানের সঙ্গে (এহছান) উপকারমূলক বাধ্য-বাধকতার বোঝা লইতে বড় ভয় করিতেন। মহাত্মা বশর হাফী বলিতেন 'আমি কাহার দান গ্রহণ করি না কেবল সরূরী সকতীর দ্রব্য লইয়া থাকি; তিনি যে এক জন উচ্চ শ্রেণীর (জাহেদ) ধন-বিরাগী অর্থাৎ তাঁহার হস্ত হইতে ধন বাহির হইয়া গেলে যে তিনি সুখী হন, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি।' (৫) যাহারা দান করিয়া স্বীয় দানের ডঙ্কা বাজাইতে ইচ্ছা করে, অথবা নাম বা যশের আশায় লোক দেখাইয়া দান করিতে চায়, তাহাদের দান গ্রহণ করা উচিত নহে। কোন এক জন ধনী লোক এক জন সাধুকে কিছু দিয়াছিল। সাধু তাহা গ্রহণ করেন নাই। তদ্দর্শনে উপস্থিত দর্শকগণ দরিদ্র সাধুর উপর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নানা কথা বলিতেছিল। সাধু মহাদয় বলিতেছিলেন—'দেখ, ভ্রাতৃগণ! দাতার উপর দয়া করিয়াই আমি ফেরৎ দিয়াছি। দানের পর ঐ ব্যক্তি লোকের নিকট দানের বাহাদুরী প্রকাশ করিয়া বেড়াইলে তাহার দ্রব্যও যাইত এবং পুণ্যও নষ্ট হইত।' (৬) যাহা হউক, দাতা, গরীব দুঃখীর অভাব মোচনের ইচ্ছাতেই প্রকৃত প্রস্তাবে বিতরণ করিতেছেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা গেলে, গৃহীতা প্রথমে নিজকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে, সে উহা লইবার উপযুক্ত কি না। যেরূপ অভাবগ্রস্তকে দাতা দান করিতে ইচ্ছা করেন, তদ্রূপ অভাবগ্রস্ত না হইলে কখনই লইবে না। (৭) কিন্তু নিজে কোন অভাবে আবদ্ধ থাকিয়াও দান না লইয়া ফেরৎ আসা উচিত নহে। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—"বিনা প্রার্থনায় যাহা লোকে দেয়, তাহা আল্লার প্রেরিত উপজীবিকা মনে করা কর্ত্তব্য।" আবার জ্ঞানী লোকেরাও বলিয়াছেন—'কোন বস্তু দিতে গেলে যে ব্যক্তি ঘৃণা পূর্ব্বক না লয়, সে ব্যক্তি এমন বিপদে জড়িত হইবে যে, প্রকৃত অভাবে পড়িয়া চাহিতে গেলেও কেহ তাহাকে কিছু দিবে না।' মহাত্মা সরূরী সকতী যখন ইমাম আহমদ হাম্বল ছাহেবকে কিছু না কিছু পাঠাইতেন, তখনই তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া ফিরিয়া পাঠাইতেন। উক্ত মহাত্মা এক দিন ইমাম ছাহেবের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন 'হে

আহ্‌মদ প্রত্যাখ্যান করিলে যে বিপদ্‌পাত হয়, তাহা হইতে ভয় কর।' ইমাম ছাহেব বলিলেন—'প্রত্যাখ্যান সম্বন্ধে কি বলিলেন?' শেখ মহোদয় কথাটা ভাঙ্গিয়া বলিলেন যে, যখনই তিনি কিছু পাঠাইতেন, তখনই ইমাম ছাহেব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। প্রত্যাখ্যান করিলে যে বিপদ্‌পাত হয়, তাহার প্রমাণ করিতে হদীছের উক্ত বচনও তিনি আবৃত্তি করিলেন। তখন ইমাম ছাহেব বিশেষ চিন্তার পর প্রত্যাখ্যানের কারণ স্মরণ পূর্ব্বক বলিযাছিলেন—'আচ্ছা ভাই! এখন আমার হাতে এক মাসের উপযোগী খাদ্য দ্রব্যাদি জমা আছে। তুমি ঠিক একমাসের পর পাঠাইবে, তখন আর ফেরৎ যাইবে না।'

কোন্ স্থলে ও কি ভাবে ভিক্ষা চাওয়া সঙ্গত এবং কোন স্থলে অসঙ্গত—পাঠক! জানিয়া রাখ—যতগুলি ঘৃণিত কার্য্য আছে, তন্মধ্যে ভিক্ষা করা একটী জঘন্যতম ঘৃণিত কার্য্য। অভাবের তাড়নায় না পড়িলে ঘৃণিত কার্য্য সঙ্গত হয় না। ভিক্ষা করা তিন কারণে ঘৃণিত কার্য্যের অন্তর্গত। প্রথম কারণ—নিজের অভাব প্রকাশ করিলে মহাপ্রভুর বিধানের প্রতি নিন্দা করা হয়। ভৃত্য যদি অন্যের নিকট কিছু খাদ্য প্রার্থনা করে, তবে ইহা বুঝা যায় যে, তাহার প্রভু তাহাকে আবশ্যকীয় খাদ্য দেয় না বলিয়াই সে অন্যের নিকট চাহিতেছে; তাহাতে প্রকারান্তরে প্রভুর নিন্দা করা হয়।

ভিক্ষাকে হারাম (ঘৃণিত কার্য্য) বলিবার ত্রিবিধ কারণ

(১) অবশ্য অভাবে ঠেকিয়া এবং নিন্দার গন্ধ পর্য্যন্ত প্রকাশ না পায়, এমন ভাবে চাহিলে দোষ নাই। দ্বিতীয় কারণ এই যে—লোকের নিকট চাহিলে নিজকে হেয় ও অপদার্থ বানান হয়। এক আল্লা ভিন্ন অন্য কাহারও সম্মুখে নিজকে হেয় ও তুচ্ছ করা মুসলমান লোকের উচিত নহে। অভাবে পড়িয়াও নিজকে লোকের সম্মুখে ঘৃণিত হইতে না দিবার উপায় এই যে, যতদূর সম্ভব বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন, অথবা উদারচিত্ত দয়ালু লোকের নিকট চাহিবে, তদ্‌ভিন্ন অন্য লোকের সম্মুখে হাত পাতিবে না। (২) তবে নিতান্ত কঠিন অভাবে পড়িলে অগত্যা অপরের সম্মুখেও হাত পাতা যাইতে পারে, কিন্তু অভাব তত কঠিন না হইলে এবং আত্মীয় বন্ধু ও উদার হৃদয় দয়ালু লোক থাকিলে অপরের নিকট কিছু চাওয়া উচিত নহে। ভিক্ষা কার্য্য জঘন্য হইবার তৃতীয় কারণ এই যে, যাহার স্থানে চাওয়া যায়, তাহাকে কষ্ট দেওয়া হয়। দেখ, যাহারা আন্তরিক ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া দেয় না, তাহাদিগের স্থানে কিছু চাহিলে, হয়তো সে চক্ষু লজ্জায় বাধ্য

হইয়া অথবা অপরের প্রশংসা পাইবার বাসনায় কিছু দিতে সম্মত হয়। 'না দিলে' লোকে নিন্দা করিবে, এই ভয়টী দণ্ডধারী পিয়াদার ন্যায় তাহার অন্তর মধ্যে দাঁড়াইয়া বিভীষিকা প্রদর্শনে তাহাকে কিছু দিতে বাধ্য করে। আর প্রশংসা প্রীতি তাহাকে 'নামের লোভে' পাগল করিয়া তাহার হাত হইতে কিছু কাড়িয়া লইয়া দিয়া থাকে। এই দুই প্রবৃত্তি অর্থাৎ 'নিন্দা-ভয়' ও 'প্রশংসা-প্রীতির' বিনা উত্তেজনায় যে ব্যক্তি কিছু দিয়া ফেলে, সে কিছুক্ষণ পরে হয়তো এই বলিয়া অনুশোচনা আরম্ভ করে যে, "হায়! কেন দিলাম, দিয়া কেন ধন-ক্ষয় করিলাম।" এরূপ লোক আন্তরিক অনুরাগে দেয় না হয়তো উক্ত প্রকার কষ্টে পড়িয়াই দিয়া থাকে। অথবা দানের পর অনুতাপ করিয়া কষ্ট পায়। আবার দেখ, যাচকের কাতর প্রার্থনাতেও যাহার হৃদয় গলে না—ভিক্ষুককে নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দেয়, তদ্রূপ লোককে সকলে নিন্দা করে। সুতরাং লোকের নিন্দা ভাজন হইয়া তাহাকে কষ্টে পড়িতে হয়। তবেই দেখ, যাহারা আন্তরিক অনুরাগে দান করে না, তাহাদের স্থানে কিছু চাহিলে তাহাদিগকে উভয় সঙ্কটে ফেলিয়া কষ্ট দেওয়া হয়। (৩) দিলে ধনক্ষয় জন্য অনুশোচনা এবং না দিলে নিন্দা ভাজন হইয়া মনঃকষ্ট পাইতে হয়। তদ্রূপ লোকের স্থানে কিছু না চাহিয়া তদ্রূপ কষ্ট হইতে অব্যাহতি দেওয়াই ভাল। (৪) নিতান্ত কঠিন অভাবে পড়িয়া যদি চাহিতেই হয়, তবে প্রকাশ্য ভাবে সোজাসুজী না চাহিয়া প্রকারান্তরে চাওয়া উচিত। তদ্রূপ প্রার্থনা, বুঝিতে পারে নাই বলিয়া যদি সে ভাণ করে এবং পূর্ব্বোক্ত কষ্ট হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করে, তবে তাহাকে সে সুযোগ দেওয়া উচিত। (৫) আর যদি প্রকাশ্য ভাবেই চাহিতে হয়, তবে এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য না করিয়া তথাকার সকল লোককে সমবেত সম্বোধন পূর্ব্বক চাওয়া উচিত। তদ্রূপ ভাবে চাহিলে কোন ব্যক্তি-বিশেষকে পূর্ব্বোক্ত রূপ কষ্টে ফেলান হয় না। কিন্তু সে স্থলেও যদি সমবেত লোকের মধ্যে মাত্র এক জন ধনী লোক থাকে, এবং অপর লোক সেই ধনীর আশাধারীরূপে উপস্থিত থাকে, তবে সমবেত ভাবে চাহিলেও তথায় সেই ধনীর প্রতিই লক্ষ্য করা হয় এবং তজ্জন্য তাহাকে কষ্টে ফেলান হয়। (৬) যে ধনীর প্রতি জকাৎ দেওয়া ওয়াজেব হইয়াছে, তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক উপযুক্ত ব্যক্তিকে জকাৎ দিতে অনুরোধ করিলে যদি সে ধনী পূর্ব্বোক্ত প্রকার কষ্ট অনুভব করে, তবেও সঙ্গত হইবে। তুমি স্বয়ং অভাবে পড়িলে অর্থাৎ জকাৎ গ্রহণের

উপযুক্ত হইলে, যে ধনীর উপর জকাৎ দেওয়া কর্ত্তব্য হইয়াছে, তদ্রূপ ধনীর স্থানে পরিষ্কার ভাবে জকাৎ চাহিলেও সঙ্গত হইবে। তদ্ভিন্ন, ধনী ব্যক্তি চক্ষু লজ্জায় জড়িত হইয়া বা প্রশংসা পাইবার আশায় মুগ্ধ হইয়া কিছু দিতে গেলে গ্রহণ করা হারাম। কেননা তদ্রূপ দান গ্রহণ করা বল পূর্ব্বক কাড়িয়া লওয়া তুল্য। আমাদের এ কথা প্রকাশ্য বিধান-শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিবে না। প্রকাশ্য আইনে, দান প্রকাশক বাক্য লইয়া বিচার হয়। তদ্রূপ বিচার পৃথিবীর রাজা ও বিচারকদিগের আইনে সঙ্গত বলিয়া সংসারের কাজেই সীমাবদ্ধ; কিন্তু পরকালের বিচার অন্তরের ভাব লইয়া নিষ্পত্তি হইবে সুতরাং মনে যখন বুঝা যাইবে যে দাতা অসন্তুষ্ট হইয়া দান করিতেছে, তখন সে দান গ্রহণ হারাম হইবে। এ পর্য্যন্ত যাহা বলা গেল তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে—"যাচ্ঞা করাই হারাম"। তবে কঠিন দায়ে পড়িলে, অভাবের চাপে অন্যের নিকট চাওয়া যাইতে পারে।

(৭) আড়ম্বর ও ভড়ক বাড়াইবার বাসনায় কিম্বা সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদের জন্য অথবা উপাদেয় খাদ্য ভোজন করিবার নিমিত্ত ভিক্ষা চাওয়া নিতান্তই অনুচিত। (৮) যে সকল অঙ্গহীন ব্যক্তি, শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিতে অক্ষম অথচ একেবারে নিঃস্ব, উপার্জ্জনের পন্থা বা শিল্পব্যবসায়ও জানে না, তেমন লোকের পক্ষে ভিক্ষা চাওয়া সঙ্গত (৯) তদ্রূপ, যাহারা বিদ্যার্জ্জনে নিযুক্ত আছে কোন শিল্প ব্যবসায় করিবার অবসর পায় না—ব্যবসায় বাণিজ্যে ধনোপার্জ্জন করিতে গেলে বিদ্যার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে, তদ্রূপ নিঃস্ব শিক্ষার্থী অন্যের নিকট যাচ্ঞা করিতে পারে; কিন্তু যাহারা বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত না থাকিয়া, এবাদৎ কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহারা যেন সহজে অন্যের নিকট ভিক্ষা না চায়, বরং স্ব স্ব অভাব মোচনের জন্য কোন না কোন শিল্প বাণিজ্য অবলম্বন করা তাহাদের পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য। আবার দেখ, আহারের অভাব হইবা মাত্র বিদ্যাশিক্ষার্থীকে প্রথমেই অন্যের সম্মুখে ভিক্ষার্থ হাত পাতা কর্ত্তব্য নহে। অগ্রে অনাবশ্যক পুস্তকাদি বিক্রয় পূর্ব্বক আহারের সংস্থান করিবে; তাহা নিঃশেষ হইবার পর অন্যের নিকট হাত পাতা সঙ্গত। এইরূপ অতিরিক্ত জায়নমাজ পিরাহান বা তহবন্দ থাকিলে ভিক্ষা করিয়া খাওয়া হারাম। এরূপ বিদ্যার্থীকেও তদ্রূপ অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করা উচিত। সাধারণতঃ সকল প্রকার লোকের পক্ষে, নিজের বা নিজ পরিবারের সাংসারিক

স্থলভেদে শিক্ষার্থীগণের ভিক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে মতামত

অবস্থা সচ্ছল করিতে অথবা ধুমধামের সহিত দিনপাত করিবার জন্য ভিক্ষা করা হারাম।

কি পরিমাণ বস্তু অধিকারে থাকিলে ভিক্ষা অনুচিত— মহাপুরুষ হজরৎ রসুলে (ﷺ) বলিয়াছেন--'যে ব্যক্তি নিজের অধিকারে বিক্রয়ের উপযুক্ত দ্রব্য রাখিয়া ভিক্ষা করে, পরকালে তাহার বদন-মণ্ডলের সমস্ত মাংশ পেশী খসিয়া পড়িবে, কেবল কয়েক খানা অস্থি মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে।' তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—'নিজের অধিকারে কোন বস্তু রাখিয়াও যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে, ভিক্ষা-লব্ধ বস্তু অল্পই হউক বা অধিকই হউক তৎ সমস্তই দোজখের অগ্নি হইবে।' উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'হে রসুলুল্লা! কি পরিমাণ বস্তু অধিকারে থাকিলে ভিক্ষা চাওয়া যায় না?' এই প্রশ্নের উত্তরে দুইটী হদীছ-বচন কথিত হইয়াছে। এক বচনে প্রকাশ যে, দিন রাত্রের মধ্যে দুই বেলার আহার হাতে থাকিলে ভিক্ষা চাওয়া হারাম। অন্য বচনে প্রকাশ যে, পঞ্চাশ দেরেম মুদ্রা হাতে থাকিলে অন্যের স্থানে আবার চাওয়া হারাম। শেষোক্ত বচনের অর্থ এই যে, পঞ্চাশ দেরেম পরিমিত রৌপ্য মুদ্রা হাতে থাকিলে এক ব্যক্তির সম্বৎসরের ব্যয় চলিতে পারে। যে দেশে বৎসরের মধ্যে এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে দান খয়রাৎ বিতরণ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে, সে দেশে অক্ষম অথচ নির্ধন লোকের হাতে পঞ্চাশ দেরেম রৌপ্য না থাকিলে দান বিতরণের সময়ে ভিক্ষা করিয়া সম্বৎসরের আবশ্যকীয় ব্যয়ের পরিমিত অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়; নতুবা সম্পূর্ণ বৎসর ধরিয়া তাহাকে অনাহারে কষ্ট ভোগ করিতে হয়। আর যে দেশে ভিক্ষুকগণের পক্ষে প্রত্যহ ভিক্ষা পাইবার উপায় আছে সে দেশে প্রাতঃ সন্ধ্যা দুই বেলার পরিমিত আহারের সংস্থান না থাকিলে ভিক্ষা করিবার অনুমতি আছে। যে দেশে বৎসরের মধ্যে এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে দান বিতরণ হয় সে দেশের এক বৎসর, এবং যে দেশে প্রত্যহ বিতরণ হয় সে দেশের এক দিন, সমস্থানীয় বলিয়া ধরা গিয়া থাকে। মানুষের পক্ষে তিন প্রকার দ্রব্যের অভাব হয়—(১) অন্ন; (২) বস্ত্র; (৩) গৃহ। মহাপুরুষ হজরৎ রসুলে (ﷺ) ও বলিয়াছেন—"অন্ন, বস্ত্র ও গৃহ এই তিন বস্তু ভিন্ন সংসারে অন্য কোন পদার্থে মানবের ভাগ নাই; অন্ন, দেহ রক্ষার প্রধান সহায়; বস্ত্র আবরু শরম ঢাকিয়া রাখে ও শীত গ্রীষ্ম হইতে দেহ বাঁচায়: গৃহ মানবকে রৌদ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষা করে। গৃহ সামগ্রী ও তৈজস পত্র

ঐ ত্রিবিধ পদার্থেরই অন্তর্গত। বাহনাশ্বের শরীরাচ্ছাদনের জন্য 'চার জামা' এবং নিজের শরীর ঢাকিবার 'শীতোড়ী' বা 'ওড়না' থাকিলে, কম্বল ও লেপের (টীঃ ৩১০) জন্য ভিক্ষা করা উচিত নহে। জল পাত্রের জন্য মাটীর ভাঁড় থাকিলে, ধাতুর লোটা বা ঘটীর জন্য ভিক্ষা করা অনুচিত। আবশ্যকতার সীমা নির্দ্ধারণ করা বড় কঠিন। কঠিন অভাবে পড়িলে তো অবশ্যই অপরিহার্য্য দ্রব্যের আবশ্যক হয় আবার সুখ সচ্ছন্দ বা বিলাসের জন্যও বহু বস্তুর প্রয়োজন হয়। তবে কথা এই, যে পর্য্যন্ত কঠিন অভাব উপস্থিত না হয় ততক্ষণ কিছু চাওয়া উচিত নহে। যাচ্ঞা করা বড় ঘৃণিত কার্য্য (টীঃ ৩১১।)

অবস্থা ভেদে দরিদ্রের শ্রেণী বিভাগ—ত্রিবিধ। পাঠক! বুঝিয়া রাখ, অবস্থা ভেদে দরিদ্রের নানা শ্রেণী হয়। মহাত্মা বশর হাফী বলিতেন—"দরিদ্র লোক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। **প্রথম** শ্রেণীর দরিদ্র, স্বয়ং কাহারও নিকট কিছু চান না এবং অন্যে উপযাচক হইয়া দিতে গেলেও গ্রহণ করেন না। এই প্রকার দরিদ্র 'আলা ইল্লীন' নামক উচ্চাদপি উচ্চ বেহেশ্‌তে স্বাধীন আত্মার সঙ্গে একত্র বাস করিবেন। **দ্বিতীয়** শ্রেণীর দরিদ্র, স্বয়ং কাহারও স্থানে কিছু চান না, তবে কেহ কিছু ইচ্ছা পূর্ব্বক দিতে গেলে গ্রহণ করেন, এরূপ দরিদ্র 'ফেরদওছ' নামক উচ্চ বেহেশ্‌তে আল্লার প্রিয়তম ঘনিষ্ঠ লোকের সঙ্গে বাস করিবেন। **তৃতীয়** শ্রেণীর দরিদ্র অন্যের স্থানে চান বটে কিন্তু কঠিন অভাবে না পড়িলে চান না; এই

টীকা—৩১০। তুলা পুরা শীতের ওড়নাকে আরবীতে لحاف লেহাফ বলে। উহারই অপভ্রংশে বাংলায় 'লেপ' হইয়াছে। শুদ্ধ কথা লেহাফ লিখিলে পাঠক সহজে বুঝিতে পারিবে না বলিয়া বিকৃত "লেপ" শব্দই লিখা গেল।

টীকা—৩১১। প্রতিপাদ্য কথাটী মূল গ্রন্থেও পরিস্ফুট হয় নাই। অনুবাদেও হইল না। উদাহরণ না দিলে বুঝা যাইবে না। পিপাসা লাগিলে জল পানের আবশ্যক হয়। কঠিন পিপাসার সময়ে জলের অভাব হইলে অন্যের স্থানে চাওয়া সঙ্গত। পানীয় জলের নানা প্রকার ভেদ আছে—কূপের জল, নদীর জল, উৎস জল, তাহার উপর বরফ মিশ্রিত শীতল জল, শর্করাদি মিশ্রিত মিষ্ট জল বা শরবৎ। শরবতের সঙ্গে বরফ বা গোলাব কেওড়া মিশাইলে পরম উপাদেয় মনোহর পানীয় প্রস্তুত হয়। পিপাসার সময়ে অনায়াস লব্ধ কূপাদির জল পরিত্যাগ করতঃ বরফ-শীতল-সুগন্ধ শরবৎ ভিক্ষা করা উচিত নহে। তবে জ্বরাদি রোগে আক্রান্ত হইলে ঔষধের নিমিত্ত কঠিন আবশ্যকতা উপস্থিত হইলে এবং ক্রয়ের সুযোগ ও সম্বল না থাকিলে চাহিয়া লওয়া সঙ্গত।

শ্রেণীর দরিদ্র 'আছ্হাবোল ইয়ামীন' (টীঃ ৩১২) নামক শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ-পুরুষগণের সহিত নির্ম্মুক্ত ভাবে বেহেশ্তে বাস করিবেন।"

পূর্ণ গুণবান দরিদ্র লোকের দৃষ্টান্ত ও তাঁহাদের অলৌকিক ক্ষমতার বিবরণ—মহাত্মা এব্রাহাম আদ্হম স্বীয় প্রিয় বন্ধু শকীককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হে শকীক্! তুমি গৃহ ত্যাগের সময়ে দরিদ্র সমাজকে কি অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছ?" শকীক বলিয়াছিলেন—"তাহাদিগকে আমি পরিতুষ্ট দেখিয়া আসিয়াছি—তাহারা যখন কিছু পাইত তখন আল্লাকে ধন্যবাদ দিয়া ভোগ করিত কিন্তু যখন না পাইত তখন সন্তুষ্ট চিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিত।" মহাত্মা এব্রাহীম বলিয়াছিলেন "আমি যখন বল্খ্ দেশ ত্যাগ করিয়া আসি তখন তথাকার কুকুর গুলিকেও সেই অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছি।" মহাত্মা শকীক্ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনার বিচারে দরিদ্রদিগকে কি প্রকার গুণবান হওয়া আবশ্যক?" শেখ মহোদয় বলিয়াছিলেন—"যে দরিদ্র হইবে, সে কিছু না পাইলেও আল্লাকে ধন্যবাদ দিবে এবং যদি কিছু পায় তবে কিয়দংশ নিজের অভাব মোচনে ব্যয় করিবে আর কিয়দংশ অপর অভাবী দরিদ্রদিগের মধ্যে বিলাইয়া দিবে।" মহাত্মা শকীক্, শেখ মহোদয়কে চুম্বন করিয়া বলিলেন—"আপনার কথা যথার্থ।" কোন সাধু ব্যক্তি বলিয়াছেন "আমি মহাত্মা আবুল-হাছন নূরীকে রাজপথে দুই হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য মনে করিয়াছিলাম; এবং মহাত্মা জোনায়েদ বগ্দাদীর সমীপে উপস্থিত হইয়া, সেই কথা জ্ঞাপন করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন—'তুমি কখনই মনে করিও না যে নূরী মহোদয় মানুষের স্থানে কিছু চাহিতেছেন বরং মানুষের মঙ্গলের জন্য তিনি দুই হস্ত বিস্তার করতঃ আল্লার স্থানে অনুগ্রহ চাহিতেছেন।' এই কথা বলিয়া মহাত্মা জোনায়েদ আমাকে এক খানি নিক্তি আনিতে আদেশ দিলেন। আমি তাহা লইয়া আসিলে তিনি স্বহস্তে এক শত দেরেম চাঁদী ওজন করিয়া এক পাত্রে রাখিলেন এবং পশ্চাৎ তৎসঙ্গে এক মুষ্টি চাঁদী বিনা ওজনে মিশাইয়া আমাকে ঐ সমস্ত লইয়া গিয়া মহাত্মা নূরীকে দিতে বলিলেন। আমি চমৎকৃত হইলাম। পরিমাণ জানিবার জন্য লোকে ওজন করে ইনি এক শত দেরেম ওজন করিবার পরে বিনা ওজনে এক মুষ্টি চাঁদী

টীকা—৩১২। 'আছহাবোল্ ইয়ামীন' শব্দের অর্থ 'এব দৎ পুস্তকে' ১২৪ নং টীকায় দ্রষ্টব্য।

তৎসঙ্গে মিশাইয়া দিয়া সমস্ত দ্রব্যের পরিমাণ অনিশ্চিত করিয়া দিলেন। যাহা হউক, আমি পাত্রটী রৌপ্য খণ্ড গুলি সহ লইয়া গিয়া মহাত্মা আবুল হাছন নূরীর সমীপে স্থাপন করিলাম। তিনিও আমাকে একখানি নিক্তি আনিতে আদেশ করিলেন। নিক্তি আনিলে, তিনি এক শত দেরেম রৌপ্য খণ্ড ওজন করিয়া মহাত্মা জোনায়্দকে ফেরৎ দিবার জন্য আমার হস্তে প্রদান করিলেন এবং অবশিষ্ট রৌপ্য গ্রহণ করিলেন, এবং বলিলেন—'হাঁ, বাস্তবিকই জোনায়্দ মহা চতুর লোক; তিনি দীর্ঘ রর্জ্জুর উভয় প্রান্ত যুগপৎ সমান ভাবে দর্শন করিতে চান।' আমি নূরী মহোদয়ের কার্য্য দর্শনে ও বাক্য শ্রবণে নিরতিশয় চমকৃত হইলাম। যে এক শত দেরেম চাঁদী মহাত্মা নূরী ফেরত দিয়াছিলেন তাহা হজরৎ জোনায়্দের সমীপে স্থাপন করতঃ সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলাম। তিনি বলিলেন—'আল্লাই ধনী! তাঁহারই ধন্যবাদ! যে পরিমাণ চাঁদী তাঁহার উদ্দেশ্যে ছিল তাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন; আর যাহা আমার জন্য ছিল, তাহা ফেরত দিয়াছেন।' আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'ইহার অর্থ কি?' তিনি বলিলেন—'দেখ, প্রেরিত রৌপ্যের মধ্যে এক শত দেরেমের পুণ্য আমি পরকালে পাইবার আশায় পাঠাইয়াছিলাম আর অবশিষ্টগুলি নিঃস্বার্থ ভাবে কেবল আল্লার প্রসন্নতার জন্য দিয়াছিলাম। যাহা আল্লার জন্য দেওয়া হইয়াছিল, তাহা তিনিও আল্লার জন্য গ্রহণ করিয়াছেন, আর এক শত দেরেম যাহা আমি স্বার্থের জন্য অর্থাৎ পরকালে পুণ্য পাইবার আশায় পাঠাইয়াছিলাম, তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া ফেরৎ দিয়াছেন।'" যাহা হউক, পূর্ব্বকালের দরিদ্র লোক এইরূপ পূর্ণ গুণবান্ হইতেন। তাঁহাদের অন্তর এতদূর পর্য্যন্ত পরিষ্কার ছিল যে, অপরের হৃদয় মধ্যস্থ গুপ্ত ভাবও তাঁহারা জানিতে পারিতেন। এখনকার দরিদ্রগণ যদি তদ্রূপ ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে না পারে তবেও তাহা পাইবার আশা করা উচিত। তদ্রূপ ক্ষমতা পাইবার আশা করিতে যদিও না পারে তথাপি এ কথাটী বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য যে, দরিদ্রের ভাগ্যে তদ্রূপ অলৌকিক ক্ষমতা ঘটিয়া থাকে।

জোহ্দ বা বৈরাগ্যের পরিচয়—পাঠক! বুঝিয়া দেখ—কোন এক ব্যক্তি গ্রীষ্মকালে প্রবল পিপাসার সময়ে বরফ সংযোগে পানীয় জল শীতল পূর্ব্বক পরম সুখে পান করিবার আশায় কিছু বরফ সংগ্রহ

করিল; ইতিমধ্যে অন্য একজন লোক আসিয়া বলিল দেখ ভাই! তোমার বরফের পরিবর্ত্তে আমি সম ওজনে এই বিশুদ্ধ স্বর্ণ দিতেছি, তুমি স্বর্ণ লইয়া বরফগুলি বিক্রয় কর। তখন বরফ-স্বামী অবশ্যই এরূপ চিন্তা করিবে—বরফ গলনশীল পদার্থ; অধিকক্ষণ থাকিবে না; রজনী আসিতে আসিতে সমস্ত গলিয়া জল হইবে; ইহার পরিবর্ত্তে যদি চিরস্থায়ী স্বর্ণ পাওয়া যায় তবে তাহা বহুদিন আমার উপকারে আসিবে; ক্রমশঃ উহার বিনিময়ে নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত পরম সুখে ভোগ করিতে পাইব। অদ্যকার এক বেলা বা একটী দিন সুশীতল জল পানের লোভ সম্বরণ পূর্ব্বক, এই সাধারণ জলে তুষ্ট থাকিতে পারিলে, আজীবন ঐ স্বর্ণে নানা সুখ ভোগ করিতে পাইব। এই প্রকার চিন্তা করিলে, বরফ-শীতল জল পানের লালসা আর তাহার মনে তিষ্ঠিতে পারিবে না। চির-হিতকর স্বর্ণ লাভের আশায়, ক্ষণস্থায়ী বরফ-লালসা ত্যাগ করাকে এস্থলে زهد (জোহ্‌দ) বা বৈরাগ্য বলা যায়। বরফ সম্বন্ধে উক্ত ব্যক্তির বৈরাগ্য যে কারণে ও যে প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছিল, 'সংসারের' সম্বন্ধে, চক্ষুষ্মাণ্‌ জ্ঞানী লোকের বৈরাগ্যও সেই কারণে এবং সেইরূপে উৎপন্ন হয়। তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পান সংসার সর্ব্বদাই চলিয়া যাইতেছে,—পরমায়ু প্রতি পলকে বরফের ন্যায় হ্রাস পাইতেছে মৃত্যুর সময়ে সমস্তই শেষ হইয়া যাইবে। তাঁহারা পরকালের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহাকে পরিষ্কার ও অটল অচল বলিয়া বুঝিতে পারেন। মৃত্যুকালে যে পরকাল আরম্ভ হইবে তাহার আর শেষ নাই। এমন অবস্থায় জ্ঞানী লোকেরা ইহকালকে, পরকালের তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং সেই চিরস্থায়ী পরকাল লাভের জন্য ইহকালকে হৃষ্টচিত্তে বিক্রয় করিতে উৎসুক হন। ফল কথা,—সংসারের প্রতি বিরাগী হইয়া এবং ইহা ছাড়িয়া দিয়া পরকালকে মজবুৎ করিয়া ধরিয়া লন। ইহাকেই প্রকৃত জোহ্‌দ বা বৈরাগ্য বলে।

বৈরাগ্যের মধ্যে কয়েকটী অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য—(পাঠক জানিয়া রাখ) বৈরাগ্যের মধ্যে কয়েকটী অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য আছে; তন্মধ্যে (১) একটী কর্ত্তব্য এই যে—ইহসংসারের নির্দ্দোষ আনন্দগুলিও পরিত্যাগ করা উচিত। ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নিষিদ্ধ পদার্থ তো সকলেই ক্ষতিকর জ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে পারে। হারাম পদার্থ সভয়ে পরিত্যাগ করা সকলের উপর

উপর ফরজ; কিন্তু নির্দ্দোষ আনন্দ পরিত্যাগ করিতে অসীম মানসিক বলের প্রয়োজন। (২) প্রকৃত বিরাগী লোকের আর একটী কর্ত্তব্য এই যে সংসারের প্রত্যেক বিভাগ ভোগের অমোঘ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উহা পরিত্যাগ করিবার প্রচুর শক্তি থাকা আবশ্যক। সংসারের কোন পদার্থই সে ব্যক্তি পায় নাই, পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা, তাহার কোথা হইতে আসিবে? তবে যাহার কিছুই নাই তাহাকে কিছু দিলে সে যদি নির্ব্বিকার মনে ত্যাগ করিতে পারে তবে তাহাকে বিরাগী বলা যাইতে পারে। কিন্তু তদ্রূপ লোক বস্তু পাইয়া নির্ব্বিকার মনে পরিত্যাগ করিতে পারে কি না, পরীক্ষা না করিলে বলা যায় না। বিনা পরীক্ষায় তাহার সেই ত্যাগ-ক্ষমতার অস্তিত্বের সাক্ষী দেওয়া যায় না। সংসার হাতে আসিলেই মানবের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়। অনেক লোকে অনুমান করে, পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা আমার যথেষ্ট আছে; কিন্তু হস্তগত হইবামাত্র সে কুহেলিকা ঘুচিয়া যায়। তখন প্রাপ্ত পদার্থ পরিত্যাগ কালে মনের উপর কিছু না কিছু ভাবান্তর না ঘটাইয়া যায় না। এই জন্য, আজন্ম দরিদ্রের ত্যাগ-ক্ষমতা আছে কি না বলা যায় না। (৩) প্রকৃত পরহেজগার অর্থাৎ বিরাগী লোকের আর একটী কর্ত্তব্য এই যে, তাহাদিগকে এই সংসারের সর্ব্ববিধ ধন ও মান পরিত্যাগ করা উচিত, তৎসমুদয় রক্ষণে কিছু মাত্র চেষ্টা করা উচিত নহে। (৪) যাহা হউক, সংক্ষেপ কথা এই যে সংসারের সর্ব্ববিধ আনন্দ ও সুখ গুলি বিক্রয় করিয়া পরকালের আনন্দ ক্রয় করিয়া লওয়া প্রকৃত পরহেজগার বা বিরাগীর কর্ত্তব্য। এই ক্রয় বিক্রয়কে এক প্রকার ব্যবসায় বলা যায়। এই ব্যবসায়ে বড় লাভ আছে। মহাপ্রভু বলিতেছেন—

إِنَّ اللهَ اشْتَرٰي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ

وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

"নিশ্চয়ই আল্লা মুছলমান লোকের নিকট হইতে তাহাদের প্রাণ ও ধন বেহেশ্‌তের বিনিময়ে ক্রয় করিয়াছেন।" (১১ পারা। সূরা তওবা। ১৪ রোকু।) তিনি পুনরায় বলিয়াছেন—

فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ

"যাহা হউক, (হে মুছলমানগণ !) তোমরা আল্লার সঙ্গে যে খরিদ বিক্রয়ের কারবার করিয়াছ তজ্জন্য আনন্দ প্রকাশ কর।" (১১ পারা। সূরা তওবা। ১৪ রোকূ।) এই দুই আয়াতের মর্ম্ম এই যে মহাপ্রভু আল্লা, মুছলমানদিগের দেহ ও ধন, যাহা সর্ব্বদাই বরফের ন্যায় গলিয়া নষ্ট হইতেছে তাহা লইয়া স্থায়ী বেহেশ্‌ৎ মূল্য স্বরূপ দিতে প্রস্তুত আছেন। এই ব্যবসায়ে তোমাদেরও প্রভূত মঙ্গল ও মহা লাভ হইবে।

প্রকৃত বৈরাগ্যের পরিচয়—পাঠক! এস্থলে এ কথাও বুঝিয়া রাখ যে—নিজের বদান্যতা ও দানশীলতা জন-সমাজে প্রদর্শন মানসে অথবা পরকাল ভিন্ন অন্য কিছু পাইবার বাসনায় ইহসংসার বিক্রয় করা বৈরাগ্য নহে। আবার পরকাল পাইবার আশায় ইহকাল বিক্রয় করা চক্ষুষ্মাণ জ্ঞানীর নিকট একটী তুচ্ছ ধরণের বৈরাগ্য। তাঁহারা ইহজীবনের পরিবর্ত্তে পরকালের সুখও চান না। পরকালের বেহেশ্‌ৎ মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, উদর ও কাম প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তু আছে। যে সকল পদার্থে, উদর কাম প্রভৃতি ইন্দ্রিয় পরিতুষ্ট হয়, তাহা পশুগণও ভোগ করিতে পায়; এই জন্য তাঁহারা বেহেশ্‌ৎকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন; এবং ইন্দ্রিয় ভোগ্য বেহেশ্‌ৎ পাইতে উৎসুক না হইয়া স্বীয় জ্ঞানের মর্য্যাদা রক্ষা করতঃ কেবল মাত্র আল্লাকে পাইতে চান এবং তাঁহারই দর্শন ও পরিচয় সম্ভূত আনন্দে পরিতৃপ্ত হন। প্রকৃত সংসার-বিরাগী-লোক আল্লার প্রসন্নতা ও তাঁহার দর্শন-সম্ভূত-আনন্দ পাইবার জন্য ইহকালের সমস্ত বিক্রয় করিয়া থাকেন। এরূপ বিরাগী লোক সাংসারিক ধনৈশ্বর্য্য হইতে পলায়ন না করিলেও কোন ক্ষতি নাই বরং ধন পাইয়া নির্ব্বিকার মনে তাহার সদ্ব্যবহার করা এবং প্রকৃত অভাবীদিগের মধ্যে বিতরণ করা প্রকৃত বৈরাগ্য। আমীরোল মোমেনীন হজরৎ ওমর ঐরূপই করিতেন। তাঁহার হস্তে সসাগরা ধরার অসীম ধন রাজকর স্বরূপ আসিত কিন্তু তিনি তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন এবং অভাবগ্রস্ত লোকের মধ্যে অজস্র বিতরণ করিতেন। পরম-ভক্তি-ভাজন হজরৎ বিবী আয়শা ছিদ্দীকার অবস্থাও ঐরূপ ছিল। তিনিও লক্ষ মুদ্রা মৃত্তিকাবৎ অভাবগ্রস্ত লোকের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন অথচ রোজা এফ্‌তারের পর

নিজের আহারের জন্য এক পয়সার মাংস ঐ মুদ্রা হইতে ক্রয় করা যাইতে পারে কি না, এমন চিন্তাও মনে উদয় হয় নাই।

যাহা হউক, চক্ষুষ্মাণ জ্ঞানীর হাতে লক্ষ মুদ্রা থাকিলে তিনিও প্রকৃত সংসার-বিরাগী হইতে পারেন কিন্তু যাহার হস্তে এক পয়সাও নাই সে, সংসার-বিরাগী হইতে পারে না। সংসারের প্রত্যেক বিষয় হইতে সম্পূর্ণ অনাসক্ত থাকাই প্রকৃত উন্নত বৈরাগ্যের চিহ্ন। সংসারে প্রতিপত্তি লাভে ব্যস্ত না হওয়া কিম্বা তাহা হইতে পলায়নও না করা; সময়ের প্রতিকূল আচরণ না করা কিম্বা তাহার সহিত মিশিয়াও না যাওয়া; সংসারকে ভাল না বাসা কিম্বা শত্রু জ্ঞানও না করা, বৈরাগ্যের লক্ষণ নহে। কোন বস্তুকে অনিষ্টকর বলিয়া ঘৃণা করিলে, মনে তৎপ্রতি বিরক্তি জন্মে। কোন পদার্থকে ভালবাসিলে যেমন মন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়; ঘৃণা করিতে গেলেও তদ্রূপ মন দূরবর্ত্তী হয়। সুতরাং উভয় স্থলেই মন তৎ তৎ পদার্থের চিন্তায় ব্যাপৃত না হইয়া উদাসীন থাকিতে পারে না। আল্লা ভিন্ন সর্ব্ববিধ পদার্থের অনুরাগ বা বিরাগ হইতে উদাসীন থাকাই প্রকৃত বৈরাগ্য। তদরূপ অবস্থাপন্ন লোকের মনে সাংসারিক ধন-সম্পত্তি নদীর জলের ন্যায় এবং নিজের হস্ত, আল্লার ধন ভাণ্ডারের ন্যায় বিবেচিত হয়। (টীঃ ৩১৩) সংসার-বিরাগীর অধিকারে কত ধন আসিল কত গেল; বৃদ্ধি হইল কি কমিয়া গেল, এ সমস্ত চিন্তা হইতে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা আবশ্যক। এইরূপ হইলে বৈরাগ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

যাহা হউক, নির্ব্বোধ লোকেরা বৈরাগ্যের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিষম ধোকার মধ্যে পড়ে। তাহারা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ধনের সদ্ব্যবহার করিতে পারে না অথচ অযত্নে গৃহে ধন ফেলিয়া রাখিয়া এরূপ বিবেচনা করে যে আমি উহাতে অনাসক্ত ও বিরাগী। এরূপ লোক ভুল বিবেচনা করিতেছে কি না তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক। কোন ব্যক্তি আসিয়া যদি তাহার সেই ধন ও অপর ব্যক্তির ধন এবং নদীর জল লইতে লাগে এবং সেই সময়ে উক্ত ত্রিবিধ ধন-হরণ দর্শনে যদি তাহার মনে একই

টীকা—৩১৩। বিশ্ব জগতের প্রত্যেক স্থান আল্লার ধন ভাণ্ডার এবং তন্মধ্যস্থ পদার্থ গুলি তাঁহার ধন। জল একটী পদার্থ, ইহা জীব জন্তু ও উদ্ভিদের জীবন এবং কত নৈসর্গিক কার্য্যের কারণ। নদী গর্ভ, জলের ভাণ্ডার। নদী গর্ভ হইতে লোকে তাহে স্নানে, জল তুলিয়া লইয়া গেলেও নদী সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে অথচ জগৎ বাসীরা আনন্দিত হয়—নদীর তীর বাসীরা এই বলিয়া আনন্দিত হয় যে মানবগণের অভাব

প্রকার অবস্থা না ঘটিয়া, পার্থক্য অনুভূত হয়, তবে বুঝিবে যে, সে ব্যক্তি নিজকে ধন সম্বন্ধে উদাসীন বুঝিয়া ভুল করিয়াছে। তাহার মনে তখনও প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মে নাই বরং ধনের আসক্তি গুপ্ত ভাবে ছিল। যাহা হউক, প্রকৃত কথা এই ধন অধিকারে আসিয়া, ইচ্ছামত ভোগের আয়ত্ত হইলেও যদি নির্ব্বিকার মনে দূর করিয়া ফেলিবার সামর্থ্য থাকে তবে বুঝিবে প্রকৃত বৈরাগ্যই জন্মিয়াছে—সে স্থলে বৈরাগ্য চিনিতে ভুল হয় নাই।

মহাত্মা আবদুল্লা মোবারককে কেহ 'সংসার-বিরাগী' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল। তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—'ভাই! তুমি বোধ হয় বৈরাগ্যের অর্থ বুঝ নাই। আমি আজন্ম দরিদ্র; আমার হাতে এমন দ্রব্য আসে নাই যাহা নির্ব্বিকার মনে ত্যাগ করিতে পারি। খলীফা ওমর এব্‌নে আব্‌দুল আজীজকে যথার্থ সংসার-বিরাগী বলা যায়। তাঁহার হস্তে সসাগরা ধরার ধনৈশ্বর্য্য আছে। তৎসমুদয় ভোগ করিবার অবাধ ক্ষমতাও তাঁহার যথেষ্ট আছে। ইহা সত্বেও তিনি সংসার-বিরাগী।' আবু লায়লা এক দিন এব্‌নে শীরমাকে বলিয়াছিলেন—'দেখ ভাই! আবু হানিফা জোলার ছেলে হইয়া আমার প্রদত্ত ব্যবস্থা অসিদ্ধ করে!' এতদ্ শ্রবণে শীরমা বলিয়াছিলেন— 'আবু হানীফা, জোলার ছেলে বা শরাফ-সন্তান বলিয়া আমি প্রভেদ বুঝি না; কিন্তু আমি এই মাত্র জানি যে সংসারের ধনৈশ্বর্য্য তাঁহাকে আশ্রয় করিতে আগ্রহ সহকারে আসিতেছে, আর তিনি সে দিক হইতে পলাইতেছেন। আর দেখ, দুনিয়া আমাদের নিকট হইতে বিমুখ হইয়া পলাইতেছে; আর আমরা তাহাকে ধরিবার জন্য দৌড়িয়া মরিতেছি।' মহাত্মা এব্‌নে মসউদ বলিয়াছেন—"নিম্ন লিখিত আয়াৎ অবতীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা বুঝিতে পারি নাই যে আমাদের মধ্যে কেহ সংসার ভালবাসিয়া থাকে।

مِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ
يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ

ঘুচিবে তাহার। দুঃখ হবে, বালকগণের আনন্দের তো কথাই নাই। ধন সম্বন্ধে ধনীকে, সর্ব্বাবস্থায় ঐ প্রকার নির্ব্বিকার ও উদাসীন ভাব রক্ষা করাই বৈরাগ্য। নদ-স্বামীর মত, অর্থাৎ তুল্য হওয়া চাই। স্রোতে নানা দিক হইতে জল আসিয়া নদীগর্ভে পড়িতেছে; আবার লোকে তাহা ভরে ভরে লইয়া যাইতেছে। কত জল আসিল; কত খরচ হইল, কে কে লইয়া গেল, এ সম্বন্ধে নদী উদাসীন; সংসার বিরাগীকেও এইরূপ হওয়া চাই।

"তোমাদের মধ্যে কতকগুলি লোক সংসারকে ভালবাসে আর কতকগুলি লোক পরকাল ভালবাসে।' (৪ পারা। সুরা এমরাণ। ১৩ রোকু।)"
এক সময়ে কতকগুলি মুছলমান লোক বলিয়াছিল—'মহাপ্রভু যে কার্য্য ভালবাসেন তাহা যদি আমরা চিনিতে পারিতাম তবে কায়-মনোবাক্যে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতাম।' ইহার উত্তরে আল্লা বলিয়াছেন—

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ
إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ۵

"যদি তাহাদের উপর এই আদেশ লিপি-বদ্ধ করিতাম যে তাহারা আত্ম হত্যা করুক কিম্বা জন্মভূমি পরিত্যাগ করুক, তবে নিতান্ত অল্প লোক ব্যতীত তাহারা সে আদেশ পালন করিত না।" (৫ পারা। সুরা নেছা। ৯ রোকু।)

সংসারের পরিবর্ত্তে পরকাল পাইতে অনাগ্রহের কারণ—পাঠক! জানিয়া লও—বরফের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ প্রাপ্তি যে একটী বিশেষ লাভের ব্যবসায় ইহা বুঝিয়া কাজ করা তত বড় একটা বিশেষ কঠিন কার্য্য নহে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তুচ্ছ বরফের পরিবর্ত্তে উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে; কিন্তু স্বর্ণের সহিত তুলনায় বরফ যত নিকৃষ্ট, পরকালের সহিত তুলনায় সাংসারিক পদার্থ তদপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও লোকে তুচ্ছ সংসারের পরিবর্ত্তে পরমোৎকৃষ্ট পরকাল লইতে আগ্রহ করে না, ইহার কারণ কি? ইহার **তিনটী** কারণ আছে—(১) ঈমান বা বিশ্বাস জ্ঞানের দুর্ব্বলতা। (২) প্রবৃত্তির প্রবলতা এবং (৩) দীর্ঘসূত্রিতা—এ কাজটী অদ্য না করিয়া কল্য করিব—এই প্রলোভনের পদার্থটী এখন ভোগ করিয়া লই, পরে ত্যাগ করিব, এইরূপ ভাবকে দীর্ঘসূত্রিতা কহে। দীর্ঘসূত্রিতার ফলে লোভ বলবান হইয়া থাকে। লোভনীয় পদার্থ সম্মুখে আসিলে তাহা ভোগের জন্য লোভ উত্তেজিত হইয়া উঠে। উত্তেজনার প্রারম্ভেই উহাকে দমন না করিয়া যদি মনে করা যায় যে এখন ভোগ করিয়া লই

পরে লোভকে দমন করা যাইবে ; তবে তাহাকে দমন করা কঠিন হইতে কঠিনতর হইবে ; লোভ 'খোরাক' পাইলেই বলবান হইয়া উঠে। দ্বিতীয় বার তদ্রূপ কোন ভোগ্য বস্তু সম্মুখে আসিলে লোভ এমন বল প্রকাশ করিবে যে, তখন দমন করা নিতান্তই দুঃসাধ্য হইবে। এই কারণে মানব, হস্তস্থিত তুচ্ছ সুখে এমন মুগ্ধ হয় যে, ভবিষ্যতের স্থায়ী সুখের কথা ভুলিয়া যায়।

বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য—পাঠক! স্মরণ কর—সংসারের অপকারিতা ও নিন্দা বর্ণনা কালে যাহা কিছু বলা গিয়াছে, তাহাই বৈরাগ্যের প্রশংসা কালে বলা যাইতে পারে। (টীঃ ৩১৩) সংসারের প্রতি আসক্তি, ধ্বংসকর দোষের মধ্যে একটী গুরুতর দোষ ; এবং উহার প্রতি বিরক্তি, উদ্ধারকারী গুণের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ গুণ। সংসারের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শক যে সকল বচন কোর‌্আন ও হদীছে উক্ত হইয়াছে তাহা বৈরাগ্যের প্রশংসা স্থলে বলা যাইতে পারে। বৈরাগ্য যে একটী অতীব শ্রেষ্ঠ গুণ তাহার প্রমাণ এই যে মহাপ্রভু উহাকে জ্ঞান ও জ্ঞানীর সঙ্গে সম্পর্কিত করিয়াছেন। জগৎ বিখ্যাত ধনী কারূণ যখন মহাড়ম্বরে সৈন্য সামন্ত ভৃত্য ও অমাত্যগণ সহকারে শোভা যাত্রায় বাহির হইয়াছিল, তখন দর্শকবৃন্দ খেদ প্রকাশ করতঃ বলিতেছিল—"হায়! আমরা নির্ধন ; যদি আমরা ঐরূপ ঐশ্বর্য্য পাইতাম তবে কেমন সুখ হইত!" সেই সময়ে কেবল জ্ঞানবান্ লোকেরা বৈরাগ্যের বশীভূত হইয়া বলিয়াছিলেন—"যাহারা পরকালের প্রতি ইমান আনিয়াছে ও সৎকার্য্য করিয়াছে তাহাদের ভাগ্যে যে পুণ্য অবধারিত আছে তাহা সাংসারিক ধনৈশ্বর্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।" এই কাহিনী কোর‌্আন শরীফে মহাপ্রভু প্রকাশ করিয়াছেন—

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ

ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ

"যাহাদিগকে এলম (জ্ঞান) দেওয়া হইয়াছে তাহারা (বৈরাগ্যের বশীভূত হইয়া) বলিয়াছিল—হায়! যাহারা ঈমান পাইয়াছে ও সৎকার্য্য করিয়াছে

টীকা—৩১৩। বিনাশন পুস্তকের পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

তাহাদের ভাগ্যে যে পুণ্য অবধারিত আছে তাহা সাংসারিক ধন দওলত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।" (২০ পারা। সুরা কাছাছ। ৮ রোকু।) জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত সংসারে উদাসীন থাকিতে পারে, তাহার হৃদয়ে হেকমতের প্রস্রবণ উৎপন্ন হয়।" মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—"আল্লার ভালবাসা যদি পাইতে চাও তবে সংসারে উদাসীন থাকিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনে চল।" মহাত্মা হারেছা এক দিন মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আমি কি বিশ্বাসী 'মোমেন' হইতে পারিয়াছি?" তদুত্তরে হজরৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার অবস্থা কেমন?" তিনি বলিয়াছিলেন—"সংসার আমার নিকট এমন তুচ্ছ বিবেচিত হইতেছে যে, স্বর্ণ ও প্রস্তর খণ্ড আমার মনে সমান বোধ হয় এবং বেহেশ্‌ৎ ও দোজখ যেন আমি চক্ষের উপর দেখিতে পাইতেছি।" তখন হজরৎ বলিয়াছিলেন—"বিশ্বাসের যে অবস্থা তোমার প্রতি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা এখন পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; এখন এই অবস্থা সযত্নে রক্ষা কর।" শেষে বলিয়াছিলেন—

عَبْدٌ نَوَّرَ اللهُ قَلْبَهُ

"এই ব্যক্তি আল্লার উপযুক্ত দাস। আল্লা ইহার হৃদয় আলোকে উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন।" যে সময়ে নিম্নলিখিত সুসংবাদ অবতীর্ণ হইয়াছিল—

فَمَنْ يُّرِدِ اللهُ اَنْ يَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ

صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ ۝

"আল্লা যাহাকে সুপথ প্রদর্শনের ইচ্ছা করেন তাহার হৃদয় এছলামের জন্য "শারাহ্" (প্রশস্ত) করিয়া দেন।" তখন ছাহাবাগণ, হজরতের নিকট উহার অর্থ জানিবার মানসে নিবেদন করেন—"হে রসুলুল্লা! ঐ (শারাহ্) প্রশস্ত কি প্রকার?" তিনি বলিয়াছিলেন—"উহা এক প্রকার আলোক, হৃদয়ের মধ্যে জন্মে, তাহার প্রভাবে হৃদয় প্রশস্ত হইয়া পড়ে।" ছাহাবাগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাহার চিহ্ন কি?" তিনি বলিলেন—'সংসার হইতে মন চটিয়া যায়, পরকালের জন্য ব্যাকুল হয় এবং মৃত্যুর পূর্ব্বেই

[illegible]

মরণের আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই তাহার চিহ্ন।" তিনি অন্য এক দিন ছাহাবাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"আল্লার জন্য যেরূপ লজ্জা করা উচিত, তদ্রূপ উপযুক্ত লজ্জা কর।" ছাহাবাগণ বলিয়াছিলেন—"হে রসুলুল্লা! আমরা তো আল্লার জন্য শরম করিয়া থাকি।" তখন হজরৎ বলিলেন—"তবে কেন, যে ধন ভোগ করিতে পারিবে না তাহা জমা কর, এবং যেখানে বাস করিতে পারিবে না তথায় কেন গৃহ বানাও?" অন্যত্র হজরৎ এক জুমার নমাজের দিন খোৎবা পড়িবার সময় বলিয়াছিলেন—যে ব্যক্তি لا اله الا الله (লা এলাহা এল্লেল্লাহ) "আল্লা ব্যতীত আর কোন প্রভু নাই" এই বাক্য যথার্থই বিশ্বাস করে এবং তৎসহ আর কিছু মিশ্রিত না করে তাহার জন্য বেহেশৎ অবধারিত।" এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক মহাত্মা হজরৎ আলী দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিয়াছিলেন—"যাহার সহিত উহা মিশ্রিত করা উচিত নহে তাহার পরিচয় বর্ণনা করুন।" তদুত্তরে হজরৎ বলিয়াছিলেন—"তাহা 'সংসার প্রীতি' ও 'সংসার অনুসন্ধান'। বহু লোক পয়গম্বর তুল্য উপদেশ দেয় কিন্তু তাহাদের আচরণ ধন-গর্ব্বিত অত্যাচারী লোকের তুল্য। 'আল্লা, এক' এই বিশ্বাসটী যাহারা সংসার-প্রীতির আবিল্য হইতে অক্ষত ও নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারে তাহাদের স্থান বেহেশ্‌তে হইবে।" হজরৎ ইহাও বলিয়াছেন—"যাহারা সংসার বিরাগী, তাহাদের হৃদয়ের উপর মহাপ্রভু হেকমতের দ্বার খুলিয়া দেন। তাহাদের বাগ্‌যন্ত্রকে জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত করেন; তাহাদিগকে সমস্ত রোগের উৎপত্তির কারণ ও ঔষধ প্রণালী শিক্ষা দিয়া থাকেন, এবং পরিশেষে শান্তির সহিত নিরাপদে পৃথিবী হইতে বেহেশ্‌তে তুলিয়া লন।" মহাপুরুষ হজরৎ রসুল [illegible] একদিন ছাহাবাগণ সমভিব্যাহারে কোন স্থানে যাইতেছিলেন, পথের পার্শ্বে উষ্ট্রের একটী বৃহৎ বাথান ছিল। বাথানের উষ্ট্রগুলি সুন্দর হৃষ্ট পুষ্ট ছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি উষ্ট্রী গর্ভবতী, আর অধিকাংশ সবৎসা দুগ্ধবতী ছিল। উষ্ট্র আরব জাতীর এক উৎকৃষ্ট ধন। তাহারা উহার দুগ্ধ পান করে, মাংস আহার করে এবং পশমে পরিধান বস্ত্র ও বাসের তাঁবু প্রস্তুত করে। হজরৎ বাথানের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিলেন। ছাহাবাগণ নিবেদন করিলেন—"হে রসুলুল্লা। এই পবিত্র ধনের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কি কারণে মুখ ফিরাইয়া লইলেন?" তিনি বলিলেন—"মহাপ্রভু আমাকে ধনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে নিষেধ পূর্ব্বক বলিয়াছেন—

ولا

ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به

ازواجا منهم زهرة الحيوة الدنيا ه

لنفتنهم فيه ط ورزق ربك خير و ابقى ٥

'বহু সম্প্রদায়কে ধন দওলত দিয়াছি। তদ্দারা তাহাদের পার্থিব জীবনের শোভা সৌষ্ঠব করা হইয়াছে। (হে পয়গম্বর) তুমি সে দিকে কটাক্ষপাত করিও না—উহা তাহাদের পরীক্ষার কারণ হইয়াছে। (তোমার জন্য) তোমার প্রভুর নির্দ্ধারিত জীবিকা অতীব শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।''' (১৬ পারা। সুরা তাহা। ৮ রোকু।) লোকে মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী আঃ কে, সুখে এবাদৎ করিবার সুযোগ দিবার নিমিত্ত গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। তদুত্তরে তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—'যাও ঐ নদীর জল-স্রোতের উপর গৃহ বানাও।' তাহারা জলের উপর গৃহ পত্তন করা অসম্ভব বলিয়া প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—'সংসারে ভালবাসা অন্তরে রাখিয়া এবাদৎ করাও তদ্রূপ অসম্ভব ব্যাপার।' পয়গম্বর-শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ বলিয়াছেন—"আল্লার ভালবাসা পাইবার ইচ্ছা থাকিলে সংসার হইতে মন তুলিয়া লও এবং লোকের ভালবসা পাইবার বাঞ্ছা থাকিলে তাহাদের যাহা আছে তাহা হইতে হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া লও।"

মহাত্মা হজরৎ ওমর, মুসলমান জগতের বাদশা স্বরূপ, যে সময়ে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কঠোর দরিদ্রতার সহিত জীবন যাপন করিতেছিলেন, তখন কোন সন্ধ্যায় সামান্য আহার জুটিত কখন বা অনাহারে ক্ষুধার জ্বালায় দগ্ধ হইতেন; চতুর্দ্দশ গ্রন্থি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিতেন। তাঁহার দরিদ্রতা দর্শনে তদীয় দুহিতা (মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ এর অন্যতমা প্রিয় পত্নী) মাননীয়া বিবী হাফ্‌জা, দয়ার্দ্র চিত্তে বলিয়াছিলেন—"পিতঃ! এখন আপনি মুসলমান জগতের অধিপতি, নানা রাজ্য হইতে প্রভুত রাজস্ব ও অসীম ধন আপনার হস্তে আসিতেছে। আপনি তৎসমুদয় ধনই দরিদ্রং

হজরৎ ওমর ও হজরৎ রসুলের জীবন যাপন প্রণালী

অনুষ্ঠান ছাহাবাগণের কর্ম্ম অপেক্ষা পরিমাণে অধিক কিন্তু ছাহাবাগণ তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; ইহার কারণ এই যে, ছাহাবাগণ তোমাদের অপেক্ষা সংসারে অধিক বিরাগী ছিলেন।" মহাত্মা হজরৎ ওমর বলিয়াছেন—"বৈরাগ্যই মনের শান্তি এবং শরীরের আরাম।" মহাত্মা হজরৎ এব্‌নে মছউদ বলিয়াছেন—"সংসারবিরাগী লোকের দুই রকাৎ নমাজ অবশ্যই 'মোজ্‌তাহেদ্' (টীঃ ৩১৫) লোকের সমগ্র জীবনের 'এবাদৎ' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" মহাত্মা সহল্ তসতরী বলিয়াছেন—"মানব যখন খাদ্যের অভাব, পরিধানের অভাব, দরিদ্রতা ও অপমান এই চতুর্ব্বিধ পদার্থের ভয় হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারে তখন তাহার সদনুষ্ঠান কেবল আল্লার জন্য শুদ্ধ সঙ্কল্পে ঘটিতে পারে।"

বৈরাগ্যের শ্রেণী বিভাগ—বিরাগীর প্রকার ভেদে—পাঠক! জানিয়া লও, **তিন** শ্রেণীর বৈরাগ্য আছে। (১) ধর্ম্মের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই এমন সাংসারিক কার্য্য হইতে যাহারা হস্ত সঙ্কুচিত করিতে পারিয়াছে বটে কিন্তু মনকে একেবারে অনাসক্ত করিতে পারে নাই, অথচ মনকেও তাহা হইতে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে এবং তজ্জন্য প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে, তাহাদিগকে বৈরাগ্যের শিক্ষার্থী বলা যায়—কিন্তু প্রকৃত বিরাগী বা উদাসীন বলা যায় না। সংসার হইতে বিমুখ হইবার জন্য প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম, বৈরাগ্যের প্রথম সোপান। (২) যাহারা সংসার হইতে হস্ত ও মন তুলিয়া লইতে পারিয়াছে কিন্তু আপন কার্য্যকে মূল্যবান মনে করিতেছে, তাহাদের বৈরাগ্য মধ্যম শ্রেণীস্থ। তাহারা সংসারে উদাসীন হইতে পারিলেও তাহাদের বৈরাগ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। (৩) যাহারা বৈরাগ্যের কথাও ভুলিয়া যাইতে পারে এবং তাহাকে একটা নগন্য তুচ্ছ কার্য্য মনে করে তাহাদের বৈরাগ্য উন্নত শ্রেণীর।

একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা মধ্যম ও উন্নত বৈরাগ্যের তারতম্য বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। মনে কর—কোন ব্যক্তি, এক প্রতাপান্বিত সম্রাটের প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইবার মানসে আবেদন হস্তে রাজকীয় প্রাসাদে প্রবেশ করিতে চেষ্টা

করা অত্যাবশ্যক হইয়াছিল সেই সময়ে কতকগুলি অসাধারণ জ্ঞানী বিদ্বান লোক বুদ্ধি ও বিদ্যার প্রভাবে ছহি-হ হদীছগুলি অন্য নীতি বাক্য হইতে নির্ব্বাচন পূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহাদিগকে 'মোজতাহেদ' বলে। মোজতাহেদগণ হদীছ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক সেই নির্ব্বাচিত হদীছ মত অতি সতর্কতার সহিত জীবন যাপন করিয়াছেন এবং তদনুরূপ উপদেশ দিতেন। এখন ধর্ম্ম-শিক্ষকদিগকে 'মোজতাহেদ' বলে, তাহারা সর্ব্ব সাধারণ লোকদিগকে পাপ কার্য্য ও কদাচার হইতে বিরত থাকিতে এবং ধর্ম্মকার্য্য করিতে উপদেশ দেন।

করিল, সিংহদ্বারে এক ভয়ঙ্কর কুকুর দেখিতে পাইল। কুকুর, প্রবেশ-দ্বার শক্ত করিয়া আটকাইয়া বসিয়া আছে—কিছুতেই প্রবেশ করিতে দিল না, তখন সেই ব্যক্তি হস্তস্থিত রুটী মাংস কুকুরের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। কুকুর খাদ্য পাইয়া দ্বার ছাড়িয়া দিল। বাধা দূর হওয়াতে সে ব্যক্তি সহজেই সম্রাটের সম্মুখে গিয়া মন্ত্রী-পদে প্রতিষ্ঠিত হইল। এ স্থলে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, মন্ত্রী-পদ-প্রাপ্তির তুলনায় রুটী মাংসাদির পরিত্যাগ নিতান্ত তুচ্ছ। আবার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া রুটী মাংসাদি কুকুর দ্বারা খাওয়াইয়া ফেলান কোন লাভের কার্য্যও নহে। পাঠক! এখন বিচার করিয়া বুঝ, সংসারের সমস্ত ভোগ্য বস্তু এক লোকমা রুটী মাংসের তুল্য। শয়তান একটী ভীষণ দুর্দ্দান্ত কুকুরের সদৃশ; সে আল্লার সান্নিধ্যে যাইবার পথ আটক করিয়া গর্জ্জন করিতেছে। রুটী মাংসের ন্যায় সংসারের ভোগ্য বস্তু শয়তানরূপ কুকুরের সম্মুখে ফেলিয়া দিলে সে তোমার পথ ছাড়িয়া দিবে। আহারের জন্য রুটী মাংস হাতে থাকিলে মনে যে আনন্দ জন্মে তাহা অবশ্যই মন্ত্রিত্ব পাইবার আনন্দ অপেক্ষা তুচ্ছ; আবার পরকালের অনন্ত গৌরব প্রাপ্তির আনন্দ অপেক্ষা সাংসারিক ধন মানের আনন্দ একেবারেই নিকৃষ্ট। পরকালের গৌরব জনিত আনন্দের সীমা নাই; কিন্তু সংসারে ধন মান জনিত আনন্দ, নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও ক্ষণ ভঙ্গুর। সংক্ষিপ্ত ও ভঙ্গুর পদার্থ কি কখন অসীম ও চিরস্থায়ী পদার্থের সমান হইতে পারে? মহাত্মা আবু ইয়াজেদ বোস্তামী মহোদয়ের সমীপে কতকগুলি লোক বলিয়াছিল—'অমুক ব্যক্তি বৈরাগ্যের কথা বলিতেছেন।' শেখ মহোদয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'কোন বিষয় হইতে বৈরাগ্য?' তাহারা নিবেদন করিয়াছিল—'সংসার হইতে বৈরাগ্য।' মহাত্মা বলিয়াছিলেন—'সংসারতো একটা তুচ্ছ অপদার্থ বস্তু, তাহা পরিত্যাগ করিলে কি লাভ! হাঁ, আল্লার জন্য একটা পদাখের মত পদার্থ পরিত্যাগ করিতে পারিলে অবশ্যই লাভ ছিল।'

অভিলষিত বস্তুর বিচারে বৈরাগ্যের শ্রেণী বিভাগ—যে পদার্থ পাইবার আশায়, সাংসারিক সুখের পদার্থ পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহার প্রকার ভেদে বৈরাগ্যের **তিন** শ্রেণী আছে। **প্রথম** শ্রেণীর বৈরাগ্য—পরকালের শাস্তি হইতে পবিত্রাণ পাইবার আশায় এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে গিয়া সংসারের প্রলোভনের পদার্থ পরিত্যাগ করা; ইহা ধর্ম্মভীরু লোকের বৈরাগ্য। মহাত্মা মালেক দীনার এক দিন বলিয়াছিলেন—"অদ্য

রজনীতে আমি আল্লার সমীপে বড়ই ধৃষ্টতা করিয়াছি—সে সময়ে আমি সাহস করিয়া বেহেশ্‌ৎ চাহিয়াছিলাম।" **দ্বিতীয়** শ্রেণীর বৈরাগ্য—পরকালে সুখ ও আরাম পাইবার আশায়, ইহকালের প্রলোভন পরিত্যাগ করা ; ইহার মধ্যে পাপের ভয়, পুরস্কারের আশা এবং প্রেম এই তিনটী মানসিক গুণই বর্ত্তমান থাকে বলিয়া ইহাকে উন্নত শ্রেণীর বৈরাগ্য বলা যায়। ইহা প্রেমিক সাধু লোকের বৈরাগ্য। **তৃতীয়** শ্রেণীর বৈরাগ্য—দোজখের শাস্তির ভয়ে বা বেহেশ্‌তের সুখাশায় এরূপ বৈরাগ্য ঘটে না—কেবল আল্লার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সংসারের সমস্ত বিষয় বৈভব ভুলিয়া যাইতে হয়। এ শ্রেণীর বিরাগী লোক আল্লা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না। এরূপ ধরণের বৈরাগ্য, পূর্ণ উন্নত শ্রেণীর অন্তর্গত। ভক্তিভাজন বিবী রাবেয়া বছরীকে লোকে বেহেশ্‌তের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—

اَلْجَارُ ثُمَّ الدَّارُ

'গৃহস্বামী (অগ্রে) পরে গৃহের কথা।' আল্লার প্রেমাস্বাদ যেমন অতুল আনন্দদায়ক, বেহেশ্‌তের সুখ তদ্রূপ নহে, কিন্তু সে আনন্দ সংসার বিরাগী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ অনুভব করিতে পায় না। দেখ, প্রজাপালন কার্য্যে রাজা বাদশা যে প্রকার আনন্দ পান তাহা বালকগণের পক্ষী-ক্রিড়া জনিত আনন্দ অপেক্ষা অতীব উৎকৃষ্ট, তথাপি বালকগণ তদ্রূপ ক্রীড়াতেই পরম মনোরম আনন্দ পাইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে বাল্যকালে তাহাদের মনে রাজকীয় আনন্দ বুঝিবার শক্তি জন্মেনা এবং বুদ্ধিও তত দূর বিকাশ পায় না। এই প্রকার আল্লার দর্শন ভিন্ন অন্য কোন বিষয় হইতে যাহারা আনন্দ পায়, বুঝিতে হইবে, তাহারাও বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে উপস্থিত হইতে পারে নাই ও উন্নত আনন্দ উপভোগের শক্তি এবং জ্ঞান-বুদ্ধিও তাহাদের বিকশিত হয় নাই।

পরিত্যাক্ত বস্তুর প্রকার ভেদে বৈরাগ্যের শ্রেণী বিভাগ— অভিলষিত বস্তুর বিচারে, বৈরাগ্যের তিন শ্রেণী দেখান গেল ; পরিত্যাক্ত বস্তুর প্রকার ভেদেও উহার বহু শ্রেণী হয়। যে পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করা যায় তাহার গুরুত্ব লঘুত্ব বিচারে বৈরাগ্য বহু প্রকার হয়। কেহবা সংসারে কিয়দংশ কেহবা অধিকাংশ পদার্থ পরিত্যাগ করিতে

পারে কিন্তু পূর্ণ পরিপক্ক বিরাগী ব্যক্তিগণ যে পদার্থে প্রবৃত্তির কিছু মাত্র টান দেখিতে পান অথচ ধর্ম্মপথে যাহা অনাবশ্যক বুঝিতে পারেন তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ধন, মান, পান, আহার, পরিচ্ছদ, বাক্যালাপ, নিদ্রা, সংসর্গ, শিক্ষাদান, উপদেশ-প্রদান, প্রভৃতি কার্য্যে মানব-প্রবৃত্তি আনন্দ পায়। প্রবৃত্তি যাহা পাইতে চায় তাহাকেই সংসার বলা যায় কিন্তু এই সকল কার্য্যের মধ্যে কতকগুলি কার্য্য অতীব মহৎ এবং মানবজাতীর মহোপকার সাধন করে যথা—শিক্ষাদান, উপদেশ প্রদান ইত্যাদি; এরূপ কার্য্য মনুষ্যজাতিকে পাপ কার্য্য হইতে আল্লার পথে আকর্ষণ করে। যে কার্য্য মানুষকে আল্লার পথে আকর্ষণ করে, তাহা 'দুনিয়া' নামক পদার্থের অন্তর্গত নহে। মহাত্মা আবু ছোলায়মান্ দারানী বলিতেন—'আমি অনেকের মুখে বৈরাগ্যের পরিচয় শুনিয়াছি কিন্তু আমি এই বুঝি, যে পদার্থ মানুষকে আল্লা হইতে দূরে লইয়া যায় তাহা পরিত্যাগ করাই প্রকৃত বৈরাগ্য।' তিনি আরও বলিয়াছেন—'যাহারা বিবাহ করিয়া পত্নীর প্রতি আসক্ত হয় কিম্বা ভূতলের বৈচিত্র-দর্শন-সুখের আশায় দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হয় অথবা হদীছ বিদ্যায় পাণ্ডিত্ব প্রদর্শনার্থ উপদেশ-দানে আনন্দ অনুভব করে তাহারা সংসারের বেড়ে পড়িয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ○

"যে ব্যক্তি سليم ছলীম হৃদয় লইয়া আল্লার নিকট গিয়াছে তদ্ব্যতীত অন্য কেহ পরিত্রাণ পাইবে না।" (১৯ পারা। সূরা শোরা। ৫ রোকু)

এই আয়াৎ আবৃত্তি করিয়া কেহ আবু ছোলায়মান দারানীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"'ছলীম হৃদয়' কি প্রকার?" তিনি বলিয়াছিলেন—"যে হৃদয়ে আল্লা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের চিন্তা নাই সেই হৃদয়কে ছলীম অর্থাৎ 'নিখুৎ-সুস্থ' বলে।" মহাত্মা হজরৎ জকরীয়া নবী عم এর পুত্র মহাত্মা হজরৎ ইয়াহীয়া নবী عم চট বা ছালা পরিধান করিতেন। সূক্ষ্ম ও কোমল বস্ত্র পরিধান করিলে আরাম পাওয়া যাইবে—প্রবৃত্তি প্রফুল্ল হইবে এই ভয়ে তিনি ছালা পরিধান করিতেন। পরিহিত ছালার ঘর্ষণে শরীরের কয়েক স্থানে ক্ষত জন্মিয়াছিল। পুত্রের কষ্ট দর্শনে তাঁহার মাতা স্নেহ পরবশ হইয়া কোমল পশমী বস্ত্র পরিধান করিতে অনুরোধ করেন। মাতার অনুরোধ ক্রমে এক দিন তিনি কোমল বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন।

তখনই আকাশ বাণী হইয়াছিল—"হে ইয়াহীয়া, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া 'দুনিয়া' গ্রহণ করিলে ?" ইহা শ্রবণ করতঃ মহাত্মা অনুতপ্ত হৃদয়ে বহু রোদন করিয়াছিলেন এবং পুরাতন ছালা খানি পুনরায় তুলিয়া পরিয়াছিলেন।

পাঠক! জানিয়া রাখ, প্রবৃত্তিকে আনন্দ দেয় এমন সর্ব্ববিধ পদার্থ পরিত্যাগ করা, চূড়ান্ত উন্নত অবস্থার বৈরাগ্য; কিন্তু সকলে সেই উন্নত অবস্থা লাভ করিতে পারে না। পরিত্যক্ত পদার্থের আনন্দ-দায়িনী শক্তির ইতর বিশেষ অনুসারে বৈরাগ্যের শ্রেণী ভেদ হয় অর্থাৎ যেরূপ প্রবল আনন্দপ্রদ পদার্থ ত্যাগ করা অভ্যাস হইয়া যায় বৈরাগ্য তদ্রূপ উন্নত বলিয়া গণ্য হয়।

তওবা ও বৈরাগ্যের তুলনা—পাপে যেমন হৃদয়ের ক্ষতি করে লোভনীয় পদার্থের দিকে মনের টানেও তদ্রূপ আত্মার ক্ষতি করিয়া থাকে; কিন্তু সেই পাপজনিত ক্ষতি যেমন 'তওবা'র প্রভাবে সংশোধিত হয় তদ্রূপ লোভনীয় পদার্থের প্রতি আসক্তি জনিত ক্ষতি, বৈরাগ্য (পরহেজগারী) দ্বারা পূরণ হয়। 'তওবা' ও বৈরাগ্য কখনই বিফল হয় না। আবার দেখ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে কঠিন কঠিন পাপ পরিত্যাগ করা যেমন সঙ্গত তদ্রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দপ্রদ লোভনীয় পদার্থ হইতে মন তুলিয়া লইয়া ক্রমে প্রবল আনন্দদায়ক প্রলোভন হইতে বিরাগী হওয়া বিধেয়। এক দমে নিষ্পাপ অবস্থা হস্তগত করা এবং এক লম্ফে বৈরাগ্যের উন্নত শিখরে আরোহণ করা অসম্ভব। এই দুই অবস্থাই ক্রমে ক্রমে লাভ করিতে হয়। তথাপি, তওবাকারী ও বিরাগী (পরহেজগার) লোকের জন্য করুণাময় পরকালে যে মহা গৌরব দিবার অঙ্গিকার করিয়াছেন তাহা কেবল সর্ব্ববিধ-পাপ-পরিত্যাগী নিষ্পাপ তওবকারীদের এবং সর্ব্ববিধ-লোভনীয়-পদার্থ-পরিত্যাগী বিরাগী পরহেজগারদের জন্য অবধারিত।

জীবনধারণার্থ অত্যাবশ্যকীয় সাংসারিক পদার্থের ষড়বিধ শ্রেণী বিভাগ অবলম্বনে সংসারবিরাগীগণের তদ্রূপ পদার্থে পরিতুষ্টির বর্ণনা—পাঠক! অবগত হও—মনুষ্যজাতি সংসাররূপ জেল-খানায় আসিয়া বন্দী হইয়া পড়িয়াছে। এস্থানে মানবকে অসংখ্য বিপদ আপদ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। সেই বিপদরাশির মধ্যে ইহাদের জীবন ধারণের জন্য ছয় প্রকার দ্রব্যের নিতান্ত আবশ্যক; (১) অন্ন (২) বস্ত্র (৩) গৃহ (৪) গৃহ-সামগ্রী (৫) পত্নী (৬) ধন ও মান।

জীবনধারণোপযোগী অত্যাবশ্যকীয় পদার্থের শ্রেণী বিভাগ।

আহারীয়

(১) আহারীয় পদার্থের বিভিন্ন বিচার ও ব্যবহার উল্লেখে সংসার বিরাগীগণের পরিতুষ্টির তারতম্য বিচার—প্রথম প্রকার আবশ্যকীর দ্রব্য—অন্ন বা আহারীয় পদার্থ। উহা নানাবিধ। কোন প্রকার পদার্থ কি পরিমাণ আহার করা কর্ত্তব্য অবস্থাভেদে তাহার পার্থক্য আছে। অন্নের ব্যঞ্জন কি প্রকার হওয়া আবশ্যক তাহারও পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

যাহা আহার করিলে শরীর রক্ষা পায়, তাহাই আহারীয় পদার্থ। আহার্য্য পদার্থের মধ্যে তণ্ডুল, ময়দা প্রভৃতি প্রধান এবং ক্ষুদ্ কুঁড়া ভুষি ইত্যাদি নিকৃষ্ট। যব, বাজ্‌রা, শামা, চিনা, কলাই, মাকই, ইত্যাদির রুটী মধ্যম। চালা নহে এমন সাধারণ ময়দা হিতকর। চালিয়া লওয়া সূক্ষ্ম ময়দা, সুজী, চিকণ চাউল মূল্যবান হইলে হিতকর নহে। যাহারা সুজী বা চালা ময়দার রুটি অথবা চিকণ চাউলের অন্ন আহার করে তাহাদিগকে শরীর-সেবক বলা যায়—বিরাগী বা পরহেজগার বলা যায় না।

আহার্য্য বিচার

আহারের পরিমাণ লইয়া বিচার করিলেও ভোক্তার নানা শ্রেণী হয়। সামান্য আহারের পরিমাণ অনুমান এক পোয়া (টীঃ ৩১৬); মধ্যম শ্রেণী আহারের পরিমাণ অনুমান অর্দ্ধ সের ; পরিতৃপ্ত ভোজনের পরিমাণ অনুমান এক সের। ধর্ম্মবিধানে (শরীয়তে) সাধারণ দরিদ্রের জন্য ঐ পরিমাণ অন্ন আহারের আদেশ আছে। এতদপেক্ষা অধিক ভোজনে উদর পূজা হয়—বৈরাগ্য বা পরহেজগারী থাকে না।

আহারের পরিমাণ

ভবিষ্যতের জন্য আহার্য্য পদার্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইলে, এক সন্ধ্যার পরিমিত দ্রব্য জমা রাখা আবশ্যক। তদপেক্ষা অধিক দ্রব্য সঞ্চিত রাখা বৈরাগ্যবলম্বী (পরহেজগার) লোকের পক্ষে ভাল নহে। অল্প সময়ের জন্য ক্ষুদ্র আশা করা বৈরাগ্যের মূল বিষয়, কিন্তু দীর্ঘ আশা করা লোভীদিগের কার্য্য। এক মাস

আহার্য্য সঞ্চয়বিধি

টীকা—৩১৬। মূল গ্রন্থে আহারের পরিমাণ যথাক্রমে দশ সের, অর্দ্ধমণ ও এক মোদ্ লেখা আছে। উক্ত সের আমাদের বাংলা দেশের সেরের সমান নহে। উক্ত সের আমাদের বাংলা দেশের প্রায় দেড় তোলার সমান হয়। অতএব দশ সের পরিমাণ দ্রব্য বাংলা দেশের কাঁচি প্রায় এক পোয়ার সমান। আর উল্লিখিত অর্দ্ধমণ বাংলা দেশের কাঁচি প্রায় অর্দ্ধ সেরের সমান এবং উল্লিখিত এক মোদ্ বাংলা দেশের কাঁচি প্রায় এক সেরের সমান ওজন। (বিনাশন পুস্তক ; ২—লোভ ; ৭২—৭৮ পৃঃ টীকা দেখ)।

বা চল্লিশ দিনের জন্য আহারীয় পদার্থ হাতে রাখা মধ্যম ধরণের বৈরাগ্য। এক বৎসরের ব্যয়ের উপযুক্ত দ্রব্য সঞ্চয় রাখা নিতান্ত হীন বৈরাগ্যের কার্য্য। এক বৎসরের অধিক চলে এত পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিলে, বৈরাগ্য হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যে ব্যক্তি এক বৎসরের অধিক লম্বা আশা রাখে, তাহার দ্বারা বৈরাগ্য রক্ষিত হইতে পারে না। মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (ﷺ) স্বীয় প্রতিপাল্য ব্যক্তিবর্গের হস্তে এক বৎসরের উপযোগী খাদ্য-দ্রব্য সমর্পণ করিতেন। কেন না তাঁহাদের মধ্যে হয়তো কেহ ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে পারিতেন না; কিন্তু নিজের জন্য তিনি রাত্রির খাদ্য দিবসে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন না।

ব্যঞ্জন বিচার

সের্কা ও শাক অতি সামান্য ধরণের ব্যঞ্জন। এরূপ সামান্য পদার্থ সংগ্রহ করিতে অধিক পরিশ্রম বা অধিক সময় লাগে না। মধ্যম ধরণের ব্যঞ্জন ঘৃত তৈল বা তদুৎপন্ন দ্রব্য। মাংস উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ব্যঞ্জন। কিন্তু সর্ব্বদা মাংস ভক্ষণে বৈরাগ্য সমূলে বিনষ্ট হয়। মধ্যে মধ্যে ২। ১ বার মাংস ভোজন করিলে পরহেজগারী একেবারে নষ্ট হয় না।

আহারের সময়

ব্যঞ্জনবিচারের পর, আহারের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। দিবা রাত্রির মধ্যে এক বার আহার গ্রহণ, সাধারণ ধরণের পরহেজগারী। দুই দিনের পর এক দিন আহার করা উত্তম। দিবা রাত্রির মধ্যে দুইবার আহার করিলে পরহেজগারী থাকে না। পরহেজগারীর উৎকৃষ্ট অবস্থা জানিতে হইলে মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (ﷺ) ও তাঁহার ধর্ম্ম বন্ধু ছাহাবাগণের জীবন চরিত উত্তমরূপে জানা কর্ত্তব্য। মহামাননীয়া বিবী আয়শা ছিদ্দীকা বলিয়াছেন—"কখন কখন এমন হইত যে মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (ﷺ) এর গৃহে ক্রমাগত চল্লিশ দিন ব্যাপিয়া তৈলের অভাবে রাত্রিকালে প্রদীপ জ্বলিত না এবং খোরমা বা ছাতু ও জল ভিন্ন অন্য দ্রব্য খাইতে পাওয়া যাইতনা।" মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী (আঃ) বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি বেহেশ্‌ৎ পাইতে চায় তাহাকে যবের রুটী আহার করতঃ শিয়াল কুকুরের সহিত পাঁশের পালায় শয়ন করিয়া পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত।" তিনি স্বীয় ধর্ম্ম-বন্ধুগণকে বলিতেন—"শাক সহকারে যবের রুটী খাও—গোধূমের অনুসন্ধানে যাইও না। গোধূম আহার করিলে কখনই তদুপযুক্ত ধন্যবাদ প্রকাশ করিয়া শেষ করিতে পারিবে না।"

(২) বস্ত্রের প্রকার ও ব্যবহার উল্লেখে সংসার বিরাগীগণের পরিতুষ্টির বিবরণ—দ্বিতীয় প্রকার আবশ্যকীয় পদার্থ—হইতেছে বস্ত্র। সংসার-বিরাগী লোককে 'একখানি বস্ত্রে'র (টীঃ ৩১৭) অধিক রাখা উচিত নহে। এমন কি সেই বস্ত্র খানি ধুইবার সময় বিবস্ত্র হইতে হইলেও ক্ষতি নাই। (টীঃ ৩১৮) দুই খানি বস্ত্র থাকিলে বৈরাগ্যের উন্নত সোপান হইতে পতিত হইতে হয়।

বস্ত্রের সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছদের মধ্যে একটী লম্বা পিরাহান, একটী টুপী বা পাগড়ী ও এক জোড়া জুতা সাধারণ সামাজিক পরিচ্ছদ। এক খানি তহবন্দ বা ইজার একটী পিরাহান বা চাদর; একটী টুপী বা পাগড়ী এবং এক জোড়া জুতা হইলে পূর্ণ পরিচ্ছদ হয়।

সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ পরিচ্ছদের বিবরণ

বস্ত্রের প্রকার—চট বা ছালা নিতান্ত সামান্য প্রকারের পরিচ্ছদ। কম্বল বা তদ্রূপ মোটা পশমী বস্ত্র মধ্যম প্রকারের বস্ত্র। তুলার মোটা বস্ত্র অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পরিচ্ছদ। যে ব্যক্তি সূক্ষ্ম ও কোমল বস্ত্র ইচ্ছা পূর্ব্বক পরিধান করে, সে পরহেজগারের দল হইতে বহিষ্কৃত হয়।

বস্ত্রের প্রকার

মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (ﷺ) পরলোকে প্রস্থান করিলে, ভক্তিভাজন হজরৎ বিবী আয়শা ছিদ্দীকা একখানি মোটা তহবন্দ ও একখানি কম্বল বাহির করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাই মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (ﷺ) **এর** সাকুল্য পরিচ্ছদ। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে যে—'যে পোষাক পরিধান করিলে তদুপরি লোকের চক্ষু পড়ে এবং এক জন অপরকে উহার সংবাদ দিতে থাকে, সেরূপ বস্ত্র

মহাপুরুষ হজরৎ রসুলের পোষাক

টীকা—৩১৭। 'একখানি বস্ত্র' শব্দের অর্থ এই যে, শরীরের গুপ্ত অংশ ঢাকিবার জন্য একখানি পরিধান বস্ত্র; গায়ে উড়িবার একখানি চাদর; মস্তকের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য একখানি শিরস্ত্রাণ অর্থাৎ উক্ত ত্রিবিধ কার্য্যের জন্য এক এক খানি বস্ত্র হওয়া আবশ্যক। দুই খানি হইলে অতিরিক্ত হয়। জুতা বস্ত্রের অন্তর্গত নহে। পরিধানের জন্য তহবন্দ বা ইজার; গায়ে দিবার জন্য পিরাহান বা চাদর এবং মস্তকের জন্য টুপী বা পাগড়ী প্রয়োজন, জানু ঢাকা যায় এমন একটী লম্বা পিরাহান হইলে তহবন্দ ও চাদর উভয়ের কাজ হইতে পারে।

টীকা—৩১৮। 'বিবস্ত্র হইলে ক্ষতি নাই' বলিলে ইহা বুঝায় না যে অপর লোকের দৃষ্টিগোচরে বিবস্ত্র হইতে হইবে। এতদ্দৎ পুস্তকের ৯৭ পৃষ্ঠায় 'জামামে গোছলবিধি' দ্রষ্টব্য।

এমন মন্দ যে আল্লার প্রিয়পাত্র লোকও তাহা পরিধান করিলে তিনি অসন্তুষ্ট হন; যে পর্য্যন্ত সে পোষাক উন্মোচন না করা যায় ততক্ষণ আল্লার অসন্তুষ্টি দূর হয় না।' মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) এর দুই থানি বস্ত্রের অর্থাৎ তহবন্দ ও কম্বলের মূল্য দশ দেরেমের অধিক হইত না। একবার একখানি বস্ত্র তাঁহার 'নজর' স্বরূপ উপনীত হইয়াছিল। হজরৎ তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক পরিধানও করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ বস্ত্রের মধ্যে 'বুটাদার' কাজ ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তৎপ্রতি দৃষ্টি পতিত হইলে তিনি বস্ত্র থানি উন্মোচন করতঃ বলিলেন—'ইহা আবু জহীমকে প্রদান করতঃ তাহার কম্বল থানি আন। এই বুটাদার বস্ত্র আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।' মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) এর নালায়েন বা কাষ্ঠ পাদু-কায় নূতন ফিতা লাগান হইয়াছিল; কিছুক্ষণ পরে তিনি উহা খুলিয়া ফেলিয়া, পুরাতন ফিতাগাছী লাগাইয়া দিতে আদেশ করিয়াছিলেন; এবং বলিয়াছিলেন—'উহার সৌন্দর্য্যের উপর আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল।' একদা তিনি মেম্বরের (বেদীর) উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া খোৎবা পড়িতে ছিলেন, ইতিমধ্যে তাঁহার চক্ষু স্বীয় অঙ্গুরীর উপর পতিত হওয়াতে উহা খুলিয়া তিনি দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; এবং বলিয়াছিলেন—'এক চক্ষু অঙ্গুরীর উপর এবং অন্য চক্ষু তোমাদের উপর রাখা উচিত নহে।' এক সময়ে তাঁহাকে এক জোড়া নালায়েন দেওয়া হইয়াছিল। উহা দর্শনান্তর তিনি আল্লার সম্মুখে ছেজদা করিয়া কিছুক্ষণ প্রার্থনা করেন; পরে বাহিরে আসিয়া সর্ব্ব প্রথমে যে ভিক্ষুককে দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহাকে উহা দান পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন 'আমার চক্ষে ইহা সুন্দর বলিয়া মনে আনন্দ জন্মিয়াছিল; তাহাতে আমার ভয় হইয়াছে, কি জানি মহাপ্রভু আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন। সেই জন্য আমি সভয়ে ছেজদা করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করি-য়াছি।' মহামাননীয়া হজরৎ বিবী আয়শা ছিদ্দীকাকে তিনি উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—"অয়ি আয়শা! কেয়ামতের দিন যদি আমার সঙ্গে একত্র হইতে চাও তবে পৃথিবীতে কেবল জীবন ধারণের পরিমিত বস্তুতে সন্তুষ্ট থাক এবং পুরাতন বস্ত্রে তালীর উপর তালী না পড়া পর্য্যন্ত উহা পরিধান হইতে খুলিও না।"

মহাত্মা হজরৎ ওমর ফারুকের পরিধান বস্ত্রে চৌদ্দ তালী পড়িয়াছিল; বহু ছাহাবা তাহা গণনা করিয়া স্মরণ রাখিয়াছিলেন। মহাত্মা হজরৎ আলী

করমোল্লা যে সময়ে খলিফা পদে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্যের শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন, তখন তিনি একটী পিরাহান তিন দেরেমে ক্রয় করিয়াছিলেন। উহার আস্তিন লম্বা হওয়াতে অতিরিক্ত খানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন এবং পিরহানটী পরিধান পূর্ব্বক আল্লাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিয়াছিলেন – 'আমার প্রভুর ধন্যবাদ; তিনি আমাকে দয়া করিয়া ইহা পরিধান করিতে দিয়াছেন।' এক সাধু বলিয়াছেন "আমি মহাত্মা হজরৎ সুফিয়ান স্থরীর পরিচ্ছদ ও নৈলায়েনের মূল্য যাচাই করিয়া দেখিয়াছিলাম, সমুদয়ের মূল্য এক দেরেম ও চারিদাঙ্গ অপেক্ষা কেহই অধিক বলে নাই।" হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—"বহুমূল্য পরিচ্ছদ ধারণ করিতে যাহার অর্থবল আছে, সে যদি আল্লার জন্য বিনয় অবলম্বনে উহা পরিধান না করিয়া সামান্য বস্ত্রে পরিতুষ্ট হয়, তবে মহাপ্রভু তাহাকে বেহেশ্‌তের মধ্যে স্থান দিবেন এবং বেহেশ্‌তের অপূর্ব্ব বিচিত্র পরিচ্ছদগুলি পদ্মরাগ মণি নির্ম্মিত বাক্‌সে সাজাইয়া উহার নিকট প্রেরণ করিবেন।" মহাত্মা হজরৎ আলী করমুল্লা বলিয়াছেন—"যে সকল পয়গম্বরকে মহাপ্রভু মানবজাতীর সৎপথ প্রদর্শন জন্য জগতে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদেব সকলের স্থানে এই অঙ্গীকার লওয়া হইয়াছে যে, তাঁহাদের পরিচ্ছদ যেন সাধারণ লোকের পরিচ্ছদের ন্যায় সামান্য ধরণের হয়। তদরূপ হইলে আমীর লোকেরাও তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিবে এবং দরিদ্রগণও মনঃক্ষুণ্ণ হইতে পারিবে না।" মহাত্মা ফোজ্‌লা এব্‌নে ওবায়েদ মিচর দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; তিনি সামান্য বসন পরিধান পূর্ব্ব নগ্নপদে নিঃসঙ্কোচে বাজারে বেড়াইতে যাইতেন। দেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া তদরূপ হীন ভাবে যথা তথা বিচরণ করিলে গৌরবের হানি হয় বলিয়া কেহ পরামর্শ দিলে তিনি বলিতেন—"মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) আড়ম্বর প্রকাশে নিষেধ করিয়াছেন; এমন কি তিনি কখন কখন নগ্ন পদে বেড়াইতে আমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন।" মহাত্মা মোহাম্মদ এব্‌নে ওয়াছে একদা মোটা পশমের সামান্য বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ফতীবা এব্‌নে মোসলেমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'তুমি এমন জঘন্য বস্ত্র কেন পরিয়াছ?' উনি উত্তর না দিয়া নীরব ছিলেন। তখন তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'তুমি উত্তর দিতেছ না কেন?' তখন উনি মুখ ফুটিয়া বলিলেন—'আমি কি উত্তর দিব? যদি বলি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছি, তবে আত্ম-প্রশংসা হইবে; কিন্তু যদি বলি দরিদ্রতা জন্য উৎকৃষ্ট বসন ক্রয় করিতে

পারি নাই, তবে মহাপ্রভুর বিধানের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হইবে।' মহাত্মা ছালমানকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'আপনি উৎকৃষ্ট বসন পরিধান করেন না কেন?' তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—'দাস হইয়া কি প্রকারে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করা যায়? যদি আগামী কল্য স্বাধীন হইতে পারি, তবে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইতে বঞ্চিত হইব না।' খলীফা ওমর এবনে আব্‌দুল আজীজের পরিচ্ছদ ছালা নির্ম্মিত ছিল; তাহা তিনি রাত্রি কালে পরিধান করিয়া নমাজে দণ্ডায়মান হইতেন; লোকে দেখিবে ভয়ে তিনি দিবসে খুলিয়া রাখিতেন। মহাত্মা হাছন বছরী, একদা ফরকদ্‌ ছন্‌জীকে বলিয়াছিলেন—"আমার ভয় হয়, তুমি এই কম্বল পরিধান করিয়া হয়তো নিজকে অপর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধু ছুফী বলিয়া মনে করিতে পার। আমি শুনিয়াছি অধিকাংশ কম্বলপোশ ছুফী দোজখে যাইবে।"

(৩) গৃহের প্রকার ও ব্যবহার উল্লেখে সংসারবিরাগী-গণের পরিতুষ্টির বিবরণ—তৃতীয় প্রকার আবশ্যকীয় পদার্থ হইতেছে গৃহ। শীতাতপ ঝড় বৃষ্টি হইতে দেহ রক্ষার নিমিত্ত বাস গৃহের প্রয়োজন। উহা সাধারণতঃ নিজ-নির্ম্মিত বা ভাটক-গৃহীত হইতে পারে। মছজেদ অতিথিশালা প্রভৃতিতে অস্থায়ী ভাবে সকলেই বাস করিতে পারে। পরের দহ্‌লীজ বা বাহির বাড়ীতেও লোকে আশ্রয় পাইয়া থাকে। এই ধরণের স্থানে বাস করিয়া জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করিলে নির্ম্মাণাদির জন্য ব্যয় করিতে হয় না—বিনা খরচে বাস করা যায়। নিজ-নির্ম্মিত বা ভাটক-গৃহীত গৃহ উন্নত শ্রেণীর আবাস স্থান। এরূপ আবাস গৃহের আয়তন আবশ্যকতার অনুযায়ী হওয়া উচিত। অনাবশ্যক প্রশস্ত বা উচ্চ হওয়া উচিত নহে। বাস গৃহে সাজ সজ্জা বা নানা বর্ণের লতা পাতার চিত্র থাকাও উচিত নহে। বাস গৃহ ছয় গজের অধিক উচ্চ হইলে অধিবাসীকে বৈরাগ্যের আসন হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়। শীতাতপ ও বর্ষা হইতে আত্ম রক্ষার জন্যই গৃহের প্রয়োজন, উহা জাক জমক ও ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের জন্য নহে। জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন -"মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (ﷺ) এর লোকান্তর গমনের পর মুছলমান সমাজে যে সকল বিলাসিতা ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিয়াছে তৎ সমুদয়ের মধ্যে গৃহের আড়ম্বর ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য প্রথম। মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (ﷺ) এর পরে চুণ-কাম করা গৃহ ও সুন্দর সেলাই করা পোষাক মুছলমান সমাজে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

হজরতের সময়ে মুছলমানগণ কামিজ ও পিরাহান আদি বস্ত্র 'এক মাত্র সেলাই' দিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতেন (টীঃ ৩১৯) মহাত্মা হজরৎ আব্বাছ তৎকালে একটী উচ্চ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হজরতের আদেশে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। অন্য এক দিন মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ কোন স্থানে যাইতেছিলেন; অনতিদূরে উচ্চ গুম্বজওয়ালা একটী গৃহ দর্শনে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'ঐ গৃহ কে নির্ম্মাণ করিয়াছে?' লোকে গৃহ-স্বামীর নাম বলিয়াছিল। পরে সেই ব্যক্তি হজরতের সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। সে ব্যক্তি হজরতের অসন্তোষের কারণ অবগত হইয়া গৃহের গুম্বজটী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাতে হজরৎ প্রসন্ন হইয়া তাহার মঙ্গলের জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।" মহাত্মা হাছন বছরী বলিয়াছেন—"মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ স্বীয় বাসের জন্য এক খানি ইষ্টকের উপর আর এক খানি ইষ্টক স্থাপন করেন নাই এবং এক খানি কাষ্ঠের সহিত আর এক খানি কাষ্ঠ জোড় দেন নাই।" মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ বলিয়াছেন,—"মহাপ্রভু যাহার অমঙ্গল ইচ্ছা করেন,

---

টীকা—৩১৯। মূল গ্রন্থে یک درز 'এক সেলাই' লিখা আছে। উহার অর্থ অনেকে অনেক প্রকার করেন। উর্দ্দু অনুবাদক درز শব্দের অর্থ সেলাই না ধরিয়া "কাট ছাট" ধরিয়াছেন। কিন্তু আমাদের নিকট তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। সেলাই নানা প্রকারের আছে—যথা بخیہ বখিয়া, لبکی লপকী, تیپ چی তেপচী, ترپائی তোরপাই, اورما ওরমা, মছলীকাটা কাওয়াদার ইত্যাদি। হজরৎ রসুলের সময়ে মুসলমান সমাজে কেবল এক লপকী বা এক বখিয়া দিয়া কাপড় সেলাই করিবার প্রথা ছিল। লপকী বা বখীয়া দিলেই কাপড় পরিধানের উপযুক্ত হয়; তাহার উপর তোরপাই করিয়া, কাপড়ের মুড়াগুলি মুড়িয়া দিলে সেলাই উত্তম হয়। রসুলের সময়ে লপকী বা বখিয়ার পর কেহ তোরপাই করিতেন না। যদি মুড়াগুলি মুড়িয়া দিবার প্রয়োজন হইত তবে একে বারে দুই মুড়া একত্রে রাখিয়া ওরমার ন্যায় জড়িয়া এক সেলাই করিয়া লইতেন। "এক সেলাই" শব্দের অর্থ আমরা ইহাই বুঝিয়াছি। লপকীর পর এক পাশী তোরপাই করিলে দুই সেলাই দেওয়া হয় তাহাতে সেলাই সুন্দর হয়। বখিয়ার পর এক পাশী তোরপাই করিলে, সেলাই মজবুৎ সুন্দর হয়—দোপাশী তোরপাই করিলে তদপেক্ষা সুন্দর হয়। সৌন্দর্য্য, প্রবৃত্তির লোভনীয়। উহা পরহেজগার লোকে ত্যাগ করেন। এক ছাঁট দিয়া এক এক সেলাই দিলে বা দুই তিন ছাঁট দিয়া দুই তিন স্থানে সেলাই করিলে পরহেজগারীর কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে পারে না॥

তাহার ধন, জলে ও মৃত্তিকায় নষ্ট করিয়া দেন” (টীঃ ৩২০)। মহাত্মা হজরৎ আবদুল্লা এবনে ওমর বলিয়াছেন—“আমরা এক খানি জীর্ণ গৃহের সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, এমন সময়ে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তোমরা কি করিতেছ?’ আমরা নিবেদন করিলাম—‘এই নলের ঘর খানি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।’ আমরা ইহার মেরামত করিতে লাগিয়াছি।’ তিনি বলিলেন,—‘কামতো খুব নিকটে আসিয়াছে, তবে সময় পাইলে হয়।” অর্থাৎ মৃত্যু অতি নিকটে আসিয়াছে। অন্য এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন—‘যে ব্যক্তি অনাবশ্যক গৃহ নির্ম্মাণ করে, কেয়ামতের দিন তাহার মস্তকে সেই গৃহ চাপাইয়া দেওয়া হইবে।’ তিনি ইহাও বলিয়াছেন—‘অভাব মোচনের জন্য মানব যাহা ব্যয় করে, তাহার পুণ্য সে পরকালে পাইবে। কিন্তু জল ও মাটীর মধ্যে যাহা ব্যয় করে, তাহার জন্য কিছুই পাইবে না।” মহাত্মা হজরৎ নূহ্ নবী (আঃ) নলের গৃহ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইবে, লোকে বলিয়াছিল—“ইষ্টক দ্বারা গৃহ বানাইলে অতি সুন্দর হইত।” তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—“যাহাকে মরিতে হইবে, তাহার জন্য এই নলের ঘরও অতিরিক্ত।” মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—“পৃথিবীতে বড় বড় ঘর বানাইলে, পরকালে তজ্জন্য দায়ে ঠেকিতে হইবে, কিন্তু শীত গ্রীষ্ম বর্ষা হইতে মাথা লুকাইবার মানসে যত বড় আবশ্যক, ঠিক তত বড় ঘর বানাইলে পরকালে কোন বিপদের ভয় ঘটিবে না।” শাম (সীরিয়া) দেশে যাইবার পথে অনতিদূরে ইষ্টক নির্ম্মিত একটী উচ্চ প্রাসাদ দেখিয়া আমীরোল মোমেনীন হজরৎ ওমর বলিয়াছিলেন—“ইহার অগ্রে আমি বুঝিতে পারি নাই যে, মুসলমানের মধ্যে কেহ এমন গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। এই প্রকার গৃহ, মন্ত্রী হামান তাহার প্রভু ফের্‌আউনের জন্য বানাইয়াছিল। ফের্‌আউন পাকা ইষ্টক প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া বলিয়াছিল—

فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ

‘হে হামান, আমার জন্য কর্দ্দমের উপর আগুন জ্বালাও।’ অর্থাৎ ইষ্টক পোড়াও।”’ (২০ পারা। সুরা কাছাছ। ৪ রোকূ।) ছাহাবাগণ হদীছ

টীকা—৩২০। জলে ও মৃত্তিকায় ধন নষ্ট করিবার অর্থ অন্যত্র অন্যরূপ হইলেও এস্থলে গৃহ নির্ম্মাণার্থ দেওয়াল দেওয়া, ইট প্রস্তুত করা ইত্যাদি কার্য্য বুঝাইতেছে।

ব্যাখ্যা কালে বলিয়াছেন—"লোকে যখন ছয় গজ অপেক্ষা উচ্চ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে, তখন এক ফেরেশ্‌তা উচ্চ স্বরে বলিতে থাকে—'রে পাপিষ্ঠ! কোথায় আসিতেছিস? তোকে মাটীর মধ্যে যাওয়া উচিত; তাহা না করিয়া আকাশের দিকে উঠিতেছিস!'" মহাত্মা হজরৎ হাছন বলিয়াছেন—"মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (দঃ) এর সমস্ত গৃহ এত উচ্চ ছিল যে এক জন লোক দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইলে গৃহের ছাত স্পর্শ করিতে পারিত।" মহাত্মা ফাজীল বলিতেন—"যাহারা বাসের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ করিয়া মরিয়া যায়, তাহাদের অবস্থা আমার নিকট তত আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু উহা দেখিয়া যাহারা সাবধান হয় না তাহাদের অবস্থা আমার নিকট অতীব আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়।"

(৪) **গৃহ-সামগ্রীর বিভিন্ন বিচার ও ব্যবহার উল্লেখে সংসার-বিরাগীগণের পরিতুষ্টির তারতম্য বিচার**—চতুর্থ প্রকার আবশ্যকীয় পদার্থ—গৃহ-সামগ্রী অর্থাৎ অন্যান্য আবশ্যকীয় পদার্থ। এ সম্বন্ধে মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী (আঃ) এর আচরণ বড় **উচ্চ ধরণের** ছিল। প্রথমে তাঁহার সঙ্গে এক খানি চিরুণী ও একটী ঘটী ছিল। এক দিন কোন ব্যক্তিকে স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা দাড়ীর চুলগুলি আঁচড়াইতে দেখিয়া চিরুণীর অনাবশ্যকতা বোধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পুনরায়, অন্য এক দিন কোন ব্যক্তিকে অঞ্জলী করিয়া জল পান করিতে দেখিয়া ঘটিটীও ফেলিয়া দিয়াছিলেন। গৃহ-সামগ্রী **মধ্যম ধরণে** রাখিতে হইলে প্রত্যেক আবশ্যকীয় পদার্থের এক একটী রাখিতে হয়। তৎসমস্ত পদার্থ মৃত্তিকাময় বা দারুময় হওয়া আবশ্যক। তৎপরিবর্ত্তে তামা পিত্তলাদি ধাতুময় হইলে **বৈরাগ্য লোপ** পায়। পূর্ব্ব কালের সাধু লোকেরা এক সামগ্রী হইতে নানা কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইতেন।

মহাপুরুষ হজরৎ রসুলের গৃহ-সামগ্রী

মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (দঃ) এর একটী মাত্র বালিস ছিল। চর্ম্মের মধ্যে খোর্মা বৃক্ষের সূত্রবৎ ছাল গুলি পুরিয়া সে বালিস প্রস্তুত করা হইয়াছিল। তাঁহার গায়ে দিবার জন্য চাদর স্বরূপ যে কম্বলখানি ছিল তাহাই দুই ভাঁজে পাতিয়া শয্যা করিয়া লওয়া হইত। মহাত্মা হজরৎ ওমর ফারুক এক দিন প্রাতে মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (দঃ) এর পবিত্র পৃষ্ঠ দেশে চাটাইর দাগ দেখিয়া বহু রোদন করিয়াছিলেন। রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে

তিনি বলিয়াছিলেন—"হায়! রোমের 'কায়ছর' ও পারস্যের 'কেছ্‌রা' উপাধিধারী বাদশাগণ আল্লার শত্রু হইলেও অসীম সুখ ভোগে নিমগ্ন আছে আর আল্লার রসুল ও বন্ধু এত কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন।" ইহা শুনিয়া মহাত্মা ওমরকে প্রবোধ দিবার জন্য হজরৎ বলিয়াছিলেন—'হে ওমর! তুমি কি এ কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবে না যে, তাহাদের ভাগ্যে এই পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য আছে; আর আমাদের জন্য পরকালের অসীম সৌভাগ্য অবধারিত রহিয়াছে।' মহাত্মা ওমর এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। হজরৎ পুনরায় বলিলেন—'হে ওমর, আমি যাহা বলিলাম তাহা অতীব সত্য।' * * * একদা মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) সফর হইতে গৃহে আসিবার সময়ে, প্রথমে প্রিয়তমা কন্যা বিবী ফাতেমার সঙ্গে দেখা করিবার মানসে, তাঁহার বাড়ীতে যান। গৃহের দ্বারে একখানি পর্দা ঝুলিতেছিল এবং কন্যার হস্তে দুইগাছী রূপার বালা ছিল; ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে অপ্রিয় বোধ হওয়াতে কাল বিলম্ব না করিয়া বিনা বাক্যালাপে ফিরিয়া গেলেন। বিবী ফাতেমা বুঝিতে পারিলেন যে দুয়ারের পর্দা ও হাতের বালা তাঁহার দৃষ্টিতে অপ্রিয় বলিয়া বোধ হইয়াছে। তজ্জন্যই তিনি কথা বার্ত্তা না বলিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। বিবী মহোদয়া কাল বিলম্ব না করিয়া হাতের দুইগাছী বালা বেচ দেবেমে বিক্রয় পূর্ব্বক পর্দার বস্ত্র সমেত গরীব দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। সেই সংবাদ পাইয়া হজরৎ প্রসন্ন হন এবং কন্যার সহিত দেখা করিতে যান। সাক্ষাতের সময় বলিয়াছিলেন,—'তুমি অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছ।' অন্য এক দিন মহামাননীয়া বিবী আয়শা ছিদ্দীকার ঘরে পর্দা লট্‌কান দেখিয়া হজরৎ বলিয়াছিলেন—"বিচিত্র পর্দা দর্শন করিলে সংসারকে সুখময় বলিয়া আমার মনে হয়; অতএব ইহা দুয়ারে লট্‌কাইয়া না রাখিয়া অমুক দুঃখীকে দান কর।" মহামাননীয়া বিবী আয়শা ছিদ্দীকা বলিয়াছেন "মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) গায়ের কম্বল খানি দুই ভাঁজ করিয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়া লইতেন। এক রজনীতে আমি যত্ন পূর্ব্বক উত্তম শয্যা পাতিয়া দিয়াছিলাম। তাহাতে শয়ন করিয়া তিনি সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যান নাই; কেবল পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া রজনী কর্ত্তন করিয়াছিলেন।" পর দিন প্রাতে তিনি বলিয়াছিলেন,—"উৎকৃষ্ট শয্যায় আমার নিদ্রা নষ্ট করিয়াছে। তদবধি তাঁহার চাদর খানি দুই ভাঁজ করিয়া বিছানায় পাতিয়া দেওয়া হইত।" কোন স্থান হইতে একদিন বহু স্বর্ণমুদ্রা

হজরতের নিকট আসিয়াছিল। তৎ সমস্তই তিনি অভাবগ্রস্ত দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। বিতরণ করিতে করিতে রজনী সমাগত হয়। তখন ছয়টী মুদ্রা অবশিষ্ট ছিল। এশার নমাজ সমাপনান্তে তিনি নিদ্রার জন্য শয্যায় যান। শয়ন করিবার পর বিতরণাবশিষ্ট ঐ ছয়টী মুদ্রার কথা স্মরণ হয়। তখন সেই চিন্তায় তিনি আর নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। কিছুক্ষণ কষ্টে কর্ত্তন করিয়া শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অভাবগ্রস্ত দরিদ্রের অনুসন্ধানে বাহির হন এবং উপযুক্ত লোকের মধ্যে উহা বিতরণান্তে পুনরায় শয্যায় আসিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যান। পর দিন প্রাতে রাত্রির অশান্তির কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"ঐ ছয়টী মুদ্রা রাখিয়া যদি আমি মরিয়া যাইতাম, তবে আমার অবস্থা কেমন হইত ?"

এক জন সাধু মহাত্মা আবু জর এর গৃহে গিয়া দেখিয়াছিলেন তাঁহার গৃহে কিছুই নাই। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন -'হে আবু জর! তোমার! গৃহে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না ইহার কারণ কি ?' তিনি বলিয়াছিলেন— 'আমার আর একখানি বাটী আছে; আমার হস্তে যাহা কিছু আসে, আমি তৎক্ষণাৎ তথায় পাঠাইয়া দিয়া থাকি।' পরকালকে তিনি তাঁহার অন্য বাটী বলিয়া ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন। তখন সেই সাধু পুনরায় বলিয়াছিলেন 'এ গৃহে যত দিন আছ তত দিন তো কিছু গৃহ সামগ্রী নিকটে রাখা আবশ্যক।' তিনি বলিয়াছিলেন—'এ গৃহের অধিপতি আমাকে এথায় আর থাকিতে দিবে না। মহাত্মা হজরৎ ওমর এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হেমছ অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা আমের এবনে সাদ আসিয়াছিলেন; আমীরোল মোমেনীন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'হে আমের! তোমার ভাণ্ডারে এখন কত অর্থ সঞ্চিত আছে ?' তিনি বলিয়াছিলেন—'আমার নিকট একটী লাঠী আছে তাহা অবলম্বন করিয়া আমি চলি এবং শত্রু দিগকে তদ্দ্বারা দণ্ড প্রদান করি, আর একটী চর্ম্ম নির্ম্মিত থলী আছে, তন্মধ্যে আহারীয় দ্রব্যাদি রাখিয়া থাকি। আর একটী পাত্র আছে তাহার উপর খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া আহার করি এবং আবশ্যক হইলে তাহার উপর জল রাখিয়া বস্ত্রাদি ও মস্তক ধৌত করিয়া লই। আর একটী ঘটী আছে তাহাতে জল পান করি এবং ওজু ও অঙ্গ-শুদ্ধি করিয়া লই। এই কয়েক পদার্থ আমার ধন ও গৃহ সামগ্রী। (টিঃ ১২১) মহাত্মা হাছন বছরী বলিয়াছেন, -

টীকা—১২১। এই টীকা চিহ্ন পর্য্যন্ত প্যারার প্রথম অংশ মূল গ্রন্থে পূর্ব্ববর্ত্তী প্যারার অন্তর্গত তারকা চিহ্নত স্থানে ছিল। প্যারার জন্য স্থান পরিবর্তিত হইল।

"আমি ৭০ সহস্র জন ছাহাবার সেবা করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। তাঁহাদের সহবাসে আমি এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছি যে, তাঁহাদের সকলেরই জীবন যাপনের ধরণ একই প্রকার ছিল; তাঁহাদের সকলেরই পরিচ্ছদ নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ প্রকারের ছিল; তাহাও এক প্রস্থ; দিবা রজনী সেই বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতেন। খাট, চৌকি প্রভৃতির উপর কখনই শয়ন করেন নাই—কেবল ভূপৃষ্ঠে নিজের পৃষ্ঠ রাখিয়া শয়ন করিতেন। গায়ে দিবার চাদর খানি হয় উড়িতেন না হয় শয্যা করিয়া পাতিয়া লইতেন। শরীরে ধূলা মাটী লাগিবে বলিয়া কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিতেন না।"

(৫) বিবাহ ব্যাপার উল্লেখে বৈরাগ্যের যৌক্তিকতা বিচার— পঞ্চম আবশ্যকীয় বিষয় পাণি গ্রহণ। মহাত্মা সহল তসতরী ও মহাত্মা সুফিয়ান আয়ানী প্রভৃতি কতকগুলি জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন,—"বিবাহের মধ্যে বৈরাগ্য নাই" (টীঃ ৩২২)। ইহার প্রমাণ করিতে তাঁহারা বলেন, মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** ﷺ জগতের সমস্ত মানব জাতিকে পরহেজগারী শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বৈরাগ্যের আদর্শ হইয়াও সহধর্ম্মিণী বড় ভালবাসিতেন এবং নয় জন ধর্ম্মপত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা হজরৎ আলী করমুল্লাও পরহেজগারগণের শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন; তথাপি তিনিও চারি জন সহধর্ম্মিণী ও দশ বার জন সেবা দাসী রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক পাঠক জানিয়া রাখ, (তাঁহারা অলৌকিক সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন

বৈরাগ্যের জন্য বিবাহে বিরতি অনাবশ্যক

টীকা—৩২২। মূল গ্রন্থে লিখিত আছে—در نکاح زهد نیست অর্থাৎ বিবাহ মধ্যে বৈরাগ্য নাই" এ বাক্য কি অর্থে গৃহীত হইয়াছে, ভাল বুঝা যায় না। ইহার অর্থ অনেক প্রকার হইতে পারে—(১) বিবাহ করিলে পরহেজগারী থাকে না; যথা—আহার করিলে ক্ষুধা থাকে না। (২) পরহেজগার লোক বিবাহ করে না; যথা—ক্ষুধা-হীন লোক আহার করে না। ইহা হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, যতক্ষণ পরহেজগারী থাকে, ততক্ষণ বিবাহ করে না, পরহেজগারী চলিয়া গেলে বিবাহ করে। এরূপ অর্থ মূল গ্রন্থের লক্ষ্য নহে। ঐ কথা হইতে তর্ক শাস্ত্রের নিয়মানুসারে আরও অনেক অর্থ বাহির হয়, তন্মধ্যে, ইহাও একটা—যেমন "বিবাহের মধ্যে পরহেজগারী বা অপরহেজগারীর কোন সংস্রব নাই" অর্থাৎ বিবাহ এক পদার্থ—পরহেজগারী ভিন্ন পদার্থ। গ্রন্থোক্ত জ্ঞানীগণ এই অর্থেই উক্ত কথা বলিয়াছেন।

বলিয়া যে ঐরূপ অমানুষিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নহে) সাধারণ লোকেও পত্নী গ্রহণে বিমুখ হয় ইহা তাঁহারা সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। বিবাহ-জনিত আনন্দ সুখ পরিত্যাগ করাকে যদি বৈরাগ্যের অন্তর্গত মনে করা যাইত এবং তজ্জন্য যদি কেহ দার-পরিগ্রহ না করিত, তবে মানব বংশের উৎপত্তির পথ বন্ধ হইয়া যাইত। বিবাহ হইতে সন্তানোৎপত্তি ও বংশ রক্ষা হয়। উহাতে অসীম মঙ্গল আছে (টীঃ ৩২৩) ক্ষুধার সময়ে অন্ন জলে যেমন অসীম আনন্দ ও সুখ পাওয়া যায়, স্ত্রী সহবাসেও তদ্রূপ এক প্রকার আনন্দ ও সুখ জন্মে। আনন্দ সুখ পরিহার মানসে বৈরাগ্য ভ্রমে, অন্ন জল পরিত্যাগ করিলে যেমন শরীর বিনাশ পায়, স্ত্রী গ্রহণে বিমুখ হইলেও তদ্রূপ মনুষ্য বংশ ধ্বংস হইতে পারে।

অবস্থা বিশেষে বিবাহে বৈরাগ্যের বিধান

পক্ষান্তরে, বিবাহ করিলে, আল্লাকে ভুলিয়া কেবল স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িবার ভয় যাহাদের মনে জন্মে তাহাদের পক্ষে, কাম রিপু প্রবল হইলেও বিবাহ না করাই হিতকর। তবে কথা এই, রূপবতী সুন্দরী কামিনী পরিত্যাগ করতঃ গুণবতী কদাকার স্ত্রীলোক বিবাহ করা অবশ্য বৈরাগ্যের কার্য্য। সুন্দরী রমণী কাম প্রবৃত্তি উত্তেজিত করে, আর গুণবতী কদাকার ভার্য্যা উহা শান্ত করিয়া দেয়। মহাত্মা ইমাম

টীকা—৩২৩। শারীরিক, মানসিক সামাজিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি যে অসংখ্য মঙ্গল বিবাহ হইতে পাওয়া যায়, তাহা পয়গম্বর ভিন্ন অন্য লোকে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে না। বিবাহ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে অপব্যবহার বা কদাচার করিলে যে সমস্ত ক্ষতি উৎপন্ন হয়, তাহাও পয়গম্বরগণই জানিতেন। পয়গম্বর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হজরৎ রসুলে (দঃ) বিবাহ ও তৎসম্বন্ধীয় নিয়ম ও কর্ত্তব্যগুলি মানব জাতিকে পূর্ণ মাত্রায় শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু হায়! তাঁহার অন্যান্য উপদেশ যেমন অবহেলা করিয়া আমরা হীন ও অপদার্থ হইয়াছি, তদ্রূপ বিবাহ বিষয়ক মঙ্গলময় উপদেশও লঙ্ঘন করতঃ দুর্ব্বল, রুগ্ন, ভীরু, কাপুরুষ হইয়া মুছলমান সমাজকে কলঙ্কিত করিয়া রসাতলে দিতেছি। বিবাহে শরীর সুস্থ থাকে এবং উহা যে বহু রোগের ঔষধ, তাহা অনেকে জানেন; মনের বিমর্ষতা ঘুচে—প্রফুল্লতা জন্মে; মানব পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী ও কষ্টসহিষ্ণু হয়। বিবাহের পর হইতে অতিথি-সৎকার, লৌকিকতা, আত্মীয়তার আরম্ভ হয়। শৈশবে সকলেই নিজের ভোগ ও সুখ লইয়া ব্যস্ত থাকে—অন্যের সুখ দুঃখের দিকে দৃষ্টি করিতে জানে না। বিবাহ হইলে দম্পতি মধ্যে এক জন অপরের সুখ ও সুবিধার নিমিত্ত নিজের-ত্যাগ স্বীকার আরম্ভ করিতে শিক্ষা করে। দয়া, মায়া, মমতা, প্রেম প্রভৃতির অনুশীলন আরম্ভ হয়;

আহ্‌মদ হম্বল সাহেবকে লোকে বিবাহ দিবার জন্য এক পরম সুন্দরী কামিনী নির্ব্বাচন করিয়াছিল। সেই কামিনীর এক ভগিনী ছিলেন; তিনি তদপেক্ষা বুদ্ধিমতী, কিন্তু এক-চক্ষু-হীনা ছিলেন। ইমাম মহোদয় সুন্দরী কামিনীর পরিবর্ত্তে সেই কাণা বুদ্ধিমতী রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মহাত্মা হজরৎ জোনায়েদ বলিতেন—"ধর্ম্ম-পথের-প্রথম-পথিক মুরীদগণের পক্ষে ব্যবসায়, বিবাহ ও বিদ্যা-শিক্ষা হইতে বিরত থাকিয়া আত্মরক্ষা করা আমি ভালবাসি।" এই মহাত্মা আরও বলিয়াছেন,—"ছুফীদিগের পক্ষেও বিদ্যা-চর্চ্চা আমি পছন্দ করি না। ইহার কারণ এই, বিদ্যাচর্চ্চা করিতে গেলে মনে নানা চিন্তা ও ভাব আবির্ভূত হয়, তৎপ্রভাবে হৃদয় চঞ্চল হয়—প্রশান্ত হইতে পারে না।"

(৬) ধন ও মানের ব্যবহার উল্লেখে সংসারবিরাগীগণের পরিতুষ্টির বিবরণ—ষষ্ঠ আবশ্যকীয় বিষয়—ধন ও মান। পাঠক! স্মরণ কর—'বিনাশন পুস্তকে'র 'ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদে' বলা হইয়াছে যে, ধন ও মানসম্ভ্রম, এই দুই পদার্থ, সাংঘাতিক বিষতুল্য ক্ষতিকর হইলেও অভাব-মোচনের পরিমাণ উহা ব্যবহার করিলে অমৃত-তুল্য উপকার হয়। অভাব-মোচনের পরিমিত ধন ও মান-সম্ভ্রম, 'দুনিয়া' নামক মোহ-উৎপাদক পদার্থ-শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, বরং ধর্ম্মপথে ও গুণ-উপার্জ্জন-বিষয়ে সাহায্য করে বলিয়া পারলৌকিক হিতকর পদার্থের অন্তর্গত।

ধন মানের পরিমিত ব্যবহার দুনিয়া নামক মোহ উৎপাদক লোভনীয় পদার্থ নহে

এক সময়ে মহাত্মা হজরৎ এব্‌রাহীম নবী (আঃ) নিতান্ত অভাবে পড়িয়া কোন বন্ধুর স্থানে কিছু ধার চাহিয়াছিলেন। তখনই প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল—"হে এব্‌রাহীম! আমি তোমার প্রকৃত বন্ধু, তুমি আমার নিকট কেন করজ চাহিলে না?" তিনি নিবেদন করিলেন—"হে মহাপ্রভো! আমি ইহা বিলক্ষণ জানি যে, তুমি 'দুনিয়াকে' ভালবাস না; তজ্জন্যই তোমার নিকট উহা চাহিতে ভয় হইয়াছিল।" তখনই প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল—"হে এব্‌রাহীম। যে পদার্থ নিতান্ত আবশ্যক, তাহা 'দুনিয়া' নামক মোহ-উৎপাদক পদার্থ নহে।" যাহা হউক, ফল কথা এই যে—যাঁহারা পরকাল-সম্বন্ধীয়

নিজে না খাইয়া অপরকে খাওয়াইতে ও অপরকে সুখী করিতে শিক্ষা তখন হইতে আরম্ভ হয়। বিবাহ হইতে এতদ্রূপ বহু উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক গুণ লাভ হয়। এই সমস্ত কথা সকলেই বুঝে। জ্ঞান-রাজ্যের পথে যিনি যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি বিবাহের তত মঙ্গল বুঝিতে পারেন।

চিন্তায় বিভোর থাকায়, লোভনীয় পদার্থের দিকে মন দিতে অবসর পান না, তবে নিতান্ত অভাব আসিয়া বাধিলে, যাঁহারা কেবল তন্মোচনের পরিমিত ধন ও মান ব্যবহার করতঃ উহা নিবারণ পূর্ব্বক পরিতুষ্ট ও প্রশান্ত হইতে পারেন, তাঁহাদের মনকে ধন ও মান সম্বন্ধে নির্লিপ্ত বলা যায়। ধন ও মান সম্বন্ধের কিয়দংশ ব্যবহার করতঃ অভাব ঘুচাইলেও তাঁহারা উহা ভালবাসেন না।

পার্থিব-পদার্থের-বৈরাগ্যোচিত-ব্যবহার বিষয়ক আলোচনার উপসংহার—লোভনীয় পদার্থের চিন্তা ও আলোচনা হইতে মন তুলিয়া লইয়া প্রশান্ত হইবার অভ্যাস জন্মাইতে পারিলে পরিশেষে এই এক মহা ফল হস্তগত হয় যে, ইহজগৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরকালে যাইবার সময়ে অর্থাৎ আসন্ন মৃত্যুকালে মানব মন, নিম্ন পার্থিব জগতের দিকে আর আকৃষ্ট হয় না এবং পরকালে যাইবার সময়ে এদিকে আর ফিরিয়া চায় না। যে ব্যক্তি পৃথিবীকে আরামের স্থান বলিয়া জানে, সে ব্যক্তি পরকালে যাইবার সময়ে ইহার দিকে পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি পৃথিবীকে 'পায়খানা' তুল্য ঘৃণিত স্থান বলিয়া মনে করে, সে মৃত্যু কালে ইহার দিকে দৃক্‌পাতও করে না। পৃথিবীকে পায়খানার সহিত তুলনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, কঠিন আবশ্যক না হইলে কেহই তথায় যাইতে চায় না। আবার কার্য্য সমাধা হইলে তাড়াতাড়ী তথা হইতে বাহির হইয়া পড়ে—ইচ্ছা পূর্ব্বক কেহই তথায় বসিয়া থাকিতে চায় না। পৃথিবীর মধ্যে যখন অন্ন বস্ত্র গৃহাদির কঠিন আবশ্যক উপস্থিত হয়, তখন এথা হইতে তৎ তৎ অভাব মোচনের পদার্থ লইয়া কার্য্য সমাধা করিতে হয়। মৃত্যু ঘটনায় যখন সমস্ত অভাব শেষ হইয়া যায়, তখন 'বাহ্য সমাপ্তির' পর 'পায়খানা' পরিত্যাগের ন্যায় আগ্রহের সহিত পৃথিবী হইতে সরিয়া যাওয়া উচিত। যাহারা সংসারকে অভাব মোচন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে না, তাহারাই মৃত্যু কালে ইহার দিকে দৃক্‌পাতও করে না। যাহারা সংসারের প্রতি প্রগাঢ় আসক্ত থাকে, মৃত্যু কালে তাহাদের অবস্থা কিরূপ হয়, বুঝাইবার জন্য একটী দৃষ্টান্ত

লোভনীয় ও মোহ উৎপাদক পদার্থই দুনিয়া—ইহা পরিত্যাগ বাঞ্ছনীয় (ফল মৃত্যুকালে পার্থিব চিন্তা মুক্তি)

জীবন ধারণার্থ অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ—ইহা অভাব মোচন ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা বাঞ্ছনীয় (ফল—বৈরাগ্যে উন্নতি)

দেওয়া হইতেছে। মনে কর তোমাকে কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিতে দেওয়া হইবে না—থাকিতে চাহিলেও বল পূর্ব্বক তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। ইহা জানিয়াও যদি তুমি স্বীয় গ্রীবা দৃঢ় ভাবে তথায় লৌহ-শৃঙ্খলে বান্ধিয়া রাখ, অথবা মস্তকের কেশ-পাশ ঐ স্থানে শক্ত করিয়া পেঁচাইয়া রাখ, তবে যখন তোমাকে তথা হইতে বল পূর্ব্বক টানিয়া বাহির করা হইবে, তখন তোমার শরীরটী বিদূরিত হইবে বটে, কিন্তু মস্তকটী ছিন্ন হইয়া তথায় পড়িয়া থাকিবে অথবা মস্তকের চুলগুলি উপড়িয়া যাওয়াতে দারুণ ক্ষত উৎপন্ন হইবে। উভয় অবস্থাতেই ক্ষত-যাতনা বহুদিন পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইবে। মহাত্মা হাছন বছরী বলিতেন—"আমি এমন এক শ্রেণীর লোক (অর্থাৎ কতকগুলি ছাহাবা) দেখিয়াছি যে, তাঁহারা বিপদ আপদে পতিত হইলে এতদূর আনন্দিত হইতেন যে, তোমরা মহা সম্পদ পাইলেও তত আনন্দিত হইতে পার না। তাঁহারা যদি তোমাদিগকে দেখিতেন তবে বলিতেন—'ইহারা শয়তান ভিন্ন আর কিছু নয়।' আর তোমরা যদি তাঁহাদিগকে দেখিতে, তবে বলিতে—'উঁহারা পাগল বই আর কিছু নহেন।'" তাঁহারা বিপদ আপদ, দুঃখ কষ্ট পাইতে যে তদ্রূপ আগ্রহ করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের এই উদ্দেশ্য ছিল যে তাঁহারা তদুপায়ে স্বীয় মনকে পৃথিবী হইতে ভাঙ্গিয়া লইতেন এবং সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। সংসারের প্রতি মন বিরক্ত হইয়া পড়িলে মৃত্যু কালে সমস্ত পার্থিব পদার্থের দিকে ঘৃণা জন্মে এবং এখান হইতে পলাইতে আগ্রহ জন্মে। এই অবস্থা লাভ করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। (আল্লাই ভাল জানেন।)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সঙ্কল্প—একক ও প্রকৃত।

نیت و اخلاص و صدق

বিশুদ্ধ সঙ্কল্পের চরম প্রয়োজনীয়তা—প্রিয় পাঠক! জানিয়া রাখ—চক্ষুষ্মান জ্ঞানী লোক সুস্পষ্ট দর্শন করিয়াছেন যে, মানবজাতির মধ্যে সদনুষ্ঠানকারী লোক ভিন্ন অপর সকল ক্ষতিগ্রস্ত এবং তাহাদের জীবনও বিনষ্ট হইতেছে, কিন্তু সেই সদনুষ্ঠানকারীদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানের উপদেশ মত কার্য্য না করে, তাহাদেরও পরিশ্রম নষ্ট এবং জীবনও ধ্বংস প্রাপ্ত। আবার জ্ঞানী আলেমগণের মধ্যে যাহারা কেবলমাত্র আল্লার জন্য বিশুদ্ধ সঙ্কল্পে, জ্ঞানানুমোদিত কার্য্য না করে, তাহাদের জীবনও ধ্বংস প্রাপ্ত। যাহা হউক, বিশুদ্ধ সঙ্কল্পানুযায়ী অনুষ্ঠানকারী লোকের কার্য্য বড় বিপদ সঙ্কুল; সঙ্কল্প মধ্যে বিশুদ্ধভাব কিঞ্চিৎ ত্রুটী হইলেই তাহাদের সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইয়া যায়। (বিশুদ্ধ সঙ্কল্পই কল্যাণপ্রসূ অনুষ্ঠানের প্রাণ)

কল্যাণপ্রসূ সঙ্কল্পের মধ্যে অবশ্য রক্ষণীয় দ্বিবিধ ভাব—(১) 'বিশুদ্ধতা' (এখলাছ) যেমন সঙ্কল্পের মধ্যে রক্ষা করা অতীব আবশ্যক, তদ্রূপ—(২) সত্য বা "প্রকৃত বাস্তবিকতা" (ছেদক) তন্মধ্যে থাকাও নিতান্ত প্রয়োজন। এই দুটী 'ভাব' সঙ্কল্পের মধ্যে না থাকিলে, 'অনুষ্ঠান' হইতে কোন কল্যাণই পাওয়া যায় না। প্রথমে সঙ্কল্পের অর্থ বুঝিলে উহার 'ভাব' বা অবস্থা জানা সহজ হইতে পারে; কিন্তু সঙ্কল্পের অর্থ না বুঝিতে পারিলে, উহার মধ্যে এখলাছ (বিশুদ্ধতা) ও ছেদক ('প্রকৃত বাস্তবিকতা') রক্ষা করা যায় না (টীঃ ৩১৪)। এই জন্য এই পরিচ্ছেদটী তিন অনুচ্ছেদে বিভাগ করিয়া—প্রথম অনুচ্ছেদে نیت (নীয়ৎ) সঙ্কল্পের অর্থ, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে اخلاص (এখলাছ) বিশুদ্ধতার পরিচয় এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদে صدق (ছেদক) প্রকৃত বাস্তবিকতার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

টীকা ৩১৪ উপরে যে কয়েক পংক্তি লেখা গেল; তাহা মূল গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। মূল গ্রন্থে ঐ স্থান ঠিক তিন লাইনের মধ্যে এমন সংক্ষিপ্ত করিয়া লিখা হইয়াছে যে, তাহার অনুবাদ করা যায় না। এই জন্য 'এহ্‌ইয়া-উল্‌-উলুম' হইতে ভাব সংগ্রহ করতঃ সেই ভাব বঙ্গ [illegible] উপযুক্ত করিয়া স্বাধীন ভাবে লিখা গেল। গ্রন্থাংশের অবিকল অনুবাদ করিলে উহার কিছুই বুঝা যাইত না।

প্রথম অনুচ্ছেদ 'নীয়ৎ' বা সঙ্কল্প।

সঙ্কল্পজনিত উপকার সম্বন্ধে হদীছ ও মহাজন উক্তি—পাঠক! 'নীয়ৎ' অর্থাৎ সঙ্কল্পের কল্যাণে কত উপকার পাওয়া যায়, প্রথমে তাহা বুঝিয়া লও। সঙ্কল্পই অনুষ্ঠানের জীবন। সঙ্কল্প লইয়াই বিচার হইবে এবং উহারই বিশুদ্ধতা অনুসারে কার্য্যের ফল পাওয়া যাইবে। (১) মহাবিচারক কেবল ক্রিয়া কলাপের সঙ্কল্প দেখিয়া বিচার করেন। এই জন্য মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—'মহাপ্রভু তোমাকে বা তোমার কার্য্য দেখিবেন না—কেবল তোমার অন্তর ও তোমার সঙ্কল্প দেখিবেন।" অন্তরটী সঙ্কল্পের স্থান বলিয়া উহা দেখিবেন। (২) তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্য হইয়া থাকে। সদনুষ্ঠানের মূলে যে সঙ্কল্প করা যায়, প্রত্যেক ব্যক্তি তদনুরূপ ফল পাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আল্লার প্রসন্নতা পাইবার মানসে গৃহ ত্যাগ পূর্ব্বক হজে বা জেহাদে (ধর্ম্মযুদ্ধে) যায়, তাহার গৃহত্যাগ আল্লার জন্যই হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি ধন বা রমণী পাইবার আশায় হজে বা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যায়, তাহার গৃহত্যাগ আল্লার জন্য হইতে পারে না—উহা তাহার কামনার অনুযায়ী পদার্থের জন্য হয়।" (৩) তিনি আরও বলিয়াছেন—"আমার উম্মৎগণের মধ্যে বহু লোক শয্যার উপর, উপাধানে মস্তক রাখিয়া প্রকৃত শহীদের (ধর্ম্ম-যোদ্ধার) ন্যায় প্রাণ ত্যাগ করিবে; কিন্তু বহু লোক, যুদ্ধ-প্রবৃত্ত দুই সৈন্যদলের মধ্যে হত হইয়াও দোজখে চলিয়া যাইবে। তাহার কারণ এই যে, আল্লা উহাদের সঙ্কল্প উত্তম রূপে জানেন।" (৪) তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"মানব সৎকার্য্য করিলে, ফেরেশ্‌তাগণ তাহা উত্তম জানিয়া আল্লার সমীপে লইয়া যায়, কিন্তু তিনি উক্ত সৎকার্য্য মানবের কার্য্য-তালিকা হইতে কাটিয়া ফেলিতে ফেরেশ্‌তাগণকে আদেশ করেন; অপর পক্ষে যে ব্যক্তি, যে কার্য্য, দৃশ্যতঃ করে নাই, সে পুণ্য তাহার কার্য্য-তালিকায় লিখিতে অনুমতি করেন। ফেরেশ্‌তাগণ ইহার মর্ম্মবোধে অক্ষম হইয়া নিবেদন করে, 'হে মহাপ্রভো! এরূপ কার্য্য তো ঐ ব্যক্তি করে নাই।' আদেশ হইবে—'যদিও দৃশ্যতঃ করে নাই, তথাপি সঙ্কল্প করিয়াছিল।'" (৫) হজরৎ আরও বলিয়াছেন—"চারি ধরণের লোক আছে; তন্মধ্যে এক প্রকার লোক ধনবান। তাহারা জ্ঞানের উপদেশ মত স্বীয় ধন সদ্ব্যয় করে। দ্বিতীয় প্রকার লোক, নির্ধন; তাহারা আন্তরিক আশা করে যে, যদি আমাদের ধন

থাকিত তবে সৎকার্য্যে ব্যয় করিতাম। এই দুই শ্রেণীর লোক সমান পুণ্য পাইবে। তৃতীয় প্রকার লোকও ধনবান্; কিন্তু তাহারা অন্যায় কার্য্যে অপব্যয় করে এবং চতুর্থ প্রকার লোক নির্ধন; তাহারাও অন্যায় অপব্যয় করাকে উত্তম কার্য্য মনে করিয়া বলিতে থাকে—'যদি আমাদের প্রচুর ধন থাকিত তবে আমরাও ঐরূপ ধুমধাম করিতাম।' এই শেষোক্ত দুই দল সমান পাপী হইবে।" এই বাক্যের অর্থ এই যে, সৎকার্য্য করিয়া ফেলিলে যে ফল পাওয়া যায়, শুধু ইচ্ছা করিলেও সেই ফল পাওয়া যায়। (৬) মহাত্মা হজরৎ আনেছ বলিয়াছেন—"তাবুক যুদ্ধ শেষ হইলে মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (ﷺ) বাহিরে আসিয়া বলিয়াছিলেন—'আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি প্রভৃতি যুদ্ধের দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া যে ফল পাইলাম, মদীনার অনেক লোক ঘরে থাকিয়াও তাহার অংশ প্রাপ্ত হইয়াছে।' ইহা শুনিয়া উপস্থিত লোকেরা নিবেদন করিয়াছিল—'হে রসুলুল্লা! তাহারা তো জেহাদে (ধর্ম্ম-যুদ্ধে) আসে নাই, কেমন করিয়া অংশ পাইবে?' হজরৎ বলিয়াছিলেন—'তাহাদের যুদ্ধে আসিবার ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার অনুরূপ ছিল, কিন্তু প্রবল বাধা ছিল বলিয়া আসিতে পারে নাই।'" * * * (৭) মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (ﷺ) বলিয়াছেন—"যাহার সঙ্কল্প ও সাহস সংসার সম্বন্ধেই আবদ্ধ থাকে, তাহার চক্ষুর সম্মুখে দরিদ্রতা সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ায় এবং মৃত্যুকালে সংসারের মায়াতে বান্ধা থাকিয়া মরে। অপর পক্ষে, যাহার সঙ্কল্প ও সাহস পরকালের কার্য্য অবলম্বনে হয়; মহাপ্রভু তাহার হৃদয় সম্পূর্ণ ধনী করিয়া রাখেন এবং মৃত্যুকালে সে পূর্ণ বৈরাগ্য লইয়া পরকালে পার হয়।" (৮) তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"মুসলমান যখন, কাফেরের সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধে রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হন, তখন ফেরেশ্তাগণ তাহাদের 'আমল নামার' মধ্যে এইরূপ লিখিতে থাকেন যে—'অমুক ব্যক্তি, কুসংস্কার-মূলক বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিতেছে,' 'অমুক, মান সম্ভ্রম রক্ষার জন্য লড়িতেছে' পরিশেষে লিখে—'অমুক, অমুক ব্যক্তি আল্লার পথে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে।' যে ব্যক্তি আল্লার 'একত্ব-জ্ঞানের কথা' জগতে প্রচার করিতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সে আল্লার জন্য যুদ্ধ করে বলিতে হইবে।" (৯) তিনি আরও বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি, স্ত্রীর প্রাপ্য যৌতুক (মোহরআনা) ফাঁকী দিবার মানসে বিবাহ সময়ে চালাকী করে, সে ব্যক্তি পরস্ত্রী গামী ব্যভিচারী; এবং যে ব্যক্তি, 'ঋণ পরিশোধ করিব না' এরূপ ইচ্ছা করিয়া করজ লয়, সে ব্যক্তি চোর।"

টীকা

(১) এছরায়েল বংশে একজন নিতান্ত দরিদ্র লোক ছিল। ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে সে বেচারা সপরিবারে মৃতবৎ হইয়াছিল। এক দিন কিছু খাদ্য শস্য পাইবার আশায় গ্রামান্তরে যাইতেছিল। পথিমধ্যে বায়ু পরিচালিত বালুকা স্তূপ দেখিতে পাইয়া মনে ভাবিয়াছিল—'হায়! আমার অধিকারে এ পরিমাণ ময়দা থাকিলে আমি দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতাম।' সেই সময়ে যে পয়গম্বর ছিলেন, তাঁহার প্রতি এই প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল যে—'অমুককে বলিয়া দাও তাহার দান মহাপ্রভু নিরতিশয় আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।' যদি সেই ব্যক্তি ঐ সময়ে তত ময়দা পাইত, তবে গরীব দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করিয়া দিত, কিন্তু না পাওয়াতে তাহার হাত আটক ছিল সুতরাং পারে নাই। বিতরণ করিলে যে পুণ্য পাইত, শুধু সঙ্কল্প করিয়া সে তত পুণ্য পাইয়াছে। (টীকা ৩২৫) (২) জ্ঞানীগণ বলিয়াছেন—"অগ্রে সৎকার্য্যের সঙ্কল্প সম্বন্ধে জ্ঞান শিক্ষা কর, তাহার পর কার্য্য করিতে যাইও।" (৩) এক ব্যক্তি বলিতেছিল—"হে বন্ধুগণ! আমাকে সদনুষ্ঠান বিষয় শিক্ষা দাও, আমি দিবা নিশি সৎকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে চাই—মঙ্গল হস্তচ্যুত হইতে দিতে চাই না।" (৪) লোকে বলিয়াছিল—"পরোপকার কর, যদি করিতেও না পার, তবে পরোপকার করিবার ইচ্ছা সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক রাখ।" (৫) মহাত্মা হজরৎ আবু হোরায়রা বলিতেন "মহাবিচারের দিন মানব-মণ্ডলীকে তাহাদের সঙ্কল্পের অনুরূপ আকারে উত্থাপিত করা হইবে।" (৬) মহাত্মা হজরৎ হাছন বছরী বলিতেন "জীবনের এই কএকটী সংক্ষিপ্ত দিনের সৎকার্য্য আর কত? এই সংক্ষিপ্ত সৎকার্য্যে কি অনন্ত চিরস্থায়ী বেহেশ্‌ত পাওয়া যায়? উহা পাইবার একটী কৌশল আছে সর্ব্বদা নিরবছিন্ন ভাবে সৎকার্য্যের সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ কর, তাহাতে চিরস্থায়ী বেহেশৎ মিলিবে, কেননা সঙ্কল্পের সীমা নাই।"

নীয়ৎ বা সঙ্কল্পের পরিচয়—পাঠক! জানিয়া রাখ—মানব দ্বারা কোন কার্য্য ঘটিবার পূর্ব্বে তিনটী কারণের সমাবেশ হওয়া আবশ্যক, যথা—(১) জ্ঞান বা জানা, (২) ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য, এবং (৩) অবাধ ক্ষমতা; এই তিনটী কারণ একত্র হইলে কার্য্যের উৎপত্তি হয়; কিন্তু তন্মধ্যে কোন একটির অভাব হইলে কার্য্য ঘটিতে পারে না। দেখ, অন্ন না

মানবীয় কার্য্যের উৎপত্তি—ত্রিবিধ কারণের সমাবেশে

টীকা ৩২৫। এই টীকা চিহ্ন পর্য্যন্ত প্যারার প্রথম অংশ মূলগ্রন্থে পূর্ব্ববর্ত্তী প্যারার অন্তর্গত তারকা চিহ্নিত স্থানে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা হইল।

দেখা পর্য্যন্ত কেহ খাইতে পারে না; আবার দেখিলেও ইচ্ছা বা ক্ষুধা না থাকিলে কেহ আহার করে না। তাহার পর ইচ্ছা জন্মিলেও ক্ষমতা না থাকিলে খাওয়া যায় না; যাহার ক্ষুধা হইয়াছে কিন্তু হস্ত এমন অবশ যে খাদ্য দ্রব্য মুখে তুলিয়া দিতে পারিতেছে না। অথবা চর্ব্বণ-ক্ষমতা বা গিলিবার শক্তি নাই, সে ব্যক্তি আহার করিতে পারে না। তবেই দেখ প্রত্যেক ক্রিয়ার অগ্রে, জ্ঞান, ইচ্ছা এবং ক্ষমতা এই তিন কারণ বর্ত্তমান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কার্য্য ক্ষমতার অধীন; ক্ষমতা আবার ইচ্ছার অধীন; কেননা ইচ্ছার উদয় হইলে ইন্দ্রিয়াদির ক্ষমতাকে কার্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত আদেশ করে। সেই ইচ্ছা কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞানের অধীন নহে। ইহার প্রমাণ এই যে, মানব বহু বস্তু ও ব্যাপার দেখিতেছে এবং তাহার ভাল মন্দ গুণও দেখিতেছে, অথচ তৎসকলের প্রতি কোন ইচ্ছা জন্মিতেছে না। আবার ইহাও ধ্রুব সত্য যে বিনা 'জ্ঞানে' ইচ্ছার উৎপত্তি হয় না। মানব যে পদার্থের গুণাগুণ না জানে, তাহা পাইতে বা পরিহার করিতে কেমন করিয়া 'ইচ্ছা' করিতে পারে?

যাহা হউক, উপরোক্ত তিন কারণের মধ্যে 'ইচ্ছার' অন্য নাম 'সঙ্কল্প' এবং তাহাকেই আরবীতে 'নীয়ৎ' বলে। ইহাকে স্থান বিশেষে 'উদ্দেশ্য' বা 'অভিপ্রায়'ও বলা যাইতে পারে। যে ইচ্ছা মানবকে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয় এবং বিপদ আপদ অগ্রাহ্য করতঃ স্থির ও অটল ভাবে কার্য্যে লাগাইয়া রাখে, সেই প্রবল ও গাঢ় ইচ্ছাকে 'অধ্যবসায়' বলে। যাহা হউক, এই সমস্তই 'নীয়তের' পৃথক্ পৃথক্ বিকাশ বা অবস্থা। এখন ভাবিয়া দেখ, যে আভ্যন্তরিক উত্তেজনা, মানুষকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করে এবং তাহাতে লাগাইয়া রাখে, তাহাকেই 'নীয়ৎ' বা 'উদ্দেশ্য' বলে।

সঙ্কল্পের পৃথক পৃথক বিকাশ বা অবস্থা

একক সঙ্কল্প ও একাধিক সঙ্কল্পের পার্থক্য—এই 'নীয়ৎ' বা উদ্দেশ্যের সংখ্যা কখনও একটী আবার কখনও একাধিক হইয়া থাকে। কার্য্যের উদ্দেশ্য যখন একটীমাত্র থাকে, তখন তাহাকে خالص খালেছ (টীঃ ৩২৬) বলে। মনে কর—এক ব্যক্তি নিশ্চিন্ত মনে উপবিষ্ট আছে, একটী ব্যাঘ্র মুখ ব্যাদন পূর্ব্বক তাহাকে গ্রাস করিতে আসিল। ইহা দর্শনে

টীকা—৩২৬। "খালেছ" বিশেষণ পদ, অর্থ—'অমিশ্র' যাহার মধ্যে অন্য কিছু মিশান নাই। যেমন 'খালেছ' মধু বা 'খালেছ' দুধ ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই যে খাঁটি

তাহার মনে প্রাণ-রক্ষার্থ পলায়নের ইচ্ছা উৎপন্ন হইবে। এস্থলে পলায়নের ইচ্ছা একমাত্র কারণ। এইরূপ কোন ভক্তিভাজন সম্ভ্রান্ত লোককে নিকটে আসিতে দেখিলে মানুষ দণ্ডায়মান হয়। কোন্ উত্তেজনার প্রভাবে দণ্ডায়মান হয়? কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, এস্থলে কেবল সম্মান-প্রদর্শনের ইচ্ছায় মানুষকে দণ্ডায়মান করাইয়াছে। এস্থলে সম্মান-প্রদর্শনের ইচ্ছা একমাত্র কারণ। সুতরাং উভয় স্থলের উদ্দেশ্যই 'খালেছ' (অমিশ্র বা একক।)

এখন একটী কার্য্য, কি প্রকারে দুই উদ্দেশ্যে ঘটিয়া থাকে তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। যে স্থলে দুই উদ্দেশ্যের প্রভাবে কোন কার্য্য সংঘটিত হয়, তথায় উভয়ের বলের তারতম্য অনুসারে তিন অবস্থা ঘটে।

একাধিক সঙ্কল্পের মিলিত প্রভাবের তারতম্যানুসারে ত্রিবিধ অবস্থা প্রদর্শন।

প্রথম—মিলিত দুই উদ্দেশ্যের প্রত্যেকটী এরূপ বলবান্ যে, একটীর প্রভাবেই কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে। মনে কর—কোন দরিদ্র আত্মীয় আসিয়া তোমার স্থানে একটী টাকা চাহিলেন। তুমি তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিয়া থাক এবং তজ্জন্য তাহাকে একটি টাকা দিতেও প্রস্তুত ছিলে আবার তিনি যেরূপ দরিদ্র হইয়া কষ্টে পড়িয়াছেন, তাহাতে আত্মীয় না হইয়া অপর দরিদ্র হইলেও দয়া করিয়া একটি টাকা দিতে। এইরূপ স্থলে সেই দরিদ্র আত্মীয়কে তুমি একটি টাকা দিলে। এখন বিবেচনা কর ঐ দানের মধ্যে সম্মান-প্রদর্শন ও দয়া উভয় উদ্দেশ্য তোমার মনে সমান বলবান ও কার্য্যকর ছিল; সুতরাং তোমার মনের সঙ্কল্প ভাগাভাগী হইয়া পড়িল। এ বিষয়টী পুনরায় অন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। মনে কর—এক খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর স্থানান্তরিত করিতে হইবে। দুই জন সমান বলবান পুরুষ আসিয়া দাঁড়াইল। উভয় ব্যক্তি এমন বল-

মধু বা দুধ ভিন্ন তন্মধ্যে অন্য কোনও দ্রব্য নাই। মিষ্ট শব্দটীও 'খালেছ' শব্দের ন্যায় বিশেষণ পদ। যে ভাব বা অবস্থা বর্ত্তমান থাকিলে কোন পদার্থ মিষ্ট হয়, তাহাকে যেমন 'মিষ্টতা' বলে, তদ্রূপ যে ভাব বা অবস্থা থাকিলে উদ্দেশ্য 'খালেছ' হয়, তাহাকে 'এখ্‌লাছ' বলে। কিন্তু 'এখ্‌লাছ' ভাবটী ব্যাপক অর্থ হারাইয়া এখন সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এখন 'এখ্‌লাছ' বলিলে এই বুঝায় যে, মন যে উত্তেজনায় কাজ করিতে উৎসুক হইয়াছে, তাহার মধ্যে অন্য কোন ভাব নাই কেবল আল্লার চিন্তা মাত্র বর্ত্তমান আছে। 'খালেছ' শব্দটী যেমন মধু, দুধ ইত্যাদি নানা পদার্থের বিশেষণ হইতে পারে তেমনই 'উদ্দেশ্য'রও বিশেষণ হইয়া 'অমিশ্র উদ্দেশ্য' বুঝাইতে পারে। কিন্তু 'এখ্‌লাছ' ভাবটী 'নীয়ৎ' বা 'উদ্দেশ্য' ভিন্ন অন্য পদার্থের 'অমিশ্র ভাব' বুঝায় না।

যান্ যে, প্রত্যেকেই প্রস্তর খণ্ড সরাইতে পারে; তথাপি দুইজন একত্রে ধরাধরী করিয়া প্রস্তর খণ্ড সহজেই সরাইয়া দিল। দ্বিতীয়—পূর্ব্বোক্ত দানের সময়ে যদি তুমি এইরূপ বিবেচনা করিতে যে, সেই প্রার্থী দরিদ্র না হইয়া যদি কেবল আত্মীয় হইত, কিম্বা দরিদ্রই হইত, অথচ আত্মীয় না হইয়া অপর লোকই হইত, তবে তুমি টাকা দিতে না। এক সঙ্গে আত্মীয় ও দরিদ্র হওয়ার জন্যই তুমি তাহাকে টাকা দিয়াছ; সে স্থলে আত্মীয়তা ও দয়া, দুই উদ্দেশ্য একত্র মিলিত হইয়া দান কার্য্যটী ঘটাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ঐ দুই উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র থাকিলে দান কার্য্য ঘটিত না। পূর্ব্বোক্ত প্রস্তর খণ্ড সরাইতে যে দুই জন লোক প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারা যদি কেহই একাকী সরাইতে না পারিত, কিন্তু দুই জনের বল একত্র প্রয়োগ করিয়া উহা সরাইয়া থাকিত, তবে দৃষ্টান্তটী ঠিক মিলিত। তৃতীয়—দুই উদ্দেশ্যের মধ্যে একটী এমন দুর্ব্বল যে, উহা কখনই মানবকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারিতেছে না; এমন সময়ে অপর একটী বলবান্ উদ্দেশ্য আসিয়া জুটিল; এ উদ্দেশ্যটী একাকী মানবকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে। সে স্থলে দুর্ব্বল ও সবল দুই উদ্দেশ্য একত্র মিলিত হইয়া কার্য্যটী নিতান্ত সহজে নির্ব্বাহ করে। দেখ, শেষ রাত্রিতে উঠিয়া নমাজ পড়িবার যাহার অভ্যাস আছে, সে ব্যক্তি যদি বহু লোককে একত্রে নমাজ পড়িতে দেখে, তবে তাহার মনে শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক নমাজের জন্য দাঁড়াইতে স্ফূর্ত্তি আসে এবং নমাজ পড়াও নিতান্ত সহজে সম্পন্ন হয়; কিন্তু ঐ ব্যক্তির মনে যদি পুণ্য প্রাপ্তির আশা না থাকিত, তবে দেখাদেখী উৎসাহ বৃদ্ধির কথা কি, হাজার উপদেশ দিলেও সে নমাজ পড়িবার জন্য সুখশয্যা ত্যাগ করিতে পারিত না। ইহা বুঝাইবার জন্য আর একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতেছে। মনে কর, এক জন বলবান ব্যক্তি, পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরখণ্ড সহজে সরাইতে পারে। সে স্থলে অপর এক জন দুর্ব্বল ব্যক্তি—যে একাকী উহা সরাইতে পারে না—আসিয়া যদি যোগ দেয়, তবে অতি সহজে প্রসন্নতার সহিত সে কার্য্যটী সম্পন্ন হইতে পারে। যাহা হউক, ফল কথা এই, উদ্দেশ্য দুটীর বলের তারতম্য অনুসারে উপরি উক্ত তিন অবস্থা ঘটে।

'এখ্লাছ' বা বিশুদ্ধ সঙ্কল্পের পরিচয় কালে 'দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ'এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা যাইবে। তবে এস্থলে এ কথাগুলি বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, যে উত্তেজনা মনের মধ্যে

উৎপন্ন হইলে লোককে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, তাহাকে 'নীয়ৎ' বা সঙ্কল্প বলে এবং তাহা কোন স্থলে একমাত্র থাকে, আবার কোন স্থলে একাধিক একত্র মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য উৎপন্ন করে।

ক্রিয়া অপেক্ষা সঙ্কল্প উৎকৃষ্ট হইবার ত্রিবিধ কারণ মহাপুরুষ হজরত রসুল ﷺ বলিয়াছেন,—

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ ۔

"মোমেন মুসলমান লোকের নীয়ৎ (সঙ্কল্প), ক্রিয়া অপেক্ষা উত্তম।" পাঠক! হজরতের এই বচনে তোমরা এই কথা মনে করিও না যে, তিনি 'ক্রিয়াহীন শুধু সঙ্কল্পকে' কেবল 'সঙ্কল্পহীন ক্রিয়া' অপেক্ষা উত্তম বলিয়াছেন। একথা সকলেই বুঝে, সদুদ্দেশ্য মনে না রাখিয়া কোন উত্তম কার্য্য করিলেও তাহা সৎকার্য্যের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না; কিন্তু সাধু উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া কোন কার্য্য করিয়া উঠিতে না পারিলেও সেই উদ্দেশ্যকেই সৎকার্য্যের তুল্য ধরা যায়। (টীকা ৩২৭) তিনি 'নীয়ৎ'কে যে উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন, তাহার **প্রথম** কারণ এই যে, সৎকার্য্য (এবাদৎ) শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে; আর 'নীয়ৎ' হৃদয়ের মধ্যে লাগা থাকে। এজন্য পৃথক

টীকা—৩২৭। হাদীছের মর্ম্ম বুঝাইবার জন্য মূল গ্রন্থে যে দুই এক লাইন লিখা গিয়াছে, তাহা বড় দুর্বোধ্য। তথায় লিখিত আছে—"ইহা নিতান্ত সুস্পষ্ট যে, নীয়ৎ-হীন ক্রিয়া এবাদৎ নহে, কিন্তু ক্রিয়াহীন নীয়ৎ, এবাদৎ বলিয়া গণ্য।" এই কথাটী পরিস্ফুট করিবার জন্য অনুবাদ অনেক বিস্তৃত করা হইল, তথাপি সুস্পষ্ট হইল না। অগ্রে নীয়তের 'মারেফাত' বুঝিতে পারিলে অর্থ গ্রহণ সহজ হইতে পারে বিবেচনায় দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

'অগ্নি প্রজ্বলন একটী কার্য্য; উদ্দেশ্য ভেদে উহা সৎ, অসৎ বা বৃথা কার্য্য হইতে পারে। শীতক্লিষ্ট লোকের কষ্ট দূর করিবার উদ্দেশ্যে অগ্নি প্রজ্বলন সৎকার্য্য; নিজের শীত ভাঙ্গিবার উদ্দেশ্যে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে অগ্নি লাগাইয়া দেওয়া পাপ এবং বিনা কারণে 'খাগড়া' শুষ্ক তৃণ রাশি শুধু দগ্ধ করা বৃথা কার্য্য। শীতকষ্ট বা অন্ধকার দূর করিবার নীয়ৎ (সঙ্কল্প) মনে রাখিয়া অগ্নি জ্বালিবার চেষ্টা করিলে অগত্যা চক 'ঠুকি' পাওয়া না, 'দিয়াশলাই' অভাবে বা শুষ্ক তৃণাদি না পাইয়া অগ্নি জ্বালিতে না পারিলেও শুধু চেষ্টাকে সৎকার্য্য বলিয়া ধরা যাইবে। ইহা ক্রিয়াহীন নীয়ৎ। বিনা প্রয়োজনে 'খাগড়া' তৃণ রাশি দগ্ধ করা সৎকার্য্য নহে বরং পাপের নিকটবর্ত্তী বৃথা কার্য্য। ইহা নীয়ৎহীন ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত।

পৃথক্ বস্তু। ইহাদের মধ্যে যেটী হৃদয়ের মধ্যে বাস করে, তাহা উৎকৃষ্ট এবং যেটী শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে তাহা অধম; কেননা হৃদয় উৎকৃষ্ট এবং শরীর অধম! 'নীয়ৎ' উৎকৃষ্ট হইবার আরও একটী দ্বিতীয় কারণ আছে। হৃদয়ের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাকে উৎকৃষ্ট পরিণতির (টীঃ ৩২৮) দিকে লইয়া যাওয়াই শারিরীক সৎকার্য্যের উদ্দেশ্য। সৃষ্টিকর্ত্তা শরীর ও হৃদয়কে যে ভাবে সৃজন করিয়াছেন, তাহাতে শরীর খাটাইয়া সাধু কার্য্য সম্পন্ন করিলে আত্মার গুণ বৃদ্ধি ও উন্নতি হয়। কিন্তু হৃদয়ের কার্য্য (সুধু সঙ্কল্প) দ্বারা শরীরের বাহ্য আকৃতির কোন পরিবর্ত্তন হয় না, (কেননা সৃষ্টিকর্ত্তা তেমন গুণ দিয়া উহাদিগকে সৃজন করেন নাই)। সাধারণ দৃষ্টিতে বুঝা যায়, (আমল) ক্রিয়ার জন্যই (নীয়ৎ) সঙ্কল্পের আবশ্যক, অর্থাৎ সাধু কার্য্যের জন্য সৎ সঙ্কল্প মনে জন্মাইয়া লওয়া চাই; কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, "নীয়ৎকে" উৎকৃষ্ট পরিণতির দিক বর্দ্ধিত করিবার জন্য শারীরিক সৎকার্য্য (আমল) অধিক পরিমাণে করা আবশ্যক। মুছলমান লোকের সকল কার্য্যই হৃদয়কে উৎকৃষ্ট পরিণতির দিক লইয়া যায়। দেল বা আত্মাকেই পরকালে যাইতে হইবে এবং তথায় উহাকেই সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ভোগ করিতে হইবে। শরীর যদিও সেই সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের মধ্যবর্ত্তী কারণ, তথাপি উহা মধ্যপথে আসিয়া আত্মার সহিত মিলিত হইয়াছে বলিয়া আত্মারই অধীন। হজ্ কার্য্যে মক্কায় যাইবার জন্য উষ্ট্র নিতান্ত আবশ্যক হইলেও সে উষ্ট্র কখনই হাজী হইতে বা হজের কল্যাণ পাইতে পারে না; শরীরের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। শরীর না খাটাইলে কোন কার্য্যই হয় না, তথাপি কার্য্যের ফল শরীর না পাইয়া আত্মা পাইয়া থাকে। হৃদয়কে উৎকৃষ্ট পরিণতির দিকে ফিরাইয়া লওয়া, একটী কার্য্য ভিন্ন অধিক নহে। তাহা এই—হৃদয়ের মুখ সংসারের দিক হইতে ফিরাইয়া পরকালের দিকে লইয়া যাওয়া, বরং সংসার ও পরকালের চিন্তা হইতে ফিরাইয়া কেবল আল্লার চিন্তায় নিযুক্ত করা। হৃদয়ের অভিলাষ বা ইচ্ছাকে উহার মুখ বলা যায়! সংসারের আসক্তি বা অভিলাষ

শারিরীক সৎকার্য্যের 'উদ্দেশ্য'

টীকা ৩২৮। শরীর, স্বভাব, আত্মা বা অন্য কোন পদার্থের দোষ বা রোগ দূর করতঃ তাহার স্বাভাবিক গুণ ও সৌন্দর্য্যাদি বৃদ্ধি করিলে সেই পদার্থকে ক্রমশঃ উন্নত পরিণতির দিকে লইয়া যাওয়া হয়। কোন পদার্থকে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও উন্নত করিয়া যে অবস্থায় লইয়া যাওয়া সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য, সেই উন্নত অবস্থাকে 'পরিণতি' কহে।

মনে প্রবল হইলে বুঝিতে হইবে, হৃদয়ের মুখ সংসারের দিকে আছে। আবার সংসারের সহিত সম্বন্ধ ঘটিলেই তৎপ্রতি অভিলাষ বা আসক্তি জন্মে। ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মানব, সংসারের নানা পদার্থের সম্বন্ধে জড়িত হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য তৎপ্রতি অভিলাষী হইতে হয়। সেই মন যদি সংসারের দিক হইতে ঘুরিয়া আল্লা ও পরকালের চিন্তায় নিযুক্ত হয়, তবে বুঝিবে, হৃদয়ের অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া উৎকৃষ্ট পরিণতির দিকে গিয়াছে; কিন্তু তাহা না হইয়া কোন পদার্থ বিশেষের প্রতি আসক্ত থাকিয়া গেলে উহাকে ঘুরাইয়া আল্লা ও পরকালের চিন্তায় প্রবর্তিত করিতে একমাত্র সদনুষ্ঠান ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সেজদা করার উদ্দেশ্য কি? মস্তককে উচ্চ হইতে নামাইয়া ভূপৃষ্ঠে স্থাপন করা উহার উদ্দেশ্য নহে, বরং হৃদয়ের অহঙ্কার অভিমানাদি ভাব পরিবর্তন পূর্ব্বক উহাকে বিনয় নম্রতা ও অধীনতার দিকে লইয়া যাওয়াই উদ্দেশ্য।

সেজদা করার উদ্দেশ্য

'আল্লাহো আক্‌বর' বলিবার উদ্দেশ্য জিহ্বা সঞ্চালন করা নহে, বরং আত্মাভিমান ও অহংভাব হইতে হৃদয়কে ফিরাইয়া আল্লার মহত্ত্ব ও গৌরব জ্ঞান হৃদয়ের মধ্যে জাগরূক করিয়া দেওয়াই উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

আল্লাহো আকবর বলিবার উদ্দেশ্য

হজের সময়ে, প্রস্তর নিক্ষেপ কার্য্যে, কেবল হস্ত সঞ্চালন বা বহু প্রস্তর একত্র করা উদ্দেশ্য নহে, বরং আল্লার দাসত্ব সম্পাদনে হৃদয়কে দৃঢ় পদে দণ্ডায়মান হইবার ক্ষমতা জন্মান এবং প্রবৃত্তি ও তর্ক বুদ্ধির অধীনতা ছিন্ন করিয়া কেবল আল্লার আদেশের অধীন হওয়া—নিজের পরিচালনার বল্গা নিজ হস্ত হইতে খুলিয়া আল্লার আদেশের হস্তে সমর্পণ করিবার অভ্যাস জন্মানই প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই জন্য হজের নীয়ৎ কালে বলা হয়—

হজের সময় প্রস্তর নিক্ষেপের উদ্দেশ্য

لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًّا

"প্রকৃত এবাদৎ কার্য্যে দাসের মত হজের জন্য দাঁড়াইলাম।" কোরবাণী কার্য্যে ছাগ গবাদির রক্তপাত করা উদ্দেশ্য নহে বরং হৃদয়স্থ কৃপণতা বাহির করিয়া ফেলা এবং গৃহপালিত প্রাণীর প্রতি মমতা দূর করিয়া আল্লার আদেশ অটুট রাখিবার ক্ষমতা হৃদয়ে স্থাপন করাই উদ্দেশ্য। জবেহ্ করিবার আদেশ শুনিয়া যেন এরূপ তর্ক মনে উদয় না হয় যে, এই পশুগুলি কি পাপ করিয়াছে যে,

কোরবাণীর উদ্দেশ্য

তাহাদিগকে কেন কষ্ট দিয়া হত্যা করিব ? বরং সমস্ত ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া নিজকে অসহায় অপদার্থ ও বিনষ্ট বলিয়া বুঝিবে। তুমি আমি সত্য সত্যই কিছু নহি—বিশ্ব-সংসারে যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, তৎসমস্তও কিছুই নহে; বিশ্বপ্রভু আল্লারই কেবল অস্তিত্ব আছে। এই প্রকার সমস্ত সৎকার্য্য ও এবাদতের উদ্দেশ্য হৃদয়কে উৎকৃষ্ট পরিণতির দিকে লইয়া যাওয়া অর্থাৎ হৃদয়কে সর্ব্ব দিক হইতে বিমুখ করিয়া কেবল আল্লার চিন্তায় মগ্ন করা উদ্দেশ্য। সৃষ্টিকর্ত্তা মানব-হৃদয়কে এমন স্বভাব-সম্পন্ন করিয়া সৃজন করিয়াছেন যে,—যখন কোনও ইচ্ছা বা অভিলাষ তন্মধ্যে উৎপন্ন হয়, তখন যদি শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেই অভিলাষের ইঙ্গিত অনুসারে সঞ্চালিত হয়, তবে সেই ভাবটী হৃদয়ের মধ্যে দৃঢ় রূপে জমিয়া যায়। দৃষ্টান্ত—পিতৃ মাতৃহীন অনাথ সন্তানের প্রতি যখন কাহারও মনে দয়া বা মমতা উদিত হয়, তখন যদি সেই ব্যক্তি উক্ত অনাথ সন্তানের মস্তকে বা পৃষ্ঠে সদয় ভাবে হস্তামর্ষণ করে, তবে মমতা তাহার হৃদয়ে জোয়ারের ন্যায় বাড়িয়া উঠে এবং সুন্দর মত জমিয়া যায়। এই রূপ, মনে নম্রতা বা বিনয় আবির্ভূত হইলে যদি কেহ ভক্তিভাজন লোকের সম্মুখে অবনত হইয়া ভূপৃষ্ঠে ললাট স্থাপন করে, তবে তাহার মনে বিনয় ও ভক্তি উদ্‌বেলিত হয় এবং সুন্দর মত জমিয়া যায়। মঙ্গল-প্রাপ্তির আশা সকল হৃদয়েই আছে। সংসার হইতে মন তুলিয়া লইয়া আল্লার সঙ্গে লাগাইয়া দেওয়া সকল মঙ্গলের সার। তদবস্থা লাভ করিবার অভিলাষ হৃদয়ে রাখিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিলে অর্থাৎ শরীর খাটাইয়া এবাদৎ শ্রেণীর কার্য্য করিতে লাগিলে আল্লার দিকে হৃদয়ের টান ঘনীভূত হইতে থাকে। এখন বুঝিতে পারিলে শারীরিক এবাদৎ, আল্লার সঙ্গে মন সংযোগ করিবার অভিলাষ বা নীয়ৎকে বলবান করে। যদিও প্রথমে নীয়ৎ বা উদ্দেশ্যের জন্যই ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে, তথাপি শেষে সেই ক্রিয়া হইতে 'নীয়ৎ' পুনরায় বল প্রাপ্ত হয়। এই কারণে (আমল) ক্রিয়া অপেক্ষা 'নীয়ৎ' শ্রেষ্ঠ। **তৃতীয়** কারণ—আবার দেখ, নীয়তের বাসা হৃদয়ের মধ্যে। শারীরিক এবাদৎ বা ক্রিয়ার ফল বাহিরে শরীরে উৎপন্ন হইয়া গিয়া হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করতঃ তথায় সুফল উৎপন্ন করে। যদি ক্রিয়ার ফল, বাহ্য শরীরে উৎপন্ন হইয়া, কোন কারণে হৃদয়-অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারে; তবে নষ্ট হয়; আবার প্রবেশ

মানব হৃদয়ের বিশেষত্ব—ইচ্ছার-উদ্রেক-জনিত দৈহিক কার্য্যানুষ্ঠান হৃদয়ের সেই ইচ্ছাকেই আরও সুদৃঢ় করে।

করিবার কালে (গফলৎ) মোহাদি দোষে আবৃত থাকিলে হৃদয়ের কোন হিত-পরিবর্ত্তন করিতে পারে না সুতরাং নষ্ট হইয়া যায় ; কিন্তু 'নীয়ৎ' ক্রিয়াহীন হইলেও ব্যর্থ হয় না। উহা হৃদয়ের মধ্যেই থাকে সুতরাং মোহাদি কোন দোষ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই কথাটী বুঝাইবার জন্য একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতেছে। উদরে বেদনা হইলে, দুই প্রকার ঔষধে উপকার পাওয়া যায় ; প্রথম—সেবনীয় ঔষধ ; উহা উদরের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পীড়া দূর করিতে পারে ; দ্বিতীয়—বক্ষঃস্থলে প্রলেপ প্রদান। বুকের মধ্যে রক্তাধার ফুসফুস ইত্যাদি শরীর রক্ষার্থ সর্ব্ববিধ যন্ত্র আছে। সেই সকল যন্ত্রের উপরে প্রলেপ দিলে ঔষধের ক্রিয়া ক্রমে ক্রমে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ উদরে গিয়া উপস্থিত হয় এবং বেদনা দূর করে ; কিন্তু কোন কারণে অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক যদি উদরে গিয়া উপস্থিত হইতে না পারে তবে ব্যর্থ হয়। পক্ষান্তরে সেবনীয় ঔষধ সোজাসুজী উদরে প্রবেশ করতঃ ক্রিয়া-প্রকাশে বিশেষ সুযোগ পায়। প্রলেপের ঔষধ বহির্দ্দেশে প্রযুক্ত হয় ; তাহার ক্রিয়া ক্রমে সঞ্চারিত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে থাকে, এই জন্য কোন কারণ বশতঃ মধ্য-পথে নষ্ট হইতে পারে ; কিন্তু সেবনীয় ঔষধ ভিতরে গিয়া ক্রিয়া-প্রকাশে বিশেষ সুবিধা পায়, সে ক্রিয়ার প্রভাব বাহিরে প্রকাশ না পাইলেও ব্যর্থ হইয়াছে বলা যায় না।

মনের মধ্যে প্রবৃত্তি কুপরামর্শ দিলে তজ্জন্য মানব দায়ী কি না ?—পাঠক ! জানিয়া লও, মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—"আমার ওম্মতের (অনুবর্ত্তীজনের) মনে প্রবৃত্তি কোনও কুপরামর্শ দিলে করুণাময় তজ্জন্য দোষ ধরিবেন না।" ছহী বোখারী ও ছহী মোছলেম হদীছ গ্রন্থে লিখিত আছে—"যদি কেহ পাপ-কার্য্যের ইচ্ছা মাত্র করে, অথচ সেই পাপ-কার্য্য না করে ; তবে করুণাময় ফেরেস্তাগণকে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ করেন ; কিন্তু সে ব্যক্তি যদি ইচ্ছার অনুরূপ পাপ-কার্য্য করে, তবে ফেরেশ্‌তাগণকে একটী মাত্র পাপ লিখিতে আদেশ করেন। পক্ষান্তরে কেহ যদি কোন সৎকার্য্যের অভিলাষ মাত্র করে, অথচ সেই কার্য্য বাস্তবিক না না করে, তবে তাহার ভাগ্যে একটী পুণ্য লিখিতে আদেশ করেন ; পরন্তু সে ব্যক্তি যদি ইচ্ছার অনুরূপ সৎকার্য্য সমাপ্ত করে, তবে তাহার ভাগ্যে দশটী পুণ্য লিখিতে অনুমতি দেন।" হদীছের অন্য বচনে দেখা যায়, ফেরেশ্‌তাগণ সেই পুণ্য বৃদ্ধি করিয়া সাত শত পর্য্যন্ত উত্তোলন করেন। এই হদীছের

উপর নির্ভর করিয়া কতকগুলি লোক বিবেচনা করিয়াছেন যে—ইচ্ছা পূর্ব্বক পাপের প্রতি অভিলাষ করিলে কিম্বা যত্ন পূর্ব্বক পাপাভিলাষ মনে জাগাইলে মানব তজ্জন্য দায়ী হইবে না; কিন্তু এরূপ বিবেচনা করা ভ্রম-মূলক। ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, হৃদয় বা আত্মা মূল পদার্থ; শরীর তাহার অধীন। সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাও বলিতেছেন—

وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ

يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ

"এবং হৃদয়ে যাহা আছে তাহা যদি প্রকাশ কর বা গোপনে রাখ, আল্লা তজ্জন্য তাহার হিসাব লইবেন।" (৩ পারা। সূরা বকর। শেষ রোকূ) তিনি আরও বলিয়াছেন—

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ

أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ○

"তাহার নিকট কর্ণ, চক্ষু, অন্তঃকরণ এ সমস্তের জন্য জিজ্ঞাসা করা হইবে।" (১৫ পারা। সূরা বনী এছরায়েল। ৪ রোকূ।) তিনি ইহাও বলিয়াছেন—

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِ

وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

"আল্লা তোমাদিগকে পরিহাস-মূলক শপথের জন্য দায়ী করিবেন না, কিন্তু ইচ্ছা পূর্ব্বক সত্য সত্যই যে পাকা শপথ কর, তজ্জন্য দায়ী করিবেন।" (৭ পারা। সূরা মায়দা। ১২ রোকূ।) যাহা হউক, অহঙ্কার, কপটতা, ঈর্ষা, সাধুতা-প্রদর্শন, খোদপছন্দী ইত্যাদির জন্য মানুষ দায়ী হইবে এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। কেননা এ সমস্ত অন্তরের ক্রিয়া।

প্রবৃত্তির পরামর্শ মনের মধ্যে চারি প্রকারে কার্য্যকরী তন্মধ্যে কোন্ প্রকার কার্য্যের জন্য মানব দায়ী? যাহা হউক প্রবৃত্তির পরামর্শ, কোন্ অবস্থায় মার্জ্জনীয় এবং কোন্ স্থলে নহে; তদবিষয়ের পূর্ণ মীমাংসা করিতে হইলে উহা অন্তরের মধ্যে কি ভাবে চলাচল করে, তাহা বিচার করা আবশ্যক। প্রবৃত্তির পরামর্শ মনের মধ্যে চারি প্রকারে কার্য্য করে, তন্মধ্যে দুই অবস্থার প্রতি মানুষের ক্ষমতা চলে না, সুতরাং তজ্জন্য মানব দায়ী নহে। আর দুই অবস্থার উপর মানবের ক্ষমতা চলে বলিয়া তথন দায়ী হইবে। একটী দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টী সহজে বুঝা যাইবে। মনে কর, তুমি নিজ মনে পথ চলিতেছ; এমন সময়ে একজন কামিনী আসিয়া তোমার অনুগমন করিতে লাগিল; তুমিও বুঝিতে পারিলে এক জন রমণী তোমার পঁশ্চাতে পথ চলিতেছে। এমন সময়ে তোমার প্রবৃত্তি তোমাকে সেই কামিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পরামর্শ দিতে লাগিল; কিন্তু তোমার হৃদয়, প্রবৃত্তির সে পরামর্শে কর্ণপাতই করিল না; সে কামিনীর প্রতি এক বারও দৃষ্টিপাত না করিয়া তুমি আপন মনে পূর্ব্বের ন্যায় পথ চলিতে লাগিলে। প্রবৃত্তির এই প্রকার 'বৃথা পরামর্শের' নাম "হদীছে নাফছ"; কিন্তু ইহা **প্রথম প্রকারের** অন্তর্গত।

(১) প্রবৃত্তির বৃথা পরামর্শ—হদীছে নফছ—ইহার জন্য মানব দায়ী নহে

আবার মনে কর তুমি পথ চলিতেছ এমন সময়ে বুঝিতে পারিলে তোমার পশ্চাতে যেন কেহ আসিতেছে। কে আসিতেছে জানিবার জন্য তোমার প্রবৃত্তি তোমাকে পরামর্শ দিল—তুমিও তদনুসারে ফিরিয়া দেখিলে। এই-রূপ নির্দ্দোষ পরামর্শের নাম 'স্বাভাবিক কৌতূহল'; ইহা **দ্বিতীয় প্রকারের** অন্তর্গত।

(২) প্রবৃত্তির নির্দ্দোষ পরামর্শ—স্বাভাবিক কৌতূহল—ইহার জন্য মানব দায়ী নহে

প্রবৃত্তির নির্দ্দোষ পরামর্শ মত তুমি যথন ফিরিয়া দেখিলে, তথন জানিতে পারিলে এক জন যুবতী তোমার পশ্চাতে আসিতেছে। এখন যুবতী কামিনী দর্শনে তোমার প্রবৃত্তি অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, পুনরায় তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে তোমাকে পরামর্শ দিতে লাগিল। তথন, তোমার হৃদয়, উহা সঙ্গত কি অসঙ্গত, অবধারণ করিয়া দেখিতে জ্ঞানের সাহায্যে বিচারে প্রবৃত্ত হইল। বিচারে কোন ভয় বা বিপদ্‌পাতের আশঙ্কা দেখিতে না পাইলে এবং উহা সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে হৃদয় তোমার চক্ষুকে তৎপ্রতি দর্শনের জন্য

(৩) প্রবৃত্তির পরামর্শ শ্রবণে হৃদয়ের স্বাধীন অবস্থার আদেশ—এই স্বাধীনতার অপব্যবহারের জন্য মানব দায়ী

আদেশ করিবে। এস্থলে ইহা মনে রাখ—প্রবৃত্তি, যে কোন পরামর্শ হৃদয়ের সম্মুখে উপস্থিত করিবে, তাহাই যে হৃদয় গ্রহণ করিবে, তাহা নহে; বরং কথন কথন প্রবৃত্তির পরামর্শ শ্রবণ পূর্ব্বক বিচারান্তে উহা না করিবার আদেশ দিয়া থাকে। প্রবৃত্তির পরামর্শ শ্রবণ পূর্ব্বক উহা পালন করিতে বা অগ্রাহ্য করিতে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রতি হৃদয় যে আদেশ করে, তাহাকে 'হৃদয়ের আদেশ' বলে এবং তদ্রূপ স্থলে প্রবৃত্তির পরামর্শকে **তৃতীয় প্রকারের** মধ্যে ধরা যায়। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ স্থলে, প্রবৃত্তি সেই কামিনীর প্রতি পুনর্দর্শনের পরামর্শ দিলে হৃদয় তাহা গ্রহণ করিবে কি অগ্রাহ্য করিবে নির্ণয়ার্থ বিচারে প্রবৃত্ত হয়। সেই সময়ে 'জ্ঞান' আসিয়া যদি হৃদয়ের সম্মুখে আল্লার ভয় লোক-লজ্জা স্থাপন করিতে পারে, তবে হৃদয় তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে ক্ষান্ত থাকে; তদ্রূপ প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত না হইলে প্রবৃত্তির প্ররোচনায় হৃদয় সহজে পরিচালিত হইয়া চক্ষুকে দর্শন করিতে অনুমতি করে; চক্ষুও তদনুসারে দর্শন করিয়া লয়। প্রবৃত্তির পরামর্শ পাইয়া এস্থলে হৃদয়ের যে অবস্থা হয়, তাহা **চতুর্থ প্রকারের** অন্তর্গত। এই শেষোক্ত দুই প্রকার অবস্থার জন্য মানব দায়ী, কেননা তৎ তৎ স্থানে মানবের স্বাধীনতা আছে; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকারের উপর মানবের স্বাধীনতা নাই বলিয়া সে দায়ী নহে। মহাপ্রভু বলিতেছেন—

(৪) প্রবৃত্তির পরামর্শ শ্রবণে জ্ঞানের নির্দ্দেশ সত্বেও প্রবৃত্তির প্রতি হৃদয়ের পক্ষপাত—দুষ্ট আদেশ এই পক্ষপাতের জন্য মানব দায়ী

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লা কোন প্রাণীকে তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত তক্লীফ (কষ্ট) দেন না।" (৩ পারা। সূরা বকর। শেষ রোকু।)

মহাত্মা ওছমান এবনে মজ্‌উন, একদা মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) এর সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বীয় হৃদয়ের যে সকল ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, তাহা **প্রবৃত্তির বিফল পরামর্শ**। তিনি নিবেদন করিয়াছিলেন—"হে রসুলুল্লা! স্ত্রী-সম্ভোগের কামনা লোপ করিবার জন্য আমার মন আমাকে অণ্ডকোশ ছিন্ন করিতে বলে।" হজরৎ বলিয়াছিলেন—"তাহা করিও না। রোজা রাখার অভ্যাস আমার ওম্মতের পক্ষে মুষ্ক-ছেদের তুল্য।" তিনি পুনরায় নিবেদন করিলেন—"হে রসুলুল্লা! আমার মন আমাকে পত্নী পরিত্যাগ

করিতে বলে।” হজরৎ বলিলেন—“সাধ্য পক্ষে তাহা করিও না। সস্ত্রীক অবস্থায় সংসারে থাকিয়া কর্ত্তব্য কাজ করা আমার সোন্নৎ (ধর্ম)।” তিনি পুনরায় নিবেদন করিলেন—“হে রসুলুল্লা! সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় লোকালয় পরিত্যাগ করতঃ জঙ্গলে যাইতে আমার মন চায়।” হজরৎ বলিলেন—“তাহা করিও না। হজ ও জেহাদের জন্য গৃহত্যাগ করিলে আমার ওম্মতের পক্ষে সন্ন্যাসীগণের বনবাসের ফল পাওয়া যাব।” তিনি পুনরায় নিবেদন করিলেন—“আমার মনে আমাকে মাংসাহারে নিষেধ করে।” হজরৎ বলিলেন—“তদ্রূপ করিও না। দেখ, আমি মাংস ভাল বাসিয়া থাকি; করুণাময় আমাকে মাংস খাইতে দিলে পরম আদরের সহিত ভোজন করি, আর না দিলে সন্তুষ্ট থাকি। আমি যদি বরাবর মাংস চাহিতাম, তবে তিনিও দিতেন।” যাহা হউক, এই প্রকার যে সকল ইচ্ছা উক্ত মহাত্মার মনে উদয় হইয়াছিল, তাহা প্রবৃত্তির বিফল পরামর্শ বই আর কিছুই নহে। উহার জন্য মানবকে দায়ী হইতে হইবে না, কেননা প্রবৃত্তির পরামর্শ মাত্র ছিল; তদনুসারে কার্য্য করিতে হৃদয় উৎসুক হয় নাই; তদ্‌ভিন্ন অন্য দুই প্রকার অবস্থার জন্য মানব দায়ী। তন্মধ্যে একটী **হৃদয়ের স্বাধীন অবস্থার আদেশ**। সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া কার্য্য করিলে মানব দায়ী হয়। অন্য অবস্থাটী **প্রবৃত্তির দিকে হৃদয়ের পক্ষপাত**। প্রবৃত্তি যে কার্য্যে আনন্দ পায়, তাহা করিতে হৃদয়কে পরামর্শ দেয়। আর বুদ্ধি অন্য দিক হইতে হৃদয়কে জ্ঞানের আলোক দেখাইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ দেয়। হৃদয় কিন্তু জন্মাবধি প্রবৃত্তির সঙ্গে একত্র বাস করার দরুণ সহজেই তাহার দিকে কিছু ঝুঁকিয়া পড়ে এবং তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সহজেই প্রস্তুত হয়। ইহাতে পক্ষপাত করা হয় আর পূর্ব্বটীতে স্বাধীনতার অপব্যবহার হয়। এ উভয় স্থলে মানবকে দায়ী হইতে হইবে।

‘অন্যায় কার্য্য করিলে বা দৃঢ় সঙ্কল্প করিলে মানব দায়ী হয়’—এই কথার অর্থ। “মানব দায়ী হয়” এই কথার অর্থ বুঝিয়া লও—অন্যায় কার্য্য করিলে বা করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিলে মহাপ্রভু তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া শাস্তি দিবেন বা প্রহার করিবেন, একথা বুঝিও না। বিশ্বপতি মহাপ্রভু নির্ব্বিকার, প্রশান্ত এবং করুণাময়; তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কাহাকেও শাস্তি দেন না। ক্রোধের কথা কি? তিনি করুণাদি গুণে যেরূপ পরিপূর্ণ আছেন, তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না—‘পরিবর্ত্তন’ হইতে তিনি

নির্ম্মুক্ত ও পবিত্র। তবে তিনি যে মহা কৌশলে 'মানবকে' সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই কৌশলে 'মানবের কার্য্যফল' ও 'আন্তরিক-অভিলাষের-প্রভাব' অবিলম্বে আত্মার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় 'পরিবর্ত্তন' ঘটাইয়া দেয়। অন্যায় কার্য্য করিলে বা করিবার অটল অভিলাষ করিলে হৃদয়ের মধ্যে এমন অবস্থা বা ভাব জন্মাইয়া দেয় যে, তজ্জন্য আল্লা হইতে হৃদয় দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে; ইহাই মানবের পক্ষে দুর্ভাগ্য। ইতিপূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে যে, 'হৃদয়ের মুখ' সংসার হইতে ফিরাইয়া লইয়া আল্লার দিকে স্থাপন করিতে পারিলে সৌভাগ্য হস্তগত হয়। 'প্রবৃত্তি' ও 'সম্বন্ধ' হৃদয়ের মুখ। সংসারের-সহিত-সম্বন্ধ-আছে-এমন-পদার্থের-প্রতি অভিলাষ করিলে বাস্তবিক পক্ষে সংসারের সহিতই সম্বন্ধ ঘটে। তাহাতে এই ফল হয় যে, যাহা (আল্লা) লাভ করা প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা হইতে (আল্লা হইতে) দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িতে হয়। যাহা হউক, সংক্ষেপ কথা এই যে, 'দায়ী বা আবদ্ধ' শব্দের অর্থ, সংসারের সহিত আসক্ত হইয়া পড়া; এবং 'বিতাড়িত বা দূরবর্ত্তী' শব্দের অর্থ, আল্লা ও পরকাল ভুলিয়া যাওয়া। এই 'দায়ী হওয়া ও বিতাড়িত হওয়া' কার্য্য, 'হৃদয় দ্বারা' 'হৃদয় হইতে' এবং 'হৃদয়ের মধ্য'ই ঘটিয়া থাকে; মানবের এবাদতে (সৎকার্য্যে) পরিতুষ্ট হইয়া বা তাহার পাপে ক্রুদ্ধ হইয়া কেহ তাহাকে প্রতিফল দিতে আসে না! তবে সর্ব্ব সাধারণ লোকেরা স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে বুঝিতে পারিবে বলিয়া পাপ করিলে শাস্তি ও পুণ্য কার্য্যে, পুরস্কার পাওয়া যায়, এইরূপ বলা হইয়াছে।

আন্তরিক অভিলাষের প্রকার ভেদে মানবাত্মার মঙ্গল বা অমঙ্গল—যাহারা হৃদয়ের এই গুপ্ত রহস্য বুঝিতে পারিয়াছে, তাহারা এই কথা সুন্দর মত জানে যে, আন্তরিক-অভিলাষের-প্রকার-ভেদে মানবাত্মার মঙ্গল বা অমঙ্গল উৎপন্ন হয়। এ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—"দুই ব্যক্তি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল; ইতি মধ্যে এক ব্যক্তি মারা পড়িল। সে স্থলে দুই জনই দোজখে যাইবে।" ইহা শুনিয়া ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'হে রসুলুল্লা! নিহত ব্যক্তি কেন দোজখে যাইবে?' তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'বিপক্ষকে হত্যা করিবার প্রবল ইচ্ছা উভয়েরই সমান ছিল; সুযোগ পাইলে হত্যাও করিত; কিন্তু এক জন সুযোগ পায় নাই বলিয়া নিহত হইয়াছে।' অপর প্রমাণ এই যে, কোন ধনী লোক ধর্ম্ম-বিধান

লঙ্ঘন পূর্ব্বক অন্যায় ভাবে অপব্যয় করিতেছে দেখিয়া যদি এক জন দরিদ্র লোক মনে মনে ঐরূপ ধুম ধামের সহিত ব্যয় করিবার ইচ্ছা করে, তবে উভয়ে সমান পাপী হইবে। পূর্ব্বোক্ত নিহত ব্যক্তি এবং এই নির্ধন লোকের পাপ কেবল আন্তরিক ইচ্ছার জন্যই হইবে। কোন ব্যক্তি অন্ধকারে এক জন রমণী পাইয়া পরনারী জ্ঞানে সম্ভোগ করিবার পর জানিতে পারিল যে, সে পরনারী নহে—নিজেরই বিবাহিতা পত্নী; তথাপি সে ব্যক্তি পাপী হইবে। এইরূপ কোন ব্যক্তির ওজু ভঙ্গ হইয়াছে, অথচ সে তাহা টের পায় নাই; বরং ওজু অক্ষত আছে বলিয়া তাহার মনে প্রবল বিশ্বাস রহিয়াছে, এমন অবস্থায় নমাজ পড়িলে সে ব্যক্তি নমাজের পুণ্য পাইবে। অপর পক্ষে, যাহার ওজু বাস্তবিক পক্ষে ভাঙ্গে নাই, অথচ ভ্রম ক্রমে মনে প্রবল বিশ্বাস করিতেছে যে, তাহার ওজু নাই, সে ব্যক্তি যদি ঐ অবস্থায় নমাজ পড়ে এবং নমাজ অন্তে ওজু আছে বলিয়া স্মরণও হয় তথাপি পাপী হইবে। এ সমস্ত পরিবর্ত্তন হৃদয়ের অবস্থা হইতে ঘটে। আবার দেখ, কোন ব্যক্তি পাপ কার্য্য করিবার অভিলাষ করিবার পর, আল্লার ভয়ে উহা হইতে ক্ষান্ত থাকিলে তাহার ভাগ্যে পুণ্য লিপিবদ্ধ হয়। এ সম্বন্ধে হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে যে,—"প্রবৃত্তি যাহা চায়, মানব-হৃদয়ে তদনুযায়ী অভিলাষ উৎপন্ন হয়, কিন্তু প্রবৃত্তি যে কার্য্য করিতে হৃদয়কে উপদেশ দেয়, তাহার বিপরীত কার্য্য করাকে তপস্যা বা প্রবৃত্তি-নিগ্রহ বলে। হৃদয়কে মলিন করিতে অভিলাষের যে পরিমাণ ক্ষমতা আছে, উহাকে উজ্জ্বল করিতে তপস্যা বা প্রবৃত্তি-নিগ্রহের তদপেক্ষা অধিকতর বল আছে।" মানুষের ভাগ্যে পুণ্য

মানুষের ভাগ্যে পাপ ও পুণ্য লিখার দার্শনিক ব্যাখ্যা।

লেখার অর্থ, তাহার হৃদয়ের হিত-পরিবর্ত্তন অর্থাৎ উজ্জ্বল সুস্পষ্ট ও সুস্থ করা এবং পাপ লিপিবদ্ধ হইবার অর্থ, তাহার হৃদয়ের ক্ষতি হওয়া অর্থাৎ মলিন, ক্ষত-বিক্ষত ও পীড়িত হওয়া। উক্ত হদীছের চুম্বক মর্ম্ম এই যে, মানবাত্মাকে প্রবৃত্তি যে পরিমাণ মলিন, ক্ষত বিক্ষত, পীড়িত বা দুর্ব্বল করে, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিলে আত্মা পূর্ব্বাপেক্ষা তত উজ্জ্বল, সুস্পষ্ট, সুস্থ ও সবল হয়। পুনরায় দেখ, কোন ব্যক্তি পাপ কার্য্যের অভিলাষ করিয়া, অক্ষমতা বশতঃ তদ্রূপ কার্য্য করিয়া উঠিতে না পারিলে 'অভিলাষে' তাহার হৃদয়ে যে পরিমাণ ক্ষতি করে, কার্য্য-সম্পন্ন-না-হওয়ার-ক্ষোভে সে ক্ষতির সংশোধন হইতে পারে না; ফল কথা, অভিলাষোৎপন্ন সেই মলিনতা যাহা আত্মার উপর পড়ে, তাহা

আর দূর হয় না বলিয়া মানব দায়ী হয়। এই কারণে পূর্ব্বোক্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত ব্যক্তি, বলের-অল্পতা-বশতঃ, প্রতিপক্ষকে হত্যা করিতে না পারিয়া নিজে মারা পড়িলেও পাপী হইবে।

সঙ্কল্পের ধরণে মানবের অনুষ্ঠিত কার্য্যফলের পরিবর্ত্তন— পাঠক! জানিয়া রাখ, মানবের অনুষ্ঠিত কার্য্য তিন প্রকার; যথা;—(১) পাপ— ক্ষতিকর। (২) পুণ্য হিতকর। (৩) মোবাহ্—ক্ষতিকরও নহে, হিতকরও নহে। মানবের এই **ত্রিবিধ** কার্য্যানুষ্ঠানের ফল কখনও সঙ্কল্পের ধরণে পরিবর্ত্তন হয় কি না তৎসম্বন্ধে নিম্নে পৃথক পৃথক আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রথম—পাপানুষ্ঠানের ফল—সদুদ্দেশ্যে হইলেও পুণ্য জনক হয় না। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"বাস্তবিক অনুষ্ঠান কার্য্য, সঙ্কল্পই হইয়া থাকে। (টীঃ ৩২৯) এই বাক্যের অর্থ যদি কেহ এইরূপ ক র যে, পাপ কার্য্যও সদুদ্দেশ্যের ফলে পুণ্য কার্য্যে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে মহা ভুল করা হইবে। পাপ কার্য্য এমনই এক জঘন্য পদার্থ যে, সাধু সঙ্কল্প উহার উপর কোন হিত-পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে না, অধিকন্তু মন্দ অভিপ্রায়ে পাপ কার্য্য করিলে তাহা আরও অধিকতর জঘন্য হইয়া থাকে। এক জনের মনস্তুষ্টির জন্য অপরের নিন্দা করিয়া, অথবা মছজেদ মাদ্রাসা বা পুষ্করিণী আদি প্রস্তুত বাসনায় ধনাপহরণ করিয়া, যদি কেহ আশা করে যে, তাহাতে তাহার পুণ্য হইবে, তবে বড় ভুল করা হইবে। সে ব্যক্তি জানে না যে, সৎকার্য্য করিবার মানসে মন্দ কাজ করা একটী গুরুতর পাপ! মন্দ কাজকে গর্হিত বলিয়া জানিয়া শুনিয়া করা মহাপাপ। মন্দ কার্য্যকে, মন্দ বলিয়া চিনিতে না পারিয়া করিলেও পাপী হইতে হইবে। তাহার কারণ এই যে, "জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে 'ফরজ' কার্য্য।"

টীকা—৩২৯। এই বাক্য হইতে অনেক অর্থ বাহির হয়। পুনঃ পুনঃ বলিবার সুবিধার জন্য বাক্যকে একটু সংক্ষেপ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়, যথা—"কার্য্য, ইচ্ছাতে হয়।" ইহাকে নিম্নলিখিত প্রকারে সাজাইলে কয়েক প্রকার অর্থ বাহির হয়—

১। ইচ্ছা দ্বারা কার্য্য হয়; যথা—জল দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়।

২। কার্য্যের আদি প্রবর্ত্তক ইচ্ছা; যথা—গুরুপাক দ্রব্য ভোজনে গ্রহণী রোগ হয়। গুরু ভোজনে অজীর্ণ, ভেদ, বমনাদি পীড়া—ক্রমে গ্রহণী।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য চিনিবার জ্ঞান লাভে অবহেলা করিলে, সেই 'ফরজ' লঙ্ঘনে পাপী হইতে হয়। অধিকাংশ স্থলে মূর্খতার দোষে মানবের ক্ষতি হয়। মহাত্মা সহল তসতরী বলিয়াছেন—"মূর্খতা অপেক্ষা আর মহা-পাপ নাই; আবার নিজের অজ্ঞানতা চিনিতে না পারা মূর্খতা অপেক্ষা গুরুতর পাপ। "আমি জানি না" ইহা যে পর্য্যন্ত না বুঝা যায়, ততক্ষণ কেহই জানিতে চেষ্টা করে না। সুতরাং 'জ্ঞানের অভাব' টের না পাওয়া সৌভাগ্যের পথে এক মহা প্রতিবন্ধক!

শিক্ষার্থীর মধ্যে পাপের চিহ্ন দেখিলে শিক্ষা না দেওয়া কর্ত্তব্য

যে সকল লোক, বিচারক পদে নিযুক্ত হইয়া, কিম্বা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির কর্ত্তা হইয়া অথবা পিতৃ মাতৃহীন ধনী সন্তানের ধনরক্ষকের ভার লইয়া, বহু অর্থোপার্জ্জনে ধুমধামের সহিত সংসার চালাইতে বাসনা রাখে, এবং যাহারা তর্ক বিতর্কে জয়ী হইবার বাসনায় বিদ্যা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তদ্রূপ লোককে শিক্ষা দেওয়া হারাম। এস্থলে শিক্ষক মহাশয় যদি মনে করেন যে, "আমি ধর্ম্মবিদ্যা, সর্ব্বত্র বিস্তার করিবার বাসনায় শিক্ষা দান করিতেছি; শিখার্থীগণ যদি শিক্ষিত বিদ্যা, মন্দ কার্য্যে প্রয়োগ করিয়া উহার অপব্যবহার করে, তবে আমার কি? আমি সাধু উদ্দেশ্যের কল্যাণে পুণ্য পাইব" শিক্ষক মহাশয়ের এরূপ বিবেচনা করা ভুল। যাহারা দস্যুতা করিয়া নিরীহ পথিকের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে চায়, তাহাদের হস্তে তলওয়ার বিতরণ করতঃ এবং মদ্য-প্রস্তুত-কারীদিগের হস্তে দ্রাক্ষা দান পূর্ব্বক যদি কেহ মনে করে যে—'আমি দানের উদ্দেশ্যে উহা বিতরণ করিতেছি; মহাপ্রভু দাতাকে বড় ভাল বাসেন। সাধু উদ্দেশ্যে দান করিয়া আমি কেন পুণ্য পাইব না? তবে উক্ত শিক্ষক ও এই দাতা তুল্য রূপে দায়ী হইবে। তলওয়ার ধারী ব্যক্তি দস্যুতা করিয়া পথিকের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবে, ইহা বুঝিতে পারিলে তাহার হস্ত হইতে তলওয়ার কাড়িয়া লওয়া কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া আর এক খানি তলওয়ার দিয়া তাহাকে অধিকতর বলবান করিয়া দেওয়া কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

৩। কার্য্য ঘটাইবার জন্য যতগুলি কারণ বা হেতু আছে, তন্মধ্যে ইচ্ছা সর্ব্বপ্রধান যথা—রন্ধন অগ্নিতে হয়। অগ্নি প্রধান তদ্ব্যতীত পাত্র, জল, চুল্লী ইত্যাদি বহু ছোট বড় কারণ আছে।

৪। ইচ্ছা যেমন, কার্য্য তেমন; অর্থাৎ ইচ্ছা সাধু হইলে কার্য্য সাধু, অসাধু হইলে অসাধু, সবল হইলে বলবান, দুর্ব্বল হইলে নিস্তেজ, যথা—যেমন বাপ, তেমনই বেটা।"

৫। ইচ্ছা করিলে কার্য্যের ফল লাভ হয়, কার্য্য ঘটুক আর না ঘটুক।

পূর্ব্ব কালের জ্ঞানী লোকেরা, পাপী আলেমের ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লার স্থানে আশ্রয় চাহিতেন। তাঁহারা শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে পাপের চিহ্ন দেখিতে পাইলে শিক্ষা না দিয়া দূর করিয়া দিতেন। মহাত্মা ইমাম আহমদ হাম্বল ছাহেব এক জন পুরাতন ছাত্রকে অতি সামান্য কারণে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। সেই ছাত্র, নিজ গৃহের দেওয়ালের বাহির পৃষ্ঠে, কর্ত্তিত-তৃণ-মিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিয়াছিল। তাহাতে দেওয়ালটী সামান্য অঙ্গুলী তুল্য পুরু হইয়াছিল। ইমাম ছাহেব বলিয়াছিলেন—'দেওয়ালে লেপ দিয়া তুমি মুসলমান লোকের যাতায়াতের রাস্তার পরিসর এক অঙ্গুলী কমাইয়া দিয়াছ; অতএব চলিয়া যাও তোমাকে শিক্ষা দেওয়া উচিৎ নহে।' যাহা হউক, প্রস্তাবিত কথার মীমাংসা এই যে, সাধু উদ্দেশ্য রাখিয়া পাপ কার্য্য করিলে তাহা কখনই পুণ্য কার্য্য হইতে পারে না। কোর্‌আন ও হদীছ শরীফে যে যে কার্য্য করিবার উপদেশ আছে, তাহাই পুণ্য কার্য্য।

দ্বিতীয়—সদনুষ্ঠানের ফল—সদুদ্দেশ্যবিহীন হইলে নিষ্ফল এবং সদুদ্দেশ্যযুক্ত হইলে পুণ্যবর্দ্ধক। দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুষ্ঠানকে পুণ্য কার্য্য বলে। সৎকার্য্যের উপর, সাধু উদ্দেশ্য **দুই প্রকার** ক্রিয়া করে। প্রথম—কার্য্যটী সৎ হইলেও বিনা-সাধু-উদ্দেশ্যে করিলে উহা নিষ্ফল হয়, অর্থাৎ সাধু উদ্দেশ্য মনে না রাখিয়া সৎকার্য্য করিলেও তাহা সৎকার্য্য বলিয়া গণ্য হয় না। সাধু উদ্দেশ্যই কর্ম্মকে সৎ করিয়া দেয় (টীঃ ৩৩০) উহাই সৎকার্য্যের প্রাণ। **দ্বিতীয়**—কোন এক সৎকার্য্যের মধ্যে যত অধিক সাধু উদ্দেশ্য প্রবিষ্ট থাকে, পুণ্য ততগুণ বর্দ্ধিত হয়।

'নীয়ৎ' কি ভাবে কেমন করিয়া করিলে অধিক পুণ্য পাওয়া যায়, সেই কৌশল যে ব্যক্তি শিক্ষা করিয়াছে, সেই ব্যক্তি, এক কার্য্যে দশ প্রকার সাধু উদ্দেশ্য সৃজন পূর্ব্বক, উহাকে দশ প্রকার সৎকার্য্যে পরিণত করিতে পারে। মনে কর, মছজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ অবস্থিতি করা একটী উত্তম কার্য্য; ইহার মধ্যে কত প্রকার সাধু উদ্দেশ্য সমাবেশ করা যাইতে পারে তাহা এক বার মনে করিয়া বুঝ—

মছজেদে অবস্থিতি যত প্রকার সাধু উদ্দেশ্য হইতে পারে

প্রথম উদ্দেশ্য আল্লার দর্শন প্রাপ্তির আশা। মছজেদ আল্লার ঘর; মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (ছাঃ) বলিয়াছেন—'যে ব্যক্তি

টীকা—৩৩০। কঠিন-শীতে অগ্নি প্রজ্জ্বলন-কার্য্যে ও দুর্ভিক্ষ-কালে-খোরাক-বস্ত্র-প্রস্তুত-কার্য্যে 'আর্ত্তজনের দুঃখ লাঘব উদ্দেশ্য' মনে রাখিলে উহা সৎকার্য্য হয়। কিন্তু পর্ব্বত-

মছজেদে যায়, সে আল্লাকে দর্শন করিতে যায়।' যে ব্যক্তি কাহারও দর্শন লাভে যায়, 'দর্শনীয়' ব্যক্তির প্রতি ভক্তি জন্মাইয়া লওয়া তাহার উচিত। **দ্বিতীয়** উদ্দেশ্য—পরবর্ত্তী নমাজ পড়িবার আশা করা। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে যে,—"নমাজের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলে, নমাজে নিমগ্ন-থাকিবার-তুল্য মঙ্গল পাওয়া যায়।" **তৃতীয়** উদ্দেশ্য—মছজেদে অবস্থান দ্বারা চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা হস্ত পদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রীয়গুলিকে অন্যায় ও নিরর্থক কার্য্য হইতে ক্ষান্ত রাখা। ইহা এক প্রকার রোজা। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে যে, মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (ﷺ) বলিয়াছেন—"আমার ধর্ম্মমতাবলম্বী মুছলমানগণের মছজেদে অবস্থান, অন্য ধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসীগণের বনবাসের তুল্য।" **চতুর্থ** প্রকার উদ্দেশ্য—সংসারের সম্পর্ক ও কাজ কাম হইতে মন তুলিয়া লইয়া আল্লার উপর স্থাপন করতঃ তাঁহার স্মরণে ও ধ্যান ধারণায় মগ্ন রাখা। **পঞ্চম** উদ্দেশ্য—লোকের বাদ প্রতিবাদ ও ঝগড়া বচসা হইতে আত্মরক্ষা করা। **ষষ্ঠ** উদ্দেশ্য—মছজেদের মধ্যে অপ্রিয় কার্য্য দেখিলে নিষেধ করিব, উত্তম কার্য্য দেখিলে উৎসাহ দিব এবং যে ব্যক্তি নমাজের অনুষ্ঠিত ক্রিয়াগুলি উত্তম রূপে জানে না তাহাকে আদরের সহিত শিক্ষা দিব এই আশা করা। **সপ্তম** উদ্দেশ্য—মছজেদে ধার্ম্মিক লোকের দর্শন পাইবার ও তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার আশা করা। কেননা মছজেদ ধার্ম্মিক লোকের শান্তির স্থান। **অষ্টম** উদ্দেশ্য—আল্লার ঘরে পাপ কার্য্য করিতে ভয় জন্মিবে এবং পাপ চিন্তা করিতে লজ্জা আসিবে সুতরাং মছজেদে অবস্থান করিলে পাপ কার্য্য ও পাপ চিন্তা ঘটিবে না এই আশায় মছজেদের আশ্রয় লওয়া। প্রিয় পাঠক! ভাবিয়া দেখ, মছজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ বাস একটী সামান্য ধরণের উত্তম কার্য্য; ইহার মধ্যে উক্ত প্রকার বহু সাধু উদ্দেশ্য স্থাপন করা যায়। এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যেই বহু সংখ্যক সাধু উদ্দেশ্য যোগ করা যায় এবং যে ব্যক্তি এক কার্য্যে যত অধিক সাধু উদ্দেশ্য স্থাপন করিতে পারে, সে তাহা হইতে ততগুণ পুণ্য লাভ করে।

তৃতীয়—নিষ্পাপ-নিষ্পুণ্যের ফল—সদুদ্দেশ্যে হইলে পুণ্যপ্রদ, অসৎউদ্দেশ্যে হইলে পাপ জনক এবং বিনাউদ্দেশ্যে হইলে

কল্লয়ে শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি লাগাইয়া দিয়া আসিলে বা প্রান্তর মধ্যে ২।১০ দেগ অন্ন পাক করিয়া ফেলিয়া আসিলে পুণ্য কার্য্য হয় না, বরং অপচয় করা-হেতু পাপ কার্য্য বলিয়া গণ্য হয়।

পশুশ্রম—৫ম শ্রেণীর অনুষ্ঠানকে مباح মোবাহ্ অর্থাৎ নির্দ্দোষ কার্য্য বলে। যে কার্য্যে পাপও নাই, পুণ্যও নাই, সেই কার্য্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। পশুর ন্যায় অন্যমনস্ক ভাবে এই শ্রেণীর কার্য্য করা কোন মানবের উচিত নহে। চিন্তা পূর্ব্বক সাধু উদ্দেশ্যের সহিত এই শ্রেণীর "নিষ্পাপ-নিষ্পুণ্য কার্য্য" করিতে পারিলে ইহা হইতেও বহু পুণ্য পাওয়া যায়; এমন অবস্থায় পশুর ন্যায় অন্যমনস্ক ভাবে জীবন যাপন করা মানবের পক্ষে বিষম ক্ষতির কথা। মানবের প্রত্যেক গতি, স্থিতি বা অঙ্গচেষ্টার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইবে এবং নির্দ্দোষ কার্য্যেরও হিসাব লওয়া হইবে; যদি মন্দ উদ্দেশ্যে বা কুমৎলবে করা হয়, তবে তজ্জন্য শাস্তি দেওয়া হইবে এবং সাধু উদ্দেশ্যে সম্পাদন করিলে পুণ্য দেওয়া হইবে, কিন্তু কোনই উদ্দেশ্য না রাখিয়া পশুর ন্যায় অন্যমনস্ক ভাবে করিলে অমূল্য পরমায়ুর যে অংশ সেই কার্য্যে ব্যয় হয়, তাহা বৃথা অপচয় করা হয়। সাধু অভিপ্রায়ে এই শ্রেণীর কার্য্য করিলে পুণ্য পাওয়া যায় এবং তাহাতে লাভ হয়। এইজন্য মহাপ্রভু আল্লা বলিতেছেন

وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

"দুনিয়া হইতে লভ্যাংশ লইতে ভুলিও না" (২০ পারা। সুরা কাছাছ। ৮ রোকু।) সংসার সর্ব্বদাই সরিয়া যাইতেছে; যাহা চলিয়া যাইবে তাহার সঙ্গে পুনরায় আর দেখা হইবে না। অতএব বর্ত্তমান সময়ে যত পার লাভের অংশ তুলিয়া লও। লাভ ও ক্ষতি চিরকাল সঙ্গে থাকিবে। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন—"সংসারের প্রত্যেক কার্য্যের জন্য মানুষকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করা হইবে যে 'তুমি ইহা কেন করিয়াছ?' নিতান্ত তুচ্ছ কার্য্যের কারণও জিজ্ঞাসা করা হইবে; যথা—চক্ষে কেন 'সোরমা' দিয়াছিলে? মাটীর ঢেলাটী কেন হাতে তুলিয়া লইয়াছিলে? তোমার ভ্রাতার বস্ত্র কেন স্পর্শ করিয়াছিলে?" যাহা হউক, নির্দ্দোষ কার্য্যের মধ্যে কি প্রকারে সাধু সঙ্কল্প স্থাপন করিতে হয়, তাহাও শিক্ষা করা প্রত্যেক নর নারীর কর্ত্তব্য। কার্য্যকালে মনের মধ্যে সাধু উদ্দেশ্য স্থাপনের কৌশল শিক্ষা করা একটী শ্রেষ্ঠ (এল্‌ম) জ্ঞান।

অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়ের একটা—কাজের মধ্যে সাধু উদ্দেশ্য স্থাপনের শিক্ষা

নির্দোষ কার্য্য, 'নীয়তের' দোষে কেমন জঘন্য পাপে পরিণত হয়, এবং তাহাই আবার সাধু নীয়তের গুণে কি প্রকার উৎকৃষ্ট পুণ্য দেয়, একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিয়া কেহ স্বীয় ঐশ্বর্য্যের গৌরব দেখাইতে পারে অথবা শারীরিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সৌখিনতার পরিচয় দিতে পারে। কেহবা তদপেক্ষা জঘন্য অভিসন্ধি অর্থাৎ পর-নারীর মন ভুলাইবার অভিপ্রায় মনে রাখিতে পারে। পক্ষান্তরে সেই সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারের সময়ে নিম্নলিখিত প্রকার সাধু অভিপ্রায়ও মনে পোষণ করিতে পারে। যথা—(১) আল্লার ঘর—মছজেদের সম্মান প্রদর্শনার্থ আমি এই সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিতেছি।" (২) নিজ শরীরে খোশবো লাগাইলে পার্শ্ববর্ত্তী লোকের মন প্রফুল্ল করা হইবে। (৩) নিজ শরীরে দুর্গন্ধ থাকিলে পার্শ্ববর্ত্তী লোকের মনে অসুখ ও কষ্ট জন্মিতে পারে, খোশবো লাগাইলে তাহাদিগকে তদ্রূপ কষ্ট দেওয়া হইবে না। (৪) শরীরে দুর্গন্ধ থাকিলে পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা নিন্দা করিয়া পাপ ভাগী হইতে পারে; নিজ শরীরে খোশবো লাগাইলে তাহাদের নিন্দা জনিত সেই পাপের পথ বন্ধ করা হইবে। (৫) খোশবো লাগাইলে মস্তিষ্ক পরিষ্কার ও বলবান হইবে সুতরাং আল্লার স্মরণ ও ধ্যান ধারণায় অধিক ক্ষণ নিমগ্ন থাকিবার সুবিধা ঘটিবে ইত্যাদি। যাহাদের মনে পুণ্য উপার্জ্জনের প্রবল ইচ্ছা থাকে, কেবল তাহারা প্রত্যেক কার্য্যে সাধু উদ্দেশ্য মনে জন্মাইয়া লইতে পারে। সাধু সঙ্কল্পের গুণে মানুষের মন ক্রমশঃ আল্লার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। পূর্ব্বকালের জ্ঞানী লোক আহার, বিহার স্ত্রী-সম্ভোগ, বাহ্যে যাওয়া প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য সাধু উদ্দেশ্যে সমাপন করতঃ সর্ব্বদা পুণ্য উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

সুগন্ধি ব্যবহারের উদ্দেশ্য বর্ণনা অসৎ এবং সৎ

সাধু সঙ্কল্পের শেষ পরিণতি

স্ত্রী-সহবাস কালে নিম্নলিখিত প্রকার অভিলাষ মনে রাখিতে হয়; যথা সাধু সন্তান উৎপন্ন হইবে; হজরৎ রসুলের ওম্মৎ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। তৎসঙ্গে পত্নীকে আরাম দিবার এবং তাহাকে ও নিজকে পাপ হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছাও রাখিতে হয়।

সহবাসের সদুদ্দেশ্য বর্ণনা

(১) মহাত্মা সুফিয়ান সুরী ভ্রম ক্রমে এক দিন উল্‌টা পিরহান পরিধান করিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে অনুচরবর্গ পিরহানটী সোজা করিয়া দিবার মানসে তাঁহাকে বাহু উন্নত করিতে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু মহাত্মা

তাহাদের অনুরোধ রক্ষা না করিয়া বরং বাহু বগলে সামটিয়া ধরিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন -"আমি আল্লার জন্য এ কাপড় পরিয়াছি, পরে তাঁহারই জন্য সোজা করিয়া লইব।" (২) মহাত্মা জকরীয়া নবী ﷺ একদা মজুরি করিতে গিয়াছিলেন; ক্ষুধিত হইয়া যখন ভোজনে উপবেশন করেন, তখন কয়েক জন লোক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। নবী মহোদয় তাহাদিগকে ভোজনে আহ্বান না করিয়া নিজের মনে আহার সমাধা করিলেন। আহারান্তে বলিয়াছিলেন—"যে খাদ্য আমার নিকট ছিল, তাহা সমস্ত না খাইলে আমার দ্বারা পুরা পরিশ্রম হইত না। অল্প আহার করিলে আমি শীঘ্র পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতাম সুতরাং গৃহস্থের যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে আমি বেতন লইয়াছি, তাহা অসম্পন্ন রহিয়া যাইত। বেতন লওয়াতে কাজটী সমাপ্ত করা আমার উপর 'ফরজ' হইয়াছে। লৌকিকতার অনুরোধে উহা বিতরণ করিতে গেলে, সেই অতি কর্ত্তব্য ফরজ আমার দ্বারা সম্পন্ন হইত না।" (৩) মহাত্মা সুফিয়ান এক দিন আহার করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। মহাত্মা তাহাকে আহারে সঙ্গী হইতে অনুরোধ না করিয়া নিজ মনে আহার সমাপ্তি করিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন "করজ করিয়া এই খাদ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, তদ্রূপ না হইলে তোমাকে আহারে সঙ্গী হইতে অনুরোধ করিতাম।" (টীঃ ৩৩১) পরিশেষে তিনি বলিয়াছিলেন,—"আহারের জন্য কাহাকে অনুরোধ করিয়া আনিয়া আহার দান কালে যদি মনে ভার বোধ হয়, তবে অনুরোধকারী কপটী ও পাপী হইবে। সে স্থলে অনুরুদ্ধ ব্যক্তি অনুরোধ সত্ত্বেও না খাইলে অনুরোধকারীর এক ক্ষতি (আধ্যাত্মিক-কপটতা-জনিত ক্ষতি), কিন্তু খাইলে তাহার তিন ক্ষতি; এক কপটতা, দ্বিতীয় অন্নের অপচয়, তৃতীয় অবিশ্বাসের কাজ।

টীকা—৩৩১। নিতান্ত কঠিন অভাবে না পড়িলে করজ করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে। শেখ মহোদয় কঠিন ক্ষুধার দায়ে পতিত হইয়া নিতান্ত অভাবে করজ করত: আহার সংগ্রহ করেন। করজের অর্থে গৃহীত খাদ্য লৌকিকতার অনুরোধে বিতরণ করা গর্হিত। কিন্তু হায়! আমরা অপব্যয় করিতে করজ করিয়া থাকি এবং করজের অর্থে নিজের কৌলীন্য ও বড়মানুষী দেখাইয়া থাকি। বিবাহাদি কার্য্যে করজের অর্থ অপচয় করিয়া আমরা আল্লার অপ্রিয় হইয়া পড়িতেছি। সমাজের প্রধান লোকেরা ইহার প্রতিবিধান করিতেছে না বরং কোন কোন স্থলে প্রধান লোকেরাও এই অপ্রিয় কার্য্যে উৎসাহ দিতেছে।

কেননা, যে পদার্থ খাওয়ান হইল ভোক্তা সে পদার্থের অবস্থা জানিলে কখনই খাইত না।"

প্রকৃত ও মৌখিক সঙ্কল্পের পার্থক্য—পাঠক! জানিয়া লও, সরল লোকেরা যখন শুনিতে পায় যে, নির্দ্দোষ কাজ ও নীয়তের গুণে পুণ্য প্রদান করে; তখন তাহারা হয়তো মুখে এমন কি অন্তরেও বলিতে পারে যে,—"আমি এ কাজ আল্লার জন্য করিতেছি" যথা—আল্লার জন্য বিবাহ করিতেছি; আল্লার জন্য ভোজন করিতেছি, আল্লার জন্য বিদ্যা শিক্ষা করি; আল্লার জন্যই ছুফীর 'মজলেছে' যাইয়া থাকি, ইত্যাদি। এই প্রকার কথা বলিয়া তাহারা বিবেচনা করে যে, মনে ও মুখে বলাতে আমাদের পাক্কা 'নীয়ৎ' হইল। কিন্তু তাহা প্রকৃত 'নীয়ৎ' নহে। কেননা তদ্রূপ কথা প্রবৃত্তির উপদেশ ভিন্ন আর কিছু নহে। **প্রকৃত 'নীয়ৎ'** এমন এক আন্তরিক প্রবল আকাঙ্ক্ষা যে তাহা প্রবৃত্তির বিনা-পরামর্শে অন্তরের মধ্যে আপনা আপনি উৎপন্ন হইয়া মানুষকে দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্যে লাগাইয়া রাখে। উহা এক প্রকার 'নিরবছিন্ন উত্তেজনা'; মনকে সদা সর্ব্বদা উত্তেজিত করিতে থাকে। মন সেই খোঁচানিতে অস্থির হইয়া শরীরকে তদনুসারে কার্য্য করিতে আদেশ করে। এই অবস্থা মনের মধ্যে সর্ব্বদা লাগা থাকে না অথবা যখন তখন উৎপন্ন হয় না। কর্ম্মের সঙ্কল্প যখন সুস্পষ্ট ও বলবান হয়, এবং মনের সকল প্রবৃত্তির উপর প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠে, তখনই মনকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে খোচাইতে ও উত্তেজনা করিতে থাকে। যে 'নীয়ৎ' মনকে তদ্রূপ খোঁচাইতে ও উত্তেজনা করিতে না পারে, তাহাকে **মৌখিক 'নীয়ৎ'** বলে। মৌখিক নীয়ৎ কি প্রকার বুঝিয়া লও। যাহার উদর পূর্ণ আছে, সে যদি বলে আমি 'ক্ষুধিত হইবার ইচ্ছা করিলাম' তবে এইরূপ সঙ্কল্প মৌখিক। যে ব্যক্তি কাহারও 'ধার ধারে না' সেই নিরুদ্বেগ লোক যদি বলে যে আমি অমুককে ভাল বাসিতেছি, তবে ইহাও মৌখিক বরং অস্বাভাবিক কথা। এইরূপ যে ব্যক্তি কাম ভাবে উত্তেজিত হইয়া স্ত্রী-সম্ভোগ করিতেছে, সে যদি বলে যে, আমি সন্তান কামনায় ঐ কার্য্য করিতেছি, তবে তাহার কথা মিছামিছী মৌখিক কথা হইবে। এইরূপ যে ব্যক্তি কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ মানসে বিবাহ করে, সে ব্যক্তি যদি বলে যে, আমি রসুলের ছোন্নৎ পালন বাসনায় পাণি-গ্রহণ করিতেছি, তবে তাহারও মিছামিছী কথা খরচ মাত্র। কেবল রসুলের

কথায় বা প্রবৃত্তির অভিলাষে প্রকৃত 'নীয়ৎ' হৃদয়ে উদয় হয় না। প্রথমে বিবাহ সম্বন্ধে ধর্ম্ম-বিধানের উপর অতি উচ্চ ধরণের বলবান্ ঈমান বা বিশ্বাস জ্ঞান জন্মাইয়া লওয়া আবশ্যক। পরে সন্তানার্থ বিবাহ করিলে যেরূপ পুণ্য পাওয়া যায়, তদ্‌বিষয়ে যে সকল হদীছ লিখিত আছে, তাহা বিশেষ মনোযোগের সহিত তলাইয়া বুঝা উচিত। এই দুই উপায় অবলম্বন করিলে বিবাহ জাত পুণ্য ও কল্যাণ পাইতে হৃদয় প্রবল প্রলুব্ধ হইয়া উঠে, এবং সেই প্রবল ইচ্ছা মানুষকে বিবাহ কার্য্যে প্রেরণ করে। তখন মুখে না বলিলেও সেই 'নীয়ৎ' রসুলের ছোন্নৎ প্রতিপালন জন্য হইবে। এইরূপ আল্লার আদেশ পালনের প্রবল ইচ্ছায় যাহাকে নমাজে প্রবৃত্ত করে, তাহার 'নীয়ৎ' কেবল আল্লার আদেশ পালনে ঘটে। তথায় মুখে নমাজের 'নীয়ৎ' বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহা বুঝিবার জন্য ক্ষুধিত লোকের অবস্থার প্রতি মনো-যোগ দাও। যে ব্যক্তি উৎকট ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া আহার করিতে বসিবে, তাহার পক্ষে এ কথা মুখে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, "ক্ষুধা নিবারণের জন্য আমি ভোজনে বসিতেছি।" কেননা সে যখন ক্ষুধিত, তখন তাহার অন্নাহার কেবল ক্ষুধা নিবারণের জন্যই হইয়া থাকে।

প্রবৃত্তির আনন্দ ভোগেচ্ছা ও পারলৌকিক মঙ্গলাশার একত্র আবির্ভাবে মানবের কর্ত্তব্য—প্রবৃত্তি যে স্থলে আনন্দ লোভে অন্ধ হইয়া হৃদয়কে কোন কার্য্য করিতে উত্তেজনা করিতে থাকে, তখন পারলৌকিক মঙ্গলাশা সেই হৃদয়কে উত্তেজনা করিতে অতি অল্পই সুযোগ পায়। পাইলেও কার্য্যটী প্রধানতঃ প্রবৃত্তির পরামর্শেই ঘটে বলিয়া পারলৌকিক মঙ্গল-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে হয় না। তবে যে স্থলে পারলৌকিক মঙ্গল-প্রাপ্তির আশা নিতান্ত প্রবল তথায় প্রবৃত্তি আনন্দ-ভোগের জন্য চাহিলেও কার্য্যটী বাস্তবিক পক্ষে পুণ্যপ্রাপ্তির আশাতেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। যে কার্য্যে, প্রবৃত্তির অনন্দ পাইবার লোভ এবং পরকালের পুণ্য প্রাপ্তির আশা, একত্র মিলিত হয়, তথায় পারলৌকিক পুণ্যের আশাকে চেষ্টা চরিত্র করিয়া বলবান করিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের উপর মানবের ক্ষমতার অভাব—পাঠক! ইহা মোটামুটী বুঝিয়া রাখ যে, 'নীয়ৎ' অর্থাৎ সঙ্কল্প তোমার আয়ত্বাধীন নহে। জ্ঞান-মূলক প্রখর ইচ্ছা, যাহা তোমাকে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত করে এবং অধ্যবসায়ের সহিত তৎ সম্পাদনে নিযুক্ত রাখে, তাহাকেই নীয়ৎ বা

সঙ্কল্প বলে। কার্য্য অবশ্যই তোমাদের ক্ষমতাক্রমে ঘটিয়া থাকে; তোমরা মনে করিলে হস্তাদি সঞ্চালন পূর্ব্বক কাজ করিতে পার, আবার না করিতেও পার, কিন্তু ইচ্ছাটি তোমার ক্ষমতার মধ্যে নাই—তুমি মনে করিলেও ইচ্ছাকে হৃদয়ে উৎপন্ন করিতে পার না, আবার উহা উৎপন্ন হইতে থাকিলে বাধা দিতেও পার না। কোন কোন সময়ে এমন হয় যে, প্রবৃত্তি কিছু চাহিতে থাকিলেও তখন ইচ্ছার উদয় হয় না, আবার অন্য সময়ে প্রবৃত্তি না চাহিলেও তদ্বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে।

ইচ্ছার উৎপত্তি—ধ্রুব-জ্ঞান হইতে ইচ্ছার উৎপত্তি। সাংসারিক বা পারলৌকিক কার্য্য-কলাপের মধ্যে যে স্থলে লাভের চিহ্ন সুস্পষ্ট দেখা যায়, তথায় কার্য্য করিবার ইচ্ছা স্বভাবতঃ জন্মে। লাভের স্থান ও উপায়, যে ব্যক্তি সুন্দর মত চিনিতে পারেন এবং কোন্ কার্য্যে অধিকতর লাভ হস্তগত হইবে, নিঃসন্দেহে জানিতে পারেন, তিনি ছোট খাটো লাভজনক কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল গুরুতর লাভকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন; কেননা, অল্প লাভজনক ও অধিক লাভজনক কার্য্য যুগপৎ এক সময়ে সম্মুখে উপস্থিত হইলে লোকের মন অল্প লাভকর কার্য্যের দিকে না গিয়া, অধিক লাভকর কার্য্যের দিকে দৌড়ায়। এই কারণে, বিখ্যাত সাধু মহাত্মা হাছন বছরী মানব-লীলা সম্বরণ করিলে তাঁহার জানাজা নমাজে মহাত্মা এব্‌নে সীরিন উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "অধিক পুণ্য-দায়ক অন্য মহৎ কার্য্যের দিকে আমার মন ধাবিত ছিল; মহাত্মা হাছন বছরীর জানাজায় উপস্থিত হইবার ইচ্ছা আমি হৃদয় মধ্যে খুজিয়া পাই নাই।" এই কারণে, কুফার বিখ্যাত জ্ঞানী জমাদ এব্‌নে ছোলায়মান দেহত্যাগ করিলে মহাত্মা সুফিয়ান স্বরী তাঁহার জানাজায় যোগ দিতে পারেন নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ইচ্ছা উৎপন্ন হইলে অবশ্যই আমি যোগ দিতাম।" কোনও ব্যক্তি, মহাত্মা তাউছের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তৎপ্রতি আশীর্ব্বাদ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—"আশীর্ব্বাদ করিবার 'ইচ্ছা' যে পর্য্যন্ত আমার হৃদয়ে আবির্ভূত না হইতেছে, ততক্ষণ প্রতীক্ষা কর।" এই মহাত্মাকে হদীছ বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি কখন কখন এমন নীরব হইতেন যে কিছুই বলিতেন না; অবার কোন সময়ে অন্যের বিনা অনুরোধে অনর্গল হদীছের উপদেশ দিয়া যাইতেন। তিনি বলিতেন,—'আমি ইচ্ছার প্রতীক্ষায় ছিলাম।'

এক জন জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন—"কোন পীড়িত বন্ধুকে দেখিতে যাইবার 'ইচ্ছা' সংশোধন করিতে আমি এক মাস যাবৎ চেষ্টা করিতেছি, অদ্যাবধি সংশোধন হইতেছে না।"

মনের অবস্থাভেদে সঙ্কল্পকে শুদ্ধ ও বলবান করিবার বিভিন্ন উপায়—যাহা হউক, ফল কথা এই যে, যে পর্য্যন্ত সংসারের লোভ হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত কোনই সংকার্য্যের সঙ্কল্প ঠিক হয় না। এমন কি সে সময়ে ফরজ কার্য্যের সঙ্কল্পও বহু কষ্টে ঠিক করিতে হয়। মনের অবস্থা ভেদে সঙ্কল্পকে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বলবান্ করিয়া লইতে হয়। কখন কখন মন এমন অবস্থায় থাকে যে, দোজখের শাস্তিভয় না আনিলে 'সঙ্কল্প' সংশোধিত হয় না। কি উপায়ে সঙ্কল্প শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়, তাহা যিনি সুন্দর মত জানেন, তিনি কখন কখন উচ্চ ধরণের সংকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল 'মোবাহ্' কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন—অর্থাৎ যে কার্য্যে পাপও নাই, পুণ্যও নাই, তদ্রূপ কার্য্য সাধু-উদ্দেশ্য সহকারে করিতে নিযুক্ত হন। তাহার কারণ এই যে, উন্নত শ্রেণীর সংকার্য্যে হয়তো নির্দ্দোষ সঙ্কল্প দেখিতে পান না, কিন্তু মোবাহ্ বা সাধারণ ধরণের কার্য্যে সুষ্ঠ সঙ্কল্প সহজেই প্রাপ্ত হইতে পারেন। দেখ, প্রতিশোধ ও ক্ষমা এই উভয়ের মধ্যে ক্ষমা উন্নত শ্রেণীর সংকার্য্য, কিন্তু ক্ষমা করিবার বিশুদ্ধ সঙ্কল্প প্রাপ্ত হওয়া অতীব কঠিন। তদরূপ সঙ্কল্প, পূর্ণ-জ্ঞানের প্রভাবে উৎপন্ন হইতে পারে। এই জন্য ক্ষমা করিবার বিশুদ্ধ সঙ্কল্প সহজে জন্মে না, কিন্তু প্রতিশোধের সঙ্কল্প সহজেই জন্মিতে পারে। তেমন স্থলে প্রতিশোধ লওয়াই বাস্তবিক হিতকর। কোন ব্যক্তি, শেষ রজনীর 'তাহাজ্জোদ' নমাজ পড়ার সুষ্ঠ সঙ্কল্প স্বীয় অন্তরে দেখিতে পান না; কিন্তু অতি প্রত্যুষে ফজরের নমাজ সুন্দর মত পড়িবার মানসে নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইবার ইচ্ছা প্রবল দেখিতে পান; এমন লোকের পক্ষে 'ফজরের' নমাজ অতি প্রত্যুষে সমাপন করিবার ইচ্ছায় নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাওয়াই হিতকর। যে ব্যক্তি ক্রমাগত এবাদৎ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি যদি বুঝিতে পারেন যে, পত্নীর সহিত কিছুক্ষণ আমোদ করিলে বা অপরের সহিত আলাপ করিলে মনের বিমর্ষতা ও শরীরের ক্লান্তি দূর হইতে পারে এবং পরিশেষে পুনরায় এবাদতে একাগ্রতা ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতে পারে; তবে তাঁহার পক্ষে আমোদ প্রমোদ ও বাক্যালাপ

স্থল বিশেষে শেষ রজনীর নমাজ অপেক্ষা নিরুদ্বেগ নিদ্রা উত্তম

স্থলবিশেষে এবাদৎ অপেক্ষা নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ ও বাক্যালাপ উত্তম

করা এবাদত অপেক্ষা উত্তম। মহাত্মা আবু দরদা বলিতেন—"এবাদতে একাগ্রতা ও প্রফুল্লতা লাভের বাসনায় আমি কখন কখন নির্দ্দোষ আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকি!" হজরৎ আলী করমুল্লা বলিয়াছেন,—"তুমি যদি এক কার্য্যে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার মনকে, বলপূর্ব্বক আটক রাখ, তবে তোমার আত্মা অন্ধ হইয়া পড়িবে।" নির্দ্দোষ আনন্দ ভোগে যেমন এক পক্ষে প্রবৃত্তির তুষ্টি সাধন হয়, তেমনি অপর পক্ষে এবাদতে একগ্রতা ও মনে বল বৃদ্ধি পায়। এই ব্যবহারকে রোগীর জন্য মাংসের যুষ পথ্য দেওয়ার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীকে নিতান্ত দুর্ব্বল দেখিলে মাংসের যুষ পথ্য দেন। ইহাতে যেমন এক পক্ষে বায়ুর রুক্ষতা ও উষ্ণতা বৃদ্ধি করিয়া 'দোষ' বৃদ্ধির সহায়তা করে, তেমনি অন্য পক্ষে শরীরে বল বৃদ্ধি করিয়া ঔষধ গ্রহণের ও পথ্য পরিপাকের সামর্থ্য আনিয়া দেয়।

স্থ ল বি শে ষে মাংসের যুষ দুর্ব্বল রো গী র সুপথ্য

সুচতুর সেনাপতি কখন কখন স্বীয় সেনাদিগকে শত্রুর সম্মুখ হইতে পলাইয়া আনিয়া পানাহারে বলদৃপ্ত করতঃ সজ্জিত রাখেন; শত্রু সৈন্য তাহাদের অনুসরণে ধাবিত হইলে সুযোগ বুঝিয়া প্রবল বেগে তাহাদের উপর নিপতিত হন; এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলেন। মানবকে, প্রবৃত্তি ও শয়তানের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মপথে চলিতে হয়। পরিপক্ক লোকেরা সেই অবিরাম যুদ্ধে বহু চালাকী ও কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম-জ্ঞানী পথিকগণের পক্ষে তদ্রূপ কৌশল ও চালাকী অতীব প্রশংসনীয় ব্যাপার। অপরিপক্ক আলেম তদ্রূপ কৌশলের সুযোগ পান না।

মানবকে এবাদৎ কার্য্যে রত করিবার ত্রিবিধ আভ্যন্তরিক উত্তেজনা পাঠক! যে আভ্যন্তরিক উত্তেজনা প্রভাবে লোকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে নীয়ৎ বলে, একথা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ; এখন বুঝিয়া লও (১) কেহ কেহ বেহেশ্‌ৎ পাইবার লোভে উত্তেজিত হইয়া এবাদৎ কার্য্য করে, (২) আর কোন কোন ব্যক্তি দোজখের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া এবাদৎ কার্য্যে রত হয়। যে ব্যক্তি বেহেশ্‌তের সুখাশায় সৎকার্য্য করে, তাহাকে লোভের দাস বলা যাইতে পারে; তাহার কারণ এই যে, সে ব্যক্তি এমন স্থানে যাইবার অভিলাষী, যথায় উদর-তৃপ্তি ও কাম-নিবৃত্তির সামগ্রী যথেষ্ট প্রস্তুত আছে। পক্ষান্তরে যাহারা দোজখের শাস্তি

ভয় এবাদৎ কার্য্য করে, তাহারা দুষ্ট ভৃত্যের তুল্য; লাঠি ঠেঙ্গা না খাইলে কাজ করিতে চায় না। বুঝিয়া দেখিলে এই দুই শ্রেণীর লোকেরা কেহই আল্লাকে পাইবার চিন্তা মনে রাখে না—তাহারা আল্লার স্থানে সুখ ভোগ মাত্র চায়। আল্লার প্রকৃত 'বান্দা' কেবল আল্লার জন্য সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন তাঁহারা বেহেশ্‌তের লোভ বা দোজখের ভয়ে কাজ করেন না। তাঁহাদের অবস্থা প্রেমোন্মত্ত লোকের সদৃশ। প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তি যেমন স্বীয় প্রিয়জনের মুখের দিকে চাহিয়া পড়িয়া থাকে—তাহার স্থানে স্বর্ণ রৌপ্য বা আর কিছুই পাইতে চায় না, আল্লার প্রকৃত "বান্দা" তদ্রূপ। আল্লার স্থানে কিছুই পাইতে বাসনা না রাখিয়া কেবল তাঁহার সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিয়া চলেন। যে প্রেমিক স্বর্ণ রৌপ্য পাইবার আশায় প্রিয়জনের দিকে দৃষ্টি রাখে, স্বর্ণ রৌপ্যই তাহার যথার্থ প্রিয় পদার্থ। যাহা হউক, কেবল মাত্র আল্লার সৌন্দর্য্য, যাহার নিকট প্রিয়তম পদার্থ নহে, তাহার মনে "খাছ নীয়ৎ"—প্রকৃত বিশুদ্ধ সঙ্কল্প জন্মিতে পারে না। (৩) যাহার মনে সৌভাগ্য ক্রমে, ঐ প্রকার 'খাছ নীয়ৎ' জন্মে তাঁহার সমস্ত 'এবাদৎ' কার্য্যের মূল-ইচ্ছা কেবল আল্লার সৌন্দর্য্য দর্শনে এবং সমস্ত চিন্তা তাঁহার নিকট মোনাজাত (নিভৃত-নিবেদন) জ্ঞাপনে প্রযুক্ত হয়। তদ্রূপ ব্যক্তি যখন শরীর খাটাইয়া কোন এবাদৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তখন ইহাই বুঝা যায় যে প্রিয়তমের আদেশ গুলিও তাঁহার মনে অতি প্রিয় বলিয়া লাগিয়াছে এবং তৎ পালনার্থ এক উৎকট উত্তেজনা মনে আবিভূত হইয়াছে এবং সেই উত্তেজনার প্রভাবে হস্ত পদাদি ও অঙ্গগুলি পরিচালিত হইয়া আদেশ পালনে অভ্যস্ত হইতেছে। হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিকে, বল পূর্ব্বক আল্লার আদেশ পালনে অভ্যস্ত করিয়া লওয়া নিতান্তই আবশ্যক। তদ্রূপ অভ্যস্ত করিয়া লইতে পারিলে মন যে সময়ে আল্লার সৌন্দর্য্য-দর্শনে বিভোর এবং নিভৃত-নিবেদনে (মোনাজাতে) তন্ময় হইয়া পড়ে তখন শরীর হইতে তদভাবের কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না। তদ্রূপ গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যে, সর্ব্বদা পাপ পরিত্যাগে চেষ্টা করেন তাহা কেবল দোজখের শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইবার উদ্দেশ্য নহে; বরং উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য, কেবল স্বীয় প্রবৃত্তি গুলিকে সংযত পূর্ব্বক তাহাদের

এবাদতের প্রকৃত নিয়ৎ কি?

শরীর খাটাইয়া কোন এবাদৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার আবশ্যকতা বর্ণনা

বাধা অতিক্রম করতঃ আল্লার-সৌন্দর্য্য-দর্শনে ও তৎসকাশে-নিভৃতনিবেদন-স্বাধীনতা-লাভে সক্ষম হওয়া। প্রবৃত্তি বড়ই অবাধ্য; হৃদয় যে সময়ে আল্লার-সৌন্দর্য্য-দর্শনে ও আত্ম-নিবেদনে বিভোর হয় তখন প্রবৃত্তি মাথা তুলিয়া বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এবং হৃদয়ের সম্মুখে বিষম পর্দা ফেলিয়া অন্তরায় জন্মাইতে পারে।

যাহা হউক, উক্ত প্রকার গুণসম্পন্ন লোকই 'আরেফ' অর্থাৎ চক্ষুষ্মান হন। মহাত্মা আহমদ এবনে খোজরোবা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যেন আল্লা বলিতেছেন—"সকলেই আমার নিকট কিছু না কিছু চায়।" কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মহাত্মা শিবলীকে দর্শন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "করুণাময় আল্লা, আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন?" প্রত্যুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমার উপর তাঁহার দয়া প্রবল; কেননা, পৃথিবীতে বাসকালে একদিন হঠাৎ আমার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইয়াছিল যে, বেহেশ্‌ত হইতে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা গুরুতর ক্ষতি আর নাই।" এ কথা বলা আমার পক্ষে নিতান্তই অন্যায় হইয়াছিল বলিয়া করুণাময় স্নেহভরে আমার সেই বাক্য সংশোধন করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন "তাঁহার দর্শন হইতে বঞ্চিত হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ক্ষতি; তদপেক্ষা আরও কোন গুরুতর ক্ষতি নাই।" যাহা হউক, আল্লার দর্শন-জনিত সুখের পরিচয় (তাঁহার ইচ্ছা হইলে) "প্রেম" পরিচ্ছেদে দেওয়া যাইবে। (পরিত্রাণ পুস্তক - নবম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

আরেফগণই এবাদতের প্রকৃত নীতি রক্ষায় সক্ষম

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ—'এখ্‌লাছ' বা অমিশ্র, শুদ্ধ সঙ্কল্প।

অমিশ্র শুদ্ধ সঙ্কল্পের কল্যাণ সম্বন্ধে কোরআন, হদীছ, মহাজন উক্তি ও উপাখ্যান। এখ্‌লাছ অর্থাৎ সঙ্কল্পের শুদ্ধতা ও অমিশ্রতার গৌরব প্রদর্শনার্থ মহাপ্রভু বলিতেছেন—

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ ط

"আমার

"আল্লার ধর্ম্মের জন্য এখ্লাছের সহিত এবাদৎ করুক ইহা ভিন্ন মানবের প্রতি অন্য আদেশ দেওয়া হয় নাই।" (৩০ পারা। স্থরা-বাইয়েনাৎ। ১ রোকু।) তিনি অন্যত্র বলিতেছেন—

কোরআন বচন

أَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ۞

"সাবধান! (শুন!) আল্লার জন্য, কেবল খালেছ (বিশুদ্ধ) এবাদৎ" (২৪ পারা। স্থরা জোমর। ১ রোকু।)

মহাপুরুষ হজরৎ রস্থল ﷺ এর পবিত্র বচনে শুনা গিয়াছে যে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"আমার গুঢ় তত্ত্ব গুলির মধ্যে এখ্লাছ (শুদ্ধ সঙ্কল্প) একটী প্রধান তত্ত্ব; যাহাকে আমি ভালবাসি তাহার অন্তরে উহা জন্মাইয়া দিয়া থাকি।" মহাপুরুষ হজরৎ রস্থল ﷺ মহাত্মা মা'আজকে এখ্লাছের সহিত কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন "এখ্লাছের সহিত কার্য্য কর, তাহাতে অল্প কার্য্যই প্রচুর হইবে।" যাহা হউক, 'বিনাশন পুস্তকে'র অষ্টম পরিচ্ছেদে 'রিয়া' বা সাধুতা-প্রদর্শন-প্রবৃত্তির অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখা গিয়াছে, তাহা হইতে সাবধান হইতে পারিলে 'এখ্লাছ' রক্ষা করা যায়। কেননা, সাধুতা প্রদর্শন, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণে চেষ্টা, সম্মান পাইবার আশা প্রভৃতির কারণে এখ্লাছ একেবারে নষ্ট হয়।

হদীছ বচন

(১) মহাত্মা মারুফ করখী স্বীয় শরীরে চাবুক মারিতেন এবং বলিতেন 'হে আমার প্রবৃত্তি! শুদ্ধ সঙ্কল্প অবলম্বন কর—তাহা হইলে পরিত্রাণ পাইবে।' (২) মহাত্মা আবু ছোলায়মান বলিতেন—"যে ব্যক্তি সমস্ত জীবনের মধ্যে একটী ধাপও শুদ্ধ সঙ্কল্পে ফেলিতে পারে, সে ধন্য।" (৩) মহাত্মা আবু আইয়ুব সজস্তাজানী বলিতেন "সঙ্কল্পের মধ্যে শুদ্ধতা রক্ষা করা, সেই মূল সঙ্কল্প অপেক্ষা কঠিন কার্য্য।" (৪) কেহ এক জন জ্ঞানীকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'মহাপ্রভু আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? তিনি বলিয়াছিলেন "আমি পৃথিবীতে যাহা কিছু আল্লার জন্য করিয়াছিলাম, তৎসমুদয় আমার পুণ্যের পাল্লায় দেখিয়াছি; অতি সামান্য দ্রব্যও আমি পুণ্যের পাল্লায় দেখিতে পাইয়াছি। দালিমের একটী দানা—যাহা আল্লার জন্য খুঁটিয়া লইয়াছিলাম এবং একটী বিড়াল ঘরে মরিয়াছিল, তাহা আল্লার

মহাজন উক্তি

জন্য ফেলিয়া দিয়াছিলাম, এ দুটীও পুণ্যের পাল্লায় দেখিয়াছি। আমার টুপীতে এক টুক্‌রা রেশমের সূত্র ছিল, তাহা পাপের পাল্লায় দেখিয়াছি। কিন্তু এক শত দীনার মূল্যের একটী গর্দ্দভ ঘরে মরিয়াছিল, তাহা আমি কোন পক্ষে না দেখিয়া বিচারপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'হে প্রভো! বিড়ালটী পুণ্যের পাল্লায় দেখিতেছি, গর্দ্দভ দেখিতে পাইতেছি না, ইহার কারণ কি?' উত্তর আসিল—'তুমি যেখানে পাঠাইয়াছ, তথায় গিয়াছে। গর্দ্দভটী মরিলে তুমি দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলে - অধঃপাত হইল! সুতরাং অধঃপাতে গিয়াছে। যদি বলিতে আল্লার পথে গিয়াছে, তবে এখন পুণ্যের পাল্লায় দেখিতে পাইতে।' পৃথিবীতে থাকিবার সময়ে আমি এক দিন কিছু দ্রব্য বিতরণ করিতেছিলাম—সে সময়ে কতকগুলি লোক দূরে দাঁড়াইয়া আমার দান দর্শন করিতেছিল। উহা দেখিয়া আমার মনে প্রফুল্লতা আসিয়াছিল। সেই দান আমি কোন পাল্লায় দেখিতে পাই নাই।" এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত মহাত্মা সুফীয়ান সুরী শ্রবণ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "সে দান যে তাহার পাপের পাল্লায় পড়ে নাই, ইহা তাহার সৌভাগ্য।" (৫) এক ব্যক্তি বলিয়াছেন "আমি জাহাজে চড়িয়া ধর্ম্মযুদ্ধ জেহাদে যাইতেছিলাম, আমাদের এক জন সঙ্গী তাহার তোবড়া (ব্যাগ) বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে, আমি ভাবিয়াছিলাম—'ইহা কিনিয়া লইলে কিছু দিন ব্যবহার করা যাইবে; পরে অমুক নগরে উপস্থিত হইলে তথায় উচ্চ মূল্যে বিক্রিত হইবে; সুতরাং কিছু লাভও পাইব।' সেই রজনীতে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম—দুই জন ফেরেশ্‌তা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পর আলাপ করিবার কালে প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মযোদ্ধাদিগের এক তালিকা লিখিয়া লইতে আসিয়াছেন। যাহারা তামাশা দেখিতে বা বাণিজ্য করিতে কিম্বা গাজী বলিয়া সম্মানিত হইতে আসিয়াছে তাহাদের নাম সে তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে। এমন সময়ে এক জন ফেরেশ্‌তা আমার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত পূর্ব্বক বলিলেন—'এই ব্যক্তি বাণিজ্য করিতে আসিয়াছে অতএব উহার নাম বাদ দাও।' আমি তাড়াতাড়ী বলিলাম—'আল্লার শপথ, আমার সঙ্গে কোন পণ্য দ্রব্য নাই—আমি সওদাগর নহি। কেবল জেহাদ্ করিতে আসিয়াছি।' একজন ফেরেশতা বলিলেন - 'দেখ, তুমি লাভ লইয়া বিক্রয় করিতে কি ঐ তোবড়াটী ক্রয় কর নাই?' আমি রোদন করিতে করিতে বলিলাম—'তাহা যথার্থ, কিন্তু আমি সওদাগর নহি।'

দ্বিতীয় ফেরেশ্‌তা মধ্যস্থতা করিয়া বলিলেন,—'আচ্ছা, তোমার সমস্ত কথাই লিখিয়া লইতেছি। তুমি জেহাদের উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করতঃ পথে লাভ করিবার আশায় একটী তোবড়া কিনিয়াছ। আল্লার যেরূপ ইচ্ছা তদ্রূপ তিনি নিষ্পত্তি করিবেন।'" (৬) যাহা হউক, এই জন্য জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—"এক মুহূর্ত্তের এখ্‌লাছে মানব মুক্তি পাইতে পারে, কিন্তু উহা বড় দুর্লভ পদার্থ।" (৭) তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে,—"জ্ঞানকে বীজ বলিয়া ধরিলে, অনুষ্ঠান কার্য্যকে ক্ষেত্র এবং এখ্‌লাছকে সেচন জল বলা যায়।"

উপাখ্যান

এছ্‌রায়েল বংশে সদনুষ্ঠানশীল এক সাধু বাস করিতেন। একদা তিনি শুনিতে পাইলেন অমুক স্থানে এক বৃক্ষ আছে, লোকে উহাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেছে। সাধুর মনে ক্রোধের উদয় হইল। তিনি একখানা প্রকাণ্ড কুঠার হস্তে লইয়া সেই বৃক্ষ কর্ত্তনে ধাবিত হইলেন। শয়তান এক বৃদ্ধের মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল—'তোমার ন্যায় সাধুর পক্ষে তুচ্ছ বৃক্ষ কর্ত্তনে বৃথা সময় নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে, অতএব তুমি স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া জেকের ফেকের ধ্যান ধারণায় মগ্ন হও; তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে; বৃক্ষ কর্ত্তন অপেক্ষা ধ্যান ধারণা, অতীব উৎকৃষ্ট কার্য্য।' সাধু উহার যুক্তি শ্রবণে বলিলেন—'আমি বৃক্ষ কর্ত্তনে নিরস্ত হইব না—উহা লোকের দৃষ্টিতে এমন এক কু দৃষ্টান্ত হইয়াছে যে আল্লার পূজা হইতে মানুষকে ভুলাইয়া দিবে। এ বৃক্ষ কর্ত্তন করাই আমার এক এবাদৎ। বৃদ্ধরূপী শয়তান 'সাধুর' দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দর্শনে বলিল,—'আমিও তোমাকে বৃক্ষ কর্ত্তনে এক পদও অগ্রসর হইতে দিব না।' ইহা বলিয়া সাধুর সঙ্গে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। পরিশেষে সাধু জয়ী হইয়া শয়তানকে ভূতলে নিক্ষেপ করতঃ বুকের উপর চড়িয়া বসিলেন। শয়তান পরাজয় স্বীকার করতঃ বলিল—'আমার প্রাণ রক্ষা কর—আমি তোমাকে কয়েকটী মুল্যবান কথা বলিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। দেখ, পৃথিবীতে হাজার হাজার পয়গম্বরগণকে বিশ্ব প্রভু প্রেরণ করিয়াছেন; যদি এই বৃক্ষ ছেদন করা তাঁহার অভিপ্রেত হইত তবে এত দিন তিনি কোন পয়গম্বরকে উহা ছেদন করিতে আদেশ দিতেন। তিনি এ বৃক্ষ-কর্ত্তনে তোমার প্রতিও কোন আদেশ দেন নাই; অতএব আমার কথা শুন,—অনধিকার চর্চ্চা করিতে

যাইও না। বৃক্ষ কর্ত্তনে ক্ষান্ত হও; গৃহে গিয়া ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাক।' সাধু বলিলেন—'আল্লা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ বৃক্ষ কর্ত্তনে আদেশ করুন আর না-ই করুন, আমি কর্ত্তব্য বোধে এ বৃক্ষ ছেদন কারব।' এইরূপ কথা কাটাকাটীর পর পুনরায় দুই জনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এবারেও সাধু, শয়তানকে পরাস্ত করিলেন এবং হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। শয়তান পুনরায় অনুনয় বিনয় সহকারে বলিল,—'আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তোমাকে একটী কথা বলিতেছি, তাহা যদি পছন্দ না হয়, ভবে যাহা ইচ্ছা করিও।' সাধু তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সে বলিতে লাগিল—'হে সাধু। তুমি গরীব মানুষ। অন্যের সাহায্য বিনা সংসার চালাইতে পার না। বৃক্ষ কর্ত্তনে ক্ষান্ত হইলে যদি তোমাকে কিছু ধন দেওয়া যায় তবে তোমার জীবিকা স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে; অন্যের স্থানে কিছু লইতে হয় না; বরং তখন তুমি অন্য দরিদ্রকে সাহায্য করিতে পার। বৃক্ষ কাটিলে তোমার কি লাভ হইবে। এই বৃক্ষ কর্ত্তন করিলে, বৃক্ষ-পূজকগণ আর একটী নূতন বৃক্ষ রোপন করিয়া লইবে। তাহাদের কি ক্ষতি হইবে? তোমাকে সৎপরামর্শ দিতেছি—তুমি এ 'খামখেয়াল' পরিত্যাগ কর। প্রত্যহ রজনী যোগে তোমার উপাধানের নীচে দুইটী করিয়া স্বর্ণ মুদ্রা রাখা যাইবে। তুমি প্রাতে উহা লইয়া ইচ্ছা মত দান-দক্ষিণা দিতে পারিবে।' ইহা শ্রবণে আবেদ, মনে মনে ভাবিলেন—'এ বৃদ্ধ তো উত্তম কথাই বলিতেছে? প্রত্যহ যদি দুইটী স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায় তবে একটি মুদ্রা গরীব দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করিব এবং অন্যটী, নিজের সাংসারিক অভাব মোচনে ব্যয় করা যাইতে পারে। বৃক্ষ ছেদন না করিলে, এ প্রকারে, আমার প্রচুর লাভ হইবে তদ্‌ব্যতীত আর একটী বিশেষ কথা এই যে, এ বৃক্ষ কর্ত্তনে মহাপ্রভু আমার উপর কোন আদেশ দেন নাই; আমি তো পয়গম্বর নহি। এ অবস্থায় এ বৃক্ষ কর্ত্তন আমার প্রতি 'ওয়াজেব' (অতি কর্ত্তব্য) হইতে পারে না।' যাহা হউক, এই প্রকার চিন্তার পর উক্ত সাধু গৃহে ফিরিয়া গেলেন। প্রাতঃকালে বালিশের নীচে দুইটী স্বর্ণ মুদ্রা স্থাপিত আছে দেখিতে পাইয়া নিতান্ত আনন্দিত হইলেন। দ্বিতীয় রজনীতেও ঐ প্রকার দুইটী স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষ অকর্ত্তনে নিজকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। তৃতীয় রজনীর প্রভাতে বালিশের নীচে ও শয্যার নানা স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়াও কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

তখন আবেদ পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া কুঠার হস্তে বৃক্ষ কর্ত্তনে ধাবিত হইলেন। পথে শয়তান আসিয়া পূর্ব্ববৎ বাধা দিল। বহু বাক্‌বিতণ্ডার পর উভয়ে পুনরায় দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এবার শয়তান সাধুকে পরাস্ত করতঃ ভূতলে নিপাতিত করিল এবং বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল 'প্রাণে বাঁচিতে চাওতো এখনও ফিরিয়া যাও নতুবা তোমার কণ্ঠ-চ্ছেদন করিয়া ফেলিব।' সাধু অগত্যা ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইলেন। শয়তানও তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। বৃদ্ধের হস্তে পরাস্ত হইয়া সাধু আশ্চর্য্য মনে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচ্ছা বল দেখি, আমি দুইবারে তোমাকে অক্লেশে পরাস্ত করিয়াছি। এবার কোথা হইতে তোমার এত বল আসিল যে আমাকে সহজেই পরাস্ত করিলে?' শয়তান ঈষদ্ হাস্য পূর্ব্বক বলিল—"প্রথম দুইবারই তুমি আল্লার জন্য 'বৃক্ষ পূজার' উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলে এবং আল্লার জন্য বৃক্ষ কর্ত্তনে আসিয়াছিলে তজ্জন্য আল্লা আমাকে তোমার হস্তে পরাস্ত করাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কেবল মাত্র আল্লার জন্য কোন কার্য্য করে তাহার উপর আমার ক্ষমতা চলে না; এবার তোমার স্বার্থ হানি হওয়াতে তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াছ এবং তোমার নিজের স্বার্থের জন্য ও তৎসহ আল্লার জন্য (মিলিত সঙ্কল্প লইয়া) বৃক্ষ পূজা উচ্ছেদার্থ ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছ; এবার তোমার 'নীয়ৎ' বিশুদ্ধ এক আল্লার জন্য নহে সুতরাং তুমি পরাস্ত হইয়াছ, যে ব্যক্তি নিজের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অধীনতায় পরিচালিত হয় সে আমার সঙ্গে পারে না। আমি শয়তান।"

বিশুদ্ধ সঙ্কল্পের পরিচয়—পাঠক! বুঝিতে পারিয়াছ—যে আভ্যন্তরিক উত্তেজনার প্রভাবে লোকে কার্য্য করে তাহাই 'নীয়ৎ' বা সঙ্কল্প। যে স্থলে, একটী মাত্র লাভের আশায় সেই উত্তেজনা ঘটে, তথাকার সঙ্কল্পকে "খালেছ" (অবিমিশ্র বা বিশুদ্ধ) বলে। যে স্থলে একের অধিক আশা, মানবকে কার্য্যে প্রণোদিত করে তথাকার সঙ্কল্পকে বিশুদ্ধ বলা যায় না।

মিলিত একাধিক সঙ্কল্প প্রণোদিত কার্য্য সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত—একের অধিক উদ্দেশ্য একত্র হইয়া কি প্রকারে কাজ করিয়া লয় তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। (১) আল্লার স্থানে পুণ্য পাইবার আশায় লোকে **রোজা** রাখে; এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কখন কখন 'লঙ্ঘন' দিবার প্রয়োজন হয়। কোন ব্যক্তি আল্লার স্থানে পুণ্য প্রাপ্তির এবং স্বাস্থ্য লাভের আশায় যদি এক সময়ে রোজা রাখে, তবে দুই

উদ্দেশ্য একত্র মিলিত হইয়া রোজা রাখাইল বলিয়া রোজার উদ্দেশ্য আর 'খালেছ' বা বিশুদ্ধ রহিল না। এইরূপ একই রোজার মধ্যে নানা উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, যথা—আহারীয় ব্যয় সংক্ষেপ করতঃ কিছু সঞ্চয় করিবার উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, অথবা সেই সঙ্গে অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধনের পরিশ্রম হইতে বাঁচার বাসনাও থাকিতে পারে, অথবা আহারে কিছু না কিছু সময় ব্যয় হয়; 'কাজের ভিড় বাধিলে' সেই সময় দ্বারা হাতের কাজ সারিয়া লওয়া যাইতে পারে; তজ্জন্যও লোকে আহার হইতে বিরত থাকিতে পারে। (২) এইরূপ দাস ব্যবসায় রহিত করিয়া **গোলামকে স্বাধীনতা** দিবার মধ্যে আল্লার প্রসন্নতা লাভের আশার সহিত নানা উদ্দেশ্য একত্র মিলিত থাকিতে পারে। দাসের ভরণ পোষণে যে ধন ব্যয় হয় তাহা বাঁচাইবার ইচ্ছা থাকিতে পারে; অথবা হয়তো সে গোলাম দুষ্ট ছিল, তাহার ক্ষতিকারিতা হইতে রক্ষা পাইবারও বাসনা থাকিতে পারে—এইরূপ আরও উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। (৩) ঐরূপ, **হজ্** কার্য্যের সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখ; আল্লার আদেশ পালনে কেহ হজে যাইতে পারে, এবং তৎসঙ্গে, 'আবহাওয়া' পরিবর্ত্তনে সুস্থ হইবার অভিপ্রায়; নানা দেশ দর্শনের বাসনা; সমুদ্র ভ্রমণের ইচ্ছা, নানা দেশের লোক জন ও তামাসা দর্শনের অভিলাষ ইত্যাদি অনেক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে; অথবা পারিবারিক কোন অশান্তি পরিহার বা পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণের চিন্তা হইতে মুক্তি পাইবার বাসনাতেও কেহ হজে যাইতে পারে। (৪) রাত্রি কালে আল্লার স্থানে পুণ্য পাইবার আশায় কেহ **তাহাজ্জোদের নমাজ** পড়ে; তৎসঙ্গে এ উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে যে, নমাজে দণ্ডায়মান হইলে ঘুম ছুটিয়া যাইবে, নমাজের জন্য জাগিয়া থাকিলে চোর হইতে ধন সম্পত্তির পাহারা দেওয়া হইবে। (৫) **বিদ্যা শিক্ষার** মধ্যে, আল্লাকে চিনিবার উপযুক্ত জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে এবং তৎসঙ্গে সেই বিদ্যার প্রভাবে অর্থোপার্জ্জনের ইচ্ছা এবং সেই অর্থ দ্বারা ভূসম্পত্তি ক্রয়ের বাসনা এবং সেই ভূমির উপর নয়ন মনোরঞ্জন উদ্যান নির্ম্মাণের অভিলাষ এবং তৎ সমুদয় ধন সম্পত্তির প্রদর্শন দ্বারা লোকের দৃষ্টিতে বড় মানুষ বলিয়া সম্মানিত হইবার আকাঙ্ক্ষাও থাকিতে পারে। (৬) ছুফী-দিগের **সাধনার** বা সাধারণ শিক্ষার্থীদিগের জন্য **বিদ্যালয় স্থাপনের** মধ্যে আল্লার স্থানে পুণ্য পাইবার আশাও থাকিতে পারে এবং তৎ-

সঙ্গে এই উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে যে, জ্ঞানের কথা লইয়া শিক্ষার্থীদের সহিত আলাপ করিতে থাকিলে নির্জ্জন বাসের বিমর্ষতা ও নির্ব্বাক অবস্থার কষ্ট ঘুচিতে পারে। তাহাদের সহিত বাক্যালাপে মনে প্রফুল্লতা আসিতে ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতে পারিবে এরূপ আশাও থাকিতে পারে। (৭) **কোরআন শরীফ** লিখিবার উদ্দেশ্য মধ্যে হস্তাক্ষর সুন্দর পাকা করিবার ইচ্ছাও থাকিতে পারে। (৮) **পদব্রজে হজে** যাইবার উদ্দেশ্য মধ্যে, বাহন ব্যয় বাঁচাইবার ইচ্ছাও থাকিতে পারে। (৯) **ওজু** করিবার উদ্দেশ্য মধ্যে, চোখে মুখে জল ছিটাইয়া শরীর শীতল করিবার ইচ্ছা এবং হস্ত পদাদি ধুইয়া ধূলা মাটী পরিষ্কার করিবার ইচ্ছাও থাকিতে পারে। (১০) **স্নানের** প্রকৃত উদ্দেশ্যের সঙ্গে শরীরের ময়লা দুর্গন্ধাদি ধুইয়া ফেলিবার এবং শরীর ঠাণ্ডা করিবার উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে। (১১) **মছজেদ-বাসের** উদ্দেশ্যের সঙ্গে এই অভিলাষও থাকিতে পারে যে, তথায় বাস করিলে ঘর ভাড়া লাগিবে না। (১২) কোন ভিক্ষুককে কিছু দিবার উদ্দেশ্যের সঙ্গে ইহাও এক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে যে তাহাকে কিছু না দিলে, 'জেদ' করিয়া ত্যক্ত বিরক্ত করিবে; সেই বিরক্তি হইতে বাঁচিবার জন্য কিছু **দান করা** হউক। কোন দুঃখীকে সাহায্য দানের মধ্যে, ইহাও এক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে যে তাহাকে কিছু না দিয়া রিক্ত হস্তে ফিরাইয়া দিলে, লোকের নিকট লজ্জা পাইতে হইবে, সেই লজ্জা হইতে বাঁচিবার জন্য কিছু দেওয়া হউক। (১৩) **পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিতে** যাইবার উদ্দেশ্য মধ্যে, এরূপ আশাও থাকিতে পারে যে "আমি পীড়িত হইলে তাহারা আমাকে দেখিতে আসিবে।" অথবা পীড়িত লোককে দেখিতে না গেলে লোকে নিন্দা করিবে অথবা কেহ বলিবে যে উক্ত পীড়িত লোকের সহিত তাহার শত্রুতা আছে বলিয়া দেখিতে আসে নাই। (১৪) এইরূপ **অন্যান্য সৎকার্য্য** করিবার সময়ে, মনে এই ইচ্ছা থাকিতে পারে যে লোকে তাহাকে সাধু বলিয়া প্রশংসা করিবে। ইত্যাকার আশাতে রিয়া বা সাধুতা প্রদর্শনও হয় এবং কপটতাও হয়। ঐ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে রিয়া নামক পরিচ্ছেদে কিছু বলা হইয়াছে। (বিনাশন পুস্তক অষ্টম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ঐ প্রকার ইচ্ছা অল্পই হউক বা বিস্তরই হউক এখ্‌লাছ অর্থাৎ শুদ্ধ সঙ্কল্পকে একেবারে বিনাশ করিয়া ফেলে।

'খালেছ" (বিশুদ্ধ) সৎকার্য্যের লক্ষণ এই যে উহার উদ্দেশ্য মধ্যে স্বার্থপরতার নাম গন্ধ থাকে না—উহা কেবল আল্লার আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে হয়। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ এর স্থানে লোকে **এখ্‌লাছের পরিচয়** জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—

বিশুদ্ধ সৎকার্য্যের লক্ষণ

أَنْ تَقُولَ رَبِّيَ اللهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ○

"তুমি ইহা দৃঢ়তার সহিত বল যে 'আল্লা আমার প্রভু' তাহার পর তোমাকে যেরূপ আদেশ করা হইয়াছে তদনুসারে কর্ত্তব্য-পথে দৃঢ় পদে দাঁড়াও।" মানব যে পর্য্যন্ত স্বীয় প্রবৃত্তির অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে না পারিবে সে পর্য্যন্ত ঐ অবস্থা লাভ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে। এই জন্য জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—'এখ্‌লাছ' অনুযায়ী কার্য্য করা যত বড় দুঃসাধ্য, তত বড় দুঃসাধ্য কাজ আর জগতে নাই। সমস্ত জীবনের মধ্যে একটী কার্য্যও যদি এখ্‌লাছ (বিশুদ্ধ সঙ্কল্প) সহকারে করা যাইতে পারে তবেও মুক্তির আশা আছে।"

প্রবৃত্তির প্রভাব সত্বেও বিশুদ্ধ সঙ্কল্পের সহিত সৎকার্য্য সম্পাদন কঠিনতম ব্যাপার—প্রবৃত্তি, মনোরাজ্যের সমস্ত পদার্থ ধরিয়া টানাটানী করিতেছে, এমন অবস্থায় প্রবৃত্তির স্পর্শে ইচ্ছাকে কলুষিত হইতে না দিয়া, তথা হইতে কার্য্যকে পবিত্র ভাবে বাহির করিয়া লওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। গোবর ও রক্ত পূর্ণ ভাণ্ডের মধ্য দিয়া, শুভ্র দুগ্ধ অবিকৃত ভাবে নিঃসৃত করিয়া লওয়া যেমন দুঃসাধ্য, প্রবৃত্তির স্পর্শে কলঙ্কিত হইতে না দিয়া কোন কার্য্যকে বিশুদ্ধ ভাবে আল্লার জন্য বাহির করিয়া লওয়াও তদ্রূপ দুষ্কর। এতদুপলক্ষে মহাপ্রভু বলিতেছেন—

نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ○

"তাহাদের

"তাহাদের (পশুগণের) উদরস্থ গোবর ও রক্তের মধ্য দিয়া পানকারী-দিগের জন্য সুস্বাদু বিশুদ্ধ দুগ্ধ বাহির করতঃ তোমাদিগকে পান করাইতেছি।" (১৪ পারা। সুরা নহল। ৯ রোকু।) যাহা হউক, এখ্লাছের সহিত কাজ করা দুঃসাধ্য হইলেও মহাপ্রভু মানুষের পক্ষে তাহা সম্ভব করিয়া রাখিয়াছেন। যিনি গোবর ও রক্ত পূর্ণ উদরের মধ্য দিয়া বিশুদ্ধ দুগ্ধ 'ফিল-টার' করিয়া সুস্বাদ অবস্থায় বাহির করিতেছেন; তিনি মানুষের প্রবৃত্তি ও স্বার্থপরতার মধ্য দিয়া বিশুদ্ধ সঙ্কল্পের সহিত সংকার্য্য বাহির করিবারও উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সে উপায়টী নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। সংসারের আসক্তি হইতে মনকে ছিঁড়িয়া লইতে পারিলেই তাহা করা হয়। মন হইতে সংসারের মায়া দূর করিলে আল্লার প্রেম প্রবল হইয়া উঠে! তখন মানব প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় হইয়া পড়ে; সে তখন যে ইচ্ছা করে বা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তৎসমুদয় তাহার প্রিয়জনের জন্যই করে; প্রিয়জনের চিন্তা ভিন্ন আর কিছুই তাহার মনে স্থান পায় না। সংসারাসক্তি-শূন্য ও প্রভু-প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তির অবস্থাও তদ্রূপ হয়! সে ব্যক্তি তদবস্থায় আহার করিলে কি বাহ্যে গেলে তাহাও আল্লার জন্য এখ্লাছের সহিত সম্পন্ন হইতে পারে। অপর পক্ষে, যাহার মনে সংসারাসক্তি প্রবল, তাহার রোজা ও নমাজ এখ্লাছের সহিত, আল্লার জন্য, সম্পন্ন হওয়া দুর্ঘট হইয়া থাকে। মানবীয় কার্য্যের আরম্ভ, প্রথমে অন্তরে উৎপন্ন হয়; পরে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আলোড়িত করিয়া বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে; অন্তর যে দিকে ঝুঁকিয়া থাকে কার্য্যফল সেই দিকে গড়িয়া চলে। সম্মান যাহার মনে ভাল লাগে তাহার সমস্ত কাজ কাম কেবল 'লোক দেখানের জন্য' ঘটিয়া থাকে; এমন কি তাহার হস্ত মুখ প্রক্ষালন, বস্ত্র পরিধান প্রভৃতি গুপ্ত-প্রাতঃকৃত্য গুলিও সাধুতা প্রদর্শনের জন্য করা হয়। এমন স্থলে সাধারণের সহিত সম্বন্ধ রাখে এরূপ কার্য্য যথা—সভা সমিতিতে যোগ দেওয়া, শিক্ষা দান করা; হদীছের উপদেশ বর্ণনা করা, প্রভৃতি কার্য্য 'এখ্লাছের' সহিত, বিশুদ্ধ ভাবে, আল্লার জন্য, নির্ব্বাহ করা কতদূর দুঃসাধ্য, চিন্তা করিবার বিষয়। সাধারণ-সম্পর্কিত কার্য্যের মধ্য এই উদ্দেশ্য থাকে যে, সর্ব্ব সাধারণ লোকেরা উহা হিতকর বলিয়া বুঝিবে এবং উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিবে। তদ্রূপ কার্য্যে আল্লার উদ্দেশ্য

প্রবৃত্তির প্রভাব হতে ও বিশুদ্ধ সঙ্কল্পের সহিত সৎকার্য্য সম্পাদনের উপায়

থাকিলেও সর্ব্ব সাধারণ লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিবার ইচ্ছাটী প্রবল না থাকিয়া কিছুতেই যায় না, এই জন্য দুই উদ্দেশ্যের মিলনে এখ্‌লাছ নষ্ট হইতে পারে। সাধারণ-সম্পর্কিত কাজে, শেষোক্ত ইচ্ছা অর্থাৎ অপর লোকের হৃদয় আকর্ষণের ইচ্ছাটী মনে না আনা বড় কঠিন ব্যাপার। অধিকাংশ জ্ঞানী আলেম ও চক্ষুষ্মান 'আরেফ' তদ্রূপ ইচ্ছা হইতে অন্তর পবিত্র রাখিতে পারেন না, মূর্খ লোকের কথা কি? মূর্খ লোকেরা মনে করে 'সাধারণ সম্পর্কিত কাজগুলি আমরা আল্লার জন্য করিতেছি'—কিন্তু তাহারা মহা ভুল করিতেছে। বিশিষ্ট জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণও তদ্রূপ কার্য্যে বিশুদ্ধ সঙ্কল্প রক্ষা করা সুকঠিন বলিয়া ভয় করেন। এক জন জ্ঞানী সাধু বলিয়াছেন—"আমি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া জামাআতের প্রথম সারিতে দাঁড়াইয়া নমাজ পড়িয়াছিলাম; সে সমস্ত নমাজ আমার বিফল হইয়াছে, ইহা আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি। এক দিন নমাজে আসিতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল বলিয়া শেষের সারিতে স্থান পাইয়াছিলাম। তখন আমার মনে এই কথা জাগিয়াছিল যে অপর লোক, আমার এই ত্রুটী দেখিতে পাইল। ইহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম যে ইতি পূর্ব্বে আমার মনে নমাজের জন্য যে উৎসাহ ও অনুরাগ ছিল তাহা কেবল এই জন্য জন্মিয়াছিল যে লোকে আমাকে প্রথম সারিতে দেখিতে পাইবে।" যাহা হউক, এখ্‌লাছ এমন এক মানসিক সূক্ষ্ম গুণ যাহা চিনিতে পারাই কঠিন—তদনুসারে কার্য্য করা যে কেমন কঠিনতর ব্যাপার তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সৎকর্ম্ম, দুই উদ্দেশ্যের প্রভাবে ঘটিলে বা বিশুদ্ধ ভাবে আল্লার জন্য না হইলে কখনই গ্রাহ্য হয় না।

পরিপক্ক জ্ঞানী ভিন্ন অন্যে বিশুদ্ধ সৎকার্য্য নির্ব্বাচনে অপারগ—সাধু লোকেরা বলিয়াছেন যে—"জ্ঞানী লোকের দুই রকাৎ নমাজ মূর্খ লোকের সম্বৎসরের নমাজ অপেক্ষা মূল্যবান্।" ইহার কারণ এই যে, কি দোষে সৎকার্য্য নষ্ট হয় তাহা মূর্খ লোক জানে না এবং সদুদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা কিরূপে মিশ্রিত হয় তাহাও বুঝিতে পারে না। স্বর্ণের মধ্যে যেমন 'মেকি' থাকে সৎকার্য্যের মধ্যেও তদ্রূপ 'ভুল কার্য্য' থাকে। মূর্খ লোকেরা হরিদ্রা বর্ণের সমস্ত ধাতুকেই স্বর্ণ বলিয়া বুঝিয়া লয়; তদ্রূপ উহারা সমস্ত কার্য্যকে সৎকার্য্য বলিয়া মনে করে। সুদক্ষ ও পরিপক্ক স্বর্ণ-পরীক্ষক 'ছর্‌রাফ্‌' (পোদ্দার) ভিন্ন অন্য পোদ্দার

যেমন মেকী সোনাকে বিশুদ্ধ স্বর্ণ বলিয়া ভ্রম করিতে পারে তদ্রূপ পরিপক্ক জ্ঞানী ভিন্ন অন্যে বিশুদ্ধ সৎকর্ম্ম নির্ব্বাচন করিতে পারে না।

সৎকার্য্যের বিশুদ্ধতা বিনষ্টকারী দোষের শ্রেণী বিভাগ— যে সকল দোষ, সৎকার্য্যের 'এখ্লাছ' অর্থাৎ বিশুদ্ধতা নষ্ট করে তাহার **চারিটী** শ্রেণী আছে। তন্মধ্যে কোনটী অতি দুর্লক্ষ্য ও দুর্ব্বোধ্য এই জন্য আমরা বুঝিবার সুবিধার জন্য রিয়া অর্থাৎ প্রদর্শনেচ্ছার উদাহরণ অবলম্বনে সেই সর্ব্বনাশী দোষের বর্ণনা করিব।

রিয়ার দৃষ্টান্ত অবলম্বনে নমাজের বিশুদ্ধতা নাশক চতুর্ব্বিধ দোষের বর্ণনা।

প্রথম শ্রেণীর দোষ—অতি প্রকাশ্য। মনে কর কোন ব্যক্তি নমাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইতি মধ্যে অন্য লোক আসিয়া যোগ দিল। তখন শয়তান বলিতে লাগিল—অতি সুন্দর ভাবে নমাজ পড়িতে থাক নতুবা ইহারা তোমাকে নিন্দা করিবে। **দ্বিতীয় শ্রেণীর দোষ**—তত প্রকাশ্য নহে—কিন্তু বড় পেঁচাল। শয়তানের প্রদত্ত উপরোক্ত ফাঁকী বুঝিতে পারিয়া, সে ব্যক্তি যদি, অপরের নিন্দা পরিহারের চেষ্টায়, স্বীয় নমাজ সুন্দর করিয়া না দেখায়, তবে শয়তান অন্য যুক্তি অবলম্বনে তাহাকে বুঝাইতে থাকে যে—তুমি সুন্দর মত নমাজ সম্পন্ন কর; এই সকল লোক তোমার সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করতঃ পুণ্যভাগী হইবে; আর তুমিও সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের পুণ্য পাইবে। হয় তো নমাজী ব্যক্তি এ পেঁচাল যুক্তি শুনিয়া ভুলিয়া যাইতে পারে। সদ্দৃষ্টান্তের আদর্শ হওয়া সহজ কথা নহে। যখন কোন সাধু পুরুষের অন্তর রাজ্যে দীনতা হীনতা ভাব পূর্ণ মাত্রায় আবির্ভূত হইয়া উদ্বেলিত হইয়া পড়ে এবং তাহার আলোক চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া যায়, তখন যদি অপর লোক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, তদ্রূপ অনুকরণ করে, তবে দৃষ্টান্তপ্রদর্শক অবশ্যই আদর্শ পুরুষ বলিয়া পুণ্যভাগী হইবেন; কিন্তু যেস্থলে সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শকের অন্তরে একাগ্রতার আলোক পূর্ণ মাত্রায় প্রজ্জলিত হয় নাই, কেবল লোককে অনুসরণের প্রবৃত্তি দিতে তদ্রূপ কার্য্য করিতেছে তথায় অনুকরণকারী ব্যক্তিবর্গ তাহাকে পূর্ণ আদর্শ পুরুষ জ্ঞানে, তদনুকরণ করিয়া লাভবান হইবে কিন্তু দৃষ্টান্ত প্রদর্শক ব্যক্তি কপটতার ঝুকিতে পতিত হইবে। **তৃতীয় শ্রেণীর দোষ**—অতি গুপ্ত। মনে কর কোন ব্যক্তি এ কথাটীও সুন্দর মত বুঝিতে পারিয়াছে যে, নির্জ্জন স্থানে একাকী অবস্থায় যে নমাজ সম্পন্ন হয় তাহা লোকের সাক্ষাতে প্রকাশ্য ভাবে পঠিত নমাজ

হইতে কিছু পার্থক্য ঘটিলে কপটতা করা হয়; এই ভয়ে সেই ব্যক্তি লোকের সম্মুখে যথারীতি সুন্দর মত নমাজ পড়িবার সহজ ক্ষমতা উপার্জ্জন মানসে, নির্জ্জন স্থানে তদ্রূপ নমাজ পড়িবার অভ্যাস জন্মাইতে প্রবৃত্ত হয়। ইহা বাস্তবিক গুপ্ত প্রদর্শনেচ্ছা হইতে জন্মে; কিন্তু সে প্রদর্শন অপরের জন্য না হইয়া নিজের দৃষ্টিতে ঘটে। অর্থাৎ প্রকাশ্য নমাজ হইতে, নির্জ্জনের নমাজ সংক্ষিপ্ত করিতে লজ্জা লাগে। এই জন্য সে, প্রকাশ্য নমাজ যথারীতি পড়িবার অভ্যাস লাভের উদ্দেশ্যে নির্জ্জন স্থানে একাকী সুন্দর মত নমাজ পড়িয়া থাকে এবং মনে করে যে, সে ব্যক্তি অপরের সম্মুখে সাধুতা-প্রদর্শন-রূপ-দোষ হইতে পবিত্র হইয়াছে কিন্তু—আল্লার দৃষ্টির জন্য লজ্জা না করিয়া নিজের দৃষ্টিতে নির্জ্জন নমাজ ও প্রকাশ্য নমাজে পার্থক্য করিতে লজ্জা করায়, বাস্তবিক পক্ষে সে নির্জ্জনে 'রিয়াকার' হইয়াছে। **চতুর্থ শ্রেণীর দোষ**—নিতান্ত গুপ্ত ও অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য। মনে কর, পূর্ব্বোক্ত নমাজী ব্যক্তি এ কথাও বুঝিতে পারিয়া সাবধান হইয়াছে যে, নির্জ্জনে বা প্রকাশ্যে নমাজ সম্পাদন কালে নিজের বা অপরের দৃষ্টিতে ভাল দেখাইবার জন্য দীনতা ও তন্ময়তা অবলম্বন 'গুপ্ত রিয়া'। এরূপ জ্ঞানী লোককেও শয়তান অন্য উপায়ে ফাঁকী দিতে পারে। শয়তান তাহাকে তখন এই বলিতে থাকে—"তুমি বিশ্ব জগতের প্রভুর গৌরব ও প্রাধান্য চিন্তা কর। তুমি জান না! কেমন প্রতাপশালী মহাপ্রভুর সম্মুখে তুমি দাঁড়াইয়াছ?" শয়তানের এই কথাকে উপদেশ ভাবিয়া সে ব্যক্তি দীনতার সহিত প্রকাশ্য নমাজে নিমগ্ন হইতে পারে; ও অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ হইতে পারে। কিন্তু ঐ ভাবটী তাহার নির্জ্জন কালের নমাজে না থাকিয়া যদি প্রকাশ্য নমাজে নূতন ভাবে উদয় হয় তবে 'রিয়া' হইবে। মানুষ হইতে লাভালাভের আশা ছিন্ন হইয়া গেলে, আল্লার গৌরব চিন্তা করিবার কালে, অপরের দৃষ্টি সম্বন্ধে মন নির্ব্বিকার থাকিতে পারে। নমাজের সময়ে নমাজীর মনে মানুষের দৃষ্টি ও পশুর দৃষ্টি সমান বোধ হইলে প্রকাশ্য নমাজ কালেও মনে কোন ভাবান্তর ঘটে না। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য বিবেচনা হইলে মন 'রিয়া' হইতে শূন্য হইতে পারে নাই, ইহা বুঝা যায়।

রিয়ার দৃষ্টান্ত অবলম্বনে উপরে নমাজ বিনাশক যে চারি শ্রেণীর দোষের পরিচয় দেওয়া গেল তাহা অন্যান্য সৎকার্য্যের মধ্যেও ঘটিয়া থাকে। যে

ব্যক্তি এই সূক্ষ্ম পার্থক্য চিনিতে না পারে, সে সৎকার্য্যের পুণ্যে বঞ্চিত হয় এবং অনর্থক পরিশ্রম করিয়া জীবন মাটী করে। তাহার সমস্ত কর্ম্ম বিনষ্ট হয়। এই কারণে মহাপ্রভু বলিতেছেন—

وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ۝

"এবং তাহারা যাহা কল্পনাও করে নাই তাহা উহাদের জন্য আল্লা হইতে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।" (২৪) পারা। সুরা জমর। ৫ রোকু।) যাহাদের সৎকার্য্য বিনাশ পাইবে তাহাদের সম্বন্ধে আল্লা এই কথা বলিয়াছেন।

সৎকার্য্যের সঙ্কল্পের সহিত প্রবৃত্তির আবিলতার মিশ্রণের তারতম্যানুসারে শাস্তি বা পুরস্কারের ব্যবস্থা পাঠক! জানিয়া রাখ—'এবাদতের নীয়ৎ' অর্থাৎ সৎকর্ম্মের সঙ্কল্পের মধ্যে 'রিয়া' (সাধুতা-প্রদর্শন) বা অন্য কোন প্রবৃত্তি-মূলক-স্বার্থপরতা মিশ্রিত হইলে যদি প্রথমোক্ত অপেক্ষা শেষোক্ত উদ্দেশ্য বলবান হয় তবে কর্ম্ম কর্ত্তা শাস্তির উপযুক্ত হইবে; কিন্তু উভয় উদ্দেশ্য সমান সমান হইলে সে ব্যক্তি পুরস্কার বা শাস্তি কিছুই পাইবে না। অপর পক্ষে রিয়া বা প্রবৃত্তি মূলক স্বার্থপরতা দুর্ব্বল থাকিলে আশা করা যায় যে, কার্য্যকর্ত্তা কখনই পুরস্কারে বঞ্চিত হইবে না; ইহা হদীছের বচনাবলী হইতে বুঝা যায়।

একটী বিখ্যাত হদীছ বচনে প্রকাশ আছে যে, এবাদতের সঙ্কল্পের মধ্যে প্রবৃত্তি মূলক-স্বার্থপরতা মিশ্রিত হইয়া উহার বিশুদ্ধতা নষ্ট করিলে আল্লার আদেশ হইবে যে 'যাহার উদ্দেশ্যে এই সৎকর্ম্ম করিয়াছ তাহার নিকটে গিয়া পুরস্কার চাও।' এই আদেশ, আমাদের বিচারে সেই সৎকার্য্যের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যাহার মধ্যে উক্ত দুই প্রকার আকাঙ্ক্ষা সমান থাকে, তথায় অবশ্য সৎকার্য্যে পুণ্য পাওয়া যাইবে না। একই কার্য্য, আল্লার জন্য এবং অন্য স্বার্থ সিদ্ধির মানসে করিলে এবং তজ্জন্য পুরস্কার পাইবার আশা করিলে উক্ত প্রকার আদেশ হইয়া থাকে। যে সকল হদীছ বচনে শাস্তির কথা উল্লেখ হইয়াছে তথায় কার্য্যের উদ্দেশ্য মধ্যে সম্পূর্ণই 'রিয়া'

সৎকার্য্যের সঙ্কল্প ও প্রবৃত্তির আবিলতা সমান সমান হইলে—

বা প্রবৃত্তি মূলক স্বার্থপরতা ছিল অথবা সেই কার্য্যটী আল্লার জন্য করিবার ইচ্ছা করিলেও তদপেক্ষা প্রবৃত্তি মূলক স্বার্থপরতা বা 'রিয়া' প্রবল ছিল।

সৎকার্য্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য, আল্লার সান্নিধ্য পাইবার আশায় হইলে এবং তৎসঙ্গে রিয়া বা প্রবৃত্তি মূলক স্বার্থ দুর্ব্বল ভাবে মিশ্রিত থাকিলে তাহাতে বিশুদ্ধ সঙ্কল্প কৃত কার্য্যের ন্যায় তত পুণ্য না পাওয়া গেলেও কিছু না কিছু পাইবার আশা আছে। এ কথার সত্যতা **দুই প্রকার প্রমাণে** পাওয়া গিয়াছে।

সৎকার্য্যের সঙ্কল্প অপেক্ষা প্রবৃত্তির আবিলতা দুর্ব্বল থাকিলে—

প্রথম—যুক্তি মূলক প্রমাণে বুঝা গিয়াছে যে, আল্লার সান্নিধ্য পাইবার উপযুক্ত গুণ হইতে বঞ্চিত হইলে, এক বিষম ক্ষোভানলের 'পরদার' অন্তরালে পড়িয়া দগ্ধ হইতে হয়; তাহার নামই 'শাস্তি'। আল্লার সান্নিধ্য পাইবার অভিলাষটী, অনন্ত সৌভাগ্যের বীজ এবং সাংসারিক স্বার্থের লালসা, দুর্ভাগ্যের হেতু। কোন ব্যক্তি উক্ত দুই অভিলাষ মনে স্থান দিলে এক অভিলাষ মনকে আল্লার দিকে আকর্ষণ করে এবং অন্যটী তাহা হইতে দূরে লইয়া যায়। উক্ত দুই অভিলাষের বল সমান সমান হইলে, এই ফল হয় যে একটী শক্তি যদি হৃদয়কে এক হস্ত নিকটে টানিয়া আনে তবে অন্যটি উহাকে ততখানি দূরে লইয়া যায় সুতরাং উভয়ের সজ্ঘর্ষণে মন পূর্ব্বে যে স্থানে ছিল এখনও সেই স্থানেই রহিয়া যায়। কিন্তু এক শক্তির প্রভাবে এক হস্ত পরিমাণ নিকটে আসিলে যদি বিরোধী বলের প্রভাবে অর্দ্ধ হস্ত দূরবর্ত্তী হয় তবে ফলে অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে। আবার তদবিপরীত অর্দ্ধ হস্ত নিকটে আকৃষ্ট এবং এক হস্ত দূরে বিতাড়িত হইলে অর্দ্ধ হস্ত দূরবর্ত্তী রহিয়া যায়। এইরূপ, কোন পীড়িত ব্যক্তি উষ্ণ ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণ শীতল ঔষধ সেবন করিলে উভয়ে সমান সমান হওয়াতে কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে না। কিন্তু শীতল ঔষধ অল্প মাত্রায় সেবন করিলে উষ্ণতার প্রভাব কিছু অবশিষ্ট থাকে। আবার শীতল ঔষধ অধিক পরিমাণ খাইলে উষ্ণতা লুপ্ত হইয়া কিছু শীতলতা বৃদ্ধি করে। শরীরে পীড়া ও স্বাস্থ্যের উপর ঔষধের প্রভাব যে প্রকার আত্মার উজ্জ্বলতা ও মলিনতার সম্বন্ধে পাপ পুণ্যের প্রভাব তদ্রূপ। এক বিন্দু পরিমাণ পাপ বা পুণ্য আত্মার উপর স্ব স্ব ক্ষমতা প্রকাশ না করিয়া চলিয়া যায় না—আত্মার নিক্তিতে উহাদের কম বেশী প্রকাশ পাইবে! এই মর্ম্মে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٥
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ٥

"যে ব্যক্তি বালুকা কণা সমান সৎকার্য্য করিবে তাহাও সে দেখিতে পাইবে এবং যে ব্যক্তি বালুকাকণা তুল্য পাপ কার্য্য করিবে তাহাও সে দেখিতে পাইবে।" (৩০ পারা সুরা জল জালাৎ। ১ রোকু) যাহা হউক, আল্লার জন্য সম্পাদিত কার্য্যের মধ্যে রিয়া বা প্রবৃত্তি মূলক স্বার্থ মিশ্রিত হইতে না পারে তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। সদুদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রবৃত্তি-মূলক প্রবল স্বার্থ বা 'রিয়া' মিশিলেও লোকে উহা নিতান্ত সামান্য ও দুর্ব্বল মনে করে। সৎকার্য্যকে নির্দ্দোষ রাখিতে হইলে তাহার উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রবৃত্তি মূলক স্বার্থ মিশিতে দেওয়া কখনই উচিৎ নহে। **দ্বিতীয়**—রহমৎ-মূলক প্রমাণ। বিভিন্নবাদী সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, যদি কেহ আল্লার জন্য হজ্জে যাইবার পথে ক্রয় বিক্রয়ের ইচ্ছা করে তবে আদিম ও মূল উদ্দেশ্যটী হজের জন্য থাকাতে এবং ক্রয় বিক্রয়ের ইচ্ছা পরে তাহার অনুগত ভাবে উৎপন্ন হওয়াতে হজের পুণ্য একেবারে নষ্ট হইবে না; তবে বিশুদ্ধ একক উদ্দেশ্যে হজ করিলে যত পুণ্য মিলিত তত পুণ্য অবশ্যই পাইবে না। আবার দেখ, কোন ব্যক্তি আল্লার জন্য জেহাদ (ধর্ম্মযুদ্ধ) করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে এবং সেই সময় দুই দিকে জেহাদ আরম্ভ হইয়াছে। এক দিকে ধর্ম্মদ্রোহী কাফেরগণ ধনবান, সে দিকে গেলে জয়লব্ধ ধন অধিক পাওয়া যাইতে পারে। অন্য দিকে কাফের লোক দরিদ্র, সে দিকে জয়লব্ধ ধন পাইবার আশা নাই। এমন অবস্থায় সে ব্যক্তি যদি ধনী কাফেরের দেশে 'জেহাদ' করিতে যায় তবে তাহার সমস্ত পুণ্য নষ্ট হইবে না; ইহার কারণ এই যে আল্লার জন্য ধর্ম্মযুদ্ধ করা তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জয়লব্ধ ধন, পাওয়া, না পাওয়া একটা আনুসঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। আবার দেখ, জয়-লব্ধ ধনের প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তির সঙ্কল্প মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম-যুদ্ধের সঙ্কল্প মধ্যে পার্থক্য ছিল না। দুর্ভাগ্য ক্রমে, কেবল ধন লাভ, যে স্থানে ধর্ম্মযুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য হয় তথায় পুণ্য প্রাপ্তির সন্দেহ থাকে।

সত্য বলা যাহাদের প্রকৃতিগত অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তেমন সত্যবাদী ব্যক্তি যদি 'আল্লার জন্য' এবং মনুষ্য জাতির হিত কামনায় সাধু উদ্দেশ্যে বাধ্য হইয়া ছোট খাটো দুই একটা মিথ্যা বলিলেন তথাপি তিনি ছিদ্দীকের শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইবেন না।

মিথ্যা কখন সঙ্গত ?

দ্বিতীয় সতর্কতা—মোনাজাৎ অর্থাৎ আল্লার সম্মুখে নিভৃত-নিবেদন কালে, মনে মুখে পূর্ণ সত্যবাদী হইতে হয়। যখন বলিবে وجهت وجهى "স্বীয় মুখ ফিরাইলাম" তখন যেন তোমার মনের মুখ সংসারের সর্ব্ববিধ পদার্থ হইতে ফিরিয়া আল্লার দিকে যায়। তদ্রূপ না হইলে তোমার মিথ্যা উক্তি হইবে। তাহার পর যে সময়ে বলিবে اياك نعبد "তোমারই আদেশ পালন করিতেছি।" সে সময়ে তুমি যদি লোভাদি প্রবৃত্তির আদেশ মত চলিতে থাক বরং তাহাদিগকে অধীন করিতে না পারিয়া, তাহাদেরই হাতে ক্রীড়া পুতুলের ন্যায় পরিচালিত হও, তবে তোমার পক্ষে ঐরূপ বলা মিথ্যা কথা হইবে। যাহার অধীনতায় ও আদেশ মত চলা যায় তাহারই দাস বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়। এই জন্য মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) মানুষকে স্বর্ণ রৌপ্যের 'ক্রীতদাস' বলিয়াছেন—

تعس عبد الدرهم و عبد الدينار ○

"দেরেম ও দীনারের দাস অতি জঘন্য 'ক্রীত দাস।'" স্বর্ণ রৌপ্য, ধনৈশ্বর্য্যের কথা কি, মানব যে পর্য্যন্ত সংসারের সর্ব্ববিধ আসক্তি হইতে অব্যাহতি পাইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে না পারিবে সে পর্য্যন্ত 'আল্লার দাস' মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিবে না। সংসারের সর্ব্ববিধ আসক্তি হইতে অব্যাহতি পাইয়া আল্লার দাস হইতে হইলে যেমন সমস্ত বস্তু ও ব্যক্তির মায়া মমতা ও আসক্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়া চাই তদ্রূপ স্বীয় প্রবৃত্তির আদেশ ও পরামর্শ লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বাধীন হওয়া আবশ্যক। সম্পূর্ণ রূপে 'আল্লার দাস' হইতে হইলে স্বার্থ ও অহং-ভাবকে একবারে বলি দিতে হয়, তার পর আল্লা ভিন্ন সর্ব্ববিধ বস্তু বা ব্যক্তির ইচ্ছা নির্ম্মূল করিতে হয় এবং আল্লা যেরূপ বিধান করেন বা যে ভাবে রাখেন তাহাতেই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এইরূপ ব্যবহার, আল্লার দাসত্বের সম্বন্ধে পূর্ণ সত্য। যাহার

আল্লার দাস হইবার যোগ্যতার বর্ণনা

ভাগ্যে এইরূপ অবস্থা না ঘটে তাহাকে ছিদ্দীক বলা যায় না এমন কি সে প্রার্থনা বিষয়ে সত্যবাদীও হয় না।

দ্বিতীয় সত্যরক্ষা—সঙ্কল্পের মধ্যে। যে কর্ম্মদ্বারা আল্লার নৈকট্য পাইবার অভিলাষ থাকে তন্মধ্যে আল্লা ভিন্ন অন্য বস্তু বা ব্যক্তিকে পাইবার ইচ্ছা রাখা উচিত নহে। কর্ম্মের উদ্দেশ্য মধ্যে আল্লা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থকে সঙ্গী করিয়া না লওয়াকে 'এখ্‌লাছ' শুদ্ধ-সঙ্কল্প কহে। এইরূপ এখ্‌লাছকে 'ছেদ্‌ক' বা সত্যও বলা যায়, কেননা **'ছেদ্‌ক্' কথাটী ব্যাপক**; বচন, সঙ্কল্প, অঙ্গীকার, ইত্যাদি ছয় বিষয় লইয়া ইহা ব্যাপৃত; তন্মধ্যে কেবল সঙ্কল্প সম্বন্ধীয় সত্যকে এখ্‌লাছ বলে। (সকল সময় **নীয়ৎ অমিশ্র বিশুদ্ধ ও প্রকৃত বাস্তবিকতা যুক্ত** হওয়া বাঞ্ছনীয়।) এবাদৎ (সৎকার্য্য) করিবার কালে, আল্লার সান্নিধ্য পাইবার বাসনার সঙ্গে অন্য আশা মনে থাকিলে সে ব্যক্তি উদ্দেশ্য বিষয়ে মিথ্যাবাদী বলিয়া গণ্য হইবে।

ছেদ্‌ক ও এখ্‌লাছ মধ্যে পার্থক্য—ব্যাপকার্থে ছেদক ও সঙ্কীর্ণার্থে এখ্‌লাছ

তৃতীয় সত্যরক্ষা—কর্ত্তব্য অবধারণে ও মতের দৃঢ়তা রক্ষণে। কোন কোন ব্যক্তি অবধারণ করে যে—'রাজত্ব পাইলে সুবিচার করিব'; 'শাসন কার্য্য বা শিক্ষা দানে আমা অপেক্ষা সক্ষম ব্যক্তি বাহির হইলে তাঁহার হস্তে শাসন ভার বা শিক্ষা দানের ভার প্রদান করিব,' এরূপ অবধারিত মত কখন কখন যথোচিত দৃঢ় থাকে আবার কখন এমন দুর্ব্বল হয় যে অবধারণের পরক্ষণেই লুপ্ত হয়। অবধারিত মত যে সময়ে মনের মধ্যে প্রচুর বলবান থাকে—কিছুতেই বিচলিত না হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেয় তাহাকে 'সত্য অধ্যবসায়' বলে; কিন্তু উহা যখন নিতান্ত দুর্ব্বল থাকে—সামান্য কারণে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় তখন তাহাকে 'মিথ্যা ইচ্ছা' কহে। ছিদ্দীক লোকের 'কর্ত্তব্যাবধারণ' ও সেই 'অবধারিত মত' নিতান্ত দৃঢ় ও অবিচলিত; কেননা তাঁহাদের মনে উহাকে তদবস্থায় অটল রাখিতে একটা প্রবল ইচ্ছা সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। এই জন্য মহাত্মা ওমর ফারুক নিজের 'অবধারিত মত' প্রকাশ কালে বলিয়াছিলেন—"যে সম্প্রদায়ের মধ্যে মহাত্মা হজরৎ আবুবকর ছিদ্দীক বর্ত্তমান আছেন, তাহার সর্দ্দার (নেতা) হওয়া অপেক্ষা আমি শত্রু হস্তে আমার শিরশ্ছেদন অধিক ভালবাসি।" তিনি হজরৎ আবুবকর ছিদ্দীকের সম্মুখে মুছলমান সম্প্রদায়ের সর্দ্দার না

হইবার ইচ্ছাকে স্বীয় অন্তরে এতই বলবান দেখিয়াছিলেন যে শত্রু হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করা বরং তাঁহার সম্মুখে মুছলমান রাজ্যের রাজা হওয়া অপেক্ষা অধিক প্রিয় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কর্ত্তব্যাবধারণে এবং সেই অবধারিত মত অবিচলিত ভাবে রক্ষণে চূড়ান্ত সত্য-পরায়ণ ছিলেন। মনে কর, যাহার প্রতি রাজাজ্ঞা হইল যে 'তুমি হজরৎ ছিদ্দীককে হত্যা কর, নচেৎ তোমার মাথা কাটা যাইবে' এই ব্যক্তি যদি নিজের প্রাণ বাঁচাইতে নিরপরাধ হজরৎ ছিদ্দীককে হত্যা করে তবে তাহার ও হজরৎ ওমরের মধ্যে কর্ত্তব্যের প্রতি মমতার পার্থক্য কতদূর ছিল ভাবিয়া দেখ।

চতুর্থ সত্যরক্ষা—অঙ্গীকার পালনে এবং অবধারিত কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পাদনে। কোন কোন ব্যক্তি, কোন বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্য করিবে বলিয়া পূর্ব্বে অবধারণ করিয়া রাখে, যথা—ধর্ম্মযুদ্ধ আরম্ভ হইলে, আল্লার জন্য যুদ্ধে যাইবে এবং যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রু হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে তথাপি পশ্চাৎপদ হইবে না। কোন ব্যক্তি বা এইরূপ অবধারণ করে যে, উপযুক্ত গুণবান্ নেতার আবির্ভাব হইলে তাঁহার হস্তে নেতৃত্ব দিয়া তদধীনে কার্য্য করিবে কিন্তু যখন ঠিক সেই সময়টী আসিয়া উপস্থিত হয় তখন প্রবৃত্তি, নির্দ্ধারিত অঙ্গীকার পালনে মাথা তুলে না। এই জন্য মহাপ্রভু বলিতেছেন—

رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ

"কতকগুলি লোক এমন আছে, যাহারা আল্লার সমীপে (জীবন মরণের) অঙ্গীকার করিয়া, তাহা পূর্ণ ভাবে প্রতি পালন করিয়াছে।" (২১ পারা। সূরা—আহ্‌জব। ৩ রোকু।)

যাহারা ধন বিতরণ করিবার ইচ্ছা করিয়া, শেষ করে না তাহাদের সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

.... وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝

"তাহাদের (কপটীদিগের) মধ্যে এমন লোক আছে যে, তাহারা আল্লার সঙ্গে এইরূপ অঙ্গীকার করে—'আল্লা যদি দয়া করিয়া আমাদিগকে ধন দান করেন তবে আমরা অতি নিশ্চয় সংকার্য্য করিব এবং অতি নিশ্চয় সাধু হইব।' কিন্তু যখন, তাঁহার অনুগ্রহে, তাহাদিগকে ধন দেওয়া হয় তখন তাহারা সে ধন পাইয়া কৃপণতা করে এবং অঙ্গীকার পালনে বিমুখ হয়; পরিশেষে ফল এই হয় যে আল্লার সঙ্গে অঙ্গীকার ভঙ্গ করার দরুণ এবং মিথ্যা অঙ্গীকার করার দরুণ আল্লা তাহাদিগের হৃদয়ের উপর শেষ দিন পর্য্যন্ত কপটতার জাল বিস্তার করিয়া রাখেন।" (১০ পারা। সুরা তওবা। ১০ রোকু।)

পঞ্চম সত্যরক্ষা—অন্তরস্থ ভাবের সঙ্গে বাহিরের ব্যবহার সমান ও অনুরূপ রাখা সম্বন্ধে। মানুষের মনে যে ভাব, যে অবস্থায় থাকে, ব্যবহারিক কার্য্য ও আচরণ তদনুরূপ হওয়া এই শ্রেণীর সত্যের চিহ্ন। অন্তরে গাম্ভীর্য্য না থাকিলেও যদি কেহ ধীর-গম্ভীর ভাবে চলে তবে সে সত্যবাদী নহে। মনের আবেগ ও বাহিরের অবস্থা সমান রাখিতে পারিলে ঐরূপ সত্য লাভ করা যায়। যাহার অন্তরের ভাব বাহিরের আচরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অথবা সমান সমান তাহার দ্বারা এই শ্রেণীর সত্য রক্ষা পাইতে পারে। (ইহার কারণ এই যে অন্তরের ভাব হইতে তদনুরূপ ইচ্ছা জন্মে, সেই ইচ্ছা কখন কার্য্য উৎপন্ন করিতে পারে, কখন বা পারে না।) এই হেতু মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) আল্লার স্থানে এইরূপ প্রার্থনা করিতেন—"হে প্রভু! আমার প্রকাশ্য আচরণ উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর কর এবং আমার অন্তরকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কর।" যাহার অন্তর, বাহির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে বরং সমান সমানও নহে অথচ মনে করে যে তাহার অন্তর বাহির সমান হইয়াছে সে যদি তদনুরূপ অবধারণ পূর্ব্বক নিজের সাধুতা প্রদর্শনের ইচ্ছা নাও করে তবু ত সে মিথ্যাবাদী এবং ছিদ্দীকের আসন হইতে বহিষ্কৃত।

অন্তরের ভাব ও প্রকাশ্য আচরণ উৎকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ষষ্ঠ সত্যরক্ষা—বিশ্বাস-জ্ঞান অর্থাৎ ঈমানের চরম উন্নতি-বিধানে। মানবকে যে সকল ধর্ম্মভাব ও গুণ লাভ করিতে হয় তাহার আভাস মাত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নহে। তৎসমুদয়কে পূর্ণ ও বলবান করিয়া হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া লওয়া উচিত এবং তদ্রূপ হইল কি না তদ্বিষয়ে সত্যতা

পরীক্ষা করাও কর্ত্তব্য। কোন ধর্ম্মভাবের আভাস বা ছটা মাত্র দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলে, সত্য রক্ষা পায় না। দেখ যাঁহারা মুছলমান হইয়াছেন, তাঁহাদের মনে; ভাল মন্দ বিচার পূর্ব্বক, মন্দটী পরিত্যাগের সতর্কতা; আল্লার প্রতি নির্ভরতা, পাপ ভয়, অনুগ্রহের আশা, আল্লার বিধানে সন্তুষ্টি, এবং তৎপ্রতি ভালবাসা প্রভৃতি ভাবের কিছু না কিছু অবশ্যই প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু প্রারম্ভে ঐ সকল ভাব অতি দুর্ব্বল থাকে পরে ক্রমে ক্রমে বলবান্ করিয়া লইতে হয়। যাহাদের মনে ঐরূপ ভাব বা গুণ, পূর্ণ উন্নতি পাইয়া বিশেষ প্রবল ও দৃঢ় ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে তাহাদিগকে সত্যপরায়ণ বলা যায়। এই উপলক্ষে মহাপ্রভু বলিতেছেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ

وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝

"নিশ্চই মোমেন লোক তাহারা, যাহারা আল্লা ও তাঁহার রসুলের উপর (এমন অবিচলিত) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে যে, বিশ্বাস করার পর তন্মধ্যে (কিছু মাত্র) সন্দেহকে স্থান দেয় না এবং নিজের ধন প্রাণ সহকারে আল্লার পথে পরিশ্রম করে। এই প্রকার লোকই সত্যপরায়ণ। (২৬ পারা। সুরা হোজোরাৎ। ২ রোকূ।) যাহা হউক, যাঁহাদের ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস-জ্ঞান পূর্ণ উন্নত এবং নিতান্ত সুদৃঢ় তাঁহাদিগকে মহাপ্রভু **সত্য-পরায়ণ** (ছিদ্দীক) বলিয়াছেন। দেখ যে ব্যক্তি কোন ভয়ঙ্কর বস্তু দেখিয়া ভয় পাইয়া থাকে তাহার শরীর কাঁপিতে থাকে, বদন মণ্ডল পাণ্ডু বর্ণ ধারণ করে, আহার নিদ্রা দূর হইয়া যায়; ফলকথা, সে অন্যান্য সমস্ত ভুলিয়া কেবল ভয়ে অস্থির হইয়া পড়ে। আল্লার সম্বন্ধে ঐরূপ ভয় জন্মিলে তাহাকে সত্য ভয় বলা যায়। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে 'আমি পাপ দেখিয়া

ভয় পাই' অথচ সে পাপ পরিত্যাগ করিতে না পারে তবে তাহাকে মিথ্যাবাদী বলা যায়। অন্যান্য মানসিক ভাবের সম্বন্ধেও এইরূপ বিবেচনা করিয়া লওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক মানসিক ভাবের অসংখ্য রূপ বা অবস্থা আছে।

যাহা হউক, যে ব্যক্তি উল্লিখিত ছয় বিষয়ের প্রত্যেকটী অবলম্বনে পূর্ণ সত্য-পরায়ণ হইতে পারিয়াছেন তাঁহারই সত্যকে পূর্ণ সত্য এবং তাঁহাকে ছিদ্দীক বলা যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি দুই এক বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করিতে পারিয়াছেন বটে কিন্তু অপর বিষয়ে পারেন নাই তাঁহাকে ছিদ্দীক বলা যায় না। তথাপি যিনি যত বিষয়ে যে পরিমাণে অধিক সত্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন তাঁহার গৌরব তত অধিক হইবে। (মঙ্গল কিসে হয় আল্লাই ভাল জানেন)।

সৌভাগ্য-স্পর্শমণি।

মহাত্মা ইমাম মোহাম্মদ গাজ্জালী রহমতুল্লার

কিমিয়া সা-আদৎ

গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

পঞ্চম খণ্ড

পরিত্রাণ পুস্তক।

শেষ ভাগ।

মৌলবী মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী মরহুম

কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও সম্পাদিত।

নূরুল ঈমান সিরিজ ৩—ক

P
R
HEMACLEARPRINT
S
RAJSAHI

রাজশাহী—
হেমায়েত ইসলাম ক্লিয়ার প্রিন্ট প্রেসে
শ্রী নৃপেন্দ্র চন্দ্র কর কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মির্জা মোহাম্মদ ইয়াকুব
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

(পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত)

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

সূচী পত্র।

—:•:—

—:•:—

সূরা ফাতেহা

সকল জগতের স্বামী, অশেষ করুণাময় !
বিচার কালের প্রভু, দাও মোরে বরাভয়।
কৃপা-সিন্ধো ! আমি মাত্র তব আরাধনা করি,
তোমারি নিকটে শুধু সাহায্য যাচিয়া মরি।
যে দৃঢ় সরল পথে গিয়াছে প্রেমিক তব—
চালাও সে পথে মোরে, হে করুণাময় 'রব'।
অভিশপ্ত পথ-ভ্রষ্ট চলিয়া যে পথে নিতি,
বিরাগভাজন তব, হ'য়েছে, হে বিশ্বপতি,
নিও না সে পথে কভু, এই দয়াদান চাই
চরমে পরম গতি ! হে দয়াল, যেন পাই।

—মতীয়র রহমান খাঁ
(তবলীগ—পৌষ ১৩৩৯

সৌভাগ্য-স্পর্শমণি।

পঞ্চম খণ্ড (শেষার্দ্ধ)

পরিত্রাণ পুস্তক

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রবৃত্তি-পর্য্যবেক্ষণ।

مراقبه و محاسبه

মোরাকবা—প্রবৃত্তির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সংস্থাপন ও
মোহাছবা—প্রবৃত্তির হিসাব গ্রহণ।

মহাবিচারকের নিকটে মানবের বিচার—পরকালে। প্রিয় পাঠক! জানিয়া রাখ, মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ
فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ط

"ঠিক ওজন হয় এমন দাঁড়ী পাল্লা আমি কেয়ামতের দিন খাড়া করিব; তাহাতে কোন প্রাণী কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না।" (১৭ পারা। সূরা

আত্মীয়া। ৪ রোকূ।) কেয়ামতের দিন স্বয়ং আল্লা, পাপ পুণ্যের বিচার করিবেন। কেহ বালুকা-কণা তুল্য পাপ বা পুণ্য করিলে, তাহারও সূক্ষ্ম বিচার হইবে। বিচারের সময়ে কাহার পুণ্য কম ধরিয়া বা পাপ অধিক দেখাইয়া অন্যায় করা হইবেনা। অসংখ্য মানবের বিচার তিনি একাকী এক মুহূর্ত্তে সমাধা করিতে সক্ষম।

মানবের নিকটে স্বীয় কার্য্যের বিচার—ইহকালে। পাপ পুণ্যের বিচার তিনি ইহকালে না করিয়া পরকালে করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন; কিন্তু মানবকে তিনি স্বীয় কার্য্যের বিচার এই পৃথিবীতে বাঁচিবার কালেই করিতে আদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

"আগামী কল্যের জন্য (পরকালের জন্য) মানব যাহা কিছু অগ্রে পাঠাইয়াছে তাহা পরীক্ষা করুক।" (২৮ পারা। সূরা হশর। শেষ রোকূ।)

মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (ﷺ) বলিয়াছেন -"বুদ্ধিমান লোক সময়কে ৪ চারি ভাগ করিয়া এক ভাগে, স্বীয় কার্য্যের বিচার করে, অন্য ভাগে আল্লার সমীপে গোপনে আত্ম-নিবেদন করে; অপর এক ভাগে জীবিকা সংগ্রহের চেষ্টা করে, এবং শেষ ভাগে হালাল বস্তু উপভোগে নির্দ্দোষ আরাম লাভ করে।"

বুদ্ধিমান লোকের দৈনন্দিন কার্য্যের সময় বিভাগ চতুর্বিধ

মহাত্মা ওমর বলিয়াছেন—

حَاسِبُوا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوا

"তোমরা বিচারিত হইবার অগ্রে নিজের বিচার কর।"

স্বয়ং মহাপ্রভু আল্লা বলিয়াছেন—

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا

وَرَابِطُوْا

"হে মুছলমানগণ! তোমরা ছবর কর, এবং এক জন অপরকে ছবর করিতে শিক্ষা দাও এবং পরস্পর মিলজুল করিয়া থাক।" (৪ পারা।

স্বরা আল্ এমরান। শেষ রোকূ।) মুছলমানদিগকে ছবর করিতে এবং অপরকে ছবর শিক্ষা দিতে আল্লা আদেশ করিতেছেন। এ ছবর শব্দের অর্থ—"প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধকালে তাহার উত্তেজনা সহ্য করতঃ স্বকীয় ভাব অটল রাখিতে দৃঢ় পদে দণ্ডায়মান থাকা।

'ছবর' এর সূক্ষ্ম অর্থ

ধর্ম্মপথিকগণের পারলৌকিক বাণিজ্যের শরীক স্বীয় প্রবৃত্তি—ধর্ম্ম-পথিকদিগের মধ্যে যাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে তাঁহারা একথা সুন্দর মত বুঝিয়াছেন যে—মানব এ জগতে বাণিজ্যার্থে আসিয়াছে এবং (নফ্ছ) প্রবৃত্তিকে (টীঃ ৩৩২) সঙ্গে লইয়া সেই বাণিজ্য করিতে হইবে। বাণিজ্যে লাভ হইলে বেহেশ্ত প্রাপ্তি. কিন্তু ক্ষতি হইলে দোজখে পতন অবধারিত। ধর্ম্ম-পথিকগণ স্বীয় প্রবৃত্তিকে বাণিজ্যের 'শরীক' বা অংশী বলিয়া বিবেচনা করেন।

প্রবৃত্তির হিসাব নিকাশের ষড়বিধ মোকাম—সাংসারিক ব্যবসায় বাণিজ্যে যাহাকে 'শরীক' করিয়া লওয়া হয় তাহার সঙ্গে যেমন লোকে কতকগুলি চুক্তি বা নিয়ম বান্ধিয়া লয় এবং তাহার কার্য্য প্রণালীর ও আচরণের প্রতি যেমন বিশেষ সতর্কতার সহিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে—ক্ষতি বৃদ্ধির হিসাব লয়, ক্ষতি করিলে তিরস্কার করে – জ্ঞানী ধর্ম্ম-পথিকগণও পারলৌকিক বাণিজ্য ব্যাপারে প্রবৃত্তিকে শরীক বানাইয়া তাহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করেন এবং তাহার হিসাব নিকাশ **ছয়টী** মোকামে বসিয়া লন।

সাংসারিক বাণিজ্যের শরীকের ন্যায় পারলৌকিক বাণিজ্যের শরীক (প্রবৃত্তির) হিসাব নিকাশ লওয়া চাই

১ম মোকাম مشارطه (মোশারতা) এই মোকামে প্রবৃত্তির সহিত চুক্তির শর্ৎ স্থির করিতে হয়।

২য় মোকাম—مراقبه (মোরাকবা) এই স্থানে প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য পরীক্ষা করতঃ তাহার আচরণের উপর চৌকি পাহারা দিতে হয়।

৩য় মোকাম—محاسبه (মোহাছবা) প্রবৃত্তির হিসাব লওয়া।

৪র্থ মোকাম—معاقبه (মোআকাবা) প্রবৃত্তিকে শাস্তি দেওয়া।

৫ম মোকাম—مجاهده (মোজাহেদা) প্রবৃত্তির উল্টা চাল চলা।

৬ষ্ঠ মোকাম معاتبه (মোআতবা) প্রবৃত্তিকে তিরস্কার করা।

টীকা—৩৩২। নফ্ছ শব্দে এস্থলে রিপু, প্রবৃত্তি বা মন, নিজের আকাঙ্ক্ষা বুঝা যাইবে। সচরাচর কুপ্রবৃত্তিকেই নফ্চ বলে। ইহার আরও অর্থ আছে (১) প্রাণ ও জীবন। (২) প্রাণী। (৩) মনের অবস্থা বা আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি।

এই কয়েকটীর মধ্যে প্রথমটী, কারবার আরম্ভের অগ্রে; দ্বিতীয়টী, কারবার চলিবার সময়ে; তৃতীয়টী, ফল লইয়া; এবং শেষের তিনটী, কারবার শেষ হইলে করিতে হয়। এই শেষোক্ত তিনটী, প্রবৃত্তিকে শাস্তি দিবার তিনটী ধরণ মাত্র।

প্রবৃত্তির হিসাব নিকাশের প্রথম মোকাম—'মোশারতা' অর্থাৎ কার্য্য আরম্ভ করিবার অগ্রে, প্রবৃত্তি হইতে চুক্তি লওয়া। পাঠক! বিচার করিয়া দেখ—সাংসারিক বাণিজ্যে অপরকে 'শরীক' বানাইয়া তাহার হস্তে মূল ধন সমর্পণ করিলে এবং সে কারবারের লাভ পাওয়া গেলে, শরীককে হিতৈষী বন্ধু বলা যায়, কিন্তু শরীক ব্যক্তি যদি মূল ধনই অপচয় করে তবে তাহাকে অবশ্যই শত্রু বলিতে হইবে। এই কারণে শরীকের নিকট হইতে প্রথমেই লাভ পাইবার চুক্তি বান্ধিয়া লইতে হয়। তাহার পর, তাহার হস্তে মূলধন প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বদাই তাহার আচরণের ও মূলধনের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে লাভের হিসাব অতি কড়া ভাবে লইতে হয়। পারলৌকিক বাণিজ্যে, প্রবৃত্তিকে শরীক করিয়া লইয়াও তদ্রূপ নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক। পারলৌকিক বাণিজ্যের লাভ নোকসান চিরস্থায়ী—সর্ব্বদা সঙ্গে থাকে, কিন্তু সাংসারিক কার্য্যের লাভ নোকসান ক্ষণস্থায়ী—দুনিয়ার এই কয়দিন সে লাভ নোকসান বর্ত্তমান থাকে। জ্ঞানী লোক সাংসারিক ক্ষতি তুচ্ছ বিবেচনা করেন। চিরস্থায়ী ক্ষতি নিতান্ত অল্প হইলেও ক্ষণস্থায়ী বহু লাভে তাহা পূরণ করিতে পারে না।

—কার্য্যের প্রারম্ভে

(১) পারলৌকিক বাণিজ্যের অন্যতম মূলধন—পরমায়ু। জীবনের প্রত্যেক নিঃশ্বাস এক একটী বহু মূল্য মাণিক সদৃশ, এক মাণিক সাত রাজার ধন। এরূপ মাণিক-তুল্য নিঃশ্বাসের সদ্ব্যবহারে অসীম সাবধানতার প্রয়োজন। বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা নিতান্তই আবশ্যক। ফজরের নামাজের পর অন্ততঃ এক ঘণ্টা সময় প্রবৃত্তি বা মনের আচরণ আলোচনা করা এবং তাহাকে নিম্নলিখিত ধরণের কথা শুনাইয়া দেওয়া আবশ্যক—"দেখ, মন! পরমায়ু ভিন্ন তোমাকে আল্লা অন্য পুঁজি দেন নাই। জীবিত কালে যে সকল নিঃশ্বাস ত্যাগ করা

পরমায়ুর সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে চুক্তি গ্রহণের ধারা

হইতেছে তাহা আর ফিরিয়া পাইবে না। আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত যতগুলি নিঃশ্বাস তোমাকে ফেলিতে হইবে তাহা অগ্রেই আল্লা লিপীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ; তদপেক্ষা একটী নিঃশ্বাস অধিক ফেলিতে তোমাকে অবসর দেওয়া হইবে না—পরমায়ু শেষ হইলে তুমি আর কোন কার্য্যই করিতে পাইবে না। যাহা করিতে পার তাহা এখনই করিয়া লও। পরমায়ু প্রতি নিঃশ্বাসে কমিয়া যাইতেছে। পরকালে, অনন্ত দীর্ঘ সময় পাইবে বটে কিন্তু তখন করিবার জন্য কোন কাজই পাইবে না। গত রাত্রিতে যখন ঘুমাইয়াছিলে, তখন তো এক প্রকার মরিয়াছিলে। করুণাময় এখন যেন তোমাকে নূতন জীবন দান করিলেন। আগামী রজনীতে পুনরায় নিদ্রা যাইবে সে নিদ্রা হইতে না জাগিতে পারিলেই তো মৃত্যু ঘটিবে! এই জন্য হে মন! তোমাকে বলিতেছি, যে দিনটী এখন হাতে পাইলে তাহা কেবল তোমাকে আত্মসংশোধন ও ক্ষতিপূরণ করিয়া লইবার জন্য অবসর দেওয়া হইল। এই অবসরে যতদূর পার প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া কাজ করিয়া লও। আল্লা তোমাকে এ দিনটী দয়া করিয়া দিলেন। এখনও সৎকার্য্য করিয়া লইতে না পারিলে শেষে অনুতাপে জ্বলিয়া মরিবে। হে মন! কথা শুন — অদ্যকার প্রত্যেক নিঃশ্বাসকে এক একটী অমূল্য মাণিক বলিয়া যত্ন কর ; ইহার প্রত্যেকটীর বিনিময়ে সৎকার্য্য উপার্জ্জন কর। একটী নিঃশ্বাসও বৃথা ব্যয় করিও না ; আগামী কল্য এ মহাসুযোগ আর মিলিবে না। আগামী কল্য পর্য্যন্ত বাঁচিতে হয়তো তোমাকে সময় দেওয়া হইবে না। স্মরণ কর, গত রজনীতে নিদ্রাবেশে তুমি তো এক প্রকার মরিয়াছিলে ; দয়াময় তোমার প্রার্থনা ক্রমে একটী দিন বাঁচিতে অবসর দিয়াছেন ; এই অবসর টুকু হেলায় অপচয় করিও না—অপচয় করিলে মঙ্গল হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে।”

হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—ইহ সংসারে দিবা রজনী চব্বিশ ঘণ্টা ; ইহার প্রত্যেক ঘণ্টার বিনিময়ে, পরকালে, মানবের সম্মুখে এক একটী ভাণ্ডার স্থাপিত হইবে। প্রত্যেক ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া মানবকে দেখান হইবে। যে ঘণ্টায় সৎকার্য্য করা হইয়াছিল তৎপরিবর্ত্তে যে ভাণ্ডার পাওয়া যাইবে তাহা জ্যোতির্ম্ময় মণিমাণিক্যে পরিপূর্ণ দেখা যাইবে। তাহা দর্শন মাত্র মানবের মনে এত আনন্দ ও সুখ উছলিয়া উঠিবে যে তাহার

পরমায়ুর প্রত্যেক ঘণ্টার উপার্জ্জন পরকালে দ্রষ্টব্য

কিয়দংশ দোজখ বাসীদের উপর বাঁটিয়া দিলে সকলেই যন্ত্রণার কথা ভুলিয়া যাইতে পারে। এরূপ আনন্দ ও সুখ জন্মিবার কারণ এই যে তাহারা বুঝিতে পারিবে, এক ঘণ্টার সৎকার্য্যের ফলে আল্লা তাহাদিগকে দর্শন দিবেন এবং নিজের দিকে আকর্ষণ করিবেন। অতঃপর আর একটী ভাণ্ডারের দ্বার খোলা হইবে; তাহা গাঢ় অন্ধকারে পরিপূর্ণ। তন্মধ্য হইতে এমন দুর্গন্ধ নির্গত হইতে থাকিবে যে নাক মুখ বন্ধ করিয়াও তিষ্ঠা ভার হইবে। যে সময়ে পাপ কার্য্য করা হইয়াছিল সেই ঘণ্টার পরিবর্ত্তে সে ভাণ্ডারটী পাওয়া গিয়াছিল। উহা দর্শনে লোকের মনে এমন ভয়, ঘৃণা, দুঃখ, কষ্ট উৎপন্ন হইবে যে তাহার কিয়দংশ বেহেশ্‌ৎবাসীদের সকলের উপর বাঁটিয়া দিলে তাহাদের কষ্টের অবধি থাকিবে না। অনন্তর, আর একটী ভাণ্ডারের দ্বার খোলা হইবে তাহা একেবারে শূন্য দেখা যাইবে। উহার মধ্যে আলো বা অন্ধকার কিছুই থাকিবে না। যে সময়টুকু আলস্যে অতিবাহিত হইয়াছিল—সৎ বা অসৎ কোন কার্য্যই করা হয় নাই—সেই মুহূর্ত্তের বিনিময়ে ঐ শূন্য ভাণ্ডার দেখিতে পাওয়া যাইবে। তদ্দর্শনে মানবের মনে তীব্র অনুতাপ ও ভীষণ লজ্জা জন্মিবে। ফল কথা, পরমায়ুর প্রত্যেক ঘণ্টায় যাহা উপার্জ্জন করা হয় তাহার কথা পরকালে প্রত্যক্ষ হইবে। মানবের ভাগ্য যখন এইরূপ নিয়মবদ্ধ তখন মনকে ইহা সুন্দর মত বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে মহাপ্রভু প্রত্যহ চব্বিশ ঘণ্টার জন্য চব্বিশটী ভাণ্ডার তোমার সম্মুখে স্থাপন করিতেছেন। উহার কোনটীই যাহাতে উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় রত্নশূন্য না হয়, হে মন! তাহার উপায় অবহেলা করিলে পরিণামে অসীম অনুতাপ ও মর্ম্ম যাতনা পাইবে।

ক্ষমা পাইলেও বিনষ্ট পবিত্রতার পুনরুদ্ধার অসম্ভব—পরিণাম অনুতাপ

প্রিয় পাঠক! তোমরা অবশ্যই জ্ঞানী লোককে নিম্নলিখিত মত মন্তব্য প্রকাশ করিতে শুনিয়াছ। তাঁহারা বলেন—"আল্লা ক্ষমা করিবেন।" একথা অবশ্যই বিশ্বাস করা উচিত। কিন্তু নিজের মূর্খতায় ক্ষতি করিয়া আল্লার স্থানে ক্ষমা পাইলেও চির বিশুদ্ধ সাধুজীবনের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য কখনই ফিরিয়া পাইবার আশা নাই (টী: ৩৩৩) এজন্যও অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে।

টীকা—৩৩৩। মূলগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত কথা বিস্তৃত ভাবে অনুবাদ করিলেও অর্থ খোলাসা বুঝা গেল না, তজ্জন্য ২।১টী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে কোন বালক অনাবধানতা হেতু ছুরী দ্বারা কোন অঙ্গ কাটিয়া দিল। ঔষধ ব্যবহার করুক।।

(২) পারলৌকিক বাণিজ্যের অপর মূলধন—কর্ম্মেন্দ্রিয়। প্রবৃত্তির হাতে পরমায়ু দিয়া তাহার স্থানে সদ্‌ব্যবহারের চুক্তি যেমন লইতে হয় তদ্রূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকেও প্রবৃত্তির হাতে সমর্পণ পূর্ব্বক ঐরূপ সদ্‌ব্যবহারের চুক্তি লওয়া আবশ্যক। ইহার পর মনকে বলিয়া দেওয়া উচিত যে, সে যেন ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা কোন কুকর্ম্ম করিয়া না লয়। তাহাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া এইরূপ বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য যে -

কার্ম্মেন্দ্রিয়ের সদ্‌ব্যবহার সম্বন্ধে চুক্তি গ্রহণের ধারা

'হে মন! জিহ্বাকে সংযত করিয়া চালাইবে। চক্ষুকে নিষিদ্ধ দর্শন হইতে রক্ষা করিবে।' এইরূপ সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়কে কুকর্ম্ম হইতে বাচিতে আদেশ দিবে। 'দোজখের সাতটা দ্বার আছে' বলিয়া যে কথা প্রচলিত আছে, তাহা তোমার ৭ সপ্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের পাপের জন্য তোমাকে বিভিন্ন দ্বারে দোজখে পড়িতে হইবে। (টীঃ৩৩৪) অতএব তোমার কর্ম্মেন্দ্রিয় হইতে কি প্রকার ক্ষতি ঘটিতে পারে বুঝিয়া লও। দিবসের সময় মধ্যে যতটুকু তোমার হাতে আছে তাহা হইতে কোন্ কোন্ সৎকার্য্য করা যাইতে পারে। যত সৎকার্য্য করা যাইতে পারে তাহার দৃঢ় অভিলাষ করিবে এবং প্রবৃত্তিকে শক্ত ধমক দিয়া বলিবে যে—'হে মন! হস্ত পঁদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা সৎকার্য্য করিয়া লও—না লইলে তোমাকে কঠিন শাস্তি দিব।' মানবের প্রবৃত্তি যদিও হঠকারী এবং অবাধ্য তথাপি উপদেশ ও রেয়াজৎ (সাধনার প্রভাব) গ্রহণ করিতে পারে।

কার্য্যারম্ভের অগ্রে প্রবৃত্তি হইতে চুক্তি গ্রহণের কল্যাণ— কার্য্যারম্ভের অগ্রে প্রবৃত্তির স্থানে সৎকর্ম্মের চুক্তি বান্ধিয়া লইলে সুফল উৎপন্ন হয়। স্বয়ং মহাপ্রভু বলিতেছেন—

না করুক করুণাময় ক্রমে সে ক্ষতি পূরণ করিয়া দেন। কিন্তু কর্ত্তিত স্থানে পূর্ব্বের অবস্থা ও লাবণ্য কখনই ফিরিয়া আসিবে না। আরও দেখ চিক্কণ সাটীন বস্ত্রে হঠাৎ কালী পড়িয়া গেল—অতি সাবধানে ধুইয়া ফেলিলে কালী দূর হইতে পারে বটে কিন্তু তথায় যে পূর্ব্বের লাবণ্য ছিল তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। আত্মার সম্বন্ধেও তদ্রূপ—পাপে কলঙ্কিত হইলে, অশ্রুজলে সে কলঙ্ক দূর হইতে পারে বটে কিন্তু চিরকাল সৎ ও সাধু জীবন চালাইলেও আত্মার সে সৌন্দর্য্য আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না।

টীকা—৩৩৪। শরীরের উর্দ্ধ ভাগে—চক্ষু কর্ণ নাসিকা ও জিহ্বা, মধ্যভাগে হস্ত এবং নিম্নভাগে জননেন্দ্রিয় ও পদ এই সপ্ত অঙ্গ দ্বারা আল্লার আদিষ্ট সৎকার্য্য করিয়া যেমন বেহেশ্‌তে যাওয়া যায় তেমনই পাপ কার্য্য করিলে দোজখে পড়িতে হয়। সুতরাং ঐ সকল ইন্দ্রিয় বেহেশ্‌ৎ ও দোজখ উভয়েরই দ্বার।

واعلموا ان الله يعلم ما فى انفسكم فاحذروه ○

"সাবধান ! জানিয়া রাখ—তোমাদের মনে যাহা আছে আল্লা সমস্তই জানেন অতএব তাঁহাকে ভয় কর" (২ পারা । সূরা বকর । ৩০ রোকু ।) মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি নিজের বিচার নিজে করে এবং মৃত্যুর পর উপকারে আসে এমন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"যে কার্য্য সম্মুখে আসে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ, যদি পরকালের হিতকর হয়, তবে কর—ক্ষতিকর বলিয়া বুঝা গেলে, দূরে থাক।"

যাহা হউক, প্রতিদিন প্রাতঃকালে, মনকে সৎকর্ম্মের অঙ্গীকারে আবদ্ধ করা আবশ্যক। যে সকল পরহেজগার লোক ধর্ম্মপথে দৃঢ়পদে চলিতে সুন্দর অভ্যস্ত তাঁহাদের সম্মুখেও এমন জটিল কার্য্য আসিয়া উপস্থিত হয় যে তন্মধ্য হইতে সৎকর্ম্ম বাছিয়া লওয়া এবং অনুষ্ঠান করা কঠিন হয়। তখন মনের নিকট হইতে (কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে) সৎকর্ম্মের অঙ্গীকার লওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে।

মনকে সৎকার্য্যের অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিবার উৎকৃষ্ট সময়

প্রবৃত্তির হিসাব নিকাশের দ্বিতীয় মোকাম—মোরাকবা অর্থাৎ প্রবৃত্তির আচরণ পরীক্ষা করা এবং অপকর্ম্ম না করিতে পারে তজ্জন্য কড়া পাহারা দেওয়া। দেখ, সাংসারিক বাণিজ্যের অংশী হইতে লাভের অঙ্গীকার লইয়া তাহার হস্তে মূলধন দিলেও যেমন তাহার আচরণ পরীক্ষা করা এবং তাহার কাজ কামে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক তদ্রূপ প্রবৃত্তির আচরণ পরীক্ষা করা এবং অপকর্ম্ম না করিতে পারে তজ্জন্য পাহারা দেওয়া ধর্ম্মপথিকদিগের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। এসম্বন্ধে শৈথিল্য করিলে প্রবৃত্তি অলস হইয়া পড়ে অথবা বিলাসী হইয়া উঠে শেষে হঠকারী ও অবাধ্য হইতে আরম্ভ করে।

—বাণিজ্য কারবার

প্রকৃত মোরাকবা কি ? "মহাপ্রভু আল্লা আমার কার্য্য ও মনোভাব সুস্পষ্ট দেখিতেছেন" এই ধ্যান করাই প্রকৃত 'মোরাকবা'। মানুষে কেবল লোকের বাহ্য অবস্থা দেখিতে পায়; মহাপ্রভু কিন্তু ভিতরের ও বাহিরের সমস্ত অবস্থা ও ভাব সুস্পষ্ট দেখিতেছেন। "আল্লা দেখিতেছেন" এই কথাটী যে ব্যক্তি সুন্দর মত বুঝিয়াছেন এবং সেই বুঝটী হৃদয়ের মধ্যে সদাসর্ব্বদা জাগরূক রাখিতে পারিয়াছেন তাঁহার শরীর ও মন সর্ব্বদা সজাগ ভাবে

প্রকৃত মোরাকবার প্রথম চিন্তাধারা—আল্লা আমাকে দেখিতেছেন

ভয়ত্রস্ত ও বিনীত থাকে। এই বিশ্বাসটী যাহার মনে নাই সে 'কাফের'। আবার ঐরূপ বিশ্বাস মনে থাকা সত্বেও যে ব্যক্তি পাপ কার্য্য করে সে এমন দুঃসাহসিক যে সে যেন আল্লার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। এ সম্বন্ধে আল্লা বলিতেছেন—

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ۝

"সে কি জানে না, আল্লা দেখিতেছেন!" (৩০ পারা। সূরা আলক। ১ রোকূ।) * * * প্রিয় পাঠক! "আল্লা সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে আছেন এবং তোমাকে সর্ব্বদা দেখিতেছেন" এই কথাটী যে পর্য্যন্ত বুঝিতে না পারিবে সে পর্য্যন্ত তোমার কোন কাজই ঠিক হইবে না। এ সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝

প্রকৃত মোরাকবার দ্বিতীয় চিন্তাধারা—আমি আল্লাকে দেখিতেছি

"নিশ্চয়ই আল্লা তোমাদের পরিদর্শক। (৪ পারা। সূরা নেছা। ১ রোকূ।) 'আল্লা আমাকে দেখিতেছেন' এই বিশ্বাসটী খুব উন্নত হইলে পর 'আমি আল্লাকে দেখিতেছি' এই ভাব খুলিয়া যায়।

হদীছ—১। একদা এক হাবশী, মহাপুরুষ হজরৎ রসুলের (ﷺ) সমীপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"হে রসুলুল্লা! আমি বহু পাপ করিয়াছি, আমার তওবা কি আল্লার দরবারে কবুল হইবে?" ইহা শুনিয়া তিনি বলিয়াছেন—"হাঁ অবশ্যই হইবে।" সে ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"আমি যে সময়ে পাপ করিতেছিলাম তখন কি আল্লা দেখিয়াছেন?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"হাঁ, অবশ্যই তিনি দেখিয়াছেন" ইহা শ্রবণ মাত্র হাবশী বিকট চীৎকার ছাড়িয়া ভূতলে পড়িবা মাত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। ২। অন্যত্র মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—"তুমি যেন আল্লাকে দেখিতে পাইতেছ এই ভাব মনে রাখিয়া আল্লার এবাদৎ কর কিন্তু সেই ভাব মনে জন্মাইয়া লইতে না পারিলে এই ভাবটী মনে জাগাইয়া রাখ যে, আল্লাই তোমাকে দেখিতেছেন।" (টীঃ ৩০১)

উপাখ্যান—১। কোন পীর সাহেবের বহু মুরিদ ছিল, তন্মধ্যে একজন মুরিদকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। তদ্দর্শনে অপর মুরিদগণ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। পীর সাহেব ইহা জানিতে পাইয়া

টীকা—৩০১। মূল গ্রন্থে এই প্যারাটী, পূর্ব্ববর্ত্তী প্যারার অন্তর্গত তিনটী তারকা চিহ্নিত স্থানে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা হইল।

সকল মুরিদকে ডাকিয়া বলিলেন 'তোমরা প্রত্যেকে এক একখানি ছুরী ও এক একটী পক্ষী লইয়া আইস।' মুরিদগণ প্রত্যেকেই তাঁহার আদেশ মত ছুরী ও পক্ষী লইয়া উপস্থিত হইলে তিনি আদেশ করিলেন—'তোমরা এমন ভাবে হাতের পক্ষী জবেহ্ করিয়া আন যেন কেহ দেখিতে না পায়।' সকলেই নির্জ্জন স্থানে গিয়া পক্ষী জবেহ্ করিয়া আনিল; কেবল তাঁহার প্রিয় মুরিদ এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া পক্ষী জবেহ্ না করিয়া জীবিত অবস্থায় পীরের সম্মুখে উপস্থিত পূর্ব্বক নিবেদন করিল—'কেহই দেখিতে না পায় এমন স্থান খুঁজিয়া পাইলাম না। যে স্থানে যাইতেছি তথায় গিয়া বুঝিতেছি---আল্লা আমাকে দেখিতেছেন।' ইহা শুনিয়া পীর মহোদয় সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন---'দেখ বৎসগণ! এ ব্যক্তি সর্ব্বদাই আল্লার দর্শনে ডুবিয়া আছে বলিয়া ইহাকে আমি অধিক ভাল বাসিয়া থাকি।'

মহাজন বচন ১। যে সময়ে বিবী জোলয়খা মহাত্মা হজরৎ ইয়ুছোফ নবী (আঃ)কে নির্জ্জন গৃহে আটক করিয়া কুমৎলবে আহ্বান করেন তখন তিনি গৃহস্থিত দেব মূর্ত্তির চক্ষু মুখ বস্ত্রাবরণে আবৃত করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে নবী মহোদয় বলিয়াছিলেন—'অয়ি জোলয়খা! তুমি নির্জীব পাথর দেখিয়া লজ্জা করিতেছ; আমি আকাশ পাতালের সৃষ্টি কর্ত্তা সর্ব্বদর্শী আল্লাকে দেখিয়া লজ্জা না করিয়া কেমনে থাকিতে পারি?'

২। একদা কোন ব্যক্তি মহাত্মা জোনায়দের সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিয়াছিল—'আমি নিষিদ্ধ-দর্শন-পদার্থ হইতে চক্ষুকে সামলাইয়া রাখিতে পারি না। চক্ষুকে কেমনে রক্ষা করিব?' তিনি বলিয়াছিলেন—"'তোমরা যেমন পরিষ্কার ভাবে কিছু দেখ, আল্লা তদপেক্ষা স্পষ্টভাবে তোমাকে দেখিতেছেন' এই কথাটী খুব মজবুৎ ভাবে বিশ্বাস করিয়া রাখ।" হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে যে "যাহারা পাপ কার্য্যে অভিলাষ করিয়া পশ্চাৎ আল্লার প্রতাপ ও ক্ষমতা স্মরণে লজ্জিত হয় ও সেই পাপের দিকে না যায় তাহার জন্য 'আদন' নামক উন্নত বেহেশ্‌ৎ অবধারিত আছে।"

৩। মহাত্মা আবদুল্লা এব্‌নে দিনার বলিয়াছেন "আমি কোন সময়ে মহাত্মা ওমর ফারুকের সঙ্গে পবিত্র মক্কাধামে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে বিশ্রামার্থ এক স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম সেই সময়ে একজন গোলাম, পাহাড়ে ছাগল চরাইয়া আমাদের সম্মুখ দিয়া ছাগলগুলি গৃহে লইয়া যাইতেছিল।

মহাত্মা ওমর মূল্যদানে একটী ছাগল ক্রয় করিবার অভিলাষী হইয়া রাখালকে একটী ছাগল বিক্রয় করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু রাখাল বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিয়া বলে যে ছাগলগুলি তাহার নিজের নহে—সে যাহার গোলাম তাহার বিনা অনুমতিতে বিক্রয় করিতে পারে না। মহাত্মা ওমর তাহাকে পরীক্ষা করিবার মানসে বলিয়াছিলেন—'ছাগল বিক্রয় করিয়া মূল্য লও কিন্তু প্রভুকে বলিবে উহাকে বাঘে খাইয়াছে। তোমার প্রভু কেমন করিয়া জানিতে পারিবে যে তুমি বিক্রয় করিয়াছ?' রাখাল ভৃত্য বলিয়াছিলেন—'আমার প্রভু জানিতে না পারিলেও আল্লাতো জানিতেছেন।' মহাত্মা ওমর রাখালের উত্তর শ্রবণে অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শেষে প্রকৃতিস্থ হইয়া রাখালের প্রভুকে ডাকিয়া প্রচুর মূল্যদানে রাখাল ভৃত্যকে ক্রয় করতঃ স্বাধীন করিয়া দিলেন। যাইবার সময়ে উহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—দেখ 'আল্লা তোমাকে দেখিতেছেন' এই বিশ্বাসের ফলে তুমি পৃথিবীতে দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইলে এবং পরকালেও মুক্তি পাইবে।"

মোরাকবার দ্বিবিধ শ্রেণী বিভাগ—পাঠক! জানিয়া রাখ 'মোরাকবা' অর্থাৎ প্রবৃত্তির আচরণ পরীক্ষার দুই শ্রেণী আছে। **প্রথম শ্রেণীর মোরাকবা**—ইহা ছিদ্দীকগণের সাধ্য—ইহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। ছিদ্দীক শ্রেণীর লোক আল্লার প্রতাপ ও সম্ভ্রমে সর্ব্বদাই ডুবিয়া থাকেন এবং তাঁহারা আল্লার ভয়ে এমন ত্রস্ত থাকেন যে আল্লা ভিন্ন অন্য দিকে মন দিতে অবসর পান না। মন ত্রস্ত থাকায় তাঁহারা স্বীয় হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় গুলিকে বিধি-সঙ্গত নির্দ্দোষ বিষয়ের দিকেও সঞ্চালিত করিতে পারেন না, পাপের দিকে কি প্রকারে ফিরাইতে পারিবেন? সুতরাং তাঁহাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি পাপ হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকে এবং তজ্জন্যই তাঁহাদের প্রবৃত্তিকে সাহায্য দিবার প্রয়োজন হয় না। এই কারণে ছিদ্দীকগণের 'মোরাকবা' নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। এই জন্য মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—"প্রভাতে যে ব্যক্তি আল্লার দিকে একাগ্র মন রাখিয়া উঠে, মহাপ্রভু তাঁহার জন্য জগতের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।" এই শ্রেণীর লোক 'মনের তন্ময়তা-একাগ্রতা পর্য্যবেক্ষণে এবং অবিকল ভাবে রক্ষণে এমন ডুবিয়া থাকেন যে তাঁহাদের সম্মুখে, কথা বলিলে শুনিতে পান না, কেহ গমনাগমন করিলে দেখিতে পান না। ফলকথা,

তাঁহারা উন্মিলিত চক্ষে ও নির্মুক্ত কর্ণে থাকিলেও আল্লা ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে বা শুনিতে পান না।

১। জয়েদের পুত্র মহাত্মা আবদুল ওয়াহেদকে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"আপনি কি এমন লোক দেখিয়াছেন যিনি নিজের আন্তরিক ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে তন্ময় আছেন অথচ অপর লোক তাঁহার অবস্থা জানে না?" মহাত্মা উত্তর করিলেন—"হাঁ জানি, তিনি এখনই আসিতেছেন।" ইতি মধ্যে মহাত্মা ওৎবাতোল গোলাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তিনি রাস্তায় আসিবার কালে কাহাকে দেখিয়াছেন কি না? তিনি বলিয়াছিলেন—"কৈ, আমিতো কাহাকেও দেখিতে পাই নাই।" তিনি বাস্তবিক সে সময়ে বৃহৎ রাজপথে আসিয়াছিলেন এবং শত শত লোক তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল।

২। মহাত্মা হজরৎ জকরীয়া নবী (আঃ) এর পুত্র মহাত্মা ইয়াহীয়া একদা একজন স্ত্রীলোকের পার্শ্ব দিয়া যাইবার কালে প্রাচীর ভ্রমে তদুপরি হস্ত রাখিয়া হেলানা দিতে গিয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"আপনি এমন কাজ কেন করিলেন?" তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি উহাকে একটা দেওয়াল মনে করিয়া হেলানা দিতে গিয়াছিলাম।"

৩। কোন এক জন জ্ঞানী লোক বলিয়াছিলেন—"আমি কোন সময়ে একদল লোকের নিকট দিয়া চলিয়া যাইতেছিলাম; তাহারা তীর-ধনুক লইয়া খেলা করিতেছিল। কিছু দূরে একজন লোককে একাকী উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছায় নিকটে গিয়াছিলাম কিন্তু তিনি বিরক্তির সহিত বলিলেন—"আল্লার স্মরণ নিশ্চয়ই লোকের সহিত আলাপ অপেক্ষা উত্তম।" আমি জিজ্ঞাসিলাম—"আপনি একাকী কেন এস্থানে বসিয়া আছেন?" তিনি বলিলেন—"আমিতো একাকী নহি—আল্লা ও দুই ফেরেশ্‌তা আমার সঙ্গে আছেন।" আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনাদের এই গ্রামে প্রধান লোক কে?" তিনি বলিলেন—"যাঁহাকে আল্লা ক্ষমা করিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ।" আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম—"পথ কোন দিক দিয়া?" তিনি আকাশের দিকে মুখ উচ্চ করিলেন এবং তথা হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময়ে কহিলেন—"হে আল্লা! তোমার পথ হইতে ক্ষান্ত রাখিতে বহু মানব আছে।"

৪। মহাত্মা শিবলী, একদা মহাত্মা স্থূরীর সহিত দেখা করিতে গিয়া দেখিলেন তিনি মোরাকবায় এমন তন্ময় ও অটল হইয়া বসিয়া আছেন যে তাঁহার শরীরের একটী লোম পর্য্যন্ত স্পন্দিত হইতেছে না। মহাত্মা শিবলী অবসর মত স্থূরী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "মোরাকবা মধ্যে এরূপ নিস্পন্দ ভাব কোথায় শিখিয়াছ?" তিনি বলিলেন—"বিড়াল হইতে।" ইন্দুরের গর্ত্তের পার্শ্বে বিড়ালকে এরূপ নিশ্চল ভাবে ইন্দুরের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে দেখা যায়।

৫। হনিফের পুত্র মহাত্মা আবদুল্লা বলিয়াছেন—"আমি লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, ছুর নামক স্থানে এক বৃদ্ধ ও এক যুবক সর্ব্বদাই মোরাকবায় (আত্মপর্য্যবেক্ষণ-ধ্যানে) নিমগ্ন আছেন; আমি তথায় গিয়া তাঁহাদিগকে কাবা শরীফের দিকে মুখ রাখিয়া, তদবস্থায় উপবিষ্ট দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে একাদি ক্রমে তিনবার 'ছালাম' দিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই ছালামের উত্তরে প্রতিছালাম দেন নাই—আমি তাঁহাদিগকে আল্লার কছম দিয়া ছালামের উত্তর দিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। যুবক মাথা তুলিয়া বলিলেন—'হে হনীফের পুত্র! পরমায়ু নিতান্ত সংক্ষিপ্ত তাহারও অধিকাংশ গত, কেবল অতি অল্প মাত্র অবশিষ্ট আছে। সেই অবশিষ্ট পরমায়ু টুকুর কিয়দংশ আবার তুমি অনর্থক কাড়িয়া লইলে! হে হনীফ পুত্র! তোমাকে নিতান্ত মোহমুগ্ধ অজ্ঞান দেখিতেছি, তুমি আমাদিগকে উৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে বাধা দিয়া ছালামের উত্তর দিতে টানিয়া আনিলে!' এই পর্য্যন্ত বলিয়া পুনরায় তিনি মস্তক অবনত করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। আমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর ছিলাম কিন্তু উঁহাদের অবস্থা দেখিয়া আমার সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল; সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিশুদ্ধিও লোপ পাইল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম; কেবল জোহর ও আছরের সময়ে তাঁহাদের সঙ্গে একত্র নমাজ পড়িলাম। পরিশেষে তাঁহাদের স্থানে কিছু উপদেশ পাইবার প্রার্থনা করিলাম; তাঁহারা বলিলেন—'হে হনীফের পুত্র! আমরা নিতান্ত বিপদগ্রস্ত, দুঃখানুতাপে জর্জ্জরিত; উপদেশ দিবার ভাষা আমাদের মুখে আসে না।' তাহার পরেও আমি উপদেশ পাইবার আশায় তাঁহাদের নিকট দাঁড়াইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহাদিগকে পান আহার করিতে বা নিদ্রা যাইতে দেখি নাই। আমারও পেটে ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং চক্ষে নিদ্রা ছিল না। শেষে মনে ভাবিলাম—আল্লার কছম দিয়া উপদেশ চাই, দেখি কি হয়। তেমন সময়ে যুবক মাথা তুলিয়া

বলিলেন—'উপদেশ পাইবার জন্য এমন ব্যক্তির অনুসন্ধান কর, যাহার দর্শন লাভ মাত্র তোমার মনে আল্লার স্মরণ আপনা আপনি জাগিয়া উঠে—এবং তাঁহার সম্বন্ধ তোমার মনে প্রবেশ করে। তদ্রূপ ব্যক্তির 'জবানে হাল' অর্থাৎ আকৃতি ও প্রকৃতি-নিঃসৃত প্রভাবই তোমাকে উপদেশ দিবে, তাঁহার "জবানে কাল' অর্থাৎ বাক্যময় উপদেশের আবশ্যকতা থাকিবে না।" যাহা হউক, ছিদ্দীকগণের 'মোরাকবা' (আত্ম-পর্য্যবেক্ষণ ও দমন) এই ধরণেরই হইয়া থাকে: তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আল্লার মধ্যে ঐরূপ তন্ময় হইয়া ডুবিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর 'মোরাকবা'। ইহা পরহেজগার ও আছ্‌হাবোল ইয়ামীন (টীঃ ৩৩৩) লোকের কার্য্য। এই শ্রেণীর লোক মজবুৎ ভাবে জানেন ও বিশ্বাস করেন যে মহাপ্রভু আল্লা তাঁহাদের বাহিরের ও ভিতরের সমস্ত অবস্থা সুস্পষ্ট দেখিতেছেন, সেই অচল বিশ্বাসে তাঁহারা আল্লার জন্য পূর্ণ মাত্রায় শরম করেন এবং তাঁহার প্রতাপে ও ভয়ে সর্ব্বদা থরহরি কম্পিত থাকেন। ইহারা ছিদ্দীকগণের ন্যায় আল্লার মধ্যে একেবারে ডুবিতে পারেন না বটে কিন্তু স্বীয় প্রবৃত্তির আচরণ সর্ব্বদা পরীক্ষা করেন এবং চারিধারের পদার্থ মনের উপর কোন প্রভাব কিরূপে নিক্ষেপ করতঃ প্রবৃত্তিকে উসকাইয়া দেয় তৎসম্বন্ধে সর্ব্বদা বিশেষ সতর্ক থাকেন। পরহেজগার লোককে এমন একজন লোকের সহিত তুলনা করা যায়, যে ব্যক্তি স্বীয় নির্জ্জন গৃহের অভ্যন্তরে কোন গোপনীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে অথবা নিরুদ্বেগে শরীরাবরণ উন্মোচন করতঃ উলঙ্গবৎ বসিয়া আছে এমন সময়ে একটী ক্ষুদ্র বালককে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিলে তাড়াতাড়ী সামাল হইয়া অনাবৃত অঙ্গ ঢাকিয়া লয়; অপর পক্ষে পূর্ব্বোক্ত ছিদ্দীক শ্রেণীর লোককে এমন এক জন গ্রাম্য সবল কৃষকের সহিত তুলনা করা যায় যে ব্যক্তি আপন ক্ষেত্রে নিরুদ্বেগে কাজ করিতেছিল এমন সময়ে মহাপ্রতাপশালী বাদশা হঠাৎ আসিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন এবং তাহার কার্য্য প্রণালী দেখিতে লাগিলেন। এখন অনুমান কর সেই সবল কৃষকের অবস্থা কেমন

টীকা—৩৩৩। 'আছহাবোল ইয়ামীন' শব্দের আভিধানিক অর্থ—"দক্ষিণ হস্তের অধিপতি" বা "দক্ষিণ হস্তওয়ালা" ভাবার্থ যাঁহারা সদা সর্ব্বদা সৎকর্ম্ম করেন—মন্দ কর্ম্মের ত্রিসীমায় যান না। ভাল কর্ম্ম, লোকে দক্ষিণ হস্তে করে, অথবা কার্য্য বাম হস্তে করে। (২) পরকালে বিচারের দিন সৎকর্ম্মী সাধু লোকদিগকে তাঁহাদের "আমল নামা" কার্য্য তালিকা দক্ষিণ হস্তে এবং পাপী লোকদিগকে বাম হস্তে দেওয়া হইবে। এই জন্য সৎকর্ম্মী সাধুদিগকে 'আছ্‌হাবোল ইয়ামীন' বলে।

হইবে ? বাদশাহকে মাথার উপর দণ্ডায়মান দেখিয়া ভয়ে দিশাহারা হইবে ॥

প্রবৃত্তি পর্য্যবেক্ষণের দ্বিবিধ ধারা—যাহা হউক, সাধু পরহেজগার লোক স্বীয় মনের ভাব চিন্তা, গতিস্থিতি, যত্ন চেষ্টা অতীব সাবধানতার সহিত পরীক্ষা করিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। তাঁহাদের 'মোরাকবা' ও অশেষ কল্যাণকর। এই শ্রেণীর মানবের সম্মুখে যে কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে প্রবৃত্তি পর্য্যবেক্ষণের দ্বিবিধ ধারা অবলম্বন করিতে হয়। প্রথম—কার্য্যের প্রারম্ভে, কার্য্যের নীয়ৎ (উদ্দেশ্য) পরীক্ষা করা। কার্য্যে উদ্দেশ্যটি সাধু ও বিশুদ্ধভাবে আল্লার জন্য হইলে করিতে হয় নতুবা ক্ষান্ত থাকিতে হয়। দ্বিতীয়—কার্য্যকালে কার্য্যের ধরণ ও নিয়ম পরীক্ষা করা। এ পরীক্ষা নিতান্ত সাবধানতার সহিত শেষ পর্য্যন্ত করিয়া চলিতে হয়।

প্রবৃত্তি পর্য্যবেক্ষণের প্রথম ধারা—আসন্ন কার্য্যের নীয়ৎ বা উদ্দেশ্য বিচারে প্রবৃত্তি পর্য্যবেক্ষণ—ইহা সর্ব্ববিধ কার্য্যানুষ্ঠানের প্রথমে দরকার হয়। কার্য্যের ইচ্ছা জন্মিবামাত্র উহা ভাল কি মন্দ পরীক্ষা করিয়া লওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। পরীক্ষায় যদি বুঝা যায় যে উহা আল্লার জন্য হইতেছে তবে আরম্ভ করিবে। কিন্তু কোন প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সেই ইচ্ছা জন্মিলে বা ঐ প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য ইচ্ছার উদয় হইলে কখনই সে কার্য্যে হাত দিবেনা। বরং তদরূপ ইচ্ছা মনে উদয় হইতে পারিয়াছে বলিয়া মনের দুর্ব্বলতাবোধে লজ্জিত হইবে এবং নিজকে তিরস্কার করিবে, কোন প্রবৃত্তিকে পরিতুষ্ট করিতে কর্ম্মের ইচ্ছা জন্মিলে পরিণামে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া ভীত হইবে।

কর্ম্মের ইচ্ছা জন্মিবামাত্র, উহা কেবল আল্লার জন্য কি অন্য কোন উদ্দেশ্য মিশ্রিত তাহা পরীক্ষা করিয়া লওয়া অতীব কর্ত্তব্য (ফরজ)।

—হদীছ গ্রন্থ

হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—মানব কোন কার্য্যের জন্য দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালাইলে বা তাহা সম্পন্ন করা স্থির করিলে তিনটি প্রশ্ন হইবে যথা—(১) কেন করিলে ? (২) কেমন করিয়া করিলে ? (৩) কাহার জন্য করিলে ?

(১) প্রথম প্রশ্নের অর্থ এই যে প্রত্যেক কর্ম্ম আল্লার প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে করা উচিত ছিল, সে উদ্দেশ্যে না করিয়া কেন প্রবৃত্তি বিশেষকে পরিতৃপ্ত করিবার বাসনায় করিলে ? ইহার উত্তর যদি তুমি সন্তোষজনক রূপে দিতে পার অর্থাৎ 'কেবল আল্লার প্রসন্নতা সম্পাদন মানসে কার্য্যারম্ভ করা

গিয়াছে বলিয়া প্রমাণ করিতে পার, (২) তবে "কেমন করিয়া করিলে ?" এই দ্বিতীয় প্রশ্ন হইবে। এ প্রশ্নের অর্থ এই যে, প্রত্যেক সৎকার্য্য করিবার, এক একটা নিয়ম ও ধরণ আছে; এবং সমস্ত কর্ম্ম, জ্ঞানের উপদেশ অনুযায়ী করা কর্ত্তব্য। এ কার্য্যটা তুমি জ্ঞানের উপদেশ মত এবং যথোচিত নিয়মানুসারে করিয়াছ, কি মূর্খতাবশে সহজবোধে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাবে, করিয়াছ ? এ প্রশ্নের উত্তরও যদি সন্তোষজনক রূপে দিতে পার এবং বলিতে পার যে উহা জ্ঞানানুযায়ী নিয়ম মত করা হইয়াছে (৩) তবে শেষ প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করা হইবে 'উহা কাহার জন্য করিলে ?' উহা কি কেবল আল্লার জন্য করিলে ? প্রত্যেক কর্ম্ম কেবল আল্লার জন্য শুদ্ধ সঙ্কল্পে করা তোমার প্রতি অতি কর্ত্তব্য (ওয়াজেব) ছিল। তুমি কি একাগ্র মনে আল্লার জন্য করিয়াছ ? যদি তদ্রূপে করিয়া থাক তবে অবশ্যই পুরস্কার পাইবে ; কিন্তু যদি তদ্রূপ বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যে না করিয়া থাক—নিজের সাধুতা প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্য লোকের ভক্তি আকর্ষণ বা সম্মান লাভের বাসনায় সে কর্ম্ম করিয়া থাক তবে কার্য্যের পুরস্কার সেই লোকের স্থানে চাহিয়া লও। আর যদি সাংসারিক ধন বা মান উপার্জ্জনের বাসনায় করিয়া থাকে তবে সে ফল এই পৃথিবীতেই, যাহা কিছু হয়, পাইবে। পরকালে সে কার্য্যের পুরস্কার পাইবার আশা একেবারেই নাই—অপর পক্ষে কার্য্যটা অন্য কোন সৃষ্ট পদার্থ পাইবার আশায় করিয়া থাকিলে আল্লার ক্রোধ ভাজন হইতে হইবে। এতদর্থে তিনি মানবকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন—

أَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ —কোরআন বচন

"সাবধান ; আল্লার জন্য দীন (কর্ত্তব্য কার্য্য—এবাদৎ) বিশুদ্ধ (হওয়া আবশ্যক)" (২৩ পারা। সূরা জোমর। ১ রোকু) তিনি পুনরায় বলিয়াছেন—

إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ

"নিশ্চয়ই, তোমরা আল্লাকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে (সাহায্যার্থে) ডাকিতেছ তাহারা তোমাদের মতই (দুর্ব্বল) দাস" (৯ পারা। সূরা এরাফ। ২৪ রোকু।) যে ব্যক্তি এই পবিত্র মহাবাক্য দ্বয়ের অর্থ বুঝিতে পারেন তাঁহার যদি কিছু মাত্র বুদ্ধি থাকে তবে অবশ্যই তিনি কার্য্যের উদ্দেশ্য পরীক্ষা না করিয়া থাকিতে পারেন না।

সেরূপ ব্যক্তি কার্য্যারম্ভের সময়ে মনের ইচ্ছা পরীক্ষায় অবহেলা করেন না।

যাহা হউক, সংক্ষেপ কথা এই যে, মনে কোন ভাব বা খেয়াল প্রথম উদয় হইলে তৎপরীক্ষায় সতর্ক দৃষ্টি স্থাপন করা আবশ্যক। উহাকে সংযত করিতে না পারিলে অবিলম্বে মন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইবে, তাহার উত্তেজনার পরক্ষণেই মন নাচিয়া উঠিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে "ইচ্ছা" ফুটিয়া উঠিবে—ইচ্ছা, আবার হস্ত পদাদি অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়দিগকে চালাইয়া দিবে। এই রূপে কার্য্যের উৎপত্তি হয়। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন—'যে সময়ে তোমার মন কোন কার্য্যের দিকে আকৃষ্ট হয় তখনই আল্লার জন্য ভয় কর।'

কার্য্যের উৎপত্তির ধারা

মনের গতি পরীক্ষায় অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞানী সাধু সংসর্গ আবশ্যক—পাঠক! জানিয়া রাখ, মনের প্রত্যেক গতি পরীক্ষা করিয়া ভাল মন্দ চিনিয়া লওয়া একটী দুর্লভ জ্ঞান। মনের কোন্ গতিটী আল্লার জন্য আর কোন্টী প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সংঘটিত—তাহা নির্ব্বাচন করিতে যে ব্যক্তি অপারগ, তাহাকে এমন কোন জ্ঞানী সাধুর সংসর্গে বাস করা আবশ্যক যিনি প্রত্যেক কার্য্য স্বীয় লব্ধ-জ্ঞানের উপদেশ অনুসারে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তদ্রূপ সাধুর সংসর্গে বাস করিতে পারিলে তাঁহার হৃদয়ের আলোক নিজের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে। সংসারাসক্ত বিদ্বান লোকের সহবাস বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে বরং তদ্রূপ লোকের সহবাস হইতে রক্ষা পাইবার বাসনায় আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। সংসার মুগ্ধ বিদ্বান্ লোক শয়তানের প্রতিনিধি। মহাপ্রভু আল্লা, মহাত্মা দাউদ নবী (আঃ) কে প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন—"হে দাউদ! যে বিদ্বান আলেমকে আমি সংসারের আসক্তিতে জড়িত করিয়া দিয়াছি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। জিজ্ঞাসা করিতে নিকটে গেলে তোমাকে আমার প্রেম হইতে সে বঞ্চিত করিবে। সংসার মুগ্ধ বিদ্বান লোক, আমার বান্দার হৃদয় হইতে প্রেমের আলোক 'বাটপাড়ী' করিয়া কাড়িয়া লয়।" মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন—

সংসারমুগ্ধ বিদ্বানই শয়তানের প্রতিনিধি

"যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত দ্রব্য ঝট্‌পট্ পরিত্যাগ করিতে পারে,—প্রত্যেক বিষয়ে ভাল মন্দ বিচার করিতে দূরদর্শন রাখে এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি পূর্ণভাবে ঠিক রাখিতে পারে, তাহাকে আল্লা ভাল বাসেন।"

কাহাকে আল্লা ভাল বাসেন

হিতাহিত নির্ব্বাচন ও প্রবৃত্তি দমনের ক্ষমতা জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে বর্দ্ধিত—যাহা হউক, নিম্নলিখিত দুইটী শক্তি পূর্ণ মাত্রায় বর্দ্ধিত হইলে মানব চরম উন্নতি পাইবার উপযুক্ত হয়। (১) প্রত্যেক কার্য্যের প্রকৃত অবস্থা, জ্ঞান-চক্ষে দর্শন করিয়া ভাল মন্দ নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা এবং (২) জ্ঞানের প্রভাবে প্রবৃত্তির উত্তেজনা দমন করিবার শক্তি। এই দুই শক্তি জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গেই বর্দ্ধিত হয় এবং তজ্জন্য একের সহিত অন্যটী এমন ভাবে জড়িত হইয়া থাকে যে উহাদের পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। দেখ, যাহার জ্ঞানবুদ্ধি নাই সে প্রবৃত্তির উত্তেজনা মধ্যে কোন্‌টী হিতকর ও কোন্‌টী অনিষ্ট কর চিনিতে পারে না এবং তজ্জন্যই কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা দমন করিতেও সক্ষম হয় না।

মানবের চরম উন্নতি

এই জন্য মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি পাপ করে তাহার বুদ্ধি ছুটিয়া যায়—আর ফিরিয়া আসে না।" মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী (আঃ) বলিয়াছেন—কর্ম্ম তিন প্রকার—(১) সুস্পষ্ট সৎকার্য্য, এই শ্রেণীর কার্য্য যত পার করিবে। (২) সুস্পষ্ট অপকর্ম্ম ইহার ত্রিসীমায় যাইবে না। (৩) কার্য্যটী ভাল কি মন্দ বলিয়া স্পষ্ট চিনা যায় না। এরূপ কার্য্যের দোষ গুণ নিজের জ্ঞানে চিনিতে না পারিলে অভিজ্ঞ জ্ঞানী লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের ব্যবস্থা লওয়া আবশ্যক।"

প্রবৃত্তি পর্য্যবেক্ষণের দ্বিতীয় ধারা---সর্ব্ববিধ কার্য্য যথারীতি ও যথা-নিয়মে নিষ্পন্ন হইতেছে কি না তদবিষয় বিচারে প্রবৃত্তি পর্য্যবেক্ষণ—ইহা সর্ব্ববিধ কার্য্যানুষ্ঠান কালে দরকার হয়। কার্য্যটী কি ভাবে করা হইতেছে—মনোযোগের সহিত কি অন্যমনস্ক ভাবে, তুচ্ছতাচ্ছিল্যজ্ঞানে করা হইতেছে; যথারীতি নিয়ম মত চলিতেছে, কি অনিয়মে চলিতেছে পরীক্ষা করিয়া, সাধ্য মত, সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ করা আবশ্যক। সমস্ত কার্য্যকে তিন শ্রেণীতে স্থাপন করা যায় (১)পুণ্য কার্য্য (২)পাপ কার্য্য (৩)মোবাহ্ অর্থাৎ নির্দ্দোষ কার্য্য—যাহা পাপও নহে পুণ্যও নহে। এই ত্রিবিধ কার্য্য সম্বন্ধে, 'মোরাকবা' তিন বিষয় অবলম্বনে হওয়া আবশ্যক।

পুণ্য কার্য্য সম্বন্ধে 'মোরাকবা' কালে প্রথমে দেখিতে হয়—উহা আল্লার জন্যই 'খালেছ নিয়তে' (বিশুদ্ধ সঙ্কল্পে) করা হইতেছে কি না এবং তৎসময়ে আল্লার দিকে গাঢ় মনোযোগ আছে কিনা? তৎব্যতীত যথা নিয়মে উহা করা হইতেছে কিনা ইত্যাদি কথা বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করা আবশ্যক। ফল কথা সুফল লাভ করিবার জন্য কার্য্যটী যেমন সুন্দর ও নির্দ্দোষ আবশ্যক তদ্রূপ করিতে প্রচুর যত্নে ত্রুটী করা উচিত নহে।

পুণ্য কার্য্য সম্বন্ধ মোরাকবার ধারা

পাপ কার্য্যের বেলা আল্লার জন্য যেরূপ মর্ম্মান্তিক শরম করা উচিত এবং যতদূর গভীর অনুতাপে 'তওবা' করা কর্ত্তব্য এবং নিজে নিজে দণ্ড গ্রহণের ব্যবস্থা করা উচিত তৎসমুদয় পূর্ণ মাত্রায় হইতেছে কি না পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

পাপ কার্য্য সম্বন্ধে মোরাকবার ধারা

মোবাহ্ অর্থাৎ নির্দ্দোষ ব্যাপারে, যেরূপ আদব ও নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে হয় এবং করুণাময়ের দান পাইয়া তাঁহার নিকট যেরূপ কায় মনোবাক্যে কৃতজ্ঞ হইতে হয় এবং তাঁহার হুজুরে হৃদয়কে যেরূপ বিনয়ের সহিত হাজির রাখিতে হয়, তৎসমুদয় পূরা পূরা হইতেছে কি না পরীক্ষা করা আবশ্যক। গমন, উপবেশন, শয়ন, ভোজন ইত্যাদি কার্য্যগুলি নির্দ্দোষ 'মোবাহ'। উঠিতে বসিতে পূরা আদব বিনয় রক্ষা করা আবশ্যক। শয়ন কালে পশ্চিম দিকে মুখ রাখিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে নিদ্রা যাওয়া উচিত। পান আহার কালে আল্লার করুণা ও কৌশল লইয়া গভীর ভাবে 'তফক্কোর' (সদ্‌ভাব চিন্তা) করা আবশ্যক। গাফেল ভাবে ভোজন করা কথনই উচিত নহে। সদ্‌ভাব-চিন্তন সর্ব্ববিধ কার্য্য অপেক্ষা অধিক কল্যাণ দায়ক। প্রত্যেক আহারীয় পদার্থ লইয়া নানা রূপ সদ্‌ভাব চিন্তা করা যায়। খাদ্য দ্রব্যের আকার, প্রকার, গুণ, বর্ণ, গন্ধ স্বাদ ইত্যাদি অবলম্বনে সৃষ্টি কর্ত্তার অনন্ত শিল্প-কৌশল বুঝিতে পারা যায়। মানবের সে সকল বাহিরের অঙ্গ ও ভিতরের যন্ত্র, অন্ন গ্রহণ করে যথা অঙ্গুলি, মুখ, দন্ত, গলনালী, উদর ইত্যাদি এবং যে সকল অঙ্গ বা যন্ত্র, ভুক্ত দ্রব্য সযত্নে রক্ষা করিয়া পরিপাক করায় এবং যে গুলি ক্ষুধা দূর করিবার উপায় করিয়া দেয় তৎসমুদয় সৃষ্টি কর্ত্তার এক একটী আশ্চর্য্য কারখানা বা শিল্পাগার। এই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও যন্ত্র অবলম্বনে 'তফক্কোর (চিন্তা) করা শ্রেষ্ঠ এবাদতের মধ্যে গণ্য। কিন্তু এরূপ চিন্তা করা জ্ঞানী লোকের কার্য্য। সাধারণ লোক এরূপ পদার্থ লইয়া চিন্তা করিবার সূত্রই ধরিতে পারে না। (১) আবার জ্ঞানী লোকের মধ্যে এক শ্রেণীর আলেম এরূপ আছেন যে তাঁহারা আল্লার সৃষ্ট প্রত্যেক পদার্থের এমন কি সামান্য খাদ্য দ্রব্যের অন্তর্গত শিল্প-কৌশল যতই প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন ততই তাঁহাদের হৃদয় পরম-শিল্পী আল্লার ক্ষমতা ও জ্ঞান গরিমার দিকে উন্নত ও অগ্রসর

নিষ্পাপ সিদ্ধ কার্য্যে মোরাকবার ধারা

পান আহার কালে সদ্‌ভাব চিন্তন মোরাকবার অঙ্গ বিশেষ

ত্রিবিধ শ্রেণীর মানবের পানাহার বিষয়ক সদ্ভাব চিন্তন ত্রিবিধ

হইতে থাকে এবং পরিশেষে তাঁহারা আল্লার প্রতাপ, সৌন্দর্য্য ও পূর্ণতা চিন্তনে নিমগ্ন হইয়া পড়েন। এরূপ উন্নতি-প্রাপ্তি কেবল একেশ্বর-জ্ঞানী ও ছিদ্দীকগণের ভাগ্যে ঘটে। (২) আর এক দল লোক আছেন তাঁহাদিগকে লোভে কখনই খাদ্যের দিকে পরিচালিত করিতে পারে না, বরং তাঁহারা আহার গ্রহণ করাকে বিরক্তিকর জঞ্জাল মনে করেন। তবে শরীর রক্ষার্থ খাদ্য দ্রব্য নিতান্ত আবশ্য-কীয় এইজন্য সামান্য আহারে বাধ্য হন, তথাপি আহার গ্রহণে সময় নষ্ট হয় বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। এবং মনে করেন যে ক্ষুধার দৌরাত্ম্য না থাকিলে খাদ্যের প্রয়োজন হইত না---তাহাতে প্রচুর সময় পাওয়া যাইত। আহারের প্রয়োজন কেন হইয়াছে এ কথাও তাঁহারা তফক্কোর (চিন্তার) প্রভাবে অবগত আছেন। এ অবস্থা পরহেজগারগণের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে (৩) আর কতক গুলি লোক লোভ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া আহার গ্রহণ করে। তাহারা উপাদেয় খাদ্যের অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে। কি প্রকারে খাদ্য রন্ধন করিলে সুস্বাদু হয় অধিক দ্রব্য উদরস্থ করা যায় ; কোন্ দ্রব্যের সহিত কি মস্‌লা মিশ্রিত করিলে উদর পূরিয়া আহার করিলেও অল্প সময়ে পরিপাক হয়, এই সমস্ত ধান্দায় দিবা রজনী হয়রান থাকে। এইরূপ লোক পক্ক অন্নের দোষ এবং পাচকের ক্রটী ধরে এমন কি স্বভাবজাত ফল মূলেরও নিন্দা করিয়া থাকে। এই প্রকৃতির লোকেরা এ কথা বুঝে না যে---সমস্ত পদার্থ বিশ্বপতি আল্লার শিল্প-চাতুর্য্যে সৃষ্ট, শিল্প দ্রব্যের দোষ ধরিলে শিল্পীর নিন্দা করা হয়। এই স্বভাব সংসার-মুগ্ধ অজ্ঞান লোকের পক্ষে ঘটে। মোবাহ্ (নির্দ্দোষ) দ্রব্য ভোগের সময়েও 'মোরাকবা'র (চিন্তার) প্রভেদ অনুসারে লোকের উক্ত প্রকার শ্রেণী ভাগ হয়।

প্রবৃত্তির হিসাব নিকাশের তৃতীয় মোকাম—মোহাছবা. অর্থাৎ প্রবৃত্তির হিসাব লওয়া। ইহা কার্য্যের অন্তে করিতে হয়। প্রত্যহ দৈনিক কাজ কর্ম সমাধান করিয়া রাত্রিতে শয়ন কালে অন্ততঃ একবার প্রবৃত্তির হিসাব লওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ করিতে পারিলে প্রত্যহ লাভ ক্ষতির একটা আন্দাজ পাওয়া যাইবে * * * এবং আগামী দিনের জন্য সতর্কতা আসিবে। প্রত্যেক ঘণ্টা এমন কি প্রত্যেক নিঃশ্বাসকে পুঁজীর খাতায় ধরিবে ; তন্মধ্যে যে যে সৎকার্য্য করা গিয়াছে তাহাকে লাভের দিকে জমা করিয়া লইবে ; আর যে সময় টুকু বৃথা চলিয়া গিয়াছে তাহাকে ক্ষতি এবং যে সময়ে পাপ কার্য্য হইয়াছে তাহাকে

—কার্য্য অন্তে

মহা ক্ষতি বলিয়া ধরিবে। (টীঃ ৩৩৭) সাংসারিক বাণিজ্যে ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিলে লোকে যেমন অংশী হইতে কড়া হিসাব লইয়া থাকে, ধর্ম্ম-জীবনে ক্ষতি দেখিলেও প্রবৃত্তি হইতে সেইরূপ, বরং তদপেক্ষা কড়া হিসাব লওয়া আবশ্যক। কেননা, প্রবৃত্তি বড় বাক্‌চতুর ও ফেরেববাজ নিজের স্বার্থকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তোমার সম্মুখে আল্লার এবাদৎ বলিয়া দেখাইয়া থাকে। তুমিও তাহার বাক্‌-চাতুরীতে প্রতারিত হও এবং প্রবৃত্তির আদেশে কাজ করিয়া, আল্লার এবাদৎ বোধে লাভ ধরিয়া লও। যাহা হউক, নির্দ্দোষ কার্য্য করা হইলেও প্রবৃত্তির হিসাব লইবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে কেন এ কার্য্য করিলে? কাহার জন্য করিলে? এই দুই প্রশ্নের উত্তর দিতে যদি প্রবৃত্তি কিঞ্চিৎ মাত্র ত্রুটী করে তবে সে কার্য্য প্রবৃত্তির আদেশেই হইয়াছে বলিয়া ক্ষতি গণ্য করিবে এবং তজ্জন্য প্রবৃত্তির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লইবে।

এব্‌নেছ্‌ ছেমা নামক একজন বিখ্যাত জ্ঞানী ছিলেন। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন তাঁহার বয়স ৬০ ষাইট বৎসর হইয়াছে। ঐ ষাইট বৎসরে ২১৬০০ একুশ হাজার ছয় শত দিন হয়। প্রতিদিন এক একটী পাপ ঘটিলে তত গুলি পাপ হইয়া গিয়াছে; এবং এমন দিনও গত হইয়াছে যে দিন তিনি হাজার হাজার পাপ করিয়া ফেলিয়াছেন। হায়! এমন অবস্থায় পরিত্রাণ কেমনে হইবে? এই ভাবিয়া তিনি একটী বিকট চীৎকার করিয়া ভূতলে পতিত হই-লেন। পার্শ্বস্থ লোকেরা দেখিল তাহাতেই তাঁহার প্রাণ ত্যাগ ঘটিয়াছে।

সংসারের অধিকাংশ লোকই স্ব স্ব প্রবৃত্তির (রিপুর) আচরণ হইতে অসতর্ক আছে সুতরাং তাহারা নিজের হিসাব লইতেছে না। তাহারা যে পাপ করিতেছে তাহার প্রত্যেকটির জন্য যদি এক একটী কঙ্কর কোন গৃহ মধ্যে নিক্ষেপ করা যায় তবে সে গৃহ কিছুদিনের মধ্যেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। আবার দেখ 'কেরামণ কাতেবীন' ফেরেশতা প্রত্যেক পাপ লিখিবার আজুরা বলিয়া এক এক কপর্দ্দক ল-লন তবে তাহার সমস্ত ধন শেষ হইয়া যাইবে। দেখ লোকে যখন 'ছোব্‌হান আল্লা' বা অন্য কোন তছ্‌বীহ পড়িতে লাগে তখন অমনোযোগের সহিত পড়িতে থাকিলেও কতবার পড়া হইল তাহার সংখ্যা নির্ণয়ের মানসে এক ছড়া মালা হাতে রাখে এবং এক ফেরা পড়া হইলে বলে আমি একশত বার তছ্‌বীহ

টীকা—৩৩৭। এই পারার অন্তর্গত তারকা চিহ্ন হইতে টীকা চিহ্ন পর্য্যন্ত অংশটী মূল গ্রন্থের অনুযায়ী নহে। 'এহ্‌ইয়া অল্‌ উলুম' দৃষ্টে সার মর্ম্ম দেওয়া গেল। মূল গ্রন্থে ঐ স্থানে বোধহয় লিপীকরের ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে।

পড়িলাম। কিন্তু সমস্ত দিবা রাত্রি যে সকল বেহুদা কথা বকিয়া থাকে তাহার কোন হিসাবই হয় না—তাহার সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য কোন চিহ্নও হাতে রাখে না। তছবীহ্ একশত বার পড়িয়া প্রফুল্ল মনে বলে আমি এত পড়িলাম কিন্তু হাজার হাজার বার বেহুদা কথা বলিয়াও আশা করে যে তছবীহ পড়ার কল্যাণে আমার পুণ্যের পাল্লা ভারী হইয়া পড়িবে। ইহা এক বড় মূর্খতা।

১। মহাত্মা হজরৎ ওমর ফারুক বলিয়াছেন—"তোমার কার্য্য ওজন হইবার পূর্ব্বে তুমি নিজে ওজন করিয়া দেখ।" উক্ত মহাত্মা দিনমান কাজ কাম করিয়া রাত্রিকালে যখন গৃহে যাইতেন তখন স্বীয় পদে দণ্ডাঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন।—"তুমি অদ্য কোন্ কাজ করিতে কোথায় গিয়াছিলে?" ২। মহামাননীয়া আয়শা ছিদ্দীকার মুখে শুনা গিয়াছে—মহাত্মা আবুবকর ছিদ্দীক মৃত্যু শয্যায় অবস্থিতি কালে একবার তিনি বলিয়াছিলেন—"ওমর অপেক্ষা অধিক আমার প্রিয় বন্ধু নাই।" এই কথা মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র তিনি পার্শ্বোপবিষ্টা প্রিয় কন্যা বিবী আয়শাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, আমি কি বলিলাম।" বিবী মহোদয়া পিতার বাক্যটী অবিকল শুনাইয়া দিলেন। তখন তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার মুখের কথায় মনের ভাব প্রকাশ পায় নাই সুতরাং নিজের উক্তি সংশোধন জন্য বলিলেন—"তাহা নহে; ওমর অপেক্ষা আমার কোন অধিক প্রিয় আজীজ নাই।" (টীঃ ৩৩৮) দেখ, মহাত্মা ছিদ্দীক প্রত্যেক কথা হিসাব করিয়া বলিতেন। যে কথার মধ্যে মনে ও মুখে সামান্য প্রভেদ থাকিত তাহাও সংশোধন করিয়া লইতেন। ৩। মহাত্মা এবনে ছালাম একদিন লকড়ীর বোঝা কাঁধে লইয়া যাইতেছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা বলাবলি করিতেছিল—ইহা মুটিয়া মজুরের [illegible]। মহাত্মা বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি মনকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি সামান্য কাজ করিয়া কেমন থাকে।" ৪। মহাত্মা আনেছ বলিয়াছেন— আমি একদিন প্রাচীরের আড়াল হইতে মহাত্মা ওমর ফারুককে এক বাগানে দেখিয়াছিলাম। তিনি নিজে নিজে স্বীয় মনকে সম্বোধন করতঃ বলিতেছিলেন—"বাহবাহ্, লোকে

টীকা—৩৩৮। দোস্ত (বন্ধু) এবং আজীজ (প্রবল দয়াবান) এই দুই শব্দের মধ্যে অতি সামান্য প্রভেদ আছে। যাহাকে আমি ভালবাসি ও যাহার মঙ্গল কামনা করি তিনি আমার সঙ্গে তদ্রূপ ব্যবহার করেন তাহাকে দোস্ত (বন্ধু) বলা যায়। আজীজ কিন্তু অন্য প্রকার—আমি তাঁহাকে ভালবাসি বা না বাসি, তিনি আমাকে প্রবল ভালবাসেন, আমার মঙ্গল কামনা করেন এবং কার্য্যেও মঙ্গল করিয়া দেন। না বুঝিয়া আমি তাঁহার হস্ত হইতে মঙ্গল না লইয়া পলাইতে লাগিলে তিনি জবরদস্তি আমাকে ধরিয়া হাত পা বাঁধিয়া মঙ্গল যোগ করিয়া দেন।

তোমাকে আমিরোল মোমেনীন বলিয়া সম্মান করে 'তুমি তাহাতে প্রফুল্ল হইতেছ! তুমি আল্লাকে ভয় কর না; এখন আল্লার শাস্তি সহ্য করিতে প্রস্তুত হও।" ৫। মহাত্মা হছন রহমতুল্লা বলিয়াছেন—"যাঁহারা মনকে কঠিন তিরস্কার করিতে চান, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই প্রত্যেক কার্য্য অন্তে এইরূপ হিসাব লওয়া আবশ্যক যে—তুমি অমুক কাজ কেন করিলে? অমুক বস্তু কেন খাইলে।" যাহা হউক, গত কাজের হিসাব লওয়া প্রত্যেক নরনারীর পক্ষে অতীব আবশ্যকীয় কার্য্য।

প্রবৃত্তির হিসাব নিকাশের চতুর্থ মোকাম—মোআকবা অর্থাৎ প্রবৃত্তিকে শাস্তি দেওয়া। পাঠক! সাবধানে শুন, প্রবৃত্তির কাজ কামের হিসাব লইয়া নীরব থাকিলে চলিবেনা বরং অন্যায় কার্য্য করিবা মাত্র তাহাকে শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। শাস্তি না দিলে নির্ভয় হইয়া অধিক অন্যায় কার্য্য করিতে সাহস পাইবে, পরিশেষে অবাধ্য ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিবে; তখন তাহাকে বশে আনা দুষ্কর হইবে। সন্দেহের দ্রব্য খাইয়া থাকিলে, শাস্তি স্বরূপ তাহাকে উপবাসে রাখিতে হয়। পরস্ত্রীর উপর দৃষ্টি করিলে তৎক্ষণাৎ চক্ষুকে ঢাকিয়া লইবে। এই প্রকার প্রত্যেক কর্ম্মেন্দ্রিয়কে অন্যায় কার্য্য হইতে বাধা দিয়া আটক রাখিবে। পূর্ব্বকালের জ্ঞানী লোকেরা এইরূপ ব্যবহারই করিয়াছেন।

—অসৎ কার্য্য করিলে

১। কোন সাধু ঘটনাক্রমে এক রমণীর গাত্র স্পর্শ করিয়াছিলেন এই অপরাধে তিনি নিজের হস্তখানি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছিলেন। ২। এছরায়েল বংশের এক সাধু বহুকাল গির্জ্জার মধ্যে বাস করিতেন। এক রমণী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আত্মবিক্রয়ের অভিলাষ প্রকাশ করে। সাধু তাহার নিকটবর্ত্তী হইবার মানসে গির্জ্জা হইতে একখানি পা দুয়ারের বাহিরে স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে আল্লার ভয় হৃদয়ে জাগরুক হইয়া উঠে—তখন সাধু 'তওবা' করিয়া ফিরিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু যে পা খানি পাপ-পথে এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছিল তাহাকে আর ভিতরে আসিতে দিলেন না। উহা দুয়ারের বাহিরে রাখিলেন। পা খানি বাহিরে থাকিয়া বৃষ্টি নিহারে ভিজিয়া রৌদ্রে পুড়িয়া পচিয়া শরীর হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল। ৩। মহাত্মা জোনায়দ বোগদাদী বলিয়াছেন---"প্রচণ্ড শীত কালের এক রজনীতে এবনেল কজীনীর স্বপ্নদোষ ঘটে। নিদ্রা ভঙ্গ হইবামাত্র তিনি গোছল করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু তাঁহার প্রবৃত্তি শীতের ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে কুপরামর্শ দিয়া বলিতে থাকে

'বরফের ন্যায় শীতল জলে গোছল করিয়া কেন আত্মহত্যা করিবে? ক্ষণকাল বিলম্ব কর প্রাতঃকালে হাম্মামে গিয়া উষ্ণ জলে গোছল করিও।' প্রবৃত্তির প্ররোচনা বুঝিতে পারিয়া তিনি শপথ করিয়া বলেন যে 'এখনই শীতল জলে গোছল করিব, সমস্ত পরিধান বস্ত্র ভিজাইব এবং সে গুলি শরীরে রাখিয়াই শুখাইয়া লইব।' ফল কথা তিনি তদ্রূপই করিয়াছিলেন।" মহাত্মা জোনায়দ এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—'যে প্রবৃত্তি আল্লার আদেশ পালনে শৈথিল্য করে তাহাকে এই প্রকারেই শাস্তি দিতে হয়।' ৪। এক ব্যক্তি কোন রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, পশ্চাতে অতীব লজ্জিত হইয়া প্রবৃত্তিকে শাস্তি দানের জন্য শীতল জল পান করিবেন না বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তিনি আজীবন আর শীতল জল পান করেন নাই। ৫। মহাত্মা হছান এবনে আবী নাছান একদা এক বিলাস ভবনের পার্শ্ব দিয়া যাইবার কালে পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগকে কৌতুহলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'এমন সুন্দর গৃহ কে নির্ম্মাণ করিয়াছে?' প্রশ্নটী মুখে উচ্চারণ করা মাত্র তিনি স্বীয় প্রবৃত্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যে পদার্থের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই তাহা লইয়া অনধিকার চর্চ্চা কেন করিতেছ? আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, এক বৎসর রোজা করিয়া তোমাকে অনাহারের শাস্তি দিব।" ফলেও তিনি তাহাই করিয়াছিলেন ৬। মহাত্মা আবু তল্‌হা একদিন স্বীয় খোরমা বাগানে নমাজ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে একটী সুন্দর পক্ষী খোরমা তরুর উপর উড়িতে বসিতেছিল। মহাত্মার দৃষ্টি হঠাৎ সেই দিকে ধাবিত হওয়াতে নমাজে অন্য-মনস্কতা-ভাব প্রবেশ করে এবং কয় রকাৎ নমাজ হইয়াছিল ভুলিয়া যান। এই জন্য প্রবৃত্তিকে শাস্তি দিবার জন্য উপজীবিকার সম্বল বাগানটী গরীব লোকের ভরণ পোষণে উৎসর্গ করিয়া দেন। ৭। মহাত্মা মালেক এবনে জয়গম বলিয়াছেন—"মহাত্মা রবাহোল কয়ছী একদিন আছরের নমাজ অন্তে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আমার পিতাকে ডাকিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম—"তিনি এখন ঘুমাইতেছেন।' একথা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—'এখন কি নিদ্রার সময়?' অতঃপর তিনি ফিরিয়া চলিলেন। আমি তাঁহার পশ্চাতে অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। শুনিতে পাইলাম তিনি নিজে নিজে তাঁহার প্রবৃত্তিকে সম্বোধন করিয়া তিরস্কার সহকারে বলিতে লাগিলেন—"হে প্রবৃত্তি, তুই অতিরিক্ত কার্য্য কেন করিলি? এখন নিদ্রার সময় কি না একথা জিজ্ঞাসা

করিবার

করিবার তোর কি অধিকার আছে. আমি শপথ করিয়া বলিতেছি তোর এই অনধিকার চর্চ্চার শাস্তির জন্য তোকে এক বৎসর বালিশের উপর মাথা রাখিতে দিব না।" এই কথা বলিতে বলিতে এবং রোদন করিতে করিতে তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। পরিশেষে বলিলেন—'হে প্রবৃত্তি, তুই আল্লার শাস্তি-ভয় রাখিস না?' ৮। মহাত্মা তনীমদারী এক রজনীতে এমন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন যে তাঁহার তহজ্জদ নমাজ কাজা হইয়াছিল এই ক্রটীতে তিনি একটী বৎসর রাত্রিতে নিদ্রা যাইবেন না বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন। ৯। মহাত্মা আবু তলহার মুখে শুনা গিয়াছে—তিনি এক দিন এক পুরুষকে উত্তপ্ত বালুকা ও কাঁকরের উপর গড়াগড়ী করিতে দেখিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি এই কথা বলিতেছিলেন—'হে রাত্রির মরা ও দিনের অলস! আমি কত দিন তোর অত্যাচার সহ্য করিব?' এমন সময়ে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) স্বয়ং আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—'ওহে পুরুষ। তুমিএরূপ করিতেছ কেন?' সে ব্যক্তি বলিলেন—'হে রসুলুল্লা! আমার প্রবৃত্তি আমার অবাধ্যতাচরণ করিতেছে।' হজরৎ বলিলেন 'এ সময়ে আকাশের দ্বার তোমার জন্য খোলা গিয়াছে। স্বয়ং মহাপ্রভু আল্লা 'ফেরেশতাগণের সম্মুখে তোমার গৌরব করিতেছেন।' অতঃপর তিনি সঙ্গের ছাহাবাগণকে সেই ব্যক্তির নিকট হইতে পরকালের পাথেয় অর্থাৎ আশীর্ব্বাদ লইতে আদেশ করিলেন। ছাহাবাগণ প্রত্যেকে তাঁহার নিকট গিয়া দোআ চাহিতে লাগিলেন এবং সেই ব্যক্তিও প্রত্যেকের জন্য দোআ করিতেছিলেন। পরে হজরৎ সেই ব্যক্তিকে সকলের জন্য সমবেত ভাবে দোআ করিতে আদেশ করিলেন। সে ব্যক্তি এই বলিয়া দোআ করিতে আরম্ভ করিলেন যে—'হে দয়াময়, সকলকে পরহেজগারী দান কর, সকলকেই সৎপথে রাখ ইত্যাদি।' হজরৎ ইহা শুনিয়া তাড়াতাড়ী আল্লার স্থানে এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন যে 'হে আল্লা, উহাকে থামাও; যে দোআ উত্তম তাহাই উহার মুখ দিয়া বাহির করাও।' অতঃপর সেই ব্যক্তি এইরূপ দোআ দিতে লাগিলেন—'হে আল্লা! ইহাদের সকলকে বেহেশতে স্থান দিও।' ১০। গজ্নী নামক একজন জ্ঞানী ব্যক্তি উপরের দিক দৃষ্টি করিবার কালে ছাতের উপর এক রমণীকে দেখিতে পান, এই ক্রটীতে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি আর কখনও আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না। বাস্তবিক পক্ষে তিনি মরণ পর্য্যন্ত

আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। ১১। মহাত্মা আহ্নফ এব্‌নে কায়েছ দিবসের কাজ কর্ম্ম সমাপনান্তে রাত্রিকালে প্রদীপ জ্বালাইয়া স্বীয় প্রবৃত্তির হিসাব লইতে বসিতেন। প্রবৃত্তিকে জিজ্ঞাসা করিতেন—অমুক অমুক কাজ কেন করিলে? অমুক দ্রব্য কেন খাইলে? এইরূপ হিসাব করিতেন এবং এক একবার স্বীয় অঙ্গুলীকে প্রদীপের শিখার উপর ধরিয়া প্রবৃত্তিকে শাস্তি দিতেন।

যাহা হউক, ফলকথা সতর্ক জ্ঞানী লোকেরা প্রবৃত্তিকে হঠকারী জানিয়া সর্ব্বদাই উক্ত প্রকারে শাস্তি দিতেন। তাঁহারা একথা সুন্দর মত বুঝিতেন যে, শাস্তি না দিলে প্রবৃত্তি অবাধ্য হইবে এবং অতি শীঘ্র ধর্ম্মজীবন বিনাশ করিয়া ফেলিবে। এই ভয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা প্রবৃত্তিকে শাসন করিতেন।

প্রবৃত্তির হিসাব নিকাশের পঞ্চম মোকাম—মোজাহদা অর্থাৎ প্রবৃত্তির উল্টা চাল চলা। পাঠক! জানিয়া রাখ, জ্ঞানী লোকেরা স্বীয় প্রবৃত্তিকে সৎকার্য্যে অলস দেখিলে কার্য্যের পরিমাণ বাড়াইয়া সমস্তই করিয়া লইতেন—তাহাতে প্রবৃত্তিকে বিলক্ষণ শাস্তি দেওয়া হইত। নমাজে শৈথিল্য দেখিলে অধিক পরিমাণে নমাজ পড়িতে প্রবৃত্ত হইতেন। মহাত্মা এব্‌নে ওমরের এই নিয়ম ছিল, জমাআতের সহিত একবার নমাজ পড়িতে শৈথিল্য ঘটিলে সমস্ত রজনী নিদ্রা যাইতেন না—কেবল নমাজ পড়িয়া কর্ত্তন করিতেন। মহাত্মা ওমর ফারুকের একদিন জমাআতে আসিতে বিলম্ব ঘটিয়াছিল, এই শৈথিল্যের দণ্ড স্বরূপ তিনি বিশ হাজার দেরেম মূল্যের সম্পত্তি দরিদ্রগণের দুঃখ মোচনে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। একদিন মগ্‌রেবের নমাজে হজরৎ এব্‌নে ওমরের একটুকু বিলম্ব হইয়াছিল; সেই সময়ে দুটী তারা আকাশে দেখা গিয়াছিল, সেই ত্রুটীর দণ্ড স্বরূপ তিনি দুইজন গোলামকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছিলেন। যাহাহউক এইরূপ বহু উপাখ্যান আছে।

—সৎকার্য্যে অলস দেখিলে

সৎকার্য্যে শিথিলতা দূর করিতে সাধুসঙ্গলাভ বা সাধু জীবন কাহিনী জানা আবশ্যক—প্রবৃত্তি এবাদৎ কার্য্যে শৈথিল্য করিতে আরম্ভ করিলে অবিলম্বে তাহার ঔষধ করা আবশ্যক। তজ্জন্য কোন 'রেয়াজৎ' প্রবৃত্ত (সাধনা-রত) সাধুর সহবাসে অবস্থিতি করা আবশ্যক। সাধু ব্যক্তি স্বভাবের ত্রুটী সংশোধনে যেরূপ পরিশ্রম করেন এবং প্রবৃত্তি-গুলিকে শাসনে রাখিতে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন, তাহা স্বচক্ষে

দেখিলে, তদ্রূপ পরিশ্রম ও সতর্কতা অবলম্বন করিতে ইচ্ছা জন্মিতে পারে। এক সাধু বলিয়াছেন 'যখনই আমার মধ্যে প্রবৃত্তি-নিগ্রহের শৈথিল্য অনুভব করিতে পারিতাম তখনই আমি মহাত্মা মোহাম্মদ এব্‌নে ওয়াছে মহোদয়কে দর্শন করিতে যাইতাম। তাঁহাকে দেখিলে আমার মনে এবাদতের অনুরাগ জাগিয়া উঠিত। সে অনুরাগ সপ্তাহ কাল সতেজ থাকিত।' যাহাহউক, যাহার অদৃষ্টে তদ্রূপ সাধু সহবাসের সুযোগ না ঘটে তাহাকে তদ্রূপ লোকের জীবন চরিত ও কার্য্যাবলীর গল্প পাঠ করা বা শ্রবণ করা আবশ্যক এস্থলে আমরা কয়েকজন সাধুর জীবন যাপনের ধরণ সংক্ষেপে লিখিয়া দিতেছি।

কয়েকজন সাধুগণের জীবন যাপন প্রণালী

১। মহাত্মা দাউদ তাঈ সুপক্ব অন্য খাইতেন না। দিবসে রোজা রাখিয়া রজনীতে আটা জলে গুলিয়া পান করিতেন। তিনি বলিতেন—"রুটী পাকাইতে ও চিবাইতে অনেক সময় খরচ হয়, আটা গুলিয়া পান করিতে তত সময় লাগে না। জলে আটা গুলিয়া পান করিলে যে সময় বাঁচিয়া যায় সে সময়ে কোর্‌আন শরীফের পঞ্চাশ আয়াৎ পাঠ করা যায়। আমি সেই মূল্যবান সময়টুকু কেন বৃথা নষ্ট করিব?" কোন ব্যক্তি উক্ত মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"আপনার ঘরের ছাত হইতে ঐ তীরটী কবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে?" মহাত্মা বলিয়াছিলেন—'বিশ বৎসর হইতে আমি এই গৃহে বাস করিতেছি, তীরটী কবে খসিয়া পড়িয়াছে টের পাই নাই, ছাতের দিকেও কোন দিন দৃষ্টিপাত করি নাই।" এইরূপ, জ্ঞানী লোকেরা বিনা প্রয়োজনে কোন দিক দর্শন করা অপ্রিয় কার্য্য বলিয়া মনে করেন। ২। মহাত্মা আহ্‌মদ এব্‌নে রজীন, প্রাতে ফজরের নমাজের পর হইতে আছর পর্য্যন্ত একই স্থানে বসিয়া থাকিতেন—কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। লোকে তাঁহাকে তদ্রূপ উপবিষ্ট থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছেন—"সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লা মানবকে দুটী চক্ষু এই উদ্দেশ্যে দিয়াছেন যে তাহারা চারি ধারের পদার্থ দর্শন করিয়া আল্লার সৃষ্টি কৌশল ও ক্ষমতা বুঝিয়া লইবে; যে ব্যক্তি এই সকল দেখিবে অথচ এব্‌রৎ (নীতি) উদ্ধার করিতে পারিবে না, তাহার নামে এক একটী ত্রুটী লিপীবদ্ধ হইবে।" ৩। মহাত্মা আবু দরদা বলিয়াছেন "তিনটী কার্য্যের জন্য আমি জীবিত থাকা পছন্দ করি—(১) সুদীর্ঘ রাত্রিকাল 'ছেজ্‌দায়' কর্ত্তন করিবার অভিলাষে, (২) দীর্ঘ দীর্ঘ দিনমান ক্ষুৎ-পিপাসায় অতিবাহিত করিবার মানসে। এবং

(৩) যাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে পবিত্র ও যাঁহাদের আপাদ মস্তক বিজ্ঞান ও হেকমতে পূর্ণ, তাহাদের সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষায়।" ৪। মহাত্মা আল্‌কেমা এব্‌নে কায়েছকে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"আপনি নিজকে এত কষ্টে রাখেন কেন?" তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি আমার নিজকে বড় ভালবাসি। তজ্জন্যই তাহাকে দোজখের অগ্নি হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছি।" পুনরায় তাহারা বলিয়াছিল—"শরীরকে এরূপ কষ্ট দেওয়া উচিত নহে।" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"আগামী কল্য 'কেয়ামতের' দিনে যেন এই জন্য অনুতাপ না হয় যে, হা! দুনিয়াতে ঐ কাজটী কেন করি নাই—সেই কাজটী কেন ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। পরকালের সেই আপ্‌ছোছ মিটাইতে এখন যতদূর সাধ্য প্রাণপণে কাজ করিয়া লইতেছি।" ৫। মহাত্মা জোনায়দ বলিয়াছেন—"আমি মহাত্মা ছর্‌রী ছক্‌তী মহোদয়ের মধ্যে এমন অদ্ভুত অভ্যাস দেখিয়াছি যে তাহা আর কাহারও মধ্যে দেখি নাই। তাঁহার বয়স ৯৮ অষ্টনব্বই বৎসর হইয়াছিল অথচ মৃত্যু সময়ে ভিন্ন অন্য কোন সময়ে শয্যায় পার্শ্ব স্থাপন করিতে কেহ দেখে নাই।" ৬। মহাত্মা আবু মোহাম্মদ হরিরী এক সময়ে পূর্ণ এক বৎসর মক্কা শরীফে বাস করিয়াছিলেন কিন্তু একটী দিনও তিনি শয়ন করেন নাই কিম্বা কোন বস্তুর উপর পৃষ্ঠ রাখিয়া হেলানা দেন নাই কিম্বা পা ছড়াইয়া বসেন নাই। মহাত্মা আবুবকর কাতানী উক্ত মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনি এই অলৌকিক কার্য্য কি প্রকারে করিতে সক্ষম হইতেছেন?" তিনি বলিয়াছিলেন—"যে 'ছেদ্‌ক' (সত্যভাব) আমি হৃদয়ে দেখিতে পাইতেছি তাহাই আমাকে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে রেয়াজৎ (প্রবৃত্তিনিগ্রহ) করিতে সহায়তা দিতেছে।" ৭। একজন সাধু বলিয়াছেন—'আমি মহাত্মা ফতেহ্‌ মোছলীকে এক দিন দেখিয়াছিলাম তিনি রোদন করিতেছেন এবং তাঁহার চক্ষু হইতে রক্ত মিশ্রিত অশ্রুজল নির্গত হইতেছে। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন—"বহুদিন ধরিয়া আমি পাপ স্মরণ করতঃ চক্ষু হইতে অশ্রুজল বাহির করিয়াছিলাম কিন্তু সে রোদনে "এখ্‌লাছ" (আল্লার জন্য শুদ্ধ সঙ্কল্প) ছিলনা; এখন সেই ত্রুটী স্মরণে চক্ষু হইতে রক্তপাত করিতেছি।" এই মহাত্মা মানবলীলা সম্বরণ করিলে ঐ সাধু তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আল্লা তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।" তিনি বলিয়াছিলেন—"রক্তাশ্রুপাতে রোদনের ফলে আল্লা তাঁহাকে বড়ই সম্মান

দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন শেষের চল্লিশ বৎসর ফেরেশ্তাগণ তাঁহার যে আমল-নামা লিখিয়া লইয়া গিয়াছে তন্মধ্যে কোন ত্রুটী দেখা যায় নাই।" ৮। মহাত্মা দাউদ তাঈকে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—তিনি দাড়ীর চুল গুলি অযত্নে রাখেন কেন এবং চিরুণী দেন না কেন? তিনি বলিয়াছিলেন—"চিরুণী করিতে মনোনিবেশ কারণে আল্লা হইতে মন দূরে যাইবে এবং আমি গাফেল লোকের দলভুক্ত হইব।" ৯। মহাত্মা ওয়েছ করনী এবাদতের প্রকার-ভেদে রাত্রিগুলিকে পৃথক পৃথক নামে বিভাগ করিয়াছিলেন। যে রাত্রিকে 'রোকুর' রাত্রি বলিতেন সে রাত্রি কেবল এক রোকুতে ঝুঁকিয়া রহিয়া প্রভাত করিতেন। যে রাত্রিকে 'ছেজদার রাত্রি' বলিতেন তাহা কেবল এক ছেজ্দায় কাটাইয়া দিতেন। ১০। মহাত্মা ওৎবাতোল গোলাম সর্ব্বদাই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া চলিতেন। তিনি কখন সুস্বাদু বা মিষ্ট দ্রব্য খাইতেন না তাঁহার মাতা, সন্তান-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া বলিতেন—"বৎস! তুমি তোমার শরীরের উপর দয়া কর—কিছু ভাল দ্রব্য খাও।" তিনি উত্তর দিতেন—"মাতঃ! আমি দয়ালু আল্লার অনুগ্রহের ভিখারী হইয়া জীবন যাপন করিতে চাই। দুনিয়ার এই সামান্য কয়েকদিন কিছু কষ্ট সহ্য করিলে আল্লার অনুগ্রহে যদি অনন্ত কালের আরাম পাই—তাহারই তদ্বীর করিতেছি।" ১১। মহাত্মা রবী বলিয়াছেন—"আমি একদা হজরৎ ওয়েছ করনীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম—তিনি ফজরের নমাজে নিরত আছেন। নমাজ সমাপ্ত পর্য্যন্ত খাড়া দাঁড়াইয়া রহিলাম নমাজ অন্তে তিনি তছবীহ্ পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি মনে করিলাম। এখন বাক্যালাপ করিতে গেলে তাঁহার তছবীহ্ পড়ার ব্যাঘাত হইবে। অবসর হইলে তাহার সহিত আলাপ করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি ধৈর্য্যাবলম্বনে তাঁহার অবসর প্রতীক্ষা করিলাম। তিনিও স্বস্থানে পূর্ব্ববৎ বসিয়া রহিলেন; ক্ষণকালের জন্যও তথা হইতে সরিলেন না। তদবস্থায় তছবীহ্ পড়িতে লাগিলেন। ক্রমে 'জোহরের' সময় আসিল—তিনি নমাজে দণ্ডায়মান হইলেন; নমাজ অন্তে পুনরায় তছবীহ্ পড়িতে নিমগ্ন হইলেন, পরে, 'আছরের নমাজ আসিলে—তিনি সে নমাজও পড়িয়া পূর্ব্ববৎ যোগাসনে 'তছবীহ্' পড়িতে লাগিলেন। আমি ধৈর্য্যের সহিত তাঁহার অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। তিনি সেই স্থানে সেই ভাবে রহিয়া মগ্রেবের ও এশার নমাজও পড়িলেন এবং সেই অবস্থায় রজনী প্রভাত করিয়া ফজরের নমাজও সেই স্থানে সমাপ্ত

করিলেন। অতঃপর তাঁহার চক্ষে সামান্য তন্দ্রার ভাব আসিয়াছিল—কিন্তু অতি অল্পক্ষণ মধ্যে তাঁহার সেই তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। তখন তিনি তন্দ্রার জন্য অনুতাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—'হে আল্লা! নিদ্রাতুর চক্ষু ও ভোজনপটু উদরের অত্যাচার হইতে আমাকে রক্ষা কর।' মহাত্মার সেই ভাব দেখিয়া ও সেই কথা শুনিয়া আমি মনে মনে বলিলাম—'ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট উপদেশ।' আর কিছু না বলিয়া আমি ফিরিয়া আসিলাম।" ১২। মহাত্মা আবুবকর আয়াছ একাদিক্রমে ৪০ চল্লিশ বৎসর যাবৎ শয়নের জন্য ভুমিতে পার্শ্ব স্থাপন করেন নাই। প্রত্যেহ পাঁচ শত রকাৎ নমাজ পড়িতেন এবং যৌবন কালে প্রতিদিন ত্রিশ হাজার বার 'কোল্‌হো আল্লাহো' সূরা পড়িতেন। এইরূপ করিয়া পরিশ্রমে তাঁহার চক্ষে কালজল নামিয়াছিল কিন্তু সে পীড়ার সংবাদ তিনি গৃহবাসী কাহাকেও জানিতে দেন নাই। ১৩। মহাত্মা কজর এব্‌নে ওবেরা একজন 'আবদাল' শ্রেণীর সাধু পুরুষ ছিলেন। তিনি এরূপ 'রেয়াজৎ' (আত্মনিগ্রহ) জন্য পরিশ্রম করিতেন যে প্রত্যহ তিনবার কোর্‌-আন্‌ শরীফ খতম করিতেন। তাহার এইরূপ অলৌকিক অভ্যাস ও পরিশ্রম দেখিয়া লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'আপনি নিজের উপর বড় কঠিন কষ্ট চাপাইয়াছেন।' তদুত্তরে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মানব-জাতি কতদিন হইল পৃথিবীতে বাস করিতেছে?' তাহারা বলিল—'সাত হাজার বৎসর হইতে।' পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসিলেন 'কেয়ামত কতদিন থাকিবে?' লোকেরা উত্তর দিল—"পঞ্চাশ হাজার বৎসর?" তখন তিনি বলিয়াছিলেন—"ভাল কথা, এমন কোন ব্যক্তি আছে যে পঞ্চাশ দিনের আরাম পাইবার আশায় সাত দিন কিছু কষ্ট সহ্য না করে।" তাঁহার ঐরূপ কথার অর্থ এই যে—তিনি যদি পূর্ণ সাত হাজার বৎসর ধরিয়া জীবিত থাকিতেন তবেও কেয়া-মতের একদিন যাহা দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বৎসরের তুল্য সেই দিনের কষ্ট হইতে বাঁচিবার জন্য সাত হাজার বৎসর পরিশ্রম করিতে কখনই কাতর হইতেন না। ঐ কথাটী বলিয়া মহাত্মা বলিয়াছিলেন—"এখন ভাবিয়া দেখ, আমার জীবন এই কয়েকটী সংক্ষিপ্ত দিন মাত্র—কেয়ামতের সেই দীর্ঘ বিচা-রের পরেও পরকালে অনন্তকাল আমাকে থাকিতে হইবে। এমন অবস্থায় অনন্তকালের দুঃখ কষ্ট হইতে বাঁচিবার জন্য এই কয়েকটী দিনের পরিশ্রম অতি তুচ্ছ। ১৩। মহাত্মা চোফিয়ান ছুরী বলিয়াছেন—'একদা আমি মহামাননীয়া বিবী রাবেয়া বছরীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম।

দেখিয়াছিলাম বিবী মহোদয়া 'হুজরার' মধ্যে 'এবাদতে' নিমগ্ন আছেন। তাঁহার অবসর প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় আমিও তাঁহার ঘরের এক কোণে নমাজে প্রবৃত্ত হইলাম। সমস্ত রজনী গত হইল তথাপি তাঁহাকে এবাদৎ হইতে অবসর পাইলাম না। 'ফজরের নমাজ' অন্তে তাঁহার দেখা পাইয়া আল্লার ধন্যবাদ দিয়া বলিয়াছিলাম—'সমস্ত প্রশংসা আল্লার, তিনি রজনীতে নমাজ পড়িবার সুযোগ দিয়াছেন।" আমার এই কথা শেষ হইলে বিবী মহোদয়া বলিয়াছিলেন—"আল্লাকে আরও ধন্যবাদ দাও যে তিনি অদ্য দিবসেও রোজা রাখিবার সুযোগ দিবেন।"

যাহা হউক, 'রেয়াজৎ'-কারী সাধক দিগের কার্য্য প্রণালী এইরূপ অসাধারণ ছিল। তদ্রূপ অসংখ্য সাধক মহাজনদের উপাখ্যান প্রচলিত আছে। তৎ-সমুদয় এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে সমাবেশ হইতে পারে না। 'এহ্ইয়া-অল-উলুম' গ্রন্থে অনেক সাধু মহাজনের সাধনার উপাখ্যান সংগৃহীত হইয়াছে। সাধারণ লোকেরা যদিও তদ্রূপ সাধনা ও পরিশ্রম করিতে পারিবে না সত্য তথাপি পূর্ব্বকালের সাধুগণের জীবন যাপনের ধরণ মনোযোগের সহিত শুনিয়া নিজের অক্ষমতা ও ত্রুটী একবার তো বুঝিয়া লওয়া উচিত এবং নিজের মঙ্গল কামনা অন্তরে জন্মাইয়া লওয়া তো আবশ্যক; তাহা হইলেও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারণের ক্ষমতার সূত্রপাত হইতে পারে।

প্রবৃত্তির হিসাব নিকাশের ষষ্ঠ মোকাম—মোআতবা অর্থাৎ প্রবৃত্তিকে তিরস্কার করা। পাঠক! জানিয়া রাখ, মানব-প্রবৃত্তি এমন ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে যে উহা মঙ্গল হইতে পলাইতে চায় এবং অমঙ্গলের দিকে ধাবমান হয়। পরিশ্রম দেখিয়া ভয় করা ও লোভনীয় পদার্থের দিকে দৌড়ান, প্রবৃত্তির অভ্যাস। এই কারণে প্রবৃত্তি কাজ দেখিয়া সঙ্কুচিত এবং সুখ ভোগের জন্য লোলুপ হইয়া থাকে। প্রবৃত্তির স্বভাব হইতে ঐ দোষ দূর করিয়া ফেলিতে তোমার প্রতি আল্লা আদেশ করিয়াছেন। এবং উহাকে বিপথ হইতে সুপথে চালাইবারও আদেশ দিয়াছেন। প্রবৃত্তিকে উক্ত দোষ হইতে সংশোধন করিয়া লইতে হইলে সাধারণতঃ উহার সহিত কঠিন ব্যবহার করিতে হয়। আবার কখনও কখনও কোমল ব্যবহার করা আবশ্যক। প্রবৃত্তিকে সর্ব্বদাই সৎকর্ম্মে লাগাইয়া রাখা উচিত এবং কখনও কখনও উপদেশও দেওয়া কর্ত্তব্য। সৃষ্টিকর্ত্তা প্রবৃত্তিকে এমন এক স্বভাব দিয়াছেন যে (যদিও পরিশ্রম দেখিয়া সে ভয় পায় তথাপি) কোন কার্য্যে লাভ দেখিলে তাহা

—হিত ছাড়ি অহিতে ধাবিত হইলে

সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হয় এমন কি লাভকর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইলেও অম্লান বদনে তৎসমুদয় সহ্য করিতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে অজ্ঞানতা ও অমনোযোগিতা আসিয়া প্রবৃত্তির সম্মুখে এমন এক দুর্ভেদ্য 'পরদা' ফেলিয়া দেয় যে তজ্জন্য কার্য্যে লাভ বা মঙ্গল দেখিতে পায় না। উপদেশ বাক্যে সুস্পষ্ট লাভ দেখাইয়া দিতে পারিলে এবং অমনোযোগিতা হইতে চেতন করিয়া দিতে পারিলে প্রবৃত্তি লাভকর কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হয়। এই জন্য আল্লা বলিতেছেন—

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

"এবং উপদেশ দাও—নিশ্চয়ই উপদেশ ঈমান ওয়ালা লোকের উপকার করে।" (২৭ পারা। সুরা—জারেইয়াৎ। ৩ রোকূ।) মনুষ্যের প্রবৃত্তি অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। প্রথমে, উহাকে কোমল ভাবে উপদেশ দিতে হয় তাহাতে আশানুরূপ ফল দেখা না গেলে, তিরস্কার করা আবশ্যক। কখন কখন বরাবর তিরস্কারের উপর তিরস্কার করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে হয়। তিরস্কারের অগ্নিমাত্র চিন্তা দিয়াই প্রবৃত্তি পরাক্রান্ত হইয়া দাঁড়ায়।

প্রবৃত্তির প্রতি তিরস্কার সহকারে উপদেশের নমুনা— প্রবৃত্তিকে নিম্নলিখিত প্রকারে বুঝান আবশ্যক। 'হে প্রবৃত্তি তুমি নিজকে ভারী চালাক ও বুদ্ধিমান বলিয়া অনুমান কর। কোন ব্যক্তি তোমাকে নির্ব্বোধ বলিলে তুমি তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ কর। দেখ, তোমা অপেক্ষা নির্ব্বোধ আর কে আছে? যাহাকে ধরিবার জন্য এক দল সৈন্য নগর-প্রাচীরের বাহিরে দণ্ডায়মান আছে আর একজন সিপাহী উহাকে ধরিয়া আনিয়া হত্যা করিবার জন্য নগরে প্রবেশ করিয়াছে; এমন সময়ে সেই ওয়ারেণ্টের আসামী যদি ক্রীড়া কৌতুকে ব্যাপৃত থাকে, তবে তাহা অপেক্ষা নির্ব্বোধ আর কে হইতে পারে? মৃত ব্যক্তিগণ, সৈন্যদলের ন্যায়, নগর-দ্বারের বাহিরে সজ্জিত আছে। তাহারা অঙ্গীকার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, যে পর্য্যন্ত তোমাকে সঙ্গে না লইবে সে পর্য্যন্ত প্রস্থান করিবে না। তোমাকে ধরিবার জন্য মৃত্যুকে তোমার অনুসন্ধানে পাঠান হইয়াছে। বেহেশ্‌ৎ বা দোজখ তোমার জন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছে। মৃত্যু তোমাকে অদ্যই ধরিয়া লইয়া যাইবে। অদ্য না ধরিলে একদিন অবশ্যই ধরিবে, এবং মৃত দলের

তোমা অপেক্ষা নির্ব্বোধ কে?

সঙ্গে মিলাইয়া দিবে; তাহার পর যাহা হইবার তাহা নিশ্চয়ই হইবে। মনে কর না কেন—সমস্ত এখনই হইল। মৃত্যু যখন আসিবে তখন একটুকুও বিলম্ব করিবে না বা তোমাকে প্রস্তুত হইতে সময়ও দিবে না। সে কখন আসিবে তাহাও তোমাকে জানিতে দিবে না—রাত্রিতে আসিবে কি দিবসে,—শীঘ্র আসিবে কি বিলম্বে—শীতকালে কি গ্রীষ্মকালে তাহাও বলিবে না। মৃত্যু সকলকেই হঠাৎ আসিয়া ধরে এবং যেমন ধরে তখনই লইয়া যায়। লোকে যে সময়ে নিতান্ত নিরুদ্বেগে থাকে—মরণের কথা ভাবে না তখনও মৃত্যু আসিতে পারে। এমন অবস্থায় তুমি যদি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত না থাক তবে তোমা অপেক্ষা বড় আহাম্মক আর কে হইতে পারে?

হে মন! ইহা নিতান্ত অনুতাপের কথা যে তুমি সমস্ত দিন পাপে রত আছ। (টীঃ ৩৩৯) যদি মনে করিয়া থাক যে আল্লা তোমার পাপ দেখিতে পাইতেছেন না তবে তুমি মস্ত কাফের। আর যদি তুমি ইহা জান যে তিনি পাপ করিতে দেখিতেছেন ইহা জানিয়াও যদি পাপ কর, তবে তুমি বড়ই ধৃষ্ট, নির্ভয় ও নির্লজ্জ। তাঁহার চক্ষের উপর পাপ করিতেছ অথচ শঙ্কিত হইতেছ না!! হে মন! তুমি কিছু ভাবিয়া দেখ—তোমার কোন ভৃত্য তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিলে, তুমি কি প্রকার ভয়ানক ক্রুদ্ধ হও। আল্লার আদেশ অমান্য করিয়া তুমি কেমনে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ রহিয়াছ? যদি মনে করিয়া থাক যে আল্লার শাস্তি সহ্য করিতে পারিবে, তবে তুমি নিশ্চয়ই মহা ভুল করিতেছ—আচ্ছা, তোমার একটী অঙ্গুলী প্রদীপের শিখার উপর ধর দেখি, অথবা প্রখর তীক্ষ্ণ রৌদ্রের মধ্যে কিছুক্ষণ তপ্ত বালুকার উপর বসিয়া থাক দেখি, অথবা ফুটন্ত উষ্ণ জল পূর্ণ দেগের মধ্যে ডুব দাও দেখি, তাহা হইলে তোমার অক্ষমতার পরিচয় অতি সহজেই পাইতে পরিবে। আবার ইহা যদি ভাবিয়া থাক যে তুমি যাহা করিতেছ তজ্জন্য তোমাকে শাস্তি পাইতে হইবে না তবে তুমি আল্লার পবিত্র কোর্‌আন্ শরীফকে এবং এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া উড়াইয়া দিতেছ। মহাপ্রভু আল্লা বলিতেছেন -

আল্লা কি পাপ দেখিতে পাইতেছেন না?

আল্লার শাস্তি কি সহ্য করিতে পারিবে?

পাপীকে কি শাস্তি পাইতে হইবে না?

টীকা—৩৩৯। "মানুষ সর্ব্বদা পাপ করে" এ বাক্যটী বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। যাহারা অন্যায় গর্হিত কাজ করে তাহাদের পাপ প্রকাশ্য। যাহারা কাজ না

مَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَبِهٖ

"যে ব্যক্তি মন্দ কার্য্য করে সে শাস্তি পাইবে।" (৫ পারা। সূরা নেছা। ১৮ রোকু।) হে মন—হে আত্মন্! তুমি হয় তো বলিবে "আল্লা করুণাময় ও দয়ালু তিনি কাহাকেও শাস্তি দেন না।"

দয়াময় কি কাহাকেও শাস্তি দিবেন না ?

ইহার উত্তর তুমি কাণ ও প্রাণ দিয়া শুন—সেই করুণাময় দয়ালু আল্লা কেন এই সংসারে লক্ষ লক্ষ নর নারীকে দুর্ভিক্ষে অনাহারে মারিতেছেন ? পীড়া ও বিপদ আপদে কেন সকল প্রাণীকে কষ্ট দিতেছেন ? করুণাময় ও দয়ালু হইয়া কেন তিনি কৃষকদিগকে বিনা পরিশ্রমে শস্য ধন সংগ্রহ করিয়া দেন না ? হে আত্মন্! আল্লা তো করুণাময় ও দয়ালু, তবে কেন তুমি কাম্য ধন মান উপার্জ্জনের জন্য সংসারের যাবতীয় কৌশল ও উপায় খাটাইতে ত্রুটী কর না ? সে সময়ে কেন বলনা যে আল্লা করুণাময় ও দয়ালু; আমি পরিশ্রমের কষ্ট সহ্য করিব না তিনি স্বয়ং আমার কাজ কাম সম্পন্ন করিয়া দিবেন ? হে মন্! তোমার বুদ্ধি বিবেচনার উপর ধিক্!

এখন হয়তো তুমি বলিতে পার—"আচ্ছা আমি তর্কে হারিলাম, তুমি জিতিলে। কিন্তু আমি যে পরিশ্রম কষ্ট সহ্য করিতে পারি না, কি করিব ?"

কষ্ট সহ্য করিতে পারি না—কি করিব ?

ওরে নির্ব্বোধ! তুমি এটুকু জান না যে যাহারা গুরুতর কষ্ট সহ্য করিতে না পারে তাহারা উহা হইতে বাঁচিবার জন্য ছোট ক্ষুদ্র কষ্ট অম্লান বদনে সহ্য করিয়া থাকে। পরকালে অনন্ত দুঃখ যন্ত্রণার কথা স্মরণ কর। জগতের সকল নবী পয়গম্বর ও জ্ঞানী লোকেরা সে সংবাদ দিয়াছেন। সেই দুঃখ যন্ত্রণা হইতে বাঁচিবার জন্য কি ক্ষণস্থায়ী কিঞ্চিৎ কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত নহ ? যে ব্যক্তি কষ্ট সহিতে চায় না, সে যন্ত্রণা হইতে বাঁচিতে পারে না। তুমি অদ্য এই সামান্য কষ্টটুকু সহিতে পারিতেছ না বলতো কল্য কেয়ামতের দিন দোজখের যন্ত্রণা লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করিবার ক্ষমতা কেমনে পাইবে ? ওহে নির্লজ্জ! ধনধান্য উপার্জ্জন করিতে এত কষ্ট ও এরূপ লাঞ্ছনা বহন করিয়া থাক এবং

করিয়া অমূল্য সময় নষ্ট করে তাহাদেরও পাপ হয় কেননা আল্লা মানবকে জীবন-রূপ পুঁজী দিয়া পৃথিবীতে কর্ম্মফল ক্রয় করিতে পাঠাইয়াছেন। এক একটী নিঃশ্বাস এক একটী মাণিক। তাহা বৃথা নষ্ট করা পাপ। তাহার পর জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আত্মার উন্নতি হয় এমন সৎকার্য্য করা যায়। প্রত্যেক নিঃশ্বাসে সৎকার্য্য করিয়া উন্নতির উপাদান সংগ্রহ না করা মহা ত্রুটী সুতরাং তাহাও পাপ।

শারীরিক স্বাস্থ্য লাভের বাসনায় একজন বিধর্ম্মী চিকিৎসকের কথা মত সমস্ত অভিলাষের দ্রব্য পরিত্যাগ করিতে পার, কিন্তু জগতের সমস্ত পয়গম্বর ও জ্ঞানী মহাত্মাগণের স্পষ্ট কথা শুনিয়াও এ কথাটী বুঝিতে পারিলে না যে দোজখের যন্ত্রণা দারিদ্র্য ও পীড়া অপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক এবং পরকালের অনন্ত জীবন ইহকালের জীবন অপেক্ষা অসীম!

হে মন! তুমি বোধ হয় এই আশা করিতেছ যে অতীত ত্রুটীর জন্য 'তওবা' করিয়া সুপথে ফিরিবে এবং অনন্তর সৎকার্য্য করিয়া চলিবে। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ তওবা করিবার ইচ্ছা করিতে করিতে মৃত্যু আসিয়া তোমাকে বিনাশ করিতে পারে, তখন অনুতাপ মনস্তাপ ভিন্ন আর কিছু লাভ হইবে না। হে মন! তুমি যদি ভাবিয়া থাক যে অদ্য অপেক্ষা আগামী কল্য 'তওবা' করা (পাপ হইতে বিরত হওয়া) সহজ হইবে তবে বড়ই ভুল বুঝিয়াছ। পাপ পরিত্যাগে তওবা করিতে যত বিলম্ব করিবে, ততই পাপ হইতে ফিরা দুঃসাধ্য হইবে। মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইলে তওবা করা বৃথা। পর্ব্বতোপরি চড়িবার প্রাক্কালে বাহনের পশুকে বলবান করিবার মানসে উদর পূরিয়া আহার করাইলে কোন ফল হয় না। দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশের উচ্চ ভূভাগে আরোহন করিবার আবশ্যকতা থাকিলে বাহনের পশুকে পূর্ব্ব হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চারা ঘাস খাওয়াইয়া বলবান করিয়া লওয়া আবশ্যক। দুর্ব্বল পশুকে পরিশ্রমের ঠিক পূর্ব্বক্ষণে উদর পূরিয়া আহার করাইলে কোন ফল হয় না। এই সম্বন্ধে আর একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর—একজন লোক বিদ্যা শিক্ষার মানসে বিদেশে গেল। কিন্তু পাঠাভ্যাসে পরিশ্রম ও কষ্ট দেখিয়া ভীত হইল এবং আলস্যের কোমল শয্যা আশ্রয় করতঃ সুখে দিনপাত করিতে লাগিল। কেবল মনে মনে এই আশা ও সাহস করিয়া রহিল যে গৃহে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বক্ষণে বিশেষ পরিশ্রমে বিদ্যা শিক্ষা করতঃ পণ্ডিত হইয়া দেশে ফিরিব। অবোধ—মূর্খ হতভাগা, ইহা বুঝিতে পারে নাই যে, বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পণ্ডিত হইতে বহুদিন ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে পাপ পরিত্যাগ করিয়া সৎকর্ম্ম ও সাধনা দ্বারা আত্মার বলবৃদ্ধি করিবার আশাও তদ্রূপ বাতুলতা। তোমাকে পরিশ্রমের হাফরে জ্বলিয়া, সাধনার তেজে গলিয়া ও আবর্ত্তিত পরিশ্রমের আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হইয়া বিশুদ্ধ ও পবিত্র হইতে হইবে।

তওবা করিয়া সুপথে ফিরিতে কি সময় পাইবে?

তদ্রূপ হইলে প্রেম প্রীতি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক প্রকৃত জ্ঞানী হইতে পারিবে—তখন ধর্ম্মের পথে চলিবার যোগ্যতা লাভ করিবে। তাহার পর আল্লার নৈকট্য লাভের পথে যতগুলি গুপ্ত খাত ও শত্রুর আড্ডা আছে তাহা অতি সাবধানে পার হইতে হইবে। পরমায়ুর সমস্ত দিনগুলি বৃথা অতিবাহিত হইয়া গেলে, চরিত্রসংশোধনে ও আত্মার গুণ-বর্দ্ধনে অসময়ে পরিশ্রম করিবার ইচ্ছা করিলে কি লাভ হইবে? এবং তজ্জন্য চেষ্টা করিতেই বা কেমন করিয়া পারিবে? বার্দ্ধক্যের প্রথমে যৌবনকে, রোগের অগ্রে স্বাস্থ্যকে, হাঙ্গামার পূর্ব্বে শান্তিকে, মৃত্যু না আসিতে জীবনকে, কেন তুমি অমূল্য দ্রব্য জ্ঞানে সদ্ব্যবহার করিলে না? হে মন? শীত আসিবার প্রথমে গ্রীষ্মকালেই কেন শীত বস্ত্র সংগ্রহ করিতে তৎপর হও? তখন কেন আল্লার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাক না! 'জম্‌হরীর' নামক দোজখের শীত, "চেল্লা" বাসের শীত হইতে এবং নরকাগ্নির উষ্ণতা, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের গ্রীষ্ম হইতে কখনই অল্প নহে। পৃথিবীর শীত গ্রীষ্ম নিবারণের উপকরণ সংগ্রহ করিতে তুমি কিছু মাত্র ত্রুটী কর না। কিন্তু—পরকালের কার্য্যের বেলা নানা ওজর আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক অবহেলা কর। এরূপ ব্যবহারের কারণ আর কি হইতে পারে? বোধহয় তুমি 'পরকাল' ও 'পুনরুত্থান' বিশ্বাস কর না। এই অবিশ্বাসকেও কাফেরী বলে। এ প্রকার কাফেরী তুমি আপন অন্তরের মধ্যে পুষিয়া রাখিয়াছ—এবং তোমার নিজকেও জানিতে দিতেছ না। হে নির্ব্বোধ! ইহা তোমার বিনাশের কারণ হইবে।

পরকাল ও পুনরুত্থান কি বিশ্বাস কর না?

হে আত্মন্! হয়তো তুমি ইহা বুঝিয়া রাখিয়াছ যে 'মারেফতের নূরে' (তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে) তোমার নিজকে সজ্জিত করিতে না পারিলেও মৃত্যুর পর লোভাগ্নি তোমার মর্ম্মস্থল দগ্ধ করিতে পারিবে না। এরূপ বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত এইরূপ—কোন ব্যক্তি মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আমি শীতবস্ত্র পরিধান না করিলেও আল্লার অনুগ্রহে মাঘের শীত আমার শরীর স্পর্শ করিবে না—এরূপ বিবেচনা ভ্রম পূর্ণ। আল্লার অনুগ্রহ কি প্রকার সে ব্যক্তি বুঝিতে পারে নাই। আল্লা, শীত প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তন্নিবারণের জন্য শীতবস্ত্র প্রস্তুত ও নির্ম্মাণের উপায় শিক্ষা দিয়াছেন এবং সেই শীতবস্ত্র নির্ম্মাণের উপকরণও সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন; ইহাকেই আল্লার অনুগ্রহ

তত্ত্ব জ্ঞান লাভ না করিলেও কি মৃত্যু অন্তে ক্ষতি হইবেনা?

বলে। শীতবস্ত্র ধারণ না করিলেও শীত না লাগাকে আল্লার অনুগ্রহ বলা যায় না। বিনা চাদরে প্রস্তর মৃত্তিকাকে শীত লাগে না। তাহা কি আল্লার অনুগ্রহ?

হে আত্মন! পাপ কার্য্য করিলে, আল্লা ক্রুদ্ধ হইয়া শাস্তি দিবেন, এ কথা কখনও মুখে আনিও না! আল্লার আদেশ লঙ্ঘন করিলে তিনি ক্রুদ্ধ হন না। বরং তুমিও বলিতে পার—আমি পাপ করিলে আল্লার কি ক্ষতি হয় যে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শাস্তি দিবেন? বাস্তবিক আল্লা ক্রুদ্ধও হন না—শাস্তিও দেন না। তবে তিনি তোমার মধ্যে যে অভিলাষ বা কামনা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন তাহাই তোমার মধ্যে দোজখের অগ্নি জ্বালাইয়া দিবে। কামনা গুলি যে হিসাবে খর্ব্ব ও দমিত হয় দোজখের অগ্নির তেজ তত কমিয়া যায়। দেখ বিষ বা ক্ষতিকর দ্রব্য আহার করিলে লোকের শরীরে পীড়া জন্মে, এবং তজ্জন্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। চিকিৎসক তদ্রূপ পদার্থ ভক্ষণে নিষেধ করেন এবং তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করা হয় বলিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হন না বা সেই যন্ত্রণাও দেন না। হে আত্মন! তোমার বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তির উপর ধিক! তুমি সাংসারিক সুখভোগে উন্মত্ত হইয়াছ—এবং সংসারের প্রেমে পাগল হইয়াছ। ইহা ব্যতীত অন্য কিছুতে তোমাকে আল্লা হইতে ভুলাইয়া রাখে নাই। পরকালে ইহাই তোমার মধ্যে দোজখের আগুন জ্বালাইয়া দিবে। হে হতভাগ্য! বেহেশ্‌ৎ ও দোজখের প্রতি যদি তোমার বিশ্বাস না থাকে তবে মৃত্যু যে অবশ্যই ঘটিবে এ কথা তো বুঝিতে পার। তুমি যখন মরিবে তখন সংসারের সমস্ত কাম্য বস্তু ও সুখভোগ তোমা হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে তখন তৎসমুদয়ের বিচ্ছেদের অগ্নি তোমার মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে। সংসারের প্রতি আসক্তি যে পরিমাণে বলবান হইবে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সেই পরিমাণে তীক্ষ্ণ হইবে। হে আত্মন্! আল্লা তোমাকে সুপথে চালাইয়া লউন। সংসার ধরিবার জন্য তৎপশ্চাৎ দৌড়িয়া কেন বিনাশ পাইতে চলিয়াছ? সসাগরা ধরার আধিপত্য যদি তোমার হস্তে আসে এবং জগতের সমস্ত প্রাণী যদি তোমাকে ভক্তি ভরে প্রণাম করে তথাপি অল্প দিনের মধ্যে তুমি ও তৎসমুদয় লোক মৃত্তিকা রূপে পরিণত হইবে। পূর্ব্বকালের নরপতিগণ যেমন এখন বিস্মৃতির গর্ভে লয় পাইয়াছে, তদ্রূপ তোমারও নাম নিশান কিছুই থাকিবে

আল্লা কি ক্রুদ্ধ হইয়া পাপীকে শাস্তি দেন?

সংসারের লাভ লোভ করা অনুচিত কেন?

না; সসাগরা ধরায় আধিপত্য সকলের ভাগ্যে মিলে না। তুমি বাদশা হইলেও তোমার ভাগ্যে সেইরূপই হইবে—সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব পাইবে না। যতটুকু রাজত্ব তুমি পাইবে তাহাও শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় হইতে পারিবে না। বরং তাহা উদ্‌বেগ ও অশান্তিপূর্ণ থাকিবেই থাকিবে। এমন সাংসারিক রাজত্বের লোভে চিরস্থায়ী শান্তিপূর্ণ বেহেশ্‌ৎ কেন হাত ছাড়া করিতেছ? হে মন! ইহা বিশেষ বিবেচনা করিবার বিষয়—যে ব্যক্তি উজ্জ্বল লাবণ্যময় চিরস্থায়ী হীরকের পরিবর্ত্তে মাটীর ভাঙ্গা পেয়ালা ক্রয় করে তাহার বুদ্ধি দেখিয়া তোমরা কি উপহাস কর না? দুনিয়া মাটীর ভাঙ্গা পেয়ালা সদৃশ। ইহা কতবার লোকের হাত হইতে পড়িয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—তোমার হাত হইতেও একদিন না একদিন পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে। পরকালের অনন্ত সৌভাগ্য অমূল্য উজ্জ্বল হীরক তুল্য। পরকালের সেই সৌভাগ্য বিক্রয় করিয়া, এই ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব সুখ গ্রহণ করিলে এবং মৃত্যুকালে তাহাও ফেলিয়া পরকালে গেলে এবং তথাকার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইলে, বল তো কেমন ভীষণ অনুতাপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে?

যাহা হউক, এই প্রকারে স্বীয় প্রবৃত্তিকে তিরস্কার সহকারে উপদেশ সদাসর্ব্বদা করিতে থাকিবে। তাহা হইলে অপরকে উপদেশ দিবার অগ্রে নিজকে উপদেশ দেওয়া হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সদ্‌ভাব চিন্তন।

تفکر তফাক্কোর—সদ্‌ভাব চিন্তন।

সদ্‌ভাব চিন্তনের আদেশে হদীছ ও কোরআন বচন—

প্রিয় পাঠক! অবগত হও—মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (ﷺ) বলিয়াছেন:—

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ

"এক ঘণ্টার তফক্কোর (সদ্‌ভাব চিন্তন) সম্বৎসরের এবাদৎ অপেক্ষা মূল্যবান।" বিশ্বপ্রভু আল্লাও কোরআন শরীফে বহুবার تفکر 'তফক্কোর' (টীঃ ৩৮৯)

টীকা ৩৮৯। তফক্কোর' শব্দটী ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। ইহা فکر (ফেক্‌র) চিন্তা করা, এই মূল হইতে উৎপন্ন সুতরাং উহার মৌলিক অর্থ 'বিশেষরূপে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখা'—অর্থাৎ কোন বিষয় বা বস্তু লইয়া গভীর ভাবে চিন্তা করতঃ তাহার গুণ ও প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করা।

تدبر 'তদব্বোর' (টীঃ ৩৯০) نظر 'নজর' (টীঃ ৩৯১) এবং اعتبار 'এতেবার' (টীঃ ৩৯২) করিবার আদেশ দিয়াছেন। এই চারিটী কার্য্যের প্রকৃত অর্থ, সদ্‌ভাব অর্থাৎ সৎবিষয় লইয়া চিন্তা করা।

কোন ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত 'তফক্কোর' এর পূর্ণ পরিচয় ও প্রকার চিনিতে না পারে এবং কোন্ বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে হয়, সে বিষয়গুলি কি প্রকার, তাহা অবলম্বনে কি প্রণালীতে চিন্তা করিলে কি ফল পাওয়া যায় ইত্যাদি না বুঝিতে পারে সে পর্য্যন্ত 'সদ্‌ভাব-চিন্তনের' গুরুত্ব ও উপকারিতা জানিতে পারে না। এই সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা করা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা প্রথমে উহার গুরুত্ব ও উপকারিতা বর্ণনা করিব. পরে উহার পরিচয় দিব, তাহার পর কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চিন্তা করিতে হয় তাহা বলিব, পরিশেষে যে বিষয় বা বস্তু অবলম্বনে উহা চিন্তা করিতে হয় তাহার সন্ধান দিব।

সদ্‌ভাব চিন্তনের গুরুত্ব ও উপকারিতা। পাঠক! বুঝিয়া লও, যে কার্য্য এক ঘণ্টা করিলে সম্বৎসরের এবাদৎ অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়, সে কাজটী কত বড় গুরুতর, ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। ১। মহাত্মা এব্‌নে আব্বাছ বলিয়াছেন—"কতক গুলি লোক আল্লার অস্তিত্ব লইয়া এক স্থানে চিন্তা করিতেছিল। ইতিমধ্যে মহাপুরুষ হজরৎ রস্থল (ﷺ) তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—'তোমরা আল্লার স্বষ্ট পদার্থ লইয়া চিন্তা কর; তাঁহার অস্তিত্ব লইয়া চিন্তা করিও না; কেননা সে তেজ তোমরা সহ্য করিতে পারিবে না; অপরন্তু, সে চিন্তায় তাঁহার মর্য্যাদাও রক্ষা করিতে পারিবে না।' ২। মহামাননীয়া বিবী আয়শা বলিয়াছেন "মহাপুরুষ হজরৎ

টীকা—৩৯০। 'তদব্বোর' শব্দটীও ঐরূপ বিশেষ্য। ইহা دبر (দোবর)—'পশ্চাৎ' এই মূল হইতে উৎপন্ন। কোন বিষয় বা পদার্থের পশ্চাতে যে গুণ বা শক্তি প্রবেশ করিয়া সেই বিষয় বা বস্তুকে তদবস্থায় আনয়ন করিয়াছে সেই গুণ বা শক্তি চিনিবার জন্য চেষ্টা করা।

টীকা—৩৯১। 'নজর' শব্দের মৌলিক অর্থ 'দৃষ্টি করা'। কোন বস্তুকে নানা অবস্থায় স্থাপন পূর্ব্বক পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা।

টীকা—৩৯২। 'এতেবার পদটীও বিশেষ্য। ইহার প্রকৃত অর্থ—কোন বস্তুর মধ্যে কোন গুণ বা শক্তি আছে কিনা তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়া লইবার বাসনায় পরীক্ষা করা। ইহার এক মূল عبر (আবেরা)—চিন্তা পূর্ণ হওয়া, চক্ষু হইতে অশ্রুপাত করা। অন্য মূল عبر (আবেরা)—বিশ্বাস স্থাপন করা। কোন গুণ বা শক্তি আছে কি না ধ্রুব বিশ্বাস করা; বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা; বর্ণনা করা, এই মূল হইতে عبرت (এবরাৎ) শব্দও উৎপন্ন। ইহার অর্থ নানা বিষয় বস্তু বা ঘটনা দর্শনে অভিজ্ঞতা লাভ করা এবং উপদেশ বা নীতি উদ্ধার করা

রসুল (দঃ) রজনীযোগে নির্জ্জনে নমাজ পড়িতেন ও রোদন করিতেন; তদ্দর্শনে একদিন আমি নিবেদন করিয়াছিলাম—'হে রসুলুল্লা। আল্লা আপনাকে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্তি দিয়াছেন; তথাপি আপনি কেন নির্জ্জনে রোদন করেন?' তদুত্তরে হজরৎ বলিয়াছিলেন—'রোদন না করিয়া আমি কি প্রকারে থাকিতে পারি? তিনি আমাকে এই সংবাদ দিয়াছেন—

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ
الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۝

'নিশ্চয় গগন মণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টির মধ্যে এবং দিবা রজনীর পরিবর্ত্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান জনের বুঝিবার জন্য বহু চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। (৪ পারা। সুরা এমরান। ২০ রোকু) অবশেষে বলিয়াছিলেন—'কোর্‌আন শরীফের এই আয়াৎ যে ব্যক্তি পড়ে অথচ চিন্তা করে না তাহার জন্য শোক করিতে হয়।''' ৩। মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী (আঃ) কে কতকগুলি লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"হে পরিত্রাত্মন্! এই সংসারে আপনার ন্যায় আর কেহ আছে?" তিনি বলিয়াছিলেন—"হাঁ' আছে—যাহার প্রত্যেক বচন কেবল আল্লার জেকের (স্মরণ) উপলক্ষে কথিত হয় এবং সমস্ত মৌনভাব কেবল সদ্‌ভাব-চিন্তনে রঞ্জিত হয় এবং প্রত্যেক দৃষ্টিপাত হইতে কেবল অভিজ্ঞতা ও নীতি উদ্ধার হয় সে ব্যক্তি আমার সমান।" ৪। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) ছাহাবাদিগকে বলিয়াছিলেন—"তোমরা এবাদৎ কার্য্যের কিয়দংশ এল চক্ষুকেও লইতে দাও।" তাঁহারা নিবেদন করিয়াছিলেন—'কেমন করিয়া দিতে হয়?' তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"পবিত্র কোর্‌আন শরীফ চক্ষু দ্বারা দেখিয়া পাঠ কর; তাহার মর্ম্ম ও অর্থ লইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত চিন্তা কর, এবং তন্মধ্যে যে সকল অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে তাহা হইতে অভিজ্ঞতা ও নীতি উদ্ধার কর।" ৫। মহাত্মা আবু ছোলায়মান দারানী বলিয়াছেন—"সাংসারিক বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে গেলে তাহা পরকালের অন্তরায় হইয়া পড়ে। অপর পক্ষে, পরকালের বিষয় লইয়া চিন্তা করিলে, এই সুফল ফলে যে আত্মার জীবন ও বল বর্দ্ধিত হয় এবং 'হেক্‌মৎ' অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞানের পথ খুলিয়া যায়।" ৬। মহাত্মা দাউদ তাঈ একদা রজনীযোগে স্বীয় গৃহের ছাতে বসিয়া গগণ রাজ্যের বিষয় লইয়া চিন্তা মগ্ন হইয়া রোদন

করিতেছিলেন। রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবেশীর আঙ্গিনার মধ্যে গড়িয়া পড়েন। প্রতিবেশী, পতন শব্দে জাগরিত হইয়া, চোর আসিয়াছে বিবেচনায় তল্‌ওয়ার খুলিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হয়। নিকটে গিয়া মহাত্মা দাউদকে তদবস্থায় পতিত দৃষ্টে সসম্ভ্রমে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মা বলিয়াছিলেন—"আমি অজ্ঞান হইয়াছিলাম; কি হইয়াছে কিছুই জানি না।"

'তফক্কোর'এর পরিচয়। পাঠক! জানিয়া লও—'তফক্কোর' শব্দের বাস্তবিক অর্থ—'জ্ঞান অনুসন্ধান করা।' অর্থাৎ নূতন জ্ঞান লাভ করিবার উপায় অবলম্বন করা। যে জ্ঞান 'স্বতঃসিদ্ধ' (টীঃ৩৯৩) নহে তাহা পূর্ব্ব সঞ্চিত জ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকে লাভ করা নিতান্তই অসম্ভব। কোন নূতন জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পূর্ব্বলব্ধ দুইটী জ্ঞান একত্র সংযোগ করা আবশ্যক; তাহাতে দুই জ্ঞানের সংসর্গে একটী নূতন তৃতীয় জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে। জীব জন্তুর মধ্যে যেমন নর নারীর একত্র সংসর্গে সন্তানোৎপত্তি হয়, জ্ঞান উৎপত্তির নিয়মও তদ্রূপ। যে দুই মূল জ্ঞানের সংযোগে নূতন জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে সেই নবজাত তৃতীয় জ্ঞানের দুইটী মূল বা শিকড় বলা যায়। উক্ত নবজাত তৃতীয় জ্ঞানের সহিত আর একটী জ্ঞান মিলাইয়া দিলে অপর একটী চতুর্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। এইরূপ একটী জ্ঞানকে অপর জ্ঞানের সহিত ক্রমশঃ মিলাইতে গেলে নব নব জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া জ্ঞান বংশের সংখ্যা অসীমভাবে বর্দ্ধিত হইতে পারে।

নব নব জ্ঞানোৎপত্তির ধারা।

টীকা—৩৯৩। যে জ্ঞান মানব-মন আপনা আপনি বুঝিতে পারে—তজ্জন্য কোন প্রমাণ বা যুক্তি অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না তাহাকে স্বাভাবিক বা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান কহে। স্বাভাবিক জ্ঞানের এক ভাগ 'বোধ' বা 'অনুভব' যথা শীতাতপ, সুখ দুঃখ, বা গুরুত্ব লঘুত্ব অনুভব এবং অন্য ভাগ 'প্রত্যয়'—যথা 'এক' অপেক্ষা 'দুই' বড়; গোটা বস্তু অপেক্ষা তাহার অংশ ছোট; ইত্যাদি। এইরূপ স্বাভাবিক জ্ঞান, করুণাময় মানবকে ব্যবসায়ের পুঁজি স্বরূপ দান করিয়াছেন, উদ্দেশ্য এই যে উহার এক ভাগের সহিত অন্য ভাগ যোগ করিয়া তন্মধ্য হইতে নিম্ন বর্ণিত ধারায় নূতন নূতন জ্ঞান উপার্জ্জন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ধর্ম্ম পথে আল্লার সান্নিধ্য পাইতে অগ্রসর হইবে—যথা গোটা বস্তু, তাহার অংশ অপেক্ষা বড় সুতরাং গোটা বস্তুর ভার তাহার অংশের ভার অপেক্ষা অধিক। আবার গোটা বস্তুর স্পর্শে বা ভোগে যে সুখ বা দুঃখ অনুভূত হয়, অংশের ভোগে অবশ্যই তদপেক্ষা অল্প হইয়া থাকে। শীত ও আতপ বা ঝড় ও অন্ধকার অবস্থা বিশেষে সুখকর বা কষ্টদায়ক হয়। তদ্রূপ পদার্থ এক প্রহর কাল সহ্য করিতে যত সুখ বা দুঃখ ভোগে আসিবে; দুই প্রহর কাল সহ্য করিবার সময় অবশ্যই তদপেক্ষা অধিক হইবে। যাহাহউক, নব নব উৎপন্ন জ্ঞান আবার যতই অন্য সঞ্চিত জ্ঞানের সহিত মিলাইতে থাকিবে, লাভসহ মূলধন ব্যবসায়ে খাটাইবার ন্যায় ততই জ্ঞানের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে।

এস্থলে ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, কতকগুলি লোক জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে ও জ্ঞান ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে পারে না। তদ্রূপ স্থলে দুইটী কারণ বিদ্যমান থাকে। (১) প্রথম কারণ—সে ব্যক্তি হয় তো নূতন জ্ঞানোৎপাদক মৌলিক জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানের মূল শিকড় আদৌ পাইতে পারে নাই। বণিক যেমন মূলধন না পাইলে, ধনোপার্জ্জনের সুযোগ পায় না তদ্রূপ মৌলিক জ্ঞানরূপ পুঁজী না পাইলে কেহই নূতন জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারে না। (২) দ্বিতীয় কারণ—মূল জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেও অনেকে তাহার দুই দুটীকে মিলাইবার কৌশল না জানাতে নূতন জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারে না। দেখ, যে ব্যক্তি বাণিজ্য ব্যবসায়ের কৌশল না জানে, তাহার হস্তে প্রচুর মূলধন দিলেও সে ধনোপার্জ্জনে অক্ষম হয়।

জ্ঞানোপার্জ্জনে অক্ষমতার দ্বিবিধ প্রধান কারণ

কি কি কারণে ও ঘটনায় মানব জ্ঞানোপার্জ্জনে অক্ষম হয় তাহার বিবরণ বহু বিস্তৃত। তথাপি একটী দৃষ্টান্ত লইয়া আমরা সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। "দুনিয়া অপেক্ষা পরকাল মহৎ" এই কথাটী যে ব্যক্তি বুঝিতে চায় তাহাকে তৎপূর্ব্বলব্ধ দুইটী জ্ঞানের আশ্রয় লইতে হইবে। তাহার একটী যথাঃ—"যাহা স্থায়ী, তাহা অস্থায়ী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।" অন্যটী যথাঃ—"পরকাল স্থায়ী, আর দুনিয়া অস্থায়ী।" এই দুইটী জ্ঞান যদি পূর্ব্ব হইতে মনে সঞ্চিত থাকে এবং ঐ দুইটীকে একত্র মিলন করা যায় তবেই "দুনিয়া অপেক্ষা পরকাল মহৎ" এই জ্ঞানটী সহজেই মনে জন্মিবে; কিন্তু উক্ত দুইটী জ্ঞান যদি পূর্ব্ব হইতে মনে না থাকে তবে কখনই এই শেষোক্ত জ্ঞান জন্মিতে পারিবে না। উপরে যাহা লিখা গেল তাহাতে ইহা মনে করিও না যে আমরা معتزلة 'মোতাজেলা' (টীঃ ৩৯৪) নামক দার্শনিক মতের পোষকতা করিতেছি। যাহা হউক এ সকল কথারও ব্যাখ্যা বহু বিস্তৃত।

টীকা—৩৯৪। 'মোতাজেলা' নামক দার্শনিক সম্প্রদায়, কাদরিয়া নামক দার্শনিক সম্প্রদায়েরই এক অংশ। কোন কোন বিষয়ের ইহাদের মতের সঙ্গে উহাদের মতের প্রভেদ দেখা যায়। কাদরিয়া সম্প্রদায়ের দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলেন মানবের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষমতা আছে। জব্বারিয়া সম্প্রদায়ের মত ইহার বিপরীত। তাঁহারা বলেন 'মানবের কিছু মাত্র ক্ষমতা নাই।' মোতাজেলাদের মত, কাদরিয়া মতের চূড়ান্ত পরিণতি। ইহারা বলেন "আল্লা বিশ্ব জগতের পরিচালনাকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অটল নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন ও সেই নিয়ম গুলিতেই সমস্ত কার্য্য হইতেছে। আল্লাকে নূতন করিয়া আর কিছুই করিতে হয় না। তিনি এক প্রকার নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিয়াছেন। মোতাজেলা শব্দটী عزل আজ্‌ল্‌ মূল হইতে উৎপন্ন, তাহার অর্থ 'পৃথক করা' 'নিকর্ম্মা করা।' জগতের কার্য্য নির্ব্বাহে আল্লা নিয়ম স্থাপন করিয়া, নিজে এখন

ফলকথা—সর্ব্ববিধ চিন্তার প্রকৃত স্বভাব এই যে, দুইটী জ্ঞান মনের মধ্যে একত্র মিলন করিলে অন্য একটী নূতন জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ স্থলে এ কথাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, ঘোটক ঘোটকীর সংযোগে যেমন অশ্বশাবক উৎপন্ন হয়—ছাগশিশু জন্মে না, তদ্রূপ সমশ্রেণীস্থ জ্ঞানের মিলনে তজ্জাতীয় জ্ঞান পাওয়া যাইতে পারে—এক জাতীয় দুই জ্ঞানের মিলনে ভিন্ন জাতীয় জ্ঞান লাভ হয় না। আবার বিভিন্ন প্রকারের দুই জ্ঞান হইতে কোন জ্ঞান জন্মিতে পারে না। প্রত্যেক শ্রেণীর জ্ঞান লাভের জন্য তৎসম্পর্কিত দুটী মূল জ্ঞান একত্র করা কর্ত্তব্য। অভিলষিত জ্ঞানের সম-সম্পর্কিত দুইটী মূল জ্ঞান যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে জন্মাইয়া লইতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত বাঞ্ছিত জ্ঞানের শাখা প্রশাখা হৃদয়ে জন্মাইয়া লইতে পারিবে না।

সদ্‌ভাব চিন্তনের উদ্দেশ্য। পাঠক! জানিয়া রাখ—মহাপ্রভু, মানুষকে অজ্ঞানতার আবরণে, অন্ধকার মধ্যে, সৃজন করিয়াছেন—এই কারণে ইহার জন্য একটী আলোকের বিশেষ প্রয়োজন। (টীঃ ৩৯৫) সেই আলোকের সাহায্যে মানব অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া স্বীয় গন্তব্য পথ অবলম্বন করিতে পারে; এবং উহারই প্রভাবে জানিতে পারে তাহাকে কোন্ কার্য্য করিতে হইবে—

মানবের জন্য জ্ঞানালোকের দরকার কেন?

এক প্রকার নিষ্কর্ম্মা হইয়া আছেন। ছোন্নৎ সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ এই মতকে নাস্তিকতার প্রকার ভেদ বলিয়া ঘৃণা করেন।

টীকা—৩৯৫। আলোক না থাকিলে পৃথিবী, মানুষের নিকট বাস্তবিক অন্ধকারময়। আলোক ভিন্ন মানব আর কিছুই দেখিতে পায় না। বাহ্যজগতে আলোক দিবার জন্য সূর্য্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ আল্লা সৃজন করিয়াছেন। তৎসমুদয়ের আলোক মানব দেখিতে পায় এবং সেই আলোক যে যে পদার্থের উপর পড়ে কেবল সেই গুলিও লোকে দেখিতে পায়। পদতলে ভূগর্ভে কি আছে চারিধারে কত ফেরেশ্‌তা ও মৃত ব্যক্তির আত্মা বিচরণ করিতেছে তাহা আমরা দেখিতে পাই না। তোমার মনে কি আছে বা তোমার আমার চক্ষু গোলকে কতটী পরদা, কি ভাবে সাজান আছে তাহাও দেখিতে পাইতেছি না। মাথার মধ্যে কয়টী কুঠরী আছে তাহার কোন্ স্থানে কি কার্য্য চলিতেছে তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। আলোক রশ্মি যে স্থানে পড়ে না তাহা যেমন চক্ষে দেখা যায় না; তেমনই জ্ঞানের আলোকে যে বিষয় উদ্ভাসিত হয় না তাহাও মানব-মন বুঝিতে পারে না। মানব শিশু অন্ধকারময় জননী-জঠরে গঠিত হইয়া পরে ভূমিষ্ঠ হয়। এখানে আসিয়া প্রথমে সূর্য্যাদির আলোকের সঙ্গে দেখা হয়। অন্তর্জ্জগতেও অনুভব শ্রেণীর কতকগুলি জ্ঞান জীবনের সঙ্গে আগত হয়। বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকিলে বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যয় শ্রেণীর-জ্ঞানও ক্রমে অন্তর্জ্জগতের মধ্যে উদয় হয়। তখন ঐ দুই জাতীয় স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানের একটীর সঙ্গে অন্যটী বুদ্ধির প্রভাবে মিলাইয়া লইতে থাকিলে জ্ঞানের আলোক ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া চলে। তৎপ্রভাবে মানব, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য দেখিতে এবং গন্তব্য অগন্তব্য পথ চিনিয়া লইতে পারে। বাহ্য জগতে সূর্য্যাদির আলোক ও তেজ, যেমন লোকে বুদ্ধি

কোন্ দিকে যাইতে হইবে; সংসারের দিকে দৌড়িতে হইবে কি পরকালের পানে ধাবমান হইতে হইবে, কাহার প্রতি আসক্ত হইতে হইবে; নিজের প্রতি আসক্ত হইবে কি আল্লাকে ভাল বাসিবে? জ্ঞানের আলোক ভিন্ন মানব এ সমস্ত কথা কিছুতেই বুঝিতে পারিবে না। আবার চিন্তা ব্যতীত সেই জ্ঞানালোক অন্য উপায়ে পাওয়া যায় না। (জ্ঞানালোকের সন্ধানই সদ্ভাব চিন্তনের উদ্দেশ্য।) হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—

خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ

"মানব অন্ধকারের মধ্যে জন্মিয়াছে পশ্চাৎ তাহার উপর আল্লার নূর (আলোক) অল্পে অল্পে বর্ষিত হইয়াছে।"

জ্ঞানের সহিত আলোকের তুলনা—পথিক লোক অন্ধকারে পড়িলে যেমন 'দিশাহারা' হইয়া চলিতে পারে না; তখন তাহাকে লৌহ দণ্ড দ্বারা চকমকী পাথর ঠুকিয়া অগ্নি উৎপাদন করতঃ প্রদীপ জ্বালিয়া লইতে হয়। প্রদীপ জ্বালিলে আলোকের সাহায্যে সে যেমন চারি ধারের অবস্থা দেখিতে পায়—কষ্টকর অবস্থা ঘুচিয়া যায়—কোন্‌টী সুপথ, কোন্‌টী বিপথ, বাছিয়া লইতে পারে—সরল পথ অবলম্বনে নিরাপদে চলিয়া যাইতে পারে—মানবের অবস্থাও তদ্রূপ। সে অন্ধকারময় পৃথিবীতে পতিত হইয়া কি করিবে, কোন্ দিকে যাইবে, বুঝিতে পারে না। তাহাকেও স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক জ্ঞানের একটীর সহিত আর একটী মিলাইয়া জ্ঞান রাশি উপার্জ্জন করতঃ তাহার আলোকে সুপথ চিনিয়া লইতে হয়, তবেই সে নিরাপদে সুখের স্থানে চলিয়া যাইতে পারে। মানবের অন্তরের যে দুই শ্রেণীর স্বাভাবিক জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে একটী প্রস্তর ও অন্যটী লৌহদণ্ড সদৃশ। দুই স্বাভাবিক জ্ঞানের সংযোগার্থ চিন্তাকে (প্রস্তরোপরি লৌহ-দণ্ডের) আঘাত সদৃশ মনে কর—চিন্তা-সম্ভূত জ্ঞান, আঘাতোৎপন্ন আলোক সদৃশ। আলোক পাইলে পথিকের 'দিশাহারা' অবস্থা ঘুচিয়া গিয়া কর্ত্তব্য-পরায়ণতা আগত হয়, তদ্রূপ অবোধ মানব জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে তৎপর হয়। দেখ, জ্ঞানের প্রভাবে মানব যখন দুনিয়া অপেক্ষা

প্রভাবে বিভিন্ন প্রকার ধারণ ও প্রেরণ করতঃ অসংখ্য সাংসারিক কার্য্য করিয়া লয় অন্তর্জগতেও স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানের দুই দুটী জ্ঞান, বুদ্ধির প্রভাবে যোগ করিয়া নব নব জ্ঞানের আলোক উৎপাদন করতঃ বিভিন্ন প্রকারে ধারণ ও প্রেরণ করিয়া সমস্ত কার্য্য সুকৌশলে নির্ব্বাহ করিয়া লইতে পারে।

পরকালকে মহৎ বলিয়া পরিষ্কার ভাল বুঝিতে পারে তখন দুনিয়া হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া পরকালের দিকে যাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হয়।

তফক্কোর সর্ব্ববিধ কার্য্যের মূল কারণ—তফক্কোর হইতে তিন ফল পাওয়া যায়, প্রথম—মা'রেফত বা পরিচয় জ্ঞান; দ্বিতীয়—হালত বা অবস্থান্তর; তৃতীয়—আমল বা কার্য্য-চেষ্টা। এই তিনটীর মধ্যে কার্য্য-চেষ্টা, মনের অবস্থার অধীন অর্থাৎ মনের মধ্যে সচেষ্টভাব না জন্মিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে চেষ্টা আসে না; সুতরাং কোন কার্য্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। মনের অবস্থা আবার জ্ঞানের অধীন। জ্ঞানের উদয় না হইলে মনে প্রবুদ্ধ-ভাব আসে না। সুতরাং দেখ, কার্য্যের মূল প্রবর্ত্তক হইতেছে জ্ঞান। সেই জ্ঞান, চিন্তা বিনা উৎপন্ন হইতে পারে না। এই জন্য তফক্কোরকে সর্ব্ববিধ কার্য্যের মূল কারণ বা কুঞ্জি বলা যায়। ইহাতেও তফক্কোরের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

তফক্কোর হইতে ক্রমান্বয়ে লব্ধ তিন ফল

চিন্তার ভূমি কোথায় ও কোন্ দিকে প্রসারিত!

পাঠক! চিন্তার ভূমি, অর্থাৎ যাহা অবলম্বনে চিন্তা করা যায় তাহা নিতান্তই অসীম। সুতরাং জ্ঞানের সীমাও অসীম। জগতের প্রত্যেক পদার্থ লইয়া চিন্তা করিলে নব নব সত্য, তথ্য ও জ্ঞান পাওয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু যাহা ধর্ম্ম পথের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে না তৎসমুদয় বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যাহা ধর্ম্ম পথের অন্তর্গত, সুধু তাহা লইয়া চিন্তা করার নমুনা আমরা প্রদর্শন করিব। ধর্ম্ম পথের সহিত যে সকল পদার্থের সম্বন্ধ আছে তাহাও অনন্ত; তথাপি তৎসমুদয়কে কয়েকটী বড় বড় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। পাঠক! "ধর্ম্মপথ" বলিয়া আমরা যাহার প্রতি লক্ষ্য করিলাম, তাহার পরিচয় এখন গ্রহণ কর। যে সকল ব্যবহার বা কার্য্য আল্লা ও মানবের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহাকেই আমরা "ধর্ম্মপথ" বলিতেছি। কেননা উহারাই মানবের কর্ত্তব্য কার্য্য ও গন্তব্যপথ। উহারই কল্যাণে মানব আল্লার সান্নিধ্য পাইতে পারে।

ধর্ম্মপথের সহিত সম্বন্ধহীন চিন্তা—এখানে পরিত্যক্ত

ধর্ম্ম পথ কাহাকে বলে?

ধর্ম্মপথ-সম্পর্কিত চিন্তার ভূমির শ্রেণী বিভাগ—এখন বুঝিয়া দেখ মানুষের চিন্তার ভূমি প্রধানতঃ দুই ভাগ হইল (১) নিজের সম্বন্ধে এবং (২) আল্লার সম্বন্ধে। নিজের সম্বন্ধে চিন্তার ভূমি আবার দুই ভাগে বিভক্ত

হইতে পারে; (১) নিজের সেই দোষগুলি যাহা আল্লার অপ্রিয় এবং যাহা সঙ্গে থাকিলে আল্লা হইতে দূরবর্ত্তী হইতে হয়। এইরূপ দোষ গুলিকে ধ্বংসকর দোষ বা পাপ বলে। (২) মানবের কতকগুলি গুণ যাহা আল্লার অতীব প্রিয় এবং যাহার কল্যাণে মানব আল্লার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে। সেই গুণগুলিকে পরিত্রাণকারী গুণ বা পুণ্য বলা যায়! আল্লার সম্বন্ধে চিন্তা করিবার ময়দান বাস্তবিক নিতান্তই অসীম; তথাপি তাহাকেও দুই ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম ভাগে, তাহার 'জাৎ' ও 'ছেফৎ' অর্থাৎ তাঁহার 'অস্তিত্ব' ও 'গুণাবলী। আল্লার অস্তিত্ব লইয়া চিন্তা করা বড়ই কঠিন; তাহা যে সে লোকের কার্য্য নহে; তবে তাঁহার গুণের আভাষ, তাঁহার "আসমায়ে হোসনা" অর্থাৎ 'পবিত্র নামাবলী' অবলম্বনে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ভাগে, আল্লার কার্য্য পদ্ধতি এবং সৃষ্ট পদার্থ। তাঁহার সৃষ্টি জগতের অন্তর্গত বিস্ময়কর কৌশলও অনন্ত-জ্ঞান-অন্তর্ভূক্ত। ধর্ম্মপথে থাকিয়া চিন্তা করিবার এই চারিটী অসীম ময়দান। (টীঃ ৩৯৬।)

ধর্ম্মপথে নিজের সম্বন্ধে চিন্তার ভূমির দুইটী ভাগ

ধর্ম্মপথে আল্লার সম্বন্ধে চিন্তার ভূমির দুইটী ভাগ

ধর্ম্ম পথিকের সহিত প্রেমাসক্ত লোকের তুলনা—আল্লার পথে গমনোৎসুক পথিক লোক, এই ৪ চারি শ্রেণীর কোন না কোন বিষয় লইয়া চিন্তা করেন—তদ্ভিন্ন অন্য দিকে মন দিতে অবসর পান না। এরূপ লোকের অবস্থা, প্রেমাসক্ত লোকের তুল্য। প্রেমাসক্ত লোক, প্রিয়জনের চিন্তা ভিন্ন অন্য দিকে মন দিতে পারে না। যদি তাহার মন অন্য দিকে যায়, তবে তাহার সে প্রেমকে প্রকৃত পূর্ণ-প্রেম বলা যায় না। প্রেম, পূর্ণ উন্নতি প্রাপ্ত হইলে এমন ভাবে প্রেমিকের মন অধিকার করিয়া জুড়িয়া বসে যে, সে মনের মধ্যে আর কিছু প্রবেশ করিতে স্থান পায় না। সে সময়ে প্রেমিকের দৃষ্টি দুই দিক ভিন্ন অন্য দিকে যাইতে পারে না। হয়, প্রিয় জনের দিকে দৃষ্টি করে; নয় নিজের দিকে। প্রিয়-জনের দিকে দৃষ্টি কালে হয়তো, তাহার সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ইত্যাদি আলোচনা করে, নচেৎ তাহার স্বভাব, গুণ ও কার্য্যাবলী চিন্তনে মগ্ন হয়। নিজের দিকে দৃষ্টি কালেও দুইটী বিষয় ভিন্ন অন্য দিকে মন দিতে অবসর পায় না—তখন নিজের সেই দোষ অনুসন্ধানে

টীকা—৩৯৬। মূলগ্রন্থে চিন্তার ময়দানের সন্ধান, বিভাগ এবং পরিচয় উল্টাপাল্টা অবস্থায় লিখিত আছে ইহা লিপীকর প্রমাদ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আমরা 'এহইয়া-অল-উলুম' দৃষ্টে যথা সাধ্য সংক্ষেপে সাজাইয়া দিলাম।

ও সংশোধনে প্রবৃত্ত হয়, যাহা প্রিয়জন পছন্দ করে না অথবা সেই অবস্থা অনুসন্ধান ও বর্দ্ধনে সচেষ্ট হয় যাহা প্রিয় জন ভাল বাসে। যাহাহউক, প্রেমাসক্ত লোকের চিন্তার ভূমি যেমন ৪ চারি ভাগে বিভক্ত, আল্লার প্রতি প্রেমাসক্ত ধর্ম্মপথিকগণের চিন্তার ময়দানও তদ্রূপ চতুর্ব্বিধ।

ধর্ম্মপথসম্পর্কিত চিন্তার প্রথম ও দ্বিতীয় ময়দান—(টীঃ৩৯৭) নিজের স্বভাব ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধীয় দোষ-গুণ চিন্তন। মানুষকে প্রথমে এই চিন্তা ও অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য যে, তাহার স্বভাবের মধ্যে কোন্ কোন্টী মন্দ, আর কার্য্যাবলীর মধ্যে কোন্ কোন্টি দোষনীয়। যাহা মন্দ বা দোষনীয় বলিয়া বুঝা যায় তাহা সংশোধন করিয়া লইতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। কার্য্যাবলীর মধ্যে যাহা দোষনীয় তাহাকে পাপ বলে; উহা বাহিরে প্রকাশ পায়। স্বভাবের মধ্যে যাহা মন্দ তাহাকে কুপ্রবৃত্তি বলে; তাহা অন্তরের মধ্যে গুপ্ত অবস্থান থাকে। পাপ ও কুপ্রবৃত্তি অসংখ্য। পাপের মধ্যে অনেকগুলি কার্য্য সপ্ত অঙ্গের (টীঃ ৩৯৮) সাহায্যে করা হয়; যথা জিহ্বা, চক্ষু, হস্ত, পদ, ইত্যাদি আর কতকগুলি কার্য্য সমস্ত দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। অন্তরস্থ কুপ্রবৃত্তির অবস্থাও ঐ রূপ।

পাপ ও কুপ্রবৃত্তির তুলনা ও পরিচয়—প্রথমটী বাহ্যিক ও অপরটী গুপ্ত।

টীকা—৩৯৭। চিন্তার ভূমিকে প্রথমে দুইটী বৃহৎ ভাগে বিভাগ করা হইল (১) নিজের সম্বন্ধে (২) আল্লার সম্বন্ধে। তাহার পর প্রথম ভাগকে দুই খণ্ড করা হইয়াছে—১(ক) নিজের দোষ ও পাপ সম্বন্ধীয় চিন্তা, এবং ১(খ) নিজের গুণ ও পুণ্য লইয়া চিন্তা। এই দুই প্রকার চিন্তাকে, চিন্তার প্রথম ও দ্বিতীয় ময়দান বলা হইল। আল্লার সম্বন্ধীয় চিন্তার ভূমিকেও দুই খণ্ড করা হইয়াছে যথা—২(ক) আল্লার 'জাৎ' ও ছেফাৎ' অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব ও গুণ এবং ২(খ) তাঁহার কৌশলময় কার্য্যপদ্ধতি ও সৃষ্ট পদার্থ। এই খণ্ডের চিন্তাকে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ ময়দানের অন্তর্গত বলা হইয়াছে। এই জন্য পাঠকগণ স্বভাবতঃ এই চারি খণ্ডের বিস্তৃত পরিচয় ক্রমানুসারে পাইতে অবশ্যই আশা করিবেন; কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা সে দিকে লক্ষ্য করেন নাই। তিনি স্বপ্রণীত 'এহইয়া-অল-উলুম' গ্রন্থের 'সংক্ষিপ্ত সার' রূপে এই' কিমিয়ায়ে সাআদৎ' গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া সংক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন করিয়াছেন। এইজন্য মূল গ্রন্থে চিন্তা ভূমির প্রথম বৃহৎ ভাগ দ্বয়কে অর্থাৎ 'আত্ম সম্বন্ধীয় দোষ-গুণ চিন্তন'কে গ্রন্থকার এই স্থানে বিশদ ভাবে বর্ণনা কালে প্রথম ও দ্বিতীয় ময়দান বলিয়া পৃথক পৃথক উল্লেখ না করিয়া মোটের উপর প্রথম ময়দান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা চিন্তাভূমির চারিটী বিভাগের সহিত পূর্ব্বাপর শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এখানে চিন্তাভূমির প্রথম বৃহৎ ভাগ-দ্বয়কে এক যোগে প্রথম ও দ্বিতীয় ময়দান বলিয়া উল্লেখ করতঃ মূল-গ্রন্থের পদানুসরণে উহাদের বিশদ বর্ণনা পৃথক পৃথক না দেখাইয়া এক স্থানে দেখাইলাম।

টীকা—৩৯৮। মূল গ্রন্থে 'হেফ্‌ৎ' আন্দাম' লিখিত আছে। কোন্ কোন্ অঙ্গ উহার অন্তর্গত তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। সপ্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা—(১) চক্ষু; (২) কর্ণ; (৩) জিহ্বা (বাক যন্ত্র); (৪) মুখ (ভোজন যন্ত্র); (৫) হস্ত; (৬) পদ; (৭) লিঙ্গ (জননেন্দ্রিয়) নাসিকা, ও মলদ্বার কর্ম্মেন্দ্রিয় হইলেও তাহাদের স্বাধীন ক্ষমতা নাই।

কার্য্য ও স্বভাব লইয়া চিন্তা করিবার ক্রমিক ত্রিবিধ ধাপ— কার্য্য ও স্বভাব লইয়া চিন্তা করিবার তিন ধাপ আছে। (১) অমুক কাজ বা অমুক স্বভাব ভাল কি মন্দ। কার্য্য ও স্বভাবের দোষ সহজে ধরা যায় না—চিন্তার সাহায্যে উহা স্থির করিয়া লইতে হয়। (২) ঐ রূপ মন্দ কার্য্য আমি করিতেছি কি না এবং ঐ রূপ মন্দ স্বভাব আমার মধ্যে আছে কি না অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কুপ্রবৃত্তির দোষ গুণও প্রগাঢ় চিন্তা ব্যতিরেকে বুঝিতে পারা যায় না। (৩) নিজের মধ্যে যে যে কুপ্রবৃত্তি আছে, বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইতে পবিত্র হওয়ার উপায় কি? ইহাও চিন্তার প্রভাবে স্থির করিয়া লইতে হয়। যাহাহউক, প্রত্যহ প্রাতঃকালে অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল ঐ প্রকারে আত্ম-পরীক্ষার জন্য নিম্ন লিখিত ধরণে চিন্তা করা আবশ্যক।

আত্ম পরীক্ষায় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তাহার কার্য্যাবলী লইয়া চিন্তার ক্রমিক ধারা—প্রথমে প্রকাশ্য পাপ-কার্য্য চিন্তনে প্রবৃত্ত হইবে। তদর্থে এক একটি কর্ম্মেন্দ্রিয় লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, যথা জিহ্বা হইতে মিথ্যা কথন, পর-নিন্দা প্রভৃতি প্রকাশ্য পাপ ঘটিতে পারে কি না; অদ্য আমার দ্বারা ঐ রূপ পাপের মধ্যে কোন্ পাপ ঘটিতে পারে, যদি মিথ্যা বলিবার বা পরনিন্দা করিবার কারণ সম্মুখে দেখা যায় তবে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহা চিন্তার সাহায্যে অবধারণ করিবে। এইরূপ যদি হারাম অন্ন ভোজনের কোন নিমিত্ত দেখা যায় তবে তাহা হইতে বাঁচিবার উপায়, বুদ্ধির প্রভাবে চিন্তা পূর্ব্বক স্থির করিয়া লইবে। ফল কথা জিহ্বার দ্বারা যে সকল পাপ ঘটিতে পারে একে একে তৎসমুদয়ের অনুসন্ধান অন্তে অন্যান্য কর্ম্মেন্দ্রিয় লইয়া বিচার আরম্ভ করিবে। প্রত্যেক কর্ম্মেন্দ্রিয় হইতে যে যে পাপ উৎপন্ন হইতে পারে, ক্রমে ক্রমে তৎসমুদয়ের অনুসন্ধান ও চিন্তা করিবে।

প্রথম চিন্তা—কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারায় কি কি প্রকাশ্য পাপ কার্য্য সম্ভব?

এইরূপ পাপ লইয়া চিন্তা করিরার পর, কোন্ কোন্ অঙ্গ দ্বারা কিরূপ এবাদৎ করা যাইতে পারে, তাহাও অনুসন্ধান আরম্ভ করিবে। এবাদৎ কার্য্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও চিন্তার পর কোন্ অঙ্গ দ্বারা কি কি অতিরিক্ত সৎকার্য্য করা যাইতে পারে তাহা লইয়া চিন্তা করিবে এবং সেইরূপ সৎকার্য্য সম্পাদন করিতে তৎপর হইবে। মানব স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাহায্যে কোন্ কোন্ অতিরিক্ত সাধুকার্য্য করিতে পারে তৎসম্বন্ধে চিন্তার একটী সংক্ষিপ্ত নমুনা দেওয়া যাইতেছে—

দ্বিতীয় চিন্তা—কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারায় কি কি এবাদৎ সম্ভব?

১। মনে কর,

১। মনে কর, এই জিহ্বা ; ইহার দ্বারা আল্লার জেকের ও মুছলমান লোকের উপকার করা যায়। বাক্য-কথন, রসাস্বাদন প্রভৃতি কার্য্যের ন্যায় এরূপ সৎকার্য্যের জন্যও জিহ্বার সৃষ্টি হইয়াছে। অদ্য জিহ্বার দ্বারা আমি আল্লার অমুক নাম বা অমুক 'কল্‌মা' উচ্চারণ করিতে পারি; তদ্ব্যতীত অমুক ব্যক্তির দুঃখ মোচনের নিমিত্ত অপরকে অনুরোধ উপরোধ করিতে বা সন্তোষকর বচন প্রয়োগ করিতে পারি ; তাহার ফলে সে ব্যক্তির দুঃখ ঘুচিতে ও আরাম আসিতে পারে। ২। চক্ষুকে, জ্ঞান ধরিয়া লইবার ফাঁদ স্বরূপ বানান হইয়াছে। উহার সাহায্যে সৌভাগ্যরূপ শিকার ধরিয়া লইতে পারি ; অথবা জ্ঞানী সাধু লোকের প্রতি ভক্তি সহকারে দৃষ্টিপাত করিতে এবং পাপীর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে পারি। যে উদ্দেশ্যে চক্ষুদান পাওয়া গিয়াছে তাহা সাধন করিতে পারিলে চক্ষুর সদ্ব্যবহার করা হয়। ৩। ধন মাল ধার্ম্মিক লোকের আরাম সাধনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। সেই ধন দ্বারা নিজের অভাব কথঞ্চিৎ নিবারণ করতঃ উদ্বৃত্ত ধন অন্য গরীব দুঃখীর কষ্ট নিবারণ ও আরাম বর্দ্ধন জন্য খরচ করিতে পারি। এইরূপ চিন্তা এবং এই ধরণের সৎচিন্তা প্রত্যহ করিতে আরম্ভ করিলে হয়তো এক ঘণ্টার চিন্তার ফলে মনে এমন সুপ্রভাব উৎপন্ন হইতে পারে যাহা মানবকে যাবজ্জীবন পাপ হইতে নিরাপদ রাখিতে পারে। এই জন্য মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—"এক ঘণ্টার চিন্তা, সম্বৎসরের এবাদৎ অপেক্ষা মূল্যবান।" কেননা, উহার ফল যাবজ্জীবন স্থায়ী থাকিতে পারে।

তৃতীয় চিন্তা—কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারায় কি কি আবশ্যক সৎকার্য্য সম্ভব?

আত্মপরীক্ষায় অন্তরের স্বভাব লইয়া চিন্তার ক্রমিক ধারা — যাহা হউক, প্রকাশ্য এবাদৎ ও পাপ লইয়া চিন্তা করিবার পর অন্তরের দিকে মনোযোগ দিবে। তোমার মনে কোন কোন্ ধ্বংস-কর কুপ্রবৃত্তি আছে এবং পরিত্রাণ-কর সদ্গুণের মধ্যে কোন্ গুলি নাই তাহা তখন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে। কুপ্রবৃত্তির মধ্যে যে গুলি দেখিতে পাইবে, তাহা সংশোধন করিতে এবং সদ্গুণ ও সৎপ্রবৃত্তিগুলি উপার্জ্জন করিয়া লইতে তৎপর হইবে। কুপ্রবৃত্তি ও সৎপ্রবৃত্তির সংখ্যা অসংখ্য এবং তৎসমুদয় লইয়া চিন্তা করিবার পথও বহুবিস্তৃত। তথাপি ধ্বংসকর দোষের দশটী প্রধান শিকড় আছে, যথা—(১) কৃপণতা ; (২) মদ বা অহঙ্কার ; (৩) মোহ বা ভ্রান্তি ; (৪)

চতুর্থ চিন্তা—অন্তরে কোন্ কোন্ কুপ্রবৃত্তি আছে?

সাধুতা-প্রদর্শন; (৫) দ্বেষ বা মাৎসর্য্য; (৬) ক্রোধ; (৭) অতি ভোজনের লোভ; (৮) অধিক কথনের লোভ; (৯) ধন লোভ; (১০) মান লোভ। এই কয়েকটী আন্তরিক কুপ্রবৃত্তির মূল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিলে, লোকে বিনাশ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। (তৎপরে দেখিবে পরিত্রাণ-কর সদ্‌গুণের মধ্যে কোন্ গুলি নাই এবং তৎসমুদয় কি উপায়ে লাভ করিতে পারিবে) হিতকর গুণেরও দশটী প্রধান মূল আছে, যথা—(১) তওবা (অনুতাপ); (২) ছবর (ধৈর্য্য); (৩) সন্তোষ; (৪) শোকর (কৃতজ্ঞতা); (৫) ভয়; (৬) আশা; (৭) পরহেজগারী (বৈরাগ্য); (৮) এখ্‌লাছ (প্রত্যেক সৎকার্য্যে আল্লার প্রসন্নতা লাভের আশায় করা হইতেছে—অন্য কাহার জন্য নহে এরূপ সঙ্কল্প) (৯) সর্ব্বজীবের সহিত সাধু ব্যবহার। (১০) আল্লার প্রতি প্রেম।

পঞ্চম চিন্তা—অন্তরে কোন্ কোন্ সদ্‌গুণ নাই?

উপরিলিখিত প্রত্যেক দোষ বা গুণ লইয়া চিন্তা করিতে গেলে চিন্তার সম্মুখে অসীম ময়দান আসিয়া উপস্থিত হয়। চিন্তার এবম্বিধ পথ, সকলের সম্মুখে খোলে না। ঐ সকল দোষ গুণের পরিচয় এই পুস্তকে যে ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে তৎসমুদয় যাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন কেবল তদ্রূপ লোকের সম্মুখে সদ্‌ভাব-চিন্তার পথ ক্রমে ক্রমে খুলিতে থাকিবে।

আত্মপরীক্ষার জন্য স্ব স্ব দোষ গুণের পৃথক পৃথক ফর্দ্দ প্রস্তুত করা আবশ্যক। প্রত্যেক ধর্ম্ম-পথিক মুরীদ লোকের উচিত যে তাঁহারা নিজের দোষ বা গুণের এক একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিকটে রাখেন। যখন ঐ সকল গুণের কোন একটী লাভ করিতে বা দোষের একটী পরিহার করিতে সমর্থ হন তখন একটী রেখা পাত করিয়া, তালিকা-লিখিত সেই দোষ বা গুণ যেন কাটিয়া দেন এবং অন্য একটী দোষ পরিহারে বা গুণ উপার্জ্জনে পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হন।

ঐ সকল আপন আপন দোষ বা গুণ লইয়া চিন্তা করিবার কালে কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ দোষ বা গুণ লইয়া চিন্তা করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহার কারণ এইযে হয়তো কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ দোষে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে পারে। দেখ, কোন জ্ঞানী পরহেজগার আলেম সমস্ত কুপ্রবৃত্তি হইতে নিস্তার পাইয়াছেন কিন্তু তিনি স্বীয় জ্ঞানকে মূল্যবান বিবেচনা করিয়া নিজে নিজে গৌরব অনুভব করেন; নিজের শিক্ষিত বিদ্যা 'জাহির' করিয়া নিজের নাম ও মান-সম্ভ্রম বর্দ্ধনের সুযোগ অনুসন্ধান করেন,

লোকের চক্ষুর সম্মুখে নিজের 'এবাদৎ' প্রকাশ করেন বা বাহ্য আকার প্রকার সাজাইয়া রাখেন; লোকে তাহাকে আলেম বলিয়া ভক্তি করিলে বেশ আনন্দ অনুভব করেন; কিন্তু কেহ তাঁহাকে নিন্দা করিলে নিন্দাকারীর প্রতি তিনি মনে মনে অসন্তুষ্ট হন এবং তাহার প্রতিশোধ লইতে সুযোগ অনুসন্ধান করেন। এ সমস্ত ভাবই অন্তরস্থ গুপ্ত দোষ এবং ধর্ম্ম জীবনের ক্ষতিকর। যাহা হউক, তদ্রূপ আলেমকে প্রত্যহ 'রিয়া' বা সাধুতা-প্রদর্শন-প্রবৃত্তি লইয়া চিন্তা করা আবশ্যক এবং কি উপায়ে তাহা দূর করিয়া নিজকে রক্ষা করিতে পারা যায় তাহার পন্থা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। তদ্রূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট আলেমকে এই-রূপ চিন্তা করা উচিত যে—"'মানুষেরা আমার দিকে দেখিতেছে' এই খেয়ালটী আমার মন হইতে কেমন করিয়া ধুইয়া ফেলিতে পারিব? আমার সম্মুখে মানুষ আছে, কি ইতর জন্তু আছে, অথবা কিছুই নাই, এইরূপ খেয়ালগুলি আমার মন বিচলিত করিতে না পারে; অথবা আদৌ সেই খেয়াল মনে প্রবেশ করিতে না পারে এবং মনের সম্মুখে ভক্তি ও তাচ্ছিল্য কি উপায়ে সমান উদাসীন হইতে পারে।"

মনে কর এই প্রকার অবস্থায় উন্নত হইতে পারিলে মানবের দৃষ্টি তখন কেবল এক আল্লার প্রতি স্থির হইয়া রহিতে পারে। এই সকল বিষয়, স্বাধীন চিন্তার একটী অসীম ময়দান। ইহা হইতে বুঝা গেল মানব নিজের প্রত্যেক দোষ বা গুণ লইয়া চিন্তা করিতে বসিলে দেখিতে পাইবে যে তদ্রূপ চিন্তা-ভূমির কুল কেনারা নাই সুতরাং তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। এ জন্য কলম সংযত করিলাম আছ্‌ছালাম।

ধর্ম্মপথসম্পর্কিত চিন্তার তৃতীয় ময়দান—(টীঃ ৩৯৯) আল্লার 'জাৎ' ও 'ছেফাৎ' অর্থাৎ তাঁহার অস্তিত্ব ও গুণাবলী। যে চিন্তা আল্লার অস্তিত্ব ও গুণাবলী লইয়া করিতে হয়, তাহা নিতান্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য।

সাধারণের পক্ষে আল্লার সম্বন্ধে চিন্তা করা শরীয়তে নিষেধ—সাধারণ নরনারী তদ্রূপ চিন্তা করিতে অক্ষম। তাহাদের বুদ্ধি ততদূর উচ্চে উঠিতে পারে না, বা আল্লার অস্তিত্ব বা গুণাবলীর মর্ম্ম ধারণ করিতে পারে না। এই কারণে সাধারণ লোককে আল্লার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে—

টীকা—৩৯৯। মূল গ্রন্থে চিন্তাভূমির প্রত্যেক বিভাগের পৃথক পৃথক বিশদ বর্ণনা করিতে যাইয়া এ স্থলে আল্লার অস্তিত্ব ও গুণাবলী সম্বন্ধীয় চিন্তাকে দ্বিতীয় ময়দান বলিয়া লিখিত আছে। চিন্তাভূমির চারিটী বিভাগের সহিত পূর্ব্বাপর শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য উহাকে এখানে দ্বিতীয় ময়দান না বলিয়া তৃতীয় ময়দান বলিয়া লিখিত হইল।

ফَمَا لَكُمْ أَنْ تَقْدِرُوا قَدْرَهُ

"তাঁহার (আল্লার) কদর (সম্মানিত অবস্থা) জানিতে তোমাদের ক্ষমতা নাই।" পাঠক! মনে করিওনা যে আল্লার গৌরব ও প্রতাপ গুপ্ত আছে বলিয়া লোকে তাঁহার প্রকৃত অবস্থা ও স্বরূপ জানিতে পারে না; বরং তাঁহার প্রতাপের জ্যোতিঃ এতই উজ্জ্বল—আলোক এতই প্রখর যে মানুষের জ্ঞান-চক্ষু তাহা সহ্য করিতে পারে না, এই জন্য তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে মানুষ বেহোশ ও দিশাহারা হইয়া পড়ে। দেখ চামচিকা নামক প্রাণীর দুর্ব্বল চক্ষু, সূর্য্যের প্রখর জ্যোতিঃ সহ্য করিতে পারে না। তজ্জন্য তাহারা উজ্জ্বল দিনমানে কিছুই দেখিতে পাবে না—সন্ধ্যাকালে, সূর্য্য অস্ত গেলে, যে সামান্য একটুকু আলোক অবশিষ্ট থাকে সে সময়ে তাহারা দেখিতে পায়। সাধারণ লোকের জ্ঞান চক্ষু ঐ প্রকার দুর্ব্বল; তাহারা আল্লার অতি প্রকাশ্য প্রখর প্রতাপ ও মনোহর সৌন্দর্য্য অবধারণের ক্ষমতা রাখে না।

আল্লার প্রখর প্রতাপ ও মনোহর সৌন্দর্য্য কেবল সর্ব্বদর্শী পয়গম্বর, ছিদ্দীক এবং ওলী লোক দর্শনের ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারাও সদাসর্ব্বদা দেখিবার ক্ষমতা রাখেন না। সর্ব্বদা আল্লার প্রতাপ দর্শন করিতে গেলে তাঁহাদেরও দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হইতে পারে। এই কারণে আল্লা গুপ্ত অবস্থায় থাকেন—নিজের প্রখর প্রতাপ মানবের সম্মুখ হইতে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। কেবল উক্ত ধরণের মহাপুরুষগণ স্ব স্ব শক্তির তারতম্য অনুসারে, আল্লার অস্তিত্বের প্রখর প্রতাপ-চ্ছটার ঝলক মধ্যে মধ্যে পাইতে পারেন। দেখ, আমরা প্রখর সূর্য্যকে দুই একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পারি বটে কিন্তু সর্ব্বদা সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারিনা—সর্ব্বদা সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকিলে মানুষ অন্ধ হইতে পারে। সেইরূপ, আল্লার অস্তিত্ব লইয়া পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে গেলে মানুষ হতজ্ঞান ও পাগল হইতে পারে।

গুপ্ত অবস্থায় আল্লা থাকেন কেন?

যাহাহউক আল্লার গুণাবলীর মধ্যে কোন গুণের যতটুক আভাষ জ্ঞানী লোকেরা পাইতে পারেন তাহা সাধারণ লোকের সম্মুখে বর্ণনা করা উচিত নহে। তৎসম্বন্ধে নিষেধ আছে। তবে, তাঁহার যে গুণের আভাষ মানুষের মধ্যেও কিছু কিঞ্চিৎ আছে—সেই কথার বর্ণনা করিবার অনুমতি আছে; যথা—আল্লা জ্ঞানময় ইচ্ছাময় অথবা আল্লার আদেশ, নিষেধ, হস্ত, মুখ ইত্যাদি। এরূপ কথা বলিলে, নিজ গুণের সমজাতীয় ভাবিয়া লোকে সাদৃশ্যের সাহায্যে কিছু কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারে।

সাধারণের নিকট আল্লার গুণাবলীর কোনটুকু বলা নিষেধ এবং কোন্‌টুকু বলায় অনুমতি আছে?

যাহাহউক, ইহার উপরও যদি কখনও এ কথা বলা যায় যে—আল্লার কথা মানুষের কথার ন্যায় 'শব্দময়' বা 'অক্ষরে প্রকাশ্য' নহে। তাঁহার বাক্যের মধ্যে ছেদ, বিরাম বা জোড় মিল নাই। তাঁহার বাক্যের মধ্যে অস্পষ্টতা বা ভাঙ্গা কথা নাই, তবে নিশ্চয় সাধারণ লোক উহা বুঝিতে পারিবে না; এবং বুঝিতে না পারিয়া হয়তো অবিশ্বাস করিয়া বসিবে এবং ভাবিতে থাকিবে আমাদের বাক্য শব্দময়—এক শব্দের পর আর একটী শব্দ মিলাইয়া বলিতে হয়। সুতরাং প্রত্যেক শব্দের পর 'ছেদ' 'বিরাম' আছে তবে আল্লার বাক্য কেমন হইল? এইরূপ যদি তুমি একথা মানুষকে শুনাও যে-তোমরা যেমন বর্ত্তমান আছ, আল্লাও তদ্রূপ বর্ত্তমান আছেন কিন্তু তাঁহার "অস্তিত্ব" তোমাদের অস্তিত্বের ন্যায় নহে—তিনি গুণ পদার্থ নন বা গুণাধার পদার্থও নন, তিনি কোন স্থানের মধ্যে নাই বা কোন স্থানের উপরেও নাই; 'দিকের' সঙ্গে তাহার সংস্রব নাই—তিনি, পূর্ব্বে বা পশ্চিমে, উত্তরে বা দক্ষিণে, উপরে কি নীচে কোন দিকেই নাই। জগতের সহিত তিনি যুক্তও নহেন আবার পৃথকও নহেন, জগতের ভিতরেও নাই আবার বাহিরেও নাই। এইরূপ কথা শুনিলে হয়তো লোকে অসম্ভব বলিয়া অবিশ্বাস করিতে পারে। ইহার কারণ এই যে, জানা বস্তুর সাদৃশ্য না ধরিয়া অজানা বস্তু জানিবার উপায় নাই কিন্তু পরিজ্ঞাত বস্তুর সাদৃশ্যে অপরিজ্ঞাত বস্তু বুঝিতে গিয়া মানুষ উভয় বস্তুর প্রত্যেক গুণ গুলি সর্ব্বতোভাবে সমান বুঝিয়া বড় ভুল করে। এই জন্য লোকে আল্লার অস্তিত্বের প্রত্যেক মহৎ ভাগ নিজের অস্তিত্ব সূচক প্রত্যেক তুচ্ছ গুণের সহিত মিলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করে সুতরাং আল্লার অসীম গৌরব ও অনন্ত প্রতাপ বুঝিতে পারে না। লোকে মনুষ্য সমাজে কেবল সম্রাটের গৌরব ও প্রতাপ দেখিতে পায়—সম্রাট উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন আর তাঁহার সম্মুখে দাসগণ করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকে। আল্লার প্রাধান্য ও প্রতাপ বুঝিবার সময়েও উক্ত পরিজ্ঞাত "রাজসভার" প্রত্যেক বিষয় ও পদার্থের সাদৃশ্যে আল্লার সম্বন্ধে ঐ রূপ একটা কল্পনা আঁকিয়া লয় এবং মনে করে নিশ্চয়ই বাদশার ন্যায় আল্লারও হস্ত পদ, চক্ষু কর্ণ মুখ জিহ্বা আছে। যদি না থাকিত তবে আল্লার সম্বন্ধে ক্রটী থাকিত। দেখ, মানুষের ন্যায় মাছি মক্ষিকার বুদ্ধি থাকিলে তাহারাও মনে করিত - অতি নিশ্চয় আমাদের সৃজন কর্ত্তা আল্লার পালক ও শুড় আছে; যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমাদের বল ও

সচ্ছন্দতার হেতু সে সমস্ত আল্লার না থাকা অসম্ভব কথা। যাহাহউক, মানুষও ঐ রূপ প্রত্যেক বিষয় নিজের সঙ্গে তুলনা করিয়া অনুমান করে। এই জন্য আল্লার অস্তিত্ব ও গুণের সম্বন্ধে চিন্তা করা শরীয়তে নিষেধ আছে।

প্রাচীন জ্ঞানী লোকেরা আল্লার অস্তিত্ব ও গুণের সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহারা এ সম্বন্ধে যদি কিছু বলিতেন, তবে এই কথা বলিতেন -আল্লা জগতের ভিতরেও নাই বাহিরেও নাই অথবা তিনি ইহার সঙ্গে মিলিয়াও নাই পৃথক হইয়াও নাই। তাঁহারা কোর্‌আন শরীফে এই কথা বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ "কোন বস্তু তাঁহার সদৃশ নহে আবার তিনিও কোন বস্তুর সদৃশ নহেন।" (২৫ পাবা। সূরা শোরা। ২ রোকু)

আল্লা সম্বন্ধে জ্ঞানীগণ অনুমোদিত বর্ণনার নমুনা—সূক্ষ্ম বর্ণনা জ্ঞানীরা বেদাৎ মনে করেন।

তাঁহারা এই কথাটি মোটা ভাবে বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন—সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে বর্ণনা করিতেন না। তাঁহারা আল্লার অস্তিত্ব ও গুণ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে খুলিয়া বর্ণনা করা বেদাৎ (ক্ষতিকর নব প্রথা) মনে করিতেন। তাঁহাদের এরূপ ব্যবহারের কারণ এইযে অধিকাংশ লোকের বুদ্ধি উহার বিস্তৃত বর্ণনা ও অর্থ ধারণ করিতে অক্ষম। এই কারণে কোন কোন পয়গম্বরের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে "আমার দাসগণের সম্মুখে আমার গুণ ও স্বভাবের পরিচয় খুলিয়া বলিও না; উহা শুনিয়া তাহারা অবিশ্বাস করিতে পারে। সাধারণ লোক যতদূর বুঝিবার শক্তি রাখে তাহাদের সঙ্গে তদ্রূপ কথা বল।"

যাহাহউক, নিতান্ত পরিপক্ক জ্ঞানী লোক ভিন্ন, সাধারণ লোকের পক্ষে আল্লার অস্তিত্ব ও গুণাবলী লইয়া তর্ক-বিতর্ক না করা এবং চিন্তা না করাই ভাল। নিতান্ত পরিপক্ক ও জ্ঞানী লোকও আল্লার অস্তিত্ব ও গুণ লইয়া চিন্তা করিতে গিয়া উদ্‌ভ্রান্ত ও বুদ্ধি হারা হইতে পারেন। এই জন্য আল্লার সৃষ্ট জগত ও তদন্তর্গত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থ, বিস্ময়কর জ্ঞান এবং কৌশল-পূর্ণ কার্য্য-পদ্ধতি দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতাপ ও গৌরব হৃদয়ঙ্গম করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। বিশ্বজগতে যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, তৎসমুদয়, তাঁহার অসীম প্রতাপের একটী আলোক হইতে প্রকাশিত। দেখ, লোক প্রখর প্রতাপ বিশিষ্ট সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অক্ষম হইলেও উহার যে কিরণ, ভূপৃষ্ঠে পরিব্যাপ্ত হইয়া পতিত হয় তাহা দর্শন করিবার ক্ষমতা অবশ্যই আছে।

সাধারণের পক্ষে আল্লা সম্বন্ধে কোন্ চিন্তা অনুচিত ও কোন্ চিন্তা উচিত

ধর্ম্মপথসম্পর্কিত চিন্তার চতুর্থ ময়দান—(টীঃ৪০০) আল্লার সৃষ্ট জগৎ ও তদন্তর্গত বিস্ময়কর ব্যাপার। পাঠক! জানিয়া রাখ এ বিশ্বজগতে যাহা কিছু তৎসমস্তই তাঁহার সৃষ্ট শিল্প পদার্থ। বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থ এমন কি অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ পদার্থ হইতে অতি প্রকাণ্ড বিস্ময়কর পদার্থ সকলেই আল্লার প্রশংসা করিতেছে। আকাশ ও পাতাল তদন্তর্গত প্রত্যেক বালুকা-কণা আপন আপন ভাষায় স্বীয় সৃজন কর্ত্তার প্রশংসা ও পবিত্রতার স্তুতি পাঠ করিতেছে—তাঁহার অপ্রতিহত পূর্ণ শক্তি ও অনন্ত জ্ঞানের বর্ণনা করিতেছে। জগতের যে দিকে দৃষ্টি করিবে সমস্তই আশ্চর্য্য বিস্ময়কর বলিয়া বুঝিতে পারিবে। ঐ সকল বিস্ময়কর পদার্থ এত অসীম যে তৎসমুদয়ের বিস্তৃত বর্ণনা করা যাইতে পারে না। এমন কি, যদি পৃথিবীর সমস্ত জলাশয় ও সমুদ্রের জল, লিখিবার কালী হইত এবং সমস্ত বৃক্ষ গুল্মাদি উদ্ভিদ, কলম হইত এবং সমস্ত প্রাণী, লিখক হইত এবং বহু শতাব্দি ধরিয়া লিখিত, তথাপি আল্লার সৃষ্ট পদার্থ হইতে প্রকাশিত তাঁহার জ্ঞান, কৌশল ও ক্ষমতাদির প্রকৃত অবস্থা অতি সামান্যই লিখিতে পারিত। এই অর্থে আল্লা বলিতেছেন—

আল্লার সৃষ্টি হইতে বোধিত আল্লার অস্তিত্ব ও গুণাবলীর নিদর্শন অফুরন্ত।

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ
الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَ لَوْ جِئْنَا
بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ○

"হে মোহাম্মদ! এই কথা বল যে যদি সমস্ত সমুদ্র-জল লিখিবার কালী হইত তবে আমার প্রভুর অবস্থা বর্ণনা করিয়া শেষ করিবার পূর্ব্বেই সমস্ত সমুদ্র-জল ফুরাইয়া যাইত, এবং যদি সমস্ত সমুদ্র-জল পরিমিত আরও কালী আনা হইত তাহাও ফুরাইয়া যাইত।" (১৬ পারা। সূরা কহফ। ১২ রোকূ)

টীকা—৪০০। মূলগ্রন্থে চিন্তাভূমির প্রত্যেক বিভাগের পৃথক পৃথক বিশদ বর্ণনা করিতে যাইয়া এ স্থলে কেবল আল্লার কৌশলময় কার্য্য পদ্ধতি ও সৃষ্ট পদার্থ লইয়া সর্ব্বসাধারণ সকলেই কিরূপে চিন্তা করিতে পারে কেবল তাহাই বিশেষ ভাবে দেখাইবার মানসে স্বতন্ত্র ভাবে 'চিন্তার তৃতীয় ময়দান' বলিয়া লিখিত আছে। চিন্তাভূমির চারিটী বিভাগের সহিত পূর্ব্বাপর শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য উহাকে এখানে তৃতীয় ময়দান না বলিয়া 'চতুর্থ ময়দান' বলিয়া লিখিত হইল।

পাঠক ! এই কথা প্রথমে বুঝিয়া লও যে সৃষ্ট পদার্থ মোটামুটি দুই প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার পদার্থের সংবাদ আমরা আদৌ পাইতে পারি নাই; সুতরাং তৎসমুদয়ের চিন্তা আমরা কি প্রকারে করিতে পারি ? এই জন্য সৃষ্টি কর্তা আল্লাও বলিয়াছেন—

অজ্ঞাত সৃষ্ট পদার্থ আলোচনা অসম্ভব।

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ

الْاَرْضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ○

"তাঁহার পবিত্রতা (বিঘোষিত হউক) যিনি সমস্ত পদার্থ জোড়া জোড়া সৃজন করিয়াছেন। যাহা পৃথিবী উদ্‌গত করে এবং যাহা তাহাদের জীবনের মধ্য হইতে উৎপন্ন হয় এবং যে পদার্থ তাহারা জানে না (তাহাও জোড়া জোড়া সৃজন করিয়াছেন)।" (২৩ পারা। সূরা ইয়াছীন। ৩ রোকূ)।

আবার যে সকল পদার্থের সংবাদ আমরা পাইতে পারি তাহাও দুই প্রকার। তাহার এক প্রকার আমরা চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখিতে পাই না; যথা—আরশ, কুরছী, ফেরেশতা, দেব দৈত্য, জেন পরী ইত্যাদি। এইরূপ অদৃশ্য পদার্থ লইয়া চিন্তা করিবার ধরণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লেখা নিতান্তই কঠিন কার্য্য। যে সমস্ত পদার্থ আমরা চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সাহায্যে দেখিতে পাই তৎসমুদয় লইয়া কি প্রকারে চিন্তা করিতে হয় তাহারই পন্থা দেখাইয়া আমরা নিরস্ত হইব।

জ্ঞাত অদৃশ্য সৃষ্ট পদার্থ আলোচনা এখানে পরিত্যক্ত

সপ্ত শ্রেণীর দৃশ্যমান পদার্থ আল্লার অসীম গুণাবলীর অন্যতম নিদর্শন বিশেষ—দৃশ্যমান পদার্থ যথা, গগন, চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থ পদার্থ যেমন পাহাড়, পর্ব্বত, অরণ্য, মরুভূমি, সমুদ্র নদ নদী, এবং ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থ, মণি মাণিক্যাদি এবং ভূতলস্থ নানা জাতীয় উদ্‌ভিদ্ লতা এবং জলচর স্থলচর খেচর ইতর জীব জন্তু হইতে বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল মানব পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই চিন্তার বিষয়। মানব সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক ও বিস্ময়কর পদার্থ। এতদ্‌ব্যতীত ভূতল ও গগন মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী মেঘ বৃষ্টি, শিলা, মেঘগর্জ্জন বিদ্যুত, বজ্রপাত, জলধনু, এবং বায়ুপ্রবাহ যাহা কিছু আকাশের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইতেছে ইহাও চিন্তার বিষয়। এইরূপ সমস্ত বিস্ময়কর

দৃশ্যমান পদার্থ অবলম্বনে আল্লার সম্বন্ধে চিন্তা

পদার্থ

পদার্থ আল্লার সৃষ্ট। এইরূপ পদার্থের মধ্যে কতকগুলি লইয়া কিরূপে চিন্তা করিতে হয় তাহার একটী সংক্ষিপ্ত নমুনা দেওয়া হইতেছে। এই সমস্ত পদার্থই আল্লার নিদর্শন, তিনি এই নিদর্শন ও চিহ্ন লইয়া তোমাদিগকে চিন্তা করিতে আদেশ করিয়াছেন—

وكاين من اية في السموت والارض

يمرون عليها وهم عنها معرضون ○

"গগন মধ্যস্থ ও ভূতলস্থ নিদর্শন সমূহের বহুতর নিদর্শন তাহাদের (চক্ষুর) উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে অথচ তাহারা তৎপ্রতি উদাসীন। (১৩ পারা। সূরা ইয়ুছোফ্। ১২ রোকু।) তিনি পুনরায় বলিয়াছেন—

او لم ينظروا في ملكوت السموت و الارض

و ما خلق الله من شيء

"তাহারা কি গগন মণ্ডল ও ভূতলের রাজ্য সমূহের মধ্যে এবং আল্লা যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তৎসমুদয়ের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতেছে না?" (৯ পারা। সূরা এরাফ্। ২৩ রোকু।) তিনি পুনরায় বলিয়াছেন—

ان في خلق السموت و الارض و اختلاف

اليل و النهار لايات لاولي الالباب

"নিশ্চই গগন ও ভূতলের সৃষ্টির মধ্যে এবং দিবা রজনীর পরিবর্ত্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকের জন্য বহু নিদর্শন আছে।" (৪ পারা। সূরা আল এমরান। ২০ রোকু।) যাহাহউক, এইরূপ আরও বহু নিদর্শন আছে। সেই সকল অবলম্বনে চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

আল্লার অসীম গুণাবলীর প্রথম নিদর্শন—যাহা তোমার নিকটবর্ত্তী তাহা বাস্তবিক তুমি নিজেই। বিশ্ব জগতের মধ্যে তোমা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যজনক বিস্ময়কর পদার্থ আর কিছুই নাই। অথচ তুমি নিজের পরিচয় সম্বন্ধে অজ্ঞ রহিয়াছ। স্বয়ং আল্লা বলিতেছেন—

اَوَ لَمْ ...... اَنْعَامُهُمْ وَ اَنْفُسُهُمْ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ ۝

"তাহারা কি দেখিতেছে না যে আমি মৃতবৎ পতিত ভূমিকে জল পান করাইতেছি, সেই জল দ্বারা মাটী হইতে শস্য উৎপন্ন করিতেছি সেই শস্য তাহারা নিজে এবং তাহাদের গৃহপালিত পশু আহার করে; ইহা কি তাহারা দেখিতেছে না?" (২১ পারা। সূরা ছেজ্‌দা। ৩ রোকু) ইহার ভাবার্থ এই যে—হে মানব! তোমরা আল্লার কার্য্য লইয়া চিন্তা কর—তাহা হইতে আল্লার ক্ষমতা ও প্রতাপ তোমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

প্রিয় পাঠক! তুমি প্রথমে নিজের আদিম অবস্থার বিষয় চিন্তা কর—তুমি কোথা হইতে আসিলে? আল্লা তোমাকে এক বিন্দু জল হইতে প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই জল সর্ব্ব প্রথমে পিতার পৃষ্ঠে ও মাতার বক্ষে তোমার জন্মের বীজ স্বরূপ রক্ষিত ছিল। তাহার পর পিতা মাতার উপর কাম ভাবকে উত্তেজনা করিতে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। রমণীর জরায়ুকে (বাচ্চাদানীকে) ক্ষেত্র স্বরূপ এবং পুরুষের পৃষ্ঠস্থিত জলকে বীজ সদৃশ করা হইয়াছে। নরনারীর মনে কাম ভাব, উত্তেজনা ও পীড়ন করিতে লাগিলে পুরুষের পৃষ্ঠ ও রমণীর বক্ষ হইতে শুক্র স্খলিত হইয়া জরায়ু ক্ষেত্রে গিয়া নিপতিত হয়; তখন উভয় শুক্র মিলিত হইয়া نطفة নোৎফা নামে কথিত হয়। উহার সঙ্গে রমণীর ঋতু-রক্ত-বিন্দু মিলিত হইয়া রক্তাকারে জমিয়া গেলে علقة আলকা নাম প্রাপ্ত হয়। পরে ঐ জমাট রক্ত কিছু দিন মধ্যে মাংস পিণ্ডের আকার ধারণ পূর্ব্বক مضغة মোজ্‌গা নামে অভিহিত হয়। পরে তন্মধ্যে জীবন স্থাপিত হয়। এখন দেখ, এক বিন্দু শুভ্র জল অন্য এক বিন্দু লোহিত জলের মিশ্রণ হইতে তোমার জন্য কত বিভিন্ন পদার্থ, যথা—মাংস, চর্ম্ম, রগ, শিরা, স্নায়ু অস্থি প্রস্তুত হইয়াছে। পরে ঐ সমস্ত দ্বারা তোমার দেহ, ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আকার ও ডৌল গঠিত হইয়াছে। মস্তকটী গোলাকার হইয়াছে, হস্ত পদ লম্বা লম্বা করিয়া বানান গিয়াছে। হস্ত পদের প্রান্ত ভাগে পাঁচ পাঁচটী অঙ্গুলী স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখমণ্ডল, জিহ্বা প্রভৃতি অঙ্গগুলি দেহের বহির্ভাগে সাজান হইয়াছে; এবং দেহের অভ্যন্তর ভাগে উদর, পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড,

মানব দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ

রক্তাধার, ফুসফুস, প্লীহা, যকৃৎ, বাচ্চাদানী, মূত্রকোষ ও নাঁড়ীভুঁড়ী সৃজন করা হইয়াছে। প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আকার ও গঠন বিভিন্ন প্রকার, গুণ ও উপযোগিতা পৃথক্ পৃথক্ এবং আয়তনও ভিন্ন মত। তাহার পর ঐ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে নানা বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। অঙ্গুলীর মধ্যে অধিকাংশকে তিন তিন 'পোরে' ভাগ করিয়াছেন, আর কয়েকটী বড় অঙ্গুলীকে দুই 'পোরে' জোড় দিয়া রাখিয়াছেন। মাংস, ত্বক্, রগ, শিরা, স্নায়ু, ও অস্থি যোগে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাজাইয়াছেন।

—চক্ষু গোলক

দেখ, তোমার চক্ষু গোলক, পরিমাণ ও আয়তনে একটী সুপারী অপেক্ষা বৃহৎ নহে, তথাপি তাহাকে ৭ সাতটী পৃথক ভাগে জোড় দিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। (টী:৪০১) প্রত্যেক বিভাগের কার্য্য ও উপযোগিতা পৃথক পৃথক। উহাদের মধ্যে যদি এক ভাগের কিছু মাত্র ক্ষতি হয় তবে পৃথিবীর কোন পদার্থই তোমার চক্ষে দেখা যাইবে না। যাহা হউক কেবল চক্ষুর বিস্ময়কর অবস্থা ও আশ্চর্য্যজনক কার্য্য বর্ণনা করিতে গেলে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিতে হয়।

—অস্থি

যাহাহউক, নিজের অস্থি খণ্ডের প্রতিও মনোযোগ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখ, উহা নিতান্ত কঠিন পদার্থ হইলেও নির্ম্মল তরল জল হইতে বানান হইয়াছে। উহার প্রত্যেক জোড় ও টুক্‌রার আকার, গঠন ও পরিমাণ বিভিন্ন ধরণের—কোন অস্থিখণ্ড গোলাকার,

---

টীকা।—৪০১। দর্শন পুস্তকে প্রথম অনুষ্ঠানে বলা হইয়াছে যে দশটী পরদা বা স্তর সাজাইয়া চক্ষু নির্ম্মিত, এখানে বলা হইতেছে সাতটী অংশ যথা অক্ষিপট, তারকা প্রভৃতি জোড় দিয়া চক্ষু-গোলক নির্ম্মিত। আধুনিক Anatomy বা 'শরীর স্থান' বিদ্যার গ্রন্থে দেখা যায় সাতটী প্রধান অংশে চক্ষু বিভক্ত। যথা—১। চক্ষু-গোলক ২। ভ্রু ৩। চক্ষু পল্লব ৪। পক্ষ্ম ৫। শ্লৈষ্মিক আবরণ বা কনজাংটিভা ৬। কারুণকিউলা ল্যাকিমালিস ৭। ল্যাক্রিমাল বা অশ্রুস্রাবী যন্ত্রাদি। চক্ষুর মণি কোনও পদার্থ নহে উহা শূণ্য স্থান। চক্ষু-গোলকই শ্রেষ্ঠাংশ। ইহা নিম্নলিখিত সাতটী অংশে বিভক্ত। যথা—1. Sclerotic (শুভ্র মণ্ডল) 2. Cornea 3. Choroid 4. Retina 5. Ciliary body, 6. Iris 7. Crystalline lens (জলীয় পদার্থ সহ)। চক্ষু-গোলকের মধ্যে প্রধানতঃ অক্ষিপট বা রেটিনাতেই নিম্নলিখিত দশটী স্তর দেখা যায়। যথা—1. Internal limiting membrane. 2. layer of nerve fibres. 3. Ganglionic layer 4. Inner molecular layer 5. Inner nuclear layer 6. Outer molecular layer 7. Outer nuclear layer 8. External limiting membrane. 9. Jacob's membrane 10. Pigmentary layer. ইহা ব্যতীত Fibre of muller লম্বভাবে প্রথম স্তর হইতে পশ্চাৎবর্ত্তী অষ্টম স্তর পর্য্যন্ত সকল স্তরের মধ্যে থাকিয়া গৃহের স্তম্ভের ন্যায় কার্য্য করে।

কোনটী লম্বা, কোনখানী চৌড়া, কোনটী শূন্যগর্ভ, কোনটী নিরেট কিন্তু সমস্ত অস্থিখণ্ড পরস্পর সংযুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে এবং প্রত্যেকের পরিমাণ, আকার ও গঠনের মধ্যে পৃথক পৃথক কৌশল আছে এমন কি বহু কৌশল ও উদ্দেশ্য নিহিত আছে। অস্থিগুলিকে তোমার দেহ-গৃহের স্তম্ভ বা খুঁটী স্বরূপ প্রস্তুত করিয়া তদুপরি অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের 'বুনিয়াদ' স্থাপন করা হইয়াছে। অস্থিগুলি যদি খণ্ডিত না করিয়া ও পরস্পর জোড় না লাগাইয়া এক টানা ভাবে গোটা প্রস্তুত করা হইত, তবে পিঠ ঝুঁকাইতে ও মস্তক নত করিতে পারা যাইত না। আবার যদি সেইগুলি খণ্ডিত হইত অথচ পরস্পর জোড় লাগান না হইত তবে পিঠ সোজা করিয়া পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়ান যাইত না। এই উভয় অসুবিধা পরিহার জন্য এক খণ্ড অস্থির সঙ্গে অন্য এক খণ্ডের জোড় দেওয়া হইয়াছে। খণ্ড-গুলির এক প্রান্তে ৪ চারিটী গোল বর্ত্তুলাকৃতি দাঁত এবং অন্য প্রান্তে সেই দাঁত 'চুবিয়া' বসিতে পারে এমন ৪ চারিটী গর্ত্তাকৃতি খাঁজ কাটা হইয়াছে। এক খণ্ডের প্রান্তস্থিত বর্ত্তুল অন্য খণ্ডের প্রান্তস্থিত গর্ত্তাকৃতি খাঁজের মধ্যে বেশ 'চুবিয়া' বসে। হেলাইলে বা নত করিলে ঐ অস্থিখণ্ডের এক-প্রান্ত, কনুই প্রান্তের ন্যায় কিঞ্চিৎ বাহির হইয়া পড়ে। যাহা হউক, স্নায়ু-সূত্র, মাংস-পেশী' রগ ও শিরা দ্বারা সেই খণ্ডের জোড়, দৃঢ়ভাবে জুড়িয়া রাখা হইয়াছে, তজ্জন্য একেবারে স্থানচ্যুত হয় না।

—মস্তক

এইরূপ তোমার মস্তকের করোটী ৫৫ পঞ্চান্ন অস্থি খণ্ডের সংযোগে নির্ম্মিত হইয়াছে। (টীঃ ৪০২) ঐ সকল জোড় সূক্ষ্ম সেলাই দ্বারা টাঁকা আছে। এইরূপ জোড় থাকাতে করোটীর এক ভাগে কোন দুঃখ যুক্ত হইলে তাহা অন্য ভাগে প্রবেশ করিতে পারে না—তজ্জন্য অন্য অংশ সকল নিরাপদ থাকে।

টীকা—৪০২। আধুনিক শরীর স্থান বিদ্যার গ্রন্থে দেখা যায় যে, মোট সাতান্নটী সংযোগ প্রয়াসী বিভিন্ন অস্থি ক্রমে ক্রমে জুড়িয়া মানব মস্তকের করোটী গঠিত হইয়াছে তন্মধ্যে ছত্রিশটী অস্থি খণ্ড জুড়িয়া মস্তিষ্কাধার এবং একুশটী জুড়িয়া মুখ মণ্ডল তৈয়ারী হইয়াছে। এক হিসাবে দেখা যায় উপরের চোয়ালের দুই পার্শ্বের সংযোগ-প্রয়াসী অস্থি, চারিটী হিসাবে আটটী ধরা হইয়াছে। সংযোগ প্রয়াসী চারি চারিটী অস্থি জুড়িয়া উপরের চোয়াল তৈয়ারী হয় কি না তৎসম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দ্ধারণ করা কঠিন এবং এ বিষয়ে বিদ্বানগণেরও মতভেদ আছে। অন্যমত অনুসারে ইহার সংখ্যা চারিটী না ধরিয়া তিনটি হিসাবে ধরিলে করোটির মোট সংযোগ প্রয়াসী অস্থি খণ্ডের সংখ্যা (number of ossifying centres of the bones) পঞ্চান্নটি হইয়া থাকে।

দন্ত পাঁতির ব্যবস্থা মনোযোগ দিয়া দেখ। কতকগুলি দাঁতের মাথা বেশ চৌড়া, তাহার উপর খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া চিবান যায়। আর কতকগুলি দাঁতের মাথা ছুরীর ধারের ন্যায় পাতলা। সম্মুখের দন্তের সাহায্যে খাদ্য দ্রব্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড কর্ত্তন করতঃ পার্শ্বস্থ প্রশস্ত-মস্তক দন্তের উপর চর্ব্বনের জন্য স্থাপন করা হয়। ইহা দেখিলে মনে হয় যেন খাদ্য দ্রব্য পিশিবার জন্য জাঁতার উপর দেওয়া হইতেছে।

—দন্ত

তোমাদের গ্রীবা, ৭ সাত খণ্ড অস্থি সহযোগে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এবং তৎসমুদয় শিরা ধমনী ও স্নায়ু-সূত্রে জড়াইয়া মজবুত করিয়া রাখা হইয়াছে। গ্রীবার উপরিভাগে মস্তক স্থাপন করা হইয়াছে। তোমার মেরুদণ্ড বা পৃষ্ঠাস্থি, ২৪ খণ্ড অস্থি টুকরার জোড়ে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে এবং তাহার উপর অংশে গ্রীবা রক্ষিত হইয়াছে। (টীঃ ৪০৩) তাহার পর দেখ, পঞ্জরাস্থি বা বক্ষাবরণের শলাকাগুলি কেমন কৌশলে মেরুদণ্ডের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

—গ্রীবা ও মেরুদণ্ড

এইরূপ আরও বহু অস্থি দয়াময় নির্ম্মাণ করিয়া বিশেষ কৌশলের সহিত সাজাইয়া রাখিয়াছেন। প্রত্যেক অস্থিখণ্ডের উপযোগিতা বর্ণনা বড় বিস্তৃত। ফল কথা, তোমার শরীরমধ্যে ২৪৭ দুই শত সাতচল্লিশ খণ্ড অস্থি আল্লা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। (টীঃ ৪০৪) প্রত্যেক অস্থি টুকরা হইতে বহু উদ্দেশ্য ও কার্য্য সুকৌশলে সাধিত হইতেছে। অস্থিগুলি গোটা না করিয়া খণ্ড খণ্ড করার উদ্দেশ্য এই যে তোমার কার্য্যাবলী সহজে নির্ব্বাহ পাইবে।

মানব দেহের সমগ্র অস্থিখণ্ড

টীকা—৪০৩। আধুনিক শরীর তত্ত্ববিদগণেরও মতে মেরুদণ্ডের দুই অংশ—প্রকৃত এবং অপ্রকৃত। প্রকৃত মেরুদণ্ডের উর্দ্ধাংশে ৭টি গ্রীবাস্থি (cervical vertibra) লইয়া মোট চব্বিশটি পৃষ্ঠাস্থি আছে। গ্রীবাস্থির সর্ব্ব প্রথমটির নাম atlas ও তৎপরবর্ত্তীর নাম axis.

টীকা—৪০৪। ইরাসমাস উইলসন সাহেবের এনাটমি গ্রন্থে সমগ্র মানব দেহের পৃথক পৃথক অস্থির বিবরণ নিম্নলিখিতরূপ দেওয়া আছে—মাথা ৮ কর্ণবিবর ৬ মুখমণ্ডল ১৪ দন্ত ৩২ মেরুদণ্ড (প্রকৃত ২৪ অপ্রকৃত ২) ২৬ পঞ্জরাস্থি ২৫ হস্ত সম্পর্কীয় ৬৪ পদ সম্পর্কীয় ৬২ শিসামায়েড অস্থি ৮ মোট দুই শত সাতচল্লিশটি। এখানে অপ্রকৃত মেরুদণ্ড বলিয়া যে দুই অস্থির হিসাব আছে তাহার একটির নাম Sacrum কাহারও Sacrum অস্থি প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত দুইটি পৃথক অংশে বিভক্ত থাকে—পরে জুড়িয়া যায়। মেরুদণ্ডের সর্ব্ব নিম্নাংশে কাহারও আবার অতিরিক্ত একটি অস্থি দেখা যায়। ৬০ বা তদূর্দ্ধ বয়সে কাহারও অপ্রকৃত মেরুদণ্ডের দুই অংশই জুড়িয়া এক হইয়া পড়ে। কাহারও আবার পঞ্জরাস্থি একটি অতিরিক্ত পাওয়া যায়। এই সব কারণে মানব দেহের সমগ্র অস্থিখণ্ড ২৪৭ বলিয়া ধরা বর্ত্তমান যুগের হিসাবেও অসঙ্গত নহে।

যাহা হউক এই সমস্তই, এক বিন্দু ঘৃণিত জল হইতে সৃজন করা হইয়াছে। যেহেতু ঐ অস্থি গুলির মধ্যে একখানির অভাব হইলে কোন কর্ম্ম করিতে পারিতে না। আবার এক খণ্ড অধিক হইলে তুমি কষ্টে পড়িতে।

যাহা হউক, তোমার অস্থিখণ্ড ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আড়ষ্ট ও অচল না হইয়া সঞ্চলনশীল হওয়া তোমার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। তজ্জন্য তোমার অস্থি বা অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জোড়ে ৫২৭ পাঁচশত সাতাইশ খানি عضلة আজালা স্থাপন করা হইয়াছে। (টীঃ ৪০৫) প্রত্যেক 'আজলা'র গঠন মৎস্যাকৃতি—মধ্যভাগ চৌড়া ও স্ফীত, প্রান্তের দিকে ক্রমশঃ পাৎলা ও অপ্রশস্ত। উহাদের আয়তন ও গঠন নানা প্রকার—কতকগুলি ক্ষুদ্র ও কতকগুলি বৃহৎ। সমস্ত 'আজালা' সূত্রময় মাংস খণ্ড। (টীঃ ৪০৬) তৎসমুদয় স্নায়ু-সূত্র ও পর্দ্দা দ্বারা প্রত্যেক জোড়ে ও অঙ্গে মজবুৎ ভাবে জড়িত ও আবদ্ধ হইয়া আছে। পর্দ্দা যেন উহাদের চাদর। উহাদের মধ্যে ২৪ চব্বিশ খান আজলা কেবল চক্ষু-গোলকের আশে পাশে স্থাপিত আছে। (টীঃ ৪০৭)

মানবদেহে অস্থির সহিত সংযুক্ত সমগ্র মাংসপেশী

টীকা—৪০৫। মানব দেহের অস্থির সহিত কতকগুলি পেশী সংযুক্ত আর কতক পেশী সংযুক্ত নহে। অস্থির সহিত সংযুক্ত সব পেশীগুলি (voluntary) পর্য্যায়ভুক্ত এবং ইহাদেরই সংখ্যা ইমাম সাহেব ৫২৭টী লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। আধুনিক 'শরীর স্থান' বিদ্যার গ্রন্থে অস্থির সহিত সংযুক্ত মাংসপেশীগুলির সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ পাওয়া যায়—কর্ণসহ মস্তক ৮৫ গ্রীবাদেশ ৭৪ পৃষ্ঠদেশ ৫৪ বক্ষদেশ ৬৪ উদর ১৬ উদর নিম্নাংশ দেশ ১২ হস্ত সম্পর্কীয় ১০৬ পদসম্পর্কীয় ১১৬ মোট পাঁচশত সাতাইস। এই হিসাব ধরিতে মাথা ও ললাটের একটী পেশী, নাসিকা সম্পর্কীয় একটী পেশী, মুখ সংক্রান্ত একটি পেশী, উদর সম্বন্ধীয় দুইটী পেশী, এবং উদর নিম্নদেশ সম্পর্কীয় চারিটী পেশীকে একক শ্রেণীর পেশী ধরা হইয়াছে। অবশিষ্ট পেশীগুলি শরীরের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া জোড়া জোড়া গণনা করা হইয়াছে। পেশীগুলির অবস্থিতি ও গঠন বিশিষ্টতার তারতম্যানুসারে ইহাদের মোট সংখ্যা নির্দ্ধারণে বিদ্বানগণের মধ্যে সামান্য মতভেদ পরিলক্ষিত হইতে পারে। কেননা, অস্থিখণ্ডগুলির পরস্পর পার্থক্য যেরূপ সুস্পষ্ট, পেশীগুলি স্তরে স্তরে মিলিত বলিয়া ইহাদের পার্থক্য অনেকস্থলে তদ্রূপ সুস্পষ্ট নহে।

টীকা—৪০৬। 'আজালা' শব্দটী "শরীরস্থান" বিদ্যার কথা। উহাকে বাংলায় 'মাংশপেশী' ও ইংরাজীতে Muscle (মাসল) বলে। ইহা দুই জোড়ের মধ্যে, দুই বিভাগের মধ্যে, স্থূল অঙ্গে এমন কি শরীরের সর্ব্বত্র নানা আকারে আছে। স্থানের প্রকৃতি ভেদে উহার আকার গঠন ও উপাদানের পার্থক্য ঘটে। কলকব্জায় যেমন চর্ব্বি মাখাইয়া দিতে হয় জোড়ে এবং সূত্রময় পেশীর মধ্যেও তদ্রূপ চর্ব্বি সিঞ্চন আবশ্যক হয়। সিঞ্চিত চর্ব্বি অধিক পরিমাণে পেশীর মধ্যে বাধিয়া গেলে শরীর মোটা হয়।

টীকা—৪০৭। আধুনিক 'শরীরস্থান' বিদ্যার গ্রন্থে দেখা যায় যে, উভয় চক্ষু ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ভ্রু আদি সঞ্চালন করিতে, চক্ষু কোটরের বহিঃপ্রান্তে ও, চক্ষুর অভ্যন্তরে

উদ্দেশ্য এই যে উহাদের সাহায্যে চক্ষু-গোলক, পাতা ও ভ্রূ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে পারে। অন্যান্যগুলির সম্বন্ধেও এইরূপ বিবেচনা করিয়া বুঝ। পেশী সমূহের উপযোগিতা ও কার্য্য প্রণালীর বিবরণও বহু বিস্তৃত।

অতঃপর দেখ—তোমাদের দেহ মধ্যে ৩ তিনটী 'হাওজ' স্থাপিত আছে। তথা হইতে নালী প্রণালী বাহির করিয়া সমস্ত শরীরে বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। প্রথম 'হাওজ'—মস্তিষ্ক। উহা হইতে স্নায়ুসূত্রগুলি নালী প্রণালীর ন্যায় বাহির হইয়া সমস্ত দেহে জালের ন্যায় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। স্পর্শ-শক্তি ও নড়ন চড়নের ইচ্ছা, মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইয়া ঐ স্নায়ু-পথে দেহময় প্রবাহিত হয়। মস্তিষ্কের 'হাওজ' হইতে আর এক গাছা মোটা স্নায়ু-সূত্র নদীর ন্যায় বাহির হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত আছে, এবং মেরুদণ্ডের প্রত্যেক জোড় হইতে তাহার শাখ প্রশাখা বাহির হইয়া দেহময় ব্যাপিয়া আছে। এরূপ বিধানের উদ্দেশ্য এই যে কোন অঙ্গের স্নায়ুজাল মস্তিষ্ক হইতে দূরে না পড়ে। মগজ হইতে দূরে পড়িলে স্নায়ু-সূত্রগুলি শুষ্ক হইয়া নষ্ট হইতে পারে। দ্বিতীয় 'হাওজ'—রক্তাধার। এ স্থান হইতে রগ ও ধমনী সকল বাহির হইয়া শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এবং তৎসমুদয়ের ভিতর দিয়া শরীর-পোষক রক্ত, শরীরের সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইতেছে। তৃতীয় 'হাওজ'—'দেল'। ইহা হইতে বহু রগ ও শিরা বাহির হইয়া সমস্ত শরীর পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এবং জীবনী-শক্তি, 'দেল' হইতে বাহির হইয়া সেই পথে সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে।

দেহমধ্যস্থ তিনটী শক্তিকেন্দ্র—মস্তিষ্ক, রক্তাধার ও দেল

যাহা হউক, পাঠক! তুমি নিজের এক একটী অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ লইয়া চিন্তা কর সৃষ্টিকর্ত্তা কেন, কি অভিপ্রায়ে উহা সৃষ্টি করিয়াছেন। চক্ষু গোলকটী যেরূপ সৌন্দর্য্য ও উপযোগিতার সহিত সপ্ত অংশে নির্ম্মাণ করিয়াছেন তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই। চক্ষুকে ধুলা কুটা হইতে রক্ষার জন্য পাতা, ঢাকনী স্বরূপ আল্লা সৃজন করিয়াছেন। সেই পাতার প্রান্ত-ভাগে পক্ষ্ম নামক

—চক্ষু

১৪, নাসিকামূলে ১, ললাটে ১ এবং চক্ষুর বাহির কোণের নিকটে মিলিত চোয়ালের পেশী ২ মোট চব্বিশটী মাংসপেশী সাহায্য করিয়া থাকে। ললাট ও নাসিকামূলের পেশী যেমন চক্ষু পল্লবকে নিয়ন্ত্রিত করে তেমনি চোয়ালের পেশী সঞ্চালিত হইলেই চক্ষুর নীচের পাতাও সঞ্চালিত হয়।

কতকগুলি লোম অতি চমৎকার ব্যবস্থায় সাজাইয়া রাখিয়াছেন। পক্ষ্মগুলি সরল ও কৃষ্ণবর্ণ করাতে, এক দিকে চক্ষুর শোভা-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, অন্য পক্ষে দৃষ্টি শক্তির তেজ বৃদ্ধি হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সেই লোম গুলি চক্ষুর মধ্যে ধুলা কুটা পড়িতে দেয় না। ঊর্দ্ধ হইতে ধুলা কুটা পড়িতে গেলে ঐ লোমে আটকিয়া যায়। নীচের পাতার উপর ধুলা জমিলে উপরিস্থ লোম গুলি ঝাড়ুর ন্যায় কার্য্য করিয়া তাহা মুছিয়া ফেলে। আবার পক্ষ্মগুলি কিছু ফাঁক ফাঁক করিয়া সাজান হইয়াছে বলিয়া দর্শনেরও ব্যাঘাত হয় না। এ সমস্তই তাঁহার আশ্চর্য্য কৌশল ও শিল্প নৈপুণ্য। এতদপেক্ষা অত্যাশ্চর্য্য কারিগরী ও বিস্ময়কর হেকমৎ এই যে চক্ষুর পুত্তলী একটী মসুরদানার তুল্য হইলেও অসীম আকাশ ও বিশাল ভূতলের প্রকাণ্ড ছবি ধারণ করিবার ক্ষমতা রাখে। এই যে প্রকাণ্ড আকাশ এত উচ্চে ও এত দূরে অবস্থিত আছে, তথাপি চক্ষু খুলিবা মাত্র উহার বিশাল ছবি তোমার এই ক্ষুদ্র চক্ষু পুত্তলীর মধ্যে আসিয়া পড়ে। চাক্ষুষ দর্শনের বিচিত্র ব্যবস্থা ও দর্পণের মধ্যে দর্শনের আশ্চর্য্য অবস্থা এবং তৎসম্পর্কিত বাস্তব ও অবাস্তব আকৃতি দর্শনের কারণ বর্ণনা করিতে গেলে প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিতে হয়।

অতঃপর কর্ণের সম্বন্ধে চিন্তা কর। উহার সঙ্গেও অনন্ত কৌশল বিজড়িত আছে। কর্ণের সম্বন্ধে দুই চারিটী সামান্য বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ, তাহার সঙ্গেও কেমন আশ্চর্য্য জ্ঞানের ব্যবস্থা আছে।

—কর্ণ

সৃষ্টিকর্ত্তা কর্ণের দ্বারে এক প্রকার কটু ও বিস্বাদ ময়লা সঞ্চিত থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে সেই বিস্বাদ ময়লার গন্ধে কোন কীট, কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে পারে না। কানের ছিদ্র শামুকের ন্যায় পেচাল করাতে শব্দ সকল উহার মধ্যে প্রতিহত হইয়া গাঢ় ও বর্দ্ধিত হয়। এবং উচ্চভাবে কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে। উহা পেচাল করিবার অন্য উদ্দেশ্যও আছে। যখন তোমরা নিদ্রা যাও, তখন পিপীলিকা তোমার অজ্ঞাতসারে কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলে তাহার পথ পেচাল হওয়াতে তাহাকে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হয় সুতরাং সময়ও অধিক লাগে, ইতিমধ্যে তুমি জাগিয়া উঠিতে ও প্রতিবিধান করিতে অবসর পাইবে— এই উদ্দেশ্যেও কর্ণের ছিদ্র পেচাল করা হইয়াছে।

এইরূপ স্থায়ী মুখ, নাক ইত্যাদি অঙ্গের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে গেলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইতে পারে। যাহা হউক, উপরে অতি সংক্ষিপ্ত

ভাবে

ভাবে যাহা কিছু লিখা গেল তাহাতে তোমরা চিন্তা করিবার পথ পাইবে এবং এই ধরণে প্রত্যেক অঙ্গ লইয়া চিন্তা করিতে শিখিলে—সেই অঙ্গটী আল্লা কি উদ্দেশ্যে দিয়াছেন, তাহার নির্ম্মাণে তাঁহার কি পরিমাণ শিল্পচাতুর্য্য, প্রতাপ, দয়া, করুণা, জ্ঞান ও ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও ক্রমে ক্রমে তোমার সম্মুখে প্রকাশ হইতে থাকিবে। তোমার মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, অসংখ্য আশ্চর্য্য ও বিস্ময়কর ব্যাপার বিদ্যমান আছে।

দেহের আভ্যন্তরিক ব্যাপারগুলি আরও আশ্চর্য্যজনক। মস্তিষ্কের অন্তর্গত জ্ঞান-ভাণ্ডার ও অনুভব শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার। বক্ষাভ্যন্তরস্থ রক্তাধার ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কারখানা এবং উদরের মধ্যস্থ কার্য্যাবলী অসম্ভব চমৎকারজনক। সৃষ্টিকর্ত্তা উদর মধ্যস্থ পাকস্থলীকে দেগচীর ন্যায় করিয়াছেন। জলন্ত চুল্লির উপর স্থাপিত দেগের ন্যায় পাকস্থলী তেজপ্রভাবে সর্ব্বদা 'বলক' খাইতেছে। খাদ্য দ্রব্য উহার মধ্যে পড়িবামাত্র পরিপাক হইয়া যায়। সেই পরিপক্ক অন্ন রক্তাধারে গিয়া রক্তের আকার ধারণ করে। তথা হইতে পিত্তকোষের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার কালে উহার অন্তর্গত ফেণবৎ অংশ যাহাকে পিত্ত বলে তাহা ছাঁকা হইয়া যায়। আর রক্তের 'গাদ' বা তলছাঁট প্লীহা নামক যন্ত্রে চুষিয়া ও ছাঁকিয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। রক্তের গাদ ছাঁকা না হইলে উহা রক্তের সঙ্গে প্রবাহিত হইয়া মস্তিষ্কে গেলে বায়ুরোগ জন্মিতে পারে। রক্ত মধ্যস্থ অতিরিক্ত জলীয় ভাগ যকৃৎ নামক যন্ত্রে টানিয়া লইয়া মূত্রাধারের দিকে প্রেরণ করে। এইরূপ স্ত্রীলোকের বাচ্চাদানী ও সন্তানোৎপাদক যন্ত্রগুলিও বিশেষ বিস্ময়কর ব্যাপার। তাহার পর শরীরের বহির্ভাগস্থ ইন্দ্রিয় এবং অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদির শক্তি, যথা—দর্শন' শ্রবণ, বুদ্ধি, জ্ঞান ইত্যাদি যাহা আল্লা দয়া করিয়া মানবকে দিয়াছেন তৎসমুদয়ও বিস্ময়কর ব্যাপার।

একবিন্দু জল পৃষ্ঠে বিশ্ব শিল্পীর বিস্ময়কর চিত্র—মানবদেহ। ইহা আশ্চর্য্য কৌশলের সমষ্টি

প্রিয় পাঠক! দেখ—কোন চিত্রকর প্রাচীর পৃষ্ঠে একটী সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিলে তুমি তাহার দক্ষতার প্রশংসা করিতে থাক কিন্তু বিশ্বশিল্পী যে এক বিন্দু জলের পৃষ্ঠে ও অভ্যন্তরে এই যে বিস্ময়কর চিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। এবং তাহার সঙ্গে কত আশ্চর্য্য ক্ষমতা দিয়াছেন তাহা তোমরা দেখিতেছ না। উহা প্রস্তুত করিবার সময়ে বিশ্বশিল্পীর তুলি, কলম বা

হস্ত কিছুই দেখা যায় না ; এমন বিস্ময়কর প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তোমরা বিস্মিত হইতেছ না ! অথবা সেই মহা শিল্পির অপ্রতিহত ক্ষমতা, পূর্ণ-জ্ঞান অনুধাবন করিতে গিয়া তোমরা আত্মহারা হইতেছ না ! অথবা এমন দয়ালু সৃষ্টিকর্ত্তার প্রত্যেক শিল্পের মধ্যে অনন্ত করুণা ও অসীম ভালবাসা বুঝিতে পারিতেছ না এবং তজ্জন্য ভক্তি-গদ-গদ-চিত্তে ধন্যবাদ দিতেছ না !

যখন তুমি মাতৃগর্ভে খাদ্যের অভাবগ্রস্ত ছিলে তখন কেমন সদয় ব্যবস্থায় তোমার ক্ষুধা-নিবৃত্তি ও দেহ পোষণ করিয়াছেন ভাবিয়া দেখ। তখন তোমার আহার, মুখ দিয়া দিবার ব্যবস্থা থাকিলে হয়তো তুমি মুখ মেলিবা মাত্র মাতার ঋতু-রক্ত অতিরিক্ত পরি- পরিমাণে তোমার মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তখনই তোমার বিনাশ সাধন করিত। এই কারণে নাভী-পথে তোমাকে আহার দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যখন তুমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলে তখন নাভী-পথে আহার দানের ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দিয়া মুখ খুলিয়া দিয়াছিলেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে মাতা স্বয়ং দেখিয়া শুনিয়া পরিমাণ মত আহার দিতে ও খাওয়াইতে পারিবেন এই কারণে নাভী-পথে, রক্ত প্রেরণের নিয়ম বন্ধ করিয়াছিলেন। আবার দেখ, অতি শৈশবে তোমার শরীর নিতান্ত কোমল ও দুর্ব্বল ছিল বলিয়া কঠিন খাদ্য, ভোজন বা পরিপাক করিবার শক্তি তোমার ছিল না, তজ্জন্য তখন তরল ও লঘু মাতৃ দুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং বহু পূর্ব্ব হইতে মাতৃবক্ষে দুগ্ধ-ভাণ্ডার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। জন্মের পূর্ব্বেই সেই ভাণ্ডারে দুগ্ধ সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন, মাতৃ স্তনের বোঁটার আয়তন তোমার মুখের আয়ত্ব হইতে পারে এমন করিয়া সৃজন করিয়াছেন এবং তাহা হইতে অল্প অল্প দুগ্ধ ক্ষরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অধিক পরিমাণে দুগ্ধ তোমার মুখে ঢালিয়া পড়িলে অনিষ্ট হইত। সেই অনিষ্ট নিবারণের জন্যই ঐ ব্যবস্থা। তাহার পর দেখ, মাতার বক্ষস্থলে এক স্বাভাবিক শক্তি বসাইয়া রাখিয়াছেন সে শক্তি ধোপার ন্যায় কাজ করে। মাতার স্তনে যে লোহিত বর্ণের রক্ত আসে তাহাকে ঐ শক্তি ধুইয়া শুভ্রদুগ্ধে পরিণত করিয়া দেয়। সেই দুগ্ধ রক্ত অপেক্ষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও লঘুপাক করিয়া তোমার মুখে দেয়। তাহার পর দেখ, বাৎসল্যভাবকে তোমার মাতার হৃদয়ে দণ্ডধারী প্রহরীর ন্যায় লাগাইয়া রাখেন। তুমি ক্ষুধিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলে তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়েন। আবার দেখ, মাতৃদুগ্ধ পানের সময়ে দন্তের প্রয়োজন হয়

ভ্রূণ ও শিশুদের পোষণের সদয় কৌশল।

না; এই জন্য অতি শৈশবে দাঁত দেন নাই। সে সময়ে তোমার মুখে দন্ত দিলে হয় তো তুমি দন্তাঘাতে মাতার স্তন ক্ষত বিক্ষত করিতে পারিতে; তৎ প্রতিবিধানের নিমিত্ত শৈশবে দাঁত দেন নাই। যখন শক্ত দ্রব্য খাইবার শক্তি জন্মিয়াছিল তখন শক্তির অনুযায়ী দাঁত দিয়াছিলেন। সেই শক্ত দাঁতে তুমি শক্ত দ্রব্য কামড়াইয়া ও চিবাইয়া খাইতে সক্ষম হইয়াছিলে।

যে ব্যক্তি এই সকল শিল্প-কার্য্য ও সৃষ্ট-পদার্থ দেখিয়া, নির্ম্মাণ-কর্ত্তার প্রাধান্য ও অপ্রতিহত ক্ষমতা চিন্তনে হতবুদ্ধি না হয় এবং তাঁহার পূর্ণ অনুগ্রহ ও দয়া স্মরণে বিস্মিত না হয় এবং তাঁহার মনোহর সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ না হয়, সে ব্যক্তি বাস্তবিকই অন্ধ। তাহাকে নরাকৃতি পশু বলা যায়—সে নিতান্ত বিমূঢ়। এইরূপ পদার্থ লইয়া যে ব্যক্তি চিন্তা করিতে জানে না, এবং নিজের শরীরের খবরও রাখে না, বিশেষতঃ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান পদার্থ যে বুদ্ধি, তাহাও অবহেলায় নষ্ট করে, সে বাস্তবিক পশু। সে এই মাত্র জানে যে ক্ষুধা লাগিলে আহার করিতে হয়—ক্রোধ হইলে শত্রুর সহিত ঝগড়া বা মারামারি করিতে হয়; কিন্তু আল্লার পরিচয়-রূপ-উদ্যান-ভ্রমণ-সুখ হইতে সে পশুর ন্যায় বঞ্চিত থাকে। যাহা হউক, মানুষকে সাবধান ও সচেতন করিবার জন্য চিন্তা করিবার যতটুকু পন্থা দেখান গেল তাহাই বুদ্ধিমানের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু যাহা বলা গেল তাহা তোমার দেহের আশ্চর্য্য পদার্থের লক্ষ ভাগের এক ভাগও নহে। উপরে যে সকল বিস্ময়কর ব্যাপারের উল্লেখ করা গেল তাহা ক্ষুদ্র মশক হইতে বৃহৎ হস্তী পর্য্যন্ত সকল গুলির মধ্যেও দেখা যায়। (মানবের অবস্থা তো সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর।) এইরূপ সর্ব্বসাধারণ প্রাণী-সম্পর্কিত বিস্ময়কর ব্যাপারও এত বিস্তৃত যে বর্ণনা করা কঠিন।

আল্লার অসীম গুণাবলীর দ্বিতীয় নিদর্শন—পৃথিবী এবং তদুপরিস্থিত ও তদন্তর্গত পদার্থ। প্রিয় পাঠক! নিজ দেহ-সংক্রান্ত বিস্ময়কর পদার্থের চিন্তা সমাপ্ত করিয়া যদি চিন্তা রাজ্যে অধিক অগ্রসর হইতে চাও তবে পৃথিবীর চিন্তনে প্রবৃত্ত হও। মহাপ্রভু কেমন কৌশলে ইহাকে তোমার শয্যা স্বরূপ বিছাইয়া রাখিয়াছেন। পৃথিবীকে এমন প্রশস্ত করিয়াছেন যে তুমি কখনই উহার সীমায় উপস্থিত হইতে পারিবে না। ভূপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে আল্লা পাহাড় পর্ব্বত-গাড়িয়া দিয়াছেন তাহাতে ভূপৃষ্ঠ শক্ত হইয়াছে। (টীঃ৪০৮)

—ভূপৃষ্ঠ

টীকা—৪০৮। প্রাকৃতিক ভূবিদ্যা-শাস্ত্র বলে—পূর্ব্বকালে পৃথিবী তেজের প্রভাবে তরল অবস্থায় ছিল। সেই তেজ বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ করিলে পৃথিবী ক্রমে ক্রমে

সেই মহা-কৌশলী কঠিন প্রস্তরের চাপের মধ্য হইতে জল অল্পে অল্পে—ধীরে ধীরে নির্গত করিতেছেন; প্রস্তরের গুরুতর চাপে, জলের গতি আবদ্ধ না হইলে, জল একেবারে বাহির হইয়া সমস্ত সমতল-ক্ষেত্র ডুবাইয়া দিত। শস্য ও উদ্‌ভিদের পক্ষে অল্প শুষ্কতার পর, জল-সেচন হিতকর। সে স্থলে একেবারে জলে ডুবিয়া গেলে উদ্‌ভিদ বংশ বিনাশ পাইত। অতঃপর, বসন্ত ঋতুর সম্বন্ধে চিন্তা কর। দারুণ শীতের প্রভাবে মৃত্তিকা মরিয়া জমাট বান্ধিয়া যায়; পরে বসন্তের বৃষ্টিপাত পাইবামাত্র সেই মরা মাটী তৃণ-শস্যে কেমন সুন্দর সজীব হইয়া উঠে। নানা বর্ণের ফল পুষ্পের সৌন্দর্য্যে ভূপৃষ্ঠ সপ্ত বর্ণের 'এৎলাস' নামক রেশমী বস্ত্রের শোভা ধারণ করে। সপ্ত বর্ণ কি কথা, তখন ভূপৃষ্ঠ হাজার বর্ণ প্রাপ্ত হয়। (টীঃ ৪০৯)

উদ্‌ভিদ রক্ষার সময় কৌশল

শীতল হইয়াছিল। কালক্রমে পৃথিবীর পৃষ্ঠ শীতল হইয়া কঠিন প্রস্তরবৎ স্তরে আচ্ছাদিত হইয়াছিল, কিন্তু অভ্যন্তর ভাগ অদ্যাবধি তেজাধিক্যে তরল অবস্থাতেই আছে। পৃষ্ঠভাগকে ভূপঞ্জর এবং অভ্যন্তরস্থ অংশকে ভূগর্ভ বলে। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন নৈসর্গিক নিয়মে, ভূগর্ভ তেজ বিকীর্ণ করতঃ সঙ্কুচিত ও ভূপঞ্জর সঙ্কোচিত হইতেছে; তৎপ্রভাবে পৃষ্ঠের প্রস্তরস্তর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কোথাও উচ্চ, কোথাও নিম্ন হইতেছে। কাল ক্রমে ভূপৃষ্ঠের তেজ আরও অধিক হ্রাস পাইলে ভূপৃষ্ঠের চতুর্দ্দিকে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যে জলীয় অংশ তেজ-প্রভাবে বাষ্পাকারে ছিল। তাহা জলের আকারে ভূপৃষ্ঠে বর্ষিত হয়। ইহাতে জলগুলি স্বাভাবিক নিয়মে নিম্নভূভাগে সঞ্চিত হইয়া সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়াছে। ভূপৃষ্ঠের যে অংশ অতীব উচ্চ তাহা পাহাড় পর্ব্বত বলিয়া অভিহিত হইতেছে এবং যে ভাগ তত উচ্চ নহে অথচ সমুদ্র-গর্ভ অপেক্ষা কিছু অধিক উচ্চ তাহা সমতল-ক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। যাহা হউক বায়ুমণ্ডলের অন্তর্গত জলীয় বাষ্প বৃষ্টি রূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলে তাহা আবার তেজ-প্রভাবে বাষ্পাকারে আকাশে উত্থিত হয় এবং পুনরায় বৃষ্টিরূপে ভূতলে পতিত হয়—এই চক্রাবৎ পরিবর্ত্তনে ভূপৃষ্ঠ ভাঙ্গাচুরা প্রস্তরস্তর জলের ঘর্ষণ, বায়ুর তাড়নে, সূর্য্যের উত্তাপে ঘর্ষিত, ধৌত, বিশ্লিষ্ট হইয়া বালি ও কর্দ্দমে পরিণত হইতেছে এবং তৎসমুদয় পর্ব্বত-পার্শ্বে সমতল ভূভাগে ও ভূগর্ভে শিলাখণ্ডের পর স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়া ভূপঞ্জরের পৃষ্ঠে মৃত্তিকাবরণের সৃষ্টি করিয়াছে। যেরূপ নারিকেল ফলের অভ্যন্তরে জল তদুপরি শক্ত খোলা, এবং উপরস্থ পৃষ্ঠদেশে নরম ছোবড়া থাকে, পৃথিবীর অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। যাহাহউক পাহাড় পর্ব্বত হউক, সমতল-ভূমিই হউক বা সমুদ্র গর্ভই হউক, সকলের নিম্নতল কঠিন প্রস্তরের বুনিয়াদের উপর স্থাপিত—এই কারণে কোন অংশ ধসিয়া খসিয়া যাইতে পারিতেছে না। ভূপঞ্জরের যে প্রস্তরস্তর উচ্চ হইয়া পর্ব্বত আকারে দাঁড়াইয়াছে তাহাকে সামান্য দৃষ্টিতে মেখ বা খুঁটির ন্যায় প্রোথিত বোধ হয় কিন্তু বাস্তবিক ইহারা প্রস্তর বুনিয়াদ হইতে উর্দ্ধে মাথা তুলিয়া আছে।

টীকা—৪০৯। "শীত কালে মাটী মরিয়া জমাট হয়, বসন্তের বৃষ্টিপাতে তৃণ শস্যাদি উদ্‌ভিদ জন্মিয়া পৃথিবীকে জীবিত করে" এই কথাগুলি আমাদের বঙ্গদেশীয় লোক ভাল বুঝিতে পারিবেন না। পারস্য আফগানিস্থান প্রভৃতি পর্ব্বতময় দেশে শীত কালে

সেই বসন্তকালে যে সকল উদ্‌ভিদ্ উৎপন্ন হয় তাহা লইয়া চিন্তা কর। উদ্‌ভিদ্ নানা শ্রেণীর। তাহার মধ্যে কাহারও ফুল ফুটিতেছে, কাহারও শাখায় কলিকা দুলিতেছে, ফুলের মধ্যে কেহ প্রস্ফুটিত হইয়াছে; কেহ অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত ভাবে ঘোমটা খুলিতেছে। তাহাদের আকার ও বর্ণ পৃথক পৃথক—গুণও বিভিন্ন প্রকার।

উদ্‌ভিদের বিচিত্রতা ও বিশেষত্ব

একটী অপেক্ষা অন্যটী উৎকৃষ্ট—কেহ বর্ণে উৎকৃষ্ট, কেহ গন্ধে শ্রেষ্ঠ, কেহ বা কমনীয়তায় প্রশংসনীয়। তাহার পর ফল, মেওয়া ও তৎ তৎ বৃক্ষ সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখ—তাহাদের সৌন্দর্য্য, আস্বাদ, গন্ধ, গুণ ও উপযোগিতার বিষয় চিন্তা কর। পুনরায় দেখ, হাজার হাজার গুল্ম লতা ভূপৃষ্ঠে জন্মিতেছে, তাহাদের অধিকাংশের নাম ও চিহ্ন পর্য্যন্ত তুমি কিছুই অবগত নহ। সেই সমস্ত অপরিজ্ঞাত গুল্ম লতার মধ্যে বিশ্বপতি অতি দুর্লভ গুণ ও উপযোগিতা স্থাপন করিয়াছেন। যে গুলি তুমি জান তাহার মধ্যে কেহ কটু, কেহ মিষ্ট, কোনটী অম্ল, কাহার প্রভাব এমন যে মানুষের রোগ উৎপন্ন করে, আবার কাহার উপকারিতা এরূপ যে রোগ দূর করিয়া, স্বাস্থ্য প্রদান করে। কোন ভৈষজ্য প্রাণ রক্ষা করে আবার কোনটী জীবন-সংহারক বিষ। কেহ পিত্ত বৃদ্ধি করে; কেহ উহার প্রাবল্য উপশম করে। কোনটী শরীরস্থ রক্ত হইতে বায়ু রোগ নির্গত করিয়া দেয়। কোনটী সেই উন্মাদ রোগ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কোনটী গরম, কোনটী শীতল, কোন গাছ গাছড়া মস্তিষ্কের শুষ্কতা বৃদ্ধি করে, কোনটী আর্দ্রতা আনয়ন করে। কোন ভৈষয্যে নিদ্রা বৃদ্ধি করে কোনটীতে নিদ্রা বিদূরিত হয়। কোন উদ্‌ভিদে মনের প্রসন্নতা জন্মায়; কোনটীতে বিমর্ষতা ও দুঃখ উৎপন্ন হয়। কোন উদ্‌ভিদ মানুষের খাদ্য; কোনটী পশুর 'চারা' এবং কোনটী বা পক্ষীর আহার। প্রিয় পাঠক! অবশ্যই বুঝিয়াছ, জগতে লক্ষ লক্ষ উদ্‌ভিদ্ আছে। তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে বহু গুণ ও উপযোগিতা বিদ্যমান আছে। সুধু একটী মাত্র বস্তুর

গুল্মাদি সমস্ত মরিয়া যায়। বৃক্ষরাজি পত্র পল্লব শূন্য হইয়া মৃতবৎ দণ্ডায়মান থাকে। পর্ব্বত-শরীর ও সমতল-ভূমি শুভ্র বরফ-স্তূপে আচ্ছাদিত হয়; ফল কথা যে দিকে দেখ বরফ-স্তূপ ও শুষ্ক বৃক্ষ নয়ন গোচর হয়। শীতের শেষে বসন্তের আগমনে, বৃষ্টি-পাত হওয়ামাত্র হঠাৎ সমস্ত বরফস্তূপ গলিয়া ভেলকীর মত অন্তর্হিত হয়। তখন ভূপৃষ্ঠে সবুজ তৃণলতা উদ্‌গত হইতে থাকে—কৃষকেরা শস্য বপন করে—৩০।৪০ দিনের মধ্যে সবুজ বৃক্ষ লতায় নানা বর্ণের পত্র পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। ফল কথা, ঐ অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর বাহ্য-দৃশ্য অসম্ভব পরিবর্ত্তিত হয়। বঙ্গ দেশে সে দৃশ্য দেখা যায় না। এখানে শীত কালেও বৃক্ষ লতাতে ফুল ফল ও পত্র দেখা যায়।

মধ্যে যতগুলি গুণ ও উপযোগিতা বর্ত্তমান আছে, তাহা নির্ণয় করিতে মহাজ্ঞানী ও অসাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি হতবুদ্ধি ও দিশাহারা হইয়া পড়েন। (টীঃ ৪১০) এ সমস্ত উদ্‌ভিদের সংখ্যাও অসীম।

আল্লার অসীম গুণাবলীর তৃতীয় নিদর্শন—ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থ। এই শ্রেণীর পদার্থ দেখিতে সুন্দর এবং তন্মধ্যে কতকগুলি অধিক মূল্যবান। তজ্জন্যই বোধ হয় মহাপ্রভু উহাদিগকে ভূগর্ভে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি মানব দেহের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয়, যথা—স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, ফিরোজা, ইয়াকুত ইত্যাদি মণিমাণিক্য। আর কতকগুলি, তৈজস পাত্র প্রস্তুত জন্য ব্যবহৃত হয় যথা—লৌহ, তাম্র, পিত্তল, কাঁসা ইত্যাদি ধাতু, আর কতকগুলি পৃথক পৃথক কার্য্যে ব্যবহৃত হয় যথা—লবণ, গন্ধক, নেফ্‌তা, আল্‌কাৎরা ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে লবণ নিতান্ত সুলভ ও সামান্য পদার্থ। ইহার গুণে খাদ্য দ্রব্য পরিপাক পায়। কোন জনপদে লবণের অভাব হইলে তথাকার খাদ্য দ্রব্য বিস্বাদ লাগে, এবং শিঘ্র নষ্ট হয়, অধিবাসী লোক পীড়িত হইয়া বিনাশের অবস্থায় উপনীত হয়।

—লবণ

এস্থলে মহাপ্রভুর দয়া ও দান কিরূপ, দেখ—তোমার শরীর রক্ষার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। তাহা সুস্বাদু করিতে যে লবণ আবশ্যক তাহা তিনি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দিয়াছেন। বৃষ্টির জল হইতে লবণ উৎপত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৃষ্টি-জল; ভূগর্ভে সঞ্চিত হইয়া আল্লার স্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়মে, লবণরূপে পরিণত হয়। (টীঃ ৪১১) ইহাও এক অদ্‌ভূত বিস্ময়কর ব্যাপার।

টীকা—৪১০। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক জল লইয়া বিচার কর। ইহার মধ্যে কত গুণ আছে এবং ইহার সাহায্যে কত কাজ হইতে পারে, তাহা বোধ হয় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। সামান্য পরীক্ষায় জানা যায় যে, জলে পিপাসা শান্তি হয়; অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়; কিন্তু তাহার বাষ্পে ইঞ্জিন চলে, রেল ষ্টিমার দৌড়ে; সুতা কাটা সুরখী ভাঙ্গা হয়—এগুলি পরীক্ষা ও কৌশলে ধরা গিয়াছে। জলের চাপে বস্তা বান্ধা হয়, বরফের বলে পাহাড় ভাঙ্গা হয়, ইত্যাদি ক্ষমতা পরবর্ত্তী পরীক্ষায় ধরা পড়িয়াছে। মানুষের বহু রোগ আছে—প্রত্যেক রোগ আরামের জন্য শত শত ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে—কিন্তু সেই এক জলে সকল পীড়া আরাম হইতে পারে ইহা সকলে জানে না।

টীকা—৪১১। বৃষ্টিজল লবণে পরিণত হয় এই কথা বোধ হয় স্থূলদর্শী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করিবেন না। তাঁহারা লবণ বিশ্লেষ করিয়া ক্লোরিণ ও সোডিয়ম নামক পদার্থ পাইয়াছেন কিন্তু জল বিশ্লেষ করিয়া হাইড্রোজেন ও অক্‌সিজেন ভিন্ন অন্য কিছু পান নাই। এই কথার উপর নির্ভর করিয়া জল হইতে লবণের উৎপত্তি কথাটী উড়াইয়া দেওয়া জ্ঞানীলোকের কর্ত্তব্য নহে। হাইড্রোজেন ও অক্‌সিজেন বিশিষ্ট জল, ভূগর্ভে বহু বৎসর আবদ্ধ থাকিয়া যুগ্তকার্য্যে নানা পদার্থের সংযোগ ও প্রভাবে

আল্লার অসীম গুণাবলীর চতুর্থ নিদর্শন—পৃথিবীর সমস্ত জীব জন্তু। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি চলে, কতকগুলি উড়ে; আবার কোন গুলি দুই পদে চলে, কোন গুলি চারি পদে হাঁটে। কেহবা বুকের উপর ভর দিয়া চলে, কোনগুলি বা বহু পদের সাহায্যে গমনাগমন করে। তাহার পর খেচর ও পতঙ্গাদি প্রাণী এবং মৃত্তিকা হইতে উত্থিত পোকামাকড় প্রভৃতি ঋতু-বিশেষে-জাত ইতর প্রাণীর বিষয় চিন্তা কর। এইরূপ সমস্ত প্রাণীর আকৃতি প্রকৃতি পৃথক্ পৃথক্—একটী অন্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তাহাদের প্রত্যেকের পক্ষে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণের জন্য যাহা প্রয়োজন তৎসমুদয়ই করুণাময় বিশ্বপতি উৎকৃষ্ট ধরণে ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দান করিয়াছেন। প্রত্যেককে, জীবন যাপনের কৌশল ও নিয়ম শিখাইয়াছেন; তদ্ অবলম্বনে তাহারা সকলেই স্ব স্ব খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লয়; ও আপন আপন সন্তান পালন করিয়া থাকে এবং নিজের বাসের জন্য বাসা বা স্থান বানাইয়া লয়।

—পিপীলিকা

প্রিয় পাঠক! পিপীলিকার দিকে দর্শন কর—তাহারা উপযুক্ত সময়ে কেমন দূরদর্শিতা ও দক্ষতার সহিত খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া জমা রাখে। একটী গোধুম বীজ বা চাউলের দানা পাইলে দূরদর্শনে বুঝিয়া লয় যে উহা গোটা রাখিলে অভ্যন্তরে কীট জন্মিয়া খাইয়া ফেলিবে বা অন্য প্রকারে নষ্ট হইবে তজ্জন্য তাহারা দানাগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া জমা রাখে। কিন্তু তাহারা ধনিয়া বীজ পাইলে বিবেচনা করিয়া দেখে যে উহার তুষ খুলিয়া ফেলিলে অভ্যন্তরস্থ শস্য আদ্রতার প্রভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে এই কারণে ধনিয়া বীজ তুষ সমেত গোটা জমা করিয়া রাখে।

পরিশেষে ক্লোরিণ ও সোডিয়ম বিশিষ্ট লবণ রূপে জমিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। বৃক্ষ লতাদি উদ্‌ভিদের কাষ্ঠ শাখা পত্র বহুবৎসর ভূগর্ভে আবদ্ধ থাকিয়া পাথরিয়া কয়লা হয়, আবার কৃষ্ণবর্ণ কদাকার কয়লা বহুবৎসর ভূগর্ভে থাকিয়া উজ্জ্বল হীরক খণ্ডে পরিণত হয়, একথা বৈজ্ঞানিকগণ অস্বীকার করিতে পারেন না। তবে ইহাদের উপাদান সমান কেবল বর্ণের পার্থক্য। এক রূপ উপাদান বিশিষ্ট পদার্থ ভূগর্ভে আবদ্ধ থাকিলে তাহার উপাদান পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন আশ্চর্য্য নহে। পুরুষের শুক্র নামক জলবিন্দুর বিশ্লেষ করিলে যে যে পদার্থ পাওয়া যায় তাহা অবশ্যই সংক্ষিপ্ত কিন্তু সেই এক বিন্দু জল মাতৃগর্ভে কেবল দশ মাস আবদ্ধ থাকিয়া, মানব শিশুর আকারে নির্গত হইলে তাহার দেহ বিশ্লেষণে দেখা যায় পার্থিব সমস্ত পদার্থই তন্মধ্যে পাওয়া যায়। এমন স্থলে বৃষ্টির শুভ্র জলরাশী ভূগর্ভে বহুবৎসর আবদ্ধ থাকিয়া পার্থিব অসংখ্য পদার্থের মধ্য লবণাংশ গ্রহণ করতঃ সমস্ত লবণ রূপে পরিণত হওয়া কি আল্লার বাক্যে অসম্ভব? লবণের খনিতে যে কোন দ্রব্য পড়্‌লে কেন লবণ হইয়া যায় ইহা অনেকে জানেন।

প্রিয় পাঠক! মাকড়ার প্রতি একবার দেখ, সে আপন শিকার ধরিবার জাল কেমন কৌশলে নির্ম্মাণ করে। যে ধরণে জাল বুনাইলে মশা মাছী প্রভৃতি শিকার সহজে আবদ্ধ হইতে পারে তৎপ্রতি তাহারা কেমন সতর্ক দৃষ্টি রাখে! মুখের লালা দিয়া সুতা প্রস্তুত করিয়া লয়।

—মাকড়সা

গৃহের এক কোণ আশ্রয় করতঃ এক দেওয়ালে জাল-সূত্রের এক প্রান্ত আটকাইয়া অন্য দেওয়ালের দিকে 'তানা' টানিয়া লইয়া যায়। 'তানা'র সুতা গুলি বিস্তার করিবার পর 'বানা' বা 'পড়িয়ানের' সুতা বুনাইতে আরম্ভ করে। 'তানা' ও 'বানা' উভয়ের সূত্র গুলি সমান সমান ব্যবধানে স্থাপন করে—কোন স্থানে ঘন বা কোন স্থানে পাতলা করে না। তাহাতে জালখানি দেখিতে অতি সুন্দর হয়। জাল বুনান সমাধা হইলে মাকড় একযোগে এক গাছি সুতা মুখে লইয়া মশা মাছির প্রতিক্ষায় লট্‌কিয়া থাকে। ইতিমধ্যে মশা বা মাছী আসিয়া জালে পড়িলে মাকড় দ্রুত বেগে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে এবং মুখের সুতা দিয়া শিকারের হাত পা জড়াইয়া বান্ধিয়া ফেলে। সুতরাং সে আর উড়িয়া যাইতে পারে না। যখন বুঝিতে পারে যে শিকার আর উড়িয়া পলাইতে পারিবে না তখন তাহাকে ভাণ্ডার-খানায় লইয়া গিয়া জমা করিয়া রাখে এবং পুনরায় নূতন শিকার ধরিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়।

পাঠক! একবার মৌমাছির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তাহারা কেমন সুন্দর ও পরিপাটী সম-ষট্‌-কোণ গৃহ নির্ম্মাণ করে। তাহাদের গৃহ যদি তদ্রূপ না হইয়া সমচতুষ্কোণ হইত, তবে তাহাদের পেন্‌সিলের

—মৌমাছী

ন্যায় গোল দেহ তন্মধ্যে স্থাপিত হইলে চারি কোণে অনেক স্থান বিফলে পতিত থাকিত। আবার, উহাদের গৃহ যদি চুঙ্গির ন্যায় গোল হইত তবে নলাকৃতি গোল দেহ গোল চুঙ্গির মধ্যে যাতায়াতের জন্য চারি ধারে অবশ্যই অঙ্গুরী আকারে কিছু ফাঁক স্থান রাখার প্রয়োজন হইত—তাহাতেও অধিক স্থান নষ্ট হইত। ঐরূপ গোল চুঙ্গির মধ্যবর্ত্তী স্থান অপেক্ষা সম-ষট্‌-কোণ চুঙ্গির অভ্যন্তরস্থ স্থান অল্প; ইহা গণিত ও জ্যামিতি শাস্ত্রে প্রমাণিত; অথচ মধু মক্ষিকার গোল দেহ তন্মধ্যে অক্লেশে যাতায়াত করিতে পারে। এখন বুঝিয়া দেখ, এই ক্ষুদ্র প্রাণীর উপর বিশ্বপ্রভু আল্লার দয়া কিরূপ। তিনি করুণা করিয়া এই সামান্য প্রাণীকেও গৃহ নির্ম্মাণের চমৎকার কৌশল প্রত্যাদেশ সহকারে শিখাইয়া দিয়াছেন।

রক্ত, মশকদিগের খাদ্য—ইহা তিনি তাহাদিগকেও প্রত্যাদেশ সহকারে জানাইয়াছেন এবং সেই রক্ত চুষিয়া লইবার জন্য তিনি দয়া করিয়া মশককে কেমন একগাছি সুন্দর শূন্যগর্ভ তীক্ষ্ণ শুণ্ড প্রদান করিয়াছেন। মশক সেই শুঁড়গাছি মানব-দেহে প্রবেশ করিয়া দিয়া রক্ত চুষিয়া পান করে। এই ক্ষুদ্র প্রাণীকে আত্মরক্ষার জন্য, দয়াময়, দুই খানি হাল্‌কা পাংলা পর প্রদান করিয়াছেন। মানুষ তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিবা মাত্র সে বুঝিতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ উড়িয়া পলায় কিন্তু পরক্ষণেই ফিরিয়া আসে। মশকের যদি কথা কহিবার ক্ষমতা ও বুদ্ধি থাকিত, তবে এই পলক-প্রাপ্তির জন্য স্বীয় সৃষ্টি-কর্ত্তাকে এত অধিক ধন্যবাদ দিত যে মানুষ চমৎকৃত হইত। যাহা হউক, মশকের বাক্‌শক্তি না থাকিলেও তাহার আপাদ-মস্তক হইতে যে অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে তাহা যেন বাকশক্তি ধারণ করিয়া স্বীয় ভাষায় সৃষ্টিকর্ত্তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছে। সেই ধন্যবাদের ভাষা আমরা বুঝিতে পারি না। এই জন্য আল্লা বলিতেছেন—

—মশক

وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۚ

"কিন্তু তোমরা তাহাদের তছবীহ্ (প্রশংসা-সূচক-ধন্যবাদ) বুঝিতে পার না।" (১৫ পারা। সুরা বাণী এছরাইল। ৫ রোকু।)

যাহা হউক, জীব-জন্তু সম্বন্ধীয় আশ্চর্য্য ও বিস্ময়কর ব্যাপারের অন্ত নাই। তৎসমূহের বিস্তৃত তথ্য অবধারণ করা দূরে থাকুক—তন্মধ্যস্থ একটী মাত্র ব্যাপারের সমস্ত অংশ বর্ণনা করা এমন কি আলোচনা করিবারও কোন্ মানবের সাধ্য নাই। প্রিয় পাঠক! এই যে অসংখ্য জীব জন্তু দেখিতেছ তাহারা কেমনে এমন আশ্চর্য্য আকার, মনোরম মূর্ত্তি, সুগঠিত অঙ্গ, সুদৃশ্য কলেবর পাইল? ইহারা কি নিজেই নিজকে এইরূপ আশ্চর্য্য কৌশল সহকারে বানাইয়াছে, কি অন্য কোন মহাশক্তি এইরূপ করিয়া সৃজন করিয়াছেন? আল্লা! আল্লা! সৃষ্টিকর্ত্তার জ্ঞান ও ক্ষমতা কতদূর, অন্য দিক দিয়া একবার বুঝ। উজ্জ্বল আলোকের মধ্যে মানবকে পূর্ণমাত্রায় দর্শন ক্ষমতা দিয়াও তিনি মানব-চক্ষুকে অন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। বুদ্ধি বিবেচনা ও চিন্তা-শক্তি পূর্ণমাত্রায় কাহাকে দিয়াও তাহার মনকে অচেতন করিয়া রাখিতে পারেন। তদ্রূপ অবস্থায় কেহ চিন্তা করিবার পন্থাও পাইতে পারে না। যাহা হউক, এরূপ লোকও বহু আছে যে তাহারা এই প্রকাশ্য

চর্ম্মচক্ষে দর্শন করে বটে কিন্তু অন্তরের চক্ষে কিছুই দেখিতে পায় না— ও তাহারা কোন দৃশ্য হইতে নীতি উদ্ধার করিতে পারে না। যে বাক্য শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, তাহা শুনিতেও তাহারা বধির হয়। যদিও বা তাহাদের কর্ণ বিবরে কোন কথা প্রবেশ করে, তথাপি তাহা পশুর ন্যায় শ্রবণ ভিন্ন আর কিছুই বুঝে না। উপদেশ বাক্য তাহাদের কর্ণে, পক্ষীর কলরবের ন্যায় শ্রুত হয়—তাহা হইতে কোন অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না। মনোযোগ সহকারে যাহা দেখা কর্ত্তব্য তদ্দর্শনে তাহারা বিমুখ হয়। কাগজের উপর কলমের দ্বারা যাহা লিখা হয় তাহা অনেকে পড়িতে পারে বটে কিন্তু বিশ্ব-জগতের সর্ব্বত্র এমন কি, সামান্য বালুকা-কণার উপর আল্লার ক্ষমতা-রূপ-কলমে যাহা লিখিত আছে, তাহা উহারা দেখিতেও চায় না পড়িতেও জানে না।

প্রিয় পাঠক! পিপীলিকার ডিম্ব, অতি তুচ্ছ পদার্থ—একটী বালুকা-কণার তুল্য ক্ষুদ্র। একবার তৎপ্রতি মনোযোগ দাও এবং কাণ লাগাইয়া শুন—সে কি বলিতেছে। উহা পরিষ্কার ভাষায় উচ্চ রবে বলিতেছে—"হে চিন্তা-শূন্য মানব! কোন চিত্র-কর প্রাচীর পৃষ্ঠে একটী সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিলে তোমরা সেই চিত্রকরের শিল্প-নৈপুণ্য ও দক্ষতা স্মরণে আশ্চর্য্য বিবেচনা কর ও ধন্য ধন্য বলিয়া প্রশংসা কর কিন্তু আমার শরীরের উপর যে চিত্র আল্লা কৌশলে অঙ্কিত করিয়াছেন তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত কর। এস, আমার নিকট বস ও আমার প্রতি মনোযোগ সহকারে দেখ—সৃষ্টি-কর্ত্তা আল্লার চিত্র-কৌশল, শিল্প-নৈপুণ্য-দক্ষতা তোমার চক্ষে প্রতিভাত হইবে। আমি একটী ক্ষুদ্র বালুকা-কণা অপেক্ষা বৃহৎ নহি। আমা হইতে সেই মহা-শিল্পী পরিশেষে পিপীলিকা প্রস্তুত করিবেন, তজ্জন্য সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আমাকে কত অবস্থার ভিতর দিয়া গড়াইয়া আনিয়া এখন এ অবস্থায় দাঁড় করিয়াছেন, এখন অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে পিপীলিকা রূপে বাহির করিবেন। দেখ, আমি যে এত ক্ষুদ্র তথাপি আমাকে কত অংশে বিভাগ করিবেন। আমার এক অংশ হইতে মন প্রস্তুত করিবেন—এবং অন্যান্য অংশ হইতে মস্তক ও হস্ত পদাদি নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বানাইবেন। আমার ক্ষুদ্র মস্তকের মধ্যে মস্তিষ্ক ভাণ্ডারকে কয়েকটী কুঠরীতে ভাগ করিবেন। প্রত্যেক কুঠরীতে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি স্থাপন করিবেন। এক কুঠরীতে আস্বাদন শক্তি, অন্য কুঠরীতে ঘ্রাণ-শক্তি, অপরটীর মধ্যে দর্শন-শক্তি স্থাপন

পিপীলিকার ডিম্ব হইতে ঘোষিত আল্লার অস্তিত্বের নিদর্শন বাণী

করিবেন। তাহার পর আমার মস্তকের বহির্ভাগে কয়েকটী পিয়ালা সদৃশ স্থান স্থাপন করিয়া তদুপরি কয়েকখানি 'পরকলা' স্থাপন করিবেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষুদ্র মস্তকের এক অংশে নাসিকা, মুখ-বিবর স্থাপন করতঃ আহার গিলিবার পথও স্থাপন করিবেন। শরীরের বহির্ভাগে হস্ত পদাদিও বাহির করিবেন। উদরের মধ্যেও এমন এমন স্থান রাখিবেন যাহার একটীতে আহার জমা হইবে, অন্য স্থানে গিয়া পরিপাক পাইবে. আর অন্য পথ দিয়া অসার ভাগ বাহির হইয়া যাইবে। এই প্রকার অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গও প্রস্তুত করিবেন। শরীরের এতগুলি স্থান ও যন্ত্রাদি যোজিত হইলেও আমার শরীর নিতান্ত লঘু হালকা ও স্ফূর্ত্তিপূর্ণ হইবে। তাহার পর দেখিতে পাইবে যে আমার দেহ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, বিশেষ দক্ষতা সহকারে এক ভাগকে অপর ভাগের সহিত জোড় দিবেন। চৌকিদারের কমরে যেমন পেটী বান্ধা থাকে আমার কমরেও তদ্রূপ দাসত্বের পেটী বান্ধিয়া দিবেন এবং শরীরে কৃষ্ণবর্ণের উর্দ্দী কোট পরাইয়া দিবেন। হে মানব! তুমি মনে করিতেছ যে পৃথিবীর প্রত্যেক পদার্থ ও প্রত্যেক জীব তোমার সুবিধা ও সেবার জন্য মহাপ্রভু সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু আমি তোমাকে শুনাইয়া দিতেছি যে, আমাকে তিনি যখন এই ডিম হইতে বাহির করিবেন তখন আমিও তোমাদের মত ভূতলে চলিতে ফিরিতে লাগিব; তখন আমিও দেখিতে পাইব—এই দুনিয়া আমার সুবিধার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। তুমি যেমন নানা নেআমত (সম্পদ) ভোগ করিতে পাইতেছ, আমিও তদ্রূপ উপাদেয় বস্তু ভোগ করিতে পাইব। আরও দেখিতে পাইব, পৃথিবীর সকলেই আমার খেদমৎ করিতেছে, এমন কি তোমার মত শ্রেষ্ঠ জীব মানবও আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছে। মানুষ, দিবা রজনী মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ভূমি-কর্ষণ, বীজ বপন ও জল সেচন করিয়া ধান্য গোধুম ইত্যাদি যাহা উৎপন্ন করে তাহা আমরা সুখে ভোগ করিতে পাইব। মানব আমার সুখের জন্যই খাটিবে। তোমরা শস্য কাটিয়া মাড়িয়া যে কোন স্থানে জমা করিয়া বা লুকাইয়া রাখ না কেন, মহাপ্রভু আমার মত তুচ্ছ পিপীলিকাকে তাহার সন্ধান বাতাইয়া দিবেন। আমি মাটীর নীচে গর্ত্ত মধ্যে থাকিলেও আল্লা আমাকে তোমাদের শস্যের গন্ধ পাঠাইয়া দিবেন আমি সেই গন্ধের অনুসরণে তোমাদের শস্য-ভাণ্ডারে গিয়া উপস্থিত হইব। তোমরা কঠোর পরিশ্রমে যাহা উপার্জ্জন কর, হয়তো তাহাতে তোমার সম্বৎসরের আহারের

সংস্থান না হইতেও পারে। কিন্তু আমি তোমার ভাণ্ডার হইতে এত খাদ্য লইয়া যাইব যে তাহাতে আমার এক বৎসরের বরং তদপেক্ষা অধিক সময়ের খরচ চলিতে পারিবে। ঐ খাদ্য দ্রব্য এমন সাবধানে নিরাপদ স্থানে সঞ্চয় করিয়া রাখিব যে কিছু মাত্র অপচয় হইতে পারিবে না। আমাদের সঞ্চিত দ্রব্য রৌদ্রে শুখাইবার নিমিত্ত ভূপৃষ্ঠের উপরে খোলা ময়দান স্থানে আনিলে মহাপ্রভু আমাদিগকে বৃষ্টিপাতের সংবাদ প্রত্যাদেশ সহকারে পূর্ব্বেই দিয়া থাকেন। সুতরাং বৃষ্টিপাতের পূর্ব্বেই আমরা বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত সে দ্রব্য ময়দান হইতে সরাইয়া নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দিব—বৃষ্টিতে ভিজিয়া নষ্ট হইতে দিব না। হে মানব! তোমরা যদি ময়দানে শস্য মাড়াই করিবার জন্য 'খোলা' প্রস্তুত করিয়া তথায় শস্য 'পালা' দিয়া রাখ এমন সময়ে শিলা ও বৃষ্টি-পাত আরম্ভ হয় তবে তোমাদের সঞ্চিত শস্য সমস্ত নষ্ট হইতে পারে, কেননা আল্লা তোমাদিগকে বৃষ্টিপাতের নিশ্চিত সংবাদ অগ্রে বুঝিতে দেন নাই। যাহা হউক, দয়াময় আল্লা আমাদের সুখ সচ্ছন্দতার জন্য যেরূপ বিধান করিয়াছেন তাহাতে আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ কেমন করিয়া শোধ করিব! তিনি যে আমার ন্যায় এত ক্ষুদ্র ও এত তুচ্ছ বালুকা কণাবৎ অণু হইতে এমন সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট চালাক, চৌকশ, প্রাণী সৃষ্টি করিবেন এবং তোমাদের মত শ্রেষ্ঠ জীবকে, প্রভূত জ্ঞান গরিমা দিয়াও আমাদের ন্যায় তুচ্ছ প্রাণীর 'খেদমতগার' বানাইয়া দিবেন—তোমরা আমাদের আহার জোগাইবে, ভূমি কর্ষণ করিবে, শস্য বপন করিবে, এবং তাহা কাটাই মাড়াই করিতে কত দুঃখ কষ্ট ও পরিশ্রম সহ্য করিবে, আর আমরা 'মজা করিয়া' আরামে বসিয়া খাইব—এরূপ স্থলে আমরা সৃষ্টিকর্তার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা কি প্রকারে শোধ করিতে পারি?"

পাঠক! ছোট বড় ক্ষুদ্র মহৎ সকল প্রাণীরই 'অবস্থা-রূপ-বাকশক্তি' হইতে সৃষ্টিকর্তার মহিমা-ব্যঞ্জক স্তুতি পাঠ ও ধন্যবাদ প্রকাশ পাইতেছে। প্রাণীর কথা কি, প্রত্যেক লতা পাতা এমন কি প্রত্যেক নির্জ্জীব বালুকা-কণা হইতেও, বিশ্ব-প্রভুর স্তুতি সুস্পষ্ট উচ্চারিত হইতেছে। মানুষ কিন্তু সে স্তুতি-পাঠ শুনিতে কাণ দিতেছে না—অচেতন ও অন্য-মনস্ক ভাবে জীবন কাটাইতেছে। সৃষ্টি-কর্ত্তা আল্লা বলিতেছেন—

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۝

"নিশ্চয়ই তাহারা তছবীহ্ শ্রবণ হইতে অন্য-মনস্ক ও গাফেল আছে" (১৯ পারা। সূরা শো'রা। ১১ রোকূ) এবং আরও বলিয়াছেন—

وَ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَ لٰكِنْ

لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ؕ

"এবং যত বস্তু আছে তৎসমস্তই তাঁহার (আল্লার) প্রশংসা ও তছবীহ্ পাঠ করে। কিন্তু তোমরা তাহাদের তছবীহ্ বুঝিতে পার না।" (১৫ পারা। সূরা বানী-এসরায়েল। ৫ রোকূ)।

আল্লার অসীম গুণাবলীর পঞ্চম নিদর্শন—সমুদ্রাদি জলরাশি। ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র জল প্রকাশ্যে বা অন্তর্নিহিত অবস্থায় পরিব্যাপ্ত আছে। একটী মহাসমুদ্র, ভূপৃষ্ঠকে ঘেরিয়া লইয়া আছে। প্রত্যেক সাগর, উপসাগর, খাড়ী সেই মহাসমুদ্রের পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড। বাস্তবিক পক্ষে স্থল-ভাগ, সমুদ্র মধ্যস্থ কতকগুলি ছোট বড় দ্বীপ মাত্র। হাদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—'প্রান্তরের মধ্যে, কতকগুলি আস্তাবল যেরূপ, সমুদ্র মধ্যে স্থল-ভাগও তদরূপ।' পাঠক! স্থলভাগের পদার্থ লইয়া চিন্তা করিবার পন্থা ধরিতে পারিলে, এখন জল-ভাগের অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে প্রবৃত্ত হও। জল-ভাগ যেমন স্থল-ভাগ অপেক্ষা বৃহৎ তদন্তর্গত বিস্ময়কর ব্যাপারও তদ্রূপ অনন্ত। স্থল-ভাগে যেমন জীব জন্তু ও উদ্ভিদ আছে জলের মধ্যেও তদ্রূপ পদার্থ আছে। কিন্তু জলের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ ধরণের পদার্থ আছে যাহা স্থলভাগে নাই। জলজ-পদার্থের আকারও পৃথক্।

কোন জলজ প্রাণী এত ক্ষুদ্র যে দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার কতকগুলি এত বৃহৎ যে, জাহাজ উহার পৃষ্ঠে লাগিলে লোকে মনে করে যে উহা সমুদ্র মধ্যস্থ চরে আটকিয়া গিয়াছে। আরোহীগণ, —জলজ প্রাণী স্থল জ্ঞানে তদুপরি অবতরণ করিয়া বিচরণ করে; কিন্তু আগুন জালিয়া পাক করিতে লাগিলে সেই প্রাণী অগ্নির তেজ স্পর্শ করিয়া নড়িতে লাগে এবং কখন কখন ডুবিয়া যায়। তখন লোকে বুঝিতে পারে যে উহা ডাঙ্গা নহে—জলজ প্রাণীর পৃষ্ঠ। সমুদ্রের এবং তদন্তর্গত

পদার্থের অলৌকিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া বহু লোক বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহা সমাবেশ হইবে না।

পাঠক! জানিয়া লও, বিশ্বস্রষ্টা আল্লা সমুদ্র-গর্ভে এক জীব সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার পৃষ্ঠের অস্থিকে ঝিনুক বলে। আল্লা তাহাকে বৃষ্টি

—ঝিনুক

পাতের সময় জানিবার ক্ষমতা দিয়াছেন এবং মেঘের বারি বিন্দু উদরস্থ করিয়া লইতে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন। মেঘ হইতে বৃষ্টি পাত হইবার কালে তাহারা সমুদ্রের লবণাক্ত জলরাশির তল হইতে ভাসিয়া উপরে উঠে এবং মেঘের দিকে মুখ খুলিয়া থাকে; মিষ্ট বৃষ্টি-জলের কয়েক বিন্দু উদরস্থ হইলে মুখ মুদ্রিত করতঃ পুনরায় সমুদ্র-তলে চলিয়া যায়। সেই মিষ্ট-জল উহার উদরে, মাতৃগর্ভে শুক্রবিন্দুর ন্যায় সযত্নে রক্ষিত হয়। বহুদিবস পরে যথাকালে তাহা মুক্তাফল রূপে পরিণত হয়; কিন্তু সকল বৃষ্টি-বিন্দু মুক্তা হয় না। আবার, যাহা হয় তাহার মধ্যে কোনটী ক্ষুদ্র কোনটী বৃহৎ হইয়া থাকে। ঐ মুক্তা ফল লইয়া মানুষেরা শরীরের শোভা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য হার বা অন্য ভূষণ প্রস্তুত করে।

সমুদ্র-গর্ভে আল্লা লোহিত-প্রস্তরবৎ এক প্রকার বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার আকার প্রকার অবিকল বৃক্ষের ন্যায়। ঐ বৃক্ষের দেহ, উজ্জ্বল

—প্রবাল ও আম্বর

বহুমূল্য প্রস্তর সদৃশ এবং এক প্রকার রত্ন বলিয়া বিখ্যাত। উহাকে আরবীতে 'মরজান' ও বাঙ্গলায় প্রবাল বা পলা (টীঃ ৪১২) বলে। ঐ প্রবাল-বৃক্ষ হইতে নিঃসৃত ফেণা সমুদ্র-তরঙ্গে তীরে আসিয়া জমে এবং 'আম্বর' নামে কথিত হয়। সমুদ্রে এইরূপ আশ্চর্য্য বিস্ময়কর পদার্থ অসংখ্য আছে। সে গুলি এক হিসাবে জীব অন্য হিসাবে উদ্ভিদ আবার তাহাদের সহিত কাহারও মিল নাই।

টীকা—৪১২। সমুদ্র গর্ভে 'প্রবাল-শৈল'' বা প্রবাল পাহাড় দৃষ্ট হয়। উহা প্রথমে বৃক্ষাকারে বর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে পাহাড়ের আকার ধারণ করে। স্থলজ বৃক্ষের সহিত প্রবালের অতি ঘনিষ্ট সাদৃশ্য আছে। বৃক্ষরাজি শিকড়ের সাহায্যে মৃত্তিকা হইতে রস চুষিয়া লইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রবাল বৃক্ষ সেরূপ নহে। সমুদ্র-গর্ভে এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট বাস করে তাহারা বৃদ্ধ হইলে তাহাদের গাত্র হইতে জলে অমিশ্র এক প্রকার রস বাহির হয়। কীট-গুলি ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া জীবনের শেষভাগে সমুদ্রের অল্প গভীর অংশ নির্ব্বাচন করতঃ তথায় অবস্থিতি করে। এবং তাহাদের গাত্র হইতে রস নির্গত হইয়া কঠিন হইয়া যায়. পরে উহার উপরে অন্য কীট আসিয়া বাস করে ও শরীর-নিঃসৃত-রস স্থাপন করিতে থাকে। এইরূপ প্রবাল কীটের শরীর নিঃসৃত রস একত্র পুঞ্জীকৃত হইয়া বৃক্ষ রূপে বর্দ্ধিত হয়; লোকে উহা প্রস্তরবৎ কাটিয়া আনিয়া খণ্ড খণ্ড করতঃ 'পলা ও 'আকীক' নামক রত্নরূপে বিক্রয় করে। স্থল ভাগে বৃক্ষ-শাখায় এক প্রকার কীটের শরীর-নিঃসৃত-রস হইতে লাক্ষা জন্মে।

অতঃপর জলের উপর জাহাজ ও নৌকা চলাচল লইয়া চিন্তা করা কর্তব্য। নৌকা জলে না ডুবে এমন ভাবে নির্ম্মাণ করিতে মানুষকে আল্লা বুদ্ধি দিয়াছেন। নৌকা-চালক মাঝিকে অনুকূল ও প্রতিকূল বায়ু চিনাইয়া দিয়াছেন। নক্ষত্রাদির সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার ইহাও এক উদ্দেশ্য ছিল যে. অকূল সমুদ্রের মধ্যে যেখানে জলরাশি ভিন্ন. কূল কেনারা দেখিতে পাওয়া যায় না তথায় ঐ নক্ষত্র দেখিয়া নাবিকগণ পথ-নির্ণয় করে। ইহা এক অত্যাশ্চর্য্য বিস্ময়-কর ব্যাপার।

—জলপথে গমনা-গমনের ব্যবস্থা

অতঃপর জলের প্রতি লক্ষ্য কর। জলের আকার প্রকার তরলতা স্বচ্ছতার বিষয় ভাব। সকল পদার্থের সঙ্গে ইহার সংসক্তি আছে। এবং সেই সংসক্তি-প্রভাবে কিরূপ কার্য্য হয় তাহা লইয়াও চিন্তা কর। জলকে আল্লা সমস্ত জীব জন্তু উদ্ভিদ এমন কি সমস্ত সৃষ্ট-পদার্থের জীবন স্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন; ইহা এক অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার। পাঠক! ভাবিয়া দেখ, প্রচণ্ড পিপাসা লাগিলে তুমি যখন এক অঞ্জলি জলের জন্য লালায়িত হও তখন যদি জলের অভাব হয় ও সহজে না পাও. তবে তুমি ততটুকু জলের বিনিময়ে তোমার যথাসর্ব্বস্ব ধন দিতে প্রস্তুত হইবে। আবার সেই জল পান করিবার পর যদি উহা তোমার মূত্রাধারে আটকিয়া যায়—প্রস্রাবের পথে বাহির না হয়—তখনও তুমি সেই মূত্র বাহির করিয়া দিয়া মূত্র-যন্ত্রণা হইতে বাঁচিবার বাসনায় তোমার যথাসর্ব্বস্ব চিকিৎসককে দিতে প্রস্তুত হইবে। ফল কথা, জল ও সমুদ্রের অলৌকিক গুণের সীমা নাই।

—জলের প্রকৃতি ও বিশিষ্টতা

আল্লার অসীম গুণাবলীর ষষ্ঠ নিদর্শন—বায়ু ও বায়ু মণ্ডলের অন্তর্গত পদার্থ। বায়ু-মণ্ডল বাস্তবিক তরঙ্গাকুলিত সমুদ্রবৎ। বায়ুপ্রবাহককে, বায়ু-সমুদ্রের তরঙ্গ বলা যায়। প্রিয় পাঠক! ভাবিয়া দেখ যে, বায়ুরাশি এমন লঘু ও সূক্ষ্ম পদার্থ যে চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং এমন স্বচ্ছ যে, উহার ভিতর দিয়া দেখিবার বাধা জন্মায় না, সেই বায়ু তোমার প্রাণের খাদ্য। পান বা আহার দিবসের মধ্যে একবার গ্রহণ করিলেও শরীর রক্ষা পাইতে পারে কিন্তু এক ঘণ্টা কাল শ্বাস বন্ধ হইলে—প্রাণের খাদ্য বায়ু তোমার উদরের মধ্যে না গেলে তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে—এ কথা কি তুমি চিন্তা কর না?

—বায়ু

বাতাসের আর একটী গুণ এই যে, ইহার প্রভাবে নৌকা জলের উপর ভাসমান থাকিতে পারে—বাতাসের প্রভাব হইতে মুক্তি না পাইলে ইহা আর জলমগ্ন হইতে পারে না। (টীঃ ৪১৩) বাতাসের গুণ ও উপকারিতা বর্ণনা করা বহু বিস্তৃত। প্রিয় পাঠক, প্রথমে তুমি বাতাসের কথা বুঝিয়া দেখ; মহাপ্রভু কোন্ কোন্ পদার্থ যোগে বাতাস প্রস্তুত করিয়াছেন। মেঘ, বৃষ্টি, বজ্রধ্বনী, বিদ্যুৎ, তুষার, বরফ, এই বাতাসের মধ্যে হইতে হয়। বারিদ মেঘের বিষয় চিন্তা কর, উহা অদৃশ্য বায়ুর মধ্যে সর্ব্বদাই উৎপন্ন হইতেছে।

—মেঘ

সমুদ্র নদী প্রভৃতি জলাশয়ের উপর দিয়া বায়ু প্রবাহিত হইবার কালে উহার জলীয় অংশ বাষ্পাকারে চুষিয়া লইয়া উপরে প্রেরণ করে। তদ্ব্যতীত পাহাড় পর্ব্বত হইতে তেজের প্রভাবে বাষ্প উত্থিত হয়, আবার বায়ুর উপাদানস্থ পদার্থ হইতেও বাষ্প প্রস্তুত হয়। সেই সমস্ত বাষ্প উপরে উঠিবামাত্র মেঘ নাম প্রাপ্ত হয়। পাহাড় পর্ব্বত বা সমুদ্রাদি জলাশয় হইতে দূরে অবস্থিত দেশে বায়ু-প্রবাহে ঐ মেঘ চালিত হয় এবং তথায় বিন্দু বিন্দু আকারে বর্ষিত হয়।

বৃষ্টি-জলের ফোঁটা সাধারণতঃ ঠিক সরল ভাবে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। বৃষ্টির যে ফোঁটাকে আল্লা যে স্থানে নিক্ষেপ করিবার বিধান লিপীবদ্ধ করিয়াছেন ঠিক সেই স্থানে সেই ফোঁটা পড়িবে। যে কীট পিপাসায় কাতর হইয়াছে, তাহার পরিতৃপ্তির জন্য বৃষ্টির যে ফোঁটা গুলি নির্দ্ধারিত ছিল, ঠিক তাহাই সেই কীটের প্রতি বর্ষিত হয়। এইরূপ বিধানে, যে উদ্ভিদ জলাভাবে শুখাইতেছিল, তাহা নির্দ্দিষ্ট বৃষ্টির ফোঁটা প্রাপ্ত হইয়া সজীব হইয়া উঠে। যে শস্য-দানা পরিপুষ্ট করিবার জন্য যে জল-বিন্দু নির্দ্ধারিত ছিল, ঠিক সেই বিন্দুগুলি তাহার উপর আগমন করে। বৃক্ষের উচ্চ শাখায় যে ফলটী রসের অভাবে শুখাইতেছিল, ঠিক সেই বৃক্ষের মূলে নির্দ্দিষ্ট বৃষ্টি-জল ঢালিয়া দেওয়া

সৃষ্টিরক্ষার্থ জলের নিয়ন্ত্রণ বিধি

টীকা—৪১৩। জলে ভাসমান নৌকার তলায় ছিদ্র হইলে ছিদ্র পথে জল উঠিয়া নৌকা গহ্বর পরিপূর্ণ হয় ও নৌকাটী আর ভাসমান থাকিতে পারে না। এই আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষার নিমিত্ত, পুরাকালে সমুদ্রগামী কোন কোন নৌকার সহিত বায়ু পূর্ণ কোষ (air tight compartments) যুক্ত থাকিত বলিয়া মনে হয়। এইরূপ নৌকার তলদেশে আঘাত পাইয়া ছিদ্র হইলেও, আবদ্ধ বায়ুর চাপে নৌকায় জল উঠিতে পারে না—ইহা ভাসমান থাকিয়া যায়। বাতাসের সাহায্য লইতে জানিলে, ইহা নিমজ্জমান নৌকাকে বা যে কোন পদার্থকে জলে ডুবিতে না দিয়া ভাসমান রাখিবার ক্ষমতা ও গুণ রাখে। এইরূপ, রুদ্ধ বাতাসের প্রভাবে ফাঁপা 'লাইফ বেল্ট' ও 'বয়া' জলমগ্ন হইতে পারে না দেখা যায়।

হয়, আবার সেই জলের যে অংশে সেই ফল তাজা করিবার বিধান হইয়াছিল ঠিক সেই জলটুক্ বৃক্ষ মূলের অভ্যন্তরস্থ কৈশিক-শিরা-পথে, ঠিক সেই শুষ্কপ্রায় ফলের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাকে সরস করিয়া তোলে। তোমরা কিন্তু এমন করুণাময়ের সদয় ব্যবস্থার কথা ভুলিয়া গিয়া, পশুর ন্যায় চিন্তা-শূন্য অবস্থায় সেই ফল আহার করিয়া থাক। বৃষ্টি-জলের প্রত্যেক বিন্দুর উপর আল্লা ইহা লিখিয়া রাখিয়াছেন যে—এই বিন্দুটী অমুক স্থানে পড়িবে এবং অমুক জীবের জীবিকা রূপে পরিণত হইবে। বৃষ্টি-জলের বিন্দু সংখ্যা গণনা করিতে যদি পৃথিবীর সমস্ত লোক একত্র হয় তথাপি গণিয়া উঠিতে পারিবে না। মেঘের জল যদি একবারেই বর্ষিত হইয়া পড়িয়া যাইত তবে উদ্ভিদ জাতির অনিষ্ট ঘটিত। উদ্ভিদ যেমন ক্রমে ক্রমে বাড়ে তেমনি ক্রমে ক্রমে জলের প্রয়োজন হয়। ক্রমে ক্রমে জল-সিঞ্চনের ব্যবস্থা করিতে, বিশ্বপতি শীত ঋতুকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ঋতু-বৃন্দও অতি সাবধানতার সহিত নিয়মানুযায়ী স্বীয় কর্ত্তব্য-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। বায়ু-মণ্ডলস্থ জল-কণা, শীতের প্রভাবে তুষারের আকার ধারণ পূর্ব্বক ধুনিত তুলার ন্যায় পর্ব্বত-পৃষ্ঠ আচ্ছাদন করিয়া রাখে। কৌশলময় আল্লা, এইরূপে পর্ব্বতকে বরফের আলয় বানাইয়া রাখিয়াছেন। পার্ব্বত্য স্থানের বায়ু বড় শীতল তজ্জন্য পর্ব্বত-গাত্রে সর্ব্বদা বরফ জমিয়া থাকে এবং সে বরফ শীঘ্র গলিয়া যায় না। শীতের পর বসন্ত আসিলে শীতের প্রভাব কিছু কমে ও উষ্ণতার বৃদ্ধি পায়; তখন বরফ ক্রমে ক্রমে গলিতে আরম্ভ করে। তখন ঝরণা ও নদী দিয়া অধিক জল প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। গ্রীষ্মকালে বরফ গলিতে লাগিলে জলের মাত্রা আরও কিছু বৃদ্ধি হয়। তখন ক্ষেত্রে প্রয়োজন মত জল ব্যবহৃত হইতে থাকে। আবার দেখ, সদা সর্ব্বদা বৃষ্টিপাত হইতে থাকিলে জীব জন্তু ও উদ্ভিদ সকলেরই কষ্ট হইত—এমন কি অনিষ্ট হইত। আবার একই বারে সমস্ত জল বর্ষাইয়া দিয়া বৃষ্টিপাত বন্ধ করিলে উদ্ভিদরাজী সম্বৎসর ধরিয়া শুষ্ক থাকিত। দেখ, বরফ-সৃষ্টির মধ্যেও আল্লার মহা কৌশলময় দয়া নিহিত আছে।

করুণাময় আল্লার দয়া যে কেবল বরফ-সৃষ্টির মধ্যেই নিহিত আছে তাহা নহে—প্রত্যেক পদার্থের সৃষ্টির মধ্যে জগতের উপর আল্লার দয়া দেদীপ্যমান আছে। বরং ভূতল ও গগন-মণ্ডলের প্রত্যেক অংশ ও প্রত্যেক পদার্থ তিনি সত্য-সহকারে, বিচার পূর্ব্বক, কৌশল-পূর্ণ-সদয়-ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন এই কারণে আল্লা বলিতেছেন—

وَ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ○ مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

"গগন মণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং যাহা কিছু তদুভয়ের মধ্যে আছে এ সমস্ত আমি 'খেল্ তামাশা' স্বরূপ সৃষ্টি করি নাই। সত্য ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করি নাই কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক ইহা বুঝে না।" (২৫ পারা। সূরা দোখান। ২ রোকূ।) ইহার ভাবার্থ এই যে, আল্লা কোন পদার্থ নিরর্থক ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করেন নাই। সমস্ত পদার্থ সত্য সহকারে অর্থাৎ যে ভাবে করা উচিত ছিল ঠিক সেই ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন।

আল্লার অসীম গুণাবলীর সপ্তম নিদর্শন—গগন-রাজ্য ও তন্মধ্যস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক। গগন-রাজ্যে যত আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতেছে তাহার তুলনায় ভূমণ্ডলের ব্যাপার অতি সামান্য। গগন ও গগন-বিহারী গ্রহ নক্ষত্রাদির আশ্চর্য্য ব্যাপার চিন্তা করিয়া দেখিতে মহাপ্রভু কোর্‌আন শরীফের নানা স্থানে আদেশ করিয়াছেন। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন—

وَ جَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ○

"এবং আকাশকে আমি সুরক্ষিত ছাত করিয়াছি কিন্তু তাহারা (মানুষেরা) সে চিহ্ন দর্শনে বিমুখ আছে।" (১৭ পারা। সূরা আম্বীয়া। ৩ রোকূ।) তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

"গগন ও পৃথিবী সৃষ্টি করা অবশ্যই মনুষ্য সৃষ্টি অপেক্ষা অতীব কঠিন একথা কিন্তু অধিকাংশ মানব জানে না।" (২৪ পারা। সুরা মোমেন। ৬ রোকু।) আল্লা মানবকে গগন-রাজ্য দর্শনের আদেশ করিয়াছেন; একথায় ইহা বুঝিওনা যে, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আকাশের নীলিমা ও তারকাগণের উজ্জ্বলতা দেখিতে বলিয়াছেন। তদ্রূপ দর্শন পশুগণও করিয়া থাকে। * * *

এখন গ্রহ নক্ষত্রগণের গতি ও ঘুর্ণনের অবস্থা অবগত হও। তাহাদের উদয় ও অস্ত সম্বন্ধে চিন্তা কর। তাহারা কি পদার্থ এবং কেন সৃষ্ট হইয়াছে তৎসম্বন্ধে অনুধাবন কর। অসংখ্য নক্ষত্র ও তারকার সংখ্যা সম্বন্ধেও ভাবিয়া দেখ। বর্ণ ও উজ্জ্বলতা সম্বন্ধে তাহারা পৃথক পৃথক— কোনটী লোহিত, কোনটী শুভ্র, আবার কোনগুলি পারদ ধাতুর ন্যায়। আবার দেখ, কেহ ক্ষুদ্র কেহ বৃহৎ। পশ্চাৎ ইহাও দেখ যে, তাহাদের কতক গুলিকে কল্পনা বলে দলবদ্ধ করিলে এক একটী মূর্ত্তি বলিয়া বুঝা যায়—কোন দল মেষের আকার, কোন্‌গুলি বৃষের ন্যায়, আবার কোনগুলি বৃশ্চিকের সদৃশ দেখা যায়। এইরূপ কল্পনা করিলে, ভুপৃষ্ঠে যত প্রকার পদার্থ দেখা যায় তৎ সকলের মুর্ত্তি আকাশের তারা দ্বারা অঙ্কিত আছে বলিয়া কল্পনা করা যায়। তাহার পর, নক্ষত্রগণের গতি সম্বন্ধে চিন্তা কর— কতকগুলি এক মাসে সমস্ত আকাশ ভ্রমণ করে, কোন কোনগুলি এক বৎসরে, কোনগুলি বার বৎসরে আবার কোনগুলি ত্রিশ বৎসরে গগন-পথ পরিভ্রমণ করিয়া আসে। কতকগুলি তারা এরূপ ধীর ভাবে চলে যে বোধ হয় যেন তাহারা চিরকাল একস্থানে স্থির হইয়া আছে। আকাশ-মণ্ডল যদি চিরস্থায়ী থাকিত—প্রলয় না হইত—তবে ৩৬ হাজার বৎসরে ঐ তারাগুলি আকাশ পথ পার হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। যাহা হউক, গগন-মণ্ডলের বিস্ময়কর ব্যাপারের অন্ত নাই সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানেরও সীমা নাই। পাঠক, তোমরা যখন পৃথিবীর আশ্চর্য্য ব্যাপারের কিছু কিঞ্চিৎ চিনিয়াছ তখন বোধ হয় একথাও জানিতে পারিয়াছ যে, পদার্থ যত দূরে থাকে তাহার আকারও তত ক্ষুদ্র দেখা যায়। প্রথমে পৃথিবীর আকার কত বড় ভাবিয়া দেখ। ইহা এত বড় প্রকাণ্ড যে কোন ব্যক্তি ইহার সীমায় উপস্থিত হইতে পারে না। সূর্য্য, এই পৃথিবীর ১৬০ এক শত ষাইট গুণ বৃহৎ। (টী ৪১৪)

টীকা—৪১৪। এরূপ স্থলে এক শত ষাইট শব্দে ঠিক সংখ্যা প্রকাশ না করিয়া 'অসংখ্য' অর্থ প্রকাশ করে। 'বিশা শ' অর্থাৎ ১২০ একশত বিশ শব্দও ঐ প্রকার 'অসংখ্য' অর্থ

সেই অতি প্রকাণ্ড সূর্য্য পৃথিবী হইতে কতদূর ব্যবধানে থাকায় উহাকে এক খানি ক্ষুদ্র থালার ন্যায় দেখা যায় এ কথা একবার ভাবিয়া দেখ। ইহা হইতে বুঝিতে পারিবে, সূর্য্য কিরূপ ক্ষিপ্র গতিতে গগন-মণ্ডলে বিচরণ করিতেছে। অর্দ্ধ-ঘণ্টার মধ্যে সূর্য্যের পরিধি (বেড়) ভূ চক্রবাল পার হইতে দেখা যায় বটে কিন্তু সেই সময়ে পৃথিবীর দূরত্বের এক শত ষাইট গুণ পথ আকাশ মার্গের মধ্যে দিয়া চলিয়া যায়। একদিন মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) হজরৎ জেব্‌রায়েল ফেরেশ্‌তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"সূর্য্য কি ডুবে ?" তিনি বলিয়াছিলেন "না—হাঁ।" ইহা শুনিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "উহার অর্থ কি ?" হজরৎ জেব্‌রায়েল বলিয়াছিলেন "'না—হাঁ' বলিতে যে সময় লাগে, তন্মধ্যে সূর্য্য পাঁচশত বৎসরের পথ চলিয়া যায়।" (টীঃ ৪১৫) কোন কোন তারকা পৃথিবীর আকার অপেক্ষা শত শত গুণ বৃহৎ কিন্তু দূরত্বের আধিক্য জন্য নিতান্ত ক্ষুদ্র দেখা যায়। প্রিয় পাঠক! ভাবিয়া দেখ ঐরূপ বৃহৎ তারা আকাশে দুই দশটা নাই বরং অসংখ্য আছে। তারকা-মণ্ডলী আকাশে কত আছে তাহার সংখ্যা করা মানবের সাধ্যের অতীত। এরূপ অবস্থায় বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখ আকাশ কত বড়। সেই প্রকাণ্ড আকাশের ছবি তোমার এই ক্ষুদ্র চক্ষে অতি সহজে সমাবেশ হয়। ইহা হইতে সৃষ্টি-কর্ত্তা আল্লার অসীম ক্ষমতা ও আশ্চর্য্য কৌশলের কিছু পরিচয় পাইতে পার। প্রত্যেক গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে পৃথক পৃথক কৌশল ও প্রভাব নিহিত আছে; এবং প্রত্যেকের গতি, স্থিতি, প্রত্যাবর্ত্তন, উদয়, অস্ত এবং মধ্য-গগনে অবস্থান ইত্যাদি নানা অবস্থার মধ্যে বহু কৌশল ও বহু হেকমৎ নিহিত আছে। সূর্য্যের নানা অবস্থানের মধ্যে যত কৌশল স্থাপিত আছে তন্মধ্যে কতক গুলি অতি প্রকাশ্য। মহাকৌশলী সূর্য্যের পথটী রাশি-চক্রের মধ্যে দিয়া প্রসারিত রাখিয়াছেন তন্মধ্যেও বহু কৌশল স্থাপন করিয়াছেন। রাশি-

প্রকাশ করে আরবীতে '৭০ সত্তর, ৭০০ সাত শত' শব্দ ঠিক ঐরূপ অসংখ্য অর্থ প্রকাশ করে। বাঙ্গলা ভাষাতেও 'দশ' 'পাঁচ' হাজার ঐরূপ অসংখ্য-বাচক। বর্ত্তমান সময়ে সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা ১৩ তের লক্ষ গুণ বড় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

টীকা—৪১৫। উত্তরের ভাবার্থ এই—সূর্য্য ডুবেনা বা তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। দৈনিক গতিক্রমে পৃথিবী নিজের শরীর গড়াইয়া ঘুরে তাহাতে প্রায় ১২ ঘণ্টায় সূর্য্যের উদয়াস্ত দেখা যায় এবং বার্ষিক-গতি-ক্রমে প্রায় ৩৬৫ দিনে সূর্য্যের চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া আসে—তাহাতে ঋতু পরিবর্ত্তন এবং রৌদ্রের তীক্ষ্ণতা খর্ব্বতা বুঝা যায়। তদ্ব্যতীত সূর্য্য, পৃথিবী আদি গ্রহ ও উপগ্রহ সঙ্গে লইয়া আল্লার বিধান মতে শূন্য-পথে অতি ভয়ঙ্কর বেগে কোন নির্দ্দিষ্ট দিকে ধাবিত হইতেছে। সেই গতিক্রমে নিমিষ মধ্যে পাঁচশত বৎসরের পথ চলিয়া যায়।

চক্রের মধ্য দিয়া সূর্য্যের গতি থাকাতে এক ঋতুতে সূর্য্য মস্তকের উপর মধ্য-গগন দিয়া চলিয়া যায় এবং অন্য ঋতুতে মাথার উপর দিয়া না গিয়া কিছু হেলিয়া চলে। এই পরিবর্ত্তনে বায়ু মণ্ডলের ও শীতাতপের পরিবর্ত্তন ঘটে। ইহার ফলে শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু-ভেদ হয়। ঐ কারণে সূর্য্যের উদয় অস্তের স্থান পরিবর্ত্তন ও দিবা রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এইরূপ কথার বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে গেলে প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইতে পারে।

বিবিধ জ্ঞানের তুলনা—যাহা হউক, পাঠক! এ সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল আমাদের জ্ঞানের কথা ভাবিয়া দেখ। আমাদিগকে আল্লা দয়া করিয়া এই অল্প কয়েক বৎসর বয়সের মধ্যে যত জ্ঞান দান করিয়াছেন তাহা যদি বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হই, তবে বহু বৎসর লাগিবে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান, আওলীয়া আম্বীয়াদিগের জ্ঞানের তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ। আবার আওলীয়াগণের জ্ঞান, যাহা তাঁহারা আল্লার সৃষ্ট জগৎ-অধ্যায় পাঠ করিয়া সংগ্রহ করেন, তাহা আম্বীয়াগণের জ্ঞানের তুলনায় নিতান্ত অল্প। আবার আম্বীয়াদিগের জ্ঞান, প্রধান, প্রধান ফেরেশ্‌তাগণের জ্ঞানের তুলনায় নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। আবার এই সমস্ত শ্রেণীর জ্ঞান একত্র সমষ্টি করিয়া মহাপ্রভুর জ্ঞানের সহিত তুলনা করিতে গেলে, এমন তুচ্ছ বলিয়া বুঝা যাইবে যে, ইহাদের জ্ঞান-সমষ্টিকে জ্ঞান বলা শোভা পায় না। আল্লা! আল্লা! মহাপ্রভু বিশ্বপতির কি অপার মহিমা! তিনি স্বীয় দাসদিগকে জ্ঞান-ফল ভোগের সৌভাগ্য দান করিয়া এবং অনন্ত জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের প্রশস্ত রাজপথ সম্মুখে খুলিয়া দিয়া, অজ্ঞানতার দাগ প্রক্ষালন করিতে উৎসাহ দিতেছেন এবং বলিতেছেন—

মানবের জ্ঞান অতি নগন্য—আল্লার জ্ঞান অতুলনীয়।

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

"এবং তোমাদিগকে জ্ঞানের মধ্য হইতে কিছু সামান্য জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু দেওয়া হয় নাই।" (১৫ পারা। সুরা বনীএছরায়েল। ১০ রোকু)

সদ্ভাব চিন্তনের বিষয়-বস্তুর ক্রমোন্নত তালিকা—যাহা হউক, পাঠক! তোমার দেহ সম্বন্ধীয় আশ্চর্য্য ঘটনা তোমার যত নিকটবর্ত্তী, গগন মণ্ডল ও ভূমণ্ডল তোমার তত নিকটবর্ত্তী নহে। আবার গগন-মণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বিস্ময়কর ব্যাপারের সহিত তোমার দেহ-সম্বন্ধীয় আশ্চর্য্য

ঘটনা তুলনা করিলে একটী বালুকা-কণা তুল্যও হইতে পারে না। তুমি যখন তোমার দেহ সম্বন্ধীয় আশ্চর্য্য ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ জানিতে পার নাই তখন অসীম গগন-রাজ্যের অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার কিরূপে অবগত হইতে পারিবে? তোমাকে উন্নতির পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথমে তোমার নিজের সম্বন্ধে সকল কথা জানিয়া লও, পরে পৃথিবীর সম্বন্ধে জান; তাহার পর সমস্ত উদ্‌ভিদ, জীব জন্তু ও সমস্ত জড় পদার্থের আশ্চর্য্য গুণ অবগত হও। তাহার পর বায়ু ও বায়ু মধ্যস্থ মেঘাদির বিস্ময়কর ব্যাপার বুঝিয়া লইয়া অবশেষে আকাশ ও গ্রহ নক্ষত্রাদির অদ্ভূত ব্যাপার অবগত হইতে চেষ্টা কর। এই সকল বুঝিয়া লইয়া পরে আল্লার 'কুরছী' (আসন) ও 'আর্‌শ্' কি পদার্থ, বুঝিবার চেষ্টা কর। তাহার পর জড় জগৎ ত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক জগতের পর্য্যালোচনায় নিমগ্ন হও। তৎসমুদয়ের তথ্য অবগত হইলে, ফেরেশ্‌তা শয়তান ও জেন কিরূপ পদার্থ, জানিতে চেষ্টা কর। শেষে ফেরেশ্‌তাগণের শ্রেণী-বিভাগ এবং তাহাদের বিভিন্ন 'মোকাম' চিনিয়া লও। (টীঃ ৪১৬)।

আল্লার শিল্প-নৈপুণ্যের ক্রমিক উপলব্ধি সদ্ভাব-চিন্তন দ্বারা সম্ভব—পাঠক, চিন্তার ধরণ বুঝাইবার উপলক্ষে এখন যাহা বলা গেল তাহা একটী নমুনা মাত্র। এই ধরণে চিন্তা করিতে লাগিলে নিজের মোহ চিনিতে পারিবে। দেখ, তুমি কোন আমীরের সুরম্য সৌধ এবং বিচিত্র বালাখানা দর্শন করিলে তাহার শিল্প-নৈপুণ্য দর্শনে মুগ্ধ হও এবং বহু দিন ধরিয়া প্রশংসা করিতে থাক; কিন্তু আল্লার এই অত্যাশ্চর্য্য বৈচিত্রময় গৃহে তোমরা সর্ব্বদা বাস করিতেছ অথচ এ গৃহের শিল্প-নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছ না!

বিশ্বজগত আল্লার গৃহ

এই বিশ্ব-জগত আল্লার গৃহ। ভূতল তাহার 'ফরশ', আকাশ উহার ছাত। বিনা স্তম্ভে এত বড় প্রকাণ্ড ছাত বর্ত্তমান আছে, ইহা নিতান্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। পাহাড় পর্ব্বত, সেই রাজপ্রাসাদের ধন-ভাণ্ডার এবং সমুদ্র তাহার রত্নাধার। জীব ও বৃক্ষ-লতা ইত্যাদি উহার গৃহ-সামগ্রী; চন্দ্র সে গৃহের প্রদীপ; সূর্য্য, মশাল; নক্ষত্র-রাজী, ঝাড় লণ্ঠন; এবং ফেরেশ্‌তাগণ মশালচী। কিন্তু তোমরা এই মহারাজ-প্রাসাদের সৌন্দর্য্য ও আশ্চর্য্য বৈচিত্র দর্শনে অন্ধ হইয়া বাস

টীকা—৪১৬। মূল গ্রন্থে এই প্যারাটী পূর্ব্ববর্ত্তী প্যারা দুইটীর প্রথমে তারকা চিহ্নিত স্থানে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা হইল।

করিতেছ। ইহার কারণ এই যে, এই বিশ্বরাজ-প্রাসাদ অসীম ও বৃহৎ— কিন্তু তোমাদের চক্ষু নিতান্ত ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্র চক্ষে তত বড় গৃহ দেখিতে পাইতেছ না? তোমাদের সাদৃশ্য একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকার ন্যায়, সে পিপীলিকা রাজ-প্রাসাদের কোন স্থানে ছিদ্র মধ্যে বাস করে। সে নিজের বাস-গৃহ, আহার এবং বন্ধু-বান্ধব ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পায় না, তদ্ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের সংবাদও রাখেনা এবং চিন্তাও করে না। রাজ-প্রাসাদের সৌন্দর্য্য, দাস দাসীদিগের বাহার, রাজসিংহাসনের প্রতাপ, এ সমস্তের কিছুই সে পিপীলিকা জানে না। তুমি যদি সেই পিপীলিকার ন্যায় জীবন যাপন করিতে চাও তবে যেমন ভাবে আছ তেমনই থাক। তোমাকে কিন্তু আল্লার-পরিচয়-রূপ-উদ্যানের আশ্চর্য্য তামাশা দর্শনের পন্থা দেখান গেল। তুমি বাহিরে আসিয়া চক্ষু খোল—দেখিবে, আল্লার শিল্প-নৈপুণ্য তোমার চক্ষে পড়িবে, এবং তোমাকে আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িতে হইবে। (আল্লা ভাল জানেন)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আল্লার প্রতি ভরসা।

توكل و توحيد

তওয়াক্কোল—আল্লার প্রতি ভরসা ও তওহীদ—একত্বজ্ঞান।

তওয়াক্কোল মনের একটী সর্ব্বোন্নত অবস্থা—প্রিয় পাঠক! জানিয়া রাখ, মনের একটী সর্ব্বোন্নত অবস্থার নাম 'তওয়াক্কোল'। সাধু দরবেশগণের মন যে সকল উচ্চ অবস্থায় উন্নত হইলে আল্লার নৈকট্য পাইতে পারে, সেই সকল অবস্থার মধ্যে 'তওয়াক্কোল' একটী উচ্চতম অবস্থা। ইহার শ্রেণী অতীব উর্দ্ধে স্থাপিত।

তওয়াক্কোলের পথে কিরূপ বাধা আসিতে পারে? তওয়াক্কোল সম্বন্ধীয় জ্ঞান নিতান্ত সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বোধ্য; তজ্জন্য তওয়াক্কোল অনুসারে চলা ও কাজ করা নিতান্ত দুষ্কর ও কঠিন এবং সে কাঠিন্য এমন ভাবে

জড়িত হইয়া আছে যে একটু ইতর বিশেষ হইলে ঈমানের (বিশ্বাসের) সর্ব্বনাশ হয়। দেখ, যে ব্যক্তি, মানবের কার্য্যাবলীর মধ্যে, আল্লা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের দখল আছে বলিয়া মনে করে, সে ব্যক্তি একেশ্বরবাদী (এক আল্লা পরস্ত) বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। পুনরায় দেখ, বিশ্ব-নিয়ন্তা আল্লা, ও মানবীয় কার্য্য, এতদুভয়ের মধ্য হইতে উপাদান, উপকরণ বা মধ্যবর্ত্তী কারণগুলি বাদ দিলে '**শরীঅৎ**' অর্থাৎ ব্যবহারিক ধর্ম্ম-নীতির অবমাননা করা হয়। পুনরায় দেখ, মানবীয় কার্য্যাবলীর প্রকাশ্য কারণ সমূহের মধ্য হইতে কোন কারণ বাদ দিলে **বুদ্ধির** অপব্যবহার করা হয়। আরও দেখ, প্রকাশ্য কারণ সমূহের মধ্যে কোন কারণকে প্রধান বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতি ভরসা বান্ধিলে, প্রকৃত **তওহীদ**-বিশ্বাসী 'আল্লা পরস্ত' অর্থাৎ একেশ্বর বাদীর উন্নত শ্রেণী হইতে ভ্রষ্ট হইবার ভয় জন্মিতে পারে।

বুদ্ধি, শরীঅৎ ও তওহীদের যোগেই প্রকৃত তওয়াক্কোল জন্মে।

যাহা হউক, উল্লিখিত **বুদ্ধি, শরীঅৎ ও তওহীদ** (আল্লার প্রতি বিশ্বাস) এই তিনটীর একত্র নিয়মিত মিলনে তওয়াক্কোল অর্থাৎ আল্লার প্রতি নির্ভরতা-ভাব গঠিত হওয়া আবশ্যক, কেননা এই বুদ্ধি, 'শরীঅৎ' ও 'তওহীদের যোগেই প্রকৃত 'তওয়াক্কোল' জন্মিতে পারে। মনের এই ভাব বা অবস্থা অবশ্যই বড় সূক্ষ্ম ও দুর্লভ পদার্থ। উহা সকলে লাভ করিতে পারে না। এই কারণে আমরা প্রথমে আল্লার প্রতি বিশ্বাসের মোটামুটি বিবরণ দিয়া পরে উহার প্রকৃত-পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। পরিশেষে আল্লার প্রতি নির্ভরতা জন্মিলে মনের যে অবস্থা ঘটে এবং যেরূপ কার্য্য করণের চেষ্টা হয় তাহাও বলা যাইবে।

আল্লার প্রতি নির্ভরতার গৌরব সম্বন্ধে কোরআন হদীছ ও মহাজন উক্তি—প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, মহাপ্রভু আল্লা বলিয়াছেন—

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

"তোমরা যদি মোমেন হও তবে আল্লার উপর তওয়াক্কোল কর।" (৬ পারা। সূরা ময়দা। ৪ রোকূ)। মহাপ্রভু আল্লা, সকল ঈমানওয়ালা লোকের প্রতি, আল্লার উপর তওয়াক্কোল করিবার আদেশ করিয়াছেন—তওয়াক্কোলধারী লোকের মনে ঈমান থাকা একটী শর্ৎ অর্থাৎ অপরিহার্য্য নিয়ম। ২। এই কারণে আল্লা পুনরায় বলিয়াছেন—

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝

"নিশ্চয় আল্লা তওয়াক্কোলধারী লোকদিগকে ভাল বাসেন।" (৪ পারা। স্বরা আল্ এমরান। ১৭ রোকু)। ৩। তিনি পুনরায় বলিয়াছেন—

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۝

"যে ব্যক্তি আল্লার উপর ভরসা বান্ধে, আল্লাই তাহার যথেষ্ট (সহায়)।" (২৮ পারা। স্বরা তালাক। ১ রোকু) ৪। পুনরায় তিনি বলিয়াছেন—

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ۝

"আল্লা কি তাঁহার দাসের (রক্ষণাবেক্ষণে) প্রচুর নহেন?" (২৪ পারা। স্বরা জমর। ৪ রোকু)। তওয়াক্কোলের মাহাত্ম্য ও গৌরব প্রদর্শন জন্য উক্ত প্রকার বহু আয়াৎ প্রমাণ স্বরূপ দেখান যাইতে পারে।

১। মহাপুরুষ হজরৎ রস্থুল (ছাঃ) বলিয়াছেন—"মহাপ্রভু আল্লা আমাকে তাঁহার অভিপ্রায়ের বহু চিহ্ন দেখাইয়াছেন; তন্মধ্যে ইহাও দেখাইয়াছেন যে আমার ওম্মৎ (অনুবর্ত্তী) মণ্ডলীর সংখ্যা এত অধিক হইবে যে, ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বস্থান—সমতল ভূমি, পাহাড় পর্ব্বত, এমন কি প্রান্তর জঙ্গল সমস্তই পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। এই চিহ্ন দেখিয়া আমি নিতান্ত প্রীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। বিশ্বপ্রভু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'ওম্মৎ সংখ্যা অনন্ত দর্শনে তুমি সন্তুষ্ট হইয়াছ কি না' তদুত্তরে আমি আমার হৃদয়ের সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি (হজরৎ) ইহাও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে পৃথিবীতে মুছলমান সংখ্যা তদ্রূপ অসংখ্য বৃদ্ধি পাইলেও কেবল ৭০ সহস্তর হাজার মুছলমান বেহেশ্‌তে যাইবে। এ কথা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'হে রস্থলুল্লা! তাঁহারা কে?' তিনি বলিয়াছিলেন—"যাহারা মন্ত্র তন্ত্রের প্রতি নির্ভর করে না এবং শুভাশুভ 'লগ্ন' দেখিয়া কাজ করে না, বরং কেবল আল্লা ভিন্ন অন্য কিছুর প্রতি ভরসা রাখে না।" ইহা শ্রবণ করতঃ মহাত্মা ওকাশা দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিয়াছিলেন—"হে রস্থলুল্লা! আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি উক্ত সহস্তর হাজার লোকের মধ্যে স্থান পাইতে পারি।" মহাত্মা ওকাশার প্রার্থনা পূরণের জন্য আল্লার সমীপে হজরৎ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অতঃপর আর এক জন ছাহাবা গাত্রোত্থান করতঃ তদ্রূপ প্রার্থনা

জ্ঞাপন করিলে হজরৎ সুধু এই কথা বলিয়াছিলেন—'ওকাশা, এ ক্ষেত্রে অপরকে পশ্চাৎ ফেলিয়া অগ্রসর হইয়াছে।' ২। অন্য একদিন মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ ছাহাবাদিগকে লক্ষ্য করতঃ বলিয়াছিলেন—"যদি তোমরা প্রকৃত 'তওয়াক্কোলে'র মত 'তওয়াক্কোল' করিতে পার, তবে আল্লা তোমাদিগকে এমন অতর্কিত ও অজানিত স্থান হইতে উপজীবিকা দিবেন যেমন তিনি পক্ষীদিগকে দিয়া থাকেন।" পক্ষীগণ প্রাতে ক্ষুধিত অবস্থায় বাসা ত্যাগ করে এবং সন্ধ্যা বেলা তৃপ্তির সহিত উদর পূর্ণ করিয়া ঘরে ফিরে। ৩। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি আল্লার আশ্রয় চায়, আল্লা তাহার সমস্ত কার্য্যের সরবরাহ করিয়া থাকেন; আল্লাই তাহার প্রচুর সহায়; এবং এমন স্থান হইতে তাহাকে জীবিকা দেন যাহা পূর্ব্বে তাহার কল্পনাতেও উদয় হয় নাই; কিন্তু যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন পদার্থের আশ্রয় লয়, আল্লা তাহাকে সংসারের সঙ্গে ত্যাগ করিয়া থাকেন।"

১। কাফেরগণ যে সময়ে মহাত্মা হজরৎ এব্‌রাহীম নবী عم কে চড়কে বান্ধিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের আয়োজন করিতেছিল তখন তিনি বলিয়াছিলেন—

حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ○

"আল্লা আমার পক্ষে যথেষ্ট সহায়, এবং তিনি আমার উত্তম উকীল।" উক্ত মহাত্মা যে সময়ে চড়ক হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া বাতাসের ভিতর দিয়া পড়িতেছিলেন তখন হজরৎ জেব্‌রাইল ভয়ত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"এ সময়ে আমি কি আপনার কোন সাহায্য করিতে পারি?" মহাত্মা উত্তর করিয়াছিলেন—"আপনার নিকট হইতে সাহায্য লইবার কোন প্রয়োজন নাই।" "আল্লা আমার পক্ষে যথেষ্ট সহায়" এই কথা বলাতে অন্যের স্থানে সাহায্য না লইবার অঙ্গীকার বুঝা যায়। তেমন কঠিন বিপদের সময়ে জেব্‌রাইলের যাচিত সাহায্য না লওয়াতে তাঁহার সে অঙ্গীকার পূর্ণভাবে পালন করা হইয়াছিল। মহাপ্রভু সেই কারণে নবী মহোদয়কে وفى (ওফ্‌ফা) অঙ্গীকার-পালক বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰى ○

"এবং এব্‌রাহীম 'ওফাদার' অর্থাৎ অঙ্গীকারপালক।" (২৭ পারা। সূরা নজম। ৩ রোকু)। ২। মহাত্মা হজরৎ দাউদ নবী عم কে মহাপ্রভু প্রত্যাদেশ

করিয়াছিলেন—"হে দাউদ! যে ব্যক্তি সকল আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কেবল আমার আশ্রয়ে মাথা লুকাইয়াছে, সমগ্র ভূতল ও গগন-মণ্ডল তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও আমি তাহাকে সর্ব্ববিধ বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিব।" ৩। মহাত্মা ছইদ এব্‌নে জবয়ের বলিয়াছেন একদা এক বিচ্ছু তাঁহার হস্তে দংশন করে। তাঁহার মাতা তাঁহাকে শপথ দিয়া হস্তখানী মন্ত্র-পাঠক ওঝার সম্মুখে খুলিয়া ধরিতে আদেশ করেন। তিনি মাতার শপথে বাধ্য হইয়া যে হস্তখানী সুস্থ ছিল—বিচ্ছুতে কাটে নাই—সেই হস্তখানী ওঝার সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—"আমি মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ছাঃ) মুখে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তি মন্ত্র বা দাগ বিশ্বাস করে এবং তাহার উপর ভরসা বান্ধে সে তওয়াক্কোলধারী নহে।" ৪। মহাত্মা হজরৎ এব্‌রাহীম আদ্‌হম বলিয়াছেন—"আমি এক খৃষ্টান সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 'তিনি জীবিকা কোথা হইতে পান।' সন্ন্যাসী মহোদয় বলিয়াছিলেন—'কোথা হইতে পাই তাহা তো আমি জানিনা, তবে যদি তোমার প্রয়োজন হয়, তবে যিনি আমাকে জীবিকা দেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার।'" ৫। কতকগুলি লোক এক জন সাধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'আপনি সর্ব্বদা এবাদৎ কার্য্যে নিমগ্ন থাকেন; কিরূপে আহার চলে?' এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্বীয় হস্তের অঙ্গুলি নিজের দন্তের দিকে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাহার অর্থ এই যে যিনি এই দন্তকে শিল-পাটার ন্যায় করিয়াছেন তিনি অবশ্যই পিশিবার জন্য শস্যও দিবেন। ৬। মহাত্মা হারম এব্‌নে হায়ান একদিন মহাত্মা ওয়ায়েছ করণীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আমাকে কোন্ দেশে বাস করিতে আদেশ করিতেছেন?" মহাত্মা বলিয়াছিলেন—'তুমি শাম দেশে গিয়া বাস কর।' মহাত্মা হারম জিজ্ঞাসা করিলেন—"তথায় জীবিকা কি উপায়ে চলিবে?" মহাত্মা ওয়ায়েছ বলিয়াছিলেন—'যে মনে সন্দেহ আছে তাহা শোচনীয়। সে মনে উপদেশ কোন কাজে লাগে না।'

তওয়াক্কোলের বুনিয়াদ। পাঠক জানিয়া রাখ—মনের উন্নত অবস্থাগুলির মধ্যে 'তওয়াক্কোল' একটী প্রধান অবস্থা। উহাকে ঈমান (বিশ্বাস-জ্ঞান) এর ফল বলা যায়। বিশ্বাস-জ্ঞানের বহু শ্রেণী ও নানা শাখা প্রশাখা আছে। তাহার দুই শাখার উপর তওয়াক্কোল স্থাপিত; সুতরাং তওয়াক্কোলের দুইটী বুনিয়াদ আছে। **প্রথম**—তওহীদ অর্থাৎ 'আল্লা এক' এই কথা বিশ্বাস

তওয়াক্কোল—ঈমানের ফল

করা। (টীঃ ৪১৭) **দ্বিতীয়—মানুষের উপর আল্লার অসীম ভালবাসা—** অর্থাৎ আল্লা মানুষকে অসীম ভাল বাসেন এবং সর্ব্বদাই তাহার মঙ্গল বিধান করেন এই কথা বিশ্বাস করা। তওহীদ বা আল্লার সম্বন্ধে একত্ব-জ্ঞান, সমস্ত জ্ঞানের চরম সীমা। তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া নিতান্তই কঠিন তথাপি সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক।

তওয়াক্কোলের প্রথম বুনিয়াদ—তওহীদের পরিচয়। তওহীদ অর্থাৎ 'আল্লা এক' এই জ্ঞানের চারিটী শ্রেণী আছে। (টীঃ ৪১৮)

তওহীদের শ্রেণী-বিভাগ- চতুর্ব্বিধ

প্রথম—ছিলকা বা ছোবড়া, **দ্বিতীয়**—খুলী বা শক্ত আবরণ। **তৃতীয়**—উহার মগজ। **চতুর্থ**—মগজের মগজ বা সার ভাগ। 'একত্ব-জ্ঞানের' দুইটী অসার আবরণ ও দুইটী সার ভাগ আছে। উহার চারি ভাগ কাঁচা আখরোট ফলের চারি ভাগের সদৃশ। বাহিরের ভাগ ছোবড়া; তদভ্যন্তরের ভাগ শক্ত খুলী। ভিতরের প্রকাশ্য ভাগ শাঁস এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুপ্তভাগ, শাঁসের সার বা তন্মধ্যস্থ তৈল।

টীকা—৪১৭। তওহীদ শব্দটী وحد (এক) এই মৌলিক শব্দ হইতে উৎপন্ন। ছুফীদিগের কথায় উহার অর্থ 'আল্লাকে এক বলিয়া জানা।' মূল গ্রন্থে উহাকে সদ্য-পক্ক আখরোট ফলের চারি অবস্থার তুলনায় চারি ভাগ করা হইয়াছে। (১) মোনাফেক লোকের মৌখিক বিশ্বাস। তাহারা অন্তরের সহিত না মানিয়া কেবল মুখে আল্লাকে এক বলিয়া প্রকাশ করে। উহাকে বাস্তবিক 'বিশ্বাস' বলা যায় না। উহা এক প্রকার জঘন্য প্রতারণা মাত্র। তাহা আখরোট ফলের ছিলকা সদৃশ—কোন কাজের নহে; তথাপি মৌখিক স্বীকার করিয়া প্রকৃত মুছলমানের সহিত মিশিয়া তাঁহাদের সাধারণ-ভোগ্য উপকার ভোগ করিতে পায়। অথচ প্রকাশ্য কাফের অপেক্ষা মুছলমান জাতির অধিক ক্ষতি করিয়া প্রাণ দণ্ড হইতে বাঁচিয়া যায়। (২) সাধারণ লোকের আন্তরিক বিশ্বাস। ইহার দুই প্রকার আছে। এক প্রকার তকলিদী—ইহা সাধারণ লোকের অন্ধ-বিশ্বাস। পিতা মাতা প্রভৃতি ভক্তি-ভাজন গুরু লোকের মুখে আল্লার কথা শুনিয়া ও তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া 'দেখাদেখী' ভাবে তাঁহাদের পদানুসরণ করিতে থাকে। পরে অভ্যাসের ফলে সে বিশ্বাস মনের উপর দৃঢ় হয়। অন্য প্রকার দলিলী (প্রমাণ-সিদ্ধ)—ইহা বুদ্ধির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণে লব্ধ হয় এবং বক্তাদিগের মুখে শুনিয়া বিশ্বাস করিয়া লওয়া হয়, ইহা এক প্রকার জ্ঞান এবং আখরোটের খুলী সদৃশ। (৩) চক্ষুষ্মান আরেফ লোকের প্রত্যক্ষ-দর্শন। তাঁহারা জ্ঞান-চক্ষে আল্লাকে এক বলিয়া জানিতে পারেন—ইহা আখরোটের শাঁস তুল্য (৪) সিদ্ধ-পুরুষের একত্ব-জ্ঞান। বিশ্ব-জগতের সকল পদার্থ মধ্যে এক আল্লা আছেন—ইহা সুস্পষ্ট অনুভব করা। ইহা আখরোট শাঁসের সার তৈল সদৃশ। এই চারি শ্রেণীর 'তওহীদ' জ্ঞানের মধ্যে প্রত্যক্ষ-দর্শন-লব্ধ তৃতীয় শ্রেণীর জ্ঞানই 'তওয়া-ক্কোলের' প্রথম বুনিয়াদ।

টীকা—৪১৮। মূল গ্রন্থে তওহীদের চারিভাগ যে পর্য্যায় ক্রমে দেখা গিয়াছে, পরিচয় দিবার বাগে ইহার উল্টা হইয়াছে, অনুবাদে যথারীতি সাজান গেল।

প্রথম শ্রেণীর তওহীদ—তওহীদ বা 'আল্লা এক' এই প্রথম ভাগ অতি প্রকাশ্য। উহাকে বাহ্যাংশ বলা যাইতে পারে। এই অবস্থায় লোকে কেবল মুখে 'লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্' কল্‌মা পড়ে মাত্র, কিন্তু মনে তাহার অর্থ প্রত্যয় করে না। এরূপ একত্ব-বিশ্বাস কেবল মোনাফেক (কপটী) লোকের হইয়া থাকে। *** প্রথম শ্রেণীর তওহীদ অর্থাৎ মৌখিক একত্ব-জ্ঞান—ইহা কপটী লোকের বিশ্বাস। উহা আখরোট ফলের বাহিরের ছোবড়া সদৃশ। পাঠক, কাঁচা আখরোটের বাহিরের ছোবড়া দেখিতে সুন্দর সবুজ বর্ণ—তজ্জন্য চক্ষুর আনন্দদায়ক-কিন্তু খাইতে লাগিলে নিতান্ত বিস্বাদ লাগে। উহা আগুনে পোড়াইতে গেলেও কোন লাভ হয় না; তাহা হইতে যে ধূম নির্গত হয় তাহা নিতান্ত অপ্রিয়, আবার পোড়াইতে লাগিলে অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া ফেলে। উহা সঞ্চয় করিয়া রাখিবার উপযুক্ত পদার্থ নহে। ভবিষ্যতেও কোন কাজে লাগেনা এবং ঘরে রাখিলে অনর্থক আবর্জ্জনার ন্যায় কত খালী স্থান আটক রাখে। জ্বালান কাজ বা অন্য কোন কাজে উহা আবশ্যক হয় না। তথাপি উহাকে কিছু দিন ফলের পৃষ্ঠে লাগিয়া থাকিতে দিলে অভ্যন্তরের খুলী তাজা রাখে, আবাব তজ্জন্য কোন পীড়া বা কীট ফলের শাঁস নষ্ট করিতে পারে না। এই প্রকার কপটী 'মোনাফেক' লোকের ধর্ম্ম-বিশ্বাস কোন কাজের নহে; তথাপি সেই মৌখিক বিশ্বাস-বাক্য উহাদের শরীরকে তল্‌ওয়ার হইতে রক্ষা করে। (টীঃ ৪১৯) 'মোনাফেক' লোক আল্লাকে যেরূপ ভাবে বিশ্বাস করে তাহা আখরোট ফলের 'ছোবড়া' সদৃশ। তাহারা মুখে আল্লাকে এক বলিয়া প্রকাশ করে এবং মুছলমান বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়—তাহাতে এই লাভ হয় যে উহাদিগকে মুছলমানদিগের শত্রু বলিয়া ধরা

টীকা—৪১৯। কপটী মোনাফেক লোক 'কাফের' হইতেও জঘন্য এবং মানব সমাজের অধিক ক্ষতিকর। 'কাফের' লোক না বুঝিয়া বা ভ্রমে পড়িয়া আল্লার আদেশ মত চলিতে পারে না; কিন্তু মোনাফেক মুখে সব মানে, মনেও উহার বিপরীত সঙ্কল্প করে এবং সুযোগ পাইলে সাধু মানব-সমাজেরও ক্ষতি করে—বাহিরে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এই জন্য প্রকৃত সাধু মুছলমান, মোনাফেকের অনিষ্টকারিতা হইতে বাঁচিতে পারে না। এই জন্য বাছিয়া বাছিয়া মোনাফেক লোককে হত্যা করা সমাজের হিতকর। ইহা বুঝাইতে একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—গাঁজা-ক্ষেত্রে দুই প্রকার চারা থাকে, দেখিতে উভয়ই সমান। এক প্রকার চারা নিজে তো কোন ফল-পুষ্প দিবে না অধিকন্তু প্রকাণ্ড ক্ষেত্র-মধ্যে তদ্রূপ ২।১টী চারা থাকিলে সমস্ত চারাকে নষ্ট করিয়া দেয়। এজন্য কৃষক বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তদ্রূপ ক্ষতিকর চারা কর্ত্তন করে। মোনাফেক লোককেও সমাজ হইতে কর্ত্তন করা আবশ্যক—তবে সুখের বিষয় এখন মানব সমাজে তদ্রূপ ক্ষতিকর মোনাফেক লোক নাই।

যায় না। সুতরাং তাহাদের শরীরও তল্ওয়ার দ্বারা কাটা হয় না। কিন্তু উহাদের দেহ যখন মৃত্যু ঘটনায় খসিয়া পড়িবে তখন তাহাদের প্রতারণা-মূলক মৌখিক 'বিশ্বাসে' আত্মারূপ শাঁসকে রক্ষা করিতে পারিবে না। (টীঃ ৪২০)

দ্বিতীয় শ্রেণীর তওহীদ—ইহা প্রথম শ্রেণীর তওহীদ অপেক্ষা গুপ্ত। এ অবস্থায় লোকে 'লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্' কল্মার অর্থ, ভক্তি-ভাজন লোকের মুখে শুনিয়া ও তাঁহাদের ব্যবহার দেখিয়া অন্তরের সহিত মানিয়া লয় ও প্রত্যয় করে। এরূপ জ্ঞান সর্ব্বসাধারণ মুছলমান লোকের হইয়া থাকে। ইহার আর এক প্রকার ভেদ আছে, তাহাকে লোকে যুক্তি-প্রমাণে ও বুদ্ধি-বলে বিশ্বাস করিয়া লইয়া থাকে। ইহা যুক্তি-অনুসন্ধানকারী বৈজ্ঞানিক লোকের জ্ঞান। * * * আত্মার রক্ষার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর তওহীদ আবশ্যক। আখরোটের 'খুলী' তাহার ছোবড়ার ন্যায় তত অকর্ম্মণ্য নহে। 'খুলীর' আবরণে শাঁস যেমন নিরাপদ থাকে তদ্রূপ আল্লার সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্বাস মানবের আত্মাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করে। আল্লার সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রকার বিশ্বাস দুই উপায়ে লব্ধ হয়—(১) تقليد তক্লীদ্ অর্থাৎ 'দেখাদেখী' বা অনুগমন—পিতা মাতা প্রভৃতি ভক্তি ভাজন আপ্ত গুরু লোকেরা আল্লাকে যে ভাবে মানে তাহা লোকে বাল্যকাল হইতে 'দেখাদেখী' শিখিয়া লয়; ইহা সাধারণ লোকের 'বিশ্বাস'। (২) دليل দলীল—জ্ঞানী বুদ্ধিমান লোকের মুখে যুক্তি ও প্রমাণ শুনিয়া আল্লাকে এক বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। এই উভয় উপায়ে আল্লার সম্বন্ধে যে বিশ্বাস জন্মে তাহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্বাস বলিয়া ধরা গেল। এইরূপ বিশ্বাস, মানবাত্মাকে দোজখের অগ্নি হইতে বাঁচাইতে পারে। ইহা আখ্রোট ফলের দ্বিতীয় আবরণ খুলীর সদৃশ। খুলীর আবরণে শাঁস রক্ষা পায়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর 'বিশ্বাস' অর্থাৎ আল্লার সম্বন্ধীয় বিশ্বাস যদিও আত্মাকে নিরাপদে রক্ষা করিতে পারে বটে তথাপি উহার মধ্যে আল্লার সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট জ্ঞান বা সেই জ্ঞানের সার পদার্থ যে 'একত্ব-জ্ঞান' তাহা পাওয়া যায় না। আখ্রোটের খুলিতে যেমন উপাদেয় শাঁস এবং সেই শাঁসস্থ পবিত্র তৈল পাওয়া যায় না—আল্লার সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় শ্রেণীর 'বিশ্বাস' যাহা আপ্ত লোকের 'দেখাদেখী' বিশ্বাস করা হয় বা জ্ঞানী লোকের প্রদর্শিত যুক্তি ও প্রমাণ হইতে

টীকা—৪২০। পরবর্ত্তী ছয়টী প্যারার নীচে, যে তিন লাইন তারকা চিহ্নিত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম লাইনের স্থানে, মূল গ্রন্থে এই প্যারার শেষাংশটুকু (তারকা-চিহ্নিত স্থান হইতে শেষ পর্য্যন্ত বাক্যগুলি) সংক্ষেপে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা হইল।

লব্ধ হয় তাহাতে 'চাক্ষুস প্রত্যক্ষের ধ্রুবত্ব' এবং 'একত্ব-জ্ঞানের মাধুর্য্য' থাকে না। (টীঃ ৪২১)।

তৃতীয় শ্রেণীর তওহীদ—ইহা জ্ঞান-চক্ষুর সাহায্যে ('মোশাহেদা' বা) প্রত্যক্ষ-দর্শন। যাঁহাদের এরূপ জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে তাঁহারা সমস্ত পদার্থের মূলে একমাত্র আল্লাকে দেখিতে পান এবং সমস্ত কার্য্যের মধ্যে এক আল্লাকেই কর্ত্তা বলিয়া বুঝিতে পারেন—তদ্‌ব্যতীত অন্য কোন কর্ত্তা দেখিতে পান না। এই শ্রেণীর লোকের একত্বজ্ঞান এক প্রকার আলোক সদৃশ। উহা হৃদয়ের মধ্যে উৎপন্ন হয় এবং তাহার প্রভাবে প্রত্যক্ষ-দর্শন লব্ধ হয়। * * * তৃতীয় শ্রেণীর তওহীদ জ্ঞান খুলিয়া গেলে অর্থাৎ বিশ্ব-জগতের মধ্যে সর্ব্বত্র আল্লার কার্য্যাবলী দর্শন করিলে তাঁহার সম্বন্ধে যে বিশ্বাস মনে বদ্ধমূল হয় তাহা তখন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আকার ধারণ করে। আল্লার সম্বন্ধে এই শ্রেণীর জ্ঞানের মধ্যেও তখন বহুত্ব-বোধ ও পার্থক্য-জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে। (টীঃ ৪২২)।

তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্বাস-জ্ঞান সাধারণ লোকের 'আপ্তবিশ্বাসের' বা বৈজ্ঞানিকদিগের যুক্তি-লব্ধ-বিশ্বাসের অনুরূপ নহে। ইহাদের বিশ্বাস-জ্ঞান এক শ্রেণীর এবং উহাদের (তৃতীয় শ্রেণীর) প্রত্যক্ষ-দর্শন অন্য শ্রেণীর। এই শেষোক্ত দুই দলের যে বিশ্বাস লব্ধ হয় তন্মধ্যে সাধারণ লোকের বিশ্বাস—আপ্ত লোকের বা ভক্তি-ভাজন-জনের পদানুসরণে বা দেখাদেখী জন্মে এবং বৈজ্ঞানিকদিগের বিশ্বাস, প্রমাণ ও যুক্তির প্রভাবে, মনের উপর বান্ধিয়া লওয়া হয়; কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর জ্ঞান প্রত্যক্ষ-দর্শন হইতে লব্ধ। এই শ্রেণীর জ্ঞানে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দেয় এবং দর্শন-পথের সমস্ত পর্‌দা ও 'আটক-বাধক' দূর করিয়া ফেলে। দ্বিতীয় ভাগের দুই প্রকার বিশ্বাসের সহিত তৃতীয় ভাগস্থ প্রত্যক্ষ-দর্শনের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। একজন লোক অপরের মুখে শুনিল যে অমুক আমীর গৃহের অভ্যন্তরে আছেন। এই কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি আমীরের গৃহে অবস্থান মানিয়া লইল। ইহার বিশ্বাস, সাধারণ লোকের বিশ্বাসের অনুরূপ হইল। ইহাদের বিশ্বাস পিতা

আপ্ত বিশ্বাস, যুক্তি-বাদীর বিশ্বাস ও প্রত্যক্ষ দর্শনের পার্থক্য

টীকা—৪২১। এই প্যারার শেষাংশটুকু (তারকা-চিহ্নিত স্থান হইতে শেষ পর্য্যন্ত বাক্যগুলি) এই প্যারার পরবর্ত্তী পাঁচ প্যারার নীচে, যে তিন লাইন তারকা-চিহ্নিত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে দ্বিতীয় লাইনের স্থানে, মূল গ্রন্থে, সংক্ষেপে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা হইল।

টীকা—৪২২। এই প্যারার অন্তর্গত তারকা-চিহ্নিত স্থান হইতে শেষ পর্য্যন্ত বাক্যগুলি, এই প্যারার পরবর্ত্তী চারিটী প্যারার নীচে যে তিন লাইন তারকা-চিহ্নিত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে তৃতীয় লাইনের স্থানে, মূলগ্রন্থে, সংক্ষেপে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা হইল।

মাতার মুখে শ্রবণ এবং আপ্ত লোকের দেখাদেখী বিশ্বাস স্থাপন করার ন্যায় হইল। আর এক জন লোক দেখিল যে আমীরের গৃহ-দ্বারে তাঁহার বাহন-অশ্ব বান্ধা আছে, বহু দাসদাসী আদেশ-পালনে ব্যস্ত ত্রস্ত ভাবে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত আছে; এই প্রমাণ পাইয়া সে বুঝিতে পারিল যে আমীর অবশ্যই গৃহাভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। এই ব্যক্তির বিশ্বাস, যুক্তি-পথাবলম্বী তার্কিকগণের বিশ্বাসের অনুরূপ। তৃতীয় ব্যক্তি আমীরের গৃহে প্রবেশ করতঃ স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখিয়া লইল। ইহার প্রত্যক্ষ-দর্শন-জ্ঞান চক্ষুষ্মান 'আরেফ' দিগের দর্শন-জ্ঞানের অনুরূপ। এই শেষোক্ত ব্যক্তি স্বচক্ষে সমস্ত দর্শন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, উপরি উক্ত তিন ভাগ জ্ঞানের মধ্যে বড় পার্থক্য আছে।

যদিও শেষোক্ত তৃতীয় ভাগের জ্ঞান অতীব উন্নত তথাপি দর্শক এই শ্রেণীতে উঠিয়া সৃষ্ট পদার্থও দেখিতে পান এবং সৃষ্টি-কর্ত্তাকেও দেখিতে পান। তদ্ব্যতীত তিনি ইহাও দেখিতে পান যে, সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ সেই সৃষ্টিকর্ত্তা হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। এই কারণে তৃতীয় ভাগের বিশ্বাস-জ্ঞানের মধ্যে বহুত্ব-ভাবেরও দখল আছে। দর্শক, যতক্ষণ সৃষ্টি-কর্ত্তা ও সৃষ্ট পদার্থ উভয়কে দেখিতে পাইবেন, ততক্ষণ দ্বৈত-ভাবের পার্থক্য ও প্রভেদের গণ্ডগোলের মধ্যে পতিত থাকিবেন—সুতরাং তাঁহার মন নির্ব্বিকার হইতে পারে না। এই জন্য ইহা পূর্ণ 'তওহীদ' বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

প্রত্যক্ষ-দর্শন-জনক বিশ্বাস-জ্ঞান পূর্ণ 'তওহীদ' নয় কেন?

চতুর্থ শ্রেণীর তওহীদ—এই শ্রেণীতে 'তওহীদ' জ্ঞান উন্নত হইলে দর্শক 'আরেফ' এক আল্লা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না—সমস্তই এক বলিয়াই দেখিতে পান এবং এক বলিয়াই বুঝিতে পারেন। তদ্রূপ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকে না। ছুফী লোকেরা এই শ্রেণীকে "ফানা-ফিৎ-তওহীদ" বলেন। (টীঃ ৪২৩) এই উন্নত জ্ঞানের পরিচয় ও ব্যাখ্যা পুস্তকের মধ্যে লিখা নিতান্ত কঠিন—সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর অধিক লিখা উচিত নহে।

মহাত্মা হোছেন হাল্লাজ একদা মহাত্মা খাওয়াছকে বিজন প্রান্তরে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তুমি এথায় কি করিতেছ?"

টীকা—৪২৩। তওহীদের এই ভাগের প্রথমাংশকে 'ফানাফিল্লা' এবং শেষ অংশকে 'বাকাবিল্লা' বলা হয়।

তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি 'তওয়াক্কোল' বিষয়ে নিজকে অটল রাখিতে শিক্ষা দিতেছি ও তদ্রূপ অভ্যাস জন্মাইতেছি।" মহাত্মা পুনরায় বলিলেন—"তুমি স্বীয় জীবন আভ্যন্তরিক সুশোভনার জন্য ব্যয় করিয়াছ; আচ্ছা বলতো 'নাস্তি' দ্বারা "তওহীদের" উচ্চ সোপানে কেমন করিয়া উঠিতে পারিবে?"

* * * (১) * * *

* * * (২) * * *

* * * (৩) * * *

কেবল চতুর্থ শ্রেণীর জ্ঞানই বাস্তবিক 'একত্বজ্ঞান'। সে অবস্থায় বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব মনের সম্মুখ হইতে লুপ্ত হইয়া কেবল এক আল্লা অবশিষ্ট থাকে; তখন নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়। ফল কথা, আল্লা ব্যতীত আর কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না।

চতুর্থ শ্রেণীর তওহীদের যতটুকু প্রসঙ্গ সাধারণে প্রকাশ যোগ্য—হে পাঠক! এস্থলে তুমি অবশ্যই বলিবে যে আল্লার সম্বন্ধীয় বিশ্বাস বা জ্ঞানের চতুর্থ শ্রেণীর অবস্থা বুঝিতে পারা নিতান্ত কঠিন। বাস্তবিক সে কথা সত্য; সর্ব্ব সাধারণ লোকের পক্ষে উহার অবস্থা জানিতে পারা নিতান্তই অসম্ভব। পরিষ্কার করিয়া বলা যায় না; আবার যতদূর বলা যায় তাহাতে সাধারণ লোকে বুঝিতেও পারে না। তথাপি কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। আমাদের চতুর্দ্দিকে পৃথক্ পৃথক্ অসংখ্য পদার্থ দেখা যাইতেছে। মাথার উপর গগন মণ্ডল এবং পদতলে ভূমণ্ডল। এতদুভয়ের মধ্যেও অসংখ্য পদার্থ আছে। এত বিভিন্ন পদার্থকে কি প্রকারে এক বলিয়া বুঝা যাইতে পারে? * * * (টীঃ ৪২৫) চতুর্থ শ্রেণীর একত্ব-জ্ঞান

টীকা—৪২৪। মহাত্মা হোসেন হাল্লাজের শেষোক্ত বাক্যের অর্থ গ্রহণ করা বড় কঠিন। মূলগ্রন্থে ঐ অংশের লিখন নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হওয়াতে মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারা গেল না। হস্ত লিখিত ও ছাপার অনেক পুস্তক দেখা গেল সর্ব্বত্রই ঐরূপ অস্পষ্টতা। ঢাকা কলেজের আরবী অধ্যাপক পরিপক্ক কামেল ছুফী মওলানা আবদুল আজীজ সাহেবের সহিত এই স্থানের অর্থ লইয়া আলোচনা হয়। তাঁহার আলোচনার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—মহাত্মা খাওয়াছ তওহীদের তৃতীয় সোপানে থাকিয়া তওয়াক্কোলের শক্তি বর্দ্ধন করিতেছিলেন। কেননা তওয়াক্কোল তওহীদের তৃতীয় সোপানের অন্তর্গত। তওহীদের চরম উন্নতি চতুর্থ সোপানে গেলে আল্লার সহিত একত্র বাসের সময়ে তওয়াক্কোলের প্রয়োজন হয় না।

টীকা—৪২৫। পরবর্ত্তী প্রথম প্যারাটীর নীচে যে প্যারাটী স্থান পাইয়াছে তাহা মূল গ্রন্থে, এই টীকা চিহ্নের পাশে তারকা-চিহ্নিত স্থানে সংক্ষেপে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা হইল।

যাহারা স্বয়ং অর্জ্জন করিতে না পারিয়াছে তাহাদিগকে উহার বিস্তৃত বর্ণনা বুঝান নিতান্তই কঠিন; তথাপি তোমাকে মোটামুটী নিম্নের তথ্যটুকু বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। (১) জগতে এমন বহু পদার্থ আছে যে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি গুণ বা অবস্থা সাধারণ ভাবে সকলের মধ্যেই সমান সমান আছে এবং সেই একতা দৃষ্টে তাহাদিগকে এক শ্রেণীর পদার্থ বলা যায়। প্রাণী জগতের মধ্যেও যাহাদের মাংস, চর্ম্ম, মস্তক হস্ত পদ উদর প্রভৃতি অঙ্গ একই প্রকার, তাহাদিগকে এক 'শ্রেণী বাচক' নামে প্রকাশ করা যায়। এই কারণে কতকগুলি প্রাণী 'মনুষ্য' নামে আর কতক গুলি 'গরু' বা ঐ প্রকার কোন শ্রেণী-বাচক বা জাতিবাচক নামে কথিত হইতেছে। কোন দর্শক ঐরূপ প্রাণীর কোন অঙ্গ-বিশেষ দর্শন করিবামাত্র উহাকে সেই 'জাতি-বাচক' নামেই প্রকাশ করে—তখন হস্ত পদাদি অন্য অঙ্গের বিষয় এক বারেই ভাবে না। দেখ, মনুষ্য-দেহে, হস্ত পদাদি নানা অঙ্গ থাকিলেও তাহার এক অঙ্গ দৃষ্টি মাত্র উহাকে মানুষ বলিয়া চিনা যায়। মনে কর, তুমি জলমগ্ন এক ব্যক্তির মুখ-মণ্ডল মাত্র দেখিতে পাইলে এমন সময়ে অপর কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি দেখিতেছ? তখন অবশ্যই তুমি বলিবে—"আমি একজন মানুষ দেখিতেছি তদ্‌ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।" এইরূপ মানবের যে অঙ্গ নয়ন-গোচর হইবে তাহা দেখিলে, সেই মানুষই দেখা গেল বলিতে হইবে। এই প্রকার একটী গুণ বা অবস্থা ধরিতে পারিলে সেই গুণাধার পদার্থটী ধরা যায়। প্রিয়জনের ভালবাসার একটী প্রমাণ দেখিতে পাইলে সেই প্রিয়-জনকে মনে পড়ে। কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রিয়জনের ভালবাসার বিষয় ভাবিতেছে, তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—তুমি কি ভাবিতেছ? সে তদুত্তরে বলিবে—আমি আমার প্রিয়জনকে চিন্তা করিতেছি। দেখ, মানুষের মুখ-মণ্ডল মাত্র দর্শনে যেমন মনুষ্য-দর্শন হইল বলা যায়, এস্থলে তেমনি প্রিয়জনের কেবল এক ভালবাসা গুণটী চিন্তা করিতে গিয়া নানা গুণ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সম্বলিত গোটা প্রিয়জনের চিন্তা করা হইল বলা গিয়া থাকে। আবার দেখ, প্রিয়জনকে বা তাহার কোন এক গুণ চিন্তা করিতে তন্ময় হইলে প্রথমে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু প্রেমের আদান প্রদানে শেষে আত্মবিস্মৃতি পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে তখন এক মাত্র প্রিয়জন

প্রথম প্রেমদ— ভ ও ষ্টী দ-জ্ঞান পূর্ণ হইলে আমার সহিত যাবতীয় পদার্থের অস্তিত্ব মিলিয়া এক হয় এবং তাহাদের পার্থক্য থাকে না।

ভিন্ন আর কিছু তাহার মনে অবশিষ্ট থাকে না। (টীঃ ৪২৩) (২) যাহা হউক, পাঠক! একথা জানিয়া রাখ—মা'রেফৎ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের উন্নতির পথে এমন এক উন্নত 'মোকাম' আছে তথায় উপস্থিত হইলে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে বিশ্বসংসারের সমস্ত পদার্থ, এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে পরস্পর আবদ্ধ হইয়া মিলিত আছে। সমস্ত পদার্থ পরস্পর মিলাইলে একটী বিরাট জীবের আকার ধারণ করে। গগনমণ্ডল ভূমণ্ডল প্রভৃতি যেন সেই বিরাট জীবের পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ; অথচ তাহারা পরস্পর সম্বন্ধ-বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থ স্বীয় পরিচালকের সহিত এক হিসাবে, এক বিশেষ সম্বন্ধে, যেরূপ জড়িত আছে, জীবদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিও তাহার জীবন ও বুদ্ধির সহিত প্রায় তদ্রূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ আছে। প্রাণ ও বুদ্ধি যেমন ভাবে দেহ-রাজ্যের কার্য্য-পরিচালনা করে বিশ্বজগতের পরিচালক আল্লাও, ঠিক তেমন ভাবে না হউক, প্রায় তদ্রূপ সাদৃশ্যে জগতের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

। প্রসঙ্গ—তওহীদ-জ্ঞান পূর্ণ হইলে, যাবতীয় পদার্থ এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ ও সৃষ্টিকর্তার সহিত এক হিসাবে জড়িতবলিয়া বোধ হয়।

(৩) "আল্লা 'আদম'কে তাঁহার 'ছুরতে'র অনুরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন"—এই বাক্যের তাৎপর্য্য ও মর্ম্ম যতক্ষণ কেহ বুঝিতে না পারিবে তত দিন উক্ত সূক্ষ্ম বিষয়ও সে বুঝিতে পারিবে না। 'দর্শন পুস্তকে' এ কথার আভাস দিতে কিছু বলা হইয়াছে তদপেক্ষা আর কিছু অধিক না বলিয়া নীরব থাকাই ভাল।

তৃতীয় প্রসঙ্গ—'মানবকে আল্লা নিজের ছুরতের অনুরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন' —ইহার তাৎপর্য্য বুঝিবার আবশ্যকতা

শৃঙ্খলাবদ্ধ পাগলকে শিকল ধরিয়া টানিলে অথবা ভাবোন্মত্ত লোকের সম্মুখে সুমিষ্ট গান বাদ্য করিলে তাহাদের যেরূপ উন্মত্ততা বৃদ্ধি পায় সাধারণ লোকের সম্মুখে সর্ব্বোচ্চ চতুর্থ শ্রেণীর একত্ব-জ্ঞানের আলোচনা করিলে তাহাদেরও তদ্রূপ মানসিক বিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে।

তৃতীয় শ্রেণীর 'তওহীদ' জ্ঞানই তওয়াক্কোলের প্রথম বুনিয়াদ—এখন পূর্ব্ব বর্ণিত কয়েকটী কথা স্মরণার্থ সংক্ষেপে পুনরায় বলা যাই-

---

টীকা—৪২৩। এস্থানের মর্ম্ম বড় দুর্ব্বোধ্য। নিজে বুঝাই কঠিন তাহার উপর কলমের সাহায্যে অন্যকে বুঝান তদপেক্ষা কঠিন। সাদৃশ্যে বুঝিবার জন্য একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতেছে। সমুদ্র বা নদীর ধারে একটী গভীর কূপ খনন করিলে, জলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম অনুসারে নিম্ন খাতের তলদেশ দিয়া কূপের মধ্যে জল প্রবেশ করে। সে জল সমুদ্রের পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত উন্নত হয়। পরে সমুদ্র ও কূপের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান ধুইয়া গেলে কূপ ও সমুদ্র এক সঙ্গে মিলিয়া একাকার হইয়া যায়। তখন কূপ ও সমুদ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।

তেছে। অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছ যে, মোনাফেক (কপটী) লোক আল্লাকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করে না কেবল মুছলমান লোকের ভালবাসা পাইবার মৎলবে মুখে মুখে আল্লাকে বিশ্বাস করে। আল্লার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন সম্বন্ধে সাধারণ লোকের দুই ভাগ আছে। তন্মধ্যে অধিকাংশ লোক ভক্তি-ভাজন গুরু লোকের মুখে আল্লার কথা শুনিয়া ও তাঁহাদের দেখাদেখী আল্লাকে মানিয়া লয়। আর কতকগুলি লোক, জ্ঞানী লোকের প্রদর্শিত যুক্তি শুনিয়া ও প্রমাণ দেখিয়া বিশ্বজগতে 'এক আল্লা' আছে বলিয়া বিশ্বাস করে। 'মোনাফেক' ও সাধারণ মুছলমান ভিন্ন আর এক উন্নত সাধু শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহারা জগতের কার্য্যাবলীর অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া জ্ঞান-চক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিতে পান যে জগতের সৃজন পালন ও সংরক্ষণাদি কার্য্যের এক মাত্র 'কারণ' আছে। সেই 'কারণ'কে তাঁহারা আল্লা বলিয়া জানিতে পারেন। যাহা হউক, উক্ত তিন শ্রেণীর লোক আল্লার সম্বন্ধে যে বিশ্বাস ও জ্ঞান রাখেন তাহা বরং অনেকটা বুঝিতে পারা যায় কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর 'একত্ব-জ্ঞান' বুঝিতে পারা নিতান্তই কঠিন। তওয়াক্কোল অর্থাৎ আল্লার প্রতি নির্ভর করিতে গেলে চতুর্থ শ্রেণীর একত্ব-জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। তজ্জন্য তৃতীয় শ্রেণীর প্রত্যক্ষ-দর্শন-জ্ঞানই প্রচুর। এইজন্য তৃতীয় শ্রেণীর 'তওহীদ'-জ্ঞানই তওয়াক্কোলের প্রথম বুনিয়াদ বলিয়া গণ্য।

তৃতীয় শ্রেণীর ক্রিয়া সম্পর্কিত তওহীদ বুঝাইবার জন্য কয়েকটী প্রসঙ্গের ক্রমিক অবতারণা—তৃতীয় শ্রেণীর 'তওহীদ'কে ক্রিয়া-সম্পর্কিত 'তওহীদ'ও বলা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে 'এহ্ইয়া-অল্-উলূম্' নামক গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা গিয়াছে। যাঁহাদের সুযোগ আছে তাঁহারা তথায় দেখিতে পারেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'শোকর' সম্বন্ধে যাহা লিখা গিয়াছে তাহা সুন্দর মত জানা এ স্থলে যথেষ্ট মনে করি। তথায় যাহা বলা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে এ স্থলে বলা যাইতেছে।

প্রথম প্রসঙ্গ—বিশ্বের কোন পদার্থই স্বাধীন ক্ষমতায় কোন কাজ করিতে পারে না—চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র মেঘ বৃষ্টি বায়ু ইত্যাদি পদার্থ যাহাদিগকে তোমরা জাগতিক কার্য্যাবলীর কারণ বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, তৎসমুদয় আল্লার হাতে নিতান্ত অধীন হইয়া চলিতেছে। লেখকের কলম যেমন অধীন ভাবে চলে উহারাও তদ্রূপ বশীভূত থাকিয়া চলিতেছে। ফল কথা, কোন পদার্থের এমন স্বাধীন ক্ষমতা নাই যে উহা নিজে নিজে

কোন কার্য্য করিতে পারে—কার্য্য করা দূরের কথা কেহ হেলিতে দুলিতেও পারে না। সেই মহাপ্রভু সমস্ত পদার্থের প্রত্যেকটীকে, যথা সময়ে, প্রয়োজন মত সঞ্চালন করিয়া থাকেন। বিশ্ব-জগতের কোন পদার্থই নিজের স্বাধীনতায় কোন কার্য্য করিতে পারেনা। যদি কেহ বিবেচনা করে যে অমুক পদার্থ বা অমুক গ্রহ, কোন কার্য্য করিতেছে—তবে তাহার মহাভুল করা হইবে। পুরস্কার দানের আদেশ কলমে লিখিত হয় বলিয়া কলম বা কাগজের উপর পুরস্কার দানের ক্ষমতা আরোপ করা নিতান্ত অন্যায়। যাহা হউক, যদি কিছু অসম্ভব হয় তবে তাহা জীবের ক্ষমতা ভিন্ন আর কিছু নহে। (টীঃ ৪২৭)

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ—মানবের স্বাধীন ও নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমতায় কোন কাজ ঘটেনা—তোমরা মনে কর মানুষেরও কিছু ক্ষমতা আছে। বাস্তবিক এরূপ বিবেচনা মহাভ্রম। মানুষ স্বয়ং অসহায়। এরূপ কথা বহুবার বলা হইয়াছে। অবশ্য মানুষের ক্ষমতা হইতে কার্য্য সম্পন্ন হয়। সে ক্ষমতা, ইচ্ছা হইতে জন্মে অর্থাৎ ইচ্ছা জন্মিলেই ক্ষমতা আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহা যদি পর্য্যাপ্ত হয় তবে কার্য্যও সম্পন্ন হইতে পারে। এই জন্য বলা হয় মনে যেরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয় মানুষ তদনুসারেই কার্য্য করিয়া থাকে; কিন্তু মানুষের ইচ্ছা স্বয়ং আল্লা জন্মাইয়া থাকেন। ইচ্ছার উপর মানুষের হাত নাই। তবে সুখ-লোভ বা দুঃখ-ভয় উপস্থিত হইলে সেই ইচ্ছা কখন কখন সতেজ বা খর্ব্ব হয় মাত্র। ফল কথা, ইচ্ছার প্রভাবেই কার্য্য ঘটিয়া থাকে। কার্য্য যখন ক্ষমতার অধীন, আবার ক্ষমতা যখন ইচ্ছার অনুগত, সেই ইচ্ছা আবার মানুষের হাতে নাই তখন মানুষের সমস্তই আল্লার মুষ্টির মধ্যে আছে—কোন কার্য্যই মানুষের আয়ত্তাধীনে নাই। মানুষ নিতান্ত অসহায় ও পরাধীন।

মানুষের কার্য্য তাহার আয়ত্তাধীনে নাই, কেবল আল্লার স্থাপিত নিয়মে ঘটিয়া থাকে—মানুষের কার্য্যের ত্রিবিধ প্রকার

টীকা—৪২৭। আল্লার জগতে যদি কিছু অসম্ভব কার্য্য বা পদার্থ থাকে তবে তাহা জীবের 'ক্ষমতা'—এ কথার অর্থ বুঝিতে অনেক চিন্তার প্রয়োজন। সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। জীবের জীবনরক্ষা এক অসম্ভব ব্যাপার—'শৈত্য তেজ, আদ্রতা শুষ্কতা, তরল কঠিন ইত্যাদি বিরুদ্ধগুণের পদার্থ একত্র মিলাইয়া আল্লা অতি কৌশলে জীবের জীবন রক্ষা করিয়া সকলকে চালাইতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা-শক্তি যেমন অন্যদিকে যাইবে অমনি বিরুদ্ধ-পদার্থের মিলনোৎপন্ন জীবনও শেষ হইবে। এই যে কলম দিয়া আমি লিখিতেছি হস্তের মধ্যে কোন রগ কিঞ্চিৎ বক্র হইলে বেদনা জন্মিবে। অমনি কলমটী হাত হইতে খসিয়া পড়িবে। জীবের স্বাধীন ক্ষমতা আদৌ নাই।

ভেদে তাহার বর্ণনা—প্রিয় পাঠক! মানুষের কার্য্য কি ভাবে ঘটে এবং কত প্রকার, এ কথা পরিষ্কার মত বুঝিতে পারিলে ইহাও বুঝিতে পারিবে যে কার্য্যের উপর মানুষের বাস্তবিক কোন ক্ষমতা নাই। (ইহা কেবল মাত্র আল্লার স্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়মের তাড়নায় সংঘটিত হয়।) মানুষের কার্য্য তিন প্রকার। তন্মধ্যে **প্রথম** প্রকারের নাম—তব্‌ঈ বা স্বাভাবিক কার্য্য। ইহার দৃষ্টান্ত দেখ—লোকে জলের উপর পদস্থাপন করিলে পদ তৎক্ষণাৎ জলের মধ্যে প্রবেশ করে। ইহা দেখিয়া লোকে বিবেচনা করিতে পারে যে—মানুষের পা জল রাশি ফাঁড়িয়া এক ভাগকে অপর ভাগ হইতে পৃথক করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। **দ্বিতীয়** কার্য্যের নাম—এরাদতী অর্থাৎ ঐচ্ছিক বা ইচ্ছা সম্পন্ন কার্য্য। শ্বাস, প্রশ্বাস, প্রস্রাব, বাতকর্ম্ম, মলত্যাগ পান ভোজন আদি কার্য্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। **তৃতীয়** কার্য্যের নাম—এখ্‌তীয়ারী বা ক্ষমতা সম্পন্ন কার্য্য; চলন ফিরন বাক্যকথন ইত্যাদি এই শ্রেণীর কার্য্য।

মানুষের কার্য্যের প্রকারভেদ—ত্রিবিধ

প্রথম—তব্‌ঈ বা স্বাভাবিক কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। এই শ্রেণীর কার্য্যের উপর লোকের কিছু মাত্র ক্ষমতা নাই—উহা কেবল প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। জলের উপর পদ স্থাপন করিলে, পায়ের চাপে জল আপনা আপনি ফাটিয়া দূরবর্ত্তী হয়। ইহাতে মানুষের ক্ষমতা কিছুই লাগে না। মানুষ ইহা করুক বা না করুক জলের তরলতা ও পায়ের চাপ সর্ব্বত্রই ঐরূপ ঘটনা ঘটায়। জলের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে সে পাথরও ঐরূপ কার্য্য করিবে। জলে ডুবিয়া যাওয়া পাথরের ক্ষমতা-সম্ভূত কার্য্য নহে। উহার চাপে বা ভারে স্বভাবের নিয়মানুসারে তরল জলের কিয়দংশ নিম্ন হইতে সরিয়া যায় তাহাতে প্রস্তর খণ্ড ডুবিয়া পড়ে।

প্রথম—মানবের স্বাভাবিক কার্য্য—তাহার আয়ত্তের বাহিরে

দ্বিতীয়, নিঃশ্বাস গ্রহণের ন্যায় 'এরাদতী' বা ইচ্ছা সম্পন্ন বা **ঐচ্ছিক কার্য্য** সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হউক। মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে ইহার মধ্যেও মানুষের স্বাধীন ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যাইবে না। মানুষ হাজার চেষ্টা করিলেও নিঃশ্বাস বন্ধ রাখিতে পারে না। কেন না মানুষকে এমন করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে যে তাহাকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চালাইতে হইবে। এবং তজ্জন্য শ্বাস প্রশ্বাসের ইচ্ছাও আপনা আপনি জন্মিবে। কোন ব্যক্তি একটী সূচ লইয়া

দ্বিতীয়—মানবের এরাদতী কার্য্য—তাহার ক্ষমতার বাহিরে

কাহারও চক্ষুর অদূরে 'হক্ হক্' বলিয়া সূচটী চক্ষু মধ্যে বিদ্ধিয়া দিবার ভয় দেখাইলে সে অতি নিশ্চয় চক্ষু-পলক চাপিয়া লইবে। সে সময়ে হাজার চেষ্টা করিলেও চক্ষুর পাতা বন্ধ না করিয়া সে কিছুতেই থাকিতে পারিবে না। ইহার কারণ এই যে সৃষ্টি-কর্ত্তা মানুষকে ক্ষতি হইতে বাঁচিবার ও উপকার পাইবার নিমিত্ত যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দিয়াছেন তাহাতে সে ঝটিতি বুঝিতে পারে চক্ষু বন্ধ করায় উপকার আছে। সেই উপকার-জ্ঞান জন্মিবা মাত্র চক্ষু বন্ধ করিবার ইচ্ছা উদিত হয়। জলের উপর দাঁড়াইলে উহার তরলতা ও শরীরের ভার প্রভৃতি স্বাভাবিক গুণের নিমিত্ত লোক যেমন ডুবিয়া যায়, নিঃশ্বাস-গ্রহণ ও চক্ষু-আবরণ কার্য্যেও তদ্রূপ আল্লার প্রদত্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানবকে উত্তেজিত করিয়া থাকে। ইহাতে দেখা যাইতেছে 'প্রাকৃতিক' ও 'ঐচ্ছিক' উভয় শ্রেণীর কার্য্য, আল্লার স্থাপিত নিয়মের তাড়নায় সংঘটিত হয়; তন্মধ্যে মানবের কিছু মাত্র স্বাধীনতা নাই। তৃতীয় এখ্‌তীয়ারী বা **ক্ষমতা সম্পন্ন কার্য্য** সম্বন্ধে আলোচনা হউক। চলন ফিরন বাক্যকথন ইত্যাদি কার্য্য সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায়—মানুষের এ পরিমাণ বল আছে যে মনে করিলেই তদ্রূপ কার্য্য করিতে পারে আর ইচ্ছা না করিলে বন্ধ রাখিতে পারে। এ শ্রেণীর কার্য্য করিতে মানুষের ক্ষমতা নাই এ কথা বলিলে প্রথমে স্বীকার করিয়া লওয়া বড়ই কঠিন হয়। যাহা হউক পাঠক! বুঝিয়া রাখ, যে কার্য্যে মঙ্গল বা উপকার প্রাপ্তির আশা থাকে সে কার্য্য করিতে মনে স্বভাবতঃ ইচ্ছা জন্মে। কোন কার্য্যে উপকার আছে কি না বিচার করিয়া দেখিতে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। কখন কখন সেই কাজে উপকার আছে কি না কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া দেখিতে হয়। উপকার আছে বলিয়া বুঝিতে পারিলে ইচ্ছা অবিলম্বে উৎপন্ন হইয়া ক্ষমতাকে কর্ম্ম সম্পাদন করিতে যে অঙ্গের আবশ্যক তাহা সঞ্চালন করিতে আদেশ দেয় তখন কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে চেষ্টার উদয় হইয়া থাকে। এই কারণে চক্ষে সূচ ফুটাইবার ভয় দেখাইলে মনে ঝটিতি এই কথার বিচার নিষ্পত্তি হয় যে সূচ ফুটাইলে ক্ষতি হইবে আর চক্ষু বন্ধ করিলে উপকার হইবে। এ ক্ষেত্রে, এইরূপ জ্ঞানটী স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ সর্ব্বদাই মনের মধ্যে জাগরিত থাকে বলিয়া, চিন্তা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হয় না। বিনা চিন্তাতেই বুঝিতে পারে, চক্ষু বন্ধ করিলে উপকার হইবে। এই জ্ঞান তৎক্ষণাৎ চক্ষুকে বন্ধ করিবার ইচ্ছা

তৃতীয়—মানবের এখ্‌তীয়ারী কার্য্য—ইহাও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার ক্ষমতার বাহিরে

জন্মাইয়া দেয়। ইচ্ছার প্রভাবে চক্ষু-পলকের মধ্যে সঞ্চালন-শক্তি আসিয়া উদয় হয় এবং তাহারই প্রভাবে চক্ষুর পাতা আসিয়া চক্ষু-গোলক আবৃত করিয়া ফেলে। কিন্তু এই প্রকার শ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় অন্যান্য 'ঐচ্ছিক' কার্য্যে আরাম মিলে; না করিলে কষ্ট উপস্থিত হয়—এই জ্ঞানও মনুষের মনে স্বতঃ-সিদ্ধ ও সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। সেই জ্ঞান মনকে বাধ্য করিয়া উক্ত প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া দেয়। পলায়ন, প্রত্যাগমন প্রভৃতি শক্তিসম্পন্ন কার্য্যেও তদ্রূপ উপকার প্রাপ্তির আশা না পাইলে মন সে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হয় না। শেষোক্ত প্রকার কার্য্যে উপকার প্রাপ্তির আশা, আশ্ পাশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া, চিন্তা পূর্ব্বক জানিয়া লইতে হয়। তজ্জন্য অল্প বিস্তর কিছু বিলম্ব ঘটিতে পারে। সেই বিলম্ব টুকু বাদ দিলে উভয় স্থলে উপকার প্রাপ্তির জ্ঞান হইতে ইচ্ছা জন্মে। ইচ্ছার প্রভাবে ক্ষমতার উদয় হয় এবং সেই ক্ষমতার কাজ সম্পন্ন করিয়া লয়। সুতরাং উভয় স্থলে কর্ত্তার স্বাধীন ক্ষমতা দেখা যায় না। কাহাকে প্রহার করিতে লাঠী উঠাইলে সে ব্যক্তি আশ্পাশের অবস্থা দৃষ্টে বুঝিতে পারে পলায়নে উপকার আছে, কিন্তু ছাতের উপর অবস্থিতি কালে কেহ তাহাকে দণ্ড প্রহারে ধাবমান হইলে সে অবশ্যই প্রথমে দৌড়িয়া পলাইতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু ছাতের ধারে গিয়া উপস্থিত হইলে তাহার সম্মুখে দুইটী সঙ্কট উপস্থিত দেখিতে পাইবে। ছাতের উপর হইতে লম্ফ দিলে হাত পা ভাঙ্গিতে পারে আবার লম্ফ না দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে দণ্ডাঘাতে মস্তক ভাঙ্গিতে পারে। এই দুই বিপদের মধ্যে কোনটী সহজ তাহা তখন চিন্তা করিয়া স্থির করিতে হয়। যদি লাঠীর আঘাত অপেক্ষা লম্ফ দিয়া পড়া সহজ বোধ করে তবে তাহাই ভাল লাগিবে এবং তৎক্ষণাৎ লম্ফ দিয়া নীচে পড়িবে। কিন্তু যদি বুঝিতে পারে যে লম্ফ দিয়া হাত পা ভাঙ্গা অপেক্ষা দণ্ড প্রহার সহ্যকরা সহজ তবে লাফাইয়া না পড়িয়া দণ্ডায়মান থাকিবে। উভয় কার্য্যের আশ্পাশের অবস্থা বিচারে যাহা ভাল বোধ হয় তাহাই করিবার ইচ্ছা জন্মে এবং সেই ইচ্ছার অনুরূপ কার্য্য-ক্ষমতার উদয় হয়। পূর্ব্বোক্ত স্থলে লাঠী খাওয়া, লাফাইয়া পড়া অপেক্ষা ভাল বোধ হইলে দণ্ডায়মান থাকার ক্ষমতা উৎপন্ন হয়—তখন লম্ফ দিবার ক্ষমতা জন্মে না; তখন পদের গতি বা স্থিতি ইচ্ছার আদেশ অনুসারে সম্পন্ন হয়। ইচ্ছা আবার বুদ্ধির আজ্ঞায় পরিচালিত হয়। বুদ্ধি কিন্তু বিচার করিয়া যে কার্য্য উত্তম বা করিবার যোগ্য বলিয়া সাব্যস্থ করে

ইচ্ছা সেই কার্য্যের দিকে ঝুকিয়া পড়ে। মনে কর, কোন ব্যক্তি স্বীয় কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া আত্মহত্যার ইচ্ছা করিল। হস্তে প্রচুর বল ও ছুরী উভয়ই আছে। তথাপি সে নিজের গলা কাটিতে পারে না। ইহার কারণ এই যে হস্তের ক্ষমতা, ইচ্ছার অধীন। ইচ্ছাও নিজে স্বাধীন নহে। সে বুদ্ধির পরামর্শ মত চলে। বুদ্ধি যখন বলে এ কার্য্য তোমার জন্য ভাল, এবং করিবার যোগ্য তখন ইচ্ছার উদয় হয়। আবার দেখ, বুদ্ধিও পরাধীন কেননা উহা একখানী নির্ম্মল দর্পনের ন্যায় স্বচ্ছ। যে কার্য্য উত্তম তাহার প্রতিবিম্ব বুদ্ধি-রূপ-দর্পণের উপর পড়ে; আর যাহা মন্দ তাহার ছবী তন্মধ্যে পড়ে না। আত্মহত্যা মন্দ কার্য্য, তাহার ছবি বুদ্ধিরূপ দর্পণে পড়ে না। তবে কোন ব্যক্তি সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলে এবং রোগ যন্ত্রণা অসহ্য হইলে সে প্রথমে রোগ মুক্তির চেষ্টা করে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে দুটী পথ তাহার সম্মুখে অবশিষ্ট থাকে—হয় আত্মহত্যা দ্বারা রোগ-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ, না হয় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ। যন্ত্রণা ভোগ অপেক্ষা আত্মহত্যা সহজ বোধ হইলে তাহার বুদ্ধিরূপ দর্পণে উহার প্রতিবিম্ব পড়ে এবং ভাল দেখা যায়। তখন আত্ম-হত্যার মধ্যে উপকার-জ্ঞান উদয় হইয়া আত্মহত্যার ইচ্ছা জন্মাইয়া দেয়। সেই ইচ্ছা আবার কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বল প্রেরণ করে। এইরূপে আত্ম-হত্যা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লয়। এই শ্রেণীর কার্য্যকে 'এখ্‌তীয়ারী' নাম দিবার কারণ এই যে, বুদ্ধি স্বীয় বলের তারতম্য অনুসারে এবং চিন্তার সাহায্যে 'উপকার প্রাপ্তি জ্ঞান' মনে জন্মাইয়া দেয়। সেই জ্ঞান তখন মানুষকে বাধ্য করিয়া কার্য্য করিয়া লয়। তখন সেই আত্ম-হত্যা কার্য্যও 'শ্বাস প্রশ্বাস লওয়া'র ন্যায় এবং 'সূচী বিদ্ধ হইবার ভয়ে চক্ষু-মুদ্রিত করার' ন্যায় অপার্য্যমাণেই ঘটিয়া থাকে। আবার 'শ্বাস লওয়া' ও 'চক্ষু বন্ধ করা' কার্য্যগুলিও 'জলে ডুবার' ন্যায় আল্লার স্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই ঘটিয়া থাকে। (টীঃ ৪২৮) ঐ সমস্ত কার্য্যের 'কারণ'

টীকা—৪২৮। সর্ব্ববিধ কার্য্যই আল্লার স্থাপিত নৈসর্গিক নিয়মে বা কারণে ঘটে—মানুষের স্বাধীন ক্ষমতায় ঘটে না, এ সত্য উক্ত তিন শ্রেণীর কার্য্যাবলীর মধ্যে দেখা যায়।

১। জলে পদ স্থাপন করিলেই 'ডুবে' ইহার মধ্যে জলের স্বাভাবিক তরলতা ও স্থূল পদের গুরুতা, যাহা আল্লা স্থাপন করিয়াছেন তাহাই এক মাত্র কারণ; জলে পদস্থাপন করিবা মাত্র উহা ডুবে—ডুবিতে না দিবার জন্যও বেগ পাইতে হয়।

২। শ্বাস প্রশ্বাস লওয়া, প্রস্রাব, বাতকর্ম্ম, বাহ্য করা, ক্ষুৎপিপাসা নিবারণার্থ পান ভোজন করা, ইত্যাদিকে ঐচ্ছিক কার্য্য বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, লোকে ইচ্ছা করিলে অবশ্য কিছুক্ষণ ঐরূপ কার্য্যের বেগ আটক রাখিতে পারে বটে কিন্তু সেরূপ বাধা ক্ষণিক—হাজার চেষ্টা করিলে

গুলি মধ্যে একটী 'কারণ' অপর 'কারণের' সহিত মিলিত হইয়া আছে। তাহাতে কারণ গুলি পরস্পর মিলিত হইয়া একটী শিকলের ন্যায় বহু দীর্ঘ হইয়াছে।

মানবের ক্ষমতা জাগতিক কারণ-শৃঙ্খলের অন্তর্গত একটী বলয়

'এহ্ইয়া-অল্-উলুম' গ্রন্থে এই কারণ-শৃঙ্খলের বিস্তৃত বর্ণনা লিখিত হইয়াছে। সৃষ্টি-কর্ত্তা আল্লা মানুষের মধ্যে ক্ষমতা নামক যে পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা ঐ কারণ শৃঙ্খলের-অন্তর্গত একটী বলয় ভিন্ন আর কিছু নহে। এই কারণে লোকে মনে করে যে তাহার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। এরূপ মনে করা মানুষের পক্ষে মহাভুল।

মানুষের মধ্যে 'ক্ষমতা' বলিয়া যাহা দেখা যায় তাহা ইহার নিজস্ব নহে—বিশ্বপতির অমোঘ 'ক্ষমতা' মানুষের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে।

মানব প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লার ক্ষমতা-প্রবাহের রাস্তা

মানব কেবল বিশ্বপতি আল্লার ক্ষমতা-প্রবাহের অন্তর্গত একটী মধ্যবর্ত্তী স্থান মাত্র। ইহার ভিতর দিয়া আল্লার ক্ষমতা প্রবাহিত হইতেছে। ফল কথা মানব, হইতেছে আল্লার ক্ষমতা-প্রবাহের রাস্তা। আল্লা নানা কৌশলে সেই ক্ষমতা মানবের মধ্যে জন্মাইয়া দিতেছেন। দেখ, বাতাসের প্রবাহে বৃক্ষ নড়ে বটে কিন্তু আল্লা তন্মধ্যে (বৃক্ষের মধ্যে) ইচ্ছা বা ক্ষমতা কিছুই উৎপন্ন করেন না। এই জন্য বৃক্ষকে কেহ আল্লার ইচ্ছা বা ক্ষমতার প্রবাহ-স্থান বলিয়া মনে করিতে পারে না। বায়ু-প্রবাহে বৃক্ষের দোলনকে 'পর-পরিচালিত' বলা হয়। মহাপ্রভু যাহা করিতে চান তাহা ঘটিবার কালে তাঁহার ইচ্ছা বা

কেহ সে বেগ দীর্ঘকাল আটক রাখিতে পারে না। ঐ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা 'বিধান-শৃঙ্খলার' মধ্যে আল্লা যে 'ধর্ম্ম' বা নিয়ম স্থাপন করিয়া দিয়াছেন তাহা মানুষকে পীড়ন আরম্ভ করে, সেই পীড়ন হইতে মুক্তি পাইয়া আরাম লাভের বাসনা মনে জাগরিত হয় এবং সেই বাসনা তদ্রূপ কার্য্য করাইয়া লয়। চক্ষু-গোলকে সূচী বিদ্ধিবার ভয় আসিলে 'নিরাপদ' জ্ঞান ঝটিতি উৎপন্ন হইয়া মানুষকে বাধ্য করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করাইয়া লয়। মানুষ সে স্থলে চক্ষু বন্ধ না করিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। সুতরাং এই শ্রেণীর কার্য্যে মানুষের স্বাধীন ক্ষমতা নাই।

৩। দণ্ডাঘাত হইতে পলায়ন, সুখভোগ্য বস্তুর লোভে প্রত্যাবর্ত্তন, মনের কথা আটক না রাখিয়া উহা প্রকাশার্থ বাক্য কথন ইত্যাদি কার্য্যের মধ্যে 'উপকার' প্রাপ্তির জ্ঞান' যাহা বুদ্ধির ভিতর দিয়া উৎপন্ন হয় তাহাই মানুষকে বাধ্য করিয়া তদ্রূপ কার্য্য করাইয়া লয়। এই শ্রেণীর কার্য্য সম্মুখে আসিলে' চারি ধারের 'অবস্থা' দৃষ্টে বিচার পূর্ব্বক 'উপকার-প্রাপ্তি জ্ঞান'টী লাভ করিতে হয়; ইহাতে কিছু সময় লাগে। ব্যাপার জটিল হইলে উপকার-প্রাপ্তির জ্ঞান অধিক সময় লাগে—সরল হইলে অল্প সময় লাগে। চক্ষে খোঁচা লাগিবার ভয় আসিলে চক্ষু-বন্ধে উপকার হয় ইহা নিতান্ত সরল ব্যাপার সুতরাং সে জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ ভাবে বিনা বিচারে ঝটিতি মনে উদয় হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে ২য় ও ৩য় শ্রেণীর কাজের মধ্যে 'উপকার জ্ঞান' উৎপত্তির সময়ের তারতম্য ভিন্ন আর কিছু প্রভেদ নাই।

ক্ষমতার কিছু মাত্র ইতর বিশেষ হয় না। কোন পদার্থের বিদ্যমানতার বা অভাবে তাঁহার ইচ্ছার কিছু মাত্র ইতর বিশেষ হয় না। এই কারণে তাঁহার ক্ষমতা ও ইচ্ছাকে 'অটল' ও 'অমোঘ' বলা হয়। মানুষের কার্য্য বৃক্ষের নড়নের ন্যায় সম্পূর্ণ 'পর-পরিচালিত' নহে আবার আল্লার কার্য্যের ন্যায় 'অটল' এবং 'অমোঘ'ও নহে। মানবের ক্ষমতা ও ইচ্ছা অন্যান্য নানা 'কারণের' সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। সে সমস্ত 'কারণে'র উপর মানবের কোন ক্ষমতা নাই। এই জন্য মানবের কার্য্য, আল্লার কার্য্যের ন্যায় নহে বলিয়া 'অটল'ও নহে। আবার মানুষ আল্লার ক্ষমতা ও ইচ্ছার 'প্রবাহ-স্থান' হওয়াতে তিনি মানবের মধ্যে 'ক্ষমতা' ও 'ইচ্ছা' উৎপন্ন করিয়া দেন তজ্জন্য বৃক্ষের ন্যায় মানব সম্পূর্ণ 'পর-পরিচালিত' নহে। এই জন্য মানবের কার্য্যকে অন্যের পরিচালিত কার্য্যও বলা যায় না। মানুষের কার্য্য, আল্লার কার্য্যের ন্যায় নহে সুতরাং 'অমোঘ' বলা যায় না এই জন্য মানবের কার্য্যকে আরবীতে 'কছব' নাম দেওয়া হইয়াছে (বাঙ্গালাতে 'উপার্জ্জন' বলা যাইতে পারে।)

মানবের ক্ষমতা 'পর-পরিচালিত'ও নহে আবার অটল ও অমোঘও নহে

যাহা হউক, উপরে যাহা বলা গেল তাহা হইতে ইহা বুঝা যায় যদিও মানুষের কার্য্যাবলী তার ক্ষমতার মধ্যে এক হিসাবে আছে তথাপি ইহাদের নিজস্ব স্বাধীন-ক্ষমতা না থাকায় এবং আল্লার ক্ষমতায় ইহাদের ইচ্ছা-শক্তি পরিচালিত হওয়ায় বাস্তবিক পক্ষে ইহাদের নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমতার কোন কার্য্যই ঘটে না।

তৃতীয় প্রসঙ্গ—নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমতা-শূন্য মানব কেন পুণ্যের পুরস্কার বা পাপের শাস্তি পাইবে? পাঠক! এখন তুমি বলিতে পার—কার্য্যের উপর মানুষের যখন কোন ক্ষমতা নাই তখন মানুষ কেন পুরস্কার বা শাস্তি পাইবার যোগ্য হইতে পারে এবং 'শরীঅৎ' (ধর্ম্ম শাস্ত্র) ই বা কি উদ্দেশ্যে তাহার জন্য অবধারিত হইয়াছে? পাঠক! জানিয়া রাখ, আল্লার একত্ব-জ্ঞানের এই স্থানটী বড় ভীষণ স্থান—ইহাকে অতল সমুদ্রের আবর্ত্তের সহিত তুলনা করা যায়। দুর্ব্বল-বিশ্বাসী লোক এই স্থানে আসিয়া ডুবিয়া মরে। যে ব্যক্তি জলের উপর চলিতে পারে, সেই ব্যক্তি ঐ দুস্তর সমুদ্রের ভীষণ আবর্ত্ত পার হইতে পারে। জলের উপর দিয়া চলিবার শক্তি না থাকিলে কেহ ঐ ভীষণ আবর্ত্ত পার হইতে পারে না। তবে যাহারা অসাধারণ সন্তরণপটু তাহারা কখন কখন পার হইলেও হইতে

আল্লার একত্ব-জ্ঞান-লাভের চেষ্টা সাধারণের পক্ষে একটী বিপজ্জনক বিনাশের স্থান

পারে। এই ভীষণ সমুদ্রের ডুবন মরণ হইতে যাহারা বাঁচিতে চায় তাহারা যেন ইহার ত্রিসীমায় পদ স্থাপন না করে। সাধারণ শ্রেণীর লোক এই সমুদ্রের সংবাদ পায় নাই। ইহা তাহাদের প্রতি এক প্রকার দয়া বলিতে হইবে। সাধারণ লোকদিগকে উক্ত উচ্চ শ্রেণীর 'তওহীদ' সমুদ্রের দিকে যাইতে না দেওয়া তাহাদের প্রতি মহা অনুগ্রহ। 'তওহীদ' সমুদ্রে যাহারা ডুবিয়া মরে তাহাদের অধিকাংশ সন্তরণপটু নহে বলিয়া মারা যায়। আর কতকগুলি লোক সন্তরণ-বিদ্যা শিক্ষা না করার জন্য বা উহা আবশ্যক বলিয়া না জানার জন্য ডুবিয়া মরে। আল্লার একত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে গিয়া অনেকে এইরূপ মনে করে যে, মানবের ক্ষমতার মধ্যে কিছুই নাই—সমস্তই আল্লা করিয়া থাকেন। তৎসহ ইহাও জানে যে সৃষ্টির প্রারম্ভে যাহার অদৃষ্টে দুর্ভাগ্য লিপীবদ্ধ হইয়াছে সে হাজার চেষ্টা করিলেও দুর্গতি হইতে ফিরিতে পারিবে না; এবং যাহার অদৃষ্টে তখন সৌভাগ্যের আদেশ হইয়াছে তাহার পক্ষে পরিশ্রম ও যত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এরূপ বিশ্বাস করা নিতান্ত মূর্খতা ও বিনাশের কারণ। এই প্রকার কথার প্রকৃত তথ্য কোন গ্রন্থে লেখা উচিত নহে, তথাপি কথা প্রসঙ্গে যখন এতদূর বলা গেল তখন কিছু আভাস দেওয়া সঙ্গত মনে করি।

ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট হওয়া আল্লার পবিত্র স্বভাবের বিরুদ্ধ

পাঠক! তুমি বলিয়াছ—মানবের স্বাধীনতা যখন নাই তখন পুরস্কার বা শাস্তি কেন হইবে? ইহার উত্তরে জানিয়া লও, কুকার্য্য করিলে আল্লা ক্রুদ্ধ হইয়া যে তোমাকে শাস্তি দিবেন এ কথা ঠিক নহে। এইরূপ সৎকার্য্য করিলেও যে আল্লা সন্তুষ্ট হইবেন এবং তজ্জন্য তোমাকে পুরস্কার দিবেন ইহাও মনে আনিও না। ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট হওয়া আল্লার পবিত্র স্বভাবের বিরুদ্ধ। তোমার শরীরে রক্ত, পিত্ত বা অন্য কোন ধাতু দূষিত হইলে তজ্জন্য তোমার শরীরে এক প্রকার অবস্থা আবির্ভূত হয়—তাহাকে রোগ বলে। রোগ জন্মিবার পর ঔষধ-পত্র ব্যবহার করিলে এবং ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পাইলে শরীরের আর এক প্রকার অবস্থা উৎপন্ন হয়—তাহাকে স্বাস্থ্য বলে। এই প্রকার লোভ ও ক্রোধ তোমার মনে প্রবল হইয়া উঠিলে তুমি তৎকর্তৃক পরিচালিত হইতে থাক। তাহাতে তোমার অন্তরে এক প্রকার অগ্নি উৎপন্ন হইয়া

প্রাণের মর্ম্মস্থল দগ্ধ করিতে লাগে তাহা হইতেই তোমার বিনাশ-সাধন হইবে। এই অর্থে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—"ক্রোধটী অগ্নির এক টুকরা।" ইহার ভাবার্থ যে—ক্রোধ অন্তরের মধ্যে জন্মাইয়া লইলে তাহা, অগ্নিখণ্ডের ন্যায়, অন্তর পোড়াইতে লাগে। বুদ্ধির আলোক বর্দ্ধিত হইলে যেমন লোভ ও ক্রোধ-রূপ অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দেয় তদ্রূপ ঈমানের আলোক, দোজখের অগ্নি নির্ব্বাণ করে। এই কারণে দোজখ ঈমানদার লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে—

ঈমানের আলোক দোজখের অগ্নি নির্ব্বান করে

جُزْ يَا مُؤْمِنُ فَاِنَّ نُورَكَ اَطْفَأَ نَارِي

"হে ঈমানদার লোক সরিয়া যাও—নিশ্চয়ই তোমার নূরে আমার অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দিবে।" দোজখের এই অনুরোধ ভাষাব সাহায্যে প্রকাশ না হইলেও অবস্থা-রূপ-ভাষার প্রকাশ পায়। ঈমানের আলোক দর্শন করিতে দোজখের সাধ্য নাই বলিয়া সে পলাইতে লাগে। মশক যেমন বায়ু প্রবাহ-দেখিলে উড়িয়া পলায়, তদ্রূপ ঈমানওয়ালাদের 'নূর' দর্শনে দোজখ ছুটিয়া পলাইবে। বুদ্ধির আলোক দর্শনে লোভাগ্নিও দূরে পলায়ন করে। যাহা হউক পাঠক! এ কথা জানিয়া রাখ—তোমাকে শাস্তি দিবার জন্য অন্য স্থান হইতে কাহাকেও আনিতে হইবে না। তোমারই 'উপার্জ্জন' করা দ্রব্য তোমাকে দেওয়া হইবে। এই অর্থে কথিত হইয়াছে।

اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ اِلَيْكُمْ

"নিশ্চয়ই এ সমস্ত তোমাদেরই কৃতকার্য্য, এখন তোমাদের দিকে ফিরিয়া আসিয়াছে।" যাহা হউক তোমারই লোভ ও তোমারই ক্রোধ তোমার দোজখের মূল কারণ। উহা তোমারই সঙ্গে তোমার অন্তরের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। তোমার অন্তরে ধ্রুব-জ্ঞান থাকিলে তুমি অবশ্যই তাহা দেখিতে পাইতে। এই মর্ম্মে আল্লাও বলিয়াছেন—

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝

"কখনই নহে। যদি তোমাদের ধ্রুব জ্ঞান থাকিত তবে অবশ্যই দোজখ দেখিতে পাইতে।" (৩০ পারা। সুরা তাকাছোর। ১ রোকু) যাহা হউক পাঠক!

এ কথা জানিয়া রাখ—বিষ পান করিলে মানুষ পীড়িত হয় এবং পরিশেষে মারা পড়ে। কোন ব্যক্তি বিষ পান করিলে কেহ তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইতে পারে না—কেহ তাহাকে তজ্জন্য শাস্তিও দেয় না। বিষে যেমন শরীরে রোগ আনয়ন করে তদ্রূপ পাপ কার্য্যে ও লোভে মানবের আত্মাকে পীড়িত করিয়া ফেলে। আত্মার পীড়া অগ্নির ন্যায়, তাহা মানবাত্মাকে পোড়াইতে থাকে।

দোজখের অগ্নি, চুম্বক লোহের ন্যায় পাপাগ্নি-সংযুক্ত লোককে স্বাভিমুখে টানে

এই পাপাগ্নি বাস্তবিক নরকাগ্নির সমজাতীয়—পৃথিবীর প্রকাশ্য অগ্নির সমজাতীয় নহে। চুম্বক-লৌহ যেমন তাহার সমশ্রেণীস্থ লৌহকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ দোজখের অগ্নি, পাপাগ্নি সংযুক্ত লোককে স্বীয় অভিমুখে টানিয়া আনে এবং দোজখের মধ্যে নিক্ষেপ করে। ইহা কাহারও ক্রোধের ফলে হয় না। পুণ্যের অবস্থাও এই প্রকার অনুমান করিয়া লও। সে সম্বন্ধে কিছুই লিখা হইল না। লিখিতে গেলে অনেক লিখিতে হয়।

চতুর্থ প্রসঙ্গ—জগতে পয়গম্বরগণের আগমন ও তাঁহাদের শরীঅৎ-বিধি প্রচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য—তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার দেওয়া কেমন করিয়া সঙ্গত হইতে পারে? তাহার উত্তর উপরে লিখা গেল। তোমার আর একটী প্রশ্নের উত্তর বাকী আছে এখন দিতে হইবে। তুমি বলিয়াছিলে শরীঅৎ কি উদ্দেশ্যে অবধারিত হইয়াছে? পয়গম্বরগণকে কি কারণে জগতে পাঠান গিয়াছে? এ প্রশ্নের উত্তর শুন—ইহা করুণাময় আল্লার এক প্রকার কাঠিন্য-মূলক অনুগ্রহ। মানুষকে জবরদস্তী শিকলে বান্ধিয়া ছান্দিয়া বেহেশ্‌তে লইয়া যাইবার জন্যই আল্লা ঐ প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—"তুমি কি সেই সম্প্রদায় দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছ, যাহারা শিকলে আবদ্ধ হইয়া বেহেশ্‌তের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে?" ইহার অর্থ এই যে করুণাময় আল্লা মানববৃন্দের প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া দোজখের পথ হইতে তাহাদিগকে জবরদস্তীর ফান্দে আট্‌কাইয়া টানিয়া লইতেছেন। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) অন্যত্র বলিয়াছেন—"তোমরা পতঙ্গের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া নিজকে অগ্নির উপর নিক্ষেপ করিতে যাইতেছ—আর আমি তোমাদিগকে অগ্নিতে পতিত হইতে না দিবার জন্য তোমাদের কমর ধরিয়া টানিতেছি।" প্রিয় পাঠক! এ কথা জানিয়া রাখ—আল্লা যে শিকলে

মানবকে আবদ্ধ করিয়া দোজখের দিক হইতে টানিয়া লইতেছেন, পয়গম্বর গণের উপদেশ সেই শিকলের এক টুকরা। তাঁহাদের কথায় তোমার মনে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেই জ্ঞানে তোমরা কুপথ হইতে সুপথ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পার। পয়গম্বরগণ যে সব কথা বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন তাহা হইতে তোমার মনে ত্রাস জন্মিতে পারে। তাঁহাদের প্রদত্ত উপদেশ হইতে যে জ্ঞান জন্মে এবং প্রদর্শিত কথা হইতে যে ভয় উদয় হয় সেই জ্ঞান ও ভয় একত্র মিলিত হইয়া, তোমাদের বুদ্ধি-রূপ-দর্পণোপরি সঞ্চিত ধূলা ধূসর দূর করে। তাহাতে এই ফল হয় যে তোমরা সংসারের রাস্তা ত্যাগ করিয়া পরকালের পন্থা অবলম্বন করিতে পার। সংসারের পন্থা ত্যাগ করিয়া পরকালের পন্থা অবলম্বন করা যে হিতকর, বুদ্ধি-রূপ-দর্পনে সে 'সত্য' সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়, এবং উহা দৃষ্টিগোচর হইলে পরকালের পন্থা অবলম্বন করিবার ইচ্ছা তোমাদের মনে উৎপন্ন হইতে পারে। এমন কি সেই ইচ্ছার প্রভাবে তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে চেষ্টা আগমন করিতে পারে, কেননা অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি ইচ্ছার অধীন। এখন দেখ, পয়গম্বরের বচন হইতে আরম্ভ করিয়া কর্ম্ম-চেষ্টা পর্য্যন্ত 'কার্য্য' ও 'কারণ' গুলি পরস্পর মিলিত হইয়া কেমন এক চমৎকার শিকলের ন্যায় হইল। সেই শিকলে তোমাদিগকে বান্ধিবে; করুণাময় কেমন জবরদস্তীর সহিত দোজখ হইতে টানিয়া আনিয়া বেহেশ্‌তে প্রেরণ করিতেছেন। মহামাননীয় পয়গম্বরগণকে এমন একরূপ ছাগরক্ষক রাখালের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে যাহাদের দক্ষিণ পার্শ্বে শ্যামল তৃণ-ক্ষেত্র শোভা পাইতেছে এবং বাম পার্শ্বে ব্যাঘ্র ভল্লুকপূর্ণ নিবিড় অরণ্য বর্ত্তমান আছে। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশু ছাগবৃন্দের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছে। রাখালগণ অরণ্যের ধারে লগুড় হস্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া ছাগগুলিকে জঙ্গলের দিক হইতে তাড়াইয়া তৃণ-ক্ষেত্রের দিকে প্রেরণ করিতেছে। পয়গম্বরদিগের অবস্থা বাস্তবিক ঐ রূপই বটে। তাঁহারা দোজখের ধারে দাঁড়াইয়া সে দিক হইতে মানবজাতিকে বেহেশ্‌তের দিকে প্রেরণ করিতেছেন। পয়গম্বরগণকে জগতে পাঠাইবার ইহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য।

পঞ্চম প্রসঙ্গ—সৃষ্টির প্রারম্ভে অদৃষ্টে যখন সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য লিপীবদ্ধ হইয়াছে তখন আর পরিশ্রমে কি ফল? পাঠক! তুমি আর একটী প্রশ্ন এই বলিয়া উত্থাপন করিয়াছিলে যে সৃষ্টির প্রারম্ভে

যাহার অদৃষ্টে দুর্ভাগ্য লিপী-বদ্ধ হইয়াছে তাহার পক্ষে যত্ন ও পরিশ্রম করিলে কি ফল? তোমার কথা এক হিসাবে সত্য এবং অন্য পক্ষে ভুল। সত্য হইলে, তাহা হইতে মহাক্ষতির সূত্রপাত এবং বিনাশ অবধারিত। যাহার সম্বন্ধে দুর্ভাগ্যের আদেশ হইয়াছে তাহার লক্ষণ এই যে, আল্লা তাহার মনে ঐ কথাটী নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছেন—'চেষ্টা করিলেও কোন লাভ নাই'। ইহা তাহার মনে সত্য সত্যই বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং তজ্জন্য সে চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত থাকে—সে বীজ বপনও করে না, শস্যও কাটিতে পায় না। বিশ্ব-প্রভু যাহার অদৃষ্টে অনাহার-মৃত্যু লিপীবদ্ধ করিয়াছেন তাহার চিহ্ন এই যে, তাহার মনে এই কথা দৃঢ় ভাবে গাড়িয়া দেওয়া হইয়া থাকে—"অনাহারে যখন মরিতেই হইবে তখন আহার গ্রহণে কি ফল?" এই কথা ভাবিয়া সে আহার গ্রহণ করিবে না সুতরাং ক্ষুধায় মারা পড়িবে। এইরূপ যাহার অদৃষ্টে আল্লা দরিদ্রতা লিপীবদ্ধ করিয়াছেন তাহার চিহ্নও পূর্ব্ব হইতে প্রকাশ পায়। সে মনে করে "আমার অদৃষ্টে দরিদ্রতা লিখিত হইয়াছে অতএব কৃষি কার্য্যেই বা কি লাভ—বাণিজ্যেই বা কি উপকার?" এইরূপ ভাবিয়া সে বীজও বুনিবে না, শস্যও কাটিবে না এবং বাণিজ্যও করিবে না—সুতরাং নির্ধন রহিয়া যাইবে। আল্লা যাহার সম্বন্ধে সৌভাগ্য লিপীবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাকে তিনি এই কথাও বুঝাইয়া দিয়াছেন যে তাহাকে ধনী হইতে হইবে, দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে হইবে, তদর্থে কৃষি বাণিজ্যও অবলম্বন করিতে হইবে—আহারও করিতে হইবে। এরূপ পারস্পরিক সম্বন্ধ-বদ্ধ-ব্যাপার অদৃষ্টে লিপীবদ্ধ করা নিরর্থক ব্যাপার নহে বরং 'কার্য্য' 'কারণের' সঙ্গে সকলগুলি সম্বন্ধ-বদ্ধ হইয়া আছে। মহাপ্রভু আল্লা যাহাকে যে কার্য্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকে তৎ তৎ কার্য্যের 'উপাদান' উপকরণ'ও সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তিনি কাহাকেও 'উপাদান' বা 'কারণ' সংগ্রহ করিয়া না দিয়া কোন কার্য্য সম্পাদনে প্রেরণ করেন নাই। এই জন্য মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) বলিয়াছেন "কার্য্য করিয়া যাও—যে কার্য্যের জন্য যাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহার জন্য সমস্ত 'কারণ' 'উপকরণ'ও সংগৃহীত হইবে।"

পাঠক! বুঝিয়া রাখ—মহাপ্রভু আল্লা, পাকে প্রকারে বা জবরদস্তীর সহিত তোমার মনে যে ভাব স্থাপন করিয়াছেন এবং অঙ্গে যে চেষ্টা সংযোগ করিয়া দিতেছেন তাহাকে তুমি স্বীয় পরিণামের পূর্ব্ব-সংবাদ বলিয়া

পাঠ কর। বিদ্যা শিক্ষার প্রতি তোমার মনে আসক্তি ও চেষ্টা আছে বলিয়া যদি তুমি বুঝিতে পার এবং তৎসঙ্গে অটল অধ্যবসায় ও সচেতন আলস্যহীনতা বর্ত্তমান থাকে তবে বুঝিতে পারিবে আল্লা তোমাকে ভবিষ্যতে বিদ্বান্ করিয়া সমাজের নেতা ও কর্ত্তা করিবেন বলিয়া লিপীবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তোমার মানসিক অবস্থা উক্ত প্রকার আশাপ্রদ থাকিলেও যদি তুমি যথোচিত পূর্ণ পরিশ্রম না কর—আলস্যে জীবন অতিবাহিত করিতে থাক তবে তোমার পূর্ব্বোক্ত প্রকার আশাপ্রদ মনের অবস্থা সমস্তই নিরর্থক হইবে। (টীঃ ৪২৯) যাহা হউক, তোমার মনে যদি এই কথা নিক্ষিপ্ত হয় যে "সৃষ্টির প্রারম্ভে আমার অদৃষ্টে মূর্খতার আদেশ লিপীবদ্ধ হইয়াছে—বিদ্যাশিক্ষার জন্য চেষ্টা করিলে কি ফল ?"—তবে ঐ 'ভাব'কেই তোমার দুর্ভাগ্যের 'আদেশ-ধ্বনি' বলিয়া গ্রহণ করিবে এবং ইহা জানিয়া রাখিবে যে তুমি কখনই নেতা বা কর্ত্তা হইতে পারিবে না।

উপরে সাংসারিক কার্য্য লইয়া সফলতা বিফলতা—উন্নতি অবনতি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা গেল, পারলৌকিক ব্যাপারেও তদনুরূপ ঘটে। পরকালের কার্য্য, সাংসারিক কার্য্যের অনুরূপ ভাবিয়া লইবে। এ সম্বন্ধে আল্লা বলিতেছেন—

টীকা—৪২৯। কথাটী বড় গুরুতর। একটী ধান্য বীজের প্রতি মনোযোগ দাও। উহা এখন বীজ রূপে আছে। উহা হইতে অঙ্কুর বৃক্ষ পুষ্প ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া পরিণামে পুনরায় ধান্য হইবে এবং তখন হয় উৎকৃষ্ট বীজ রূপে আদরে গোলায় স্থাপিত হইবে, নয় অগ্নিতে সিদ্ধ বা দগ্ধ হইয়া মনুষ্যাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত বা অনাদরে পচিয়া যাইবে। মানুষের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। নানা অবস্থা পার হইয়া শেষে মানুষ হইয়া হয় বেহেশ্‌তে—আদরে রক্ষিত হইবে, নয় দোজখে পুড়িবে। ধানেরও আভ্যন্তরিক অবস্থা, নিয়মানুযায়ী থাকিবার ব্যবস্থা আছে; অর্থাৎ শস্যাংশ তাজা, গোটা ও তুষ গুঁড়ার আবরণে সুরক্ষিত থাকা আবশ্যক। উহা ভাঙ্গাচুরা বা কানা হইলে অঙ্কুর উদ্গত করিতে বা পরিণামে সুপুষ্ট ধান্য দানা ফলাইতে পারিবে না; যাহা হউক, উহার আভ্যন্তরিক অবস্থা যেমন ভাল হওয়া চাই তদ্রূপ বিধিমত 'আমলে' আনা অর্থাৎ কার্য্যে ও ব্যবহারে লাগানও আবশ্যক। কর্ষিত সরস মৃত্তিকার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত 'অনড়' ভাবে স্থাপিত রাখা আবশ্যক। অদ্য পুঁতিয়া কল্য তুলিলে বা মধ্যে মধ্যে মূলের মৃত্তিকা আলগা করিয়া বা তাহা কাড়িয়া লইয়া বিরক্ত করিলে অঙ্কুর মারা পড়ে। মানুষের মানসিক (আভ্যন্তরিক) অবস্থা ভাল হওয়া চাই—আসক্তি ও চেষ্টা ইত্যাদি তাজা থাকা চাই; অটল অধ্যবসায়ের সহিত বাহিরে কর্ম্ম জগতের মধ্যে লাগিয়া থাকা চাই। সচেতন উৎসাহের সহিত কর্ত্তব্যবিধানে ব্যাপৃত থাকা চাই ইত্যাদি। আভ্যন্তরিক অবস্থা 'তাজা' হইলেও যদি বাহ্য সুব্যবস্থায় ব্যবহার না করা যায় তবে সমস্ত বৃথা। সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ক্ষতি যদি আভ্যন্তরিক আশা উৎসাহ তাজা না থাকে অর্থাৎ 'আমার অদৃষ্টে ইহা নাই' বলিয়া যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকে তবে সমস্তই বৃথা। তাহাতে আল্লার প্রদত্ত 'নেআমৎ' বা সম্পদ্ সমস্তই বৃথা অপচয় হইয়া যায়।

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ○

"তোমাদের সৃজন ও উত্থান একজন প্রাণীর সৃজন উত্থানের সদৃশ ভিন্ন আর কিছু নহে।" (২১ পারা। সূরা লোকমান। ৩ রোকূ।) পুনরায় তিনি বলিতেছেন—

سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ○

"তাহাদের জীবন মরণ উভয়ই সমান।" (২৫ পারা। সূরা জাছিয়া। ২ রোকূ।)

পাঠক! তুমি যদি এত তথ্য গুলি বুঝিতে পার তবে পূর্ব্বোক্ত (শেষ) তিনটী কঠিন প্রশ্নের উত্তর সহজ হইয়া উঠিবে—তৎসঙ্গে আল্লার একত্ব-জ্ঞানের জটিলতা সরল হইয়া পড়িবে। (যাহাদের নিয়মিত সহযোগিতায় 'তওয়াক্কোল' জন্মিতে পারে সেই) **শরীঅৎ, বুদ্ধি ও একত্ব-জ্ঞান** সম্বন্ধে তখন চক্ষুষ্মান জ্ঞানীর নিকট আর কোন তর্কবিতর্ক বর্ত্তমান থাকিবে না। (টীঃ ৪৩০) উপরে যাহা লিখা গেল তদপেক্ষা আর অধিক লেখা যায় না।

তওয়াক্কোলের দ্বিতীয় বুনিয়াদ। পাঠক! স্মরণ কর ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে আল্লার উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করিতে হইলে দুই শ্রেণীর **জ্ঞান** পরিপক্ক করিয়া লওয়া আবশ্যক—(১) 'তওহীদ'-জ্ঞান অর্থাৎ আল্লাকে 'এক' বলিয়া জানা; (২) আল্লাকে পূর্ণ দয়াময় বলিয়া মানা। এই দুই শ্রেণীর "বিশ্বাস" প্রগাঢ় 'জ্ঞানে' পরিণত হইলে 'আল্লার-প্রতি-নির্ভরতা' জীবন্ত ভাব ধারণ করে। ফল কথা, উক্ত দুই প্রকার জ্ঞানের ফল হইতেছে 'আল্লার প্রতি নির্ভরতা'। উপরে 'তওহীদ' সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা গেল। এখন আল্লার 'দয়ার' সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। (আল্লাকে পূর্ণ দয়াবান বলিয়া যথার্থ উপলব্ধি করিতে হইলে নিম্নলিখিত ধরণের কতকগুলি তথ্যের সম্যক তাৎপর্য্য অগ্রে ভালমত জানা উচিত।) (১) তুমি এ কথা বিশ্বাস কর এবং জানিয়া লও যে আল্লাই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা; বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের 'কারণ' তিনি। তাঁহা হইতে সমস্ত হইয়াছে। (২) তিনি সকলের প্রতি অফুরন্ত দয়া বিতরণ করিতেছেন এবং সুকৌশলে সকলকে বাধ্য করিয়া বা জবরদস্তীর সহিত টানিয়া লইয়া দয়ার নিকেতনে প্রেরণ পূর্ব্বক অযাচিত

টীকা—৪৩০। পরিত্রাণ পুস্তকের অষ্টম পরিচ্ছেদে (দ্বিতীয় পারা) দ্রষ্টব্য। শরীঅৎ, বুদ্ধি ও তওহীদ যোগে প্রকৃত তওয়াক্কোল জন্মিয়া থাকে—সে বিষয়ের উল্লেখ তথায় আছে।

ভাবে সকলের গায়ে করুণা মাখাইয়া দিতেছেন। তিনি পূর্ণ করুণাময়। (৩) তাঁহার 'ভালবাসা' ও 'দান' মশা মাছী, পিপীলিকা প্রভৃতি ইতর জীব হইতে আরম্ভ করিয়া জীবশ্রেষ্ঠ মানব পর্য্যন্ত সকলেই সমান ভাবে পাইতেছে। দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রতি মাতার ভালবাসা ও স্নেহ যতদূর প্রবল, প্রত্যেক জীবের প্রতি আল্লার ভালবাসা তদপেক্ষা অধিক এ মর্ম্মের কথা মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) ও বলিয়াছেন। (৪) তৎসঙ্গে এ কথাও জানিয়া লও যে, মহাপ্রভু বিশ্বজগৎ ও তদন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ এমন পূর্ণতা দিয়া—এরূপ সৌন্দর্য্য সহকারে এবং এ হেন মনোরম কৌশল সহযোগে সৃষ্টি করিয়াছেন যে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়া অসম্ভব। (৫) এই সঙ্গে আরও জানিয়া লও—আল্লা কোন বস্তু বা জীব জন্তুকে স্বীয় দয়া ও করুণা হইতে বঞ্চিত রাখিতে চান না। (৬) তিনি যে বস্তু সৃষ্টি করিতেছেন তাহা যেমন ভাবে করা উচিত—ঠিক সেই প্রকারেই করিতেছেন। পৃথিবীর সমস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে যদি পূর্ণ বুদ্ধি ও সমগ্র দক্ষতা দেওয়া হয় এবং তাহারা যদি সকলে একত্র হইয়া একযোগে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হয় তবে বিশ্বজগতের কোন পদার্থের মধ্যে সূক্ষ্ম কেশাগ্র তুল্য স্থানে মশকের পালক পরিমাণে কোন অপচয় বা অপ্রতুলতা দেখিতে পাইবে না। 'উহা এমন না হইয়া তেমন হইলে ভাল ছিল' কিম্বা 'ছোট' বা বড়, লঘু বা গুরু, হইলে উত্তম হইত' এমন মন্তব্য প্রকাশ করিতেও কেহ পারিবে না। এবং তদ্রূপ মন্তব্য প্রকাশের উপায় কোন বস্তুতে খুঁজিয়া পাইবে না। তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া যতই প্রণিধান করিয়া দেখিবে ততই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে উহা যেমন হওয়া উচিৎ ছিল ঠিক তদ্রূপই হইয়াছে। (৭) যে পদার্থ নিতান্ত কদর্য্য তাহার পূর্ণতা সেই কদর্য্যতার মধ্যেই আছে। উহা যদি কদর্য্য না হইত তবে তাহা অপূর্ণ রহিয়া যাইত এবং যে উদ্দেশ্যে তিনি কৌশল করিয়া ঐ রূপ কদর্য্য করিয়াছেন তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইত। দেখ, মন্দ দ্রব্য না থাকিলে কেহ উত্তম দ্রব্যের আদর করিত

মন্দ দ্রব্যের উদ্দেশ্য

না এবং আরামও পাইত না। অপূর্ণ বা দুর্ব্বল বস্তু না থাকিলে পূর্ণ ও বলবান বলিয়া কোন কথা থাকিত না। অপর পক্ষে, পূর্ণ ও বলবান বস্তু স্বীয় গুণের মাধুর্য্য পাইত না। পূর্ণ বা বলবানকে অপূর্ণ বা দুর্ব্বলের সহিত মিলাইয়া পরস্পর তুলনা করিয়া চিনা যায়। দেখ, এক জনকে পিতা হইলেই অন্যকে পুত্র হওয়া আবশ্যক। পুত্র সম্বন্ধ না

থাকিলে পিতা কথাটিও থাকিত না। এরূপ স্থলে, এক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর তুলনা করিয়া লইতে হয়। তুলনা স্থলে দুটী বস্তুর আবশ্যক। 'তওহীদ'-জ্ঞান, লাভ হইলে দ্বিত্বজ্ঞান অন্তর্হিত হয়; তখন সমস্তই এক হইয়া যায়; তুলনা ও তুলনীয় বস্তু সমস্তই লোপ পায়। (৮) এখন এ কথাটীও বুঝিয়া রাখ—মহাপ্রভু আল্লা জাগতিক কার্য্যাবলীর হেকমৎ মানব হইতে গোপনে রাখিয়াছেন। তাহা হিতের জন্যই হইয়াছে। (৯) তদ্‌ব্যতীত ইহাও দৃঢ়ভাবে 'বিশ্বাস' করা আবশ্যক যে—বিশ্বপ্রভু যে কার্য্যের আদেশ করেন তাহা মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন এবং তাহা যেরূপ হওয়া আবশ্যক তিনি তদ্রূপই করিয়া লন। ইহসংসারে, রোগ, শোক, দুর্ব্বলতা, এমন কি কাফেরী, পাপ, বিনাশ, ক্ষতি, দুঃখ, কষ্ট, যাতনা, বেদনা, যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ের প্রত্যেকের মধ্যে মহাকৌশলী বিশ্বপ্রভু এক একটী 'হেকমৎ' রাখিয়াছেন এবং তৎসমুদয় যেরূপ হওয়া উচিত ছিল, ঠিক সেই রূপই করিয়াছেন। যাহাকে অভাবগ্রস্ত দীন হীন করিয়াছেন তাহার মঙ্গল সেই অবস্থার মধ্যেই আছে; সে দরিদ্র না হইয়া ধনী হইলে বিনাশ পাইত। তিনি যাহাকে ধনী করিয়াছেন তাহার মঙ্গলও ঐ রূপ তাহার অবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। তওহীদ-সমুদ্রের ন্যায় এই কথার মর্ম্মও এক ভীষণ সমুদ্র। বহু লোক এ সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছে। ইহার মধ্যে অদৃষ্টবাদের জটিল পেঁচ আছে। সে পেঁচ সাধারণ লোকের সম্মুখে খুলিয়া বলিবার অনুমতি নাই। এই বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান করিতে গেলে কথা বড় বাড়িয়া যাইবে; তথাপি পুনরায় এ কথা বলা আবশ্যক যে 'তওয়াক্কোল' অর্থাৎ আল্লার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করার ক্ষমতা যেমন 'তওহীদ' অর্থাৎ আল্লার একত্ব-জ্ঞান হইতে জন্মে, তেমনই উহা 'আল্লা যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন' এই করুণা-মূলক-ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস হইতেও উৎপন্ন হয়।

আল্লা পূর্ণ করুণাময় ইহার আলোচনায় অদৃষ্টবাদের জটিল পেঁচ আসে

তওয়াক্কোলের পরিচয়—পাঠক! জানিয়া রাখ—মানুষের হৃদয়ে যতগুলি 'অবস্থা' উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে আল্লার প্রতি নির্ভরতা' একটী উন্নত অবস্থা। আল্লার একত্বের উপর এবং তাঁহার সর্ব্বমুখীন্ দয়ার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস জমিয়া গেলে হৃদয়ে এই ভাব জন্মে; এবং তৎপ্রভাবে 'কার্য্য নির্ব্বাহক' আল্লার প্রতি ভরসা জন্মে; পশ্চাৎ সেই ভরসা অটল রাখিবার চেষ্টা হয়; এবং

তওয়াক্কোলের উৎপত্তি, ফলাফল ও চরম পরিণতির

তাহার ফলে মনে নিরুদবিগ্নতা ও আরাম আসে—উপজীবিকা সংগ্রহে মন আবদ্ধ হয় না ; ঘটনাক্রমে জীবিকা সম্বন্ধীয় বাহ্য উপায়ের মধ্যে কোনটী বিগড়িয়া গেলে এবং তজ্জন্য অকৃতকার্য্য হইলে, মনে বিমর্ষতা আসে না বরং আল্লার অসীম দয়ার প্রতি বিশ্বাস করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক তুষ্ট হইয়া ভরসা করে যে, তিনি আমাকে পর্য্যাপ্ত জীবিকা দিবেন।

এ সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মনে কর এক জন চতুর লোক কোন দুর্ব্বল সৎ লোকের কিছু সম্পত্তি কাড়িয়া লইবার মানসে মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিল। সাধু ব্যক্তি বঞ্চিত হইবার ভয়ে বাদীর দাবী ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে এক জন উকীলের আশ্রয় গ্রহণ করিল। উৎপীড়িত ব্যক্তি যদি উকীলের নিম্নলিখিত গুণ হৃদ্‌বোধ ভাবে উপলব্ধি করিতে পায় তবে তাঁহার প্রতি নিরুদ্‌বেগে আত্ম সমর্পন করিতে পারে। (১) প্রতারকের দুরাভসন্ধি ও মিথ্যা দাবী উকীল সুন্দর মত বুঝিতে পারিয়াছে। (২) প্রমাণ ও যুক্তি প্রয়োগে প্রতারকের দাবী খণ্ডন করিতে উকীলের যথেষ্ট বাক্‌-পটুতা আছে। অনেক স্থলে দেখা যায় উত্তম প্রমাণ ও সুন্দর যুক্তি থাকিলেও বাক্‌-পটুতার অভাবে উকীল স্বীয় ভাব প্রকাশ করিতে পারে না, তজ্জন্য মোকদ্দমা হারিয়া যাইতে হয়। (৩) উৎপীড়িতের প্রতি উকীলের প্রচুর দয়া আছে এবং তাহার স্বার্থ রক্ষার্থ উকীল নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছেন। উকীলের উক্ত ত্রিবিধ গুণের প্রতি মনুষ ভরসা স্থাপন করিতে পারিলে আপনার সমস্ত কার্য্য তাঁহার উপর সমর্পণ করতঃ নিজে নিরুদ্‌বিগ্ন হইতে পারে ; তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করতঃ অন্যান্য গতি ও 'ওছিলা' পরিত্যাগ করিতে এবং সর্ব্ববিধ তদ্‌বীর হইতে ক্ষান্ত হইতে পারে। এই প্রকারে যে ব্যক্তি

—দৃষ্টান্ত

نِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ ۝

"তিনি আমার অতি উত্তম প্রভু এবং অতি উত্তম উকীল।" এই বাক্যের অর্থ অতি সুন্দর রূপ বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি ইহা বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন যে, ইহসংসারে যাহা কিছু হয় তাহা আল্লার 'কারণে'ই হইয়া থাকে—তিনি ভিন্ন আর কেহ কর্ত্তা নাই—তাঁহার জ্ঞান ও ক্ষমতার মধ্যে কিঞ্চিৎ মাত্রও অপ্রতুলতা নাই—তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহ এত অসীম যে তদপেক্ষা

অধিক হওয়া অসম্ভব। এইরূপ জ্ঞান পরিপক্ক হইলে, আল্লার দান ও করুণার উপর হৃদয়ের সহিত নির্ভর করিয়া, অন্যান্য উপায় ও 'তদ্‌বীর' ছাড়িয়া দিতে পারেন; তখন বুঝিতে পারেন জীবিকা নির্দ্দিষ্ট আছে' 'ঠিক সময়ে পাওয়া যাইবে' এবং 'আল্লার দয়া ও অনুগ্রহে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে।'

আল্লার উক্ত ত্রিবিধ গুণের প্রতি ধ্রুব বিশ্বাস থাকিয়া গেলেও, মানুষের মন, প্রবৃত্তির স্বাভাবিক টানে কাঁচা থাকিতে পারে এবং কাল্পনিক সন্দেহের বাতাসে ইতস্ততঃ দুলিতেও পারে। তাহার কারণ এই যে, ইহা প্রায় সচরাচর দেখা যায় যে, মানুষ কোন জ্ঞান ধ্রুব ও পরিপক্ক ভাবে পাইতে পারিলেও তাহার 'তবীঅৎ' (প্রকৃতি) সহসা তাহা গ্রহণ করিতে চায় না।

আল্লার-প্রতি-নির্ভরতা-ভাবের চরম উন্নতির পথে কাল্পনিক সন্দেহের উদয় অসম্ভব নহে

আবার কখন কখন কাল্পনিক মিথ্যা খেয়ালও মনকে সে জ্ঞানের অনুসারে কাজ করিতে দেয় না। 'তবীঅৎ' (মানব-প্রকৃতি) কখন কখন সেই সেই 'খেয়াল'কে মিথ্যা জানিয়াও উহার বশীভূত হইয়া চলে।

দেখ, কোন ব্যক্তি মিষ্টান্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে এমন সময়ে কোন ব্যক্তি আসিয়া সেই পবিত্র মিষ্টান্নকে ঘৃণ্য 'বিষ্ঠা'র সঙ্গে তুলনা করিল। তখন ভোজন-প্রবৃত্ত-ব্যক্তির মনে এমন এক ঘৃণার উদয় হইতে পারে যে, সে ব্যক্তি বাধ্য হইয়া উহা ভোজনে বিরত হয়; কিন্তু সে ব্যক্তি পরিষ্কার ভাবে জানিতেছে যে, সে তুলনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আবার দেখ, মৃত দেহকে সকলেই কাষ্ঠ প্রস্তর-বৎ নিতান্ত অক্ষম ও নিশ্চেষ্ট বলিয়া সুন্দর মত জানে এবং তাহা নড়িতে চড়িতে বা কিছু করিতে পারে না ইহাও উত্তম রূপ মানে। শব দেহের অক্ষমতা সম্বন্ধে এরূপ পরিপক্ক জ্ঞান থাকিলেও অপর কেহ একাকী রাত্রিকালে মৃত-দেহ-সহ এক গৃহে বাস করিতে পারে না।

যাহা হউক, আল্লার প্রতি নির্ভর করিতে হইলে তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের জ্ঞান বিশেষ বলবান ও পরিপক্ক হওয়া আবশ্যক, তৎসঙ্গে মনেও প্রচুর বল থাকা প্রয়োজন, যাহাতে মন হইতে 'ইতস্ততঃ-ভাব' বিদূরিত হইতে পারে। এই প্রকারে 'পূর্ণ নির্ভরতা' এবং 'সমগ্র আরাম' মনে যে পর্য্যন্ত বদ্ধমূল না হইতে পারে সে পর্য্যন্ত মানব প্রকৃত 'তওয়াক্কোল-ধারী' হইতে পারে না। তওয়াক্কোল (আল্লার প্রতি নির্ভরতা) শব্দের সংক্ষিপ্ত অর্থ—'সর্ব্ববিধ কার্য্য-কলাপে আপনাকে আল্লার উপর সর্ব্বান্তঃকরণে বিসর্জ্জন দেওয়া।' মহাত্মা

কিসে প্রকৃত তওয়াক্কোল-ধারী হওয়া যায়?

হজরত এব্রাহীম খলীল আঃ আল্লার সম্বন্ধে ধ্রুব ও পরিপক্ক ঈমান (বিশ্বাস জ্ঞান) রাখিতেন তথাপি নিবেদন করিয়াছিলেন—

رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى قَالَ

اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ؕ

"হে আমার প্রভু! আমাকে দেখাও কেমন করিয়া তুমি মৃতকে জীবিত কর" (আল্লা) বলিলেন—"তুমি কি বিশ্বাস কর না?" (এব্রাহীম) বলিলেন "হাঁ বিশ্বাস করি বটে কিন্তু আমার অন্তরে স্থৈর্য্য ভাব প্রদান জন্য দেখাও।" (৩ পারা। সূরা বকর। ৩৫ রোকূ।) নবী মহোদয়ের পরিপক্ক বিশ্বাস তো ছিল তথাপি অন্তরের আরাম ও প্রশান্তি লাভের মানসে তিনি পুনর্জীবনের তথ্য দেখিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন।

আল্লা-সম্বন্ধীয় বিশ্বাস-জ্ঞানের প্রথম অবস্থায় আন্তরিক আরাম ও প্রশান্তি এক হিসাবে 'খেয়ালের' অধীন থাকে। পশ্চাৎ সেই অবস্থা উন্নত হইয়া চরম সীমায় উপস্থিত হইলে সমগ্র হৃদয় 'বিশ্বাসে' পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তখন প্রত্যক্ষ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

আল্লা সম্বন্ধীয় বিশ্বাস-জ্ঞানের প্রথম ও চরম অবস্থার তুলনা

তওয়াক্কোলধারী লোকের ত্রিবিধ শ্রেণী বিভাগ। পাঠক! জানিয়া রাখ—আল্লার প্রতি নির্ভরকারী লোকের তিনটী শ্রেণী আছে। **প্রথম** শ্রেণীর 'তওয়াক্কোলধারী' লোকের অবস্থা এমন লোকের সদৃশ যে ব্যক্তি কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে নিজের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত একজন চতুর, অভিজ্ঞ, সুদক্ষ, বাক্‌পটু, সাহসী, দয়ালু উকীল নিযুক্ত পূর্ব্বক তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। **দ্বিতীয়** শ্রেণীর তওয়াক্কোল-ধারী লোকের অবস্থা দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায়; কোন বিপদ উপস্থিত হইবা মাত্র স্বীয় মাতার আশ্রয়ে গিয়া মাথা লুকায়। মাতা ভিন্ন আর কাহাকেও সে জানে না। ক্ষুধা লাগিলে মাতার নিকট গিয়া ক্রন্দন করে। কোন ভয় উপস্থিত হইলে দৌড়িয়া গিয়া মাতার কোলে আশ্রয় লয়। শিশুর স্বভাব নিতান্ত সরল; সে নিজের মনোভাব বাহ্যাড়ম্বর করিয়া প্রকাশ করিতে জানে না। এই শ্রেণীর তওয়াক্কোলধারী লোক আল্লার গুণে মুগ্ধ হইয়া এরূপ ডুবিয়া থাকে যে, নির্ভরতার সংবাদ পর্য্যন্ত রাখে না। প্রথম শ্রেণীর লোক

নিজের নির্ভরতা নিজে বুঝে এবং উকীলের গুণাদি দর্শনে চেষ্টা চরিত্র করিয়া নিজকে নির্ভর করিতে শিখায়। **তৃতীয়** শ্রেণীর তওয়াক্কোল-ধারী লোকের অবস্থা মৃত-দেহের তুল্য। যে ব্যক্তি মৃতদেহকে 'গোছল' দেয় তাহার হাতে মৃত-দেহের অবস্থা যেরূপ, এই শ্রেণীর লোকের অবস্থাও তদ্রূপ। নড়াইলে নড়ে, নচেৎ অচল থাকে। শিশুবা কোন দায়ে ঠেকিলে যেমন মাতাকে আহ্বান করে কিন্তু ইহারা কোন কার্য্যে ঠেকিলে আল্লাকে ডাকিতেও জানে না। বরং ইহাদের অবস্থা সেই শিশুর সদৃশ; যে শিশু সুন্দর মত মাতার স্বভাব জানে যে, বিনা প্রার্থনায় মাতা তাহার অভাব জানিয়া মোচন করেন।

ত্রিবিধ শ্রেণীর তওয়াক্কোলের তুলনা—যাহা হউক তৃতীয় শ্রেণীর নির্ভরকারীদের কিছুমাত্র ক্ষমতা থাকে না; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের ক্ষমতা থাকে না বটে, তবে নিজের অসহায়তা, প্রার্থনা এবং আল্লার প্রতি ভরসা অবশিষ্ট থাকে। প্রথম শ্রেণীর লোকের ক্ষমতা অবশ্যই থাকে কিন্তু সে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ—উকীলেব স্বভাব ও অভ্যাস দৃষ্টে যে সকল দ্রব্য সংগ্রহ করা আবশ্যক বলিয়া বুঝা যায় সেই দ্রব্যগুলি সংগ্রহের ও ব্যবহারের ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে। যদি উকীলের এই নিয়ম ও অভ্যাস থাকে যে প্রার্থী উপস্থিত না হইলে এবং 'দাবীর' 'দলীল' দাখিল না করিলে সে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে না, তবে প্রার্থীকে বাধ্য হইয়া তদরূপ আয়োজন ও জোগাড় করিয়া দিতে হয়; তথাপি ঐ সমস্ত করিয়াও উকীলের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই থাকিতে হয়। এই ধরণের যে কার্য্য ঘটে বা যে ফল লাভ হয় উকীলকেই তাহার কর্ত্তা বলিয়া ধরা হয়। প্রার্থীকে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল বা দলীলাদি দাখিল করিতে হইয়াছিল—তৎসমুদয় কেবল উকীলের 'ইশারাতে' হইয়াছিল বলিয়া উকীলেরই কৃতকার্য্য বলিয়া ধরা হয়। যাহা হউক, প্রথম শ্রেণীর তওয়াক্কোল-ধারী

কৃষি বাণিজ্যাদিজীবি লোকের তওয়াক্কোলের বিবরণ

লোকেবা, কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্যে এবং উপাদান-উপকরণ সংগ্রহে যেরূপ আয়োজন উদ্‌যোগ বা যোগাড় করিয়া থাকে তাহা আল্লার অভিপ্রায়-প্রদর্শিত নিয়ম মতেই করা হয় বলিয়া তাহারা আল্লারই আদেশ পালন বলিয়া মনে করে। এই কারণে তাহারা কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্য হইতে হস্ত সঙ্কুচিত করে না বলিয়া তাহাদিগকে তওয়াক্কোল-ধারী লোক বলা যায়। ইহার কারণ এই যে,

তাহারা কৃষি বাণিজ্যাদির প্রতি ভরসা করে না কেবল আল্লার করুণামূলক বন্দোবস্তের প্রতি নির্ভর করিয়া থাকে। তাহারা বিবেচনা করে, মানুষের মধ্যে আল্লা যে পরিমাণে চেষ্টা ও বল জন্মাইয়া দেন—উপাদান-উপকরণ দেখাইয়া এবং সংগ্রহ করিয়া দেন এবং কার্য্য-পদ্ধতি শিখাইয়া দেন, কৃষি বাণিজ্যের ফল সেই পরিমাণে হস্তে তুলিয়া দিয়া থাকেন। তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে যে বস্তু বা ব্যাপার আসিয়া পড়ে তাহা আল্লার দিক হইতে আসিতেছে বলিয়া দেখা যায়। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আরও কিছু বিস্তৃত বিবরণ ইহার পরে আসিবে।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۝

"আল্লা ব্যতীত গতি ও বল নাই।" এই বাক্যের অর্থ—উপরে লিখা গেল। 'হওলা' শব্দের অর্থ গতি 'কুওয়াৎ' শব্দের অর্থ বল বা ক্ষমতা। মানুষ যখন বুঝিতে পারে যে গতি বা শক্তি আমার নিজের নহে বরং উহা আল্লার দিক হইতে আসিতেছে তখন যাহা কিছু দেখা যায় তাহা আল্লার দিক হইতেই দেখা যায়। যাহা হউক, ফল কথা জগতের সমস্ত কার্য্যাবলী কেবল আল্লার দ্বারা ঘটিতেছে এবং তাঁহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে—অন্য কোন প্রকাশ্য "কারণ" দ্বারা ঘটিতেছে না—এই তথ্য যখন বুঝা যায় তখন মানুষ তওয়াক্কোল-ধারী হইতে পারে।

উচ্চ ধরণের তওয়াক্কোলের বিবরণ ও উদাহরণ—উচ্চ ধরণের 'তওয়াক্কোল' কিরূপ পদার্থ তাহা মহাত্মা আবু ইয়াজেদ বোস্তামী প্রকাশ করিয়াছেন। মহাত্মা আবু মুছা ওয়ালী এক দিন তাঁহার স্থানে তওয়াক্কোলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সোজা উত্তর না দিয়া পাল্‌টা প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তোমরা 'তওয়াক্কোল' কাহাকে বল ?" তদুত্তরে আবু মুছা বলিয়াছিলেন—"জ্ঞানী লোকের মুখে শুনিয়াছি—বিষধর সর্পরাশি কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইলেও যদি অন্তঃকরণ ভয়ে সূক্ষ্ম কেশাগ্র বিচলিত না হয়, তবেই 'তওয়াক্কোল' বলে।" আবু ইয়াজেদ্ বলিয়াছিলেন—"তবে তো 'তওয়াক্কোল' সহজ কথা। আমার বিবেচনায় দোজখের লোকদিগকে সর্ব্ববিধ শাস্তির মধ্যে এবং ঠিক সেই সময়ে বেহেশ্‌ৎ বাসীদিগকে পূর্ণ-অনুগ্রহের মধ্যে দেখিয়াও যাহার মনে সামান্য প্রভেদ বিবেচনা করে সে তওয়াক্কোল-ধারী নহে।" মহাত্মা

আবু মুছা যে প্রকার তওয়াক্কোলের কথা বলিয়াছিলেন তাহাও এক প্রকার উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত। তওয়াক্কোল জন্মিলে যে, মনে ভয় জন্মিতে পারে না, এমন নহে। মহাত্মা হজরৎ আবুবকর যে সময়ে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) এর সঙ্গে পর্ব্বত-কন্দরে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় পদযুগল দ্বারা সর্প-বিবরের মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন তখনও তিনি তওয়াক্কোল-ধারী ছিলেন। তিনি সে সময়ে সাপের জন্য ভয় করেন নাই—সর্পের সৃষ্টি-কর্ত্তার জন্য ভীত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন—কি জানি আল্লা সর্পের মনে দংশনেচ্ছা ও দংশন-চেষ্টা প্রেরণ করিতে পারেন। এরূপ 'তওয়াক্কোল ধারী' লোক, সকল পদার্থে "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা" কল্‌মার অর্থ দেখিতে পান। মহাত্মা আবু ইয়াজেদ মহোদয়ের বাক্য-মধ্যে যে 'ঈমান' (বিশ্বাস) এর আভাস আছে তাহা 'তওয়াক্কোলে'র মূল; উহা অনেক কয়েকটী মূল্যবান বিষয়ের উপর স্থাপিত। আল্লার 'হেকমৎ,' বিচার দয়া অনুগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞানের উপর সেই ঈমান স্থাপিত। সেই জ্ঞান হইতে মানুষ জানিতে পারে—যেরূপ ভাবে ঐহিক কার্য্যকলাপ চলা উচিৎ ছিল আল্লা ঠিক সেই ভাবেই চালাইতেছেন। এইরূপ বিশ্বাসে পরিচালিত হইয়া বিচার করিলে দেখা যায় 'শাস্তি' ও পুরস্কারের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

'তওয়াক্কোল' ব্যবহারে আনিবার প্রণালী। পাঠক! জানিয়া রাখ—ধর্ম্মপথের 'মোকাম' গুলি অর্থাৎ হৃদয়ের অবস্থা সকল, আল্লা তিনটী মূলের উপর স্থাপন করিয়াছেন, যথা—(১) জ্ঞান (২) ভাব (৩) ক্রিয়া। (১) কোন্ প্রকার 'জ্ঞান' লাভ করিলে আল্লার প্রতি নির্ভর করা যায় এবং (২) আল্লার প্রতি নির্ভর করিলে মনের 'ভাব' কি প্রকার হয় তৎসমুদয় ইতিপূর্ব্বে বলা গিয়াছে। (টীঃ ৪৩১) এখন (৩) কেবল 'ক্রিয়ার' সম্বন্ধে অর্থাৎ কি প্রকার প্রথার কাজ করিলে আল্লার প্রতি নির্ভর করা হয় সেই কথা বলিতে হইবে।

তওয়াক্কোলের নামে কর্ম্মে-বিরতি শরীঅৎ বিরুদ্ধ

এ স্থলে কেহ বিবেচনা করিতে পারে আল্লার প্রতি ভরসা বান্ধিতে হইলে মানুষকে সমস্ত কার্য্য আল্লার উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে, নিজের হাত পা খাটাইয়া বা বল খরচ করিয়া কিছুই করিবে না; এমন কি কৃষি বাণিজ্য ছাড়িয়া দিবে; আগামী কল্য খাইব বলিয়া কিছু রাখিবে না; সর্প

টীকা—৪৩১। তওয়াক্কোলের পূর্ণ উন্নতি করিতে হইলে দুই প্রকার জ্ঞান লাভ করা

বিচ্ছু ব্যাঘ্র হইতে পলাইবে না, পীড়া হইলে ঔষধ সেবন করিবে না—এরূপ মনে করা ভুল এবং শরীঅতেরও বিপরীত। আল্লার উপর নির্ভর করা শরীঅতের আদেশ আছে, সুতরাং শরীঅতের বিরুদ্ধ কার্য্য কেমন করিয়া চলিতে পারে? বরং শরীঅৎ মানবকে উপার্জ্জন, সঞ্চয়, বিপদপ্রতিষেধন, ও বিপদ-দূরীকরণ এই চতুর্ব্বিধ কার্য্য করিতে অধিকার দিয়াছেন। সেই কার্য্য-গুলি নির্ব্বাহ করিবার প্রকার-ভেদে 'তওয়াক্কোল'এর ক্ষতিবৃদ্ধি স্থায়িত্ব বা বিনাশ ঘটে; সুতরাং সেই চারি শ্রেণীর কার্য্যের মধ্যে তওাক্কোলের স্থান আছে। প্রথম শ্রেণীর কার্য্য—উপার্জ্জন অর্থাৎ যে বস্তু নাই তাহা সংগ্রহ করণ; দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্য্য—সঞ্চয় অর্থাৎ উপার্জ্জিত বস্তু সংরক্ষণ; তৃতীয় শ্রেণীর কার্য্য—বিপদ-প্রতিষেধন অর্থাৎ যে বিপদ এখনও সম্মুখে আসে নাই তাহা না আসিতে দিবার জন্য বাধা প্রদান; এবং চতুর্থ শ্রেণীর কার্য্য—বিপদ-দূরীকরণ অর্থাৎ উপস্থিত বিপদ দূর করিবার উপায় গ্রহণ। এই চারি প্রকার কার্য্য চালাইবার সময় কি নিয়মে চলিলে আল্লার উপর ভরসা বর্ত্তমান থাকে তৎসম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা আছে; সুতরাং ঐ সকল কার্য্য পরিচালনের নিয়ম বর্ণনা করা আবশ্যক। মানবের এই চারি শ্রেণীর কার্য্য নির্ব্বাহকালে 'তওয়া-ক্কোল' ব্যবহারে আনিবার প্রণালী কি আছে তাহা নিম্নে ক্রমান্বয়ে বলা যাইতেছে।

তওয়াক্কোল ব্যবহারে আনিবার প্রথম প্রণালী—উপার্জ্জন (অর্থাৎ যে বস্তু নাই তাহা সংগ্রহ) কার্য্য সংস্পৃষ্ট। যে সকল বস্তু জীবন রক্ষার জন্য উপার্জ্জন করিতে হয় তাহা কি নিয়মে চালাইলে আল্লার উপর তওয়াক্কোল থাকে তাহার বিচার করা আবশ্যক। জীবন-ধারণ ও অভাব-মোচন জন্য সংগ্রহযোগ্য পদার্থ সমূহ তিন ভাগে বিভক্ত। **প্রথম** ভাগ—আল্লার স্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা ব্যবহার করা নিতান্ত অপরিহার্য্য, না করিলে নিস্তার নাই, যথা—অগ্নি জল বায়ু ইত্যাদি; **দ্বিতীয়** ভাগ—যাহা আবশ্যক বটে কিন্তু অন্ন জলাদির ন্যায় অপরিহার্য্য নহে—পাইলে আরামের সহিত চলে না পাইলেও চলে বটে কিন্তু বড় কষ্ট ভোগ করিতে হয়, যথা—পথ খরচা; **তৃতীয়** ভাগ—যে সূক্ষ্ম উপায় অবলম্বনে অল্প সময়ে অধিক ফল পাওয়া সম্ভাবনা হয়, যথা—কল কৌশল।

জীবন রক্ষা ও অভাব মোচনার্থ সংগ্রহ যোগ্য দ্রব্যাদির তিন টী শ্রেণী বিভাগ

আবশ্যক। সেই দুই জ্ঞান তওয়াক্কোলের দুই বুনিয়াদ। ১ম—একত্বজ্ঞান (১৬৩৬ পৃঃ)। ২য়—আল্লার ভাল বাসা (১৬৫৮ পৃঃ)। ঐ দুই প্রকার জ্ঞান মনে বদ্ধমূল হইলে মনে এক নূতন ভাব আগত হয় (১৬৫৮পৃঃ)।

সংগ্রহ-যোগ্য পদার্থের প্রথম ভাগ ও তওয়াক্কোল—আল্লার স্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যাহা ব্যবহার না করিয়া নিস্তার নাই—তাহা ত্যাগ করিলে বাঁচা যায় না, আবার লোকেও পাগল বলে—তদ্রূপ দ্রব্য ত্যাগ করা তওয়াক্কোল নহে। কেননা, তাহার সহিত আল্লার অভিপ্রায় মিলিত আছে। আল্লার অভিপ্রায় মত না চলিলে নিস্তার নাই। দেখ, ক্ষুধার্ত্ত লোকের সম্মুখে আহারীয় পদার্থ স্থাপিত হইল, কিন্তু ক্ষুধিত ব্যক্তি ভাবিল—"আমি 'তওয়াক্কোল-ধারী' লোক—যে ব্যক্তি আল্লার উপর 'তওয়াক্কোল' করে তাহাকে কোন কার্য্য করা উচিত নহে। আহারের দিকে হস্ত বিস্তৃত করা একটী কার্য্য, অতএব আহার গ্রহণে আমার হাত বাড়ান উচিত নহে। ইহার পর খাদ্য-দ্রব্য দন্তে চর্ব্বন করা, জিহ্বা তালু সঞ্চালন করা, পরিশেষে উহা গলাধঃকরণ প্রভৃতি এক একটী কার্য্য—অতএব ঐরূপ কার্য্য আমি করিতে পারি না।" এরূপ কথা তওয়াক্কোল নহে—পাগলামি। আল্লা ঐ প্রকার কার্য্য মানব-প্রকৃতির অনুযায়ী করিয়া জীবন রক্ষার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন—উহা ত্যাগ করিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না। আহার গ্রহণ করিব না অথচ আল্লা উদর পূর্ণ করিয়া দিবেন, রুটী হাতে তুলিব না, বা দাঁতে চিবাইব না, গলায় গিলিব না, অথচ আল্লা দয়া করিয়া রুটীর মধ্যে এমন আলোড়ন শক্তি ও গতির সৃষ্টি করিবেন যাহাতে রুটী আপনা আপনি গলার মধ্য দিয়া উদরে প্রবেশ করিবে, অথবা কোন ফেরেশ্তা আল্লার হুকুমে আসিয়া রুটী চিবাইয়া পেটে পুরিয়া দিয়া যাইবে—এরূপ মনে করা পাগলের খেয়াল। আল্লা মানব-প্রকৃতির মধ্যে যে অটল নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন তাহা সে ব্যক্তি জানে না। এইরূপ বিনা চাষে, বিনা বপনে ক্ষেত্র হইতে ফসলের আশা করা, স্ত্রীসহবাস না করিয়া সন্তান-প্রাপ্তির বাসনা রাখা সমস্তই পাগলের কার্য্য। এরূপ স্থলে প্রকৃতির অনুযায়ী কার্য্য ত্যাগ করিলে তওয়াক্কোল থাকিবে না।

প্রকৃতি-অনুযায়ী কার্য্য ত্যাগ করা তওয়াক্কোল নহে

বরং 'জ্ঞান' ও মানসিক 'অবস্থা' হইতে তওয়াক্কোল হওয়া আবশ্যক। কোন্ প্রকার জ্ঞান হইতে তওয়াক্কোল জন্মে তাহা পুনরায় শুন—আল্লা খাদ্য দ্রব্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত হস্ত, মুখ দন্ত, এবং তদন্তর্গত শক্তি সৃজন করিয়াছেন। জীবের রক্ষণাবেক্ষণ ও আহারাদি দান তাঁহার সদয় কার্য্য। এই প্রকার জ্ঞান উদয় হইলে মনে এমন

আল্লার প্রতি হৃদয়ের নিরুদ্বেগ ও প্রশান্তি সহকৃত ভরসাই 'তওয়াক্কোল'

একটী নূতন ভাব উদয় হয় যে তাহাতে নিরুদ্‌বিগ্ন হইয়া মনে মনে ভাবিতে থাকে—"আল্লা নানা প্রকারে আমাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।" এইরূপ নিরুদ্‌বিগ্নতা-সংযুক্ত ভরসার ভাবকে মনের 'হাল' (অবস্থা) কহে। অন্য কথায় বলিলে আল্লার কার্য্যের প্রতি হৃদয়ের নিরুদ্‌বেগ ও প্রশান্তিসংযুক্ত ভরসাকে 'তওয়াক্কোল' বুঝায়।

হস্ত বা খাদ্যের প্রতি ভরসা থাকিলে 'তওয়াক্কোল' হইবে না। উহাদের উপর ভরসা কেমন করিয়া স্থাপন করা যাইতে পারে? সামান্য বেদনা হইলে বা অন্য কোন পীড়া হইলে হস্ত বিকল হইয়া যায়। ক্ষমতার প্রতিই বা কিরূপে ভরসা করা যায়? একটা শক্ত বিপদের ধাক্কা পড়িলে বুদ্ধি লুপ্ত হইতে পারে এবং তৎসঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চেষ্টাও বন্ধ হইয়া যায়। খাদ্য দ্রব্যের প্রতিইবা কি প্রকারে ভরসা করা যাইতে পারে? সম্মুখে স্থাপিত খাদ্য কেহ কাড়িয়া লইতে পারে অথবা সর্প-ব্যাঘ্র-ভয়ে নিজেই ছাড়িয়া পলাইতে পারে।

> অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও খাদ্যের উপর ভরসা তওয়াক্কোল নহে

যাহা হউক, উক্ত প্রকার কোনও পদার্থের প্রতি ভরসা করা যায় না—উহাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আল্লার অনুগ্রহ ভিন্ন আর কোন তদ্‌বীরও হইতে পারে না। সুতরাং কেবল মাত্র আল্লার অনুগ্রহের উপর সন্তুষ্ট হওয়া ও নির্ভর করা সঙ্গত। যাহা হউক, মানুষের মনে যখন উক্ত প্রকারের জ্ঞান জন্মে ও নিরুদ্‌বেগ-পূর্ণ ভরসা উৎপন্ন হয় তখন তাহারা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের ন্যায় অপরিহার্য্য কার্য্যে হাত বাড়াইলেও 'তওয়াক্কোলধারী' রহিয়া যায়।

> আল্লার অনুগ্রহের উপর সন্তুষ্ট হওয়া ও নির্ভর করাই তওয়াক্কোল

সংগ্রহ-যোগ্য পদার্থের দ্বিতীয় ভাগ ও তওয়াক্কোল—এই শ্রেণীর 'আছ্‌বাব' গুলির মধ্যে এমনও কতকগুলি পদার্থ আছে তাহার অভাবে সচরাচর কার্য্য সম্পন্ন হয় না বা হওয়া নিতান্ত কঠিন হয়। আবার কতকগুলি এমন পদার্থ আছে যে তদভাবে কষ্টেসৃষ্টে কার্য্য-নির্ব্বাহ হইতে পারে। এরূপ পদার্থ ব্যবহারের প্রকার-ভেদে 'তওয়াক্কোলে'র ইতর বিশেষ হয়। দেখ, নগর ও জনপদ ত্যাগ করিয়া বিজন অরণ্যে গেলে এবং পাথেয় সঙ্গে না লইলে পান ভোজনের অভাবে প্রাণহানির ভয় জন্মে। এমন স্থলে পাথেয় সঙ্গে না লওয়া তওয়াক্কোলে'র কার্য্য নহে বরং পাথেয় সঙ্গে লওয়া মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ)-এর ছোন্নৎ এবং পূর্ব্বকালের জ্ঞানী লোকের অভ্যস্ত কার্য্য। কিন্তু ইহার মধ্যে এক কথা আছে

> পাথের পরিহার তওয়াক্কোল নহে

যে, পাথেয় দ্রব্যের উপর ভরসা না করিয়া সেই পাথেয় যে আল্লা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন তাঁহার উপর নির্ভর করা আবশ্যক। কেননা পাথেয় দ্রব্যও অন্যে কাড়িয়া লইতে পারে। আবার অপর পক্ষে দেখ—যে ব্যক্তি সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত আহার না করিয়া ক্ষুধা সহ্য করিবার বা ঘাস পাতা খাইয়া স্বচ্ছন্দ ভাবে জীবন ধারণ করিবার অভ্যাস উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছে তদরূপ লোকের পক্ষে পাথেয় না লইয়া বিজন অরণ্যে যাওয়া 'তওয়াক্কোলের' বহির্ভূত নহে। কেননা উহা তখন তাহার পক্ষে একেবারে আহার ত্যাগের ন্যায় শরীঅৎ বিরুদ্ধ নহে। আবার সপ্তাহ মধ্যে লোকালয়ে উপস্থিত হইতে বা স্বচ্ছন্দ-বন-জাত তৃণ-পত্র-ফল-ফুলারী মিলিতে পারে। এইরূপ ক্ষমতাবান্ লোকের তওয়াক্কোল অবশ্যই পূর্ণ বলিতে পারা যায়। তাহাদের আহার কোন অতর্কিত স্থান হইতে মিলিতে পারে। মহাত্মা হজরৎ এব্রাহিম খাওয়াছ পূর্ণ 'তওয়াক্কোলধারী' ছিলেন এবং তাঁহার মধ্যে উক্ত দুই ক্ষমতাও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। তিনি পাথেয় দ্রব্য সঙ্গে না লইয়া বন জঙ্গলে ভ্রমণ করিতেন তথাপি তিনি সূচ-নরুন, ডোল-রশী সঙ্গে রাখিতেন। এই দ্রব্যগুলিকে তিনি অরণ্য-প্রান্তরে অপরিহার্য্য দ্রব্য বলিয়া মনে করিতেন। কেননা বিজন অরণ্য-প্রান্তরে 'ডোল-রশী' কোথাও পাওয়া যায় না সুতরাং জলোত্তলন অসম্ভব হয়। আবার পরিধান বস্ত্র চিরিয়া গেলে সূচ ভিন্ন সেলাই করা যায় না। এই জন্য এরূপ অপরিহার্য্য দ্রব্য ত্যাগ করাকে তিনি 'তওয়াক্কোল' বলেন নাই। বাস্তবিক এরূপ স্থলে দ্রব্যের উপর ভরসা করা হয় না, কেবল আল্লার উপর ভরসা করা হয় এই জন্য 'তওয়াক্কোল' বলিয়া গণ্য হয়।

বৃক্ষ-লতা-তৃণ-পত্র বিরহিত বিজন পর্ব্বত কন্দরে গিয়া যদি কেহ মনে করে যে 'আমি জীবিকা বিষয়ে আল্লার উপর নির্ভর করিতেছি' তবে তাহার সে কার্য্য 'হারাম' হইবে। কেননা সে স্থানে বসিয়া রহিলে নিজকে অন্ন জল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিনাশ করা হইবে। সে ব্যক্তি আল্লার স্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়মকে আল্লার প্রকাশ্য অভিপ্রায় বলিয়া বুঝিতে পারে না। যে 'উকীলের' প্রকাশ্য অভিপ্রায় এই যে, দলীল না দেখিলে কার্য্য করা দূরে থাকুক, কথাটীও বলেন না, তাঁহার সম্মুখে 'মোয়াক্কেল' বিনা দলীলে গেলে মোকদ্দমা নষ্ট হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মের

লোকালয় পরিত্যাগ ও অপরিহার্য্য আছ্বাব হইতে পলায়ন তওয়াক্কোল নহে

অনুসরণ করাই আল্লার প্রকাশ্য অভিপ্রায়। যে ব্যক্তি তাহা না করে তাহার সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। পূর্ব্বকালের এক সাধু দরবেশ, লোকালয় ত্যাগ করতঃ আল্লার স্থানে জীবিকা পাইবার আশায় বৃক্ষ-লতাদি-বিরহিত এক বিজন পর্ব্বত কন্দরে প্রবেশ করিয়াছিল। এক সপ্তাহ অতীত হইল তথাপি কোন জীবিকা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল না। অন্ন জলের অভাবে সে মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া থাকিল। তখন তৎকালীন পয়গম্বরের উপর প্রত্যাদেশ হইল—"অমুক সাধুকে বলিয়া দাও—যে পর্য্যন্ত সে লোকালয়ে ফিরিয়া না আসিবে, এবং মানুষের সঙ্গে না মিলিবে ততদিন সে জীবিকা পাইবে না।" সাধু দরবেশ লোকালয়ে ফিরিয়া আসিলে বহুস্থান হইতে নানা দ্রব্য উপঢৌকন আসিয়াছিল। তদ্দর্শনে সাধুর মনে বিষম খট্‌কা বাধিয়াছিল। তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল—"তুমি তপস্যা ও 'তওয়াক্কোল' প্রভাবে আমার বিধিবদ্ধ নিয়ম ও হেকমৎ উল্‌টাইতে চাহিয়াছিলে; তোমার একটু জ্ঞান নাই—আমি স্বীয় দাসদিগকে যে জীবিকা দিয়া থাকি—তাহা আমার দাসদিগের হস্ত দিয়া দেওয়াই পছন্দ করি—আমি স্বীয় ক্ষমতার হস্ত দিয়া কিছু দিতে ইচ্ছা করি না।" এইরূপ লোকালয়ে থাকিয়া নিজের গৃহ-দ্বার বন্ধ করতঃ তদভ্যন্তরে গুপ্তভাবে বসিয়া আল্লার হাত হইতে জীবিকা পাইবার ভরসা করাও হারাম। ইহার কারণ এই যে—অপরিহার্য্য 'আছ্‌বাব' হইতে পলায়ন করা নিতান্ত অনুচিত। কিন্তু গৃহদ্বার বন্ধ না করিয়া জীবিকার আশায় আল্লার প্রতি নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা সঙ্গত, তবে তাহার শর্ৎ এই যে দুয়ার দিয়া কেহ কিছু আনিতেছে কি না উদ্‌বিগ্ন চিত্তে পুনঃ পুনঃ সে দিকে দৃষ্টি করা না হয় এবং মনকে মানুষের সহিত আবদ্ধ না রাখিয়া আল্লার দিকে লাগাইয়া রাখা হয়। সর্ব্বদা এবাদৎ কার্য্যে মগ্ন থাকা আবশ্যক এবং এরূপ ভাবও মনে জাগরুক রাখা আবশ্যক যে, প্রকাশ্য 'আছ্‌বাব' হইতে যখন নিজকে বিচ্ছিন্ন করি নাই তখন জীবিকা হইতে অবশ্যই বঞ্চিত হইব না। এস্থলে জ্ঞানী লোকের সেই বিখ্যাত কথার সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে। তাঁহারা বলিয়াছেন—"মানুষ জীবিকা হইতে পলায়ন করিলেও জীবিকা তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া আলিঙ্গন করে।" কেহ যদি আল্লার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলে—"হে আল্লা, আমাকে জীবিকা দিওনা।" তবুও আল্লা তাহাকে জীবিকা দিতে ক্ষান্ত হইবে না। তিনি সে লোককে বলিবেন—'রে নির্ব্বোধ! আমি কি তোরে আহার না দিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি? আমি তোকে আহার না দিয়া কখনই ক্ষান্ত থাকিব না।'

যাহা হউক, কার্য্যের 'উপাদান' 'উপকরণ' হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া এবং শুধু তৎপ্রতি নির্ভর না করিয়া কেবল সেই বিশ্ব-'কারণ' আল্লার উপর নির্ভর করাই **প্রকৃত 'তওয়াক্কোল'**। কেননা সেই করুণাময় আল্লা স্বীয় দাসদাসী-দিগকে ও সকল প্রাণীকে নিয়ত জীবিকা দিতেছেন—যদিও তন্মধ্যে কতকগুলি লোক লাঞ্ছনার সহিত জীবিকা ভোগ করিতেছে, যথা—ভিক্ষুকের দল; আর কতকগুলি 'প্রতীক্ষার জ্বালা' সহ্য করিয়া, ভোগ করিতেছে, যথা—দোকানদার; আর কতকগুলি লোক কঠিন পরিশ্রমে দেহ পাত করিয়া জীবিকা লইতেছে, যথা—শিল্পী ও শ্রমিক; আর কতকগুলি লোক সম্মানের সহিত জীবিকা ভোগ করে, যথা—সাধু ছুফী। ইহারা জীবিকা বিষয়ে কেবল মাত্র আল্লার সদয় মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন—যাহা তাঁহাদের ভাগ্যে উপস্থিত হয় তাহা আল্লার দিক্ হইতে আসিতেছে বলিয়া বিবেচনা করেন—মানুষকে সেই দানের 'কারণ' বলিয়াও দেখিতে পান না।

সংগ্রহ-যোগ্য পদার্থের তৃতীয় ভাগ ও তওয়াক্কোল—যে 'পদার্থ' বা 'উপাদান,' প্রাকৃতিক নিয়মে, কার্য্যের 'অপরিহার্য্য কারণ' হইতে পারে না, তথাপি তাহাকে কখন কখন 'কারণ' বলিয়া গ্রহণ করা যায় কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে কার্য্যের 'কারণ' বলিয়া ধরিবার পক্ষে কোন প্রকাশ্য প্রমাণ বা যুক্তি নাই, সেইরূপ পদার্থ ব্যবহার করিলে আল্লার প্রতি 'তওয়াক্কোল' থাকে না, যেমন—ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন এবং রোগ-দূর-কার্য্যে ঔষধের পরিবর্ত্তে 'মন্ত্র তন্ত্র' 'ফাল' 'দাগ' গ্রহণ। এই জন্য মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) 'তওয়াক্কোল-ধারী' লোকের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন—"তাঁহারা ('তওয়াক্কোল-ধারী' লোকেরা) মন্ত্র ও 'দাগ' অবলম্বন করে না।" কিন্তু 'তওয়াক্কোল-ধারী' লোকেরা ব্যবসায় বাণিজ্যে উপার্জ্জন করে না' বা লোকালয় ত্যাগ করিয়া জঙ্গল বনে বাস করে' এরূপ কথা তিনি কখনও বলেন নাই।

উপার্জ্জন কার্য্যে তওয়াক্কোলধারীর ত্রিবিধ শ্রেণী বিভাগ—যাহা হউক, এই উপার্জ্জন কার্য্যে 'তওয়াক্কোল'-ধারীর তিন শ্রেণী আছে। **প্রথম শ্রেণী**—মহাত্মা এব্‌রাহীম খাওয়াছ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এইশ্রেণীর 'তওয়াক্কোলধারী' লোক ছিলেন। তাঁহারা বিনা সম্বলে বন জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিতেন। তাঁহাদের অবস্থা অতীব উন্নত। এরূপ লোক দীর্ঘকাল ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা সহ্য করিবার অভ্যাস জন্মাইয়াছেন। তাঁহারা সপ্তাহ কাল

বা ততোধিক সময় বিনা আহারে সন্তোষের সহিত যাপন করিবার অভ্যাস লাভ করিয়াছেন। অরণ্যের ঘাস পাতা আহার করিয়া স্বচ্ছন্দে নিরুদ্বেগে মনের প্রশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন। মরুভূমি মধ্যে ঘাস পাতা না পাইলে 'অনাহার-মৃত্যু'কে স্বচ্ছন্দে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত থাকেন—এই শ্রেণীর লোক মৃত্যু ভয়ে বিচলিত হন না বরং ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন যে ঐরূপ অনাহার জনিত মৃত্যুতে তাঁহার মঙ্গল আছে। আবার তাঁহারা ইহাও বুঝেন যে সম্বলশালী লোকের সম্বল অপহৃত বা নষ্ট হইতে পারে এবং তজ্জন্য তাহাদেরও অনাহারে মৃত্যু ঘটিতে পারে। সুতরাং তাঁহারা বিনা সম্বলে বিজন অরণ্যে যাইতে ভীত হন না। আল্লার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া সেই ভয়ের প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন না। **দ্বিতীয় শ্রেণী**—এই শ্রেণীর 'তওয়াক্কোল-ধারী' লোক জীবিকার্জ্জনের জন্য কোন শিল্প বাণিজ্য অবলম্বন করেন না বা অরণ্য জঙ্গলেও যান না। শহরের কোন মছজেদ আশ্রয় করিয়া বাস করেন, অথচ লোকের হস্ত হইতে কিছু পাইবার আশা করেন না, কেবল মাত্র আল্লার দয়ার ভিখারী হইয়া বাস করেন। **তৃতীয় শ্রেণী**--এই শ্রেণীর 'তওয়াক্কোল-ধারী' লোক, উপার্জ্জন করিবার অভিপ্রায়ে গৃহের বাহিরে যান। ব্যবসায় বাণিজ্যে 'আছবাব' এর সাহায্য গ্রহণ করেন; এবং শরীঅতের প্রতিপাল্য নিয়মগুলি পালন করেন। (ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিপাল্য নিয়ম 'ব্যবহার পুস্তকে' লিখিত হইয়াছে।) তদনুসারে তাঁহারা কর্ম্ম করেন। উপার্জ্জন কালে কোন কৌশল বা চাতুরী অবলম্বন করেন না। তাঁহারা উপার্জ্জন কার্য্যে বিশেষ তদ্বীর ও চালাকী ব্যবহার করিতে ভয় করেন। যে ব্যক্তি উপার্জ্জন কার্য্যে কৌশল বা চালাকী চতুরালী ব্যবহার করে তাহার 'তওয়াক্কোল' বিনাশ পায়। (টীঃ ৪৩২) সেইরূপ রোগ দূর করনার্থ মন্ত্র, তন্ত্র, দাগ ব্যবহারেও 'তওয়াক্কোল' নষ্ট করে।

টীকা—৪৩২। উপার্জ্জন-কার্য্যে কৌশল অবলম্বন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ নহে। কেবল কৌশল পূর্ব্বক অপর লোকের ক্ষতি করিয়া নিজে লাভ করা 'হারাম'। কারবারের অল্প সময়ের মধ্যে অধিক কার্য্য করিবার মানসে কৌশল অবলম্বন বরং লাভের কথা। তাহাতে প্রচুর সময় বাঁচে এবং সে সময়গুলি অন্য কর্ত্তব্য কার্য্যে লাগাইলে মহা লাভ হয়। অসন, বসন, ভ্রমণ, প্রভৃতি সংগতে এবং জ্ঞানার্জ্জন ও শত্রু বিতাড়ন প্রভৃতি কার্য্যে, যাহারা কল কৌশল অবলম্বন করে এবং তজ্জন্য অল্প সময়ে অধিক কার্য্য সম্পন্ন করে, তাহারা সংসার জীবনে জয়ী হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে চাউল ও ময়দা করিতে বড় কষ্ট হইত এবং অধিক সময় লাগিত। তদর্থে ঢেঁকী ও জাঁতা সৃষ্টি হইলে অল্প সময়ে অধিক কার্য্য হওয়াতে সভ্যতার

শিল্পবাণিজ্যে বিরক্তি তওয়াক্কোলে'র শর্ত নহে—শিল্পবাণিজ্যে ক্ষান্ত হওয়া 'তওয়াক্কোলে'র শর্ত নহে। ইহার প্রমাণ এই যে মহাত্মা আবুবকর ছিদ্দীক চূড়ান্ত তওয়াক্কোল-ধারী ছিলেন, তথাপি তিনি কাপড়ের বস্তা লইয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ যাইতেন। লোকে নিবেদন করিতেছিল—"হে আমীরোল মোমেনীন। আপনি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও কেন বাণিজ্য করেন?" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—"আমি নিজ পরিবারকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতেছি। যদি নিজ পরিবারবর্গকে বিনাশ করি, তবে অন্যকে শীঘ্র বিনাশ করিয়া ফেলিব।" পরিশেষে, জন সাধারণ তাঁহার ভরণ পোষণের জন্য 'বয়তোল-মাল' তহবীল হইতে বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দিয়াছিল। তদবধি তিনি বাণিজ্য ছাড়িয়া দিয়া সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সমাজের শাসন-সংরক্ষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অবসর পাইয়াছিলেন। তাঁহার 'তওয়াক্কোল' এরূপ উন্নত ছিল যে, ধনের দিকে তাঁহার মন একেবারে উদাসীন ছিল। 'বয়তোল-মাল' তহবীল হইতে তিনি যাহা পাইতেন তাহা নিজের পুঁজী বলিয়া জানিতেন না, বরং তাহা আল্লার অনুগ্রহ বলিয়া জানিতেন। নিজের ধন যেমন মঙ্গলজনক ও মূল্যবান, অন্যের ধনও তদ্রূপ মঙ্গলজনক ও মূল্যবান বলিয়া জানিতেন।

তওয়াক্কোলের জন্য পরহেজগারী চাই কিন্তু পরহেজগারীর জন্য তওয়াক্কোল নহে

যাহা হউক, শেষ কথা এই যে 'পরহেজগারী' ভিন্ন 'তওয়াক্কোল' হইতে পারে না। 'তওয়াক্কোলে'র জন্য 'পরহেজগারী' নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু তাই বলিয়া 'পরহেজগারীর' জন্য 'তওয়াক্কোলের' আবশ্যকতা নাই। মহাত্মা আবু জাফর হাদ্দাদ, মহাত্মা জোনায়দ-বাগদাদী মহোদয়ের পীর এবং অতি প্রধান 'তওয়াক্কোল'-ধারী মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি (পীর মহোদয়) বলিয়াছেন—"আমি ২০ বৎসর পর্য্যন্ত স্বীয় 'তওয়াক্কোল' ভাবটী গোপনে রাখিয়াছিলাম। বাজারে গিয়া প্রত্যহ আমি এক দিনার স্বর্ণ-মুদ্রা উপার্জ্জন করিতাম; তন্মধ্য হইতে একটী মাত্র কীরাৎ, 'হাম্মামখানায়' 'গোছল' করিবার আজ্বরা দিয়া অবশিষ্ট দীন দুঃখীর দুঃখ মোচনে বিতরণ করিতাম।" মহাত্মা জোনায়দ স্বীয় পীরের সম্মুখে 'তওয়াক্কোল' সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেন না। তিনি বলিয়াছেন—"পীরের সম্মুখে মানসিক

বৃদ্ধি হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালে তদর্থে ও অন্যান্য কার্য্য সম্পাদনার্থে বহু কল-কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং জগতের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে, সুতরাং পরিশ্রম ও সময় বাঁচাইতে কল-কৌশল প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়, তাহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতিও বর্দ্ধিত হয়।

উন্নত অবস্থা লইয়া আলাপ করিতে আমার বড় লজ্জা হয়। কারণ সে অবস্থা তাঁহা হইতেই লব্ধ।"

যে সুফী স্বীয় 'খান্‌কায়' নির্জ্জনে বসিয়া থাকেন এবং তাঁহার সেবক তাঁহার জীবিকা সংগ্রহে বাহিরে যায়, তাঁহার 'তওয়াক্কোল' ব্যবসায়ী লোকের 'তওয়াক্কোল' সদৃশ দুর্ব্বল। 'তওয়াক্কোল' সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবার অনেকগুলি শর্ত্ আছে। হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া যাইবার আশায় যে ব্যক্তি ধ্যানে উপবিষ্ট থাকেন তাঁহার সেই 'অবস্থান'কে 'তওয়াক্কোলের' সমান ফলপ্রদ বলা যাইতে পারে। তাঁহার তদ্রূপ অবস্থিতি-স্থান বহু-জন-পরিচিত হইলে এবং তদুপায়ে তিনি লোকের নিকট প্রকাশিত হইবার সুযোগ পাইলে এবং উপার্জ্জন বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভরসা মনের মধ্যে উদয় হইলে তাঁহার অবস্থা বাজারী দোকানদারের তুল্য—কিন্তু তাঁহার মন, লোক-বিখ্যাতির দিকে কিছুমাত্র আকৃষ্ট না হইলে তাঁহার 'তওয়াক্কোল' ব্যবসায়ী লোকের 'তওয়াক্কোলে'র সদৃশ। এ সম্বন্ধে আসল কথা এই যে, উপার্জ্জন বিষয়ে লোকে যেন কোন সৃষ্ট জীবের উপর ভরসা না রাখিয়া কেবল আল্লার প্রতি ভরসা করে।

ব্যবসায়ীদের ন্যায় সুফীর তওয়াক্কোল কোন্ সময় দুর্ব্বল ?

১। মহাত্মা এব্‌রাহীম খাওয়াছ বলিয়াছেন—"আমি মহাত্মা হজরৎ খেজেরকে দেখিয়াছিলাম—তিনি আমার সঙ্গে অবস্থান করিতে সম্মত ছিলেন কিন্তু তাঁহার সঙ্গে অবস্থান করিলে আমার মনে একটু ভরসা বাড়িতে পারে এবং তাহাতে আমার 'তওয়াক্কোল' দুর্ব্বল হইতে পারে, সেই ভয়ে আমি তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলাম।" ২। ইমাম আহ্‌মদ হম্বল একদা এক শ্রমজীবীকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কর্ম্ম-সমাপ্তির পর তাঁহাকে কিছু অধিক পারিশ্রমিক দিয়া বিদায় করিতে আদেশ দেন। সেবক অধিক মজুরী দিতে লাগিলে, মজুর নিজের প্রাপ্যাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক অতিরিক্ত অর্থ ফেরৎ দিয়া চলিয়া যায়। ইমাম ছাহেব স্বীয় সেবককে মজুরের পিছে পিছে গিয়া অতিরিক্ত পয়সা দিবার আদেশ করেন সেবক প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিল, মজুর প্রথমে যখন অতিরিক্ত পয়সা গ্রহণ করে নাই, তখন পুনরায় লইবে কেন? ইমাম মহোদয় বলিয়াছিলেন "তখন হয়তো অধিক অর্থ দেখিয়া তৎপ্রতি উহার লোভ জন্মিয়াছিল; এবং সেই লোভের উল্টা চাল চলিয়া তখন সে উহা গ্রহণ করিতে পারে নাই, এখন হয়তো সে লোভ বিদূরিত হইয়াছে—সুতরাং লইতে পারে।"

উপার্জ্জনেচ্ছু ব্যবসায়ীর তওয়াক্কোল—যাহা হউক, ফল কথা ধনের প্রতি আন্তরিক ভরসা স্থাপন না করিয়া আল্লার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করা উপার্জ্জনেচ্ছু ব্যবসায়ীদিগের 'তওয়াক্কোল'। তাহার চিহ্ন এই যে ধন অপহৃত হইলেও তাহার হৃদয় শোকাক্রান্ত বা বিমর্ষ হয় না এবং জীবিকা সম্বন্ধেও হতাশ হয় না। আল্লার অনুগ্রহের প্রতি ভরসা রাখে বলিয়া এইরূপ বিশ্বাস করে যে, তাহার জীবিকা এমন স্থান হইতে যোগাইয়া দিবেন, যাহার কল্পনাও সে মনে আঁকে নাই। আবার আল্লা তাহাকে জীবিকা না দিলেও সে বিবেচনা করে, জীবিকা দেওয়া অপেক্ষা না দেওয়াতে তাহার মঙ্গল হইবে।

জীবিকা দেওয়া বা না দেওয়া আল্লার মঙ্গল বিধান—এইরূপ বুঝিবার অবস্থা মনে জন্মাইয়া লইবার তদ্‌বীর—পাঠক! জানিয়া রাখ, জীবিকা মঙ্গলকর হইলে আল্লা দিবেন, আর মঙ্গলকর না হইলে দিবেন না, এইরূপ মনের অবস্থা বড় দুষ্প্রাপ্য। ধনীর ধন চুরীগেল, বা অন্য প্রকারে নষ্ট হইল, অথচ তাহার মন কিছুমাত্র বিমর্ষ হইল না—স্বকীয় পূর্ব্ব অবস্থায় মন প্রশান্তভাবে থাকিল—বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, মনের এ অবস্থা অতীব দুষ্প্রাপ্য হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে। মনের সেই অবস্থা নিম্ন লিখিত উপায়ে লাভ করিতে পারা যায়—প্রথমে আল্লার পূর্ণ দয়া, অসীম অনুগ্রহ এবং পূর্ণ ক্ষমতার উপর এরূপ পুরা ঈমান (বিশ্বাস-জ্ঞান) জন্মাইয়া লইতে হয় যে সেই জ্ঞান চূড়ান্ত 'ইয়াকীন' অর্থাৎ ধ্রুব জ্ঞানে পরিণত হয়। তাহার পর এই কথা নিঃসন্দেহে বুঝিয়া লইতে হয় যে 'বহু রিক্তহস্ত জীব'কে আল্লা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জীবিকা দিতেছেন; আবার বহু স্থানে লোকের সঞ্চিত ধনই, তাহার অধিকাধিকে সমূলে বিনাশ করিতেছে। সে স্থলে সঞ্চিত ধন অগ্রে নষ্ট হইলে অধিকারীর জীবন নষ্ট করিত না—তাহার মঙ্গল হইত।

পয়গম্বর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (দঃ) বলিয়াছেন—"সচরাচর এরূপ ঘটে,—মানব রাত্রিকালে এরূপ কার্য্যের কল্পনা করে যাহা তাহাকে বিনাশ করিতে পারে, কিন্তু করুণাময় মহাপ্রভু 'আরশ' এর উপর হইতে করুণা-চক্ষে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন; তাহাতে তাহার সেই কার্য্য ঘটিতে পারে না। প্রাতঃকালে সে ব্যক্তি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠে এবং কার্য্যটী বিগ্‌ড়িয়াছে দেখিয়া দুঃখিত হয় এবং অনুসন্ধান করিতে লাগে কে সে কার্য্য বিগ্‌ড়াইয়া দিয়াছে?

নিষ্ফলতার মধ্যেও আল্লার করুণা

কেমন করিয়া বিগ্‌ড়িল? শেষে ভ্রম-অনুমানে ঠাওরাইয়া লয়, তাহার প্রতিবেশী বিগ্‌ড়াইয়া দিয়াছে বা তাহার 'চাচাজাদ' ভাই উহা নষ্ট করিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে স্বয়ং আল্লার 'রহমৎ' উক্ত নিস্ফলতার মধ্যে মূর্ত্তিমান হইয়া দাঁড়াইয়া আছে একথা বুঝিতে পারে না।" এই কারণে মহাত্মা ওমর ফারুক বলিতেন—"প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া, আমি নিজকে কি অবস্থায় দেখিব—দুর্গতিগ্রস্ত ফকীর আকারে দেখিব কি মান্যমান আমীর রূপে দেখিব তৎসম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র ভয় করি না। কেননা আমার জানা নাই মঙ্গল কোন অবস্থার মধ্যে আছে।"

যাহা হউক, এ সমস্ত বুঝিবার পর এ কথাও জানিয়া লওয়া প্রয়োজন যে দুষ্ট শয়তানই মানবকে দরিদ্রতার ভয় দেখায়। এ সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাও সেই কথাই বলিতেছেন—

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ

"শয়তান তোমাদিগকে দরিদ্রতার ভয় দেখাইতেছে।" (৩ পারা। সুরা বকর। ৩৭ রোকু)। আল্লার করুণা দৃষ্টির উপর নির্ভর করা 'মারেফৎ' বা তত্ত্ব-দর্শনের 'পূর্ণতা'। বিশেষ করিয়া এ কথাটী জানা আবশ্যক যে মানুষের জীবিকা অনেক সময়ে নিতান্ত গুপ্ত স্থান হইতে আসিয়া থাকে। আবার তাই বলিয়া শুধু 'উপায়' বা 'কারণ' এর উপরও ভরসা করাও উচিৎ নহে। কেবল জগতের মূল—আল্লা, সকলকে জীবিকা যোগাইবেন বলিয়া জিম্মাদার আছেন, তাঁহার উপরই ভরসা করা আবশ্যক। ১। এক জন 'তওয়াক্কোল-ধারী' সাধু দরবেশ কোন মছ্‌জেদে বাস করিতেন। মছ্‌জেদের ইমাম তাহাকে কয়েকবার এই কথা বলিয়াছিলেন—"হে সাধু! তোমাকে নিঃস্ব দরিদ্র দেখা যায়, তুমি যদি জীবিকা অর্জ্জনের জন্য শিল্পাদি কোন কার্য্য অবলম্বন করিতে তবে ভাল হইত।" সাধু বলিলেন "আমার প্রতিবেশী এক ইয়াহুদী প্রত্যহ আমাকে দুই খানী রুটি দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া ইমাম সাহেব বলিলেন "যদি এই কথা হইয়া থাকে তবে কোন ব্যবসায় না করাই সঙ্গত।" তখন সাধু বলিলেন "হে ভাই ইমাম! তোমার পক্ষে ইমামতী না করাই ভাল। তোমার নিকট একজন ইয়াহুদির অঙ্গীকার, আল্লার জিম্মাদারী অপেক্ষা মজবুৎ বলিয়া বুঝা যায়।" ২। অন্য এক মছ্‌জেদের ইমাম কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া-

ছিলেন-"তুমি কোথা হইতে অন্ন খাইতে পাও ?" সে ব্যক্তি বলিল "ইমাম সাহেব! আপনি একটু বিলম্ব করুন—আপনার পশ্চাতে যে নমাজ পড়িলাম তাহা পুনরায় দোহ্‌রাইয়া পড়িয়া আপনার কথার উত্তর দিতেছি—কেননা আল্লা সকলের জীবিকার জিম্মাদার আছেন তৎপ্রতি আপনার ঈমান (বিশ্বাস) নাই।"

কল্পনাতীত স্থান হইতেও আল্লা জীবিকা দেন—যাহা হউক, যাঁহারা এই বিষয় সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা এমন স্থান হইতে জীবিকার পথ খুলিয়া যাইতে দেখিয়াছেন, যাহার সম্বন্ধে কখন কল্পনাও করেন নাই। এই উপলক্ষে আল্লা বলিয়াছেন—

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

"ভূপৃষ্ঠে যাহারা চলে, তাহাদের জীবিকা আল্লার উপর না আছে এমন কেহ নাই।" (১২ পারা। সূরা হুদ। ১ রোকূ)। এই বাক্যের প্রতি তাঁহাদের ঈমান মজবুত হইয়া গিয়াছে।

১। মহাত্মা হোজয়্‌ফা গশীকে লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"আপনি বহুদিন মহাত্মা এব্‌রাহীম আদ্‌হমের সংসর্গে ছিলেন। তাঁহার মধ্যে কি অলৌকিক বিষয় দর্শন করিয়াছেন ?" মহাত্মা বলিলেন—"মক্কাশরীফে যাইবার পথে আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। একদা আমরা উভয়ে ক্ষুধার জ্বালায় বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমরা যখন কুফা শহরে উপস্থিত হইলাম তখন ক্ষুধার চিহ্ন আমার শরীরের উপর প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেই অবস্থা দেখিয়া তিনি বলিলেন—"ক্ষুধার জ্বালায় তুমি বড় কাতর হইয়াছ।" আমি তাঁহার উক্তি স্বীকার করিলাম। তখন তিনি আমাকে কালী, কলম কাগজ উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন। আমি তৎসমুদয় তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলাম। তিনি কাগজের উপর প্রথমে 'বিছ্‌মেল্লাহে-র রহ্‌মানে-র-রহীম' লিখিলেন তাহার পর লিখিলেন—"ওহে! তুমিই প্রত্যেক অবস্থায় আমাদের উদ্দেশ্য; এবং সকলেরই লক্ষ্য তোমার দিকে; আমি তোমার ইশারা পাঠ করিয়া চলি, এবং তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, এবং তোমাকে স্মরণ করিয়া থাকি, কিন্তু আমি বিবস্ত্র, ক্ষুধিত, তৃষ্ণাতুর। তোমার প্রশংসা করা,

ধন্যবাদ দেওয়া ও স্মরণ করা এই তিন কার্য্য আমার কর্ত্তব্য। তজ্জন্য আমি দায়ী রহিলাম। অন্ন জল, বস্ত্র এই তিন বস্তু দেওয়া তোমার কাজ। তুমি তাহা দিতে জিম্মাদার রহিলে।" এই কথাগুলি লিখিয়া কাগজখানী আমার হস্তে দিলেন এবং বলিলেন—"ইহা লইয়া বাহিরে যাও; কোন দিকে মন লাগাইবে না। প্রথমে যাহার প্রতি তোমার দৃষ্টি পড়িবে তাহার হস্তে এই কাগজ টুকরা দিবে।" আমি বাহিরে আসিয়া এক উষ্ট্রারোহী ব্যক্তিকে দেখিয়া তাঁহার হস্তে ঐ কাগজ খানী দিলাম। তিনি পাঠ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এই চিঠির লিখক কোথায়?" আমি বলিলাম 'তিনি মছ্জেদে আছেন।' তখন তিনি ছয় শত দিনার পূর্ণ এক থলী আমার হাতে দিলেন। আমি ঐ উষ্ট্রারোহী ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম—তিনি একজন খৃষ্টান। তাহার পর আমি মহাত্মার নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিলাম। তিনি থলীতে হাত লাগাইতে নিষেধ করিয়া বলিলেন—'আমরা এখন থলীর মালেককে চাই।' ইতি মধ্যে সেই খৃষ্টান আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মহাত্মার চরণ-চুম্বন করিয়া এছলাম ধর্ম্মে ঈমান আনিলেন।"

২। মহাত্মা আবু ইয়াকুব বছরী বলিয়াছেন—"মক্কা শহরে আমি দশ দিন অনাহারে ছিলাম। পরিশেষে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া বাহিরে গিয়াছিলাম। পথে একটী শালগম পতিত দেখিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলাম উহা কুড়াইয়া লইয়া আহার করি। এমন সময়ে অন্তরের মধ্য হইতে এই কথা যেন শুনিতে পাইলাম—"দশদিন অনাহার-যাতনা সহ্যের পর অদ্য কি তোমার ভাগ্যে একটী পচা শালগম মিলিল?" ইহা বুঝিতে পারিয়া হস্ত সঙ্কুচিত করতঃ পুনরায় মছজেদে প্রবেশ করিলাম। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং এক বাক্স বিস্কুট, মিছরী ও বাদাম-শাঁস আমার সম্মুখে স্থাপন করিলেন এবং আত্ম-কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমি জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিলাম। এক দিন হঠাৎ ঝড় তুফান উঠিয়া জাহাজ বিপন্ন করিয়া তুলিল। সেই বিপদে পড়িয়া আমি 'মান্নৎ' করিয়াছিলাম—নিরাপদে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিলে এই সমস্ত দ্রব্য দরবেশদিগকে দিব এবং সর্ব্ব প্রথমে যে দরবেশকে দেখিতে পাইব তাহার হাতে সমর্পণ করিব।" এই কাহিনী শুনিয়া আমি প্রত্যেক পদার্থ হইতে এক এক মুষ্টী তুলিয়া লইয়া অবশিষ্ট পদার্থ তাঁহাকে

ফিরাইয়া দিলাম, এবং মনে মনে বলিতে লাগিলাম—"হে মন! আল্লা কেমন কৌশলী অন্নদাতা; ভাবিয়া দেখ, কি' কৌশলে, কোথা হইতে, আমার জন্য জীবিকা পাঠাইলেন, চিন্তা করিয়া বুঝ। তিনি বায়ুকে আদেশ দিয়াছিলেন, যেন সে সমুদ্র মধ্যে তুফান তুলিয়া তোমার মুখে অন্ন আনিয়া দিবার বন্দোবস্ত করে। তুমি কিন্তু অন্ধ, সে দিকে দেখিতে না পাইয়া অন্য স্থানে অন্ন খুঁজিয়া বেড়াইতেছ।" যাহা হউক, এই ধরণের দুর্লভ উপাখ্যান শুনিলে মানুষের মনে 'ঈমান' বলবান হইয়া থাকে।

পরিবার বিশিষ্ট লোকের উপার্জ্জন সম্পর্কে তওয়াক্কোল। পাঠক! জানিয়া রাখ—পরিবার বিশিষ্ট লোকের পক্ষে বাণিজ্য ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া বন জঙ্গলে যাওয়া উচিত নহে। পূর্ব্ব প্রদর্শিত তৃতীয় শ্রেণীর ব্যবসায়ী লোকের 'তওয়াক্কোলই' পরিবার বিশিষ্ট লোকের জন্য অবলম্বনীয়। হজরৎ আবুবকর ছিদ্দীক ঐ প্রকার 'তওয়াক্কোল' অবলম্বন করিয়াছিলেন। **'তওয়াক্কোলধারী' লোকের দুইটী গুণ** বা ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। **প্রথম**—ক্ষুধা সহ্য করিবার ক্ষমতা এবং আবশ্যক হইলে যতদূর সম্ভব ঘাস পাতার ন্যায় সামান্য দ্রব্য ভক্ষণে জীবন ধারণের ক্ষমতা। **দ্বিতীয়**—অদৃষ্ট লিখিত জীবিকা এবং আল্লার বিধানে সন্তুষ্ট থাকিবার ক্ষমতা। সর্ব্বদা ক্ষুধা সহ্য করা অদৃষ্টে থাকিলে বা ক্ষুধার চোটে প্রাণ বিয়োগ হইলে তাহার মধ্যেই মঙ্গল আছে বলিয়া ধ্রুব বিশ্বাস করিতে হইবে। এতটী অবস্থা মানব নিজে উপার্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু পরিবারের অন্তর্গত জনগণকে এ বিষয়ে বাধ্য করিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারে না। তাহার পর নিজের নফ্‌ছ (প্রবৃত্তি) কেও পরিবার ভুক্ত একজন পৃথক ব্যক্তি সদৃশ মনে কর। তাহাকেও সহজে ক্ষুধা সহ্য করিতে বা ঘাস পাতার ন্যায় সামান্য দ্রব্য ভক্ষণে সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য করা যায় না। সুতরাং পরিবার বিশিষ্ট লোকের ক্ষুধা সহ্য করিবার ক্ষমতা না থাকিলে এবং মনও ব্যাকুল হইলে তাহার পক্ষে 'পেশা' ত্যাগ করিয়া 'তওয়াক্কোল-ধারী' হওয়া উচিত নহে। তবে পরিবার ভুক্ত লোকেরাও যদি ক্ষুধা সহ্য করিবার উক্ত প্রকার ক্ষমতা পাইয়া থাকে এবং নিজেরাও 'তওয়াক্কোল' করিতে সম্মত হয় এবং পরিবারের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিকে ব্যবসায় ত্যাগ করিতে অনুরোধ করে তবে ব্যবসায় ত্যাগ করা সঙ্গত হইবে। নিজের নফ্‌ছ (প্রবৃত্তি) এবং পরিবার ভুক্ত

—কোন্ ক্ষেত্রে তাহার ব্যবসায়ে বিরক্তি অনুচিত

—কোন্ ক্ষেত্রে তাহার ব্যবসায়ে বিরক্তি সঙ্গত

অন্য ব্যক্তি এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে নিজ প্রবৃত্তিকে জবরদস্তীর সহিত ক্ষুধিত রাখা সঙ্গত কিন্তু পরিবারস্থ অপরাপর ব্যক্তিদিগকে বাধ্য করিয়া ক্ষুধিত রাখা সঙ্গত নহে।

মানবকে কি কৌশলে আল্লা জীবিকা দেন—মানুষের ঈমান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ আল্লার জ্ঞান ক্ষমতা ও দয়া পূর্ণরূপে বুঝিয়া কেবল তাঁহার উপর ভরসা স্থাপন করিলে, যদি সে ব্যক্তি পরহেজগারী ও আত্ম-শুদ্ধি ব্যাপারে নিযুক্ত হয় তবে তাহার পক্ষে ব্যবসায় বাণিজ্য পরিত্যাগ করা সঙ্গত, কেননা তখন স্বয়ং করুণাময় আল্লা তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিয়া থাকেন। এই কথার সত্যতা সাব্যস্থ করিতে কিছু বলা আবশ্যক। শিশু মাতৃগর্ভে বাস করিবার কালে নিতান্ত অসহায় থাকে; নিজের খাদ্য নিজে গ্রহণ করিতে অক্ষম, সুতরাং করুণাময় তাহার জীবিকা তখন নাভীনাড়ীর সাহায্যে প্রেরণ করেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার খাদ্য মাতার বক্ষঃ হইতে দুগ্ধ রূপে বাহির করেন বটে কিন্তু শিশুকে কিছু পরিশ্রম করিয়া দুগ্ধ চুষিয়া লইতে হয়। দুগ্ধ ভিন্ন অন্য কঠিন খাদ্য দ্রব্য অন্বেষণ করিতে লাগিলে তাহা চর্ব্বনের জন্য দন্ত উৎপন্ন করিয়া দেন; তখন পিতা মাতা বহুপরিশ্রমে সন্তানের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দিতে সর্ব্বদা তৎপর থাকেন। সেই পিতা মাতা শিশুকে ফেলিয়া মরিয়া গেলে করুণাময় আল্লা পিতা মাতার পরিবর্ত্তে পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তি-গণকে এবং প্রতিবেশীবর্গকে দণ্ডায়মান করিয়া দেন। তাহাদের হৃদয়ে সেই পিতৃ মাতৃহীন অসহায় সন্তানের প্রতি দয়া ও স্নেহ জন্মাইয়া দেন। যে স্নেহ মমতার তাড়নায় পিতা মাতা সন্তানকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন এবং আপনাদের মুখের দ্রব্য খাওয়াইয়া পালন করিতেছিলেন তাঁহাদের অভাবে কৌশলময় আল্লা বহু নর নারীকে সেই অসহায় সন্তানের লালন-পালনে দণ্ডায়মান করিয়া দেন। শিশু বড় হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলে করুণাময় তাঁহাকে জীবিকা উপার্জ্জনের নিমিত্ত শিল্প ব্যবসায়ে ক্ষমতা প্রদান করেন এবং আত্ম-প্রতিপালনের ইচ্ছা মনে দণ্ডধারী প্রহরীর ন্যায় নিযুক্ত করিয়া দেন। তখন সেই ইচ্ছার উত্তেজনায় যুবক আত্ম-প্রতিপালনের ও আত্ম-চিন্তায় তৎপর হয়। * * * শৈশবকালে জননী-হৃদয়ে সন্তান-বাৎসল্য স্থাপন করিয়া দিয়া করুণাময় আল্লা শিশুর লালনপালন ও ভরণ পোষণ

ধর্ম্ম পথিকের উপার্জ্জনে বিরতি সঙ্গত

সাধারণ মানবের জীবিকা

করিয়া লইয়াছিলেন; বাল্যকালে আত্মীয় ও প্রতিবেশীর হৃদয়ে দয়া ঢালিয়া দিয়া তাহাদের দ্বারা অনাথ বালকের প্রতিপালন করিয়া লইয়াছেন; এখন যৌবন কালে আত্ম-প্রেম তাহার স্বীয় হৃদয়ে জন্মাইয়া দিয়া নিজের দ্বারা নিজের পালন করাইয়া লইবার উপায় করিয়াছেন। শৈশবে মাতৃ-স্নেহে যেরূপ দেহ রক্ষা পাইয়াছে যৌবনে আত্ম-প্রেমও তদ্রূপ নিজের দেহ-রক্ষা, কোন শিল্প-ব্যবসায় অবলম্বনে করিয়া লয়। পিতা বা মাতা একক ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহাদের সন্তান-বাৎসল্য অগাধ—তাঁহারা যেরূপ ভালবাসা ও দয়ার সহিত সন্তান পালন করেন তাহার তুলনা নাই। তাঁহাদের মৃত্যু ঘটিলে শিশুর প্রতিপালনের সেই এক মাত্র পথটী বন্ধ হয় বটে কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে শত শত পথ আল্লা খুলিয়া দেন। সে সকল পথে যে দয়া ও ভালবাসা আসে তাহা 'দশের লাঠী একের বোঝার' ন্যায় সমষ্টিতে মাতৃ স্নেহ অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ে সুতরাং কোন কোন স্থানে অনাথ বালক পিতৃ-মাতৃ বিশিষ্ট বালক অপেক্ষা অধিক সুখে প্রতিপালিত হয়। দেখ, আল্লা কেমন কৌশলে অনাথ সন্তানের প্রতিপালন করিয়া লন। যৌবনে আত্ম-প্রেম আসিয়া মানুষকে আত্ম-পালনার্থ কোন শিল্প-ব্যবসায় অবলম্বন করায়; একক হইলেও সে, যেরূপ যত্নে ও যেরূপ সুখ সচ্ছন্দে আত্ম-পালনের বন্দোবস্ত করে তাহার সহিত অন্যের যত্নের তুলনা হইতে পারে না। এমন যুবক যখন ধর্ম্ম-পথে—

উপার্জ্জনে বিরত ধর্ম্ম-পথিকের জীবিকা

আল্লার কার্য্যে আবদ্ধ হয়, নিজের জিবীকার জন্য কোন শিল্প ব্যবসায় বা পেশা চালাইতে অক্ষম হয় অর্থাৎ তাহার জীবিকার উপায় মারা যায় তখন আল্লা সমাজের শত শত লোকের মনে তাহার প্রতি ভক্তি ভালবাসা ঢালিয়া দেন, তজ্জন্য সকলে তখন উহার প্রতিপালনে মুক্ত-হস্ত হয়। দশের সাহায্য একত্র হইলে নিজের একক উপার্জ্জন অপেক্ষা অবশ্যই অধিক হয়। এই কৌশলে পেশা-হীন সাধু লোকের জীবিকা আল্লা নির্ব্বাহ করিয়া লন।

কেন অপরে সাধুগণকে প্রতিপালন করিবে? এস্থলে কেহ বলিতে পারে শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হইলে শিশু জীবিকা অর্জ্জনে অক্ষম থাকে বলিয়া অপর লোকেরা তাহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করে, কিন্তু যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত এবং উপার্জ্জনের শক্তি রাখে তাহাদের প্রতি লোকে কেন দয়া করিবে—কেন তাহাদিগকে অন্ন বস্ত্র দিবে? বরং অপরাপর লোকে বলিবে—এ ব্যক্তি যখন আমাদের মত হস্ত-পদ বিশিষ্ট, বলবান পুরুষ, তখন

কেন সে নিজের জীবিকা নিজে উপার্জ্জন করিবে না? ইহার উত্তরে আমরাও অবশ্যই বলিব—যে ব্যক্তি আলস্যে বা শৈথিল্যে গা ভাসাইয়া দিয়া নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় কাল যাপন করিতে থাকে তাহাকে কেহ ভাল বাসে না, বা তাহার ভরণ-পোষণে কেহই সাহায্য করিতে চায় না। তদ্রূপ লোককে শিল্প ব্যবসায় অবলম্বনে নিজের জীবিকা নিজে সংগ্রহ করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি সাধুতা উপার্জ্জনে ও আল্লার আদেশ পালনে তৎপর থাকে, বা আল্লার চিন্তনে ডুবিয়া থাকে, বা আল্লার জন্য কোন মছ্‌জেদের খেদমতে নিযুক্ত থাকে, অথবা বিদ্যাশিক্ষা বা এবাদৎ কার্য্যে রত থাকে এবং তজ্জন্য শিল্প ব্যবসায় চালাইবার অবসর পায় না সেরূপ লোক শিল্প ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলে কেহ নিন্দা করিতে পারে না বরং তদ্রূপ "আল্লাওয়ালা" লোকের উপর কেহ উপার্জ্জনের কষ্ট চাপাইতে ইচ্ছাও করে না; সে ব্যক্তি 'আল্লার কার্য্যে নিযুক্ত থাকে বলিয়া আল্লা অপর লোকের হৃদয়ে তাহার প্রতি ভালবাসা প্রগাঢ়রূপে জন্মাইয়া দেন এবং তজ্জন্য তাহার পালন ভার দশজনের উপর বাঁটিয়া দেন এবং তাহারাও আনন্দের সহিত সেই ভার গ্রহণ করে। 'আল্লার কার্য্যে নিযুক্ত' ব্যক্তিকে 'মানব সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন' হইয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে, অর্থাৎ নিজের গৃহদ্বার একবারে বন্ধ করিয়া থাকা বা লোকালয় হইতে পলায়ন পূর্ব্বক বিজন-পর্ব্বত-কন্দরে আত্ম-গোপন করিয়া থাকা উচিত নহে। যাহা হউক কোন জ্ঞানী 'আল্লাওয়ালা' লোক আল্লার কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করতঃ শহরে থাকিয়া অনাহারে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে এমন কথা অদ্যাবধি কেহ কখনও শুনে নাই। তদ্রূপ 'আল্লাওয়ালা' লোক, আল্লার কার্য্যে ডুবিয়া থাকিলেও এবং ব্যবসায় বাণিজ্য না করিলেও আল্লার দত্ত মান-সম্ভ্রম প্রভাবে অন্য বহু ক্ষুধিত লোককে কটাক্ষে আহার সংগ্রহ করিয়া দেওয়াইতে পারে। তাই বলিয়া তন্মধ্যে তাহার কোনই বাহাদুরী নাই; আল্লাই কৌশলে তদ্রূপ কাজ করিয়া লন। 'আল্লার কাজে ডুবিয়া আল্লার লোক' হইতে পারিলে 'আল্লাও তাহার' হইয়া থাকেন—এবং সর্ব্ব সাধারণ লোকের মনে তাহার প্রতি ভালবাসা জন্মাইয়া দিয়া কৌশলে কাজ করিয়া লন। সন্তান পালনের জন্য মাতৃ হৃদয়ে বাৎসল্য জন্মাইয়া দেওয়াও তদ্রূপ এক কৌশল।

বিশ্বরাজ্য পালন ও সর্ব্বত্র জীবিকা বণ্টনের জন্য আল্লার বন্দোবস্ত-কৌশল উপলব্ধি করিলেই তওয়াক্কোল নিশ্চিত আসিবে—বিশ্বপ্রভু জড় জগত ও আধ্যাত্মিক জগতের এবং তদন্তর্গত অধিবাসী

বৃন্দের পালনের জন্য এক আশ্চর্য্য কৌশলময় 'বন্দোবস্ত' প্রচলিত রাখিয়াছেন। যে ব্যক্তি সেই 'বন্দোবস্ত-কৌশল' জ্ঞান-চক্ষে দর্শন করিয়াছে, সে ব্যক্তি হৃদ্‌বোধ মতে বুঝিতে পারিয়াছে—বিশ্বপ্রভু নিতান্ত সদয় হস্তে, কৌশল-জাল বিস্তার করতঃ সমস্ত জীব-জন্তুর আহার যোগাইয়া দিতেছেন, 'উপাদান' বা 'উপকরণ' পদার্থ গুলি তাঁহার কৌশলময় বন্দোবস্ত-শৃঙ্খলার এক ক্ষুদ্রাংশ। সে ব্যক্তি আরও বুঝিতে পারিয়াছে যে—আল্লাকে ভাল বাসিলে বা তাঁহার প্রতি ভরসা রাখিলেই তিনি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য, বিচিত্র-বসন ও মনোহর যান-বাহন বিনা-পরিশ্রমে আকাশ হইতে দেন না। কখন কখন তদ্রূপ পদার্থ কাহাকে হঠাৎ দিলেও সাধারণতঃ তিনি এইরূপ 'বন্দোবস্ত' করিয়াছেন—যে ব্যক্তি সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কার্য্য করিবে, এবাদতে ডুবিয়া থাকিবে, তাহাকে শাক পাতা ফল ফুলারী, শুষ্ক অন্ন বা তদ্রূপ সামান্য খাদ্য সাধারণ ভাবে সপ্তাহ মধ্যে অবশ্যই মানব সমাজের মধ্য হইতে দেওয়াইবেন ; তবে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবিকা কখন কাহাকে পুনঃ পুনঃ দিয়াও থাকেন ; সেটা স্বতন্ত্র কথা। সামান্য জীবিকা সপ্তাহ মধ্যে পাইবার আশা-করা, আল্লার বিশ্ব-বিধানের অনুরূপ। তথাপি যাহারা ঐ প্রকার অল্প আশায় তুষ্ট হইতে পারেনা, তাহারা এই জন্য পারে না যে তাহাদের প্রবৃত্তি সর্ব্বদা সুখ-ভোগে লোলুপ, 'মজা' উড়াইতে অভিলাষী, উপাদেয় খাদ্যে ও মনোহর বসন ভূষণে অনুরক্ত। এরূপ ভোগ-বাসনাকে, পরকালের কার্য্যের মধ্যে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। উক্ত প্রকার ভোগ-সুখ, বিনা পরিশ্রমে লব্ধ হইবার কোন উপায় নাই। আবার অধিকাংশ স্থলে পরিশ্রম করিলেও তাহা প্রায় ভাগ্যে জুটে না। আবার কখন কখন এরূপ হয়—যাহা কোনও দিন চিন্তা করা হয় নাই তাহা বিনা পরিশ্রমে আপনা আপনি আসিয়া পড়ে বরং তদপেক্ষা অধিক সুখকর বস্তু অতর্কিত ভাবে আপনা আপনি আসিয়া জুটে। যাহাদের জ্ঞান চক্ষু খুলিয়াছে, তাহারা যত্ন ও চেষ্টাকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বলিয়া বুঝিয়াছে। তজ্জন্য তাহারা 'তদ্‌বীর' ও চেষ্টার উপর নির্ভর করিতে পারে না—তাহারা কেবল বিশ্বজগতের পরিচালকের উপর নির্ভর করে। আল্লা, বিশ্বরাজ্য পালনার্থ এমন কৌশলময় পরিপক্ক বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, কোন প্রাণী স্বীয় জীবিকা হইতে বঞ্চিত হইতে পারে না ; তবে কখন কখন কোন প্রাণী অভাবের ঠিক শেষ ভাগে জীবিকা প্রাপ্ত হয় বলিয়া একটুকু কাঠিন্য ভোগ করে মাত্র ; তথাপি তদ্রূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল। কখন কখন জীবিকা-প্রাপ্তি একটু

বিলম্বে ঘটিলেও তাহা যে কেবল 'তওয়াক্কোল-ধারী' লোকের ভাগ্যেই ঘটে তাহা নহে, যাহারা স্বকীয় বুদ্ধি ও ক্ষমতা চালাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্যে অগাধ ধনোপার্জ্জন করে, তেমন সাংসারিক লোকদিগকেও সময়ে সময়ে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে হয়। এই সকল কথা চক্ষুষ্মান জ্ঞানীলোকের নিকট যখন সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়, তখন তাহারা বিশ্বজগতের সর্ব্বস্থলে জীবিকা বণ্টনের অত্যাশ্চর্য্য কৌশল দৃষ্টে আল্লার প্রতি 'তওয়াক্কোল' না করিয়া থাকিতে পারিবে না—এবং তাহাদের অন্তরে প্রচুর বল ও প্রবৃত্তির মধ্যে যথেষ্ট বীরত্ব উৎপন্ন না হইয়া যায় না। এই কারণে মহাত্মা হছন বছরী বলিয়াছেন—"বছরা নগরীর সমস্ত অধিবাসীবৃন্দ যদি আমার পরিবার ভুক্ত হয় এবং এক একটী গোধুম-দানার মূল্য যদি এক একটী স্বর্ণমুদ্রা হয় তথাপি আমি সকলের প্রতি পালনের ভয় করি না (টীঃ ৪৩৩) ২। মহাত্মা ওহাব এব্‌নে অলওয়ারদ্ বলিয়াছেন—"যদি আকাশ লৌহ-নির্ম্মিত ও ভূতল কংসময় হইত এবং জীবিকা প্রাপ্তির উপায় না দেখিয়া আমার মন দুঃখিত হইত, তবে আমি কাফের হইবার ভয় করিতাম।" মহা-প্রভু প্রাণীগণের জীবিকা উচ্চ আকাশের সহিত যোগ করিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে এই বুঝা যায় যে জীবিকার উপর কাহারও হাত চলে না। ৩। কতক-গুলি লোক মহাত্মা জোনয়দ এর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল—"আমরা স্বীয় জীবিকা অর্জ্জন করিতে চাই।" শেখ মহোদয় বলিলেন—"আচ্ছা কর; যদি জানিয়া থাক যে উহা কোথায় পাওয়া যাইবে।" তদন্তর তাহারা বলিল—"জীবিকা আল্লার স্থানে চাহিতে ইচ্ছা করি।" তিনি বলিলেন—"আচ্ছা চাও; যদি বুঝিয়া থাক যে তিনি তোমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন, তবে চাহিয়া তাঁহার স্মরণ জন্মাইয়া দিতে পার।" পরিশেষে তাহারা বলিল—"তবে, আল্লার উপর 'তওয়াক্কোল' স্থাপন করিয়া দেখি তিনি কি করিতেছেন।" মহাত্মা বলিলেন—"পরীক্ষা করিবার মানসে 'তওয়াক্কোল' করিলে, সন্দেহ করা হয়।" পরিশেষে তাহারা বলিল—"তবে আমরা কি 'তদবীর' করিব?" তিনি বলিলেন—"তদবীর হইতে হস্ত সঙ্কুচিত কর (টীঃ ৪৩৪)।" যাহা হউক, আসল

টীকা—৪৩৩। পূর্ব্ববর্ত্তী একটী প্যারার উপরের প্যারাস্থিত তিনটী তারকা চিহ্ন হইতে টীকা চিহ্ন পর্য্যন্ত স্থান মূল গ্রন্থের ঠিক অনুবাদ নহে। 'এহ্‌ইয়া-অল্-উলুম' গ্রন্থের ভাব লইয়া লিখিত হইল। মূল গ্রন্থের লিখিত কথা গুলি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও দুর্ব্বোধ্য।

টীকা—৪৩৪। তদ্‌বীর শব্দটী دبر (পশ্চাৎ) এই মূল হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ—আল্লা যে পদার্থে যে গুণ বা উপযোগিতা স্থাপন করিয়াছেন তাহা কোন্ ভাবে ব্যবহার করিলে উদ্দেশ্য হস্তগত হইতে পারে—নির্ণয় পূর্ব্বক কাজে প্রয়োগ করাকে 'তদ্‌বীর' বলে। অগ্নিতে

কথা এই—জীবিকাদাতা আল্লাই জীবিকা বণ্টনের বিধাতা, তাঁহাকেই উহার জিম্মাদার জ্ঞান করিবে। তিনি বিনা কৌশলে জীবিকা বণ্টন করিয়া থাকেন।

তওয়াক্কোল ব্যবহারে আনিবার দ্বিতীয় প্রণালী—সঞ্চয় অর্থাৎ উপার্জ্জিত বস্তু সংরক্ষণ কার্য্য সংসৃষ্ট। পাঠক জানিয়া রাখ, যে ব্যক্তি এক বৎসরের খাদ্য দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখে সে ব্যক্তি 'তওয়াক্কোল-ধারী' লোকের শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হয়। তাহার কারণ এই যে, সে ব্যক্তি 'প্রকৃত কারণকে' ত্যাগ করিয়া 'বাহ্য কারণের' উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ সম্বৎসর ধরিয়া সে ব্যক্তি খাদ্য দ্রব্যগুলিকে জীবিকার হেতু বলিয়া মনে স্থাপন করিয়া থাকে সুতরাং আল্লাকে জীবিকার মূল কারণ বলিয়া বুঝিতে অবসর পায় না। বাস্তবিক পক্ষে আল্লাই জীবিকার মূল কারণ—খাদ্য দ্রব্য উহার কেবল বাহ্য উপায় মাত্র। নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে বৎসর ঘুরিয়া আসে। প্রত্যেক বৎসরেই যদি দ্রব্যের উপর ভরসা থাকে, তবে আল্লার উপর ভরসা কেমন করিয়া হয়? যে ব্যক্তি ক্ষুধার সময়ে উদর পূর্ত্তির পরিমিত খাদ্যাংশ এবং অভাবের সময়ে শরীর ঢাকিবার উপযুক্ত বস্ত্রখণ্ড পাইয়া তুষ্ট থাকিতে পারে তাহার 'তওয়াক্কোল' পূর্ণ বলিয়া ধরা হয়।

পরিবারবিহীন একক লোকের সঞ্চয় সম্পর্কে তওয়াক্কোল। চল্লিশ দিনের খরচের উপযুক্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য সঞ্চয় রাখিলে 'তওয়াক্কোলের' ক্ষতি বৃদ্ধি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। মহাত্মা খাওয়াছ বলিয়াছেন—"চল্লিশ দিনের খাদ্য দ্রব্য সঞ্চয় রাখিলে 'তওয়াক্কোল' নষ্ট হইবে না, তবে তদপেক্ষা অধিক সঞ্চয় করিলে অবশ্যই নষ্ট হইবে।" মহাত্মা ছহলতছ্তরী বলিয়াছেন—"পরিমাণ যতই হউক না কেন, সঞ্চয় করিয়া রাখিলে 'তওয়াক্কোল' নষ্ট হইবে।" মহাত্মা আবুতালেব মক্কি বলিয়াছেন—"চল্লিশ দিনের অপেক্ষা অধিক খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াও যদি সেই সঞ্চিত দ্রব্যের উপর ভরসা না করা যায় 'তবে তওয়াক্কোল নষ্ট হইবে না"। মহাত্মা হোছেন মগানী, মহাত্মা বশর হাফী

তেজ আছে, শুষ্ক কাষ্ঠ-তৃণে যোগ করিলে রন্ধন কার্য্য সম্পন্ন হয়। শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি যোগ করিয়া অন্ন পাক করিয়া লওয়া একটী 'তদ্‌বীর'। আল্লার অভিপ্রায় মত তদ্রূপ 'তদ্‌বীর' কাজে খাটান অতীব প্রশংসনীয়। সংসারে থাকিয়া 'তদ্রূপ' 'উপাদান' 'উপকরণ' কাজে ব্যবহার না করা আল্লার ইচ্ছার বিপরীত, কিন্তু গ্রন্থের উক্ত স্থলে, 'তদ্‌বীর' বলিয়া যাহা হইতে হস্ত সঙ্কুচিত করিতে বলা হইল তাহা সেরূপ নহে। অন্যের শ্রমোৎপন্ন দ্রব্য বিনা পরিশ্রমে বা অল্প পরিশ্রমে, বিনা মূল্যে বা অল্প মূল্যে, বহু কথা খরচ করিয়া লাভ করা, কিম্বা নিজের দুরবস্থা প্রকাশ করতঃ ভিক্ষা করা, অথবা প্রশংসাবাদে বা চাটু কথায় ভুলাইয়া কিছু আদায় করা প্রভৃতি তদ্‌বীর নহে—চালাকী মাত্র এইরূপ রোগ দূর করিবার জন্য মন্ত্র তন্ত্র ব্যবহার করাও তদ্‌বীর নহে। শেখ মহোদয় তদ্রূপ 'তদ্‌বীর' হইতে ক্ষান্ত থাকিতে আদেশ করিয়াছেন।

মহোদয়ের এক জন শিষ্য ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—"একদা এক প্রৌঢ় ব্যক্তি আমার পীর মহাত্মা বশর হাফীর সমীপে আসিয়াছিলেন। পীর মহোদয় এক মুষ্টি রৌপ্য-মুদ্রা আমার হস্তে দিয়া তাঁহার জন্য অতি উপাদেয় মিষ্ট খাদ্য ক্রয় করিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। আমি কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তাঁহার মুখে উপাদেয় খাদ্য সংগ্রহের আদেশ কখন শুনি নাই। যাহা হউক, তাঁহার আদেশ মত আমি উত্তম খাদ্য ক্রয় করিয়া আনিয়া 'দস্তরখানের' উপর স্থাপন করিলাম। আমার পীর ছাহেব উক্ত প্রৌঢ় ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া আহারে উপবেশন করিলেন। ইতি পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে অন্যের সহিত একত্র আহার করিতেও দেখি নাই। আহারান্তে দেখা গেল বহু দ্রব্য বাঁচিয়া গিয়াছে। আগন্তুক উদ্‌বৃত্ত খাদ্য বান্ধিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। বিনা অনুমতিতে উদ্‌বৃত্ত খাদ্য তুলিয়া লইতে দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য মনে করিলাম, এবং পীর মহোদয়ের সমীপে আগন্তুকের পরিচয় প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন—"আগন্তুকের নাম ফতেহ্‌ মুছলী; তাঁহার জন্মভূমি 'মুছল' শহর; তথা হইতে তিনি আমার সহিত দেখা করিতে অদ্যই আসিয়াছেন এবং তিনি 'তওয়াক্কোল' বিষয়ে আমাকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে অবশিষ্ট খাদ্য দ্রব্য তুলিয়া লইলেন। তাহাতে এই উপদেশ দেওয়া হইল যে, আল্লার উপর পূর্ণ 'তওয়াক্কোল' মজবুৎ হইয়া গেলে সঞ্চয় করিয়া রাখিলেও কোন ক্ষতি হয় না।" যাহা হউক, আসল কথা এই যে অল্প আশা, 'তওয়াক্কোলের' মূল। এই জন্য সাধারণ নিয়ম এই যে, নিজের জন্য সঞ্চয় করা উচিত নহে; যদিও বা সঞ্চয় করিতে হয় তবে উহাকে নিজের ধন না বুঝিয়া আল্লার ধন বলিয়া বুঝিবে এবং তদুপরি ভরসা না করিয়া আল্লার প্রতি ভরসা করিবে। এই ভাবে সঞ্চয় করিলে 'তওয়াক্কোল' নষ্ট হয় না। এ পর্য্যন্ত যাহা বলা গেল তাহা পরিবার-বিহীন-একক লোকের পক্ষে সঙ্গত।

পরিবার-বিশিষ্ট লোকের সঞ্চয় সম্পর্কে তওয়াক্কোল— পরিবার-বিশিষ্ট লোক, এক বৎসরের খরচ সংগ্রহ করিয়া রাখিলেও তাহার 'তওয়াক্কোল' নষ্ট হইবে না; কিন্তু তদপেক্ষা অধিক সময়ের উপযোগী দ্রব্য জমা রাখিলে অবশ্যই 'তওয়াক্কোল' নষ্ট হইবে। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) স্বীয় পরিবার বর্গের জন্য এক বৎসরের দ্রব্যজাত সঞ্চয় করিয়া দিতেন। তদ্রূপ ব্যবস্থা কেবল তাঁহার পরিবারবর্গের জীবিকার জন্য ছিল। তাহার কারণ এই যে,

মহাপুরুষ হজরৎ রসুলের সঞ্চয়

পরিজন-বর্গের হৃদয় অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। হজরতের নিজের জীবিকা সঞ্চয়ের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তিনি সন্ধ্যার খাদ্য প্রাতে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না। প্রাতে যাহা আসিত তাহা প্রাতঃকালেই বিতরণ করিয়া ফুরাইয়া দিতেন। সন্ধ্যাবেলা যাহা আসিত তাহা তখনই শেষ করিতেন। তাঁহার মানসিক অবস্থা এরূপ উন্নত ছিল যে, তিনি নিজের হস্তস্থিত ধন ও পর হস্তস্থিত ধন সমান বিবেচনা করিতেন; তেমন অবস্থায় নিজের নিকট দ্রব্য জমা রাখিলেও তাঁহার 'তওয়াক্কোলের' কোন ক্ষতি হইত না, তথাপি তিনি অন্য সন্ধ্যার জন্য খাদ্য দ্রব্য বান্ধিয়া রাখিতেন না। তবে সাধারণ লোকের হৃদয় দুর্ব্বল বলিয়া সঞ্চয়ের সহজ নিয়ম শিক্ষা দিয়াছেন। হদীছ শরীফে উক্ত আছে এক ছাহাবা মানব-লীলা সম্বরণ করিলে তাঁহার পরিধান-বস্ত্র হইতে দুইটী স্বর্ণ মুদ্রা বাহির হয়। তৎসম্বন্ধে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) বলিয়াছিলেন—"তাহার উপর দুইটী দাগ হইবে।" তদ্রূপ দাগ দুই কারণে হইবার সম্ভাবনা। হয়তো তিনি ভ্রম ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নিজকে পরিবার বিশিষ্ট মনে করিতেন অর্থাৎ সামাজিক নিয়মে যাহাকে পরিবার ভুক্ত বলা যাইতে পারে না তাহাকে পরিবারস্থ মনে করিয়া তাহার জন্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সেই ত্রুটীতে শাস্তির আকারে তাঁহার উপর অগ্নির দুই দাগ হইবে; অথবা ইহাও হইতে পারে যে পরিবার ভুক্ত লোকের জন্য সঞ্চয় করেন নাই—নিজের জন্যই ভ্রম ক্রমে সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার পারলৌকিক মর্য্যাদার হানি হইয়াছে। দেখ মানুষের মুখ মণ্ডলের উপর দুইটী দাগ হইলে যেমন তাহার সৌন্দর্য্যের হানি হয় সেইরূপ পরকালে তাহার উন্নত গৌরবের মধ্যে সঞ্চয় করিবার ত্রুটীতে দুটী দাগ রহিয়া যাইবে। ঠিক এই ধরণে অন্য এক ছাহাবার সম্বন্ধে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই ছাহাবা প্রাণ ত্যাগ করিলে হজরৎ বলিয়াছিলেন—"পরকালে ইহার বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দেদীপ্যমান হইবে, কিন্তু ইহার স্বভাবের মধ্যে একটী অভ্যাস না থাকিলে ইহার মুখমণ্ডল সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত হইত। সে অভ্যাসটী এই—সে ছাহাবা এক শীতের বস্ত্র অন্য শীতের জন্য রাখিয়া দিতেন এবং এক গ্রীষ্মের পরিচ্ছদ অন্য গ্রীষ্ম কালের জন্য বান্ধিয়া রাখিতেন।" মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) ছাহাবাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"আল্লার উপর অটল বিশ্বাস ও 'ছবর' এই দুটী পদার্থ তোমাদের মধ্যে, অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা অল্প দেখিতেছি।"

আল্লার উপর অটল বিশ্বাস না থাকার কারণে লোকে এক শীতের বস্ত্র অন্য শীতের জন্য রাখিয়া থাকে। কিন্তু 'দস্তরখান' ঘড়া, লোটা, পিয়ালা, প্রভৃতি দ্রব্য যাহা সর্ব্বদা ব্যবহারে আসে তৎসমুদয় সংগ্রহ করা সঙ্গত, তাহাতে 'তওয়াক্কোল' এর ক্ষতি হয় না; ইহার কারণ এই যে আল্লার স্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণ করা সঙ্গত।

অপরিহার্য্য গৃহসামগ্রী সঞ্চয় সঙ্গত

প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণে ঘড়া, কলসী, লোটা, পিয়ালা প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবহার, অন্ন বস্ত্রের ন্যায় (অথচ ভিন্ন আকারে) 'অপরিহার্য্য' হইয়াছে। অন্ন বস্ত্রের 'উপকরণ' প্রতি বৎসর এমন কি প্রতি ঋতুতে প্রাকৃতিক ঘটনা-মূলে উৎপন্ন হইতেছে এবং স্বাভাবিক আকারে ভূপৃষ্ঠের প্রায় সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত আছে অথবা মানব-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অধিগম্য সর্ব্বস্থানে পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু 'ঘটী-বাটী' প্রভৃতি অপরিহার্য্য গৃহ-সামগ্রী প্রতিদিন উৎপন্ন হয় না বা আবশ্যক মত অন্যের স্থানেও পাওয়া যায় না। এই জন্য বিজন অরণ্যে ডোল, রশী, সূচ, নরুণ ইত্যাদি সঙ্গে রাখা সঙ্গত। কিন্তু গ্রীষ্মের ব্যবহৃত-বস্ত্র শীতের সময়ে কাজে লাগে না; তাহা অন্য গ্রীষ্মের জন্য রাখিয়া দেওয়া দুর্ব্বল বিশ্বাসের চিহ্ন।

পাঠক! সঞ্চয়ের উপায় সম্বন্ধে এক প্রকার সরল বিধান দেওয়া যাইতেছে। উপার্জ্জনের কিছু উপায় হস্তগত না হইলে যাহাদের মন চঞ্চল হয়—ছুটাছুটী করিতে থাকে, এবং জীবিকার জন্য অন্যের আশাধারী হইতে হয়, তেমন লোকের পক্ষে কিছু উপায় হাতে রাখা হিতকর। আবশ্যকের পরিমিত শস্য-ক্ষেত্র না রাখিলে যাহাদের মন নিরুদ্‌বেগ হইতে পারে না এবং নিশ্চিন্ত মনে 'জেকের' 'ফেকেরে' মগ্ন হইতেও পারে না. তাহাদের পক্ষে পরিমিত শস্য-ক্ষেত্র রাখা অতি উত্তম ব্যবস্থা। ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ বিষয়ে মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। মন প্রশান্ত ও নিরুদ্‌বিগ্ন হইলে আল্লার জেকেরেও ডুবিয়া থাকিতে পারে। জীবিকার সংস্থান হস্তগত হইলে মন অবশ্য নিরুদ্‌বিগ্ন হইতে পারে কিন্তু ধনাগমের উপায় অতিরিক্ত পরিমাণে হস্তগত, হইলে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রায় সকলেই আল্লার কথা ভুলিয়া যায়। আবার কতকগুলি লোক আছে তাহাদের হস্তে ধনাগমের উপায় আসিলে তাহারা উহা রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তায় বিব্রত হইয়া পড়ে, বরং উহা হাতে না থাকিলে তাহারা নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্‌বিগ্ন

নিরুদ্বেগে আল্লার চিন্তা করিবার উদ্দেশ্যে জীবিকার সংস্থান ও সঞ্চয় সঙ্গত

ধনাগমের উপায় পার্থক্যে মানবের ভিন্ন শ্রেণী

হইয়া আরাম অনুভব করিতে পারিত। এরূপ লোকের মন অতীব উচ্চ। আবার কতকগুলি লোক আছে, তাহাদের হস্তে অভাব মোচনের পরিমিত আবশ্যকীয় পদার্থ না থাকিলে মন অস্থির হয়—অন্য কিছুতে তাহারা আরাম পায় না। তদ্রূপ লোককে জীবিকার উপায় কিছু শস্য-ক্ষেত্র রাখা আবশ্যক। যে সকল লোকের মন আড়ম্বর 'ভড়ক' চায়—তাহা না পাইলে মনে আরাম পায় না, তাহাদের মন ধার্ম্মিক লোকের মনের সমজাতীয় নহে, তদ্রূপ মন, নিতান্ত জঘন্য।

তওয়াক্কোল ব্যবহারে আনিবার তৃতীয় প্রণালী—অনাগত বিপদ-প্রতিষেধন কার্য্য সংসৃষ্ট মানব জীবনে যে সকল বিপদ ঘটে বা প্রায় ঘটিয়া থাকে, পূর্ব্বেই তাহাতে বাধা দিয়া ঘটিতে না দিলে 'তওয়াক্কোলের' কোন ক্ষতি হয় না। চোরে চুরি করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে গৃহ-দ্বার-বন্ধ করিয়া তালা লাগাইলে 'তওয়াক্কোল' নষ্ট হয় না। শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সাবধানে অস্ত্র ব্যবহার করিলেও 'তওয়াক্কোল' নষ্ট হয় না। এইরূপ শীত নিবারণের মানসে শীত-বস্ত্র-দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিলেও 'তওয়াক্কোল' বিনাশ পায় না, কিন্তু শীতকালে, শরীর মধ্যে আভ্যন্তরিক উষ্ণতা বৃদ্ধি করিয়া শীত ভাঙ্গিবার আশায় উদর ভরিয়া আহার করিলে, দাগ ব্যবহারের ন্যায় 'তওয়াক্কোল' নষ্ট হয়, কেননা সেরূপ সূক্ষ্ম উপায় দ্বারা উপকার প্রাপ্তির কোন স্থির নিশ্চয়তা নাই। তদ্রূপ কার্য্যে অনিষ্টও হইতে পারে; কিন্তু যে সকল ব্যাপার, প্রকাশ্য কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা ত্যাগ করিলে 'তওয়াক্কোল' থাকে না। আরবের পল্লীগ্রাম বাসী একজন লোক উষ্ট্রারোহণে মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (ﷺ) এর সমীপে যাইবার সময়ে উষ্ট্রটী ছাড়িয়া দিয়া হজরতের মঙ্গলকর সভায় উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি পল্লীবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার উট কোথায়?" সরল পল্লীবাসী বলিল—"আল্লার উপর ভরসা করিয়া উট ছাড়িয়া দিয়াছি।" তখন তিনি বলিলেন—"উহাকে বাঁধ এবং আল্লার উপর 'তওয়াক্কোল' কর।"

মনুষ্য হইতে আগত দুঃখ সহ্য করা উচিত—ইহা তওয়াক্কোল

মানুষের হস্ত হইতে আগত দুঃখ বা কষ্ট সহ্য করা এবং তাহার প্রতিবিধান না করা বাস্তবিক এক প্রকার 'তওয়াক্কোল'। এই উপলক্ষে আল্লা বলিয়াছেন—

وَدَعْ اَذَيهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ

"এবং তাহাদের প্রদত্ত অত্যাচার ভুলিয়া যাও এবং আল্লার উপর নির্ভর

কর।" (২২ পারা। সূরা আহ্‌জাব। ৬ রোকূ) তিনি পুনরায় বলিয়াছেন—

وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

"তোমরা যে উৎপীড়ন করিয়াছ তাহা আমরা সহ্য করিয়াছি এবং তওয়াক্কোল-ধারী লোকের উচিত যে তাহারা তওয়াক্কোল করে।" (১৩ পারা। সূরা এব্‌রাহীম। ২ রোকূ)।

মনুষ্য ব্যতীত অপর জন্তু, যথা সর্প বৃশ্চিক বা ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন ক্ষতি, সহ্য করা উচিত নহে বরং তদ্রূপ ক্ষতি আসিবার পূর্ব্বেই তাহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষার্থ অস্ত্র ব্যবহার করিবার সময়ে নিজের বাহুবল বা অস্ত্রের প্রতি ভরসা করা উচিত নহে—তখন কেবল আল্লার প্রতি নির্ভর করা আবশ্যক। তাহাতে 'তওয়াক্কোল' করা হয়।

মনুষ্য ব্যতীত অপর হইতে উৎপন্ন ক্ষতি সহ্য করা অনুচিত—উহা নিবারণের পূর্ব্ব-চেষ্টা কর্ত্তব্য

অপহরণ সম্পর্কে গৃহস্বামীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও তওয়াক্কোল বিচার—গৃহ-দ্বারে তালা-চাবী লাগাইয়া, তালার দৃঢ়তার উপর ভরসা না করিয়া কেবল আল্লার উপর ভরসা করা আবশ্যক। চোরে গৃহ হইতে দ্রব্যাদি লইলে 'তওয়াক্কোল-ধারী' লোকের পক্ষে দুঃখিত হওয়া উচিত নহে—তাহাকে আল্লার কার্য্যের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক। গৃহ হইতে বাহির হইবার সময়ে দুয়ারে তালা লাগান উচিত বটে কিন্তু হৃদয়ের সহিত এই কথা বলা উচিত—হে "আল্লা! তোমার ইচ্ছা ও বিধান উলটাইবার মানসে আমি গৃহ-দ্বারে তালা লাগাইতেছি না—কেবল তোমার সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণ করিতেছি মাত্র। তুমি আমার এই ধন যদি কাহাকে তুলিয়া লইয়া যাইতে নিযুক্ত করিয়া থাক তবে তোমার সেই আদেশে সন্তুষ্ট আছি। আমি জানিনা, আমার এই দ্রব্য, কোন ব্যক্তির ভোগের জন্য তুমি সৃষ্টি করিয়া আমার জিম্মায় রাখিয়াছ।" গৃহস্বামী, দ্বার-বন্ধন পূর্ব্বক বাহিরে যাইবার পর পুনরায় গৃহে ফিরিয়া যদি দেখিতে পায় যে তাহার দ্রব্যাদি চুরি গিয়াছে এবং তজ্জন্য যদি তাহার মনে দুঃখ জন্মে তবে সেরূপ স্থলে

'তওয়াক্কোল' অক্ষত থাকিবে না। অপহৃত দ্রব্যের জন্য শোক দুঃখ প্রকাশ করিলে, বুঝিবে—তাহার প্রবৃত্তি কুপরামর্শ দিতেছে। অপহৃত দ্রব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ না করিলে বা চোরকে গালী না দিলে, 'ছবরের' ফল পাওয়া যায়; কিন্তু দুঃখ প্রকাশে ইচ্ছা জন্মিলে বা চোরকে ধরিবার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে 'ছবরের' ফল হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। সে অবস্থায় 'তওয়াকোল' বা 'ছবর' কিছুই থাকে না; যাহা কিছু লাভ, তাহা চোরেরই হইয়া থাকে।

রক্ষিত আবশ্যকীয় ধন অপহৃত হইলেও দুঃখিত না হওয়াই উচিত। প্রশ্ন—এ স্থলে কেহ প্রতিবাদ করিয়া বলিতে পারে গৃহ-স্বামী ধনের অভাবগ্রস্ত থাকে বলিয়া সে যত্নের সহিত উহা গৃহ-মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখে। সে ব্যক্তি নিজের অভাব মোচনের জন্য যে দ্রব্যগুলি যত্ন করিয়া রাখিয়াছে, চোর সেই দ্রব্য লইয়া গেলে অবশ্যই সে দুঃখিত না হইয়া কি প্রকারে থাকিতে পারে? ইহার উত্তর শুন—আল্লা মানুষের সম্বন্ধে যাহা করেন তাহা তাহার মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন। কোন্ কার্য্যে মানবের মঙ্গল হয় তাহা আল্লাই ভাল জানেন—মানব কিছুই জানে না। ধন পাইলে যদি লোকের মঙ্গল হয় তবে আল্লা তাহাকে ধন দিয়া থাকেন; আবার যে স্থানে ধন না থাকিলে মঙ্গল হয়, তথা হইতে তিনি ধন তুলিয়া লন। গৃহ-স্বামীর হস্তে, ধন থাকা যতদিন মঙ্গল ছিল, ততদিন আল্লা তাহার হস্তে ধন রাখিয়া থাকেন, পরে যখন তিনি দেখেন—ধন গৃহস্থের পক্ষে হিতকর হইবে না, তখন তিনি চোরের দ্বারা উহা তুলিয়া লইয়া থাকেন। এই বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধ-মূল হইলে, ধন থাকিলে বা অপহৃত হইলে, উভয় অবস্থায় মানবের মন প্রফুল্ল থাকে—কখনই দুঃখিত হইতে পারে না। মনে কর, এক জন পীড়িত বালকের চিকিৎসা করিতে স্বয়ং তাহার দয়াময় পিতা নিযুক্ত হইয়াছেন; পীড়ার এক অবস্থায় মাংসাহার হিতকর হইবে বুঝিয়া তিনি পুত্রের আহার জন্য মাংস সংগ্রহ করিয়া দেন। বালকও এই ভাবিয়া আনন্দিত হয় যে, "মাংসাহারে আমার শরীর সুস্থ হইবে বলিয়া দয়ালু পিতা মাংস দিয়াছেন। উপকার না হইলে তিনি কখনই মাংস খাইতে দিতেন না।" রোগের অন্য অবস্থা উপস্থিত হইলে পিতা দেখিলেন মাংস আহার করিলে ক্ষতি হইবে। তখন তিনি বালকের হস্ত হইতে মাংস কাড়িয়া লইয়া থাকেন। বালক তখন মাংস আহার করিতে না পাইলেও

সন্তুষ্ট থাকে এবং মনে মনে বিশ্বাস করে—'মাংস আমার পক্ষে কুপথ্য না হইলে পিতা কাড়িয়া লইতেন না।' "আল্লা যাহা করেন তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন" এই বিশ্বাস না জন্মিলে মনে 'তওয়াক্কোল' আসিতে পারে না। উক্ত প্রকার বিশ্বাস-জ্ঞান না পাইয়া 'তওয়াক্কোল' জন্মিয়াছে মনে করা বৃথা।

অপহরণ সম্বন্ধে তওয়াক্কোল-ধারীর প্রতিপাল্য ছয়টী নিয়ম—পাঠক জানিয়া রাখ, চুরী সম্বন্ধে 'তওয়াক্কোল-ধারী' লোককে ছয়টী নিয়ম পালন করিতে হয়। **প্রথম** নিয়ম—ধন নিরাপদে রাখিবার মানসে গৃহ-দ্বার বন্ধ করা উচিত বটে কিন্তু দৃঢ় শিকল দ্বারা বা বহু তালা লাগাইয়া বন্ধ করিতে বাড়াবাড়ী করা উচিত নহে, প্রতিবেশীদিগকে ধনের পাহারা দিতে অনুরোধ করাও কর্ত্তব্য নহে; বরং সহজ ভাবে গৃহ-দ্বার বন্ধ করা আবশ্যক। মহাত্মা মালেক দীনার নিজের গৃহ-দ্বার দড়ী দিয়া বান্ধিয়া রাখিতেন এবং বলিতেন "কুকুর প্রবেশের ভয় না থাকিলে তদ্রূপ শক্ত করিয়া বন্ধন করিতাম না।" **দ্বিতীয়** নিয়ম—যে রূপ ধন গৃহে থাকিলে ধন-লোভে চোর নিশ্চয়ই গৃহে প্রবেশ করিবে বুঝা যায়, তদ্রূপ ধন গৃহে রাখা উচিত নহে। সেরূপ লোভনীয় দ্রব্য গৃহে রাখিলে, চোরকে চুরী করিতে ডাকিয়া আনা হয়। আমীর মোগীরা, এক দিন মহাত্মা মালেক দীনারের সমীপে কিছু জাকাতের ধন প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা কিছুক্ষণ চিন্তার পর সমস্ত ধন আমীরের নিকট ফিরাইয়া দেন এবং বলিয়া পাঠান যে "তোমার ধন, তুমি গ্রহণ কর, চোরে উহা লইবে বলিয়া শয়তান আমার মনে সন্দেহ জন্মাইতেছে; আমি ইচ্ছা করি না—আমার মন সন্দেহ দোলায় বিচলিত হয়, এবং আরও ইচ্ছা করি না কেহ চুরী করিয়া পাপে ডুবে।" এই সংবাদ মহাত্মা আবু ছোলায়মান দারানী মহোদয় শুনিয়া বলিয়াছিলেন "ইহা ছুফীদিগের চিত্ত-দৌর্ব্বল্য মাত্র. মালেক দীনার তো সংসার হইতে সম্পূর্ণ বিরাগী রহিয়াছেন। ধন চোরে লউক বা না লউক তাহাতে তাঁহার কি ক্ষতি? ধনের প্রভাব তাঁহার মনের ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। তবে তাঁহার উক্ত প্রকার সতর্কতা, তাঁহার 'তওয়াক্কোলের' পূর্ণতার চিহ্ন।" **তৃতীয়** নিয়ম—গৃহ-দ্বার বন্ধ করিয়া বাহিরে যাইবার সময়ে এইরূপ 'নীয়ৎ' করিবে—"আমার দ্রব্য চোরে লইলে যেন জগতের মঙ্গল হয়; হয়তো চোর দারুণ অভাবে পড়িয়া কষ্ট পাইতেছে, অপর দিকে

আমার দ্রব্যগুলি গৃহে আবদ্ধ থাকাতে লোকের অভাব মোচনে ব্যয়িত হইতে পারিতেছে না; তাহাতে আমার কৃপণতা প্রকাশ পাইতেছে। চোর বেচারা আমার দ্রব্যগুলি লইয়া গেলে তিন প্রকার মঙ্গল হইবে—চোরের অভাব ঘুচিয়া যাওয়াতে সে আরাম পাইবে আমার কৃপণতা বিদুরিত হওয়াতে আমার হৃদয় পবিত্র হইবে এবং অপর মুছলমান ভ্রাতার ধন রক্ষা পাইবে। কেননা চোর বেচারা অভাবের তাড়নায় চুরী করিবেই করিবে। আমার ঘরে চুরী করিতে সুযোগ না পাইলে সে অপর সাধু মুছলমানের গৃহে গিয়া তাহার ধন হানি করিবে, চোর আমার দ্রব্য লইলে অন্যের দ্রব্য লইতে অবশ্যই ক্ষান্ত হইবে। এইরূপ "নীয়ৎ" করিলে চোর যে নিশ্চয়ই চুরী করিবে তাহা বুঝা যায় না, এবং তদ্রূপ নীয়তে আল্লার অভিপ্রায়ও উল্‌টে না। চুরী না হওয়া যদি তাঁহার অভিপ্রায় হয়, তবে কেহ চুরী করিবে না; আর যদি চুরী করানই তাঁহার অভিপ্রায় থাকে তবে অবশ্যই চুরী হইবে। উভয় অবস্থায় গৃহস্বামী ছদ্‌কার পূর্ণ পুণ্য পাইবে, (টীঃ ৪৩৫) অর্থাৎ এক পয়সার পরিবর্ত্তে সাত শত পয়সার পুণ্য পাইয়া থাকে। কেবল 'নীয়তের' কল্যাণে তদ্রূপ ফল প্রাপ্তি ঘটে—চুরী না ঘটিলেও কিছু আসিত না। কেননা গৃহ-স্বামী, অভাবগ্রস্ত চোরের অভাব-কষ্ট লাঘব করিবার এবং অপর মুছলমান ভ্রাতার ধন রক্ষার 'নীয়ৎ' করিয়াছিল। আল্লার ইচ্ছায় চুরী ঘটিতে না পারিলেও ঐ দুই নীয়তের (সাধু সঙ্কল্পের) ফল, ছদ্‌কার পুণ্য স্বরূপ গৃহ-স্বামীর ভাগ্যে মিলিত। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—"স্ত্রীসম্ভোগ কালে, বীর্য্যস্তম্ভন না করিয়া সাধু-সন্তান উৎপত্তির উদ্দেশ্যে শুক্র-পাত করিলে, সন্তানোৎপত্তি হউক বা না হউক তাহার ভাগ্যে এমন এক সুসন্তানের পুণ্য লিপীবদ্ধ হয় যে, সে সন্তান আজীবন আল্লার পথে ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া শেষে কাফেরের হস্তে 'শহীদ' হয়।"

সন্তান হউক বা না হউক, সাধু উদ্দেশ্যে স্ত্রী সহবাসের সুফল

এইরূপ হইবার কারণ এই যে—কর্ত্তব্য কার্য্য করার ভার সেই লোকের উপর ছিল তাহাতো সে সম্পূর্ণভাবে সম্পাদন করিয়াছে, সন্তান জন্মান এবং তাহাকে জীবিত রাখা সে লোকের ক্ষমতার অন্তর্গত নহে; যদি উহা তাহার ক্ষমতার অন্তর্গত থাকিত তবে তাহার পাপ পুণ্য তাহার স্কন্ধেই

টীকা—৪৩৫। দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচনার্থ দান করিবার 'নিয়ৎ' করিয়া দান করিলে ছদকার পুণ্য পাওয়া যায় কিন্তু কোন কারণে তদ্রূপ দানে অক্ষম হইলেও নীয়তের ফলে সেই পুণ্য পাওয়া যায়। পরিত্রাণ পুস্তকের পঞ্চম পরিচ্ছেদের ২৫২ পৃষ্ঠায় প্রথম ১১ লাইনে এছরায়েল বংশীয় দরিদ্রের বিবরণ দেখ।

পড়িত। চতুর্থ নিয়ম—ধন চুরী গেলে দুঃখিত হওয়া উচিত নহে; এবং ইহা বিশ্বাস করা উচিত—চুরী হইয়া গেলে তন্মধ্য হইতে মঙ্গল উৎপন্ন হইবে। ধন চুরী গেলে যদি বলা হয়—'উহা আল্লার জন্য দিলাম' তবে আর অপহৃত দ্রব্যের অনুসন্ধান করা উচিত নহে; এমন কি চোর সে দ্রব্য ফিরিয়া দিতে আসিলেও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে, গ্রহণ করিলে কোন ক্ষতি নাই বটে, কেননা উহা তাহারই দ্রব্য; সুধু মনের সঙ্কল্পে উহা তাহার অধিকার হইতে বহির্ভূত হইতে পারে না, তথাপি 'তওয়াক্কোল' সম্বন্ধে উহা ভাল কথা নহে। ১। মহাত্মা এবনে ওমবের একটী উষ্ট্র হারাইয়া যায় তিনি উহা খুজিতে খুজিতে হয়রান হইয়া পড়েন। পরিশেষে বলিয়াছিলেন—"আর কত খুজিব—উহা আল্লার পথে ছাড়িয়া দিলাম।" অতঃপর তিনি নমাজ পড়িতে মছজেদে গমন করেন। নমাজ সমাপ্তির পর শুনিতে পাইলেন তাঁহার উষ্ট্র অমুক স্থানে আছে। তিনি তখন পুনরায় উষ্ট্রের অনুসন্ধানে যাইবার বাসনায় জুতার মধ্যে এক পদ স্থাপন করিয়াছিলেন এমন সময়ে মনে হইল উষ্ট্রটী আল্লার পথে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এ কথা মনে হইবা মাত্র তিনি 'এছ্‌তেগফার' (ত্রুটীর জন্য আল্লার স্থানে ক্ষমা চাহিতেছি) বলিয়া জুতা পরিত্যাগ করতঃ পুনরায় মছজেদে গিয়া বসিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন—"আল্লার নামে যাহা উৎসর্গ করিয়াছি, এখন তাহার নিকটেও যাইব না।" ২। একজন সাধু স্বপ্নে কোন মুছলমানকে বেহেশ্‌ৎ মধ্যে দুঃখিত দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মুছলমান বলিয়াছিলেন—"আমার সে দুঃখ এমন কঠিন যে 'কেয়ামৎ' পর্য্যন্ত থাকিবে। আমি উচ্চ-বহেশ্‌তে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট স্থান দেখিয়াছি। তদ্রূপ স্থান সমস্ত বেহেশ্‌তে আর নাই। আমি সেই উন্নত স্থানের অভিলাষী হইয়া তদভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলাম। এমন সময়ে শব্দ হইল এ ব্যক্তিকে এথা হইতে দূর করিয়া দাও; উচ্চ বেহেশ্‌তের উন্নত স্থান উহার জন্য নহে। যাহারা 'আল্লার পন্থা জারী' রাখিয়াছেন তাহাদের জন্য ঐ উৎকৃষ্ট স্থান। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আল্লার পন্থা জারী রাখার অর্থ কি?" উত্তর আসিল—'তুমি একদিন বলিয়াছিলে অমুক দ্রব্য আল্লার জন্য দিলাম কিন্তু তাহা পালন কর নাই। তুমি যদি নিজের বাক্য পূর্ণ করিতে, তবে তোমাকে ঐ উন্নত বেহেশ্‌ৎ দেওয়া যাইত।" ৩। এক ব্যক্তি কাবা শরীফের ঘেরার মধ্যে নিদ্রা গিয়াছিল। চেতন পাইয়া দেখে তাহার টাকার থলিটী চুরী গিয়াছে।

তথায় এক জন সাধু পুরুষ ছিলেন। টাকার অধিকারী তাহার প্রতি চুরীর দোষারোপ করিল! সাধু পুরুষ থলীর মালেককে নিজের গৃহে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার থলীতে কত টাকা ছিল? সে ব্যক্তি যত টাকার কথা বলিল—সাধু ব্যক্তি তত টাকা তাহাকে দিলেন। সে ব্যক্তি টাকাগুলি লইয়া বাহির হইবা মাত্র, শুনিতে পাইলেন তাহার কোন বন্ধু তামাশা দেখিবার মানসে থলীটী তুলিয়া লইয়াছিল। ইহা শুনিয়া সে ব্যক্তি সাধুর নিকট ফিরিয়া গেল এবং টাকাগুলি ফেরৎ লইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিল কিন্তু সাধু তাহা গ্রহণ করিলেন না। সাধু বলিলেন—'আমি এ টাকাগুলি আল্লার পথে দিয়াছি—পুনরায় লইতে পারিব না।' নিতান্ত পীড়াপীড়িতে পড়িয়া বলিয়াছিলেন—'আচ্ছা' ঐ টাকাগুলি দরিদ্র লোকদিগকে দেওয়া যাইতে পারে।' তদনুসারে দরিদ্রদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। পঞ্চম নিয়ম-চোরকে অভিসম্পাত করা উচিত নহে। তাহাতে 'তওয়াক্কোল' ও 'পরহেজগারী' উভয়ই নষ্ট হয়। কেননা যে ব্যক্তি গত কার্য্য লইয়া অনুশোচনা করে সে 'পরহেজগার' নহে। (টীঃ ৪৩৬) ১। মহাত্মা রবী' এব্‌নে খছীম এর একটী বহুমূল্য অশ্ব চুরী গিয়াছিল। চোর যখন ঘোড়াটী লইয়া যাইতেছিল তখন তিনি উহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'তবে কেন আপনি চোরকে ঘোড়া লইয়া যাইতে দিয়াছিলেন?' তিনি বলিয়াছিলেন—'তখন আমি যে কার্য্যে রত ছিলাম তাহা ঘোড়া অপেক্ষা মূল্যবান্' অর্থাৎ তখন তিনি নমাজে নিবিষ্ট ছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা তখন চোরকে লক্ষ্য করিয়া অভিসম্পাত করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন—'অভিসম্পাত করিও না—আমি ঘোড়াটী 'ছদ্‌কা' দিয়া উহার জন্য হালাল করিয়া দিয়াছি।' ২। এক জ্ঞানী লোকের প্রতি কেহ অত্যাচার করিয়াছিল। কতকগুলি লোক তাঁহাকে অত্যাচারীর প্রতি অভিসম্পাত দিতে অনুরোধ করে। জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছিলেন—'অত্যাচারী তাহার স্বীয় আত্মার উপর অত্যাচার করিয়াছে—আমার উপর করে নাই। তাহার নিজের দুষ্কর্ম্ম তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবে; আমি আর তাহার উপর অতিরিক্ত শাস্তি চাপাইতে পারি না।' হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—মানুষের উপর কেহ অত্যাচার করিলে লোকে

টীকা—৪৩৬। গত কার্য্যের জন্য হা হুতাশ করা নির্ব্বোধের কার্য্য; কিন্তু গত ত্রুটীর জন্য অনুতাপ করা উত্তম কার্য্য। উহা 'তওবার' এক উৎকৃষ্ট অংশ।

অত্যাচারীর প্রতি অভিসম্পাত ও গালী দেয়। তাহাতে কখন কখন প্রতিশোধ লওয়া হয়। আবার কখনও এমনও হয় যে অতিরিক্ত অভিসম্পাত ও গালী দিয়া তাহারই নিজের উপর উল্টা অত্যাচারের ভার টানিয়া আনে। **ষষ্ঠ** নিয়ম—চোরের অবস্থা স্মরণে তাহার প্রতি দয়ার্দ্র চিত্ত হওয়া উচিত, কেননা চোর যে গর্হিত কার্য্য করিয়াছে তাহার জন্য সে পরকালে কঠিন শাস্তির যোগ্য হইয়াছে ; ধনস্বামী নিজে কাহারও প্রতি অত্যাচার করে নাই, বলিয়া পাপ ভাগীও হয় নাই—বরং অন্য কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া তাহার পুণ্য পাইবার অধিকারী হইয়াছে তজ্জন্য আল্লাকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। চুরী যাওয়াতে তুচ্ছ সাংসারিক ধনেরই সামান্য ক্ষতি হইয়াছে কিন্তু চিরস্থায়ী মহামূল্য পুণ্যের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই, বরং চোরের উপার্জ্জিত পুণ্য পাইবার অধিকারী হইয়াছে। যে চোর, চুরীর ন্যায় পাপ কার্য্যকে সহজ বিবেচনা করে সে ব্যক্তি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত। তদ্রূপ লোকের দুরবস্থা স্মরণে, যাহার মনে দয়ার সঞ্চার না হয়, তাহার মনে মানব-জাতির প্রতি ভালবাসা নাই। মহাত্মা ফজীল এর পুত্র মহাত্মা আলীর ধন একবার চোরে চুরী করিয়াছিল, পুত্রকে রোদন করিতে দেখিয়া পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কি ধনক্ষয়ের জন্য রোদন করিতেছ?' পুত্র উত্তর দিলেন—'না, আমি ধনের শোকে রোদন করিতেছি না,—আমি সেই বেচারা চোরের দুরদৃষ্টের কথা স্মরণ করিয়া রোদন করিতেছি। সে এমন কুকর্ম্ম করিয়াছে যে পরকালে বিচারের দিনে তাহার কোন ওজর আপত্তি করিবার পথ থাকিবে না।'

তওয়াক্কোল ব্যবহারে আনিবার চতুর্থ প্রণালী—পীড়াদি দূরীকরণ কার্য্য সংসৃষ্ট। মানব জীবনে যে সকল বিপদ উপস্থিত হয় এবং যাহা দূর করিতে মানবকে চেষ্টা করিতে হয়, তন্মধ্যে রোগ এক প্রকার প্রধান বিপদ। যে বস্তু ব্যবহার করিলে রোগ দূর হয় তাহাকে ঔষধ কহে। **ঔষধের তিন শ্রেণী** আছে। **প্রথম শ্রেণী নিশ্চিত ঔষধ** অর্থাৎ যাহা ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ দূর হয়, যেমন ক্ষুধা রোগে অন্ন ; পিপাসায় শীতল জল। অন্য বিপদেও তদ্রূপ নিশ্চিত ঔষধ আছে, যথা অগ্নি লাগিলে তাহার উপর জল ঢালিয়া দিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। এই প্রকার নিশ্চিত ঔষধ ব্যবহারে, হস্ত সঙ্কুচিত করা হারাম সুতরাং তদ্রূপ ঔষধ ব্যবহার না করিলে

নিশ্চিত ঔষধ ব্যবহার না করিলে তওয়াক্কোল থাকে না

'তওয়াকোল' থাকে না। **দ্বিতীয় শ্রেণী—অনিশ্চিত ঔষধ** অর্থাৎ যে ঔষধে উপকার হইবে এ কথা যুক্তিতে বুঝা যায় না—কল্পনাও করা যায় না, যেমন মন্ত্র, 'দাগ,' 'ফাল'। তদ্রূপ ঔষধ ত্যাগ করাই 'তওয়াকোল'। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে এরূপ পদার্থ ব্যবহার করিলে আল্লার উপর ভরসা থাকে না—ঐ প্রকার পদার্থের উপরই ভরসা জন্মে। উহাদের মধ্যে 'দাগ' সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য, তাহার পরে মন্ত্র, ও শেষে 'ফাল'। ফালকে শকুনী বা কাক চরিত্রও কহে। **তৃতীয় শ্রেণী—সর্ব্বজন পরিচিত ঔষধ।** ইহা এক পক্ষে, প্রথম শ্রেণীর ন্যায় ধ্রুব বা নিশ্চিত নহে—আবার অন্য পক্ষে দ্বিতীয়ের ন্যায় অযৌক্তিক এবং অনিশ্চিতও নহে; তবে আল্লা প্রত্যেক পদার্থে বিশেষ বিশেষ গুণ দিয়াছেন, তাহাতে পৃথক পৃথক ফল পাওয়া যায়।

অনিশ্চিত ঔষধ ত্যাগ করাই তওয়াকোল

সর্ব্বজন পরিচিত ঔষধের ব্যবহার বা ত্যাগে তওয়াকোল নষ্ট হয় না

দ্রব্য-গুণ, আল্লারই প্রদত্ত; উহার দ্বারা বিশেষ বিশেষ রোগ দূর হইবার প্রবল সম্ভাবনা আছে, যথা রক্তাধিক্যে রক্ত-বহিষ্করণ; কোষ্ঠবদ্ধ হইলে 'সোনাপাতা' প্রভৃতি ভেদের ঔষধ সেবন, শীত লাগিলে উষ্ণ দ্রব্যের ব্যবহার করন, আবার উষ্ণ বোধ হইলে শীতল দ্রব্য গ্রহণ ইত্যাদি। এরূপ পদার্থ ত্যাগ করা 'হারাম' নহে; আবার ব্যবহার করিলেও 'তওয়াকোলের' ক্ষতি হয় না। কখন কখন তদ্রূপ পদার্থের ব্যবহার করা, 'না করা', অপেক্ষা উত্তম। পরিত্যাগ করিলেও 'তওয়াকোল' নষ্ট হয় না। ইহার কারণ এই যে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) ঐ প্রকার ঔষধ, অপরকে ব্যবহার করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং নিজেও স্বয়ং ব্যবহার করিয়াছেন।

ঔষধ ব্যবহারের অনুকূলে হদীছ বচন—ঔষধ ব্যবহার সম্বন্ধে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) এর উপদেশ লিখিত হইতেছে—তিনি বলিয়াছেন—"হে আল্লার বান্দা তোমরা ঔষধ ব্যবহার কর।" তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"মৃত্যু ভিন্ন অন্য সমস্ত রোগের ঔষধ আছে; তবে মানব কখন কখন সে ঔষধ জানে, আবার কখন কখন জানে না।" এক সময়ে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) কে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"হে রসুলুল্লা, ঔষধ ও মন্ত্র কি আল্লার বিধান উল্‌টাইয়া দিতে পারে?" তিনি বলিয়াছিলেন—"উহাও যে আল্লার বিধান।" তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"আমি ফেরেশ্‌তাগণের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময়ে তাঁহাদের প্রত্যেক দল আমাকে

অনুরোধ করিতেন—'হে রসুলুল্লা, আপনার শিষ্য মণ্ডলীকে শিঙ্গা লাগাইয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলিতে উপদেশ করিবেন। তিনি বলিয়াছেন চান্দ্র মাসের ১৭ই, ১৯শে ও ২১শে তারিখ শিঙ্গা লাগাইয়া রক্ত নিঃসারণ করিবে। তাহা না করিলে রক্তের প্রাবল্যে বিনাশ পাইতে হইবে অর্থাৎ রক্তাধিক্য হইতে অন্য নানা মারাত্মক রোগ জন্মিবে; তিনি ইহাও বলিয়াছেন—"আল্লার আদেশে রক্ত, বিনাশের কারণ হয়। শরীর হইতে রক্ত নিঃসারণ করা, পরিধান বস্ত্র হইতে সাপ ঝাড়িয়া ফেলা এবং গৃহ-সংলগ্ন অগ্নি নির্ব্বাণ করা সমান—ঐ তিন কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হইলে বিনাশ পাইতে হয় সুতরাং 'তওয়াক্কোল' থাকে না।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"মাসের ১৭ই তারিখ মঙ্গলবারে শিঙ্গা লাগাইয়া রক্ত বাহির করিলে সম্বৎসর পর্য্যন্ত শরীরে রোগ থাকে না।" তিনি মহাত্মা ছাআদ এবনে মাআজকে 'ফছদ' খুলিয়া (রগ চিরিয়া) রক্ত বাহির করিয়া দিতে আদেশ দিয়াছিলেন। মহাত্মা হজরৎ আলীর চক্ষে বেদনা হইয়াছিল। হজরৎ তাঁহাকে খোর্মা বা খোর্মার ন্যায় শক্ত দ্রব্য আহার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং চকন্দর শাকের সহিত যবের আটা পাক করিয়া আহার করিতে বলিয়াছিলেন। মহাত্মা ছহব এর চক্ষুতে বেদনা হইয়াছিল সেই অবস্থায় তাঁহাকে খোর্মা খাইতে দেখিয়া মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) বলিয়াছিলেন—"তোমার চক্ষুতে বেদনা হইয়াছে অথচ খোর্মা খাইতেছ?" মহাত্মা ছহব বলিয়াছিলেন—"যে চক্ষে বেদনা হইয়াছে তাহার বিপরীত দিকের মাড়ী দ্বারা খোর্মা চিবাইয়া খাইতেছি।" এই উত্তর শুনিয়া হজরত হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন।

রক্তমোক্ষণে অনুমতি আছে

মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) এর ঔষধ ব্যবহার—অতঃপর মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) এর ঔষধ ব্যবহারের কথা শুন—তিনি প্রতি রজনীতে চক্ষে ছোর্মা লাগাইতেন; এবং প্রতি বৎসর ঔষধ সেবন করিতেন, 'ওহী নাজেল' হইবার সময় তাঁহার শরীরের উপর অত্যন্ত কষ্ট আবির্ভূত হইত ও সময়ে সময়ে মস্তকে বেদনা হইত। তদবস্থায় মস্তকের বেদনা স্থানে মেহেদী লাগাইয়া লইতেন। শরীরের উপর কোন স্থানে ক্ষত হইলে তথায়ও মেহেদী প্রয়োগ করিতেন। কখন কখন ক্ষত-স্থানের উপর মৃত্তিকা চূর্ণও প্রক্ষেপ করিতেন। রোগের সময়ে তিনি যে সকল ঔষধ নিজে ব্যবহার করিয়াছেন এবং অপরকে ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিয়াছেন তৎসমুদয় সংগ্রহ

করতঃ জ্ঞানী লোকেরা 'তেব্বোন্নবী' নামক এক গ্রন্থ লিপীবদ্ধ করিয়াছেন।

ঔষধ ব্যবহারের অনুকূলে মহাজন উক্তি—১। মহাত্মা হজরৎ মুছা নবী একবার পীড়িত হইয়াছিলেন। এছরাইল বংশীয় অভিজ্ঞ লোকেরা বলিয়াছিল—'অমুক দ্রব্য এই রোগের ঔষধ—আপনি তাহা ব্যবহার করুন।' তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি ঔষধ সেবন করিব না—স্বয়ং আল্লাই আমাকে আরাম করিবেন।" তাঁহার রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সকলে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল—'সেই ঔষধ সুবিখ্যাত ও অব্যর্থ, আপনি ব্যবহার করুন।' তিনি কিছুতেই ঔষধ সেবনে সম্মত হইলেন না, পীড়াও দূর হইল না। ইতি মধ্যে 'ওহী নাজেল' হইল—"হে মুছা! আমি নিজের গৌরবের শপথ করিয়া বলিতেছি—তুমি যতদিন ঔষধ সেবন না করিবে, আমি ততদিন কিছুতেই তোমাকে আরাম করিব না।" অতঃপর তিনি ঔষধ সেবন করিয়া স্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ব্যাপার উপলক্ষে নবী মহোদয়ের মনে বিষম খট্‌কা পড়িয়াছিল। ইতিমধ্যে প্রত্যাদেশ হইল—"হে মুছা, তুমি কি তোমার 'তওয়াক্কোল' দ্বারা আমার 'হেকমৎ' উল্‌টাইয়া দিতে চাও—আমা ভিন্ন আর কে ঔষধের মধ্যে হিতকর গুণ স্থাপন করিয়াছে?" ২। এক পয়গম্বর শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য আল্লার নিকট অভিযোগ করিয়াছিল। প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল—"মাংস আহার ও দুগ্ধ পান কর।" ৩। অন্য এক পয়গম্বরের প্রতি, দুর্ব্বলতার সময়ে ডিম্ব আহারের আদেশ হইয়াছিল। ৪। কোন এক সম্প্রদায়ের মধ্যে সুন্দর সুশ্রী সন্তান জন্মিত না। তৎকালীন পয়গম্বরের সমীপে সেই অভিযোগ উত্থাপিত হইলে আল্লার দরবার হইতে এই প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল—"সেই সম্প্রদায়ের লোকদিগকে বলিয়া দাও তাহারা যেন তাহাদের গর্ভবতী রমণীদিগকে গর্ভকালে উত্তম উপাদেয় আহার দান করে, বিশেষতঃ গর্ভের তৃতীয় ও চতুর্থ মাসে পুষ্টিকর উপাদেয় টাট্‌কা খাদ্য অবশ্যই যেন খাওয়ায়।" ঐ সময়ে গর্ভস্থ সন্তানের আকার গঠিত হয়। সন্তান জন্মিলেও সন্তানের মাতাকে উপাদেয় দ্রব্য আহার করিতে দিতে হয়। এই সকল কথায় বুঝা যায়, উৎকৃষ্ট পান ও আহার যেমন পরিতৃপ্তি দান করে তদ্রূপ উহা ঔষধ স্বরূপ হইয়া শরীরের বল সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য প্রদান করে। এই সমস্তই সেই বিশ্বকারণ মহাপ্রভুর সৃষ্ট হিতকর কৌশল। ৫। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—মহাত্মা হজরৎ

সুশ্রী সন্তান লাভের উপায়

মুছা নবী আল্লার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হে আল্লা! রোগ কি কারণে এবং আরগ্যই বা কি কারণে ঘটে?" উত্তর আসিয়াছিল—"উভয়ই আমার আদেশে ঘটে।" পশ্চাৎ তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"চিকিৎসক তবে কোন্ কার্য্যের জন্য হইয়াছে?" উত্তর আসিল—"কতকগুলি লোক চিকিৎসা কার্য্যে, ঔষধের উপলক্ষে, জীবিকা পাইবে এবং আমার বান্দাদিগকে প্রফুল্ল রাখিবে এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে।"

যাহা হউক, ঔষধ উপলক্ষে জ্ঞানী লোকেরা যে তওয়াক্কোল করেন বাস্তবিক তাহা জ্ঞান-মূলক ও 'মনের ভাবমূলক' ব্যাপার। মানুষের উচিত, যিনি ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার প্রতি যেন ভরসা করে—ঔষধের উপর যেন কিছুমাত্র ভরসা না করে। কেননা বহু লোক ঔষধ সেবন করিয়াও মারা পড়িতেছে।

কি কারণে 'দাগ' লওয়া অনুচিত?—পাঠক! জানিয়া রাখ—রোগ দূর করিবার জন্য 'দাগ' লওয়া বহু লোকের অভ্যাস আছে। কিন্তু 'দাগ' ব্যবহার করিলে 'তওয়াক্কোলের' শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়; বরং 'দাগ' লইতে মানবকে মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (ছাঃ) দৃঢ় ভাবে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু মন্ত্র ব্যবহারের জন্য তত কঠিন নিষেধ করেন নাই। ইহার কারণ এই যে, অগ্নি দ্বারা পোড়াইয়া দাগ দিলে, ক্ষত ভীষণ আকার ধারণ করিতে পারে; তাহার পর অগ্নির সন্তাপ শরীরের সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহাতে 'স্বাস্থ্যবিধানের' মধ্যে মহা পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। 'রগ' চিরিয়া 'ফছ্‌দ্' খোলার ন্যায় বা শিঙ্গা লাগাইয়া রক্ত বাহির করার ন্যায় 'দাগ' সহজ কার্য্য নহে। আর দাগের উপকার 'ফছ্‌দ্' খোলার বা শিঙ্গা লাগানের উপকারের ন্যায় শীঘ্র বোধ-গম্যও হয় না। তাহার উপর 'দাগের' পরিবর্ত্তে অন্য ঔষধ ব্যবহার করিলেও রোগ দূর হইতে পারে। মহাত্মা ওমর এব্‌নে হছীন পীড়িত হইয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে 'দাগ' লইতে বহু অনুরোধ করে। প্রথমে তাহাদের অনুরোধ কর্ণপাত করেন না। পরিশেষে সকল লোকের অনুরোধ উপরোধ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি 'দাগ' গ্রহণ করেন। তিনি বলিয়াছেন—"'দাগ' লইবার অগ্রে আমি এক আলোক দেখিতে পাইতাম; তদ্‌ব্যতীত আকাশ-বাণীও শুনিতে পাইতাম; ফেরেশ্‌তাগণ আমাকে 'ছালামো আলায়কোম' বলিয়া অভিনন্দন করিতেন। 'দাগ' লইবার দিন হইতে সে সমস্ত ব্যাপার বন্ধ হইয়া যায়।

উহা বুঝিতে পারিয়া আমি বহু অনুতাপ ও রোদনের সহিত 'তওবা' এবং মার্জ্জনা ভিক্ষা করি।" এই কথা তিনি মোতার্‌রফ এব্‌নে আবদুল্লার সমীপে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন এবং ইহাও বলিয়াছিলেন বহু দিন অনুতাপ রোদনের পর করুণাময় তাঁহাকে পূর্ব্ব-অবস্থা পুনঃ প্রদান করেন।

অবস্থা বিশেষে ঔষধ ত্যাগ করা চলে এবং তাহা ছোন্নৎ-বিরুদ্ধ নহে—পাঠক! জানিয়া রাখ—কোনও কোনও অবস্থায় ঔষধ ব্যবহারে ক্ষান্ত হইলেও মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) এর সোন্নতের বিপরীত কার্য্য করা হয় না। পূর্ব্বকালের বহু জ্ঞানী লোক ঔষধ সেবনে বিরত ছিলেন। এই কথা শুনিয়া কোন ব্যক্তি প্রতিবাদ করিয়া বলিতে পারেন—ঔষধ ব্যবহারে ক্ষান্ত হইলে যদি পূর্ণ-'তওয়াক্কোল' হইত তবে স্বয়ং মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) ঔষধ ব্যবহার করিতেন না। পাঠক! এই প্রতিবাদ খণ্ডন করিতে হইলে প্রথমে বলিতে হইবে—এমন কতকগুলি 'অবস্থা' আছে; তাহা উপস্থিত হইলে 'তওয়াক্কোলধারী' লোকের ঔষধের প্রতি ঔদাসীন্য জন্মে। **ঔষধের প্রতি ঔদাসীন্য ছয় কারণে জন্মে। প্রথম**—আসন্ন-মৃত্যু-দর্শন। যে সকল সাধু-পুরুষ প্রত্যক্ষ-দর্শনে জানিতে পারিয়াছেন—তাঁহাদের মৃত্যু অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাঁহারা আর ঔষধ ব্যবহারে ইচ্ছা করেন না। এই কারণে মহাত্মা আবুবকর ছিদ্দীক অন্তিম পীড়ায় আক্রান্ত হইলে, উপস্থিত লোকেরা চিকিৎসক ডাকিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন; ছিদ্দীক মহোদয় বলিয়াছিলেন—"চিকিৎসক আমাকে দেখিয়া বলিয়াছেন—তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিয়া থাকেন।" **দ্বিতীয়—পরকাল-চিন্তায় নিমগ্ন।** পীড়িত ব্যক্তি যখন পরকালের চিন্তায় তন্ময় হইয়া পড়েন—কি কারণে পরকালে সম্মান বা অপমান হ্রাস বৃদ্ধি হয়, সেই চিন্তায় ও পর্য্যবেক্ষণে বিভোর হইয়া যান, তখন শারীরিক ঔষধের খেয়ালটী পর্য্যন্ত মনে আসে না। মহাত্মা আবু দর্‌দার পীড়া হইয়াছিল; সেই সময়ে তিনি আধ্যাত্মিক রোগ অর্থাৎ পাপের সম্বন্ধে চিন্তায় বিভোর ছিলেন এবং পাপ করিলে আত্মার মর্ম্মস্থল যেরূপ দগ্ধ হয় তাহা স্মরণ পূর্ব্বক যন্ত্রণায় রোদন করিতেছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"আপনি রোদন করিতেছেন কেন? তিনি বলিয়াছিলেন—"পাপের জন্য।" তাহারা পুনরায় বলিল—"চিকিৎসককে কি ডাকা হইবে?" তিনি বলিলেন—"সেই

সুচিকিৎসকই আমাকে পীড়িত করিয়াছেন।" (টীঃ ৫৩৭) কোন এক সময়ে মহাত্মা আবুজর মহোদয়ের চক্ষে বেদনা হইয়াছিল অথচ তিনি ঔষধ গ্রহণ করেন নাই। লোকে তাঁহাকে ঔষধ ব্যবহার না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"ঔষধ অপেক্ষা এক বৃহৎ কার্য্যে আমি আবদ্ধ আছি।" তিনি কোন্ কার্য্যে আবদ্ধ ছিলেন সে কথা পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই; সেই কার্য্যটী কি, তাহা বুঝাইবার জন্য একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—কোন কয়েদীকে কঠিন দণ্ড দিবার জন্য বাদশার সমীপে টানিয়া লওয়া হইতেছে, সেই সময়ে কয়েদীকে ক্ষুধিত দেখিয়া যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে—'তুমি অন্ন আহার করিতেছ না কেন?' সে সময়ে কয়েদীর মুখে কি উত্তর পাওয়ার আশা করা যায়? সে অবশ্যই বলিবে—'বাদশার আদেশে এখনই আমার জীবন যাইবে, অন্ন আহারে আমার কি লাভ?' মহাত্মা আবুজর পাপ-জনিত কঠিন দণ্ড ভয়ে ত্রস্ত ছিলেন; সে সময়ে ঔষধ লাগাইতে কি প্রকারে অবসর পাইতে পারেন? পরকালের চিন্তা-মগ্ন লোকেরা, মহাত্মা ছহল তছতরী মহোদয়ের ন্যায় অবস্থাক্রান্ত হইয়া থাকেন। একদা কতক-গুলি লোক উক্ত মহাত্মাকে قوت (খাদ্য দ্রব্য) শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করে। মহাত্মা, উহা আত্মার খাদ্য মনে করিয়া উত্তর দেন—'আল্লার জেকের অর্থাৎ স্মরণই খাদ্য। তখন তাহারা পুনরায় বুঝাইয়া বলিয়াছিল—'মানব দেহের قوام (স্থিতি) কাহার উপর নির্ভর করে'? মহাত্মা পুনরায় আত্মার সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া বলিয়াছিলেন উহা 'জ্ঞান'। তখন তাহারা হতাশ হইয়া শেষে আরও অধিক পরিষ্কার ভাষায় জিজ্ঞাসা করে—"আমরা শরীর-পোষক খাদ্য দ্রব্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।" তখন তিনি বলিয়াছিলেন—"শরীর তুচ্ছ, নশ্বর পদার্থ কখনই রক্ষা পাইবে না; শরীর-রক্ষা হইতে হস্ত গুটাইয়া লও" এবং শরীরকে তাহার নির্ম্মাণকর্ত্তার হস্তে ছাড়িয়া দাও। তৃতীয় কারণ—চিররোগী হওয়া। যে ব্যক্তি চির-রোগী—দীর্ঘকাল হইতে রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়াও কোন ফল না দেখিয়া ঔষধকে মন্ত্র তন্ত্রের ন্যায় একটা অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বোধ্য পদার্থ মনে করিতেছে, তদ্রূপ ব্যক্তি পরিশেষে ঔষধ সেবনে ক্ষান্ত হয়। তদ্ব্যতীত, যে সকল লোক 'দ্রব্য-গুণ' বা চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা

টীকা—৫৩৭। পাপ কার্য্যে আত্মার পীড়া জন্মায়। শারীরিক পীড়ায় বহু পাপ দূর হয়। করুণাময় আল্লা শরীরে পীড়া চাপাইয়া দিয়া আত্মার পীড়া দূর করিবার কৌশল করিয়াছেন

জানে না, তাহাদের নিকটেও ঔষধ একটা অকর্ম্মণ্য পদার্থ বলিয়া পরিচিত। মহাত্মা রবী এব্‌নে খছীম বলিয়াছেন—"রোগ হইলে ঔষধ ব্যবহার করিতে আমার ইচ্ছা হয়, কিন্তু পরক্ষণেই 'আদ', 'ছমুদ' প্রভৃতি যে সকল জাতি কালের গর্ভে লয় পাইয়াছে তাহাদের ইতিহাস স্মরণ হয়, তখন এ কথা মনে স্পষ্ট জাগরূক হয় যে, তাহাদের মধ্যে অসাধারণ জ্ঞান-সম্পন্ন মহা চিকিৎসক ছিল, তথাপি তাহারা মরিয়া গিয়াছে—চিকিৎসা বিদ্যায় তাহাদের কোন উপকার করিতে পারে নাই।" ফল কথা, চিররোগীর অবস্থা দৃষ্টে বুঝা যায় তাহারা ঔষধকে কার্য্যকর বা ফলপ্রদ বলিয়া বুঝিতে পারে না। **চতুর্থ** কারণ—পীড়াকে মঙ্গলময় বলিয়া জানা। কতকগুলি সাধু লোক, রোগকে মঙ্গলকর ভাবিয়া সর্ব্বদাই শরীরের সঙ্গে লগ্ন রাখিতে ইচ্ছা করিতেন। তাঁহারা রোগ হইতে পুণ্য পাইবার বাসনা রাখিতেন। রোগ শরীরে রাখিয়া নিজের সহিষ্ণুতা ও 'ছবর' পরীক্ষা করিতেন। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—স্বর্ণকার অগ্নি দ্বারা পোড়াইয়া স্বর্ণের শুদ্ধতা পরীক্ষা করে তদ্রূপ কৌশলময় আল্লা, রোগ শোক বিপদ দ্বারা মানুষের 'ছবর' পরীক্ষা করেন। মহাত্মা ছহল তছতরী মহোদয় অন্যান্য লোককে ঔষধ সেবনে পরামর্শ দিতেন কিন্তু তাঁহার নিজের একটী বিশেষ পীড়া ছিল, সে পীড়া দূর করিতে তিনি ঔষধ ব্যবহার করিতেন না এবং বলিতেন—"রোগ-যন্ত্রণা সন্তোষের সহিত সহ্য করা এবং বসিয়া বসিয়া নমাজ পড়াকে আমি সুস্থ শরীরে দাঁড়াইয়া নমাজ পড়া অপেক্ষা উত্তম জানি।" **পঞ্চম** কারণ—রোগে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, এই বিশ্বাস। যে রোগী বহু পাপ করিয়াছে এবং আশা করে যে, রোগে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যাইবে, সে ব্যক্তি ঔষধ গ্রহণে বিরত থাকে। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—"পাপ হইতে পবিত্র করিবার উদ্দেশ্যে লোকের উপর জ্বর প্রভৃতি রোগ, যোগ করিয়া দেওয়া হয়। জ্বরের সন্তাপে পাপ এমন ভাবে পরিষ্কার হইয়া যায়, যেমন বরফ হইতে ধূলা মাটী দূর হইয়া থাকে।" মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি পাপ-মুক্তির প্রত্যাশায় শারীরিক রোগ ও আর্থিক বিপদ সন্তুষ্ট চিত্তে সহ্য না করে সে জ্ঞানী নহে।" মহাত্মা হজরৎ মুছা নবী এক রোগীকে দেখিয়া আল্লার দরবারে তাহার প্রতি দয়া ভিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রত্যাদেশ—হইয়াছিল—"আর কোন্ প্রকারে তাহার উপর অধিক দয়া করিতে পারি? আমি তাহার সঙ্গে রোগ, যোগ করিয়া দিয়া তাহার পাপ দূর করিয়া দিতেছি

এবং

এবং সেই উপায়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি দিতেছি।" ষষ্ঠ কারণ—স্বাস্থ্য হইতে মোহ গর্ব্বাদি উৎপন্ন হয়, এই বিশ্বাস। যে রোগী হৃদগত-ভাবে বুঝিতে পারিয়াছে যে শরীর সুস্থ থাকিলে মনে মোহ, গর্ব্ব ও অবাধ্যতা আদি আসিয়া রাশীকৃত হয়, সে ব্যক্তি সর্ব্বদা শরীরে রোগ পুষিয়া রাখিতে বাসনা করেন। রোগ সর্ব্বদা শরীরে রাখিলে মনে মোহাদি দোষ প্রবেশ করিতে পারে না।

আল্লা যাহার মঙ্গল কামনা করেন, তাহাকে রোগ-শোক দ্বারা সর্ব্বদা পরকালের জন্য প্রস্তুত থাকিতে সতর্ক করিয়া দেন।

রোগের মধ্যে মঙ্গল নিহিত

১। এই কারণে জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—"অভাব, রোগ ও লাঞ্ছনা এই তিন দ্রব্যের কোন একটী হইতে মুছলমান লোক পরিত্রাণ পায় নাই।" ২। হদীছ শরীফে কথিত আছে—আল্লা বলিয়াছেন—"রোগ আমার 'কয়েদ'; দরিদ্রতা আমার 'কয়েদখানা'; যাহাদিগকে আমি নিতান্ত ভাল বাসি, তাহাদিগকে 'কয়েদ' করিয়া 'কয়েদখানায়' রক্ষা করিয়া থাকি।" যাহা হউক, শরীরের স্বাস্থ্য, মানবকে পাপের দিকে টানিয়া লয়। রোগ হইলে, পাপের দিকে যাইবার উপায় থাকে না, সুতরাং রোগের মধ্যে মঙ্গল নিহিত আছে। ৩। মহাত্মা আলী করমুল্লা, এক সম্প্রদায় লোককে বেশভূষায় সজ্জিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'ইহা কি?' অপর লোকে বলিয়াছিল—"অদ্য এই সম্প্রদায়ের 'ঈদ-উৎসব।'" মহাত্মা বলিয়াছিলেন—"যে দিন পাপ কার্য্য না করা হয় তাহাই আমাদের 'ঈদের' দিন।" ৪। এক জ্ঞানী ব্যক্তি অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'তুমি কেমন আছ?' সে বলিয়াছিল, 'বেশ ভাল আছি।' জ্ঞানী ব্যক্তি বলিলেন—'তুমি যে দিন পাপ কার্য্য না কর বাস্তবিক সেই দিন তুমি ভাল থাক; যে দিন পাপ কার্য্য ঘটে সে দিন তুমি গুরুতর পীড়া গ্রস্ত।' বাস্তবিক পাপ অপেক্ষা গুরুতর পীড়া আর নাই। ৫। জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—"ফেরআওন চারি শত বৎসর জীবিত ছিল; সেই দীর্ঘকাল মধ্যে তাহার কোন রোগ হয় নাই, এমন কি সামান্য মাথার বেদনাও হয় নাই। এই কারণে সে নিজকে 'আল্লা' বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। যদি তাহার মাথায় ঘণ্টা খানিক আধ-কপালী বেদনা থাকিত, তবে কখনই সে তদ্রূপ অসম্ভব দাবী করিতে পারিত না।" ৬। জ্ঞানী লোকেরা ইহাও বলিয়াছেন—"লোকে পীড়িত হইয়াও যদি 'তওবা' না করে, তবে মৃত্যুরাজ আজ্রাইল-ফেরেশ্তা বলিয়া থাকেন—ওহে অসাবধান! আমি কয়েকবার

তোমার প্রাণ হরণের অভিপ্রায়ে তোমার নিকট অগ্রদূত পাঠাইয়াছি,তথাপি তোমার কোন উপকার হইল না!” ৭। অপর জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন—“বিশ্বাসী মুছলমান, চল্লিশ দিন ধরিয়া দুশ্চিন্তা, রোগ, ভয়, ক্ষতি হইতে মুক্ত থাকে, ইহা করুণাময় আল্লা পছন্দ করেন না।” ৮। “মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) এক রমণীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, লোকে সেই রমণীর প্রশংসা স্থলে ইহাও বলিয়াছিল, প্রস্তাবিত রমণীর কোন দিন কোনও পীড়া হয় নাই। তিনি বলিয়াছিলেন তদ্রূপ রমণীর প্রয়োজন নাই।” ৯। একদিন হজরৎ শিরঃপীড়া সম্বন্ধে কথা বলিতেছিলেন, এমন সময়ে এক পল্লীবাসী অসভ্য আরব বলিয়া উঠিল—“হে রসুলুল্লা! শিরঃপীড়া কি বস্তু আমি বুঝিতে পারিলাম না। শিরঃপীড়া দূরে থাকুক আমার শরীরে অন্য কোন পীড়াও কখন হয় নাই।” হজরৎ বলিলেন—“তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও। দোজখী লোক দেখিবার যাহাদের ইচ্ছা থাকে, তাহাদিগকে বল, যাহার কোনও দিন রোগ হয় নাই তাহাকে যেন দেখে।” ১০। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) সমীপে একদা মহামাননীয়া হজরৎ বিবী আয়েশা ছিদ্দীকা নিবেদন করিয়াছিলেন—“হে রসুলুল্লা—ধর্ম্মযুদ্ধ-জেহাদে-হত শহীদ লোকের তুল্য পুণ্যের অধিকারী কি অন্য কেহ হইতে পারে?” হজরৎ বলিয়াছিলেন—“হাঁ হইতে পারে। যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে ২০ বিশ বার মৃত্যু চিন্তা করে।” পীড়িত লোকেরা দিবসে বিশ বারেরও অধিক মৃত্যু চিন্তা করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সকল কারণে কতকগুলি লোক, ঔষধ ব্যবহার করেন নাই। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) পয়গম্বরদিগের শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন, তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকার ফল পাইবার জন্য শরীরে রোগ পুষিয়া রাখিবার তাঁহার প্রয়োজন ছিল না বলিয়া রোগ দূর করিতে ঔষধ ব্যবহার করিতেন। যাহা হউক ফল কথা এই—পীড়ার প্রকাশ্য কারণ দেখিয়া, তাহা হইতে আত্ম-রক্ষা করা ‘তওয়াক্কোলের’ বিরোধী নহে।

মড়কের স্থানে গমন বা তথা হইতে পলায়ন অনুচিত। মহাত্মা হজরৎ ওমর ফারুক এক সময়ে শাম দেশে যাইতেছিলেন। পথে সংবাদ পাইলেন তথায় সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সঙ্গীদের মধ্যে কেহ কেহ তথায় যাইতে অসম্মত হইলেন, আর কতকগুলি লোক বলিতে লাগিলেন—‘আল্লার বিধান হইতে পলাইব কোথায়?’ মহাত্মা ওমর বলিলেন—“আমরা আল্লার বিধিবদ্ধ নিয়ম অবলম্বনে তাঁহার বিধানের দিকেই

দ্রুত যাইব।" তৎসঙ্গে ইহাও বলিলেন—"মনে কর তোমাদের দুই পার্শ্বে দুটী মাঠ আছে। তন্মধ্যে একটী শ্যামল-শস্য-পরিপূর্ণ, স্বচ্ছ-সরোবর-বিরাজিত এবং অন্যটী তৃণ-লতা-পরিশূন্য শুষ্ক কঙ্করময়; এমন স্থলে রাখাল যে মাঠে পশু চরাইতে যায় তাহা আল্লার নির্দ্ধারিত বিধানের অন্তর্গত।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া হজরৎ ওমর মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করিলেন। সভাস্থলে মহাত্মা আব্দুর রহমান এব্‌নে আউফের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন— 'আমি মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) এর পবিত্র মুখে শুনিয়াছি; তিনি বলিয়াছেন—"যদি তোমরা শুনিতে পাও যে, অমুক স্থানে মড়ক লাগিয়াছে, তবে তথায় যাইবে না। আর তোমাদের অবস্থিতি স্থানে মড়ক লাগিলে, ভয়ে তথা হইতে পলাইবে না।"' মহাত্মা ওমর এই কথা শুনিয়া আল্লার প্রশংসাবাদ পাঠ করিয়া বলিলেন আমার অভিপ্রায় তবে হদীছের অনুমোদিত। সভাস্থলে অন্যান্য ছাহাবাগণও শাম দেশে না যাইবার পক্ষে একমত হইয়াছিলেন।

মড়কের স্থান হইতে সুস্থ লোকের পলায়ন দ্বিবিধ কারণে নিষিদ্ধ—মড়কের স্থান হইতে, দুই কারণে পলায়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। **প্রথম** কারণ এই যে, সবল ও সুস্থ লোক, তথা হইতে চলিয়া গেলে, সেবা শুশ্রূষার অভাবে পীড়িত লোকের দুরবস্থার সীমা থাকে না। **দ্বিতীয়** কারণ এই যে, মড়ক-স্থানের দূষিত 'আব হাওয়া' সুস্থ লোকের দেহেও প্রবেশ করে। পীড়ার প্রভাব শরীরের মধ্যে ধারণ করিয়া অন্যত্র যাওয়াও বৃথা। হদীছের অন্য বচনে, মড়ক-স্থান হইতে পলায়ন, আর কাফেরের ভয়ে যুদ্ধ স্থল হইতে পলায়ন, উভয়ই সমান বলিয়া কথিত হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে অবস্থার সমতা আছে। রণস্থল হইতে পলায়ন করিলে অবশিষ্ট যোদ্ধার উৎসাহ ভাঙ্গিয়া যায় এবং আহত সৈন্যের প্রাণ হতাশে ডুবিয়া পড়ে। মারিভয়াক্রান্ত স্থান হইতে সুস্থ লোকের পলায়নও তদ্রূপ—পীড়িতের হতাশাবর্দ্ধক; যে সকল লোক তথায় রহিয়া যায় তাহাদের সাহস ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং অসহায় রোগীদের পথ্য পাইবার উপায় থাকে না; কাজেই রোগীদিগকে অশেষ দুর্গতি ভোগ করিয়া বিনাশ পাইতে হয়। অপর পক্ষে, পলাতক লোকেরও রক্ষা পাওয়াও সন্দেহমূলক থাকে; কেননা মারিভয়াক্রান্ত স্থানে থাকার সময়ে তাহাদের শরীরে পীড়ার 'কারণ' গুলি পূর্ব্ব হইতে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিয়া থাকে। নূতন স্থানে গেলেও সেই রোগ তথায় প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে।

মড়ক-স্থান হইতে পলায়ন, রণ-স্থল হইতে পলায়ন তুল্য

রোগ-গুপ্তি মঙ্গলকর, কিন্তু অবস্থাবিশেষে প্রকাশ অন্যায় নহে। পাঠক ! জানিয়া রাখ—রোগ, দরিদ্রতা ও অন্যান্য বিপদ, গোপনে রাখা অতীব মঙ্গলকর। তাহাতে আল্লার বিধানে সন্তুষ্টি প্রকাশ পায়। আল্লার সঙ্গে মানবের যত কর্ত্তব্য কার্য্য আছে তন্মধ্যে তাঁহার প্রদত্ত বিপদ, গোপন করার ন্যায় আর কিছু মহৎ কার্য্য নাই। তথাপি অবস্থা বিশেষে, সাধু-সঙ্কল্পে কখন কখন রোগের কথা প্রকাশ করায় ক্ষতি নাই।

রোগ, দরিদ্রতা ও বিপদ-গুপ্তি তুল্য-মঙ্গলকর

রোগের কথা প্রকাশ করা কখন সঙ্গত? নিম্নলিখিত তিনটী সঙ্কল্প (নীয়ৎ) বিদ্যমান থাকিলে রোগের কথা প্রকাশ করা যায়। প্রথম—রোগ নির্ণয়ান্তে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগের সুবিধা হইবে, এই আশায় চিকিৎসকের সম্মুখে রোগের অবস্থা খুলিয়া বলা সঙ্গত। মহাত্মা বশর হাফী চিকিৎসকের সম্মুখে নিজের শরীরের অবস্থা বর্ণনা করিতেন। মহাত্মা ইমাম আহ্মদ এব্নে হম্বলও পীড়ার অবস্থা খুলিয়া বলিতেন এবং স্বীয় উদ্দেশ্য এই বলিয়া জ্ঞাপন করিতেন যে—"আল্লার ক্ষমতা যতটুকু আমার মধ্যে নূতন ভাবে প্রবেশ করিয়া শরীরে অবস্থান্তর ঘটাইয়াছে, সুধু সেইটুকু প্রকাশ করিতেছি।" দ্বিতীয়—'রোগ শোকাদি আল্লার প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ দান' ইহা বিশ্বাস করিয়া আল্লার উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ধন্যবাদ দিবার অভিপ্রায়ে, রোগের বিষয় উল্লেখ করা সঙ্গত। তজ্জন্য এরূপ বাক্যে রোগের কথা প্রকাশ করিতে হয়, যাহা শুনিলে অপর লোকের মনে সহ্য করিবার ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইতে পারে এবং রোগের জন্য আল্লার প্রতি ধন্যবাদও দিতে পারে। মহাত্মা হছন বছরী বলিয়াছেন—আল্লার প্রশংসা সহ ধন্যবাদ দিয়া পরে রোগের কথা প্রকাশ করতঃ সন্তোষ প্রকাশ করিলে, আল্লার নিন্দা করা হয় না, বরং তাহা ধন্যবাদ রূপে গণ্য হইতে পারে। তৃতীয়—এক পক্ষে নিজের অসহায়তা, দুর্ব্বলতা, প্রকাশার্থ ও অপর পক্ষে আল্লার নিকট নিজের অভাব অভিযোগ জ্ঞাপনার্থ রোগ প্রকাশ করা সঙ্গত। যে ব্যক্তি শক্তি সামর্থ্যে বিখ্যাত ও বীরত্বে দিগ্‌বিজয়ী তাহার পক্ষে এই উদ্দেশ্যে স্বীয় রোগের কথা অন্যকে জানান অতি উত্তম। (টীঃ ৪৩৮) মহাত্মা আলী করমুল্লা একদা পীড়িত ছিলেন।

—ত্রিবিধ সঙ্কল্প বিদ্যমান থাকিলে সঙ্গত

টীকা—৪৩৮। পূর্ব্ববর্ত্তী-পারার প্রথম হইতে টীকা চিহ্ন পর্য্যন্ত অংশ ঠিক মূল গ্রন্থের অনুবাদ নহে। মূল গ্রন্থ এই স্থানে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও দুর্ব্বোধ্য এইজন্য 'এহ্ইয়া-অল-উলুম' দৃষ্টে কিছু বিস্তার করিয়া দেওয়া গেল।

লোকে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসার্থ বলিয়াছিল—"আপনি ভাল আছেন তো?" তিনি বলিয়াছিলেন—"না, ভাল নহি।" এই উত্তর শুনিয়া পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা আশ্চর্য্য ভাবিয়া একে অপরের মুখ দেখিতে লাগিল। (টীঃ ৪৩৯) তাহাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—'অমোঘ ক্ষমতাশালী আল্লার সম্মুখে বাহাদুরী প্রকাশ করা কি যায়? বরং অসহায়তা ও দুর্ব্বলতা প্রকাশ করা আবশ্যক।' মহাত্মা আলীর ন্যায় জগৎ বিখ্যাত বীর পুরুষের পক্ষে দৌর্ব্বল্য প্রকাশ উত্তম কথা। তিনি আল্লার দরবারে সর্ব্বদাই 'ছবর' পাইবার প্রার্থনা করিতেন। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—"তোমরা আল্লার স্থানে মঙ্গল ও স্বাস্থ্য প্রার্থনা কর—বিপদ আপদ প্রার্থনা করিও না।"

রোগের কথা প্রকাশ করা কখন হারাম? যাহা হউক, কোনও সঙ্গত কারণ না থাকিলেও যদি রোগের সংবাদ অন্যাকে এমন প্রকারে শুনান হয় যাহাতে মনের দুঃখ প্রকাশের সহিত অভিযোগও প্রকাশ পায় তবে উহা 'হারাম' হইবে। অভিযোগ প্রকাশ না পাইলে উহা সঙ্গত হইতে পারে তথাপি রোগের কথা প্রকাশ না করা অতি উত্তম কথা; কেননা রোগের অবস্থা যতটুকু প্রকাশ পাইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তদপেক্ষা অধিক প্রকাশ পাইলে কখন কখন অপর লোক উহাকে অভিযোগ প্রকাশ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারে। জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—"রোগের সময় চীৎকার ও ক্রন্দন করা উচিত নহে—তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করা বুঝা যায়। মহাত্মা হজরৎ আয়ুব নবী দীর্ঘ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করেন, সেই সময় আল্লার দরবারে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। সেই ক্রন্দনকে শয়তান দুঃখ প্রকাশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল, তদ্‌ভিন্ন উহাকে অভিযোগ ও তওয়াক্কোল-শূন্যতা বা অন্য কোন ভাব বলিয়া আরোপ করিতে পারে নাই। মহাত্মা ফজীল আইয়াজ, বশর হাফী, ওহাব এব্‌নে অল-ওয়ারদ প্রভৃতি জ্ঞানী লোক পীড়ার সময়ে স্ব স্ব গৃহ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতেন—তাঁহাদের পীড়ার সংবাদ অপর লোকের কর্ণগোচর হইবার পথ ঘাট বন্ধ করিয়া

—কথায় বা ক্রন্দনে মনের দুঃখ ও অভিযোগ প্রকাশের উদ্দেশ্য থাকিলে 'হারাম'

টীকা—৪৩৯। মুছলমান সমাজে একজন অপরের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে সর্ব্বপ্রথমে আল্লার প্রশংসা ও ধন্যবাদ দিয়া পরে অন্য কথা বলা রীতি আছে। এ রীতির উদ্দেশ্য এই যে—রোগ, শোক বিপদের সংবাদ অপরকে শুনাইলে আল্লার নিন্দা করা হয়। মহাত্মা আলী করমুল্লার ন্যায় লোকের মুখে আল্লার নিন্দা, অনুমান করিয়া লোকেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়াছিল।

দিতেন। তাঁহারা বলিতেন পীড়িত হইয়া এমন ভাবে পড়িয়া থাকা উচিত, যেন অন্য লোক রোগের তত্ত্ব লইবার সুযোগও না পায়।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রেম, অনুরাগ ও প্রসন্নতা।

محبت شوق و رضا

মহব্বৎ—প্রেম, শওক—অনুরাগ ও রেজা—প্রসন্নতা।

আল্লার প্রতি প্রেম—হৃদয়ের একটী উন্নত মোকাম— প্রিয় পাঠক! জানিয়া লও, আল্লার প্রতি প্রেম, হৃদয়ের একটী অতীব উচ্চতম 'মোকাম' (স্থান)। তথায় উপস্থিত হইবার পরে আরও বহু সংখ্যক উন্নত স্থান সম্মুখে উপস্থিত হয়—তাহা একাদিক্রমে পার হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির দিকে চলিতে হয়। 'বিনাশন পুস্তকে' যে সকল কথা লিখা গিয়াছে তৎসমুদয় মানবকে 'আল্লার প্রেম' হইতে বঞ্চিত করে; সুতরাং তৎসমুদয় দোষ বা অন্তরায় হইতে হৃদয় পবিত্র করিবার উপায়ও তৎ তৎ স্থানে লিখিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে 'পরিত্রাণ পুস্তকে' 'তওবা', 'ছবর', 'শোকর' 'বৈরাগ্য' ভয়, আশা প্রভৃতি যে কয়েকটী বিষয় লিখা গিয়াছে, সে কয়েকটী এই প্রেমের পূর্ব্ববর্ত্তী সোপান বা ইহারই উপকরণ মাত্র। অতঃপর 'অনুরাগ' ও 'প্রসন্নতা' বলিয়া যে দুটী বিষয় লিখিত হইবে তাহা প্রেমেরই ফল। আল্লার প্রতি ভালবাসার তারতম্য অনুসারে মানবের সৌভাগ্য পরিমিত হয়। তাঁহার প্রেম যখন প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া সমস্ত হৃদয়-রাজ্য জুড়িয়া লয়, তখন মানবের পূর্ণ সৌভাগ্য উদয় হয়। প্রেমের সেরূপ উন্নত-অবস্থা, সাধারণতঃ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; তথাপি মানুষ স্বভাবতঃ যে যে পদার্থ

আল্লার প্রেমের অন্তরায়, উপকরণ ও ফল

ভালবাসে তৎসমুদয়ের ভালবাসা অপেক্ষা আল্লার প্রতি ভালবাসা সর্ব্বাপেক্ষা গাঢ়তম ও প্রবলতম হইলেও 'আল্লার প্রেম' বলিবার যোগ্য হইতে পারে।

আল্লার প্রতি প্রেমকে কেহ কেহ কঠিন ও অসম্ভব বলে। 'আল্লার প্রেম' কিরূপ পদার্থ তাহা জানিতে পারা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। এই কারণে তর্কশাস্ত্রের পণ্ডিতদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর পণ্ডিত 'আল্লার প্রতি প্রেম'কে অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা যুক্তি প্রয়োগে সাব্যস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে—"সম শ্রেণীস্থ পদার্থ ভিন্ন অন্য বস্তুকে মানব ভালবাসিতে পারে না। আল্লা মানুষের সম শ্রেণীস্থ পদার্থ নহেন; অতএব আল্লার প্রতি ভালবাসা কি প্রকারে জন্মিতে পারে?" এই কথা বলিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন—'আল্লার প্রতি ভালবাসার অর্থ কেবল 'তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করা।' যাঁহারা আল্লার প্রতি প্রেমের অর্থ উক্ত প্রকার করেন; তাঁহারা ধর্ম্মের মূল নির্ণয় করিতে পারেন নাই। এ কথার ব্যাখ্যা বিস্তৃত ভাবে করা আবশ্যক। প্রথমে আমরা আল্লার প্রেম সাব্যস্থ করিতে চেষ্টা করিব—পরে 'শরীঅৎ' অনুযায়ী প্রমাণ দিব, পশ্চাৎ প্রেমের পরিচয় এবং তৎসম্পর্কিত বিধান গুলি বর্ণনা করিব।

আল্লার প্রতি প্রেমের মাহাত্ম্য—আল্লার প্রতি ভালবাসা মানবের প্রতি 'ফরজ'; একথা সকল একেশ্বরবাদী ও মুছলমান লোক মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ১। স্বয়ং আল্লাও বলিয়াছেন—

يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهٗ —কোরআন বচন

"আল্লাকে লোকে ভাল বাসিলে, আল্লাও তাহাদিগকে ভাল বাসিবেন।" (৬ পারা। সূরা মায়দা। ৮ রোকু) * * * ২। অন্যত্র আল্লা বলিয়াছেন—

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ

وَ اِخْوَانُكُمْ

"হে রসুল! বল—যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী, জ্ঞাতিবর্গ, ধন (ইত্যাদি) তোমাদের মনে, আল্লা ও রসুল অপেক্ষা ভাল লাগে, তবে দাঁড়াও আল্লার আদেশ আসা পর্য্যন্ত প্রস্তুত থাক—কি হইতেছে দেখ।" (১০ পারা। সূরা তওবা। ৩ রোকু)।

১। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ ও বলিয়াছেন—'মানুষ যে পর্য্যন্ত আল্লা ও তাঁহার রসুলকে সর্ব্ববিধ পদার্থ অপেক্ষা অধিক ভাল না বাসিতে পারে, সে পর্য্যন্ত তাঁহার ঈমান মজবুৎ হয় না।' ২। একদা কতকগুলি লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'ঈমান কাহাকে বলে?" তিনি বলিয়াছিলেন—"আল্লা ও রসুলকে সর্ব্ববিধ পদার্থ অপেক্ষা অধিক ভালবাসা।" ৩। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"মানুষ যে পর্য্যন্ত স্বীয় পরিবারবর্গ, স্বর্ণ রৌপ্য, ধন মান ও সমস্ত পৃথিবী অপেক্ষা আল্লা ও রসুলকে অধিক ভাল না বাসে সে পর্য্যন্ত সে 'ঈমানদার' হইতে পারে না।" (টীঃ ৪৪০) ৪। এক ব্যক্তি মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ এর সমীপে নিবেদন করিয়াছিল—"হে রসুলুল্লা, আমি আপনাকে ভাল বাসিয়া থাকি।" তিনি বলিলেন—"তবে দরিদ্রতা সহ্য করিতে প্রস্তুত থাক।" সে ব্যক্তি পুনরায় বলিল—"আমি আল্লাকেও ভালবাসি।" তখন তিনি বলিলেন "তবে বিপদ সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হও।" ৫। হদীছ শরীফে উক্ত আছে—যে সময়ে মহাত্মা হজরৎ এব্রাহীম খলীলের প্রাণ হরণে যম-রাজ আজরাইল উদ্যত হইয়াছিলেন তখন তিনি আজরাইলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বন্ধু কি বন্ধুর প্রাণ বিনাশ করে, ইহা কি তুমি দেখিয়াছ?" ইতিমধ্যে প্রত্যাদেশ আসিল—"বন্ধু কি বন্ধুর সন্দর্শনে অসন্তুষ্ট হয়, ইহা কি তুমি দেখিয়াছ?" ইহা শুনিয়া নবী মহোদয় আজরাইলকে প্রাণ বাহির করিয়া লইবার অনুমতি দিয়াছিলেন। ৬। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ আল্লার সমীপে যে সকল প্রার্থনা করিতেন—তন্মধ্যে ইহাও একটী প্রার্থনা—

—হদীছ বচন

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ اَحَبَّكَ

وَحُبَّ مَا يُقَرِّبُنِيْ اِلٰى حُبِّكَ وَاجْعَلْ

حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ ○

"হে আল্লা! তোমার প্রতি প্রেম, তোমার প্রিয়জনের প্রতি প্রেম, এবং

টীকা—৪৪০। এই প্যারার প্রথম হইতে টীকা চিহ্ন পর্য্যন্ত অংশটী মূল গ্রন্থে পূর্ব্ববর্ত্তী প্যারার অন্তর্গত তারকা চিহ্নিত স্থানে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা হইল।

যে বস্তু আমা কে তোমার প্রতি আসক্ত করিতে পারে তাহার প্রতি প্রেম আমার প্রাণের পুষ্টিকর খাদ্য কর, এবং শীতল জল যেমন তৃষ্ণাতুরের পক্ষে প্রিয় তদপেক্ষা তোমার প্রেম আমার নিকট প্রিয়তম কর।" ৭। আরবের পল্লী-বাসী একজন অসভ্য লোক মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (সাঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"হে রসুলুল্লা, মহাবিচারের নিমিত্ত উত্থান কবে হইবে?" হজরৎ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেই ভীষণ দিনের জন্য কি সঞ্চয় করিয়াছ?" সে ব্যক্তি নিবেদন করিল—"হে রসুলুল্লা! নমাজ রোজার সম্বল আমার অধিক নাই; তবে আল্লা ও আল্লার রসুলকে আমি ভালবাসি।" হজরৎ বলিলেন—"যাহাকে তুমি ভালবাস পরকালে তাহার সঙ্গে তুমি থাকিবে।"

১। মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী ভ্রমণ করিতে করিতে এক সম্প্রদায় লোকের মধ্যে উপস্থিত হন; তাহাদিগকে দুশ্চিন্তা-পরায়ণ, পরিশ্রান্ত ও দুর্ব্বল দেখিয়া, তাহাদের উপর কিরূপ বিপদ নিপতিত হইয়াছে জিজ্ঞাসা করেন; তাহারা বলিয়াছিল—"আল্লার শাস্তির ভয়ে, তাহাদের দেহ গলিয়া গিয়াছে।" পয়গম্বর মহোদয় বলিয়াছিলেন—"আল্লার উপর তোমাদের দাবী আছে যে, তিনি তোমাদিগকে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ করিবেন।" অনন্তর তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হন তাহাদিগকে তদপেক্ষা অধিক দুশ্চিন্তান্বিত ও দুর্ব্বল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের উপর কি প্রকার বিপদ পতিত হইয়াছে? তাহারা বলিল 'বেহেশ্‌ৎ' পাইবার লোভে তাহাদিগকে এই দশায় আনিয়াছে। নবী মহোদয় বলিয়াছিলেন—"আল্লার উপর তোমাদের দাবী আছে তিনি তোমাদিগের আশা পুরা করিবেন।" পরিশেষে তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিন্তান্বিত ও অধিক ভয়-জর্জ্জরিত ও দুর্ব্বল দেখিলেন কিন্তু তাহাদের বদন মণ্ডল উজ্জ্বল দর্পণের ন্যায় ঝক্‌মক করিতেছিল। তাহাদের দুর্গতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিয়াছিল—আল্লার প্রেমে তাহারা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া নবী মহোদয় তাহাদের মধ্যে গিয়া উপবেশন করতঃ বলিতে লাগিলেন—"তোমরা আল্লার প্রিয়তম সহচর; তোমাদের সহিত থাকিতে আমার প্রতি আদেশ আছে।" (টীঃ ৪৪১) ২। মহাত্মা আবুবকর ছিদ্দীক

—মহাজন উক্তি

টীকা—৪৪১। এই প্যারার প্রথম হইতে টীকা চিহ্ন পর্য্যন্ত অংশটী মূলগ্রন্থে এই প্যারার

বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি আল্লার 'খালেছ' প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছে সে সংসার হইতে বিমুখ হইয়াছে, এবং মানবীয় কার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়াছে।" ৩। মহাত্মা হছন বছরী বলিয়াছেন—"আল্লাকে চিনিলে আপনা আপনি তাঁহাকে ভাল বাসিতে হয়; দুনিয়াকে চিনিলে আপনা আপনি তাহাকে ক্ষতিকর শত্রু বলিয়া ঘৃণা জন্মে। মুছলমান লোক 'গাফেল' না হইলে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, সুতরাং নিরুদ্বেগ হইতেও পারেনা। কেননা যত চিন্তা করিবে ততই সতর্ক হইতে হইবে এবং ততই ভয়-মিশ্রিত দুঃখ পাইতে হইবে।" * * * ৪। মহাত্মা ছর্‌রী ছকতী বলিয়াছেন—"পরকালে বিচারের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের পয়গম্বরের নামের সঙ্গে যোগ করিয়া আহ্বান করা হইবে, যথা, হে অমুক—মুছার ওম্মৎ, হে অমুক—ঈছার ওম্মৎ, হে অমুক—মোহাম্মদের ওম্মৎ; কিন্তু আল্লার প্রেমিকদিগকে বলা হইবে—'হে আল্লার বন্ধু! নিকটে আইস।' এরূপ সদয় আহ্বান শ্রবণে তাহাদের মন নিতান্ত প্রীত হইবে।" ৫। কোন কোন পয়গম্বরের গ্রন্থে লিখিত আছে—"হে মানব! তুমি আমাকে ভালবাস বলিয়া আমিও তোমাকে ভালবাসি—কেননা তুমি ভালবাসিলে তোমাকে ভালবাসা আমার কর্ত্তব্য।"

প্রেমের পরিচয়। পাঠক! জানিয়া রাখ, আল্লার প্রতি প্রেম বাস্তবিক এক মহা কঠিন কার্য্য। এই কারণে এক সম্প্রদায়স্থ পণ্ডিত বলিয়াছেন—'আল্লার-প্রতি-ভালবাসা-জন্মা নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার।' যাহা হউক, এরূপ কথার অর্থ বড়ই সূক্ষ্ম—সর্ব্বসাধারণ লোক ইহার মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম। এই জন্য ইহার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। পরিচয় দিতে গেলে দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি তৎপ্রতি মনোযোগ দিবেন তিনিই সহজে বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

পাঠক! ভালবাসার মূল কি, তাহাই সর্ব্ব প্রথমে জানিতে হইবে।

ভালবাসা, প্রেম বা আসক্তি, ও বিদ্বেষ কি?

যাহাকে ভাল বলিয়া বুঝা যায় তাহার প্রতি মনের এক প্রকার টান জন্মে; সেই টানকে ভালবাসা বলা যায়। সেই টান, বিশেষ প্রবল হইলে প্রেম বা আসক্তি নাম প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, যে দ্রব্য মন্দ বলিয়া বুঝা যায় তাহার প্রতি স্বভাবতঃ মনের মধ্যে এক প্রকার ঘৃণা জন্মে; তাহাকে বিদ্বেষ বলা যায়। যে বস্তুকে

অন্তর্গত পারবর্তী তারকা চিহ্নিত স্থানে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা হইল

ভাল মন্দ বলিয়া বুঝিবার উপায় নাই—তথায় আসক্তি বা বিদ্বেষ কিছুই থাকে না। এখন জানা আবশ্যক—'ভাল মন্দ' জ্ঞান কেমন করিয়া উৎপন্ন হয়। এ কথা বুঝিবার অগ্রে জানা আবশ্যক, মানব-প্রকৃতির সঙ্গে যাবতীয় পদার্থের তিন প্রকার সম্বন্ধ আছে। কতকগুলি পদার্থ, প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষার অনুযায়ী, বরং প্রকৃতি স্বয়ং তাহা চায় এবং পাইলে চরিতার্থ হয়—সেই প্রকার পদার্থকে ভাল দ্রব্য বলে। আর কতকগুলি পদার্থ আছে তাহা প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষার বিপরীত, বরং প্রকৃতি কখনই তাহা লইতে চায় না। যদি তাহা কোন ক্রমে আসিয়া জোটে, তবে দূর করিয়া দিতে ব্যস্ত হয়—তদ্রূপ পদার্থকে মন্দ দ্রব্য কহে। এই উভয় পদার্থের মধ্যবর্ত্তী আর এক শ্রেণীর পদার্থ আছে, তাহা প্রকৃতির অনুকূলও নহে—প্রতিকূলও নহে অর্থাৎ মন তাহা পাইতেও চায় না বা দূর করিতেও চায় না—তদ্রূপ পদার্থ ভালও নহে মন্দও নহে।

পাঠক! এখন ভাবিয়া দেখ, কোনও পদার্থ প্রকৃতির অনুযায়ী কি না, ইহা প্রথমে জানিতে হইবে। কোন্ পদার্থ কিরূপ, তাহা জানিতে হইলে অগ্রে পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। পাঁচ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির দ্বারা পদার্থগুলির গুণ দোষাদি জানা যায়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অধিকার পৃথক পৃথক বিষয়ের উপর স্থাপিত। যে বিষয়ের উপর যে ইন্দ্রিয়ের অধিকার আছে, তাহা পাইলে সে ইন্দ্রিয়ের পৃথক তৃপ্তি বোধ হয়। যে পদার্থ হইতে কোন না কোন এক ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি লাভ হয়, সেই দ্রব্য ভাল লাগে। ইহার অর্থ এই যে, মানব-স্বভাব তখন সেই দিকে ঝুকিয়া পড়ে। সুন্দর আকৃতি, শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র, স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী দর্শনে চক্ষুর তৃপ্তি জন্মে। কর্ণের তৃপ্তি কিন্তু সুমিষ্ট স্বর শ্রবণে; নাসিকার তৃপ্তি, সুগন্ধ আঘ্রাণে; রসনার তৃপ্তি, সুমিষ্ট দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণে; এবং ত্বকের তৃপ্তি, কোমল দ্রব্যের স্পর্শনে লব্ধ হয় বলিয়া ঐরূপ দ্রব্য মনুষ্য-প্রকৃতির সুখ উৎপন্ন করে এবং তজ্জন্যই ঐ সকল দ্রব্য মানুষের মনে ভাল লাগে। এইরূপ তৃপ্তি, চতুষ্পদ জন্তুগণও ভোগ করিতে পায়।

মানবের অন্তরে আর একটী ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে; তাহার নাম বুদ্ধি, বিবেক বা আলোক অথবা ঐরূপ যে কোন শব্দে উহার নাম করণ করিতে পার। উহারই কারণে মানুষ, পশু হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়। পূর্ব্বোক্ত পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পৃথক পৃথক পরিতৃপ্তি পাইবার ভূমির কথা উপরে দেখান গেল

এই অন্তরিন্দ্রিয় বুদ্ধিরও তৃপ্তি পাইবার বিষয় বা ভূমি আছে। সেই বিষয় বা ভূমি বুদ্ধির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে বুদ্ধি তাহার আলোচনায় পরম তৃপ্তি পাইতে পারে। এই অর্থে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) বলিয়াছেন—"মহাপ্রভু আল্লা ইহসংসারে তিন পদার্থ আমার প্রিয় করিয়া দিয়াছেন—(১) স্ত্রীজাতি, (২) সুগন্ধি দ্রব্য; (৩) নমাজ। নমাজে আমার চক্ষু-পুত্তলী শীতল হয়।" নমাজ হইতে তিনি পরম তৃপ্তি প্রাপ্ত হইতেন—বলিয়া উহার আসন অতি উচ্চে স্থাপন করিয়াছেন। যাহারা আকারে মানুষ, কিন্তু স্বভাবে চতুষ্পদ, এবং অন্তর রাজ্যের কোন আশ্চর্য্য অবস্থা অবগত নহে এবং নিজের শরীর ভিন্ন আর কিছু জানে না, সে ব্যক্তি নমাজকে উত্তম বস্তু বলিতে বা নমাজকে ভালবাসিতে কখনই পারিবে না। কিন্তু যাহার অন্তরে বুদ্ধি অতীব প্রখর এবং যিনি পশু স্বভাবের সীমা অতিক্রম করিয়া উৰ্দ্ধে উঠিয়াছেন, তিনি আল্লার অনন্ত সৌন্দর্য্য এবং আশ্চর্য্য শিল্প-কৌশল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং তাঁহার স্বভাব ও গুণের প্রভাব অনুভব করিয়া যে প্রকার পরিতৃপ্ত হন, বাহিরের চর্ম্মচক্ষে, সুন্দর পদার্থ, শ্যামল-শস্যক্ষেত্র ও মনোহর স্রোতস্বতী দর্শনে তত পরিতৃপ্তি কখনই পাইতে পারেন না। বাহ্য জগতের সৌন্দর্য্য, চর্ম্মচক্ষে দেখিতে যেরূপ ভাল লাগে, আল্লার অস্তিত্ব দর্শনে এবং তাঁহার কারুকার্য্যের সৌন্দর্য্য দর্শনে তদপেক্ষা শত সহস্রগুণ অধিক আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া যায়। আল্লার আধ্যাত্মিক জগতের সৌন্দর্য্য, জ্ঞান-চক্ষে উদ্ভাসিত হইলে, যে প্রকার অপূর্ব্ব তৃপ্তি পাওয়া যায় তাহার নিকট অন্যান্য সমস্ত তৃপ্তি নিতান্ত তুচ্ছ ও অপদার্থ।

প্রেমোৎপত্তির কারণ—যে সকল কারণে প্রেম উৎপন্ন হয় তাহা বুঝিতে পারিলে সহজেই জানিতে পারা যাইবে—আল্লা ভিন্ন আর কেহ ভালবাসার পাত্র হইতে পারে না। পাঠক! জানিয়া রাখ—**পাঁচ কারণে ভালবাসা জন্মে।** **প্রথম** - স্বাভাবিক কারণ--লোকে স্বভাবতঃ নিজকে ভালবাসে—সুতরাং নিজের জীবন, বলগুণাদিও ভালবাসে এবং তজ্জন্য নিজের বিনাশ পাইতে কেহই চায় না। যে সকল কষ্ট বা যন্ত্রণা জীবনের সাথী—মরিয়া না গেলে সে দুঃখের অবসান হইতে পারে না—তেমন দুঃখ পরিহার করিতেও কেহই মরিতে চায় না। ইহার কারণ এইযে, মানব স্বীয় প্রকৃতির অনুযায়ী পদার্থ ভালবাসে। নিজের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী হউক এবং নিজের গুণ পূর্ণতা পাউক ইহা সকলের প্রকৃতি চায়। সুতরাং নিজের বিনাশ ও গুণের লোপ কেহই চায় না। উহা মানব প্রকৃতির বিপরীত। লোকে

সন্তানের অস্তিত্বকে এক হিসাবে নিজের অস্তিত্বের অনুরূপ বলিয়াই মনে করে। এই কারণে লোকে সন্তান ও সন্তানের অস্তিত্ব ভালবাসে। পৃথিবীতে কেহই চিরকাল বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। তজ্জন্য সন্তানের অস্তিত্বকে নিজের অস্তিত্বের অনুরূপ মনে করিয়া সকলেই সন্তান পাইতে বাসনা করে। মানুষের ধন জীবন-ধারণের সাহায্য করে বলিয়া ধনকেও লোকে ভালবাসে। সেই কারণে নিজের অন্ন, বস্ত্র, ও গৃহ এবং ঐরূপ বস্তু পাইবার উপায়কেও লোকে ভালবাসে। যাহা হউক—ফল কথা এই যে, লোকে নিজকে ভালবাসে বলিয়া নিজের অস্তিত্বের কারণ ও উপায়গুলি পর্য্যন্ত ভালবাসে এবং নিজের আত্মীয় কুটম্বগণকেও সেই কারণে ভালবাসে। **দ্বিতীয় কারণ**—উপকার প্রাপ্তি। যাহার হস্ত হইতে উপকার পাওয়া যায়, তাহাকে লোকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। এই কারণে জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন—"মানুষ উপকারের গোলাম?" মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) আল্লার স্থানে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেন—"হে আল্লা, তুমি কোন কুকর্ম্মী লোককে আমার উপকার করিতে দিও না। তদ্রূপ লোক যদি আমার উপকার করে, তবে আমার মন তাহাকে ভালবাসিতে চাহিবে।" ভালবাসার হেতু উপস্থিত হইবামাত্র হৃদয়ে ভালবাসা, আপনা আপনি উৎপন্ন হয় তখন হৃদয়কে ভালবাসিতে বাধা দিয়া নিরস্ত করা যায় না। উপকার পাইলে, উপকারীর প্রতি যে ভালবাসা উৎপন্ন হয় তাহাও আত্মপ্রেমের উপলক্ষেই জন্মিয়া থাকে। মানব স্বভাবতঃ নিজকে ও নিজের শরীরকে ভালবাসে। অন্য কোন ব্যক্তি তোমার উপকার করিলে, তুমি তখন সেই উপকারকে নিজের সত্তার উপর করা হইল বলিয়া উপকারীর উপর সন্তুষ্ট হও এবং তাহাকে ভালবাসিতে থাক। লোকে স্বভাবতঃ স্বীয় শরীরের স্বাস্থ্য ভালবাসে। কোন চিকিৎসক রোগ দূর করিয়া তোমাকে সুস্থ করিয়া দিলে, তুমি চিকিৎসককে উপকারী মনে কর এবং তজ্জন্য তাহাকে ভালবাসিয়া থাক। **তৃতীয় কারণ**—সাধুতা। লোকে সাধু দয়ালু ব্যক্তিকে ভালবাসে। যে সাধু তোমার সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছে তাহার প্রতি তো তুমি অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবে ও ভালবাসিবে, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহার সদ্ব্যবহার তুমি কখন ভোগ কর নাই—লোকের মুখে শুনিয়াছ তাহাকেও তুমি ভালবাসিয়া থাক। সুদূর পশ্চিম দেশীয় কোন বাদশার জ্ঞান ও সুবিচারের যশ শুনিতে পাইলে বা তাঁহার ব্যবহারে পাশ্চাত্য জগতের অধিবাসী পরম সুখে দিন যাপন করিতেছে, এ সংবাদ

শুনিলে তুমি তাঁহাকে ভালবাসিতে লাগিবে। সে বাদশার সাধুতা তুমি স্বয়ং ভোগ করিতে সুযোগ না পাইলেও লোকের মুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়াই তাঁহাকে ভালবাসিতে প্রবৃত্ত হইবে। **চতুর্থ কারণ**—সৌন্দর্য্যোপলব্ধি। যে ব্যক্তি পরম সুন্দর হয়, লোকে তাহাকে ভালবাসে। সুন্দর লোকের স্থানে কিছু পাইবার আশা বা সুযোগ না থাকিলেও সৌন্দর্য্য-প্রীতির স্বাভাবিক টানে তৎপ্রতি আসক্ত হইতে হয়। হরিৎ-বর্ণ দুর্ব্বা-ক্ষেত্র ও স্বচ্ছ-সলিলা স্রোতস্বতী যতটুকুই ভোগে আসুক না কেন, তাহাদের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখিয়াই লোকে তবুও আনন্দিত হয় এবং তাহাদিগকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। আল্লার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য যদি লোকে দেখিতে ও বুঝিতে পারে, তবে নিজের সমজাতীয় না হইলেও তাঁহাকে ভালবাসিতে পারে। সৌন্দর্য্যের পরিচয় পরে দেওয়া যাইতেছে। **পঞ্চম কারণ**—অবস্থা ও ভাবের সাদৃশ্য। যাহাদের প্রকৃতি মধ্যে সাদৃশ্য থাকে তাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃ ভালবাসা জন্মে। সে সাদৃশ্য কখন কখন প্রকাশ্যই চিনা যায়। তজ্জন্য বালকের সহিত বালকের সখ্যতা জন্মে, তদ্রূপ দোকানদারের সহিত দোকান-দারের এবং পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিতের প্রণয় জন্মে, অর্থাৎ সমশ্রেণীস্থ ব্যক্তির মধ্যে সহজেই বন্ধুতা জন্মিয়া থাকে। আবার কখন কখন লোকের সাদৃশ্য তাহাদের প্রকৃতির মধ্যে গুপ্ত ভাবে থাকে। সৃষ্টির মূলে যে সকল স্বর্গীয় কারণ বিদ্যমান থাকে, মানবের জন্মের ঠিক প্রারম্ভে সেই কারণের সমতা ঘটিলে, ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদের মধ্যে প্রণয় জন্মিয়া থাকে। এই হেতু পয়গম্বর-শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—"আধ্যাত্মিক জগতে, এক আত্মার সহিত অন্য আত্মার সাদৃশ্য ঘটিয়াছে, আবার পার্থক্যও ঘটিয়াছে।" যাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য ঘটিয়াছে, ইহ-জগতে তাহাদের মধ্যে সৌহৃদ্য জন্মে। সেই সাদৃশ্য, জন্মের প্রারম্ভে আল্লার ইচ্ছাক্রমে ঘটিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা আর কিছু অধিক বলিবার পথ নাই।

সৌন্দর্য্যের পরিচয়—পাঠক! সৌন্দর্য্য কি প্রকার পদার্থ—তাহা বিচার করিতে গিয়া পণ্ডিত লোকের মধ্যে বহু মতভেদ ঘটিয়াছে—যাহারা পশু তুল্য চক্ষু রাখে—বিচার করিবার শক্তি হইতে বঞ্চিত, তাহারা শরীরের গঠন ও মুখ মণ্ডলের লালিত্য এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির, একের সহিত অপরের, হিসাব মত বর্দ্ধনকে সৌন্দর্য্য বলে। তদ্ব্যতীত অন্য কোন পদার্থকে তাহারা সৌন্দর্য্যের কারণ বলিয়া গণনা করে না ; তাহারা বলে—আকার ও বর্ণ

অবলম্বনে সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান থাকে এবং যে পদার্থে আকার ও বর্ণ নাই, তাহা সুন্দর হওয়া অসম্ভব। এরূপ কথা বলা নিতান্ত ভুল। বুদ্ধিমান লোকেরা শরীর বিশিষ্ট বস্তুকে যেমন সুন্দর বা কদাকার বলেন, অশরীরী-পদার্থকেও তদ্রূপ সুন্দর বা অসুন্দর বলিয়া থাকেন, যথা—লিখন সুন্দর, বস্ত্র সুন্দর, অশ্ব সুন্দর, গৃহ সুন্দর, বাগান সুন্দর, শহর সুন্দর, শব্দ সুন্দর, গান সুন্দর ইত্যাদি। এরূপ প্রত্যেক পদার্থের সৌন্দর্য্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক পদার্থের পূর্ণ-উন্নতি যেরূপ হওয়া আবশ্যক, তাহা তৎ তৎ পদার্থে বর্ত্তমান থাকে—কোন অংশে অপ্রতুলতা থাকে না। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক পদার্থের পূর্ণতা পৃথক পৃথক। লিখনের পূর্ণোন্নতি বলিলে ইহাই বুঝায় যে, উহার অক্ষর, মাত্রা, ব্যবধান ইত্যাদি একের সহিত তুলনায় অন্যটী সমাকৃতি ও পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট। সুন্দর লিখন ও সুন্দর গৃহ দর্শনে এক প্রকার সুখ ও আনন্দ অনুভবে আসে, তবেই দেখা যায়, কেবল মুখমণ্ডলের আকার ও বর্ণ দর্শনে সুখ ও আনন্দ সীমাবদ্ধ নহে। সুন্দর বস্তু চক্ষে দেখিলেই এক প্রকার আনন্দ-সুখ অনুভব করিতে পাওয়া যায়। এ কথা শুনিলে হয়তো কেহ বলিতে পারে—চক্ষে না দেখিলে সৌন্দর্য্য-জ্ঞান জন্মে না। কিন্তু সে কথা ঠিক নহে। সৌন্দর্য্যকে চক্ষের সঙ্গে সীমাবদ্ধ করা অজ্ঞানতার কথা। কেননা আমরা অনেক সময়ে আকার ও বর্ণহীন বস্তুকেও সুন্দর বলিয়া থাকি।

অমুক ব্যক্তির স্বভাব সুন্দর, বা শিষ্টতা উত্তম—এরূপ কথা তো সর্ব্বদাই বলা হয়। তদ্ব্যতীত ইহাও বলা হয়—'জ্ঞান-মূলক-পাপ-ভয়,' অতি উত্তম; 'বদান্যতা-সহকৃত বীরত্ব,' সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর গুণ; এইরূপ 'বৈরাগ্য', 'নির্লো-ভতা', 'অল্পে-তুষ্টি' গুণ গুলিও অন্য বহু পদার্থ অপেক্ষা মূল্যবান। এইরূপ কথা বিশেষ প্রচলিত—সকলেই জানে। এইরূপ গুণগুলি কেহ চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পায় না—কেবল জ্ঞান-চক্ষে ও বুদ্ধি-প্রভাবে লোকে বুঝিতে পারে। বিনাশন পুস্তকে 'রেয়াজৎ' নামক প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখাইয়া দিয়াছি যে,—মানুষের আকার দুই প্রকার; এক—শরীরের বাহ্য আকৃতি; দ্বিতীয়—সৎস্বভাব বা অন্তরের গুপ্ত-আকৃতি। এই অন্তরস্থ সৎস্বভাব লোকে স্বভাবতঃ ভালবাসে। এই কারণে লোকে মহাত্মা ইমাম শাফেঈ রহমতুল্লাকে ভালবাসে; এমন কি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মা ওমর ফারুক ও মহাত্মা আবুবকর ছিদ্দীককেও না দেখিয়া ভালবাসিয়া থাকে। তাঁহাদিগকে চক্ষে না দেখিয়া—কেবল তাঁহা-দের গুণের পরিচয় পাইয়াই ভালবাসে। সুতরাং চক্ষে না দেখিয়া ভালবাসা

অসম্ভব কথা নহে। বহুলোক পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদিগের ভালবাসায় ফাঁদে আবদ্ধ হইয়া ধন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, এমন কি এখনও করিতেছেন। এরূপ প্রেমোম্মত্ত ব্যক্তির মধ্যে অনেকে তাঁহাদের মূর্ত্তি বা আকৃতি কোন দিন চক্ষেও দেখে নাই। এখন তাঁহাদের দেহ মৃত্তিকারূপে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় তাঁহাদের প্রতি ভালবাসা শরীরের বাহ্য সৌন্দর্য্য দৃষ্টে কখনই হয় নাই—তাঁহাদের আন্তরিক সৌন্দর্য্য অর্থাৎ সদ্‌গুণ ও সৎস্বভাবের সৌন্দর্য্য-মাধুরীর পরিচয় হইতে সে ভালবাসা উৎপন্ন। তাঁহাদের অগাধ জ্ঞান, অতুলনীয় পাপ-ভীতি, নিরপেক্ষ সুবিচার প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া লোকে তাহাদিগকে ধন ও প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভালবাসে। এই কারণেই পয়গম্বরদিগকে লোকে ধন, প্রাণ ও সন্তান অপেক্ষা অধিক ভালবাসে। পয়গম্বরগণের মধ্যে মানবোচিত গুণগ্রাম পূর্ণমাত্রায় থাকে। তাঁহাদের সমস্ত গুণই উচ্চ ও পূর্ণ।

মহাত্মা আবুবকর ছিদ্দীকের গুণাবলী

সর্ব্বোচ্চ গুণান্বিত পয়গম্বরগণের সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া কেবল মাত্র মহাত্মা আবুবকর ছিদ্দীকের সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। তিনিও পয়গম্বরগণের সমান উচ্চ গুণ গ্রামে বিভূষিত ছিলেন। তিনি সৎস্বভাবের উচ্চ আদেশের যে সৌন্দর্য্য মাধুরী বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে মুছলমান জগৎ বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেছে। তাঁহার চরিত্র হইতে অগাধ-জ্ঞান, অতুলনীয়-পাপ-ভীতি (পরহেজগারী) নিরপেক্ষ-বিচার, অদম্য-সত্য, প্রখর তেজে বিচ্ছুরিত হইতেছে। তজ্জন্য তিনি 'ছিদ্দীক' নামে ভালবাসা প্রাপ্ত হইতেছেন। তাঁহার সমবেত গুণাবলী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইলে এক শ্রেণীতে 'ছেদ্‌ক' বা পূর্ণ সত্য ও অন্য শ্রেণীতে 'এলম' বা. পূর্ণ জ্ঞান সন্নিবেশিত হয়। এই দুই শ্রেণীস্থ গুণ, কতকগুলি পূর্ণ গুণাবলীর সমবায়ে উৎপন্ন। তন্মধ্যে একটীর অভাব বা অল্পতা হইলে তিনি আর 'ছিদ্দীক' নামের যোগ্য থাকিতেন না; সুতরাং 'ছিদ্দীক' বলিয়া জগতের ভক্তি ও ভালবাসা পাইতে পারিতেন না। এই জন্য তাঁহার ঐ সমবায়ী গুণোৎপন্ন অস্তিত্বকে আরবীতে جزو لا يتجزى জোজ্‌ও লা ইয়োতজজ্‌জা এবং বাংলায় 'অপরিহার্য্য অংশ'. বলে। (টীঃ ৪৪২) মহাত্মা ছিদ্দীকের অন্তর্গত ঐ সকল গুণের বা সমবায়ী 'অবস্থার' আকার বা বর্ণ নাই। আকার ও বর্ণ না থাকায় এক

টীকা—৪৪২। 'জড়' বা 'অজড়' সকল পদার্থের অতি সূক্ষ্ম অবিভাজ্য অংশকে 'জোজো লা ইয়োতজজ্‌জা' বলে। উহাকে বাঙ্গলা বা সংস্কৃতে পরমাণু বলা যায়। ইট সুরখী

শ্রেণীর

শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত, গুণকে ভালবাসার পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, তাঁহারা পারুন আর না পারুন, মহাত্মা ছিদ্দীকের শরীর তো এখন গলিয়া মাটী হইয়াছে। তিনি শারীরিক আকার ও সৌন্দর্য্যের জন্য কি প্রকারে লোকের ভক্তি ভালবাসা পাইতে পারেন? তথাপি যখন তিনি ভক্তি ভালবাসা পাইতেছেন, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে চরিত্রগত গুণ নিরাকার ও বর্ণহীন হইলেও সেই গুণের প্রভাবেই তিনি লোকের ভক্তি ও ভালবাসা পাইতেছেন।

যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বলা গেল তাহা পাঠ করিলে সামান্য-বুদ্ধি-বিশিষ্ট লোকেও চরিত্রগত গুপ্ত-সৌন্দর্য্য অস্বীকার করিতে পারিবে না এবং প্রকাশ্য আকার ও বর্ণ-গত সৌন্দর্য্য অপেক্ষা চরিত্রগত আন্তরিক সৌন্দর্য্যকে অধিক ভালবাসিবে। প্রস্তরে বা প্রাচীর পৃষ্ঠে অঙ্কিত মূর্ত্তিকে যাহারা ভক্তি করে, তাহারা এবং যাহারা মহোন্নত চরিত্রবান্ পয়গম্বরদিগকে ভালবাসে, এই উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে। ছোট শিশুকে তোমার উপর অনুরক্ত করিবার ইচ্ছা করিলে, তাহার সম্মুখে তোমার ভ্রুযুগলের বক্রতা, খঞ্জন-বিনিন্দিত চক্ষু ও বদন মণ্ডলের লাবণ্য বর্ণনা করিলে কোন ফল হইবে না। শিশুকে মোহিত ও অনুরক্ত করিতে হইলে তাহাকে খাইবার মিষ্ট বস্তু, খেলিবার খেলনা বা পাখী দিয়া তোমার অন্তরস্থ দয়া

প্রভৃতি 'জড়' পদার্থের অবিভাজ্য অতি ক্ষুদ্র অংশ পরমাণু, কিন্তু 'অজড়' পদার্থের অবিভাজ্য অংশের জন্য কোন পৃথক নাম নাই। 'অজড়' পদার্থের অবিভাজ্য অংশ এই ক্ষুদ্র 'নোটে' বুঝাইয়া দেওয়া বড় কঠিন। 'শব্দ' একটী 'অজড়' পদার্থ, ইহাকে কল্পনা বলে যত ক্ষুদ্র করা যাউক না কেন, ক্ষুদ্রাংশ অবশ্যই 'শব্দ' নামেই বর্ত্তমান থাকিবে, কিন্তু সে শব্দাংশ নিতান্ত ক্ষীণ হওয়াতে কোন ফল বা কার্য্য উৎপন্ন করিতে পারিবে না। রৌদ্রকে যদি জড় বা অজড় পদার্থ ধর, তবে তাহাকেও ঐরূপ কল্পনা বলে বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পরিশেষে অতি ক্ষুদ্রাংশ অবশিষ্ট থাকিবে কিন্তু অতি ক্ষীণ হওয়াতে কোন কার্য্যকর হইবে না। রৌদ্রকে অন্য প্রকারে বিভাগ করিলে তাহার মধ্যে দুই পদার্থ পাওয়া যাইবে—(১) তেজ; (২) আলোক। রৌদ্র হইতে আলোক বা তেজ বাহির করিয়া ফেলিলে, অবশিষ্ট পদার্থ আর 'রৌদ্র' নামের যোগ্য থাকিবে না—সুতরাং তদ্দ্বারা রৌদ্রের কাজ হইবে না। এখন সৌর রৌদ্রের ন্যায় মহাত্মা আবুবকরের 'ছিদ্দীকত্ব' ভাব লইয়া বিচার কর। তাহাও দুই শ্রেণীর গুণ বা ভাব মিলনে উৎপন্ন। (১) এলেম অর্থাৎ জ্ঞান; ইহা পরিচয়-মূলক। (২) পরহেজগারী অর্থাৎ ভাল মন্দ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক মন্দটী পরিত্যাগের এবং ভালটা অর্জ্জনের প্রবল ক্ষমতা, ইহা কর্ম্ম-মূলক। 'পরিচয়ের' দুইটী ভূমি আছে—(ক) 'অনন্ত পদার্থ'; (খ) সেই অনন্ত পদার্থ-গুচ্ছের মূল বৃন্ত 'আল্লা'। এখন ভাবিয়া দেখ জ্ঞানের ভূমি কতদূর প্রসারিত হইল। 'পরহেজগারী' এই সাংসারিক কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ছিদ্দীকের 'অবস্থা' হইতে 'জ্ঞান' বা কর্ম্ম-ক্ষমতা বিয়োগ করিলে বা উহাদের প্রত্যেকটীকে ক্ষুদ্রাংশে ভাগ করিলে 'ছিদ্দীক' রূপে আর তিষ্ঠিতে পারেন না এবং আদর্শ হইয়া মনুষ্য সমাজের আর কোন উপকার করিতেও পারেন না।

ও স্নেহের সংবাদ তাহার মনে প্রবেশ করিয়া দিতে পারিলে শিশু তোমাকে ভালবাসিতে লাগিবে। আবার শিশুকে কাহার উপর বিরক্ত করিবার ইচ্ছা করিলে, তাহার কদাকার শরীরের নিন্দা না করিয়া তাহার স্বভাবের ভীষণত্ব ও নির্দ্দয়তার সংবাদ জ্ঞাপন করিলে ফল পাওয়া যায়। এই কারণে মুছলমান লোক মহাত্মা ছাহাবাগণের সৎস্বভাবের উজ্জ্বল প্রমাণ শ্রবণ করিয়া তাহাদের উপর অনুরক্ত হন। আবার আবুজেহেলের অন্যায় অত্যাচারের সংবাদ পাইয়া তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

যাহা হউক, এ কথা বেশ বুঝা গেল; সৌন্দর্য্য দুই প্রকার—(১) বাহ্য ও (২) আন্তরিক। বাহ্য সৌন্দর্য্যের ন্যায় আন্তরিক সৌন্দর্য্যও লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। গুণবান ও বুদ্ধিমান লোক যে, নির্ব্বোধ সুন্দর লোক অপেক্ষা অধিক ভালবাসা পাইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায়।

ত্রিবিধ সৌন্দর্য্য সহজে মানবের বোধগম্য হয়। পাঠক! অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারিবে লোকে নিম্নলিখিত তিন প্রকার সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারে এবং সেই গুণের অধিকারীদিগকে ভালবাসে। **প্রথম—জ্ঞানের সৌন্দর্য্য।** এ সৌন্দর্য্য মানব সহজেই বুঝিতে পারে। জ্ঞান নিতান্ত সৎ, পবিত্র ও মহৎ বস্তু। জ্ঞানের পরিসর ও বিষয় যত বিস্তৃত ও মহৎ হইবে ততই তাহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইবে। সর্ব্ববিধ জ্ঞানের মধ্যে আল্লার পরিচয়-জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ। সেই তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে, ফেরেশ্‌তার পরিচয়, স্বর্গীয় গ্রন্থের পরিচয়, পয়গম্বরগণের পরিচয়, শরীঅৎ অর্থাৎ ধর্ম্মনীতির মর্ম্মজ্ঞান এবং ইহকাল পরকালের পরিচয়-জ্ঞান মিলিত হইলে, সেই জ্ঞান-সমষ্টি নিতান্তই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ হইবে। 'ছিদ্দীক' লোক এবং পয়গম্বরগণ সেই মহৎ জ্ঞানের পূর্ণ অধিকারী। সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসার পাত্র। **দ্বিতীয়—ক্ষমতার সৌন্দর্য্য।** যাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট ক্ষমতা যত আছে লোকে তাহাকে তত অধিক ভালবাসে। নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার ক্ষমতা অতীব শ্রেষ্ঠ ও মহৎ—যথা, নিজের দোষ সংশোধনে ও গুণ পরিবর্দ্ধনের ক্ষমতা। তৎসহ সমাজের দোষ সংশোধন, এবং শাসন সংরক্ষণ এবং মানব সমাজের মধ্যে সদ্‌গুণ, সন্নীতি স্থাপন ও ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটন এবং মানবগণকে ধর্ম্মপথে চালাইবার ক্ষমতা। এই সমস্ত মহৎ ক্ষমতা একত্র মিলিত হইলে যে সমবায়ী ক্ষমতা জন্মে তাহা নিতান্তই মহৎ বস্তু। এই শ্রেণীর ক্ষমতা যাহার মধ্যে যত অধিক থাকে সে তত

অধিক ভক্তিভাজন ও শ্রদ্ধার যোগ্য হয়। **তৃতীয়—পবিত্রতার সৌন্দর্য্য।** যে ব্যক্তি সর্ব্ববিধ ত্রুটী হইতে পবিত্র এবং স্বভাবের দোষাদি হইতে নিষ্কলঙ্ক তাঁহার সেই নিষ্কলঙ্ক-ভাব সকলের হৃদয়ে বড় সুন্দর লাগে। স্বধু কার্য্য, লোকের হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না। (টীঃ ৪৪৩) লোকে দয়া মায়া মমতা ইত্যাদি সদ্‌ভাবের বশীভূত হইয়া যে কাজ করে তাহা সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া থাকে। যে কার্য্য, সৎস্বভাবের পরিচালনায় সম্পন্ন হয় না, তাহা লোকের মনোরম হইতে পারে না। যে কার্য্য হঠাৎ প্রকাশ পায় বা যাহা অমনোযোগের সহিত করা হয় তাহা মনোহর হয় না। স্বভাবের সদ্‌গুণগুলি যাহার মধ্যে পূর্ণ—তাঁহার প্রতি লোকে অনুরক্ত ও ভক্ত হইয়া থাকে। এই কারণে—মহাত্মা আবুবকর ছিদ্দীককে লোকে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেঈ রহমতুল্লা অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন এবং পয়গম্বরগণকে মহাত্মা আবুবকর ছিদ্দীক অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। (টীঃ ৪৪৪)

আল্লাই কেবল ভালবাসার পাত্র—পাঠক! জানিয়া রাখ—বাস্তবিক পক্ষে আল্লা ভিন্ন অন্য কেহ ভালবাসার যোগ্য নহে। আল্লা ভিন্ন অন্য বস্তুকে ভালবাসিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সে ব্যক্তি আল্লাকে চিনিতে পারে নাই। তবে যাহারা আল্লাকে ভালবাসে তাহারা আল্লার প্রিয়তম ব্যক্তিকেও ভালবাসিয়া থাকে। এই কারণে মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (ﷺ) এর প্রতি ভালবাসা, আল্লার ভালবাসা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ জ্ঞানী-আলেম ও ধার্ম্মিক-সাধুদিগের প্রতি ভালবাসাও আল্লার প্রতি ভালবাসা হইতেই উৎপন্ন।

যাহা হউক, ভালবাসার পূর্ব্বোল্লিখিত পাঁচটী কারণ লইয়া নিম্নলিখিত রূপে, একে একে, বিচার পূর্ব্বক মনোযোগ করিয়া দেখিলে, এ বিষয়টী সুন্দর হৃদয়ঙ্গম হইবে। **প্রথম**—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মানুষ নিজকে ও নিজের

টীকা—৪৪৩। "লোকে স্বধু কাজে সন্তুষ্ট হয় না। যে ভাবের উত্তেজনায় কাজ সম্পন্ন হয়, তাহা সৎ ও হৃদয়গ্রাহী হইলে কর্ম্মটী লোকের হৃদয়গ্রাহী হয়। অন্যথায় অন্য প্রকার।" এই কথা বুঝাইতে একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—তুমি ক্ষুধিত অবস্থায় সন্ধ্যার সময়ে কোন গরীব গৃহস্থের পূর্ণকুটীরে গেলে, গৃহস্থ তোমাকে পরম সমাদরে ভাঙ্গা ঘরের মেজেতে ছেঁড়া মাদুরে বসাইয়া শাকান্ন ভোজন করিতে দিলে এবং তদপেক্ষা ভাল খাদ্যের আয়োজন করিতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলে তুমি যেরূপ আনন্দিত হইবে—ধনীর গৃহে অনাদৃত ভাবে টেবিলে বসিয়া পলান্ন ভোজনে তেমন তৃপ্তি পাইতে কখনই পারিবে না।

টীকা—৪৪৪। এ প্যারাটী মূলগ্রন্থে পরবর্ত্তী পঞ্চম প্যারার তারকা চিহ্নিত স্থানে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা হইল।

জীবন, বল, অবস্থা, গুণ ইত্যাদি নিজস্ব পদার্থকে ভালবাসে। নিজের প্রিয় পদার্থগুলি আল্লা হইতেই পাওয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং তাঁহাকে ভালবাসা মানুষের কর্ত্তব্য। ভাবিয়া দেখ, মানবের অস্তিত্ব এবং গুণাবলী সমস্তই আল্লার দান। তাঁহার দয়া না হইলে মানব 'নাস্তি'র অন্ধকারময় পর্দার অপর পার হইতে 'অস্তিত্বে'র জগতে আসিতে পারিত না। তাহার পর তাঁহার দয়া না হইলে, মানব এ জগতে আসিয়া নিরাপদে তিষ্ঠিতে পারিত না। আরও দেখ, আল্লা দয়া করিয়া মানবকে এই হস্ত পদ চক্ষু প্রভৃতি অমূল্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও দুর্লভ শক্তি এবং দুষ্প্রাপ্য গুণগুলি না দিলে মানব জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম, অপদার্থ ও অসহায় হইয়া বিনাশ পাইত। দেখ—বৃক্ষ হইতে ছায়া পাওয়া যায়। রৌদ্র দগ্ধ ব্যক্তি, রৌদ্র হইতে পলাইয়া সুশীতল-ছায়া-আশ্রয় করতঃ প্রাণ বাঁচাইলে অবশ্যই সে ব্যক্তি ছায়াকে ভালবাসিবে, কিন্তু সে যদি উক্ত ছায়া ব্যতীত বৃক্ষকে ভাল না বাসিয়া কেবল মাত্র ছায়াকে ভালবাসে তবে কি আশ্চর্য্যের কথা হইবে না? ছায়ার অস্তিত্ব যেমন বৃক্ষের অস্তিত্ব হইতে উৎপন্ন, তেমনই নিজ দেহ এবং দেহস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং তদন্তর্গত বল গুণাদি সমস্তই আল্লা হইতে পাওয়া গিয়াছে এমন অবস্থায় আল্লাকে ভাল না বাসিয়া কেবল নিজকে ও নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা ক্ষমতা গুণাদি ভালবাসা কেমন গর্হিত কথা! 'আল্লা হইতেই নিজের অস্তিত্ব হইয়াছে' এই কথা যে ব্যক্তি জানে না, সে অবশ্যই আল্লাকে ভালবাসিতেও পারে না। এই কারণে অবোধ মূর্খ লোকেরা আল্লাকে ভালবাসিতে জানে না। ভালবাসা, মারেফত অর্থাৎ পরিচয়-জ্ঞানের ফল। মূর্খ লোক কিছুই চিনে না। সুতরাং ভালবাসিতেও জানে না।

মারেফৎ বা পরিচয়-জ্ঞানের ফল—ভালবাসা

দ্বিতীয়—লোকে উপকারীকে ভালবাসে। ইহ-জগতে আল্লা ভিন্ন অন্য কেহ উপকার করিতে পারে না, সুতরাং আল্লা ভিন্ন অন্য কেহ ভালবাসা পাইতেও পারে না। যে ব্যক্তি আল্লা ভিন্ন অন্যকে উপকারী বোধে ভালবাসে সে নিতান্ত নির্ব্বোধ। আল্লা, কত প্রকারে মানবের উপকার করিতেছেন তাহার সংখ্যা নাই। আল্লার উপকার সম্বন্ধে 'শোকর' ও 'তফক্কোর' পরিচ্ছেদে কিছু লিখিত হইয়াছে। পাঠক! কোন লোকের হস্ত হইতে তুমি উপকার পাইয়া মনে করিতে পার—এ উপকার অমুকের দ্বারা পাইলাম। এরূপ মনে করা তোমার ভুল। বাস্তবিক তুমি সে উপকার আল্লা হইতেই

পাইয়াছ, তবে উহা সেই মানুষের হাত দিয়া তিনি দেওয়াইয়াছেন। আল্লা মানুষের মনে এক বলবান দণ্ডধারী 'পিয়াদা' স্থাপন করিয়াছেন। সে 'পিয়াদা' মানুষকে উত্তেজনা করিয়া তাহার হাত হইতে কিছু বাহির করাইয়া দুস্থ লোককে দেওয়াইয়া থাকে। মানুষ কিন্তু সর্ব্বদাই 'পিয়াদার' আদেশ লঙ্ঘন করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করে; সুযোগ না পাইলে বাধ্য হইয়া অগত্যা কিছু দেয়। দণ্ডধারী 'পিয়াদা' বলিয়া যাহাকে লক্ষ্য করা গেল, তাহা একটী 'বিশ্বাস-জ্ঞান'। উহা মানুষকে জানাইয়া দেয় যে, দুঃস্থ লোককে কিছু দিলে তোমরা পরকালে পুণ্য-সুখ পাইবে এবং ইহকালেও বহুলাভ মিলিবে। ভবিষ্যতে অধিক প্রাপ্তির আশায় উত্তেজিত হইয়া লোকে দীনহীন লোককে কিছু দিতে প্রস্তুত হয়। বাস্তবিক কেহ তোমাকে বা দীন দুঃখীকে কিছুই দেয় না, বরং তোমাদিগকে তাহার অধিক-প্রাপ্তির সোপান করিয়া লয় মাত্র। বাস্তবিক লোকে দান-গৃহীতাকে তাহার পরকালের পুণ্য ও ইহসংসারে যশ লাভের একটী সোপান করিয়া লইয়াছে। মূলে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় বিশ্বপ্রভু আল্লা, ধনীকে কৌশল জালে আবদ্ধ করিয়া তাহার দ্বারা গরীব দুঃখীর দুঃখ মোচন করিয়া লইতেছেন—তাহার অন্তরে প্রবল লাভের লোভ দেখাইয়া তাহার হাত হইতে তোমাকে কিছু দিয়াছেন। এই মর্ম্মের কথা 'শোকর' পরিচ্ছেদে কিছু বলা হইয়াছে।

তৃতীয় - দয়ালু সাধু লোককে সকলে ভালবাসে। এমন কি যাহা হইতে কোন দিন দয়া পাইবার আশা নাই, তাহাকেও লোকে ভালবাসে। সুদূর পশ্চিম দেশের এক বাদশা বড় সুবিচারক এবং প্রজার উপর বড় দয়া করেন। অভাব-গ্রস্ত দরিদ্রের দুঃখ মোচনার্থ নিজের কোষাগারের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। তাঁহার রাজ্যে কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিতে পারে না। এইরূপ কথা শুনিলে শ্রোতার মন, অতি-নিশ্চয় সেই বাদশাকে ভক্তি করিবে ও ভালবাসিবে। যদিও সে বুঝিতে পারিতেছে যে, উক্ত বাদশার সঙ্গে তাহার দেখা হইবার বা তাহার হাত হইতে কিছু পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তথাপি তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে যাহারা দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া কাহাকে কিছু দেয়, তাহা আল্লার স্থানে তদপেক্ষা অধিক পাইবার আশাতেই দিয়া থাকে। তিনি দয়া করিয়া মানবকে সৃজন করিয়াছেন এবং মানবের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহাও তিনি দয়া করিয়া দিয়াছেন। তদ্ব্যতীত যে দ্রব্য প্রয়োজনীয় নহে, কেবল শোভা সৌন্দর্য্য

বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক, তাহাও আল্লা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মানবকে দিয়াছেন ভূতল ও গগন মণ্ডলের রাজ্য এবং উদ্‌ভিদ ও প্রাণী জগৎ মনোযোগ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে বিশ্ববাসী প্রজামণ্ডলীর উপর তাঁহার অসীম দয়া অনবরত ঝরিতেছে এ কথা সুন্দর রূপে বুঝা যায়।

চতুর্থ—সৌন্দর্য্য দেখিয়া লোকে অপরকে ভালবাসে। ইতিপূর্ব্বে দেখান গিয়াছে শারীরিক সৌন্দর্য্য কোন কাজের নহে। যাহাকে লোকে আন্তরিক সৌন্দর্য্য ও চরিত্রগত মাধুর্য্যে বিভূষিত দেখিতে পায়, লোকে তাহাকে ভালবাসে ও ভক্তি করে। এই কারণে ইমাম শাফেঈ রহমতুল্লাকে কেহ ভালবাসে; কেহ মহাত্মা আলী করমুল্লাকে ভালবাসে। কেহবা মহাত্মা আবুবকর ছিদ্দীককে কেহ মহাত্মা ওমর ফারুককে কেহ মহাত্মা ওছমানগনীকে আবার কেহ সকলকেই ভালবাসে। আবার কেহবা ঐ সকল মহাত্মাদিগের সঙ্গে সমস্ত পয়গম্বরদিগকে ভালবাসে। উক্ত মহাত্মাদিগের চরিত্রগত আন্তরিক-সৌন্দর্য্য ও অস্তিত্বগত গুণ সেইরূপ ভালবাসার কারণ। * * *

পাঠক! ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে জ্ঞান, ক্ষমতা ও পবিত্রতা গুণ এই ত্রিবিধ আন্তরিক সৌন্দর্য্যই লোকে সহজে বুঝিতে পারে এবং সেই সকল গুণের অধিকারীকে তাহারা ভালবাসে। এখন পাঠক, এই জ্ঞান ক্ষমতা ও পবিত্রতা গুণের পূর্ণতা লইয়া বিচার করিয়া দেখ—এমন অবস্থায় এই গুণগুলি আল্লার মধ্যে যেরূপ অসীম ও পূর্ণ মাত্রায় আছে, সে পরিমাণে মানুষের মধ্যে কখনই থাকা সম্ভবে না। এই জন্য আল্লাই বাস্তবিক ভালবাসার এক মাত্র যোগ্য পাত্র। এমন অবোধ কেহ নাই—যে ব্যক্তি আল্লার জ্ঞানের সহিত সমস্ত ফেরেশতা ও জীন মানবের জ্ঞান একত্র তুলনা করতঃ সকলের জ্ঞান সমষ্টি তুচ্ছ ও নগণ্য বলিয়া বুঝিতে না পারে। এই উপলক্ষে স্বয়ং আল্লা বলিয়াছেন—

وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

"জ্ঞানের মধ্য হইতে তোমাদিগকে অতি সামান্য মাত্রই দেওয়া হইয়াছে।" (১৫ পারা। সূরা বনী এছ্‌রাইল। ১০ রোকূ)। সর্ব্ববিধ জ্ঞানের পরিমাণ করা দূরের কথা, জগতের সমস্ত জ্ঞানী বুদ্ধিমান লোক একত্র হইয়া এক পিপীলিকা বা মশকের নির্ম্মাণ মধ্যে আল্লার যে জ্ঞান ও কৌশল প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা জানিতে হাজার বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হইতে

পারিবে না। আর যদিও বা যৎসামান্য জানিতে পারে, তাহাও আল্লার অনুগ্রহ হইতেই জানিতে পারে, তদ্‌ভিন্ন অন্য কোন দিক হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে আল্লাও বলিয়াছেন—

خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ○

"আল্লা মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাকে বর্ণনা করিবার ধরণ শিক্ষা দিয়াছেন।" (২৭ পারা। সূরা রহমান। ১ রোকু।) মানুষের সম্মুখে জ্ঞানের প্রশস্ত রাজপথ খোলা থাকিলেও এবং অসীম জ্ঞান অর্জ্জনের শক্তি দেওয়া হইলেও ইহাদের সীমাবদ্ধ জীবনে, জ্ঞানের পরিমাণও সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। আল্লার জ্ঞান, যে দিক দিয়া বা যে কোন বস্তুর সম্বন্ধে দেখা যাউক না কেন, বুঝা যাইবে, তাঁহার জ্ঞানের সীমা নাই। মানুষের জ্ঞান তাঁহারই প্রদত্ত; সুতরাং যাবতীয় জ্ঞান তাঁহারই জ্ঞান বলিতে হইবে। আল্লার সৃষ্ট পদার্থ হইতে, মানুষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে কিন্তু আল্লার জ্ঞান, সৃষ্ট-মানুষ হইতে লব্ধ নহে। পাঠক! **'ক্ষমতার'** সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবে তাহাও মানুষের প্রিয় পদার্থ। তজ্জন্য মহাত্মা আলীর বীরত্ব, এবং মহাত্মা ওমর ফারুকের সুবিচার ও সুশাসন, জগতের লোকে ভালবাসে। ইহার কারণ এই যে—ঐ প্রকার গুণও এক প্রকার 'ক্ষমতা'—কিন্তু আল্লার সর্ব্ববিধ পূর্ণ ক্ষমতার সম্মুখে সমস্ত জগৎবাসীর ক্ষমতা একত্র করিয়া তুলনা করিতে গেলে বুঝা যাইবে ইহাদের ক্ষমতা-সমষ্টি কিছুই নহে। সৃষ্ট-জীবের ক্ষমতা আল্লা হইতেই আগত ও প্রাপ্ত। সুতরাং মনুষ্যাদি জীব মাত্রেই ক্ষমতা বিষয়ে অপূর্ণ ও অসহায়। আল্লা দয়া করিয়া ইহাদিগকে যতটুকু 'ক্ষমতা' দিয়াছেন তদ্‌ভিন্ন ইহাদের কিছুই নাই। একটী ক্ষুদ্র মাছী, মানুষের কোন দ্রব্য একটুকু খাইলে সেই মাছীর নিকট হইতে তাহা ফিরিয়া লইতে মানবের ক্ষমতা নাই। এখন বুঝ মানুষ কি প্রকার অক্ষম। আল্লার ক্ষমতা পূর্ণ—তন্মধ্যে ক্রটীর লেশ নাই; আবার সে ক্ষমতার পরিমাণ কত, তাহারও অবধি নাই। ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল এবং তদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে যথা—ফেরেশ্‌তা, জেন, এন্‌ছান (মনুষ্য) জীব জন্তু, উদ্‌ভিদ, পাহাড়, পর্ব্বত, গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য সমস্তই তাঁহারই পূর্ণ ও অমোঘ ক্ষমতা হইতে উৎপন্ন। তদ্‌ব্যতীত আকাশাদির ন্যায় 'অনন্ত' পদার্থ এবং 'সময়' বা 'কাল'

এর ন্যায় 'অনাদি অনন্ত' পদার্থও তিনি বহু সৃষ্টি করিয়াছেন। এ অবস্থায় আল্লা ভিন্ন আর কে 'ক্ষমতার' জন্য ভালবাসা পাইতে পারে? অতঃপর পবিত্রতা সম্বন্ধে দেখ—যে ব্যক্তি ত্রুটী হইতে যত 'পবিত্র' সে তত ভালবাসার যোগ্য। মানুষ কখনই ত্রুটী শূন্য হইতে পারে না; সুতরাং সে কখনই পূর্ণ ভালবাসাও পাইতে পারে না। মানুষের প্রথম ত্রুটী এই যে, সে 'দাস'—প্রভু নহে। তাহার পর ইহার ক্ষমতার মধ্যে একটী বড় ত্রুটী এই যে, ইহার অস্তিত্ব নিজের দ্বারা উৎপন্ন হয় নাই—অপর কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। ক্ষমতা-হীনতা অপেক্ষা মানবের আর কি বড় ত্রুটী হইতে পারে? তাহার পর ইহার জ্ঞানের অন্তর্গত ত্রুটী দেখ—মানব পরোক্ষ পদার্থের কোন সংবাদই পাইতে পারে না। ইহার জ্ঞানাধার-মস্তকের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র শিরা স্থানচ্যুত হইলে মস্তকে এমন বেদনা উপস্থিত হইতে পারে যে, তাহাতে সে পাগল হইতে পারে; কিন্তু মানব সে বেদনার কারণ বুঝিতে পারে না। তাহার পর সেই রোগের ঔষধ তাহার সম্মুখে বিরাজমান থাকিলেও সে চিনিয়া লইতে পারে না। ইহা অপেক্ষা মানবের গুরুতর ত্রুটী আর কি? পাঠক! যদি তুমি মানুষের অসহায়তা ও অজ্ঞতার হিসাব করিতে প্রবৃত্ত হও, তবে বুঝিতে পারিবে, মানব যে একটু যৎসামান্য জ্ঞান ও ক্ষমতা পাইয়াছে তাহা অজ্ঞানতা ও অসহায়তার মধ্যে ডুবিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। মানব, ছিদ্দীক বা পয়গম্বর তুল্য জ্ঞানী ও ক্ষমতাশালী হইলেও সেই একই কথা। সৃজন কর্ত্তা আল্লাই সর্ব্ববিধ ত্রুটী হইতে পবিত্র। তাঁহার জ্ঞানের সীমা নাই—অজ্ঞানতার লেশ নাই। তাঁহার ক্ষমতার ও সীমা নাই—সে ক্ষমতা কোন স্থানে প্রতিহত হইতে পারে না; তিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া কিছুমাত্র ক্লান্ত হন না। সপ্ত-আকাশ ও সপ্ত-পাতাল তাঁহার ক্ষমতার হস্তে রক্ষিত। তিনি নিমিষে সমস্ত সৃষ্ট-পদার্থ বিনাশ করিতে পারেন এবং লক্ষ লক্ষ জগৎ, পলকে সৃষ্টি করিতে পারেন। এ উভয় কার্য্যে তাঁহার ক্ষমতার মধ্যে কিছুমাত্র শ্রান্তি বা ক্লান্তি উৎপন্ন হয় না। তাঁহার সর্ব্ববিধ গুণ, পূর্ণ, তন্মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধির অধিকার নাই। তিনি সর্ব্ববিধ ত্রুটী হইতে পবিত্র। অভাব বা 'নাস্তি' তাঁহার বা তাঁহার গুণের মধ্যে স্থান পায় নাই। তাঁহার অস্তিত্বের কোন দিকে বা স্থানে অপ্রতুলতা বা হ্রাস স্পর্শ করিতে পারে না। এমন আল্লাকে ভাল না বাসিয়া অপরকে ভালবাসিতে যাওয়া পূর্ণ মূর্খতা। যাঁহার সমস্ত গুণ নিষ্কলঙ্ক ও পূর্ণ, তাঁহার প্রতি যে

ভালবাসা জন্মে, সে ভালবাসা, উপকার-প্রাপ্তি-জনিত-কৃতজ্ঞতা হইতে বহু উন্নত। উপকার-প্রাপ্তি স্থলে, কৃতজ্ঞতার আকারে যে ভালবাসা জন্মে তাহা, প্রাপ্ত-উপকারের অল্পতা বা আধিক্য অনুসারে তারতম্য হয়; কিন্তু আল্লার প্রতি ভালবাসা তাঁহার মহত্ব ও গুরুত্ব বিচারে এবং তাঁহার গুণের পূর্ণতা পবিত্রতা ও ক্রটীশূন্যতা জ্ঞান হইতে জন্মে। এই জন্য সেই ভালবাসার পথ পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে প্রসারিত আছে এবং উহা 'পূর্ণ-প্রেমে' পরিণত হইতে পারে। আল্লা এই কারণে মহাত্মা হজরৎ দাউদ নবীর প্রতি প্রত্যাদেশে বলিয়াছিলেন—"আমার যে বান্দা শাস্তির ভয়ে বা প্রাপ্তির লোভে এবাদৎ না করিয়া, আমার প্রভুত্ব ও গৌরবের সম্মান-প্রদর্শনার্থ এবাদৎ করে সে সর্ব্বাপেক্ষা আমার প্রিয়।" জব্বুর গ্রন্থে লিখিত আছে—"যে ব্যক্তি বেহেশ্‌তের লোভে ও দোজখের ভয়ে আমার এবাদৎ করে তাহা অপেক্ষা আর কে অধিক অত্যাচারী? বেহেশ্‌ৎ ও দোজখ প্রস্তুত না করিলে কি আমি তাহাদের এবাদৎ ও বন্দেগী পাইবার উপযুক্ত হইতাম না?"

পঞ্চম—যাহাদের প্রকৃতি মধ্যে সাদৃশ্য ও সম্পর্ক থাকে তাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃ ভালবাসা জন্মে। আল্লার সঙ্গে মানুষের এক বড় সম্পর্ক আছে। এ কথা আল্লাও স্বীকার করিয়াছেন—

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

"বল—রুহ্ আমার প্রভুর 'আম্‌র' এর অন্তর্গত।" (১৫ পারা। সুরা-বনীএছরাইল। ১০ রোকু।) এবং মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) স্বীয় হদীছে বলিয়াছেন—"আল্লা নিশ্চয় আদমকে তাঁহার ছুরতের অনুরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।" এই উভয় প্রমাণ হইতে জানা যায় আল্লার সহিত মানুষের এক বড় সম্বন্ধ আছে। স্বয়ং আল্লা মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ)-এর মুখ দিয়া এ কথা বলাইয়া লইয়াছেন—"আমার বান্দা আমার নৈকট্য পাইতে চেষ্টা করিলে আমি তাহাকে নিজের বন্ধু করিয়া লই এবং আমি তাহার কর্ণ চক্ষু ও জিহ্বা হইয়া থাকি।" তিনি মহাত্মা হজরৎ মুছা নবীকে বলিয়াছিলেন—"আমি যখন পীড়িত ছিলাম তখন তুমি আমাকে দেখা করিতে আস নাই কেন?" হজরৎ নিবেদন করিয়াছিলেন—"হে আল্লা' তুমি সমস্ত বিশ্ব জগতের কর্ত্তা ও মহাপ্রভু; তুমি কেমন করিয়া পীড়িত হইয়াছিলে?" উত্তর আসিয়া-

ছিল—"অমুক ব্যক্তি' পীড়িত ছিল। তাহাকে দেখিতে গেলে আমাকেই দেখিতে যাওয়া হইত।" বিশ্ব-প্রভু আল্লার সহিত মানব-'ছুরতের' সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য 'দর্শন পুস্তকে' কিছু বলা গিয়াছে। 'ছুরৎ' শব্দের গূঢ় অর্থ, পুস্তকে লিখা সঙ্গত নহে। লিখিলেও সাধারণ লোক বুঝিতে পারিবে না—এক বুঝিতে গিয়া অন্য কিছু বুঝিয়া ফেলিবে, তাহাতে তাহারই ক্ষতি হইবে। সাধারণ লোকের কথা কি, অনেক জ্ঞানী লোকও এই 'মোকামে' উপস্থিত হইয়া উলট্ খাইয়া পড়িয়া গিয়াছেন অর্থাৎ সাদৃশ্যের ধাঁধায় পতিত হইয়াছেন। কেহ বিবেচনা করিয়াছেন—'ছুরৎ', বাহ্য আকার ভিন্ন আর কিছু নহে। কেহ ইহা বিবেচনা করিতে পারেন, মানবের বাহ্য আকারের সহিত আল্লার সাদৃশ্য না মিলিয়া যাইতে পারে না। আবার কেহ কেহ বিবেচনা করেন—'ঘটাকাশ' 'পটাকাশ' রূপে আল্লা সর্ব্বত্র 'সংপ্রবেশ' (হলুল) করিয়া আছেন কেহবা 'সংযুক্ত' বা 'সাকল্য' (এত্তেহাদ) মতের ঘূর্ণী চক্রে পড়িয়াছেন। (টীঃ ৪৪৫) যাহা হউক, আল্লার সঙ্গে মানুষের যে 'বিশেষ সম্বন্ধ আছে তাহা বুঝা বড় কঠিন ব্যাপার। এস্থলে এতগুলি কথা বলিবার উদ্দেশ্য এইযে ভালবাসার কারণগুলি যদি তোমরা সুন্দর মত হৃদয়ঙ্গম করিতে পার তবে বুঝিতে পারিবে—আল্লাকে ভাল না বাসিয়া অন্য কিছু ভালবাসিতে যাওয়া নিতান্ত মূর্খতার চিহ্ন। যে সকল পণ্ডিত কথার আড়ম্বরে তর্ক করেন তাঁহারা বলিয়াছেন—ভিন্ন জাতীয় পদার্থকে কেহ ভালবাসিতে পারে না, আল্লা আমাদের সমজাতীয় নহেন এই জন্য তাঁহাকে ভালবাসা অসম্ভব ব্যাপার। তাঁহারা আরও বলেন—আল্লার আদেশ পালনের নামই তাঁহার প্রতি ভালবাসা। পাঠক! তার্কিক পণ্ডিতদের এই কথায় তুমি অবশ্যই তাঁহাদের সাদা অন্তরের পরিচয় পাইবে। তাঁহারা ভালবাসা বা প্রেম বলিলে স্ত্রী পুরুষের ভালবাসা ভিন্ন আর কিছু বুঝেন না। অবশ্য তাঁহাদের কথা এক হিসাবে যথার্থ; কেননা স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে কামজ-ভালবাসা জন্মে তাহা অবশ্য 'স্বজাতীয়ত্ব' চায়। কিন্তু আমরা যে ভালবাসার কথা বলিতেছি

টীকা—৪৪৫। "আল্লা, নিজের 'ছুরতের' অনুরূপে আদমকে সৃজন করিয়াছেন" এ কথায় লোকে ভিতর বাহির সর্ব্বত্র সাদৃশ্য দেখিতে গিয়া আল্লার হাত পা বিশ্বাস করে। কেহ বলে—অনন্ত আকাশের কিয়দংশ যেমন 'ঘটে' কিছু ভাগ 'পটে' প্রবেশ করিয়া আছে, আল্লাও তদ্রূপ মানব দেহে (হলুল) প্রবেশ করিয়া আছেন। আবার অন্যে বুঝে—আল্লা মানবের সঙ্গে (এত্তেহাদ) 'সংযুক্ত' হইয়া বা 'সাকল্য' ভাব ধারণ করিয়া থাকেন। এ সমস্ত মত এছলামের অনুমোদিত নহে।

তাহা অন্তরস্থ স্বভাবের সৌন্দর্য্য ও পূর্ণত্ব চায়—আকৃতিগত সাদৃশ্য চায় না। যাহারা পয়গম্বরগণকে ভালবাসে, তাহারা এ জন্য ভালবাসে না যে তাহাদের হস্ত পদ ও বদন মণ্ডলের ন্যায় পয়গম্বরগণেরও হস্ত পদ মুখশ্রী আছে; বরং এই কারণে লোকে পয়গম্বরদিগকে ভালবাসে যে পয়গম্বরগণের সৎস্বভাব ও আন্তরিক অবস্থা ও সদ্‌গুণের সঙ্গে উহাদের সেই সেই গুণের সাদৃশ্য আছে। তাহারা পয়গম্বরদিগের সাদৃশ্যে জীবিত আছে; জ্ঞান রাখে; ইচ্ছা করিয়া থাকে; কথা বলিতে পারে; শুনিতে পারে; দেখিতে জানে। তবে কথা এই, সেই সকল শক্তি পয়গম্বরদিগের মধ্যে পূর্ণ ও উন্নত। মানবের মধ্যে ঐ সকল শক্তির মূল পত্তন আছে সুতরাং সাদৃশ্যও আছে, কিন্তু সাধারণ লোকের তুলনায় পয়গম্বরদিগের ঐ সকল শক্তি বা গুণের উন্নতি আকাশ পাতাল প্রভেদ। পয়গম্বরদিগের অবস্থা অধিক উন্নত হওয়াতে সাধারণ লোক হইতে তাঁহাদের যে দূরত্ব ঘটিয়াছে তাহাতেই ভালবাসা বর্দ্ধিত হয়। সম্বন্ধ বা সম্পর্কের কারণে যে ভালবাসা জন্মে তাহার মূল এই দূরত্বে কাটা পড়ে না। পয়গম্বরদিগের সহিত সাধারণ লোকের 'ছুরৎ' সম্পর্কে যে সাদৃশ্য আছে তাহার পূর্ণ তত্ত্ব এবং পরিচয় সকলে জানিতে না পারিলেও উহার অস্তিত্ব সকলেই স্বীকার করে এবং বুঝিতেও পারে।

আল্লার 'দীদার' সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট। পাঠক! বুঝিতে চেষ্টা কর—আল্লার 'দীদার'-এর মধ্যে যেমন ও যত সুখ পাওয়া যায় অন্য কোন পদার্থে তেমন ও তত সুখ পাওয়া যাইতে পারে না। (টীঃ ৪৪৬) কিন্তু তোমরা সাধারণতঃ সকল মুছলমানের মুখে একথা শুনিতে পাও যে "আল্লার দীদারের তুল্য মিষ্ট আনন্দ আর কোন পদার্থে নাই।" এ কথাটী কিন্তু সর্ব্ব সাধারণের অভিজ্ঞতা-

টীকা—৪৪৬। 'দীদার' ও 'মারেফত' শব্দের অর্থ ও পার্থক্য জানা আবশ্যক। 'মারেফত' শব্দের অর্থ তত্ত্ব-জ্ঞান বা 'পূর্ণ পরিচয়'। আল্লা, ফেরেশতা, মানবাত্মা, পরকাল প্রভৃতি আধ্যাত্মিক পদার্থ, জল, স্থলাদি জড় পদার্থ, অগ্নি, তেজ, আলোক, শব্দ ইত্যাদি জড়ীয় অবস্থা; জীবন মরণ, লোভ, ক্রোধ, অনুরাগ, বিরাগ প্রভৃতি জড় ও অজড় পদার্থের মিলনোৎপন্ন এবং ঐ প্রকার যাবতীয় ব্যাপার, ক্রিয়া, গুণ ইত্যাদি বাস্তব অবস্থা, অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয় যোগে জানাকে 'মারেফৎ' বলে। আর মৃত্যুর পর আত্মা যখন দেহের চাপ হইতে ও দেহ-জাত সংস্কারের আবিল্য হইতে নির্ম্মুক্ত হইবে তখন 'অসংখ্য-পদার্থ-গুচ্ছের-মূল-বৃন্ত' আল্লাকে সাক্ষাৎভাবে সন্দর্শন করাকে 'দীদার' বলে। জীবিতকালে আত্মা দেহাবদ্ধ থাকায় চক্ষু কর্ণাদির অধিকার বিভিন্ন পথে সীমাবদ্ধ থাকে এবং তজ্জন্য চক্ষুর দ্রষ্টব্য পদার্থ কর্ণ জানিতে পারে না। মৃত্যুর পর সে বাধা ঘুচিয়া যায়। তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি বৃত্তি সোজা ভাবে ওতপ্রোত ভাবে পূর্ণ বলে আল্লার বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করতঃ বিমুগ্ধ হইবে। 'দীদার'—সর্ব্বতোভাবে সন্দর্শন। মারেফৎ—পূর্ণ পরিচয় বা তত্ত্ব-জ্ঞান।

লব্ধ-জ্ঞানের কথা নহে। ইহা তাহাদের সম্প্রদায়-গত-মানিত 'বিশ্বাসের' কথা। বিচার করিয়া দেখ—যে পদার্থ অনন্ত, কোনও দিকে যাহার সীমা নাই—কোন দিক্ দিয়া যাহাকে দেখিয়া শেষ করিতে পারা যায় না, এবং যাহার আকার, প্রকার বা বর্ণ নাই তাহাকে কেমন করিয়া দেখা যাইবে? এবং সে দর্শনে আনন্দই বা কিরূপে জন্মিবে? সে অনন্ত বস্তু কি প্রকার, তাহাই যখন বুঝা যাইবে না, তখন আনন্দ কোথা হইতে আসিবে? তবে কথাটা 'ধর্ম্ম-শাস্ত্রের' বিধান বলিয়া সকলে মুখে মানিয়া লয় ও 'অন্ধ-বিশ্বাস' করিয়া থাকে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের হৃদয়, সহসা সে কথা গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের মনে আল্লার জন্য অনুরাগ বা আসক্তি জন্মিতে পারে না! মানুষ যে বস্তু জানে না বা জানিতে পারে না তাহার প্রতি আসক্তি কেমন করিয়া হইতে পারে? যাহা হউক, এ প্রহেলিকার বিচার এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে হওয়া দুষ্কর; তথাপি আমরা ঈঙ্গিতে কিছু কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

অলক্ষ্য ও দুজ্ঞের্য় আল্লার দীদার কিরূপে সম্ভব তাহা ইঙ্গিতে বুঝিতে হইলে চারিটী মূল তথ্য জানা চাই। পাঠক! জানিয়া রাখ—অলক্ষ্য ও দুজ্ঞের্য় আল্লার দীদার কিরূপে সম্ভব—এ প্রহেলিকার বিচার ও নিষ্পত্তি নিম্নলিখিত চারিটী মূল তথ্যের উপর নির্ভর করিতেছে। সেই চারিটী মূল কথা জানিতে পারিলে আল্লার দীদার যে সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট একথা বুঝিতে পারা যাইবে। (১) 'এলেম' ও 'মারেফৎ' হইতে যে আরাম ও আনন্দ পায় তাহার মধ্যে চক্ষু-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বা হস্ত-ত্বকাদি অঙ্গের কোন সংস্রব নাই। (২) হৃদয়ের 'বিশেষ প্রকৃতি' অর্থাৎ বুদ্ধি বৃত্তি, জ্ঞান হইতে যে আনন্দ পাইয়া থাকে তাহা ইন্দ্রিয়-লব্ধ বা প্রবৃত্তি-লব্ধ আনন্দ অপেক্ষা অধিক মিষ্ট—অধিক প্রবল। (৩) আল্লার 'মারেফৎ' অন্য পদার্থের 'মারেফৎ' অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট। (৪) আল্লার 'দীদার' আল্লার 'মারেফৎ' অপেক্ষা অধিক আনন্দদায়ক। যাহা হউক, মানব যখন এই চারিটী মূল-তথ্য (টীঃ ৪৪৭) জানিতে পারিবে তখন সে নিশ্চয়—অতি নিশ্চয়—এ কথাও বুঝিতে পারিবে যে 'আল্লার দীদার অপেক্ষা অন্য কোন পদার্থ আনন্দদায়ক নহে।'

টীকা—৪৪৭। মূল গ্রন্থে যে ক্রম অবলম্বনে মূল-তথ্য-চতুষ্টয়ের নাম লিখা হইয়াছে, পরে বিস্তৃত পরিচয় দিবার সময়ে সে ক্রম রক্ষিত হয় নাই অর্থাৎ ঠিক প্রথমের পর দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি দেওয়া হয় নাই। আমরা পরিচয়ের নম্বর ঠিক রাখিয়া নামের স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া দিলাম।

আল্লার দীদারের তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য জ্ঞাতব্য প্রথম মূল তথ্য। ইহা বুঝা আবশ্যক যে—জ্ঞান ও 'মারেফৎ' হইতে আত্মা যে অভূতপূর্ব্ব আরাম ও আনন্দ পায় তাহার মধ্যে শরীর বা ইন্দ্রিয়াদির কোন সংস্রব নাই। পাঠক! জানিয়া রাখ—স্থষ্টি-কর্ত্তা আল্লা, মানবের মধ্যে বহু শক্তি ও বহু বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাদের প্রত্যেকটীকে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য স্বজন করিয়াছেন; যে কার্য্যের জন্য যে শক্তি স্বষ্ট হইয়াছে তাহাই তাহার 'প্রকৃতি' চায়। 'প্রকৃতি' যে কার্য্য চায় তাহা করিতে গেলে সুখ ও আনন্দ ভোগ করিতে পায়। দেখ উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ ও সুবন্দোবস্ত স্থাপনের জন্য ক্রোধ-প্রবৃত্তির স্বষ্টি হইয়াছে। তদ্রূপ কার্য্য করিতে গিয়া ক্রোধ আনন্দ পায়। খাদ্য এবং ভোগ্য বস্তু সংগ্রহ জন্য লোভকে স্বজন করা হইয়াছে। ভোগের বস্তু লাভ করিতে পারিলে লোভ পরিতৃপ্ত হয় এবং তজ্জন্য অন্য প্রকার আনন্দ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি, এবং অন্যান্য বহু শক্তি পৃথক পৃথক কার্য্যের জন্য মানব-দেহে যুক্ত হইয়াছে, এবং তাহারা স্ব স্ব কার্য্য করিয়া বিভিন্ন প্রকার আরাম ও আনন্দ পায়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, প্রত্যেক বৃত্তি বা শক্তির জন্য আনন্দ পৃথক পৃথক। এমন কি একের আনন্দের সহিত অন্যের আনন্দের বিরোধ আছে। দেখ—কাম প্রবৃত্তির সহিত ক্রোধের বিরুদ্ধ সম্পর্ক আছে। কাম প্রবৃত্তি যাহা পাইলে চরিতার্থ হয় তাহার উপর কেহ কখনই ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারে না—আবার ক্রোধের উদয় হইলে কাম-ভাব লুকাইয়া যায়। আবার দেখ- শক্তির তীব্রতা ও ক্ষীণতার তারতম্য অনুসারে আনন্দের ইতর বিশেষ হয়। ভোজন-লোভ, খাদ্য পাইলে আনন্দ পায়। তাহার উপর ক্ষুধা যদি ভোজন-লোভকে বিশেষ উত্তেজিত করিয়া দেয়, তবে সে আহারে যত সুখ ও আনন্দ মেলে, সুধু লোভে তত মিলে না। আবার প্রবৃত্তি বা শক্তি গুলির মধ্যে কোনটীকে স্বষ্টিকর্ত্তা স্বভাবতঃ অন্য অপেক্ষা বলবান করিয়া দিয়াছেন! বলবান প্রবৃত্তি, অবশ্যই দুর্ব্বল প্রবৃত্তি অপেক্ষা অধিক আনন্দ পাইবার যোগ্য। দেখ—মানুষের ঘ্রাণেন্দ্রিয় অপেক্ষা দর্শনেন্দ্রিয় স্বভাবতঃ প্রবল। এইজন্য সুগন্ধ আঘ্রাণে লোকে যে সুখ ও আনন্দ পায় তদপেক্ষা রমণীয় বস্তুর দর্শন-জাত-আনন্দ স্বভাবতঃ প্রখর হইয়া থাকে। স্বষ্টিকর্ত্তা মানবের মনে বুদ্ধি নামক এক আশ্চর্য্য শক্তি স্থাপন করিয়াছেন। মানবের

তত্ত্বজ্ঞানলব্ধ আনন্দ ইন্দ্রিয়াতীত

মধ্যে যত প্রবৃত্তি বা শক্তি আছে তন্মধ্যে বুদ্ধি শক্তিকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও বলবান করিয়াছেন। বুদ্ধি-বৃত্তি অন্তর-রাজ্যের একমাত্র প্রবল শক্তি। উহা বাহ্য শরীরের দর্শন-শ্রবণাদি সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়-বল অপেক্ষা এবং কাম-লোভাদি আভ্যন্তরিক প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিতান্ত প্রবল। বুদ্ধি-শক্তিটী জ্ঞানের আলোক। যে সকল পদার্থ কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না, তৎসমুদয়ের পরিচয় ঐ বুদ্ধি-বলে জানা যায়। বুদ্ধির স্বভাব এই যে, সে সমস্তই জানিতে চায় সুতরাং জানিতে পারিলে বুদ্ধি নিতান্ত আনন্দ পায়। বুদ্ধি-শক্তি সকল শক্তি—সকল প্রবৃত্তি—ও সকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা প্রবল, সুতরাং জ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধি যেরূপ প্রবল ও প্রখর আনন্দ ভোগ করিতে পায় এত আনন্দ আর কোন ইন্দ্রিয় বা প্রবৃত্তি পায় না। মানব বুদ্ধিবলে ইহা জানিতে পারে যে, এই বিশাল বিশ্ব-জগতের অবশ্য একজন কর্ত্তা আছে; তিনি অসীম ক্ষমতাশালী, তাঁহারই ক্ষমতা-সঞ্চালনে এই বিশ্ব-জগতের স্থিতি অক্ষুণ্ণ আছে। তাঁহার সৃষ্ট-পদার্থেও কারুকার্য্যের মধ্যে যে কৌশল বিদ্যমান আছে তাহা বুদ্ধি জানিতে পারে। এইরূপ ব্যাপার অন্য কোন ইন্দ্রিয় কখন জানিতে পারে না। মানুষ, বুদ্ধিবলে আভিধানিক শব্দ উচ্চারণ করিয়া বা সেই কথা কাগজে লিখিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে। গণিত শাস্ত্রের অঙ্ক নির্ণয় পূর্ব্বক তাহার যোগ বিয়োগে নূতন সত্য নির্ণয় করিতে পারে। এক জ্ঞানের সহিত অন্য জ্ঞান মিলাইয়া নূতন জ্ঞান অবধারণ করিতে পারে। উক্ত প্রকার সমস্ত কার্য্য বুদ্ধি-বলেই সম্পন্ন হয়। আবার বুদ্ধিব সাহায্যে নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হয়। তাহার প্রভাবে জগতে সভ্যতার বৃদ্ধি হয়। উক্ত প্রকার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে বুদ্ধির সৃষ্টি। সুতরাং তদ্রূপ কার্য্য করিতে স্বভাবতঃ বুদ্ধি চায় এবং তাহা সম্পন্ন করিতে পারিলে, অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। বুদ্ধি এ সকল শ্রেষ্ঠ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আনন্দ পায় বটে আবার তুচ্ছ বা ঘৃণিত কার্য্য করিয়াও আনন্দ অনুভব করে। কেহ তুচ্ছ কার্য্যের জ্ঞান দৃষ্টে কাহাকে প্রশংসা করিলে সে ব্যক্তি অবশ্য আনন্দ অনুভব করে। আবার দেখ, কেহ যদি বলে—'তুমি ইহা জান না' তবে সে অবশ্যই দুঃখিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, লোকে নিজের জ্ঞানকে পূর্ণ বলিয়া জানে। যে ব্যক্তি 'শতরঞ্জ' খেলায় অভিজ্ঞ, সে তদ্রূপ খেলার মজলিসে বসিলে নিজের ক্রীড়া-পটুতা ও গুণপনা 'জাহির' না করিয়া থাকিতে পারে না।

তৎকালে কেহ যদি তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া বলে যে—"আমাদের শতরঞ্জ খেলার 'চাল' সম্বন্ধে তুমি কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবে না—যদি কর তবে তোমাকে অমুক শাস্তি দিব।"—তবুও খেলওয়াড় লোক, খেলার মজলিসে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। 'অমুক গুঁটী চালিলে এই ফল হইবে' ইত্যাদি মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া সে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। শতরঞ্জ খেলার ন্যায় জঘন্য কার্য্যের আনন্দ-সুখে সে বিভোর হইয়া পড়ে বলিয়া নিজের গর্ব্ব প্রকাশের সুযোগ সর্ব্বদাই অনুসন্ধান করিতে থাকে। জ্ঞান, উৎকৃষ্ট বস্তুর সম্বন্ধেই হউক, বা নিকৃষ্ট ব্যাপারেই হউক সর্ব্বত্র আনন্দ দায়ক। জ্ঞান লাভ করিলেই মানুষ বাহাদুরী অনুভব করে। ইহার কারণ এই যে, জ্ঞান, মহাপ্রভু আল্লার এক গুণ; তজ্জন্যই উহা মানুষের মনে বড় মিষ্ট লাগে, এবং তজ্জন্যই সে গর্ব্ব অনুভব করে। জ্ঞানের আধিক্য লইয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠতা পরিমিত হয়। মানুষের নিকট জ্ঞানের পূর্ণ উন্নতি ভিন্ন আর কোন পদার্থ অধিক আনন্দদায়ক হইতে পারে না। যে জ্ঞান আল্লার গুণ হইতে লব্ধ তদপেক্ষা আর কোন্ পদার্থ অধিক গৌরবের সামগ্রী? যাহা হউক, পাঠক! তুমি এই মূল তথ্য হইতে এ কথা বুঝিতে পারিলে যে, তত্ত্ব-জ্ঞান হইতে যেরূপ প্রখর আনন্দ-লব্ধ হয় তাহার মধ্যে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন অধিকার নাই।

আল্লার দীদারের তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য জ্ঞাতব্য দ্বিতীয় মূল তথ্য। ইহা বুঝা আবশ্যক যে—হৃদয়ের 'বিশেষ প্রকৃতি' অর্থাৎ বুদ্ধি বৃত্তি, মা'রেফৎ-জ্ঞান পাইয়া চরিতার্থ হইলে যে আনন্দ ভোগ করিতে পায়, তাহা চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় বা কাম-লোভাদি প্রবৃত্তি-চরিতার্থ জনিত আনন্দ অপেক্ষা অতীব মিষ্ট—অতীব প্রবল। বুদ্ধি-বৃত্তি জ্ঞান ভোগ করিয়া

ইন্দ্রিয়লব্ধ আনন্দ অপেক্ষা জ্ঞানলব্ধ আনন্দ প্রবল

যেরূপ পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হয়, সুদৃশ্য দর্শনে, বা মিষ্ট স্বর শ্রবণে বা সুগন্ধ আঘ্রাণে, বা সুখ-স্পর্শনে, সুমিষ্ট আস্বাদনে তেমন আনন্দ পায় না। এমন কি কাম ও লোভাদি প্রবৃত্তি স্ব স্ব ভোগ্য পদার্থ ভোগ করিয়াও তেমন সুখ পায় না। পাঠক! বুঝিয়া লও—শতরঞ্জ ক্রীড়াসক্ত ব্যক্তি উক্ত খেলায় প্রবৃত্ত হইলে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে। তাহাকে খেলা ত্যাগ করিয়া আহার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেও সে 'বাজী জিতিবার' ও 'মাৎ' করিবার আশাসুখে এমন বিভোর থাকে যে সারাদিন অনাহারে থাকিলেও কষ্ট

বোধ করে না। যে ব্যক্তি শতরঞ্জ খেলাকে, আহার গ্রহণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে তাহার ব্যবহারে ইহাই বুঝা যায় যে তাহার মন আহার-কার্য্যে যে আনন্দ পায় শতরঞ্জ খেলা হইতে তদপেক্ষা অধিক আনন্দ পাইয়া থাকে। দুইটী কার্য্যের মধ্যে কোন্‌টী অধিক আনন্দ দেয় জানিতে হইলে, উভয় প্রকার কার্য্যকে মনের সম্মুখে স্থাপন করিয়া দেখিতে হয়, যাহার দিকে মন অধিক আকৃষ্ট হয় তাহাই অধিক আনন্দদায়ক। বুদ্ধিমান লোকের মনে বুদ্ধিও থাকে, অন্য প্রবৃত্তিও থাকে। তাহার সম্মুখে বুদ্ধির কার্য্য ও অন্য কার্য্য উপস্থিত হইলে যাহার মধ্যে বুদ্ধি চরিতার্থ হইবার উপায় আছে সেই কার্য্যের দিকে স্বভাবতঃ তাহার মন ধাবিত হয়। ইহার কারণ এই—যে কার্য্যে বুদ্ধি চরিতার্থ হয় তাহাতে আনন্দ উৎপন্ন হয়। মনে কর, এক বুদ্ধিমান বীর-প্রকৃতি লোকের সম্মুখে যুগপৎ দুটী কার্য্য উপস্থিত হইল। এক কার্য্যে সুপক্ক পক্ষী-মাংস সহ উপাদেয় পলান্ন ভোজন করতঃ দুগ্ধ-ফেণ-নিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা সুখ ভোগ করিতে হইবে। অন্য কার্য্যে, সম্মুখস্থ দুর্দ্দম্য সেনার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধে পরাজিত হইলে ক্রীতদাস রূপে বিক্রীত হইয়া হীন জীবন যাপন করিতে হইবে; আর জয়ী হইতে পারিলে, বহু বিস্তৃত রাজ্য, প্রভুত ধন-রত্ন ও উজ্জ্বল যশের অধিকারী হইতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত ভোজন, শয়ন ও নিদ্রার মধ্যে বুদ্ধি খাটাইবার স্থান নাই, সুতরাং সে সকল কার্য্যে বুদ্ধি চরিতার্থ হইবার ও তজ্জনিত আনন্দ ভোগ করিবার উপায় নাই। এদিকে যুদ্ধ-কার্য্য, জয়-লাভ, রাজ্য পালন ও ধন-রত্ন-লাভ, এবং তৎসমুদয় রক্ষণ ও সংবর্দ্ধন ইত্যাদি সর্ব্ববিধ কার্য্যে বিশেষ উন্নত-বুদ্ধির প্রয়োজন। এরূপ কার্য্যের সর্ব্বত্র বুদ্ধি খাটাইবার স্থান আছে এবং বুদ্ধি চরিতার্থ হইবারও উপায় আছে এবং তদ্রূপ কার্য্যে বুদ্ধি চরিতার্থ হইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ ভোগ করিতে পারে। এই সকল কারণে, সেই বুদ্ধিমান বীর পুরুষ উপাদেয়, আহার আদি ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য ধাবিত হন। কিন্তু সে ব্যক্তি বালকের ন্যায় অবোধ হইলে কখনই সে দিকে যাইত না। যাহা হউক, যাহার মনে আহারের লোভ ও রাজকীয় সম্মান-লালসা উভয় বর্ত্তমান থাকে সে রাজ-সম্মান-লাভ করিবার উপায় অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহা হইতেও বুঝা যাইতেছে জ্ঞান-সম্ভূত আনন্দের মাধুর্য্য অন্য আনন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে সকল বিদ্বান্ লোকেরা গণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি শাস্ত্র কিম্বা চিকিৎসা বিদ্যা অথবা ধর্ম্ম-

বিধান অধ্যয়ন করেন তাঁহারা তৎ তৎ বিদ্যা হইতে এক প্রকার আনন্দ ভোগ করিতে পান। আবার ঐ সকল বিদ্যায় যাঁহারা বিশেষ দক্ষতা ও পারদর্শিতা লাভ করিয়া থাকেন তাঁহারা তৎ তৎ জ্ঞান হইতে চূড়ান্ত আনন্দ উপভোগ করিতে পান। তাঁহাদের তদ্রূপ জ্ঞান চূড়ান্ত বর্দ্ধিত হইলে তজ্জনিত আনন্দ এমন উৎকৃষ্ট হয় যে রাজকীয় ক্ষমতা পরিচালনের আনন্দকেও তাঁহারা তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারেন। কিন্তু ঐ প্রকার বিদ্বান্ লোকের বিদ্যার মধ্যে অপূর্ণতা থাকিলে এবং তজ্জন্য তাহা হইতে আনন্দ পাইতে না পারিলে রাজকীয় সম্মানকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে না। এইরূপ প্রমাণেও বুঝা যায় জ্ঞানের আনন্দ অন্যান্য প্রবৃত্তির আনন্দ অপেক্ষা অতীব উৎকৃষ্ট। (টীঃ ৪৪৮) তবে কথা এই যে, যে ব্যক্তি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মারেফৎ জ্ঞানে বিশেষ-পূর্ণ-ভাবে পরিপক্ক এবং যাঁহার মধ্যে বুদ্ধি-প্রবৃত্তির সঙ্গে অন্য প্রবৃত্তিও আল্লা স্থাপন করিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহার মনে, অন্তর্জগতের প্রধান-বৃত্তি বুদ্ধি সতেজ ও ও নির্দ্দোষ অবস্থায় পূর্ণ-ভাবে বিকাশ পাইয়াছে এবং তজ্জন্য স্বীয় লোভনীয় মারেফত জ্ঞান পূর্ণ-ভাবে উপার্জ্জন করিতে ব্যাকুল হইতেছেন এবং সেই মনের মধ্যে 'খাহেশ'-শ্রেণীর অন্য প্রবৃত্তিও আল্লা জন্মাইয়া দিয়াছেন এবং এই প্রবৃত্তিও নিজের লোভনীয় 'বিষয়' পাইতে ব্যাকুল হইতেছে কিন্তু প্রবল 'বুদ্ধির' শাসনে নিয়মিত ও সংযত হইয়া চলিতেছে, সেই ব্যক্তির নিকট 'মারেফত-জ্ঞানের আনন্দ অন্য সর্ব্ববিধ আনন্দ অপেক্ষা অতীব প্রবল এবং অধিক মিষ্ট।' অল্প-বুদ্ধি-বালকের অবস্থা লইয়া বিচার করিলেও, আমাদের প্রতিপাদ্য উক্ত সত্যটী প্রমাণিত হইবে—কিছুমাত্র দোষ স্পর্শিবে না। বালকের বুদ্ধি পূর্ণ-বিকশিত হয় না সুতরাং রাজকীয় সম্মানে কিরূপ আনন্দ তাহাও সে তত বুঝিতে পারে না। আবার তাহার মনে কাম প্রবৃত্তিও তখন সম্পূর্ণ বিকাশ পায় না সুতরাং স্ত্রী-সহবাসের আনন্দও পাইবার যোগ্য হয় না। তজ্জন্য বালকেরা রাজকীয় ক্ষমতা লাভে বা স্ত্রী-সহবাসের দিকে যায় না; তখন 'পত্র-নির্ম্মিত' বাঁশী বাজাইয়া ও সামান্য মিষ্ট স্বর শুনিয়াই আনন্দিত হয়। তখন শিশুগণের ন্যায় 'ধূলামাটী' লইয়া খেলা করিয়া শরীর ও বস্ত্র মলিন করিতেও চায় না। ধূলা মাটীর খেলাকে ঘৃণা করিতে বালক, বুদ্ধির পরামর্শেই শিখে; এবং পাতা দিয়া কি প্রকারে বাঁশী প্রস্তুত করিতে হয় এবং সেই পত্র কি অবস্থায়

টীকা—৪৪৮। এই প্যারার অন্তর্গত এই টীকা চিহ্ন হইতে পরবর্তী তারা চিহ্ন পর্য্যন্ত কথাগুলি, মূল গ্রন্থের অনুবাদ নহে। গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত কথা বিস্তৃতভাবে লেখা গেল।

স্থাপন করিলে স্বর সুমিষ্ট লাগে তদ্রূপ শিক্ষা পাওয়াও বুদ্ধির কার্য্য। যাহা হউক, বালকের অবস্থাতেও বুঝা যায় 'জ্ঞানের আনন্দও অপর আনন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' * * * যাহা হউক, ইহা হইতে একথাও পাওয়া গেল যে দুটী লোভনীয় পদার্থ সম্মুখে স্থাপিত হইলে মন যে দিকে ধাবিত হয় তাহা হইতে অধিক আনন্দ পাওয়া যায়।

আল্লার দীদারের তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য জ্ঞাতব্য তৃতীয় মূল তথ্য। ইহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক যে—আল্লার তত্ত্ব-জ্ঞান অর্থাৎ পরিচয়-জ্ঞান, অন্য পদার্থের পরিচয় জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

অন্য পদার্থের পরিচয়-জ্ঞান অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞান উৎকৃষ্ট

পাঠক! ইতিপূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছ সর্ব্ববিধ জ্ঞান বিশেষতঃ তত্ত্ব-জ্ঞান নিতান্ত আনন্দ দায়ক। কাম ক্রোধাদি জ্ঞানের মধ্যে সকল জ্ঞান সমান নহে—এক প্রকার জ্ঞান অন্য প্রকার জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জ্ঞেয় পদার্থের মধ্যে যাহা যত উৎকৃষ্ট—তাহার পরিচয়-জ্ঞানও তত উৎকৃষ্ট। দেখ শতরঞ্জ ক্রীড়ার পদ্ধতি-আবিষ্কার-কার্য্য, উহার খেলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন কার্য্য, কৃষিকার্য্য বা সেলাই কার্য্য অপেক্ষা গৌরবজনক। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিধান এবং উহার উদ্দেশ্য-নির্ণয় অবশ্যই বাক্য-রচনা ও সাহিত্য-জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মন্ত্রীগণের কার্য্য নিশ্চয়ই দোকানদারদিগের কার্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। রাজ-কার্য্যের জ্ঞান, মন্ত্রীর কার্য্যের জ্ঞান অপেক্ষা মহৎ। জ্ঞাতব্য বিষয় যেরূপ শ্রেষ্ঠ হইবে তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানও অবশ্যই সেই পরিমাণ উৎকৃষ্ট হইবে এবং সেই জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে সেই পরিমাণ উচ্চ-আনন্দ ভোগ করিতে পাওয়া যাইবে। পাঠক! এখন কিঞ্চিৎ ভাবিয়া দেখ—এই বিশ্ব জগতের যাবতীয় পূর্ণতা ও সমস্ত সৌন্দর্য্য, মহাপ্রভু আল্লাই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার এই সৃজন কার্য্য অপেক্ষা আর কোন্ কার্য্য উৎকৃষ্ট ও মহৎ হইতে পারে? তাঁহার বাদশাহী, বিশ্বজগত ব্যাপিয়া—আকাশ পাতাল জুড়িয়া—ইহকাল পরকাল ধরিয়া, বর্ত্তমান আছে। তাঁহার শাসন দণ্ড যেরূপ অপ্রতিহত ভাবে পূর্ণ মঙ্গল উৎপন্ন করিয়া জগতের সর্ব্বত্র চলিতেছে, এই পার্থিব রাজার রাজ্যে তদ্রূপ হওয়া অসম্ভব। তাঁহার বাদশাহীর মধ্যে সুবিচার যেমন অযাচিত ভাবে সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে ভূতলের কোনও রাজার রাজ্যে তেমন ভাবে সুবিচার পরিচালিত হওয়া অসম্ভব। তাঁহার বিচারালয়ে যেরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব্ববিধ মোকদ্দমা একই ধরণে নিষ্পত্তি হয়—

এক চুল পরিমাণে কাহারও ক্ষতি হয় না—কোনও পার্থিব নরপতির বিচারালয়ে তদ্রূপ হইতে পারে না। আল্লা দয়া করিয়া যাহাদিগকে তাঁহার অসীম রাজত্বের অবস্থা দর্শনের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার রাজকীয় গুপ্ত রহস্য যাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন তাহারা আল্লার অত্যাশ্চর্য্য বিস্ময়কর রাজ্যের তামাশা দর্শন ছাড়িয়া অন্য কোন তামাশা দেখিতে মনোনিবেশ করিতে পারে না। এই সকল কথা হইতে বুঝা গেল—আল্লার অস্তিত্ব ও গুণাবলী এবং তাঁহার রাজত্ব ও তদন্তর্গত গুপ্ত রহস্য ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের 'পরিচয়' সর্ব্ববিধ মারেফত (পরিচয়-জ্ঞান) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কেননা ঐ সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি সমস্তই অতীব মহত্তর। আল্লা ও আল্লার সম্বন্ধীয় ব্যাপারকে মহত্তর বলাও অন্যায়, কেননা দুই পদার্থের মধ্যে তুলনা করিয়া একটী মহৎ হইলে তাহাকে 'মহত্তর' বলা হয়। জগতে আল্লা ভিন্ন অন্য পদার্থের অস্তিত্ব নাই সুতরাং তাঁহাকে 'মহত্তর' বলা কিরূপে সঙ্গত হয়।

যাহা হউক, প্রকৃত চক্ষুষ্মান আরেফ লোক এই নিম্ন পৃথিবীতে অবস্থিতি করিবার সময়ে উচ্চ বেহেশ্তে বিচরণ করিয়া থাকেন এ সম্বন্ধে মহাপ্রভু আল্লা বলিয়াছেন—

عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ○

"গগণ মণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বিস্তৃতির ন্যায় তাঁহার (মারেফতের) বিস্তৃতি।" (২৭ পারা। সূরা হদীদ। ৩ রোকু।) বরং তত্ত্ব-জ্ঞানের বিস্তৃতি তদপেক্ষা প্রশস্ত। আকাশ ও পাতাল যত বড় প্রশস্ত হউক না কেন, তাহাদের পরিসরে সীমা আছে, কিন্তু তত্ত্ব-জ্ঞানের সীমা নাই। উহা চক্ষুষ্মান আরেফ লোকের পক্ষে রম্য উদ্যান সদৃশ। সে উদ্যানের অমৃতময় ফল কখন ফুরায় না—সর্ব্বদা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ-যোগ্য অবস্থায় থাকে। আবার উহা ভোগ করিতে কাহারও প্রতি বাধা নাই। এই জন্য মহাপ্রভু আল্লা বলিতেছেন—

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ○

"তাহার ফল অতি নিকটবর্ত্তী।" (২৯ পারা। সূরা হাক্কাৎ। ১ রোকু।)

তত্ত্ব-জ্ঞানের সুফল আরেফগণের মনে অবস্থিত

নিকটবর্ত্তী বলিবার কারণ এইযে তত্ত্ব-জ্ঞানের সুরসাল ফল, 'আরেফ' লোকের মনের মধ্যেই থাকে। মনে যাহা থাকে তাহা অপেক্ষা আর কোন্ পদার্থ অধিক নিকবর্ত্তী হইতে পারে? এই বেহেশ্তের ফল ভোগের সময়ে জনতার ভিড়ে কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। কেহ ফল ভোগ নিষেধ করে না বা বাধা দেয় না অথবা ঐ ফল লইয়া কাহার সহিত প্রতিযোগিতা হয় না সুতরাং ঈর্ষা দ্বেষের কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে না। তত্ত্ব-দর্শন ক্ষেত্রে যাহার যত বড় তীক্ষ্ণ চক্ষু থাকে সে তত উৎকৃষ্ট বস্তু দর্শন করিয়া আনন্দ ভোগ করিতে পায়। এ বেহেশ্‌ৎ এমন আশ্চর্য্য যে লোক সংখ্যা যতই অসীম হউক না কেন স্থানের অপ্রতুলতা কখনই ঘটে না; বরং লোক সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে বেহেশ্‌তের পরিসর বাড়িয়া যায়। (টীঃ ৪৪৯)

আল্লার দীদারের তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য জ্ঞাতব্য চতুর্থ মুল তথ্য। ইহা বুঝা আবশ্যক যে—আল্লার 'দীদার', আল্লার 'মারেফত' অর্থাৎ পরিচয়-জ্ঞান হইতে উৎকৃষ্ট। পাঠক! জানিয়া রাখ জ্ঞান দুই প্রকার। এক প্রকার, কেবল 'খেয়ালে' আসে, যথা বর্ণ, আকৃতি। দ্বিতীয় প্রকার, বুদ্ধি-বলে পাওয়া যায়—খেয়ালে আসে না, যেমন আল্লাও আল্লার গুণ; বরং মানবেরও কতকগুলি গুণ বা অবস্থা আমাদের খেয়ালে আসে না বটে কিন্তু বুদ্ধিতে বুঝা যায়। যথা—ক্ষমতা, ইচ্ছা, জীবন, মরণ এ সমস্ত পদার্থ কি প্রকার, তাহা কাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। ক্রোধ, প্রেম,

টীকা—৪৪৯। জ্ঞান পরম আনন্দদায়ক পদার্থ। বুদ্ধি যে সকল বিষয় আলোচনা করিয়া আনন্দভোগ করে তাহাকে বেহেশ্‌ৎ বলা গেল। জ্ঞানী লোকের সংখ্যা যত বর্দ্ধিত হয় ততই তাঁহারা নব নব জ্ঞান, আবিষ্কার করেন। জল একটী সুপরিচিত সাধারণ বস্তু। ইহা হইতে দিন দিন বহু জ্ঞান আবিষ্কৃত হওয়াতে বহু জ্ঞানী সেই নূতন জ্ঞান অবলম্বনে আবার অনাবিষ্কৃত জ্ঞান অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছেন। দেখ জলের শৈত্য তরলত্ব গুণ বহু অগ্রে লোকে জানিয়া তদ্দ্বারা কত কাজ করিয়া লইয়াছে। শৈত্য প্রয়োগে কত রোগ আরাম করা হইতেছে, তাহাতে চিকিৎসা শাস্ত্রের এক নূতন পথ খোলা গিয়াছে, তাহার মধ্যে কত জ্ঞানী লোক গবেষণায় নিমগ্ন হইয়া নব নব জ্ঞান-পথ খুলিতেছেন। তরলত্ব গুণ-দ্বারা কত কাজ হইতেছে, পরে জলের বাষ্পোৎপত্তির তথ্য আবিষ্কৃত হইলে ইঞ্জিন কল প্রস্তুত হইয়া রেল ষ্টিমার প্রস্তুত হইতেছে, বরফ প্রস্তুতের প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং প্রত্যেক বিভাগে কত লোক স্ব স্ব জ্ঞান নূতন নূতন ভাবে খাটাইতে তৎপর আছেন। এক জল সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পথ যত বিস্তৃত হইয়াছে তত জ্ঞানী লোকের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে, এবং যতই জ্ঞানীর সংখ্যা বাড়িতেছে জ্ঞানের ভূমি তত প্রসারিত হইতেছে।

অভিলাষ এ সকল পদার্থও 'খেয়ালের' বহির্ভূত। এই প্রকার বহু পদার্থ আছে তাহা কেবল বুদ্ধি শক্তিতে বুঝিতে পারা যায়। যে সকল পদার্থ 'খেয়ালের' আয়ত্ত তাহা লোকে দুই প্রকারে জানিতে পারে। এক প্রকার—বস্তুটী খেয়ালের সম্মুখে রাখিয়া বুঝিয়া লওয়া হয়; তাহাতে বোধ হয় যেন তাহাকে খেয়ালের চক্ষেই দর্শন করা হইতেছে। এ উপায়ে পদার্থকে সম্পূর্ণ রূপে জানা যায় না সুতরাং এ উপায়-লব্ধ-জ্ঞান নিতান্ত কাঁচা। দ্বিতীয় প্রকার—বস্তুটী প্রকৃত চক্ষে দর্শন করা হয়; এ উপায়ে বর্ণাদি অবস্থা উত্তমরূপে জানা যায়। ইহা প্রথম প্রকারের জানা অপেক্ষা উন্নত ও পূর্ণ। এই কারণে প্রিয়জনকে খেয়ালের চক্ষে দর্শন করিলে যে আনন্দ জন্মে, স্বচক্ষে দর্শন করিলে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আনন্দ পাওয়া যায়। ইহার কারণ খুঁজিবার সময়ে ইহা মনে করিও না যে, দর্শনের সময়ে যে আকৃতি দেখা গিয়াছিল তাহা খেয়ালের সময়ে বুঝা যায় নাই অথবা সে সময়ে অন্য এক উৎকৃষ্ট আকারে ছিল; বরং উভয় সময়ে একই আকৃতি দেখা যায়, তবে কথা এইযে—দর্শনের সময়ে অধিক উজ্জ্বল ভাবে পরিষ্কার দেখা গিয়া থাকে। দেখ—কোন প্রেমিক স্বীয় প্রিয়-জনকে উষার অন্ধকারে দেখিলে যেরূপ দেখা যায়, দিন চড়িলে, রৌদ্রের আলোকের মধ্যে দেখিলে তদপেক্ষা সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এবং তজ্জন্য অধিক আনন্দ ও তৃপ্তি মিলে। ইহার কারণ কি? উষার ঘোরে যে আকৃতি দেখা যায় সে আকৃতি কি পরে পরিবর্ত্তিত হয়? তাহা নহে। দিন দুপহরে রৌদ্রের আলোকে সেই আকৃতি অধিক উজ্জ্বল হয় মাত্র। এইরূপ, যে পদার্থ 'খেয়ালে' আসে না—কেবল বুদ্ধি-বলে জানা যায়, তাহার সম্বন্ধেও জানিবার ঐরূপ দুই প্রকার পথ আছে—(১) 'মারেফৎ,' (২) 'দীদার'। মারেফৎ, পূর্ব্বলিখিত খেয়ালের ন্যায় অস্পষ্ট; আর দীদার, দর্শনের ন্যায় উজ্জ্বল। এখন একটী সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিয়া লও—দর্শন অপেক্ষা খেয়াল অস্পষ্ট হইলেও সময়ে সময়ে দর্শনে বাধা পড়ে কিন্তু খেয়ালের পথ সর্ব্বদাই নিষ্কণ্টক থাকে। দেখ—চক্ষুর পলক বন্ধ করিলে দর্শনে বাধা পড়ে। পুনরায় পলকের ঢাকনী না সরাইলে অর্থাৎ চক্ষু না খুলিলে দেখা যায় না। কিন্তু খেয়ালের পথ কখনই বন্ধ হয় না।* এই প্রকার 'মারেফৎ' অপেক্ষা 'দীদার' সুস্পষ্ট হইলেও, সুস্পষ্ট 'দীদারের' পথ অবস্থা বিশেষে বাধা পড়িলে বন্ধ হয়; সে বাধা দূর হইলে বা সে অবস্থা ঘুচিয়া গেলে পুনরায় 'দীদার' সুস্পষ্ট হয়—কিন্তু 'মারেফতের' পথ কখনই বন্ধ হয়

না। রক্ত মাংস হইতে দেহ নির্ম্মিত; এবং উহারা আবার জল ও মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন; এমন দেহের মধ্যে আত্মা আবদ্ধ থাকাতে এবং ক্রোধ লোভাদি প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে জ্ঞান-চক্ষে সন্দর্শনের পথে, এক দুশ্ছেদ্য পর্দা উপস্থিত হয়; তাহাতে 'দীদার' অর্থাৎ জ্ঞান-চক্ষে সন্দর্শনের পথ বন্ধ হয়, কিন্তু 'মারেফৎ' অর্থাৎ জ্ঞান-চক্ষের খেয়ালের পথ বন্ধ হয় না। যে পর্য্যন্ত উক্ত পর্দা অর্থাৎ দেহ ও সাংসারিক আসক্তি ছিন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত 'দীদার' লব্ধ হয় না। এই কারণে মহাত্মা হজরৎ মুছা নবীকে মহাপ্রভু আল্লা বলিয়াছিলেন—

لَنْ تَرَانِيْ

"তুমি কখনই আমাকে দেখিতে পাইবে না।" (৯ পারা। সূরা আ'রাফ। ১৭ রোকু।) যাহা হউক, 'দীদার' যখন 'মারেফৎ' অপেক্ষা পূর্ণ ও উজ্জ্বল তখন তাহা হইতে লব্ধ আনন্দও অতি সুমিষ্ট সন্দেহ নাই।

আল্লার দীদার বা প্রত্যক্ষ দর্শন।

তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণ উন্নতিকে প্রত্যক্ষ দর্শন বলে। পাঠক! এস্থলে আর একটী গুপ্ত কথা শুন—শুক্রবিন্দু যে প্রকার পরিবর্ত্তনে পরিশেষে মানব-মূর্ত্তি ধারণ করে, বটাঙ্কুর যেমন পরিশেষে প্রকাণ্ড বট-বৃক্ষে পরিণত হয়, সেই প্রকার 'মারেফৎ'-জ্ঞান পরকালে কেয়ামতের দিনে প্রকাশ্য সন্দর্শন জ্ঞানে পরিণত হইবে। তখন উহার 'অবস্থা' আর এক প্রকারে পরিবর্দ্ধিত হইবে; আদিম অবস্থার সহিত শেষ অবস্থার সম্পর্ক থাকিবে না। শেষে তাহার পূর্ণ উন্নতির বিকাশ পাইবে এবং ক্রমোন্নতির পরিবর্ত্তনে নিতান্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। তত্ত্ব বা পরিচয় জ্ঞানের এবম্বিধ পূর্ণ উন্নতিকে 'দীদার' বা সন্দর্শন কহে। ইহকালে, 'মারেফৎ' অর্থাৎ তত্ত্ব-জ্ঞানের যেমন সীমা নাই, পর-কালে, 'দীদার' বা সন্দর্শন বা প্রত্যক্ষ দর্শনেরও সীমা থাকিবে না। ইহকালের 'মারেফৎ'কে পারলৌকিক 'দীদার' এর বীজ বলা যায়। যে ব্যক্তি 'মারেফৎ' জ্ঞানে ইহকালে বঞ্চিত, সে চিরকাল আল্লার 'দীদার' হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

ইহকালে লব্ধ তত্ত্ব-জ্ঞানই প্রত্যক্ষ-দর্শনের বীজ।

যে ব্যক্তি বীজ সংগ্রহ করিতে পারে নাই, সে শস্য কি প্রকারে লাভ করিবে? যে ব্যক্তি স্বীয় দর্শন-ক্ষমতা যত তীক্ষ্ণ করিতে পারে, তাহার পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য, তত নির্দ্দোষ ও তত উন্নত হইয়া থাকে।

প্রত্যক্ষ দর্শন ক্ষমতা সকলের সমান নহে। পাঠক! একথাটী জানিয়া রাখ—সকল ব্যক্তির 'দীদার' সমান প্রবল হয় না; এবং তজ্জন্য, সন্দর্শন-জনিত-আনন্দ সকলে সমান উপভোগ করিতে পাবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব তত্ত্ব-দর্শনের বল, তেজ প্রভৃতির পরিমাণানুসারে, 'দীদার' অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-সন্দর্শন-ক্ষমতা পাইয়া থাকে। হদীছ শরীফে এই সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"নিশ্চয় আল্লা স্বীয় জ্যোতিঃ সাধারণ ভাবে সকল মানুষের উপর, প্রকাশ করিবেন কিন্তু আবুবকরের উপর বিশেষ ভাবে প্রকাশ করিবেন।" এই হদীছের মর্ম্ম গ্রহণ কালে এরূপ মনে করিও না যে, মহাপ্রভু একবার একাকী মহাত্মা আবুবকরকে নিজের স্বরূপ দেখাইবেন এবং সে সময়ে বিশেষ ভাবে খুলিয়া দেখাইবেন, আর অন্যান্য সকল লোককে একত্র করিয়া, তাঁহার স্বরূপ সাধারণ ভাবে সকলকে দেখাইবেন। বরং আল্লা স্বীয় স্বরূপ সততঃ অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ করিতেছেন। মহাত্মা আবুবকর ছিদ্দীক, তত্ত্ব-জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় লাভ করিয়াছিলেন—অন্য ছাহাবাগণ তাঁহার তুল্য জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। এই বিশেষত্ব ছিল বলিয়া মহাত্মা আবুবকর ছিদ্দীক আল্লার 'দীদার' বিশেষ ভাবে পাইতে পারিয়াছেন। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) অন্য এক সময়ে বলিয়াছেন—"অন্যান্য ছাহাবাগণ অপেক্ষা আবুবকরের নমাজ রোজা প্রভৃতি সৎকার্য্যের সম্বল অধিক নহে; তবে একটী বিশেষত্ব তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় ভাবে আছে তজ্জন্য তাঁহার গৌরব অধিক।" সেই বিশেষত্ব বলিয়া তিনি 'মারেফৎ' অর্থাৎ তত্ত্ব-জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সেই জ্ঞান বিশেষ পরিমাণে মহাত্মা আবুবকর ছিদ্দীকের মধ্যে অধিক ছিল বলিয়া আল্লার 'দীদার' বিশেষ প্রকারে তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে। মহাপ্রভু আল্লা এক। তবে মানবাত্মার মধ্যে জ্ঞানের ইতর বিশেষ হওয়ায় ও পার্থক্য ঘটায় আল্লার 'দীদার' সম্বন্ধে পার্থক্য ঘটিবে। দেখ—একই পদার্থের ছবী পৃথক পৃথক ভাবাপন্ন দর্পণে পৃথক রূপে দেখা যায়, কোন দর্পণে ছোট, কোনটার মধ্যে বড, কোনটীতে উজ্জ্বল, কোনটীতে মলিন কোনটীতে সরল, কোনটীতে বক্র ইত্যাদি। একই পদার্থ বিভিন্ন দর্পণে উক্ত প্রকার পার্থক্য ঘটার কারণ এই যে, উক্ত দর্পণ গুলির গঠনের বিশেষত্ব পৃথক পৃথক। সুন্দর বস্তুর ছবী, পরিষ্কার দর্পণে সুন্দর বলিয়াই দেখিবার কথা, কিন্তু তলওয়ারের পাতার উপর নিতান্ত কুৎসিৎ দেখা গিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিজের হৃদয়রূপ দর্পণ, ইহ সংসার হইতে মলিন করিয়া বা

বক্র করিয়া পরকালে লইয়া যায়, তাহার হৃদয়-ফলকে, আল্লার 'দীদার' ঠিক প্রকৃত ভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। যে 'দীদার' অপরের সরল হৃদয়ে অসীম আনন্দ দান করে, তাহা মলিন বা বক্র হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া এমন ভীষণ মূর্ত্তিতে নয়ন গোচর হয়, যে তাহা দেখিলে অসীম যন্ত্রণা ও কষ্ট পাইতে হয়।

প্রেমের তারতম্যে প্রত্যক্ষ দর্শন-আনন্দের তারতম্য। পাঠক! এ কথা মনে করিও না যে, পয়গম্বরগণ আল্লার 'দীদার' পাইয়া যেরূপ অপার আনন্দ ভোগ করিতে পাইবেন, অপর লোকেরাও তদ্রূপ আনন্দ পাইবে না। বরং এ কথা বিশেষ করিয়া বুঝিয়া রাখ, অপর লোক কখনই পয়গম্বরদিগের ন্যায় আল্লার 'দীদারে' আনন্দ পাইতে পারিবে না। সুধু কি এই প্রভেদ ঘটিবে তাহা নহে, বিদ্বান্ লোক যে আনন্দ পাইবেন সাধারণ লোকেরা তদ্রূপ আনন্দ পাইবে না। বিদ্বান্ লোকের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্ম-ভীরু ও আল্লার প্রেমে আসক্ত, তাঁহারা যে আনন্দ পাইবেন, সাধারণ বিদ্বান্ লোক তত আনন্দ পাইবেন না। সর্ব্বদর্শী চক্ষুষ্মাণ 'আরেফ' লোকের মধ্যে যাঁহার অন্তরে আল্লার প্রেম প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া, অন্যান্য গুণের উপর মাথা তুলিয়াছে, তিনি যত আনন্দ পাইবেন, তদ্রূপ দর্শন ক্ষমতাবান অপর আরেফ (যাঁহার মনে প্রেম তত হয় নাই তিনি) তত আনন্দ কখনই পাইবেন না। দর্শন-ক্ষমতা উভয় আরেফের সমান হইলে, এবং একই আল্লাকে দেখিলে, এবং উভয়ের হৃদয়ে 'দীদারের' মূল কারণ 'মারেফৎ' সমান সমান থাকিলেও সুধু প্রেমের তারতম্যে, দীদারের আনন্দ উচ্চ নীচ হইয়া পড়িবে। দুই জন চক্ষুষ্মান আরেফের উপভোগ্য আনন্দের তারতম্য বুঝাইবার জন্য একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—মনে কর, দুইজন লোক, উভয়ের দর্শন-শক্তি সমান প্রখর; তাঁহারা উভয়ে একজন সুন্দর লোক দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ঐ সুন্দর লোককে ভালবাসেন অন্য জন তাহাকে ভালবাসেন না।

—দৃষ্টান্ত যোগে ব্যাখ্যা

এমন স্থলে যাঁহার হৃদয়ে ভালবাসা আছে তিনি সুন্দর লোককে দেখিয়া স্বভাবতঃ যতদূর আনন্দিত হইবেন, তেমন আনন্দ অপর ব্যক্তির অদৃষ্টে ঘটিবে না। তাহার পর এ কথাও ধরিয়া লও যে, উভয় দর্শক যেন উক্ত সুন্দর লোককে ভালবাসেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজন এত অধিক ভালবাসেন যে, সেই সুন্দর ব্যক্তির উপর তিনি আসক্ত হইয়াছেন; অন্য

একজন ততদূর আসক্ত হন নাই। এমন স্থলেও যাঁহার মনে প্রেম অধিক মাত্রায় জমিয়া গিয়াছে; তিনি ঐ সুন্দর ব্যক্তিকে দেখিয়া যতদূর আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত হইবেন, অপর ব্যক্তি তত আনন্দ পাইতে পারিবেন না। এখন ভাবিয়া দেখ—পরকালে পূর্ণ-সৌভাগ্য প্রাপ্তির পক্ষে সুধু এক 'মারেফৎ' বা তত্ত্ব-জ্ঞান প্রচুর নহে। পূর্ণ মারেফতের সঙ্গে পূর্ণ প্রেম উপার্জ্জন করাও প্রয়োজন। আল্লার প্রেম, এতদূর উচ্চ ও এতদূর প্রবল পরাক্রান্ত হওয়া আবশ্যক, যাহার প্রভাবে সংসারাসক্তি যেন হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং হৃদয় নির্ম্মল ও প্রশান্ত ভাব ধারণ করে। হৃদয়ের সে প্রকার অবস্থা প্রাপ্তি, 'জোহদ' বা বৈরাগ্য এবং 'তক্ওয়া' বা ধর্ম্ম-ভয় ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে ঘটিতে পারে না। এই জন্য বলা যায়—প্রকৃত চক্ষুষ্মাণ তত্ত্বদর্শী 'আরেফের' মধ্যে যাঁহারা সংসারের উপর পূর্ণ বিরাগী ও চূড়ান্ত ধর্ম্মভীরু তাঁহারা যদি আল্লার প্রেমে ভরপূর হইতে পারেন, তবে তাঁহারা আল্লার 'দীদারে' চূড়ান্ত আনন্দ পাইতে পারিবেন।

পরকালে পূর্ণ সৌভাগ্যের জন্য পূর্ণ তত্ত্ব-জ্ঞানের সহিত পূর্ণ প্রেম আবশ্যক

ইহকালে লব্ধ তত্ত্ব-জ্ঞান অপেক্ষা পারলৌকিক তত্ত্ব-জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা—দৃষ্টান্ত যোগে বর্ণনা। পাঠক! হয়তো তুমি এ কথা বলিতে পার—আল্লার 'দীদার' অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-দর্শন হইতে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা যদি 'মারেফৎ' সম্ভূত আনন্দের সমজাতীয় হয়, তবে তাহা আনন্দ-দায়ক হইতে পারে না। তোমার এবম্বিধ মন্তব্যে বুঝা যায়,—তুমি 'মারেফৎ' কি পদার্থ চিনিতে পার নাই। বোধ হয় 'মারেফৎ' সম্বন্ধে কতকগুলি ছুটা কথা কোন পুস্তকে একত্র সঙ্কলিত দেখিয়া মুখস্থ করিয়া লইয়াছ; অথবা অন্যের নিকট কিছু শিখিয়া সেই শিক্ষিত কথাগুলিকে তুমি 'মারেফৎ' নাম দিয়াছ। এরূপ শিক্ষিত কথা হইতে তুমি কি আনন্দ পাইতে পার? চাউল ভাজাকে, অমৃতোপম 'লোজিনা' নাম দিয়া তাহা চিবাইলে কি সুধা-সম লোজিনার আস্বাদ পাইতে পারিবে? যে ব্যক্তি 'মারেফৎ' জ্ঞানের মিষ্টত্ব আস্বাদ করিতে পাইয়াছে তাহাকে যদি সেই 'মারেফৎ' জ্ঞানের পরিবর্ত্তে এই ভূপৃষ্ঠে বেহেশ্‌ৎ দেওয়ার প্রস্তাব করা যায় তবে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই বেহেশ্‌ৎকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া 'মারেফৎ-জ্ঞান' পাইতেই ইচ্ছা করিবে। বুদ্ধিমান লোক যেমন রাজ্য-পরিচালন-জনিত আনন্দকে উদর-তৃপ্তির সুখ বা কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আনন্দ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে করে, তদ্রূপ জ্ঞানী লোকেরা 'মারেফৎ-জ্ঞানের' আনন্দকে

বেহেশ্‌তের আনন্দ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিবেচনা করেন। তথাপি এহেন মারেফৎ-জ্ঞানের আনন্দ আল্লার 'দীদারের' আনন্দের সহিত তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ। একটী দৃষ্টান্ত না দিলে এ কথা বুঝা যাইবে না।

দৃষ্টান্ত যোগে ব্যাখ্যা

মনে কর, একজন প্রেমিক লোকের একটী প্রিয়জন আছে বটে, কিন্তু তাহার প্রতি উহার প্রেম পরিপক্ক হইতে পারে নাই। তদুপরি প্রেমিকের গাত্রে—ডাঁশ, মশা, মাছী, রক্ত শোষণ করিতেছে; পরিধান-বস্ত্র মধ্যে—বোল্লা, ভীমরুল, বিচ্ছু, ইত্যাদি থাকিয়া অনবরত দংশন করিতেছে। এই সকল কষ্টের সঙ্গে আরও কতকগুলি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছে, তাহার উপর প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্টকারিতার ভয়ে ভীত হইতেছে। এরূপ ব্যক্তি, উষার প্রাক্‌কালে অন্ধকারের কিছু ঘোর থাকিতে প্রিয়জনের দর্শন পাইল; সেই সময়ে তদ্রূপ অবস্থার মধ্যে থাকিয়া প্রেমিক ব্যক্তি বাস্তবিক প্রিয়জনের দর্শনে পূরা আনন্দ ভোগ করিতে পাইবে না। কিন্তু তাহার পর হঠাৎ সূর্য্যোদয় হইল, প্রখর রৌদ্রের আলোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইল; তাহার হৃদয়স্থ প্রেম, প্রবল বেগে উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিল; কর্ম্ম-ব্যাপৃতি. ছিন্ন হইল; ভয় বিদুরিত হইল; ডাঁশ, মশা, বোল্লা, ভীমরুল, বিচ্ছু আদি অন্তর্হিত হইয়া গেল; তাহাদের দংশন যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইল, এমন সময়ে, শান্তির অবস্থায়, সে ব্যক্তি প্রিয়জনের দর্শন পাইলে, অতীব প্রগাঢ় আনন্দ ভোগ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। সে ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে উষার ঘোরে বিপদ আপদে জড়িত থাকিয়া ও নানা কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া, যেরূপ আনন্দ পাইয়াছিল, সে আনন্দ অপেক্ষা এ আনন্দ, অতীব শ্রেষ্ঠ হইবে। এ আনন্দের সহিত পূর্ব্বভুক্ত-আনন্দের তুলনাই হইতে পারে না; দুনিয়াতে থাকা পর্য্যন্ত চক্ষুষ্মাণ 'আরেফ' লোকের অবস্থা ঐরূপই থাকে। সে সময়ে নানা চাপের মধ্যে থাকায় তাঁহাদের 'মারেফৎ' জ্ঞান সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে না বলিয়া সঙ্কুচিত থাকে। সেই অবস্থাকে উষার অন্ধকারের সহিত তুলনা করা গিয়াছে; বরং আরেফ লোকের তৎকালীন দর্শন কার্য্য, পর্দ্দার ভিতর হইতে বাহিরে দর্শনের ন্যায় অস্পষ্ট। মানুষ যে পর্য্যন্ত ইহ-জগতে থাকে ততদিন সে 'অপূর্ণ' থাকে (টীঃ ৪৫০) এবং সেই অপূর্ণতার জন্য তাহাদের

টীকা—৪৫০। মানব অপূর্ণ অবস্থায় থাকে এবং সেই অপূর্ণতা দূর করিতে আমরণ উন্নতির দিকে দ্রুতবেগে চলিতেছে। মানব শিশু ও গো-বৎসের অবস্থার প্রতি মনোযোগ দাও। গো-বৎস ভূমিষ্ঠ হইয়া পরক্ষণে দাঁড়ায়, দুগ্ধের অনুসন্ধান করে ও দৌড়িতে লাগে। মানব-শিশু এক খণ্ড মাংস পিণ্ডবৎ পড়িয়া থাকে। জীবন থাকে বটে, কিন্তু কোন শক্তি দেখা যায় না,

'আসক্তি'ও সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে না বলিয়া দুর্ব্বল থাকে। পার্থিব পদার্থের লোভ, সাংসারিক দুশ্চিন্তা, ক্রোধ, এবং নানাবিধ দুঃখ কষ্টকে, বোল্লা, ভীমরুল, বিচ্ছু আদির সহিত তুলনা করা গিয়াছে। কেননা ইহাদের উৎপাতে তত্ত্ব-জ্ঞানের মাধুর্য্য কমিয়া যায়। আত্ম-রক্ষার্থ কার্য্যাবলীকে, কার্য্য ব্যাপৃতির সহিত এবং জীবিকা সংগ্রহের সতর্কতাকে ভয়ের সহিত, তুলনা করা হইয়াছে। মৃত্যু ঘটিলে এ সমস্ত অন্তরায় ঘুচিয়া যায়। তখন দর্শনের অভিলাষ ও 'প্রেম', পূর্ণ মাত্রায় উচ্ছসিত হইয়া উঠে। জীবিতকালে যে সকল অবস্থা গুপ্তভাবে থাকে সে গুলিও হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তখন সংসারে দুশ্চিন্তা, দুঃখ, কষ্ট, কর্ম্ম-ব্যাপৃতি, সমস্ত কাটা পড়ে। এই সকল কারণে দর্শন-জ্ঞানের মাধুর্য্য নিতান্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। অবশ্য সে মাধুর্য্য, মূল 'মারেফৎ-জ্ঞানের' তারতম্য অনুসারেই হয়, অর্থাৎ যাঁহার 'মারেফৎ-জ্ঞান' প্রবল, তিনি সেই প্রবলতার অনুপাতে আনন্দ পান। তবে মূল 'মারেফৎ-জ্ঞান' হইতে যে পরিমাণ আনন্দ ইতিপূর্ব্বে পাওয়া যাইত, এখন 'দীদারে' তদপেক্ষা অত্যন্ত অধিক আনন্দ পাওয়া যাইবে। এমন কি জীবিত কালে মূল 'মারেফৎ-জ্ঞানের' আনন্দ পরকালের 'দীদারের' আনন্দের সহিত তুলনা করিতে গেলে নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বুঝা যায়। দেখ, উপাদেয় খাদ্য-দ্রব্যের গন্ধ পাইলে যে আনন্দ মিলে, তাহা ঐ পদার্থ-ভোজন-সম্ভূত আনন্দের সহিত তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বুঝা যায়; এইরূপ 'দীদার'-জনিত আনন্দ, 'মারেফৎ-জ্ঞানের,' আনন্দ অপেক্ষা অতীব অধিক ও উৎকৃষ্ট।

চাক্ষুষ দর্শন ও আল্লার দীদারের মধ্যে পার্থক্য। পাঠক! এখন তুমি হয়তো বলিতে পার—'মারেফৎ-জ্ঞান' হৃদয়ে জন্মে, আর 'দীদার' চক্ষুর দ্বারা উপলব্ধ হয়, এমন স্থলে 'দীদার'-সম্ভূত আনন্দ কেমন করিয়া অধিক হইবে? পাঠক! জানিয়া লও 'দীদারকে' দর্শন এইজন্য বলা যায় যে, উহার সঙ্গে দর্শনের কিঞ্চিৎ সংস্রব আছে, কিন্তু পূর্ণ 'খেয়াল' হইতে উহা উৎপন্ন হয়। (টীঃ ৪৫১) সৃষ্টিকর্তা আল্লা যদি এই শেষ 'দীদারকে'

ক্রমে অঙ্গচালন চেষ্টা, স্পর্শবোধ, ক্রন্দন, ভোজনেচ্ছা ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়। শেষে শারীরিক বল, মানসিক বল, বুদ্ধি কৌশল, ক্রমে ক্রমে তাহাকে এত বলবান করিতে লাগে যে শেষে সমস্ত জগৎকে অঙ্গুলী সঙ্কেতে চালাইতে পারে। (দর্শন পুস্তকে মানবের জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রভাব দেখ)। জ্ঞান বিষয়ে মানব চিরকাল অপূর্ণ থাকে। মৃত্যু পর্য্যন্ত জ্ঞানের সম্বন্ধে উন্নতি করিয়া শেষ করিতে পারে না। জীবিতকালে যে যত জ্ঞান উপার্জ্জন করে, ঠিক মৃত্যু ঘটায় সেই জ্ঞান হঠাৎ বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে। তাহার পর আর জ্ঞান বর্দ্ধিত হয় না।

টীকা—৪৫১। চাক্ষুষ-দর্শন, খেয়াল, মারেফৎ ও দীদার এই কয়েকটী কথায় অবস্থাগত

চক্ষুর সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া মস্তকের সহিত রাখিতেন, তথাপি মানবাত্মা আল্লাকে সম্পূর্ণ রূপেই জানিতে পারিয়া অভূতপূর্ব্ব আনন্দ পাইত। 'দীদার' কার্য্যকে কোন অঙ্গের সহিত আটকাইয়া বুঝিতে যাওয়া অনর্থক পরিশ্রম। পরকালে আল্লার নিকট যাইতে হইবে এবং আল্লার 'দীদার' (দর্শন) লাভ হইবে এই কথা ধর্ম্ম-শাস্ত্রে পরিস্কার ভাবে বলা হইয়াছে। দর্শন, চক্ষুর দ্বারাই ঘটে এবং পরকালে 'দীদারের' মধ্যে চক্ষুরও অংশ থাকিবে; এইজন্য পরকালে 'আল্লা-প্রাপ্তিকে' 'দর্শন'-অর্থ-সূচক 'দীদার' নামেই প্রকাশ করা হইল। তবে এস্থলে এ কথাও জানিয়া লওয়া আবশ্যক যে, পরকালের চক্ষু এই সাধারণ চক্ষুর ন্যায় হইবে না। আমাদের এই চক্ষু 'দিকের' সঙ্গে সীমাবদ্ধ, কিন্তু পরকালের চক্ষু তদ্রূপ সীমাবদ্ধ নহে। (টীঃ ৪৫২) সকল অবস্থায় দেখিতে পাইবে। এ কথা সাধারণ লোকের সম্মুখে বলা বৃথা—তাহারা এরূপ কথা বুঝিতে পারিবে না। সুদক্ষ সূত্রধরের কার্য্য, বালক দ্বারা সম্পন্ন হয় না। বিদ্বান আলেমগণের মধ্যে যাঁহারা, কেবল 'ফেকা' নামক বিধান-শাস্ত্র ও হদীছ, তফছীর, অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারাও এই কথা বুঝিতে পারিবেন না। যাঁহারা বক্তৃতা-বিদ্যা ও তর্কশাস্ত্র শিক্ষা

পার্থক্য জানা আবশ্যক। চক্ষু দ্বারা দর্শন করিলে বস্তুর এক প্রকার চিত্র বা ছবী মস্তিষ্কের এক স্থানে অঙ্কিত হয়। দর্শনের মধ্যে মনোযোগ যত গাঢ় করা যায়, সে চিত্র তত গভীর ভাবে অঙ্কিত হয়, পরে চক্ষু বন্ধ করিলে অন্তরস্থ জ্ঞান চক্ষু সেই চিত্রের দিকে উন্মুক্ত হইলে, ঐ চিত্র, বুদ্ধির জ্ঞানচক্ষে প্রতিফলিত হয়। মানব তখন সেই চিত্র, মানস-নয়নে রাখিয়া মুখে বর্ণনা করে, কলমে লিখে, বা হাতে গঠন করে। ফল কথা, দর্শন-জনিত-জ্ঞান, যাহা মস্তিষ্কে অঙ্কিত ও মানসচক্ষে প্রতিফলিত হয় তাহার নাম 'খেয়াল'। উহা সচরাচর চক্ষুর দ্বারা দর্শন হইতেই জন্মে; কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও কতকগুলি খেয়ালের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি করিয়া দেয়। যথা ত্বকে শৈত্য উষ্ণতাদি জ্ঞান স্মরণাধারে জমা করিয়া দেয়; ঐরূপ কর্ণ নাসিকা, রসনাও বাহ্য জড়-জগৎ হইতে কতকগুলি জ্ঞান লইয়া গিয়া জমা করে। বুদ্ধি একমাত্র প্রধান ও বলবান অন্তরিন্দ্রিয়। সে আরও কতকগুলি জ্ঞান লইয়া গিয়া ঐ 'খেয়ালের' পাশে স্থাপন করে। তদ্ভিন্ন কাম লোভাদি কুপ্রবৃত্তি এবং দয়া মায়াদি সৎপ্রবৃত্তি, স্ব স্ব 'বিষয়' ভোগ করিয়া এক এক সংস্কারও সেই 'খেয়ালের' পাশে সঞ্চয় করে। এই সমস্ত জ্ঞানই 'খেয়াল' জাতীয়। এই সমস্ত 'খেয়াল' ও জ্ঞান একত্র হইয়া 'মা'রেফৎ'-জ্ঞান নাম পায়। 'মা'রেফৎ' বাস্তবিক 'খেয়ালস্থ' জ্ঞান সমষ্টি। ইহা নষ্ট হয় না, বরং মরণান্তে হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়া 'দীদার' আকার ধারণ করে। জীবিতকালের 'মা'রেফৎ-জ্ঞান' মৃত্যুর পর 'দীদার' নাম পাইয়া আল্লাকে স্বচক্ষে দেখিতে পায়। তখন চর্ম্মচক্ষুও অংশ পায়। এখানে একটী গূঢ় চক্র আছে উহা শিকলের বেড়ের ন্যায় গোল। চাক্ষুষ দর্শনে খেয়াল জন্মে, নানা খেয়াল একত্র হইয়া মা'রেফৎ হয়, মৃত্যুর পর সেই 'মা'রেফৎ' 'দীদার' হইয়া পুনরায় চক্ষুর দর্শনের সহিত ঘুরিয়া আসে।

টীকা—৪৫২। আমাদের চক্ষু, কেবল সম্মুখের দিকে দেখিতে পায়, পশ্চাতে বা আশপাশে দেখিতে পায় না। নিকটস্থ বস্তু দেখিতে পায়, দূরস্থ বা অন্তরালস্থ বস্তু দেখিতে পায় না। পরকালের চক্ষুর, কোন বাধা থাকিবে না।

করিয়াছেন তাঁহারাও এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। তাঁহারা সাধারণ লোকের ধর্ম্মমত বিশ্বাসের দৃঢ়তা-রক্ষক। বিধর্ম্মী লোক ভুল বুঝাইয়া সাধারণ লোকের ধর্ম্ম-বিচলিত করিতে আসিলে তাঁহারা যুক্তির প্রভাবে সাধারণ লোককে বুঝাইয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দেন। নব-প্রথার প্রবর্ত্তক 'বেদাতী' লোক, সমাজের মধ্যে কোন কুপ্রথা প্রচলন করিতে আরম্ভ করিলে, ঐ সকল বক্তা-লোক তাহার পথ বন্ধ করিতে চেষ্টা করে। তদর্থে ঝগড়া বিবাদ করা আবশ্যক হইলে তাহাও তাহারা করিয়া থাকে। 'মারেফৎ' কিন্তু অন্য ধরণের একটী জ্ঞান-পথ। সে পথের পথিকগণের স্বভাব অন্য প্রকার। যাহা হউক, এরূপ কথা, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রকাশ করা সহজ নহে। এ স্থলে যাহা কিছু বলা গেল তাহাই প্রচুর।

তত্ত্ব-জ্ঞানের পথ স্বতন্ত্র

পারলৌকিক পূর্ণানন্দে বিশ্বাস জন্মাইবার চতুর্ব্বিধ তদ্‌বীর।

পাঠক! তুমি এখন হয়তো এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার—যে আনন্দ ভোগ করিতে পাইলে লোকে বেহেশ্‌তের কথা ভুলিয়া যায়, সেই আনন্দ কেন আমার বুদ্ধি, ভোগ করিতে পায় না? এ সম্বন্ধে জ্ঞানী লোকেরা অনেক কথাই শুনাইয়াছেন, অথচ আমি সে আনন্দের আস্বাদ পাই না। উহা পাইবার তদ্‌বীর কি? যদি নিতান্তই সে স্বাদ পাওয়া, আমার অদৃষ্টে না ঘটে, তবে তদ্রূপ আনন্দ যে মানুষে ভোগ করিতে পায়, এ কথা বিশ্বাস করিয়া লওয়া তো আমার পক্ষে আবশ্যক। উহা বিশ্বাস করিতে পারার উপায় কি? পাঠক। সেই বিশ্বাস মনে জন্মাইয়া লইবার **চারিটী তদ্‌বীর** অবলম্বন করা প্রয়োজন। (টী ৪৫৩)

প্রথম তদ্‌বীর—পুনঃপুনঃ আলোচনা করা। জ্ঞান ও আনন্দ সম্বন্ধে যে সকল কথা উপরে লিখা গেল তাহা পুনঃপুনঃ মনোযোগের সহিত শুনিতে হয়। যে কথা কেবল একবার মাত্র শুনা যায় তাহা অধিক্ষণ মনে থাকিতে পারে না।

টীকা—৪৫৩। পারলৌকিক পূর্ণানন্দে বিশ্বাস জন্মাইবার চারিটী তদ্‌বীরের কথা মূল গ্রন্থে এই প্যারার সূচনায় লিখিত আছে। কিন্তু পরে বিস্তৃত পরিচয় দিবার সময়ে তৃতীয় তদ্‌বীর পর্যন্ত মূল গ্রন্থে দেখা যায়। চতুর্থ তদ্‌বীরটী যে কি হইবে তাহা আর স্পষ্ট লিখা নাই। ইহাতে মনে হয় লিপীকর প্রমাদের জন্য হয়তো তিন লিখিতে চারি লিখা হইয়াছে অথবা চতুর্থ তদ্‌বীরের বিস্তৃত পরিচয় লিখা হয় নাই।

দ্বিতীয় তদ্‌বীর—মানব-প্রবৃত্তির স্বভাব জানা। পাঠক! জানিয়া লও মানুষের প্রবৃত্তি গুলি যুগপৎ একেবারে বিকাশ পায় না। তজ্জন্য আনন্দ অনুভবের সকল শক্তি, একবারে মানব-মনে জন্মে না। শিশুর মনে সর্ব্ব প্রথমে আহার প্রবৃত্তি ও আহার জনিত আনন্দ বোধের শক্তি উৎপন্ন হয়। তদ্‌ব্যতীত শিশু আর কিছুই জানে না। ৭ সাত বৎসর বয়সের সময়ে বালকের মনে ক্রীড়া কৌতুক করিবার ও লম্ফ ঝম্প দিবার অভিলাষ বিকশিত হয় এবং সেই অভিলাষ চরিতার্থ করিলে একরূপ আনন্দ ভোগ করিতে পায়। সেই আনন্দ ভোগের লালসা কখন কখন এতদূর বলবান হয় যে, বালকগণকে সেই খেলার ইচ্ছায় পাগল বানায়, তজ্জন্য মুখের অন্ন ফেলিয়া দিয়া খেলা করিতে দৌড়ায়। বালক দশ বৎসর বয়সের নিকটবর্ত্তী হইলে তাহার মনে উত্তম বেশ ভূষা ও সাজ সজ্জার অভিলাষ উদয় হয় এবং সুন্দর বসন ভূষণে শরীর সাজাইতে পারিলে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। তখন তাহারা শরীর সুশোভনা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ধুলা মাটীর খেলা ত্যাগ করে। পনর বৎসর বয়স হইলে রমণীর প্রতি কামনা জাগিয়া উঠে এবং তাহা পাইলে অপূর্ব্ব আনন্দ ও সুখ অনুভব করিয়া থাকে। কখন কখন এমন হয় যে কামিনীর পিছনে পড়িয়া যথাসর্ব্বস্ব উড়াইয়া দেয়। পরে বিশ বৎসরের নিকটবর্ত্তী হইলে প্রাধান্য ও সম্মান-স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠে, এবং অপর লোকের উপর, হুকুম চালাইতে পারিলে আনন্দ অনুভব করে। প্রভুত্ব-প্রিয়তা, সাংসারিক প্রবৃত্তি গুলির সর্ব্বশেষে উদয় হয়। প্রবৃত্তির ক্রমবিকাশ কিরূপে হয় বিশ্বপ্রভু আল্লা তাহা স্বীয় পবিত্র বচনে প্রকাশ করিয়াছেন—

মানব-প্রবৃত্তির ক্রম বিকাশের স্বাভাবিক ধারা

أَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ
وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ ۵

"দুনিয়ার জীবন ইহা ভিন্ন আর কিছু নহে যথা—খেলা ও তামাশা সাজ সজ্জা ও তোমাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কথর করা ও ধন বৃদ্ধির লালসা,

ও সন্তান-বৃদ্ধির কামনা।" (২৭ পারা। সুরা হদীদ। ৩ রোকু।) এই সুদীর্ঘ বিশ বৎসরের মধ্যে সংসার-লোভে যদি মানুষের অন্তর-রাজ্যের স্বাভাবিক অবস্থাগুলি সম্পূর্ণ বিনাশ করিয়া না থাকে এবং তাহার আত্মাকে পীড়িত করিয়া না থাকে তবে বিশ বৎসরের পরে মানব, আল্লার পরিচয় ও চারিধারের নানা পদার্থের তথ্য জানিতে ব্যাকুল হয়। সেই ব্যাকুলতা চরিতার্থ হইলে উৎকৃষ্ট আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে যেমন দেখান হইয়াছে যে, জীবন পথে নবোৎপন্ন প্রবৃত্তিগুলি স্ফূর্ত্তি পাইলে, পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবৃত্তিগুলি নিষ্প্রভ হয় ও তজ্জনিত আনন্দ, তুচ্ছ ও অপদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই হেতু সর্ব্ব-শেষ-ভাগে বিকশিত বুদ্ধি-বৃত্তি, তত্ত্ব-জ্ঞান পাইয়া যেরূপ পরম আনন্দ ভোগ করিতে লাগে, তাহার সহিত তুলনায় সমস্ত পূর্ব্ববর্ত্তী আনন্দ নিতান্ত তুচ্ছ ও অপদার্থ হইয়া পড়ে। বেহেশ্‌ৎ উপভোগের আনন্দ এবং উদর, কাম, চক্ষু প্রভৃতির চরিতার্থ-জনিত আনন্দ উভয় সমান, কেননা উভয়ের সঙ্গে বুদ্ধির কোন সম্বন্ধ নাই। উদর, কাম, চক্ষু প্রভৃতি নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয় বেহেশ্‌ৎ মধ্যেও পরিতৃপ্ত হইবার স্থান পায়। বেহেশ্‌তের মধ্যেও সুরম্য উপবনে বিহার করিতে পাওয়া যাইবে। অতি উপাদেয় ফল ভোগ করিতে পাইবে। হরিদ বর্ণ সমতল প্রান্তর ও তন্মধ্য দিয়া স্থানে স্থানে নির্ম্মল-সলিলা-স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে। তেমন স্থানে, মধ্যে মধ্যে নানা চিত্রময় সৌধরাজী মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান আছে। এ প্রকার মনোহর দৃশ্যও বেহেশ্‌ৎ মধ্যে দর্শন করিতে পাইবে। বেহেশ্‌তে ঐরূপ লোভনীয় স্থানে বাসের অভিলাষকে, ইহ সংসারে রাজপদের অভিলাষ সহ তুলনা করিলে বুঝা যায়, বেহেশ্‌ৎ-বাসের মধ্যে বুদ্ধি-বৃত্তি-চরিতার্থ হইবার কোন উপায় নাই বলিয়া উহা তুচ্ছ হইবে এবং ইহকালের রাজপদ, যাহার সঙ্গে বুদ্ধির সংস্রব আছে, তাহা লোভনীয় হইবে। তাহার পর উন্নত-বুদ্ধির লভ্য তত্ত্ব-জ্ঞানের সহিত তুলনা করিতে গেলে, বেহেশ্‌ৎ-বাসকে একেবারে নিতান্ত অপদার্থ বলিয়া বুঝা যাইবে। দেখ—খ্রীষ্টান সন্যাসীগণের মধ্যে অনেকে সাধারণ লোকের স্থানে সম্মান লইবার বাসনায় নিজকে মন্দির মধ্যে কয়েদ করিয়া রাখেন এবং 'খোরাক' কমাইতে কমাইতে একটী সুপারী-গোলক-পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করেন। তদ্রূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণ লোক সন্যাসীকে মন্দিরবাসী দেখিয়া ও অল্পাহারের অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া অধিক সম্মান করিবে। এই জন্য সন্যাসী, সম্মানকে বেহেশ্‌তের

উৎকৃষ্ট খাদ্য ও রমণীয় দৃশ্য দর্শন অপেক্ষা অধিক ভালবাসে। সম্মান ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা, যাহা পূর্ব্বে সন্যাসীর হৃদয়ে অতীব প্রবল ছিল তাহা, হয়তো পরে জ্ঞানার্জ্জনের প্রবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইলে, খাটো হইতে পারে এবং সেই সম্মান-লালসা, জ্ঞান-জাত আনন্দের প্রাবল্যে হীন হইয়া পড়িতে পারে। পাঠক! এখন হয়তো তুমি সম্মান ও প্রভুত্ব ভালবাসিবার বয়সে উপস্থিত হইয়াছ,—এই জন্য তুমি রাজত্ব ও রাজকীয় ক্ষমতাকে অন্যান্য আনন্দ-দায়ক পদার্থ অপেক্ষা ভালবাসিতেছ। কিন্তু বালকগণ অদ্যাবধি সে বয়সে উপস্থিত হয় নাই বলিয়া রাজকীয় ক্ষমতাকে আনন্দদায়ক বলিয়া আদৌ বুঝিতে পারে না, এবং তোমরা হাজারও চেষ্টা করিয়াও বালককে রাজকীয় ক্ষমতার মাধুর্য্য বুঝাইয়া দিতে পারিবে না। সেইরূপ তোমরা এখন 'মারেফৎ-জ্ঞান' সম্বন্ধে অন্ধ আছ। তত্ত্বজ্ঞানী আরেফ লোক হাজার চেষ্টা করিয়াও তোমাদিগকে 'মারেফৎ-জ্ঞানের' মিষ্টতা বুঝাইয়া দিতে পারিবেন না; কিন্তু তোমার মধ্যে যদি কিছুমাত্র বুদ্ধি থাকে এবং সেই বুদ্ধিকে বিশেষ বিবেচনা সহকারে জ্ঞানের পথে খাটাইয়া লওয়াইতে পার তবে তুমি পরিশেষে 'মারেফৎ' যে সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক পদার্থ, সে কথা বুঝিতে পারিবে।

তৃতীয় তদ্‌বীর—প্রত্যক্ষ-দর্শী আরেফদিগের অবস্থা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং তাঁহাদের জীবন বৃত্তান্ত মনোযোগ দিয়া শুনা। নপুংসক হিজড়া লোকের মনে স্ত্রী-সম্ভোগের ইচ্ছা থাকে না বলিয়া স্ত্রী-সহবাসে আনন্দ পায় না। সে কার্য্যে কি প্রকার সুখ আছে তাহা হিজড়া লোক বুঝিতে পারে না। কিন্তু তাহারা যখন অন্য পুরুষের ব্যবহার দেখিতে পায় যে তাহারা নিজের যথাসর্ব্বস্ব কামিনীর পিছে উড়াইয়া দিতেছে তখন নপুংসক লোকের মনে স্বভাবতঃ এ কথা বোধগম্য হয় যে, স্ত্রী-সহবাসে এমন কোন উৎকৃষ্ট-আনন্দ ও সুখ নিহিত আছে যাহা নপুংসক অদৃষ্ট-ক্রমে আস্বাদ করিতে পায় না। এইরূপ, যাহাদের বুদ্ধি নাই তাহারা বুদ্ধি-ভোগ্য আনন্দ কেমন করিয়া বুঝিবে?

১। মহামাননীয়া শুদ্ধ চরিত্রা বিবী রাবেয়া বছরীর সম্মুখে লোকে বেহেশ্‌তের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন "প্রথম গৃহ-স্বামী তাহার পর গৃহ।" ইহার ভাবার্থ—আল্লা গৃহ-স্বামী। তাঁহাকে বুদ্ধির প্রভাবে বুঝিতে পারিলে যে আনন্দ ভোগ করিতে পাওয়া যায়, সে আনন্দ অগ্র-গণ্য। তাহার পর গৃহের আনন্দ অর্থাৎ বেহেশ্‌তের আনন্দ। নিকৃষ্ট বলিয়া

উহা

উহা শেষে উল্লেখ যোগ্য। ২। মহাত্মা আবু ছোলয়মান দারানী বলিয়াছেন—"আল্লার বান্দাদিগের মধ্যে এমন লোক অতি অল্পই আছে তাহাদিগকে দোজখের ভয় ও বেহেশ্‌তের লোভ দেখাইয়া আল্লার স্মরণ হইতে ক্ষান্ত রাখা যায় না,—দুনিয়া তাঁহাদিগকে কি প্রকারে আল্লার স্মরণ হইতে ক্ষান্ত রাখিতে পারিবে?" ৩। মহাত্মা মারুফ করখীকে তাঁহার কোন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"বল তো—কোন পদার্থ তোমাকে দুনিয়া হইতে বিমুখ করিয়া এবাদৎ ও নির্জ্জন-বাসে প্রবৃত্ত করিয়া দিয়াছে? বল তো—মৃত্যুভয়, কবরের বিভীষিকা, দোজখের চিন্তা, বেহেশ্‌তের লোভ, এইরূপ কোন পদার্থ কি তোমাকে নির্জ্জনবাসে আবদ্ধ করিয়া আল্লার এবাদতে লাগাইয়া দিয়াছে?" মহাত্মা উত্তর দিয়াছিলেন-"ঐ সকল পদার্থের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই। যে বাদশার ক্ষমতার হস্তে এই সমস্ত পদার্থ আছে, তাঁহার সহিত 'মহব্বৎ' জন্মিলে সমস্তই ভুলিয়া যাইতে হয়। সেই প্রভুর পরিচয় পাইলে এবং তাঁহার সহিত ভালবাসা জন্মিলে ঐ সমস্ত পদার্থ নিতান্ত তুচ্ছ হইয়া পড়ে।" ৪। মহাত্মা বশরহাফী রহমতুল্লাকে কেহ স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আবুনছর তমার এবং আবদুল ওহাবের অবস্থা কেমন?" তিনি বলিলেন—"এখনই আমি তাঁহাদিগকে বেহেশ্‌তের মধ্যে পান আহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া আসিলাম।" সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার অবস্থা কেমন?" তিনি বলিলেন—"আল্লা ইহা উত্তমরূপ জানেন যে পান আহারে আমার অভিলাষ মাত্র নাই বলিয়া তিনি তাঁহার নিজের দর্শন দিয়া আমাকে চরিতার্থ করিলেন।" ৫। মহাত্মা আলী এবনেল্ মওয়াফেক বলিয়াছেন—"আমি একবার স্বপ্নে বেহেশ্‌ৎ দেখিয়াছিলাম—তথায় বহু লোক পান ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ফেরেশ্‌তাগণ উত্তম উত্তম খাদ্য তাঁহাদের মুখে তুলিয়া দিতেছেন। এক ব্যক্তিকে দেখিলাম আল্লার সৌন্দর্য্যের দিকে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া এক দৃষ্টিতে উৎসুক হইয়া চাহিয়া আছেন। আমি বেহেশ্‌তের দ্বারবান্ রেজওয়ানকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—'ইহার নাম মারুফ করখী। ইনি দোজখের ভয়ে বা বেহেশ্‌তের আশায় এবাদৎ করেন নাই। তজ্জন্য ইহার জন্য আল্লা স্বীয় 'দীদার' দ্বারা ইহাকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন।'" ৬। মহাত্মা আবু ছোলয়মান্ দারানী বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি অদ্য নিজের সঙ্গে আসক্ত আছে সে কল্য কেয়ামতের দিনেও তদ্রূপ নিজের সঙ্গেই আসক্ত থাকিবে আর যে ব্যক্তি অদ্য আল্লার প্রতি আসক্ত থাকিবে, সে আগামী

কল্য কেয়ামতের দিনেও আল্লার প্রতি আসক্ত থাকিবে।" ৭। মহাত্মা ইয়াহীয়া এব্‌নে মাজ বলিয়াছেন—"এক রজনীতে আমি মহাত্মা বায়েজীদ রহমতুল্লার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম—তিনি এশার নমাজের পর হইতে ফজরের নমাজ পর্য্যন্ত অর্থাৎ রজনীর প্রথম ভাগ হইতে শেষ পর্য্যন্ত হাঁটু গাড়িয়া, গুল্‌ফ উচ্চে রাখিয়া, অঙ্গুলীর উপর উপবেশন করতঃ উন্মত্তবৎ রাত্রি যাপন করিলেন, পরিশেষে ছেজ্‌দা করিয়া উঠিলেন এবং বহুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, শেষে স্বীয় মুখ আকাশের দিকে তুলিয়া প্রার্থনা সহকারে বলিতে লাগিলেন—"হে আমার প্রভু! কতকগুলি লোক তোমার অনুসন্ধান করিয়াছেন তুমি তাঁহাদিগকে জলের উপর চলিবার ও বাতাসের মধ্যে উড়িবার ক্ষমতা দিয়াছ। আমি তাহা চাই না—আমাকে তাহা হইতে রক্ষা কর। আর কতকগুলি লোককে ভূতলের ও ভূগর্ভের ধন-রত্ন দিয়াছ, এবং কতকগুলি লোককে তুমি এমন ক্ষমতা দিয়াছ যে তাঁহারা এক রজনীতে শত সহস্র যোজন পথ চলিয়া যাইতে পারেন। তাঁহারা তদ্রূপ ক্ষমতায় সন্তুষ্ট আছেন। আমি তদ্রূপ ক্ষমতা চাই না—তুমি আমাকে তাহা হইতে রক্ষা কর।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—'হে ইয়াহিয়া! তুমি কতক্ষণ হইতে আছ?' আমি বলিলাম—"হে আমার ছইয়দ (ছর্‌দার) অনেক্ষণ হইতে আছি। দয়া করিয়া এই অবস্থার মর্ম্ম আমাকে বুঝাইয়া দিউন।" তিনি বলিলেন—"যাহা তোমাকে বলিবার যোগ্য তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর—মহাপ্রভু আমাকে তাঁহার রাজ্যের উচ্চ ও নীচ সমস্ত প্রদেশ দেখাইলেন—তাঁহার আর্‌শ, কুর্‌ছী, আকাশ, পাতাল, বেহেশ্‌ৎ, দোজখ সমস্তই দেখাইয়া দিলেন এবং বলিলেন সমস্ত দেখিলে, এখন বল, কি পাইতে চাও? যাহা চাহিবে তাহাই দিব।" আমি নিবেদন করিলাম—"ইহার মধ্যে কিছুই চাই না।" তখন আদেশ হইল—"সত্য সত্যই তুমি আমার দাস।" ৮। মহাত্মা আবু তোরাব মহোদয়ের এক প্রধান 'মুরীদ' ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা স্বীয় কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। এক দিন শেখ মহোদয় বলিলেন—"তুমি যদি মহাত্মা বায়েজীদ রহমতুল্লার সহিত দেখা করিতে তবে ভাল হইত।" মুরীদ উত্তর করিলেন—"তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আমি কি করিব?" মহাত্মা আবু তোরাব স্বীয় শিষ্যকে মহাত্মা বায়েজীদের সহিত দেখা করিবার জন্য কয়েকদিন উপর্য্যুপরি আদেশ করেন। 'মুরীদ' পরিশেষে বলিয়াছিলেন—"বায়েজীদের আল্লাকে দেখিতে আমি ব্যস্ত আছি—দেখিয়া শেষ করিতে পারিতেছি না

এমন অবস্থায় কেমন করিয়া বায়েজীদকে দেখিতে যাই?" 'মোরশেদ' মহোদয় বলিলেন—"তুমি যে ভাবে আল্লাকে দেখিতেছ তোমার সেই ভাবে সহস্তর বার দেখা অপেক্ষা বায়েজীদের একবার দর্শন উত্তম।" 'মুরীদ' আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'ইহার অর্থ কি?' মহাত্মা বলিলেন—'ওহে নির্ব্বোধ? তুমি আল্লাকে তোমার শক্তি অনুসারে দেখিতেছ; তিনিও তোমার নিকট তদনুসারে প্রকাশ পাইতেছেন। আল্লার নিকট মহাত্মা বায়েজীদের যে পরিমাণে মর্য্যাদা আছে তিনি সেই পরিমাণ ক্ষমতা সহকারে আল্লাকে দেখেন। আল্লাও বায়েজীদের নিকট তদনুসারে প্রকাশ পাইতেছেন। 'মুরীদ' এই সূক্ষ্ম কথা বুঝিতে পারিয়া বলিল—"আমি যাইতেছি আপনিও দয়া করিয়া সঙ্গে চলুন।" মহাত্মা আবুতোরাব বলিয়াছেন—আমি ও আমার শিষ্য উভয়ে মহাত্মা বায়েজীদের নিকট গিয়া দেখিলাম, তিনি একটী ক্ষুদ্র জঙ্গলের মধ্যে বসিয়া আছেন। আমরা নিকটে গেলে তিনি বাহিরে আসিলেন। দেখিলাম তাঁহার শরীরে 'পোসতীন' (টীঃ ৪৫৪) জামা উল্টাভাবে পরিহিত আছে। আমার 'মুরীদ' তাঁহাকে দেখিবা মাত্র এক বিকট চীৎকার ছাড়িয়া পড়িয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল। আমি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলাম—"হে বায়েজীদ, তোমাকে কেহ এক নজর দেখিতে আসিলেই কি তাহাকে হত্যা করা উচিত হয়?" তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"সে কি কথা তোমার 'মুরীদ' সৎপথাবলম্বী—'ছাদেক' ছিলেন তাঁহার হৃদয়ে এক গূঢ়ভাব, বহু দিন হইতে আবদ্ধ ছিল। সে ভাব তিনি নিজের চেষ্টায় খুলিতে পারেন নাই। তিনি যখন আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন অমনি সেই গূঢ়ভাব বন্যার জল-স্রোতের ন্যায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে লাগিল, সেই বেগ এমন প্রবল ছিল যে তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া মারা পড়িলেন। ঐ ভাব ক্রমে ক্রমে প্রবাহিত হইলে, তিনি উহার বেগ ধারণে অভ্যস্ত হইতেন।"

৯। মহাত্মা বায়েজীদ বোস্তামী বলিয়াছেন—"মহাপ্রভু আল্লা যদি তোমাকে মহাত্মা হজরৎ এব্রাহীম নবীর প্রকৃতি, মহাত্মা হজরৎ মুছা নবীর মানসিক প্রার্থনা শক্তি এবং মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবীর আধ্যাত্মিক অবস্থা দিয়া থাকেন, তথাপি ইহা মনে করিওনা যে, যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাই শেষ হইল—

টীকা—৪৫৪। শীতপ্রধান দেশে লোম সমেত ছাগলাদির চর্ম্ম পরিষ্কৃত করিয়া ও পাকাইয়া তদ্দ্বারা জামা সেলাই করিয়া লয়. লোম সহকৃত সেই জামাকে পোস্তীন কহে। লোমগুলি বাহিরে থাকিলে সোজা হয় এবং তদ্বিপরীত হইলে উল্টা বলে।

আর কিছু পাইবার আশা নাই, বরং মনে করিবে তাঁহার দরবারে তদপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট পদার্থ পাইবার প্রবল আশা আছে।" ১০। মহাত্মা বায়েজীদ বোস্তামীর এক বন্ধু ছিলেন—তাঁহার নাম মজনী। তিনি উক্ত শেখ মহোদয়ের সমীপে এক দিন দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি ত্রিশ বৎসর যাবৎ রজনী জাগিয়া নমাজ পড়িতেছি এবং দিনমানে রোজা রাখিতেছি তথাপি যে সকল 'অবস্থার' কথা আপনার মুখে শুনা যায় সে অবস্থার কোনটীই আমার ভাগ্যে প্রকাশ পাইতেছে না।" শেখ মহোদয় বলিয়াছিলেন—"ত্রিশ বৎসর কেন, তিন শত বৎসর ধরিয়া তুমি এবাদৎ করিলেও সে অবস্থা তোমার প্রতি খুলিবে না।" মহাত্মা মজনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাহার কারণ কি?" মহাত্মা বলিলেন—"তোমার 'অহং-জ্ঞান' আছে তজ্জন্য তোমার প্রতি সে ভাব গুলি প্রকাশ পাইতে পারিতেছে না।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'সে দোষ দূর করিবার কি কোন উপায় আছে?' মহাত্মা বলিলেন—"হাঁ আছে বটে, কিন্তু তুমি তাহা অবলম্বন করিতে পারিবে না।" মজনী বলিলেন—"আপনি দয়া করিয়া বলুন আমি সে কাজ করিব।" শেখ মহোদয় বলিলেন—"তুমি কখনই পারিবে না।" মজনী নিতান্ত জেদ করিতে লাগিলেন, অগত্যা শেখ মহোদয় বলিলেন—"নাপিতের নিকট গিয়া মাথা, মুখ, দাড়ী সমস্ত মুণ্ডন করিয়া লও। একখানি তহবন্দ পরিধান করিয়া সমস্ত শরীর ও মস্তক উলঙ্গ রাখ। এক থলী আখরোট লইয়া বাজারের মধ্যে যাও। তথায় ঘোষণা করিয়া দাও—যে বালক তোমাকে এক 'ঘাড়পাকী' দিবার পর এক ধাক্কা দিবে তাহাকে তুমি দুটী আখরোট পুরস্কার দিবে। এইরূপ লাঞ্ছিত হইতে হইতে বিচারক কাজীর দরবারে ও সভ্য সামাজিক লোকের সভায় উপস্থিত হইবে।" ইহা শুনিয়া মজনী বলিলেন—"ছোবহান্ আল্লা! ইহা অসম্ভব ব্যবস্থা, এরূপ ব্যবস্থা কেন দিতেছেন?" শেখ মহোদয় বলিলেন—"তুমি যে ভাবে 'ছোব্‌হান্ আল্লা' বলিলে তাহাতেও তোমার অহং ভাব প্রকাশ পাইল এবং 'শেরেক' করা হইল; কেননা এখনও তুমি স্বীয় সম্মানের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিবাদ করিতেছ।" মজনী বলিলেন—'ঐ কঠিন উপায় ভিন্ন অন্য কোন সহজ তদ্‌বীরের সন্ধান দিউন। এরূপ কাজ আমার দ্বারা হইবে না।" শেখ মহোদয় বলিলেন—"ইহাই এক মাত্র প্রধান ব্যবস্থা। প্রথমেই তো আমি বলিয়াছি—তুমি সে উপায় অবলম্বন করিতে পারিবে না।" মহাত্মা বায়েজীদ স্বীয় বন্ধুর জন্য তদ্রূপ ব্যবস্থা করিবার কারণ এই যে, মজনী অপর লোক

হইতে ভক্তি আকর্ষণ ও তাহাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন ও অহঙ্কার প্রদর্শনের অভিলাষী ছিলেন। তদ্রূপ ইচ্ছা হৃদয়ের এক বড় পীড়া। সেই পীড়ায় উক্ত প্রকার ঔষধের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ১১। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবীর উপর প্রত্যাদেশ হইয়াছিল—"হে ঈছা! আমি বান্দাগণের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া থাকি, যদি সে হৃদয়ে দুনিয়া বা বেহেশ্‌তের আসক্তি দেখিতে না পাই, তবে আমার প্রেম তথায় স্থাপন করিয়া, সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকি।" ১২। মহাত্মা এব্‌রাহীম আদ্‌হম আল্লার দরবারে এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"হে আল্লা! তুমি যে প্রেম আমার হৃদয়ে দান করিয়াছ এবং তোমার স্মরণের যে মিষ্টত্ব আমার অদৃষ্টে ভোগ করিতে দিয়াছ, তুমি জান, তাহার তুলনায় বেহেশ্‌ৎ আমার নিকট মশকের পালকের তুল্য তুচ্ছ পদার্থ।" ১৩। মহামাননীয়া বিবী রাবেয়া বছরীকে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"আপনি মহাপুরুষ হজরৎ রসুল করিম (ﷺ) কে কেমন করিয়া ভালবাসেন?" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—"এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার প্রতি প্রেম আমাকে তাঁহার সৃষ্ট পদার্থের প্রেমের পথ বন্ধ করিয়াছে।" ১৪। মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবীকে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'কোন্ কার্য্য সর্ব্ববিধ কার্য্য অপেক্ষা উত্তম?' তিনি বলিয়াছিলেন—"আল্লার প্রতি প্রেম এবং তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে সন্তুষ্ট থাকা।"

যাহা হউক, এই মর্ম্মের হদীছ এবং মহাজন-বচন বহু আছে। পূর্ব্ব-কালের জ্ঞানীবৃন্দের অবস্থা দৃষ্টে স্বভাবতঃ বুঝা যায় আল্লার সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান এবং প্রেমের আনন্দ, বেহেশ্‌তের আনন্দ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। পাঠক! উপরিলিখিত কথা গুলি তোমাকে প্রগাঢ় মনোযোগ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক।

আল্লার তত্ত্ব, গুপ্ত হইবার কারণ। পাঠক! জানিয়া রাখ, কোন পদার্থের অবস্থা জানা কঠিন হইলে, সে কাঠিন্য দুই কারণে ঘটিয়া থাকে। প্রথম—তাহা অতি গুপ্ত, এত গুপ্ত যে কোনরূপে দৃষ্টি গোচর হয় না। দ্বিতীয়—তাহা অতি উজ্জ্বল, এত উজ্জ্বল যে, চক্ষু তাহার তেজ সহ্য করিতে পারে না। দেখ—চামচিকা রাত্রিকালে দেখিতে পায়, কিন্তু দিবসে দেখিতে পায় না। ইহাতে এ কথা মনে করিও না যে, রাত্রিকালে পদার্থ প্রকাশ পায় ও দিবসে গুপ্ত থাকে, বরং দিবসে রৌদ্রের আলোকে সমস্ত পদার্থ নিতান্ত প্রকাশিত হইয়া থাকে। তবে কথা এই—চামচিকার দর্শন

শক্তি নিতান্ত দুর্ব্বল, তজ্জন্য সূর্য্যের প্রখর রৌদ্র তাহার চক্ষে সহ্য হয় না।

১। এক দিকে মানবের অন্তরিন্দ্রিয়ের দর্শন-শক্তি ও ধারণাশক্তি নিতান্ত দুর্ব্বল এবং অপর দিকে আল্লার অস্তিত্ব অতীব উজ্জ্বল; তজ্জন্য মানব, আল্লার প্রখরোজ্জ্বল-অস্তিত্ব ধারণা করিতে পারে না; তজ্জন্যই আল্লার তত্ত্ব বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

—দৃষ্টান্ত যোগে ব্যাখ্যা

২। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের প্রতি মনোযোগ দিলে বুঝা যাইবে যে, আল্লার সম্বন্ধে দুই একটী প্রমাণ থাকিলে তাঁহাকে চেনা সহজ হইত; কিন্তু নানা ধরণের প্রমাণ অসংখ্য স্থান হইতে অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রখর দীপ্তির সহিত যুগপৎ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে বলিয়া ধাঁধা লাগাতে, মানব দৃষ্টি-হারা হইয়া গিয়াছে এবং তাহার বুদ্ধি অসংখ্য দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। পাঠক! তোমাদের সম্মুখে সুলিখিত একখানী পত্র বা সুন্দর সেলাই করা একখানী বস্ত্র স্থাপিত হইলে উহা দেখিয়া বুঝিতে পার—(টীঃ ৪৫৫) এ কার্য্যটী যখন দেখিতেছি তখন অবশ্যই ইহার একজন কর্ত্তা আছেন। কিন্তু তিনি এখন জীবিত কি মৃত তাহা অবশ্য উহা দেখিয়া বলা যায় না; তবে, তিনি যখন লিখিয়া ছিলেন বা সেলাই করিয়া ছিলেন তখন অবশ্যই জীবিত ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার সুধু জীবন ছিল তাহা নহে তাঁহার হস্ত চক্ষু আদির বেশ ক্ষমতা ছিল—কেমন করিয়া করিলে সুন্দর হয় সে জ্ঞানও ছিল, তদ্‌ব্যতীত তাঁহার মনে উহা করিবার প্রবল ইচ্ছাও ছিল। এখন দেখ—লিখক বা দর্জ্জীর একটী কার্য্য দেখিয়া, তোমরা উহাদের ক্ষমতা, জ্ঞান, জীবন, ইচ্ছা ইত্যাদি সুন্দর পরিচয় পাইলে, কিন্তু তাঁহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তত বড় প্রমাণ পাইতে পার নাই, অর্থাৎ এখন তাঁহারা বর্ত্তমান আছেন কি মরিয়া গিয়াছেন এ কথা বলিতে পার না। তথাপি লিখক বা দর্জ্জীর ক্ষমতা, জ্ঞান, জীবন, ইচ্ছা এগুলি ঐ পত্র বা বস্ত্র হইতে এমন পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারিলে যে, ঐ কয়েকটী বিষয়ে তোমাদের 'এল্‌মোল এয়াকীন' অর্থাৎ ধ্রুব জ্ঞান হইল। এখন দেখ—আল্লা যদি ঐ রূপ একটী পক্ষী বা একটী উদ্‌ভিদ্ সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হইতেন, তবে তোমরাও লিখকের পত্র ও দর্জ্জীর বস্ত্র দর্শনের ন্যায়, আল্লার ক্ষমতা, জ্ঞান, ইচ্ছা এ কয়েকটী বিষয় নিঃসন্দেহে

টীকা—৪৫৫। এই প্যারার এই টীকা চিহ্ন হইতে পরবর্ত্তী তারকা চিহ্ন পর্য্যন্ত কথাগুলি, মূল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বাক্যের ব্যাখ্যা জন্য, বিস্তৃত ভাবে লিখা গেল।

ধ্রুবভাবে বুঝিতে পারিতে। পূর্ব্ব দৃষ্টান্তে লিখক বা দর্জ্জীর জীবন বা অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধ্রুব কিছু জানিতে পার নাই, কিন্তু পক্ষী বা উদ্‌ভিদ্‌ লইয়া বিচার করিলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবে, আল্লা, ক্ষমতা জ্ঞান ও ইচ্ছাদি সহকারে জীবন্তভাবে বর্ত্তমান আছেন। যে শিল্প-কার্য্যের গতি বরাবর চলিতেছে তাহা দেখিয়া শিল্পীর বর্ত্তমানতা বেশ বুঝা যায়। ডিম্ব হইতে পক্ষীর ছানা-বহির্গমন, তাহার পর অনুক্ষণ পক্ষী-শাবকের দেহ-বর্দ্ধন, আহার গ্রহণ, ভুক্ত-দ্রব্য জীর্ণ হইয়া রক্তরূপে পরিবর্ত্তন, চলন ফিরন উড়ন ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝা যায়, পক্ষী-নির্ম্মাতার অলক্ষিত হস্ত, পক্ষী-জীবনের প্রত্যেক অবস্থার সহিত বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে সদাসর্ব্বদা লাগিয়া আছে। এক মুহূর্ত্ত, পক্ষী-দেহের ভিতর-বাহির কোন স্থান ত্যাগ করিতেছে না। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা গেল, পক্ষী-স্রষ্টা আল্লা, সর্ব্বদা জীবন্তভাবে বর্ত্তমান আছেন। এইরূপ একটী উদ্‌ভিদ্‌ লইয়া বিচার করিলেও ঐ সত্য তন্মধ্যেও দেখিতে পাইবে। কিন্তু পক্ষীর অবস্থার সঙ্গে বৃক্ষের অবস্থা সর্ব্বত্র মিলিবে না। তথায় অতিরিক্ত ব্যাপারের দিকে বুদ্ধিকে প্রেরণ করিয়া সেই নূতন তথ্য অবধারণ করিতে হইবে। ইহাতে বুদ্ধিকে অতিরিক্ত দর্শনে ও অতিরিক্ত বিচারে অধিক হয়রাণ ও পরিশ্রান্ত হইতে হইবে। পক্ষীর আহার-পদ্ধতি ও বৃক্ষের আহার-ব্যবস্থা সমান নহে। পক্ষী এক মুখ দিয়া আহার করে, অভ্যন্তরে গিয়া ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইয়া রক্ত রূপে পরিণত হয়। অসার ভাগ নির্দ্দিষ্ট পথে বাহির হইয়া যায়। উহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ধরণও পৃথক। বৃক্ষগণ শিকড়-রূপ মুখ দিয়া মৃত্তিকাস্থ রস পান করে--পক্ষীর ন্যায় গলাধঃকরণ করে না। আবার পত্র পল্লবাদি, অঙ্গ দ্বারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলে এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুস্থ অঙ্গারাদি খাদ্য গ্রহণ করে। জীবন্ত আল্লা, সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিয়া পক্ষী ও উদ্‌ভিদের গঠন বর্দ্ধনাদি কার্য্য, সর্ব্বদা নিজে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, বিশেষ হিসাবের সহিত করিতেছেন। এখন দেখ—একটী পক্ষীর সহিত একটী উদ্‌ভিদ্‌ লইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া বুদ্ধিকে কেমন ঘোর চক্রের মধ্যে পড়িতে হইল; এবং সেই চক্রের প্রত্যেক অংশ হইতে আল্লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরণের প্রমাণ উত্থিত হইয়া, বুদ্ধির দর্শন-শক্তিকে কেমন ধাঁধার মধ্যে ফেলিল! স্মরণ কর—যখন একটী পক্ষী লইয়া বিবেচনা-বিচার করিতে হইয়াছিল তখন আল্লার অস্তিত্বের প্রমাণ সরল ও অল্প ছিল; তজ্জন্য বুদ্ধিও সহজে ধারণা করিতে পারিয়াছিল। পরে পক্ষীর সহিত আর একটী

উদ্‌ভিদ্ মিলাইয়া বিবেচনা করিতে গিয়া দেখা গেল, পক্ষীর অবস্থার সহিত উদ্‌ভিদের তুলনা ও পার্থক্য দেখিতে গিয়া প্রমাণ বড় জটিল ও অধিক হইয়া পড়িল। বুদ্ধি, সেই একটী প্রমাণের আগা গোড়া শক্ত করিয়া ধরিয়া বুঝিতে গেলে, আর পাঁচটী প্রমাণ একেবারে হাত ছাড়া হইতে লাগিল। দশটীর আংশিক কিছু বুঝা গেল, আর আংশিক বুদ্ধির ধারণা শক্তির বাহিরে চলিয়া গেল। এখন দেখ—আল্লা কেবল একটি পক্ষী বা একটি উদ্‌ভিদ্ সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি—আকাশ, পাতাল, জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা, ধাতু, প্রস্তর, কঙ্কর, বালুকাকণা ইত্যাকার অসংখ্য জড়-পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সমস্ত পদার্থের দিকে মনোযোগ করিতে গেলে সকলেই স্ব স্ব 'অবস্থা রূপ ভাষায়' এক বাক্যে চীৎকার করিয়া সেই মহা শিল্পীর মহান্ ও গরীয়ান্ অস্তিত্ব প্রচার করিতে লাগিল। এ অবস্থায় মানব-বুদ্ধি দিশাহারা হইয়া কিছুই বুঝিতে পারিবে না। প্রমাণের বাহুল্যে ও ঔজ্জ্বল্যে আল্লার পরিচয় কিছুই জানা যায় না। * * *

৩। ইহাও চিন্তা করিয়া দেখ—বিশ্বজগতের পদার্থ সমূহের মধ্যে কোন পদার্থ এক জনের সৃষ্ট, আর অন্য কোন পদার্থ অন্যের সৃষ্ট হইলে, সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে কোন না কোন বিষয়ে, কিছু না কিছু পার্থক্য ঘটিত। সেই পার্থক্য দর্শনে, উভয় স্রষ্টার পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যাইত। কিন্তু সমস্ত পদার্থ এক নিয়মের অধীন হওয়াতে স্রষ্টার পরিচয় গুপ্ত রহিয়াছে। (টীঃ ৪৫৬)

৪। 'প্রমাণের আধিক্য ও ঔজ্জ্বল্য-বশতঃ আল্লার অস্তিত্ব গুপ্ত হইয়া গিয়াছে' এ কথা বুঝাইবার জন্য অন্য একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। দেখ, আলোক না থাকিলে আমরা কিছুই দেখিতে পাইতাম না। ভূপৃষ্ঠে সূর্য্যের আলোক অপেক্ষা অন্য কোন আলোক অধিক উজ্জ্বল নহে। সূর্য্যালোকে সমস্ত পদার্থ দেখা যায়। কিন্তু সূর্য্য যদি চিরকাল সমান উজ্জ্বল থাকিত—অস্ত না যাইত বা মেঘাবৃত না হইত তবে আমরা কেহ আলোক চিনিতে পারিতাম না। সূর্য্য সমানভাবে উজ্জ্বল থাকায়, শুভ্র, কৃষ্ণ ও অন্যান্য বর্ণ, চিরকাল একই প্রকারে দেখিতে পাওয়া যাইত; সুতরাং বর্ণ ব্যতীত আলোক বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ কেহ বুঝিতে পারিত না।

—দৃষ্টান্ত যোগে ব্যাখ্যা

টীকা—৪৫৬। আল্লার সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে দেখা যায় সমস্তগুলি জন্ম, স্থিতি মৃত্যু এই সাধারণ নিয়মের অধীন। আবার অন্য দিকে দেখ—উন্নতি, পূর্ণ-বিকাশ ও অবনতি এই ত্রিবিধ অবস্থায় মধ্য দিয়া সমস্তগুলিকে যাইতে হয়। আল্লা ভিন্ন অন্য স্রষ্টা থাকিলে অবশ্য অন্য কোন নিয়ম হইত। সৃষ্ট পদার্থ এক নিয়মের অধীন এ কথার ব্যাখ্যা বহু প্রকার করা যায়।

কিন্তু সূর্য্য অস্তমিত হইলে, ভূপৃষ্ঠ হইতে আলোক চলিয়া যাইতে লাগিলে, অর্থাৎ অন্ধকার হইতে লাগিলে, শুভ্র কৃষ্ণাদি সমস্ত বর্ণ, ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায়, শুভ্র কৃষ্ণাদি বর্ণ ব্যতীত আলোক নামে অন্য এক পদার্থ আছে। আলোকের অভাব বা পরিবর্ত্তন না হইলে কেহ আলোক চিনিতে পারিত না। এইরূপ বিশ্ব-স্রষ্টা আল্লা, যদি কখন অদৃশ্য হইতেন বা না থাকিতেন এবং তজ্জন্য জগতের সমস্ত পদার্থ (যাহা তাঁহার প্রতাপে বর্ত্তমান আছে তৎসমুদয়) বিশৃঙ্খল হইত তবে সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাকে লোকে আপনা আপনি চিনিতে পারিত। কিন্তু সমস্ত পদার্থই সৃষ্টিকর্ত্তার বর্ত্তমানতার প্রবল ও পরিষ্কার সাক্ষ্য দিতেছে এবং সমস্তই একই নিয়মের অধীন, সুতরাং প্রমাণের বাহুল্য ও প্রাচুর্য্য হেতু আল্লার পরিচয় গুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

৫। আল্লার পরিচয় না বুঝিবার আর একটী প্রধান কারণ এইযে নিতান্ত শৈশবকাল হইতে আমরা আল্লার এই বিস্ময়কর আশ্চর্য্য শিল্প, চক্ষের উপর দেখিতে পাইতেছি বলিয়া, ইহাদের বিস্ময়-উদ্দীপক-ক্ষমতা, আমাদের বুদ্ধিতে ধরিতে পারিতেছে না। শৈশবে বুদ্ধি বিকশিত হয় না বলিয়া, আল্লার সৃষ্ট-পদার্থের পরিষ্কার সাক্ষ্য বুঝিতে পারা যায় না। এ দিকে সেই সকল বিস্ময়কর পদার্থ সর্ব্বদা চক্ষের উপর দেখিতে দেখিতে অভ্যাসক্রমে উহার সহিত সখ্যতা জন্মে, সুতরাং বিস্ময়কারিতা-ভাব, দর্শকের মন আর স্পর্শ করিতে পারে না। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বিকশিত হইলে, যখন বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মে তখন কিন্তু পরিচিত পদার্থগুলি আল্লার শিল্প-নৈপুণ্যের উজ্জ্বল সাক্ষ্য দিতে থাকিলেও মন সে সাক্ষ্য শ্রবণে ও গ্রহণে চেতন পায় না। কিন্তু কোন অপরিচিত দুষ্প্রাপ্য জীব বা আশ্চর্য্য উদ্‌ভিদ নয়ন-গোচর হইলে, লোক আশ্চর্য্যান্বিত হয় এবং সহসা তাহার মুখ হইতে বিস্ময়-প্রকাশক 'ছোব্‌হান আল্লা' শব্দ আপনা আপনি উচ্চারিত হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে সেই অপরিচিত বস্তু, সৃষ্টিকর্ত্তার গৌরবের যে সাক্ষ্য দেয়, তাহা তাহার মনে নূতন বলিয়া গ্রহণ করে। পরিচিত বস্তুর সাক্ষ্য মনে ধরে না।

৬। যাহা হউক, যাহার বুদ্ধি-শক্তি দর্শন-ক্ষমতা দুর্ব্বল নহে, সে যখন যে পদার্থ দর্শন করে তাহার মধ্যে তন্নির্ম্মাতার ক্ষমতা ও জ্ঞানাদি শক্তি উপলব্ধি করিয়া থাকে। কোন বস্তু দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে চিন্তা না করিয়া তাহাকে

সহজে ছাড়িয়া দিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে না; তদ্রূপ ব্যক্তি, আকাশ ও পৃথিবীকে আল্লার শিল্প পদার্থ বলিয়া এমন পরীক্ষার চক্ষে দেখিতে থাকে যে, মর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া, কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। যাহারা 'লেখা পড়ার' কৌশল জানে তাহারা লিখিত-পত্র দেখিলে, পাঠ করিয়া মর্ম্ম বুঝিয়া লয়। দুই প্রকার দৃষ্টিতে পত্র পঠিত হয়। (১) সাধারণ দৃষ্টি অর্থাৎ এই চর্ম্ম চক্ষে সাদা কাগজের উপর কালীর দাগ গুলি দর্শন করা। ইহা 'লেখা পড়া' না জানা লোকের দর্শন। ইহার মধ্যেও প্রকার ভেদ আছে। অমনোযোগের সহিত, কেবল সাদা কাগজে, কালীর দাগের বর্ত্তমানতা ও অবর্ত্তমানতা দেখা এবং তদপেক্ষা কিছু মনোযোগ দিয়া দাগ গুলির সমতা, সরলতা, সুন্দর কি কদাকার প্রভৃতি বাহ্য আকৃতি দর্শন করা। এরূপ দর্শনে লিখকের অভিপ্রায়, জ্ঞান ইচ্ছা না বুঝিতে পারিলেও তাহার চিত্র নৈপুণ্যের ক্ষমতা কিছু কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারে। (২) এরূপ দর্শন ব্যতীত আর এক উন্নত শ্রেণীর দর্শন আছে তাহা লেখা পড়া জানা বিদ্বান্ লোকের দর্শন। তাঁহার বুদ্ধির চক্ষে, জ্ঞান-নয়নে পত্র দেখিয়া উহা পাঠে লিখকের অভিপ্রায় ও জ্ঞান বুঝিতে পারেন। গগন মণ্ডল ও ভূমণ্ডল, আল্লার কৌশলময় কলমে লিখিত পত্র সদৃশ। চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, মেঘ, বৃক্ষ লতা, পাহাড়, পর্ব্বত ইত্যাদি সেই পত্রের অক্ষর। আল্লার লিখিত এই পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য। বন্ধুর লিখিত পত্র পাঠকালে লোকে পত্রের অক্ষরের গঠনমাত্র দেখিয়া তৃপ্ত হয় না, ঐ পত্রের কথাগুলি বুঝিয়া তাঁহার অভিপ্রায় পর্য্যন্ত জানিয়া লয়। সেইরূপ আল্লার সৃষ্ট প্রত্যেক পদার্থ, তাঁহার পৃথক পৃথক পত্র। এমনকি এক এক খানি অনন্ত গ্রন্থ। একটী দ্রব্য লইয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে যে কয়েকটী সরল প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা বুঝিতে পারা আমাদের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু নানা ধরণের অসংখ্য বস্তু পাঠ করিতে গেলে মানব-বুদ্ধি অক্ষমতা হেতু সমস্তগুলি এক সঙ্গে বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারে না; সুতরাং অধিকাংশ অজ্ঞাত থাকে। এখানেও প্রমাণের অত্যধিক উজ্জ্বলতা হেতু জ্ঞেয় পদার্থ অজ্ঞাত থাকে।

প্রেমকে বর্দ্ধিত ও উন্নত করিবার উপায়। পাঠক! অবগত হও—হৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলি অনুশীলন-প্রভাবে উন্নত হইয়া নির্দ্দিষ্ট 'মোকাম' (স্থান) পর্য্যন্ত আরোহণ করে; তন্মধ্যে ভালবাসা-প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি প্রাপ্ত হইতে পারে। উহাকে উন্নত করিবার প্রধান

উপায় জানিয়া লওয়া আবশ্যক। প্রেমকে উন্নত করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে **অনুরাগ** জন্মাইয়া লইয়া পরে তাহাকে বলবান করিয়া লইতে হয়। (টীঃ ৪৫৭). যে ব্যক্তি কোন সুন্দরীকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে, তাহার নিজের মনে সেই সুন্দরীর প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া লওয়া প্রধান কার্য্য; তদর্থে তাহার চক্ষু সর্ব্বদা সুন্দরীর দিকে লাগাইয়া রাখা কর্ত্তব্য—সুন্দরী ভিন্ন আর কাহারও দিকে মন বা চক্ষু ফিরান উচিত নহে। তাহার বদন মণ্ডলের প্রকাশ্য সৌন্দর্য্য তো প্রাণ ভরিয়া দেখা আবশ্যক, তৎব্যতীত যে অংশ আবৃত আছে তাহার সৌন্দর্য্য দর্শনেরও চেষ্টা করা আবশ্যক। সৌন্দর্য্য যতই দর্শন করিতে থাকিবে 'অনুরাগ' তত বর্দ্ধিত হইবে। বরাবর দর্শন করিতে ব্যপৃত রহিলে দর্শকের মনে আপনা আপনি কিছু না কিছু 'অনুরাগ' জন্মিবে—অল্প বিস্তর অনুরাগ না জন্মিয়া যাইতে পারে না। যাহা হউক, আল্লাকে দর্শনের অনুরাগ বর্দ্ধনেরও এই পন্থা প্রশস্ত। আল্লার ভালবাসা লাভ করিতে হইলে মানুষকে দুনিয়ার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লওয়া এবং সংসারাসক্তি হৃদয় হইতে ধুইয়া ফেলিয়া হৃদয় পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক। সংসারাসক্তি মানুষকে আল্লার প্রেম হইতে বঞ্চিত করে। ক্ষেত্রে শস্য-বীজ বপন করিতে হইলে যেমন ক্ষেত্র হইতে ঘাস কাঁটা, তৃণাদি পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হয়, আল্লার প্রেম-বীজ অর্থাৎ অনুরাগ হৃদয়ে বপন করিবার অগ্রে সেইরূপ সংসারাসক্তি দূর করিতে হয়। যে ব্যক্তি আল্লার সৌন্দর্য্য দেখে নাই সে আল্লাকে ভালবাসিতে পারে না। সৌন্দর্য্য ও পূর্ণ-মহত্ত্ব জানিতে পারিলে স্বভাবতঃই ভালবাসা জন্মে। উহা

নিয়ত দর্শন-চেষ্টা হইতে অনুরাগ সঞ্চার

টীকা—৪৫৭। মানব শিশু বাহিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঙ্গে লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, পরে সেগুলি স্বাভাবিক নিয়মে দেহের বর্দ্ধনের অনুপাতে বর্দ্ধিত হয়। আভ্যন্তরিক প্রবৃত্তিগুলি কিন্তু জন্মের সময়ে এক সঙ্গে আগত হয় না—ক্রমে ক্রমে আসে; এবং ক্রমে বর্দ্ধিত ও বিকশিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। প্রবৃত্তিগুলি হস্তপদাদির ন্যায় জড় পদার্থ নহে—সুতরাং দেখা যায় না। তজ্জন্য উহাদের স্বভাব ও ধরণ করণও জানা সহজ নহে। তিনটী প্রবৃত্তি লইয়া আলোচনা করিলে অনেকগুলি কথা জানা যাইবে, তাহাতে মূল গ্রন্থের বিষয়টী বুঝা সহজ হইবে। ভোজন প্রবৃত্তি, বুদ্ধি প্রবৃত্তি ও ভালবাসা প্রবৃত্তি বা প্রেম, ক্রমান্বয়ে আগমন করে ও বিকশিত হয়। ইচ্ছা উহাদের সকলের জীবন, যথা ভোজনেচ্ছা বা ক্ষুধা; জ্ঞানপিপাসু, ও অনুরাগ। প্রথম দুটী ইচ্ছাকে সংস্কৃতে বুভুক্ষা ও বুভুৎসা বলে, সংক্ষিপ্ত হইলেও অপ্রচলিত বোধে আমরা সে নাম ত্যাগ করিলাম। ঐ প্রবৃত্তিগুলি স্ব স্ব 'বিষয়' ভোগ করিয়া চরিতার্থ হইতে থাকিলে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। বুভুক্ষা বা ক্ষুধার সীমা আছে, কিন্তু জানিবার ইচ্ছা যাহাকে বুভুৎসা বা কৌতূহল বলে এবং ভালবাসার ইচ্ছা যাহাকে অনুরাগ বলে এ দুটীর সীমা নাই—আজীবন বর্দ্ধিত হইতে পারে।

ভালবাসার বাস্তব 'কারণ'। এই হেতু জগতের লোকে মহাত্মা আবুবকর ছিদ্দীক ও মহাত্মা ওমর ফারুককে মহৎ গুণে বিভূষিত জানিতে পারিয়া ভালবাসিয়া থাকে। যাহা হউক, হৃদয়রূপ ক্ষেত্র হইতে সংসারাসক্তিরূপ আবর্জ্জনা দূর করিয়া, জ্ঞানরূপ বীজ বপন পূর্ব্বক, জেকের, ফেকের ও এবাদৎ-রূপ জল সেচন করিলে সৌভাগ্যরূপ ফসল হস্তগত হয়। কোন ব্যক্তিকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে থাকিলে তাহার সহিত এক প্রকার সখ্যতা উৎপন্ন হয়। পাঠক! অবগত হও কোন মুছলমানই আল্লার প্রেম হইতে বঞ্চিত নহে—প্রত্যেক মুছলমানের হৃদয়ে কিছু না কিছু প্রেম থাকে! তবে কাহারও হৃদয়ে অধিক আর কাহারও হৃদয়ে অল্প, এই প্রভেদ।

প্রেমের তারতম্য হইবার তিনটী কারণ আছে। **প্রথম কারণ**—মানুষের মনে সংসার-প্রেমের তারতম্য এবং সংসারের সহিত লিপ্ত থাকায় ন্যূনাধিক্য। এক পদার্থের ভালবাসা অন্য পদার্থের ভালবাসা কমাইয়া দেয়। **দ্বিতীয় কারণ**—পরিচয় প্রাপ্তির তারতম্য। সাধারণ লোক, ইমাম শাফেঈ রহমতুল্লার গুণের মধ্যে সাধারণ গুলি ধরিতে পারিয়া তাঁহাকে যেরূপ ভালবাসে, ফেকা শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ উক্ত ইমাম ছাহেবের অসাধারণ পাণ্ডিত্য বুঝিতে পারিয়া তদপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়া থাকেন। ইহার কারণ এইযে, সাধারণ লোক তাঁহার সম্বন্ধে যে পরিমাণে পরিচয় পাইতে পারে, আলেম লোক তদপেক্ষা উজ্জ্বল ও পরিষ্কার পরিচয় পাইয়া থাকেন। আবার দেখ—উক্ত ইমাম ছাহেবের, মজনী নামক, একজন শিষ্য ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা ইমাম ছাহেবের সঙ্গে থাকিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইমাম ছাহেবের উচ্চ জ্ঞান ও উন্নত স্বভাবের পরিচয় যতদূর পাইয়াছিলেন অপর কোন আলেম তত পান নাই। সুতরাং মজনী তাঁহাকে যত ভালবাসিতেন অন্য কোন আলেম লোক তাঁহাকে তত ভালবাসিতে পারেন নাই। আল্লার সম্বন্ধেও তদ্রূপ। যে ব্যক্তি আল্লার যত পরিচয় পাইয়াছেন তিনি তাঁহাকে তত ভালবাসিয়া থাকেন। **তৃতীয় কারণ**—'জেকের' ও এবাদৎ হইতে আল্লার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। সেই 'জেকের' ও এবাদতের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে ভালবাসার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। উপরি লিখিত তিন কারণে আল্লার প্রতি প্রেম অল্প বা অধিক হইয়া থাকে।

মারেফৎ বা পরিচয় হইতে প্রেমের জন্ম—কোন ব্যক্তি আল্লাকে একেবারে ভাল না বাসিলে, ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সে কখনই আল্লাকে

চিনিতে পারে নাই! শরীরের বাহ্য সৌন্দর্য্য লোকে যেরূপ ভালবাসে স্বভাবের অন্তর্গত সৌন্দর্য্যও লোকে তদ্রূপ ভালবাসে। 'মারেফৎ' অর্থাৎ পরিচয় হইতে প্রেমের জন্ম।

'মারেফৎ' উপার্জ্জনের দ্বিবিধ পন্থা—পূরা 'মারেফৎ' বা তত্ত্ব-জ্ঞান উপার্জ্জনের দুই পন্থা আছে। তন্মধ্যে **প্রথম পন্থা**—পবিত্রাত্মা ছুফীদিগের অবলম্বিত। ইহাকে 'সাধনার পথ' বলে। এ পথে নিরবচ্ছিন্ন 'জেকের' দ্বারা হৃদয় পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। বরাবর জেকের করিতে তন্ময় হইলে নিজের অস্তিত্ব ও চারিধারের পদার্থের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইতে হয়। পরিশেষে এমন এক অবস্থার উদয় হয় যে তখন আল্লার প্রতাপ চাক্ষুষ দর্শনের ন্যায় উজ্জ্বল ভাবে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এ পন্থাকে শিকারীগণের ফাঁদ পাতার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। শিকারী ফাঁদ পাতিয়া শিকার ধরিবার আশায় বসিয়া থাকে এবং অনুক্ষণ আশা করে কোন জন্তু আসিবে ও ফাঁদে পড়িবে। কিন্তু সে ফাঁদে শিকার পড়িতেও পারে, না পড়িতেও পারে। যদিও বা পড়ে, তাহা কোন্ প্রকারের বা কোন্ শ্রেণীর শিকার তাহা সে জানে না। ভাল শিকারও পড়িতে পারে, ইঁদুরও পড়িতে পারে। আবার শিকার আদৌ না পড়িয়া শিকারীর পোষা বাজটি ফাঁদে পড়িয়া মারা যাইতে পারে। এ পন্থায় সাধকের ভাগ্য পরীক্ষা হয়। কোন্ সাধকের অদৃষ্টে কি লাভ হইবে তৎসম্বন্ধে বড়ই প্রভেদ ঘটে। **দ্বিতীয় পন্থা**—জ্ঞানী আলেমদিগের আচরিত। ইহা জ্ঞানের পথ। এ পথে, 'মারেফতের এলেম' শিখিতে হয়। তদর্থে বাক্যালঙ্কার বা অন্য কোন বিদ্যার প্রয়োজন নাই। আল্লার আশ্চর্য্য সৃষ্টি-কৌশল লইয়া চিন্তা করিবার অভ্যাস করা 'মারেফৎ' বিদ্যার আরম্ভ। আল্লাকে চিনিবার জন্য তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ লইয়া কি প্রণালীতে চিন্তা করিতে হয় তাহা এই **পরিত্রাণ** পুস্তকে সপ্তম পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। সৃষ্ট পদার্থ লইয়া চিন্তা করিবার অভ্যাস জমিয়া গেলে, আল্লার প্রতাপ ও সৌন্দর্য্য লইয়া চিন্তা করিতে হয়। তাহাতে আল্লার নাম ও গুণের মর্ম্ম পরিষ্কার রূপে জানা যায়। আল্লার নামের ও তাঁহার গুণ-প্রকাশক নামের অর্থ জানা একটী অতীব প্রধান বিদ্যা। বুদ্ধিমান মুরীদ, পরিপক্ক পীরের সাহায্যে এই জ্ঞান শিক্ষা করিতে পারে। নির্ব্বোধ লোক

প্রথম পন্থা—নিরবচ্ছিন্ন জেকের করা

দ্বিতীয় পন্থা—আল্লার সৃষ্টিকৌশল প্রতাপ ও সৌন্দর্য্যাদি চিন্তা করা

এ জ্ঞান শিক্ষা করিতে পারে না। ফাঁদ পাতিয়া শিকার ধরার ন্যায়, এ জ্ঞান অনিশ্চিত নহে। ফাঁদে শিকার পড়িতেও পারে, না পড়িতেও পারে, কিন্তু এ উপায়ে জ্ঞান লাভ করা কৃষি বাণিজ্যের ন্যায় নিশ্চিত। ছাগ ও ছাগীর মিলনে যেমন ছাগলের বংশ বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ এই শ্রেণীর লব্ধ-জ্ঞানের একটীর সহিত আর একটী জ্ঞান মিলাইয়া জ্ঞান বংশের বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। কিন্তু এরূপ জ্ঞানের উপর হঠাৎ কোন আপদ পতিত হইলে ইহা সমূলে নষ্ট হইতে পারে। গোলাবন্দীশস্য বা খোয়াড়স্থ ছাগপালের উপর বজ্রপাত হইলে তৎসমুদয় যেমন হঠাৎ নষ্ট হয়, তদ্রূপ দৈব বিপদে এই জ্ঞান-ধনও নষ্ট হয়। এরূপ বিপদের প্রতিবিধানের উপর মানুষের হাত নাই—এ বিপদ অদৃষ্টের কথা।

মারেফৎ-পথ ত্যাগ করিয়া কেহ প্রেম অনুসন্ধান করিতে গেলে তাহার পক্ষে দুরাকাঙ্ক্ষা করা হইবে। মারেফৎ-জ্ঞান লাভের যে দুই পথের সন্ধান উপরে দেওয়া গেল তাহা পরিত্যাগ করতঃ জ্ঞানার্জ্জনের আশায় অন্য কোন পথে চলিলে নিশ্চয় অকৃতকার্য্য হইতে হইবে।

পারলৌকিক সৌভাগ্য—আর ইহাও জানিয়া রাখ—আল্লার প্রতি প্রেম উপার্জ্জন না করিয়া যে ব্যক্তি সৌভাগ্য অনুসন্ধান করিতে যায়, সে নিতান্ত ভুল করে। পরকালের অর্থ হইতেছে আল্লার নিকটে যাওয়া। মনে কর—এক ব্যক্তি কাহাকে ভালবাসে এবং তাহার সঙ্গে মিলনের জন্য মনে প্রবল অনুরাগ রাখে কিন্তু কোন প্রবল অন্তরায়ের জন্য মিলিত হইতে পারিতেছে না। বহুদিন সেই অনুরাগ হৃদয়ে লইয়া দিনপাত করিতেছে। এমন সময়ে হঠাৎ সে বাধা ঘুচিয়া গেল, এবং তজ্জন্য প্রিয় বস্তুর সহিত মিলন হইল। এখন বলতো সে ব্যক্তি কেমন অপার আনন্দ ভোগ করিতে পাইবে! এইরূপ অবস্থা প্রাপ্তিকে সৌভাগ্য বলে। প্রথমাবধি প্রিয় পদার্থের প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগ না থাকিলে তাহার সঙ্গে মিলনে কিছুমাত্র আনন্দ পাওয়া যায় না। অল্প স্বল্প ভালবাসা থাকিলে তাহার সহিত মিলনে অল্প আনন্দ পাওয়া যাইতে পারে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে প্রেম ও অনুরাগের পরিমাণ অনুসারে সৌভাগ্য পাওয়া যায়। আবার দেখ—কোন ব্যক্তির শত্রুর সঙ্গে তোমার ভালবাসা আছে। যদি ঘটনাক্রমে সেই ব্যক্তির সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয়, তবে মনে যে অবস্থার উদয় হয় তাহা অবশ্যই পূর্ব্বাবস্থার বিরোধী হইবে। এ সাক্ষাতে

সৌভাগ্য কি ?

প্রেম ও অনুরাগের পরিমাণ ও পাত্রভেদে সৌভাগ্য পাওয়া যায়

মনে বিষম কষ্ট ও ভয় উৎপন্ন হইবে। প্রেমের ফলে সৌভাগ্যশালী হওয়া যায়। আবার সেই প্রেম অপাত্রে ন্যস্ত হইলে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হইতে হয়। (টীঃ ৪৫৮) এই সম্বন্ধে উপমা স্বরূপে একটী গল্প বলা যাইতেছে—মল মূত্র পরিষ্কারক একজন 'মেহ্-তর' আতর গোলাব প্রস্তুতের কারখানায় গিয়াছিল। সুগন্ধে সে স্থান ভরপুর ছিল। মেহ্তর বেচারা সুগন্ধের মধ্যে বেষ্টিত হইয়া অজ্ঞান হইয়া ভূপতিত হইয়াছিল। পার্শ্ববর্ত্তী লোক জন দৌড়াদৌড়ী আসিয়া তাহার মস্তকে ও গাত্রে গোলাব সিঞ্চন করিতে লাগিল; কেহবা আতর ও মেশ্ক আনিয়া তাহার নাকে ধরিল কিন্তু এরূপ ব্যবস্থায় তাহার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িল। সেই সময়ে তথায় একজন মেহ্তর আসিয়া উপস্থিত হইল। সে উহার অবস্থা চিনিয়া তৎক্ষণাৎ কিছু বিষ্ঠা আনিয়া তাহার নাসিকা-দ্বারের নিকট ধরিল, আর কিয়দংশ তাহার নাকের উপর মালিশ করিয়া দিল। এইরূপ ব্যবস্থায় মেহ্তরের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেল। সে বলিল—'এই গন্ধই আমার প্রিয়—ইহা আমার নিকট সুগন্ধ!' যাহা হউক, এইরূপ যাহারা 'দুনিয়া' উপভোগে আনন্দ পায় এবং দুনিয়া যাহাদের নিকট অতি প্রিয় পদার্থ হইয়াছে তাহারা উক্ত মেহ্তরের সদৃশ। আতর গোলাবের কারখানায় মেহ্তর স্বীয় প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষিত মল-মূত্রাদি না পাইয়া বরং তথায় যে সকল সুগন্ধি দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে স্থাপিত ছিল তাহা উহার প্রকৃতির বিরোধী ছিল বলিয়া তাহার দুঃখ কষ্ট অধিক হইয়াছিল। এইরূপ পরকালের রম্য স্থানে এই নিকৃষ্ট দুনিয়ায় আনন্দদায়ক পদার্থ পাইতে না পারিয়া এবং তৎপরিবর্ত্তে উৎকৃষ্ট উপাদেয় বস্তু প্রচুর ও ভরপূর দেখিতে পাইয়া সংসারাসক্ত লোক মহা কষ্টে পড়িবে। পরকালের পদার্থ সংসার-লোভী লোকের প্রকৃতির বিপরীত, তজ্জন্যই পরজগতের উপাদেয় পদার্থ, সংসার-লোভীর কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। পরকাল, আত্মার রাজ্য। সে স্থান, নির্ম্মুক্ত আত্মায় সুশোভিত এবং আল্লার সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত। তথায় যাইবার পূর্ব্বে এই পৃথিবী হইতে যে ব্যক্তি স্বীয় আত্মাকে তথাকার উপযুক্ত করিয়া লইতে পারে এবং তথাকার পদার্থগুলির সঙ্গে আসক্তি জন্মাইয়া লইতে পারে, সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী হইবে। পরকালের পদার্থের সঙ্গে আসক্তি জন্মাইয়া লইবার প্রধান উপায় হইতেছে 'প্রবৃত্তিদমন ও সৎগুণ উপার্জ্জন' এবং তদর্থে 'রেয়াজৎ'(সাধনা) ও 'এবাদৎ' করা। আসক্তিরই অপর নাম অনুরাগ। করুণাময় আল্লা বলিতেছেন—

পারলৌকিক পদার্থে আসক্তি জন্মাইবার উপায়

টীকা—৪৫৮। ভালবাসা যোগ্য-পাত্রে স্থাপন করিলে অর্থাৎ আল্লার উপর স্থাপন করিলে

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا

"যে ব্যক্তি উহাকে (স্বীয় আত্মাকে) পবিত্র করিতে পারিয়াছে সে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইবে।" (৩০ পারা। সূরা শম্‌ছ) আল্লার প্রতি ভালবাসার ত্রিবিধ শত্রু আছে (১) সংসার আসক্তি, (২) দুনিয়ার মোহ, (৩) পাপ। এই সমস্ত দূর করিয়া যে ব্যক্তি নিজের আত্মাকে পবিত্র করিতে পারেন, তিনি আল্লার প্রেম সঙ্গে লইয়া পরকালে গিয়া সৌভাগ্যশালী হইতে পারেন। আল্লা পুনরায় বলিতেছেন—

আল্লার প্রতি ভালবাসার ত্রিবিধ শত্রু

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

"যে ব্যক্তি তাহাকে (আত্মাকে) মাটী দিয়া ঢাকিয়াছে (অর্থাৎ দুনিয়ার আসক্তি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছে) সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়াছে।" (৩০ পারা। সূরা শম্‌ছ। শেষ শ্লোক্।)

প্রকৃত চক্ষুষ্মাণ আরেফ লোক 'এই কথার মর্ম্ম' (টীঃ ৪৫৯) এমন সুস্পষ্ট দেখিতে পান যে তাঁহাদিগকে উক্ত কথাগুলি মানিয়া লইবার জন্য আর কোন 'আপ্ত বাক্যে' বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন হয় না। তাঁহাদের প্রত্যক্ষ-লব্ধ-জ্ঞান, 'তক্‌লীদ' (অর্থাৎ 'বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়া বিশ্বাস করার') শ্রেণী অতিক্রম করিয়া স্বোপার্জ্জিত 'ধ্রুব-জ্ঞানে' পরিণত হইয়া থাকে। ইহারা পয়গম্বরের নিকট যে সংবাদ শুনে তাহা অন্ধের ন্যায় আর মানিয়া লইতে হয় না—স্বচক্ষেই দেখিতে পান যে, সে সংবাদ বাস্তবিক সত্য।

মারেফৎ-লব্ধ প্রত্যক্ষজ্ঞান ধ্রুব জ্ঞানে দাঁড়ায়—আপ্ত বাক্য এই ধ্রুব জ্ঞানকে পরিপক্ক করে

এবং তাঁহার সঙ্গে মিলিতে গেলে সৌভাগ্য পাওয়া যায়। কিন্তু অপাত্রে অর্থাৎ তাঁহার শত্রুর সঙ্গে ভালবাসা স্থাপন করিয়া আল্লার সঙ্গে মিলিতে গেলে যন্ত্রণার অবধি থাকে না।

টীকা—৪৫৯। 'এই কথার মর্ম্ম' বাক্যের মধ্যে 'এই' সর্ব্বনাম, যে কথাকে লক্ষ্য করিতেছে বুঝা যায় সে কথাটী ব্যাপক; উহার মধ্যে কয়েকটী 'সত্য' বা 'তথ্য' অন্তর্ভুক্ত আছে। (১) দুনিয়ার 'বিষয়' ও পরকালের 'বিষয়' পরস্পর বিপরীত। (২) দুনিয়ার বিষয়ে আসক্ত হইয়া পরকালে গেলে মহাকষ্টে পড়িতে হইবে। (৩) দুনিয়ার আসক্তি ছিঁড়িলে পরকালে সুখে থাকা যাইবে। এইরূপ 'সত্য' প্রথমে আমরা 'বিশ্বস্ত' লোকের মুখে শুনিয়া বিশ্বাস করিয়া লই; কেননা প্রথমে আমরা নিজের জ্ঞানে ঐ সত্য স্থির করিতে পারি না! উপরের লিখিত দুই উপায়ে মারেফৎ-জ্ঞান খুলিয়া গেলে ঐ সকল তথ্য আপনা আপনি দেখিতে পাওয়া যায় এবং দেখিতে পাইলে সেই তথ্য সম্বন্ধে পরিপক্ক "ইয়াকীন" জ্ঞান উৎপন্ন হয়; তখন আর আপ্ত বাক্যে বিশ্বাসের প্রয়োজন হয় না।

সে সত্য সাব্যস্থ করিয়া লইতে তাঁহাদিগকে আর 'মোজেজা' বা অলৌকিকত্ব দেখিবার প্রয়োজন হয় না। দেখ—যে ব্যক্তি চিকিৎসা বিদ্যায় দক্ষ, সে অন্য পরিপক্ক চিকিৎসকের ব্যবস্থা পত্র দেখিলে শীঘ্রই ব্যবস্থা-দাতাকে যথার্থ চিকিৎসক বলিয়া বুঝিতে পারে এবং তাহার ব্যবস্থা সত্য বলিয়া মানিয়া লয়। কিন্তু দোকানদার লোক পরিপক্ক চিকিৎসকের ব্যবস্থা দেখিলেও তাহা 'ঠিক' বলিয়া মানিয়া লইতে পারে না, বরং ভুল বলিয়া উপহাসও করিতে পারে। এইরূপে চক্ষুষ্মাণ 'আরেফ' লোকেরা, প্রকৃত সত্য-নবী এবং 'জাল' নবীর পার্থক্য চিনিতে পারে। যাহা হউক, পরিপক্ক 'আরেফ' লোক নিজের দর্শন ক্ষমতায় যাহা জানিতে পারেন, পয়গম্বরগণের মুখেও তাহাই শুনিতে পান। এই উভয় প্রকারে, যে জ্ঞান সত্য বলিয়া জানা যায়, তাহা বিশেষ পরিপক্ক হয়। স্বধু পয়গম্বর-গণের 'মোজেজা' (অলৌকিকত্ব) দর্শনে যে জ্ঞান উপার্জ্জিত হয় তাহা ক্ষণ-ভঙ্গুর। মহাত্মা হজরৎ মুছা নবীর নিক্ষিপ্ত লাঠিকে সর্পবৎ দেখিয়া যে জ্ঞান জন্মে, তাহা 'সামরী'র প্রস্তুত গোবৎসের হাম্বা রবে শীঘ্রই বিনাশ পাইতে পারে। (টীঃ ৪৬০) ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে জাদু ও অলৌকিক 'মোজেজার' পার্থক্য চিনা দুষ্কর।

আল্লার প্রতি প্রেমের চিহ্ন। পাঠক! অবগত হও, প্রেম একটী অমূল্য-রত্ন-সদৃশ অনুপম পদার্থ। আমার মনে আল্লার প্রেম আছে এরূপ কথা বলা উচিত নহে এবং আমি এক জন আল্লার প্রেমিক এরূপ কথা মনে ভাবাও উচিত নহে। **প্রেমের ৭ সাতটী চিহ্ন** আছে, বরং সে সকল চিহ্ন নিজের মধ্যে জন্মাইয়া লইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। **প্রথম চিহ্ন**—মৃত্যুকে

টীকা—৪৬০। মিছর দেশের বাদশা 'ফেরআওনে'র জাদুকরগণ জাদু বলে সর্প বানাইয়াছিল। মহাত্মা হজরৎ মুছা নবী স্বীয় হস্ত-স্থিত লাঠি ভূতলে নিক্ষেপ করিলে প্রকাণ্ড অজগর হইয়া সেই সর্প গ্রাস করিয়াছিল। জাদুকরদের সর্প জাদুর প্রভাবে উৎপন্ন; আর নবী মহোদয়ের যষ্টি 'মোজেজা' প্রভাবে সর্প হইয়াছিল। এ উভয় সর্পোৎপত্তির মধ্যে কারণের পার্থক্য স্থির করা কঠিন। তবে নবীর দ্বারা হইয়াছিল বলিয়া ইহা 'মোজেজা' এবং তদ্দর্শনে দর্শক লোক আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। মহাত্মা হজরৎ মুছা নবী এছরায়েল বংশীয় লোকদিগকে মিছর দেশ হইতে উদ্ধার করিয়া আনিবার পথে তাহাদিগকে প্রান্তরের মধ্যে তাঁবুতে রাখিয়া স্বয়ং তিনি তুর পর্ব্বতে আল্লার আদেশ গ্রহণে যান। সেই অবসরে 'সামরী' নামক এক স্বর্ণকার স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা এক গোবৎস নির্ম্মাণ করে। শয়তান সেই বৎসের মধ্যে 'হাম্বা' রব নির্গত করিবার কৌশল স্থাপন করে। এই ঘটনা দর্শনে দুর্ব্বল বিশ্বাসী লোকেরা আল্লাকে ছাড়িয়া গোবৎসের পূজা আরম্ভ করে। বর্ত্তমান সময়ের ফনোগ্রাফ ঐ ধরণে প্রাণীর স্বরের অনুকরণ করিতে পারে। দুর্ব্বল জ্ঞান উহা দর্শনে ও শ্রবণে নষ্ট হইতে পারে। নবী মহোদয়ের অলৌকিকত্ব দর্শনে লোকের মনে যে আল্লার প্রতি বিশ্বাস জন্মিয়াছিল আবার সামরীর নির্ম্মিত গোবৎসের হাম্বা রব শ্রবণে সেই আল্লার প্রতি বিশ্বাস ভাঙ্গিয়াছিল। নিজের উপার্জ্জিত জ্ঞান না হইলে টিকে না।

অপ্রিয় বলিয়া মনে না করা। প্রেমিক ব্যক্তি নিজের প্রিয়জনকে দেখিবার অভিলাষী না হইয়া থাকিতে পারে না। (১) মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি আল্লার দর্শন ভালবাসে আল্লাও তাহাকে দেখিতে ভালবাসে।" (২) মহাত্মা বোইয়াতী এক পরহেজগারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তুমি কি মৃত্যুকে ভালবাস?" সে ব্যক্তিকে উত্তর দিতে কিছু বিলম্ব করিতে দেখিয়া তিনি নিজেই বলিলেন—"তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে মৃত্যুকে অবশ্যই ভালবাসিবে।" যাহা হউক, আল্লার প্রেমিকগণের মধ্যে এমন বহু লোক আছেন তাঁহারা মৃত্যুকে অপ্রিয় বলিয়া না বুঝিলেও শীঘ্র মরিতে চান না। তাহাতে এই কথা বুঝিও না যে, তাঁহারা প্রকৃতই মৃত্যুকে অপ্রিয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহারা পরকালের পাথেয় অদ্যাবধি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই; কিছু অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিলে পরকালের পাথেয় অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া লইতে অবসর পাইবেন—এই জন্য তাঁহারা শীঘ্র মরিতে চান না। এই প্রকার লোকের চিহ্ন এই যে, তাঁহারা সদা সর্ব্বদা পরকালের হিতকর পুণ্য কার্য্যে লাগিয়া থাকেন—এক মুহূর্ত্তও পুণ্য অর্জ্জন ভিন্ন অন্য কার্য্যে ব্যয় করেন না। **দ্বিতীয় চিহ্ন**—আল্লার জন্য নিজের প্রিয় পদার্থ উৎসর্গ করা এবং যে পদার্থ আল্লার সহিত নিজের সান্নিধ্য ঘটাইয়া দিতে পারে তাহা পার্য্যমাণে ত্যাগ না করা এবং যে বস্তু আল্লা হইতে দূরবর্ত্তী করিয়া দেয় তাহা হইতে দূরে পলায়ন করা। যিনি সর্ব্বান্তঃকরণে আল্লাকে ভালবাসেন তাঁহার অবস্থা ঐরূপ হয়। (১) মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) একদিন বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি সর্ব্বান্তঃকরণে আল্লাকে ভালবাসে তেমন লোক যদি তোমরা দেখিতে চাও তবে ছালেমকে দেখ।" মহাত্মা ছালেম, মহাত্মা হোজায়ফার গোলাম ছিলেন—পরে সেই গুণে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন। কোন ব্যক্তির দ্বারা পাপ কার্য্য ঘটিলে এ কথা বিবেচনা করা উচিত নহে যে তাহার মনে আল্লার প্রেম নাই—বরং এ কথা বলা যাইতে পারে যে, সে ব্যক্তি আল্লাকে পূর্ণভাবে ভালবাসিতে শিখে নাই। আমাদের এই উক্তির স্বপক্ষে নিম্নলিখিত প্রমাণ আনয়ন করিতে পারি। (২) ইয়াগমান নামক একজন লোক সুরা পান করায় অপরাধে কয়েকবার শাস্তি পাইয়াছিল। শেষবার শাস্তি দেওয়া হইলে একজন ছাহাবা তাহাকে ধিক্কার দিয়াছিলেন। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) তাহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমরা উহাকে

ধিক্কার দিও না; সে আল্লা ও রসুলকে ভালবাসে।" (৩) মহাত্মা ফজীল কোন এক ব্যক্তিকে বলিয়া ছিলেন—"লোকে যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি আল্লাকে ভালবাস কিনা? তবে সে কথার উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকা তোমার উচিত। এ কথা এই জন্য বলিতেছি যে, যদি বল, 'আল্লাকে ভালবাসি না'; তবে তোমাকে কাফের হইতে হইবে। আর যদি বল, 'তাঁহাকে ভালবাসি', তবে তোমার আচরণ, আল্লার বন্ধুগণের আচরণের তুল্য হইবে না।" (টীঃ ৪৬১) **তৃতীয় চিহ্ন**—আল্লার জেকের (স্মরণ) সর্ব্বদা হৃদয়ের উপর সজীব ভাবে প্রবল থাকা। আল্লার প্রেমিক লোক স্বভাবতঃ আল্লার নাম স্মরণে প্রবৃত্ত হন এবং তাহা হইতে আরাম ও আনন্দ পান—তাঁহাকে চেষ্টা চরিত্র করিয়া আল্লার স্মরণে প্রবৃত্ত হইতে হয় না। মানুষ যাহাকে ভালবাসে তাহাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া থাকে। ভালবাসা যখন পূর্ণ উন্নতি প্রাপ্ত হয় তখন এক মূহূর্ত্ত প্রিয় পদার্থকে ভুলিতে পারা যায় না। চেষ্টা চরিত্র করিয়া মনকে আল্লার স্মরণে লাগাইতে হইলে, এই কথা বুঝা যায় যে স্বয়ং আল্লা তাহার নিকট তত প্রিয় নহেন-তাঁহার স্মরণ (জেকের) ই তাহার নিকট প্রিয়, তজ্জন্যই সে জেকেরে নিযুক্ত হইয়া থাকে। প্রেম এক পদার্থ এবং প্রেমকে ভালবাসা অন্য পদার্থ। **চতুর্থ চিহ্ন**—আল্লার সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুর প্রতি ভালবাসা। কোর্-আন শরীফকে তাঁহার বাক্য বলিয়া এবং রসুল ও অন্যান্য পদার্থকে তাঁহার সঙ্গে সম্পর্কিত বলিয়া যে ভালবাসা জন্মে তাহার পূর্ণ উন্নতি হইলে সমস্ত সৃষ্ট জীবের প্রতি ভালবাসা আপনা আপনি উচ্ছলিত হইয়া উঠে। পরিশেষে প্রত্যেক পদার্থ—প্রত্যেক পত্র বা কঙ্করের প্রতি সেই ভালবাসা বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং যে দিকে দেখা যায় সেই দিক হইতে ভালবাসা ও আনন্দের লহরী প্রবাহিত হইতে থাকে। লোকে যাহাকে ভালবাসে তাহার লিখিত পত্রও ভাল লাগে। **পঞ্চম চিহ্ন**—যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার সহিত নিভৃতে বাস করিতে এবং তাহার নিকট মনের কথা জ্ঞাপন করিতে মন ব্যাকুল হয়। দিবসে কার্য্য-ব্যাপৃতি, কার্য্য-বাহুল্য ও জনতার গোলমালে মন বিচলিত থাকে। রাত্রি

টীকা—৪৬১। যাঁহারা প্রকৃত মুছলমান তাঁহারা কোন সৎকার্য্য করিয়া বা সদ্গুণ লাভ করিয়া এই বলিয়া ভীত হন যে উহা যেরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত ছিল তদ্রূপ হইল না—অবশ্যই কোন না কোন স্থানে ক্রটী ঘটীল। ফলকথা, ঐ ভাব মনে পোষণ করিয়া রাখিলে উন্নতি হয়। আর কোন কার্য্য করিয়া বা কোন গুণ লাভ করিয়া যথেষ্ট হইল বলিয়া পরিতুষ্ট হইলে উন্নতির পথ বন্ধ হয়। 'বিনাশন পুস্তক' নবম পরিচ্ছেদ 'ওজব' দ্রষ্টব্য।

কালে সে সমস্ত বাধা বিঘ্ন ঘুচিয়া যায়, তখন নির্জ্জনে আত্ম-নিবেদনের সুযোগ ঘটে। এই জন্য আল্লার প্রেমিক লোক রাত্রির আগমন প্রতীক্ষা করেন। যে ব্যক্তি সময়ে অসময়ে নিদ্রা যায়, লোকের সহিত কথা বার্ত্তা বলিয়া অনর্থক সময় কাটায়, নির্জ্জনবাস অপেক্ষা জনতা ভালবাসে; আল্লার প্রতি তাহার ভালবাসা থাকিলেও বুঝিবে, সে ভালবাসা নিতান্ত কাঁচা। (১) মহাত্মা হজরৎ দাউদ নবীর উপর প্রত্যাদেশ হইয়াছিল—"হে দাউদ, মানুষের সহিত আসক্তি বাধাইও না। দুই প্রকার লোক আমার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হয়—১) যে ব্যক্তি সৎকার্য্যের পুরস্কার শীঘ্র পাইতে চায়, এবং পাইতে বিলম্ব হইলে প্রার্থনায় শিথিল হয়। (২) যে ব্যক্তি আমাকে ভুলিয়া নিজের খেয়ালে ডুবিয়া থাকে। এরূপ লোক যে আমার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত তাহার চিহ্ন এই যে, তদ্রূপ লোককে আমি তাহার অভ্যাসের উপর ছাড়িয়া দিয়াছি এবং সংসারে তাহাকে হয়রান রাখিয়াছি।" যাহা হউক, আল্লার প্রেম, পূর্ণ উন্নত ও পরিপক্ক হইলে অন্য পদার্থের ভালবাসা একবারে লোপ পায়। (২) বনী এছরায়েল সম্প্রদায়ের মধ্যে এক জন সাধু আবেদ ছিলেন। তিনি রাত্রি জাগরণ করিয়া আল্লার এবাদৎ করিতেন। কিছু দূরে এক বৃক্ষোপরি কতকগুলি পক্ষী রাত্রি যোগে সুমিষ্ট গান করিত। সাধুর কর্ণে পক্ষীর সেই কলরব বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল; তজ্জন্য তিনি সেই বৃক্ষতলে গিয়া আল্লার এবাদতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। তৎকালে সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পয়গম্বর ছিলেন তাঁহার উপর এই প্রত্যাদেশ হইয়াছিল যে—'তুমি ঐ সাধুকে বলিয়া দাও, পক্ষীর মিষ্ট স্বর সে ভালবাসিয়াছে বলিয়া তাহার মর্য্যাদা এক ধাপ নামাইয়া দিলাম। অন্য কোন সৎকার্য্যে সেই অবনতির ক্ষতি পূরণ হইবে না।' (৩) কোন সাধু আল্লার প্রেমে এরূপ আবদ্ধ ছিলেন যে তিনি স্বীয় গৃহ মধ্যে নিভৃতে আল্লার সমীপে আত্ম-নিবেদনে তন্ময় ছিলেন এমন সময়ে গৃহের অপর কোণে অগ্নি লাগিয়াছিল তথাপি তিনি টের পান নাই। (৪) কোন সাধুর এক পদে কোন রোগ ছিল। তিনি নমাজে প্রবৃত্ত হইলে চিকিৎসক আসিয়া তাঁহার পা খানি কাটিয়া দেন অথচ সে সাধু টের পান নাই। (৫) মহাত্মা হজরৎ দাউদ নবীকে আল্লা প্রত্যাদেশ দিয়াছিলেন—"হে দাউদ, যে ব্যক্তি আমার ভালবাসার দাবী করে অথচ সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় কর্ত্তন করে সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। বন্ধু কি বন্ধুর দর্শন চায় না? আমাকে যে অনুসন্ধান করে আমি তাহার সঙ্গে

থাকি।" (৬) মহাত্মা হজরৎ মুছা নবী নিবেদন করিয়াছিলেন—"হে আল্লা! তুমি কোথায় আছ. আমি তোমাকে অনুসন্ধান করিতে চাই।" উত্তর আসিয়াছিল—"হে মুছা! তুমি যখন আমাকে অনুসন্ধানের ইচ্ছা করিয়াছ তখনই আমাকে পাইয়া ফেলিয়াছ।" **ষষ্ঠ চিহ্ন**—আল্লার প্রেমিক লোকের নিকট এবাদৎ কার্য্য সুখ-সাধ্য বোধ হয়—ভারী বোধ হয় না। কোন সাধু বলিয়াছেন—'আমি প্রথম ত্রিশ বৎসর তহজ্জোদের নমাজ পড়িয়াছি কিন্তু সে সময়ে নিদ্রা হইতে উঠিতে ও নমাজে দাঁড়াইতে আমাকে মৃত্যু-যন্ত্রণা-তুল্য কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাহার পর ত্রিশ বৎসর রাত্রির নমাজ পড়িতে কষ্টের বদলে নির্ম্মল আনন্দ যথেষ্ট পাইয়াছি।" আল্লার প্রতি প্রেম পরিপক্ক হইলে এবাদৎ করিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, তত আনন্দ আর কিছুতে পাওয়া যায় না। সেরূপ অবস্থায় এবাদৎ কষ্টকর হইবার কোন হেতু থাকেনা। **সপ্তম চিহ্ন**—আল্লার আজ্ঞাবহ সমস্ত বান্দার প্রতি আল্লার প্রেমিক জনের ভালবাসা ও দয়া জন্মে, কিন্তু কাফের ও পাপীর সহিত বিরোধ ঘটে। এই অর্থে আল্লা বলিয়াছেন—

اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

"(মুছলমান লোক) কাফেরগণের উপর অত্যন্ত কঠিন (কিন্তু) তাহারা পরস্পরের মধ্যে নিতান্ত দয়ালু।" (২৬ পারা—সূরা ফতেহ্। ৪ রোকু।) আল্লাকে কোন পয়গম্বর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হে আল্লা, কোন ব্যক্তি তোমার প্রেমিক?" উত্তর আসিয়াছিল—"দুগ্ধ পোষ্য শিশু যেমন আপন মাতার জন্য পাগল, সেইরূপ যাহারা আমার জন্য পাগল হইতে পারে এবং পক্ষী যেমন স্বীয় বাসায় আশ্রয় লইয়া নিরাপদ বিবেচনা করে সেইরূপ যে ব্যক্তি আমার স্মরণকে আশ্রয়স্থান মনে করে এবং ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র যেমন কাহাকেও ভয় করে না তদ্রূপ যে ব্যক্তি পাপ কার্য্য দেখিলে ক্রুদ্ধ হয় ও কাহাকে ভয় করে না সেই প্রকার লোক আমার প্রেমিক।"

এই সাতটী এবং এই প্রকার অনেকগুলি চিহ্ন পরিপক্ক প্রেমিক লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ চিহ্ন ভিন্ন অন্য চিহ্ন দেখা গেলে বুঝিবে সে প্রেম পরিপক্ক হইতে পারে নাই।

আল্লাকে পাইবার অনুরাগ। পাঠক! জানিয়া রাখ—আল্লার উপর মানুষের ভালবাসা হইতে পারে না বলিয়া যাহারা তর্ক করে তাহারা

আল্লার সহিত মিলিবার এবং তাঁহাকে পাইবার অনুরাগও অবিশ্বাস করে। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) এর প্রার্থনা-বচনের মধ্যে শওক বা অনুরাগ কথার উল্লেখ আছে।

اَسْئَلُكَ الشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ وَ لَذَّةَ النَّظْرِ اِلٰى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ

"(হে আল্লা) তোমার স্থানে তোমার সাক্ষাতের অনুরাগ চাহিতেছি এবং তোমার উদার ও বদান্য মুখশ্রী দর্শনের সুখাস্বাদ পাইবার অভিলাষ রাখি।" মহাপ্রভু আল্লা হজরতের মুখে বলাইয়া লইয়াছেন—"আমাকে (আল্লাকে) দেখিতে সাধু লোকের যেমন প্রবল অনুরাগ আছে, তাহাদিগকে দেখিতে আমার (আল্লার) তদপেক্ষা অধিক অনুরাগ আছে।" পাঠক! এখন তোমাকে شَوْق শওক বা 'অনুরাগ' শব্দের অর্থ জানা আবশ্যক। লোকে যে বস্তুকে একেবারে জানে না তাহার প্রতি মানুষের মনের টান থাকা অসম্ভব কথা। আবার যে বস্তু সুন্দর বলিয়া জানা গিয়াছে তাহা সম্মুখে থাকিলে এবং নয়ন ভরিয়া দেখিলেও তৎপ্রতি অনুরাগ থাকে না। যাহাকে সুন্দর বলিয়া জানা গিয়াছে বলিয়া এক হিসাবে মানস-চক্ষের সম্মুখে আছে এবং চাক্ষুষ ভাবে দেখা যাইতেছে না বলিয়া বর্ত্তমান নাই, তাহাকে নয়নে দেখিবার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা জন্মে তাহাকে **অনুরাগ** বলে। দেখ, প্রিয় ব্যক্তি খেয়ালের চক্ষে বর্ত্তমান থাকে। সে যখন বাস্তবিক অনুপস্থিত থাকে তখন তাহাকে দেখিতে মনে চায়; অর্থাৎ তাহাকে স্বচক্ষে দেখিবার ইচ্ছা জন্মে। সেই ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে 'শওক' বা অনুরাগ বলে।

অনুরাগ কাহাকে বলে ?

যাহা হউক, এই কথায় তোমরা বুঝিতে পারিবে—মানব. আল্লার পরিচয় পাইলে তাঁহাকে খেয়ালের চক্ষে এক প্রকার দেখিতে পায় কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃত চক্ষে সন্দর্শন করিতে পায় না। এমন অবস্থায় আল্লাকে দর্শনের ইচ্ছা মানবের মনে অবশ্যই জন্মে অর্থাৎ আল্লাকে দেখিবার অনুরাগ উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেই অনুরাগের ফলে এই পৃথিবীতে, আল্লাকে. এ জীবনে দর্শনের সম্ভাবনা নাই। 'খেয়াল' যেমন পরিশেষে

আল্লার প্রতি যে ধরণের অনুরাগ ইহকালে লব্ধ ও পরকালে পরিতৃপ্ত

'দর্শন-জ্ঞানে' পরিণত হয় তদ্রূপ ইহকাল-লব্ধ 'মা'রেফৎ-জ্ঞান' পরিণামে পরকালে আল্লার সন্দর্শনে পরিণত হয়। এই কারণে 'মা'রেফৎ-জ্ঞান'-জাত অনুরাগ এই পৃথিবীতে কখনই চরিতার্থ হইতে পারে না। তবে মৃত্যুর পর আল্লাকে স্বচক্ষে সন্দর্শন করিলে (পৃথিবীর) সেই অনুরাগ পরিতৃপ্ত হইতে পারে। সুতরাং বুঝা গেল ইহকালে-লব্ধ-অনুরাগ পরকালে গিয়া পরিতৃপ্ত ও ঠাণ্ডা হইতে পারে। কিন্তু অন্য এক প্রকার অনুরাগ পরকালেও অপূর্ণ থাকে—সে অনুরাগ কি প্রকার তৎসম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা আবশ্যক।

আল্লার পরিচয়-জ্ঞান ইহকালে দুই কারণে অপূর্ণ--পাঠক! ইতিপূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছ সর্ব্ববিধ আনন্দ অপেক্ষা আল্লার পরিচয়-জাত আনন্দ অধিক মিষ্ট। সেই পরিচয়-জ্ঞান এবং আল্লাকে দর্শনের ইচ্ছা বা অনুরাগ ইহজগৎ হইতে উপার্জ্জন করিয়া পরকালে লইয়া যাইতে হয়। মৃত্যুর পর পরিচয়-জ্ঞান উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। কিন্তু ইহকালে 'মা'রেফৎ' অর্থাৎ আল্লার পরিচয়-জ্ঞান দুই কারণে অপূর্ণ থাকে। **প্রথম কারণ**—ইহসংসারে নানাবিধ বাধা বিঘ্ন ও আবিল্যের মধ্য দিয়া সেই জ্ঞান লব্ধ হয় সুতরাং সুন্দর সুস্পষ্ট প্রস্ফুটিত হয় না। তজ্জন্য সূক্ষ্ম পর্দার ভিতর হইতে বাহিরে দর্শনের সহিত সে জ্ঞানকে তুলনা করা গিয়া থাকে। অথবা সূর্যোদয়ের পূর্ব্বে উষার অন্ধকারে প্রিয়জনের দর্শনের ন্যায় অস্পষ্ট বলা গিয়া থাকে। যাহা হউক, সংসারের নানা সম্পর্ক ও আবিল্যে জড়িত থাকার সময়ে পরিচয়-জ্ঞান অস্পষ্ট থাকিলেও তজ্জনিত অনুরাগ অবশ্য পরকালে গিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া ঠাণ্ডা হয়। **দ্বিতীয় কারণ**—প্রিয়জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এক নজরে তাহার সর্ব্বাঙ্গ যুগপৎ দেখিতে পাওয়া যায় না; মুখমণ্ডলের দিকে মনোযোগ দিলে কেশপাশ অলক্ষিত থাকে, আবার কেশপাশ দেখিতে লাগিলে হস্তপদাদি দৃষ্টির বাহিরে পড়ে। প্রিয়জনের আপাদ মস্তক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। যে অঙ্গ দেখিবে তাহা হইতেই অপার আনন্দ পাইবে বটে কিন্তু এক অংশ দর্শনের আনন্দ হইতে অপর অংশ দর্শনের আনন্দ অবশ্যই বিভিন্ন প্রকারের হইবে। যে অংশ দেখিবার খেয়াল করিবে তদ্দর্শনে আকাঙ্ক্ষা বা অনুরাগ নূতন ভাবে উৎপন্ন হইবে এবং তাহা দর্শন করিলে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ পাইতে পারিবে। বিশ্বপতি আল্লা অসীম ও অনন্ত। তাঁহার প্রত্যেক অংশের সৌন্দর্য্য অসীম মনোলোভা। যে দিকে মনোযোগ দিবে বা খেয়াল করিবে তাহাই দেখিবার ইচ্ছা বা কৌতুহল জন্মিবে এবং দেখিতে পাইলে সেই কৌতুহল চরিতার্থ

হইবে।" অভিলাষ চরিতার্থ হইলেই আনন্দ লাভ ঘটে। আল্লার সৃষ্ট জগতের সমস্ত ভাগ দর্শন করা অসম্ভব কথা। সুদক্ষ চক্ষুষ্মাণ আরেফ হইলেও সমস্ত ভাগ একবারে দেখিয়া উঠা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। যতই দেখুন না কেন বহু ভাগ অলক্ষিত থাকিবে। সুতরাং এক ভাগের দর্শনাশা পরিতৃপ্ত হইতে না হইতেই অন্য ভাগের দর্শনেচ্ছা মনের মধ্যে উদয় হইতে থাকিবে। এই প্রকার ক্রমোন্নত দর্শনেচ্ছাকে 'অন্য প্রকারের' **অনুরাগ** বলে। সন্দর্শনে এই 'অনুরাগ' পরিতৃপ্ত হয় এই 'পরিতৃপ্তি'কে "ওন্‌ছ" কহে।

ইহকালে বা পরকাল 'অনুরাগ' ও 'তৃপ্তির' সীমা নাই। পরলোকগত আরেফ লোক সর্ব্বদাই বলিবে— رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا "হে আমাদের প্রভু! আমাদের জন্য আমাদের নূর (আলোক) পূর্ণ কর।" (২৮ পারা। সূরা তহরীম। ২ রোকু।)

আল্লার প্রতি যে ধরণের অনুরাগ ইহকালেও পরকালেও অতৃপ্ত

এখানে নূর (আলোক) বলিবার উদ্দেশ্য এইযে আল্লার সৌন্দর্য্যের যাহা কিছু মানব-নয়নে প্রকাশ পায় তাহা সমস্তই আলোক, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই দেখা যায় না। পরলোকগত আরেফ লোক আল্লার সমস্ত নূর দর্শনের অভিলাষী থাকেন কিন্তু সমস্ত দেখিয়া শেষ করিতে পারেন না। এই জন্য বলা হয়—আল্লা ভিন্ন অন্য কেহ আল্লার পূর্ণ পরিচয় পাইতে পারে না। আল্লার দর্শনাকাঙ্ক্ষা আরেফের মনে চিরকাল থাকিয়া যায়। এ কথার অর্থ এই, তাঁহার মনে আল্লার যে অংশ দেখিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে তাহা দর্শন মাত্র সে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় কিন্তু তৎপরক্ষণেই আবার অন্য অংশ দেখিতে মনে আকাঙ্ক্ষা জন্মে এবং তাহাও দর্শন করিতে পাইলে সে আকাঙ্ক্ষাও পরিতৃপ্ত হয়। এই প্রকার পরকালে আল্লার সর্ব্বাঙ্গ দর্শন করিবার অদম্য আশা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিবে।

আল্লার প্রতি প্রেমের সংক্ষিপ্ত ক্রমবিকাশ-বিবরণ—উপরে যাহা লিখা গেল তাহার মর্ম্ম এই—ইহকালে আল্লার শিল্প ও শিল্প-কৌশল দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যে পরিচয় (মারেফৎ) লব্ধ হয় তাহাই খেয়ালের চক্ষে বর্ত্তমান থাকিয়া তদীয় দর্শনের 'অনুরাগ' জন্মাইয়া দেয়। সেই অনুরাগ ইহ-সংসার হইতে সঙ্গে যায় এবং পরকালে আল্লার 'দীদার' প্রাপ্তে পরিতৃপ্ত হয়। সুতরাং ইহকালের মারেফৎ-জনিত 'অনুরাগ' পরকালে 'দীদার' প্রাপ্তে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। কিন্তু পরকালে 'দীদার-শক্তি' অসাধারণ তীক্ষ্ন হয়। তখন দর্শনের

ক্ষমতা দিক্, কাল, দূরত্ব অতিক্রম করিয়া অতীব বলবান হয়। তখন আল্লার অনন্ত রূপ রাশির সমস্ত ভাগ দেখিবার অনুরাগ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে ঠাণ্ডা হইতে পায় না। এক অংশ দেখিয়া আনন্দ পাইবার পরক্ষণেই অপর অংশ দর্শনে অনুরাগ বা আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া উঠে। সে অংশ সন্দর্শনে 'পরিতৃপ্তি' পাইলে আবার পরক্ষণেই অন্যভাগ দর্শনের উৎকট 'আকাঙ্ক্ষা' জন্মিয়া উঠে। এইরূপ 'শওক' বা অনুরাগের পর 'ওন্‌ছ' বা পরিতৃপ্তি এবং পরিতৃপ্তির পর আবার আকাঙ্ক্ষা পালা ক্রমে উদয় ও নিরস্ত হইতে থাকে। এই জন্য পরকালে "অনুরাগ-বিশিষ্ট" লোকের পক্ষে নব নব সৌন্দর্য্য দর্শনের পথ খুলিতে থাকিবে এবং তাঁহাদের ভাগ্যে 'দীদার' বাড়িয়া চলিবে এবং আনন্দও উত্তরোত্তর অধিক মাত্রায় ভোগে আসিবে।

কেন বেহেশ্‌তের আনন্দ অসীম? 'বেহেশ্‌তের মধ্যে আনন্দের সীমা নাই' সে কথার অর্থই উপরে বলা গেল। যদি তদরূপ না হইত তবে এক ধরণের আনন্দ পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতে করিতে সুস্বাদের মাত্রা খর্ব্ব হইয়া পড়িত। ইহ সংসারেও দেখা যায়—সুখের বস্তু পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতে পাইলে তাহা মনের নিকট পরিচিত ও পুরাতন হয়; ক্রমে আনন্দের মাত্রা হ্রাস হইতে থাকে; পরিশেষে তাহা আর আনন্দ দিতে পারে না। নিত্য তাজা সৌন্দর্য্য দর্শনে আসিলে অবশ্যই নব নব আনন্দ পাওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, বেহেশ্‌ৎ-বাসীদের সম্মুখে আল্লার অনন্ত রূপ-রাশির মধ্য হইতে নিত্য নূতন নূতন সৌন্দর্য্য উপভোগে আসিবে এবং নূতন নূতন তাজা তাজা আনন্দ প্রদান করিতে থাকিবে বরং এক সময়ে যে আনন্দ ভোগ করিতে পাওয়া যাইবে তাহার পরক্ষণেই তদপেক্ষা মহৎ আনন্দ ভোগ করিতে পাইবে অর্থাৎ সর্ব্বদাই পরবর্ত্তী আনন্দ, পূর্ব্বভোগ্য আনন্দ অপেক্ষা অনুক্ষণ উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর হইয়া চলিবে।

'অনুরাগ' ও 'পরিতৃপ্তি'র ব্যাখ্যা—এ পর্য্যন্ত যাহা বলা গেল তাহাতে বোধহয় তোমরা 'শওক' বা অনুরাগ এবং 'ওন্‌ছ' বা তৃপ্তি এই দুই অবস্থার পার্থক্য বুঝিতে পারিয়াছ। তথাপি পুনরুক্তির ন্যায় আবার বলা যাইতেছে—আনন্দদায়ক পদার্থের মধ্যে যাহা বর্ত্তমান সময়ে সম্মুখে উপস্থিত পাওয়া গিয়াছে তাহা দর্শনে বা ভোগে মনের প্রসন্নতাময় পরিতৃপ্ত ভাবের নাম "ওন্‌ছ।" পরিতৃপ্তি জন্মিলে আর সে দৃষ্ট-ভুক্ত পদার্থের দিকে মনের কিছুমাত্র টান থাকে না। অর্থাৎ মন ঠাণ্ডা হইয়া যায়। কিন্তু আনন্দদায়ক পদার্থের

মধ্যে যাহা এখনও সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই—হইতে বাকী আছে—তাহার দিকে মনের টান প্রবল থাকে। (মনের এই টানকেই 'অনুরাগ' বলে।)

প্রেম, অনুরাগ ও পরিতৃপ্তি বিষয়ক হদীছ বচন—যাহা হউক, আল্লার প্রতি 'ভালবাসা' পৃথিবীতেই হউক বা পরকালেই হউক, 'ওন্‌ছ' ও 'শওক' এই দুই অমূল্য পদার্থ হইতেই বর্দ্ধিত হয়। (১) হদীছ শরীফে উল্লেখ আছে—মহাপ্রভু আল্লা মহাত্মা হজরৎ দাউদ নবীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—'হে দাউদ! পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে আমার পক্ষ হইতে এই সুসংবাদ ঘোষণা কর—যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে, আমি তাহাকে ভালবাসি। যে ব্যক্তি নির্জ্জনে আমার সঙ্গে উপবেশন করে, আমি তাহার সঙ্গী। যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, আমিও তাহাকে স্মরণ করিয়া পরিতৃপ্ত হই। যে আমার সঙ্গী, আমি তাহার সাথী। আমাকে যে ব্যক্তি অপরের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করিয়া লয়, আমি তাহাকে অপরের মধ্য হইতে বাছিয়া লইয়া শ্রেষ্ঠত্ব দান করি। যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করে, আমি তাহার আদেশ পালন করি। যে ব্যক্তি আমাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসে, আমি তাহাকে নিশ্চয় অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করি। যে আমাকে অনুসন্ধান করে, নিশ্চয় সে আমাকে প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি আমা ভিন্ন অপরকে অনুসন্ধান করে, সে আমাকে পায় না। হে পৃথিবীর অধিবাসীগণ! যে কার্য্য লইয়া তোমরা মুগ্ধ হইয়াছ তাহা অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়া দেখ। আমার সঙ্গ পাইতে, আমার সঙ্গে নির্জ্জনে বসিতে এবং আমাকে পাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে মনোযোগ দাও—আমার সঙ্গ পাইয়া পরিতৃপ্তি পাইবার অভ্যাস কর—আমিও তোমাকে লইয়া পরিতৃপ্ত হইব। আমার প্রিয়-বন্ধু এব্রাহীম, ও আমার অভিপ্রায়ের মর্ম্মজ্ঞ মুছা, ও আমার নির্ব্বাচিত মোহম্মদ এই তিন জনের প্রকৃতি ও স্বভাব দিয়া আমার প্রিয়তম লোকদিগের প্রকৃতি ও স্বভাব গঠন করিয়াছি। এবং আমার প্রতি অনুরাগী লোকের হৃদয় আমার নূর (আলোক) দিয়া গঠন করিয়াছি এবং স্বীয় প্রতাপ প্রয়োগে তাহা বর্দ্ধন করিয়া থাকি।" (২) অন্য এক পয়গম্বরের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল—"আমার দাসগণের মধ্যে যে আমাকে ভালবাসে, আমি তাহাকে ভালবাসি, যে আমার আশাধারী, আমি তাহার আশা করি; যে আমাকে স্মরণ করে, আমি তাহাকে স্মরণ করি; যাহার দৃষ্টি আমার উপর থাকে; আমার দৃষ্টিও তাহার উপর থাকে। হে পয়গম্বর! তুমি যদি আমার

তদ্রূপ যাদের পন্থা অবলম্বন কর তবে তোমাকেও আমি ভাল বাসিব ; কিন্তু তুমি যদি তাহাদের পন্থা ত্যাগ কর তবে তোমাকে শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিব।” এই সকল হদীছ এবং এবম্বিধ বহু হদীছ, প্রেম, অনুরাগ ও পরিতৃপ্তির উপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে। যাহা লিখা গেল তাহাই যথেষ্ট মনে করি।

রেজা বা সন্তোষের মাহাত্ম্য—পাঠক! জানিয়া রাখ—আল্লার বিধানে সন্তুষ্ট থাকা হৃদয়ের এক অতি উচ্চ অবস্থা। ইহা অপেক্ষা উচ্চ অবস্থা আর নাই। কেননা এ অবস্থা প্রেমের একটী অমূল্য ফল। আল্লা যাহা করেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারা, আল্লার প্রতি প্রেম হইতেই উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু যেমন তেমন প্রেম এই উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করিতে পারে না। প্রেম যখন বিশেষ বলবান ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখন رضا ‘রেজা’ (প্রসন্নতা বা সন্তোষ) নামক ফল প্রসব করিতে পারে।

আল্লার প্রতি পূর্ণ প্রেমের অমূল্য ফল—সন্তোষ

(১) এই কারণে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ বলিয়াছেন—“আল্লার কার্য্যে সন্তুষ্ট থাকা আল্লার গৃহের এক বড় দ্বার।” (২) একদা মহাপুরুষ হজরৎ রসুল ﷺ কোন সম্প্রদায়ের লোককে তাহাদের ঈমানের চিহ্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিয়াছিল—“হে রসুল! আমরা বিপদে ছবর করি, সম্পদে শোকর করি, এবং আল্লার কার্য্যে সন্তুষ্ট থাকি।” ইহা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—“এই সম্প্রদায়ের লোক পরিপক্ক হকীম (বৈজ্ঞানিক) এবং আলেম (জ্ঞানী)। পূর্ণ জ্ঞানের প্রভাবে ইহাদের অবস্থা নবীগণের তুল্য।” (৩) তিনি অন্য এক সময়ে বলিয়াছেন—‘মহাবিচারের দিন আমার ওম্মত মণ্ডলীর মধ্যে কতকগুলি লোককে আল্লা পক্ষীর ন্যায় ডানা প্রদান করিবেন। তাঁহারা সেই পক্ষের সাহায্যে উড়িয়া বেহেশ্‌তে চলিয়া যাইবেন। বেহেশ্‌তের ফেরেশ্‌তা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন—‘তোমাদের পাপ পুণ্যের হিসাব হইয়াছে কি না? দাঁড়ী-পাল্লাতে তোমাদের পাপ পুণ্যের ওজন হইয়াছে কি না? এবং পোলছেরাতের উপর দিয়া পার হইয়াছ কিনা?’ তাহার উত্তরে ঐ সকল লোক বলিবেন—‘ঐ সমস্ত কি পদার্থ তাহা আমরা জানি না।’ তখন ফেরেশ্‌তাগণ জিজ্ঞাসা করিবেন—‘তোমরা কে?’ তাঁহারা বলিবেন—‘আমরা মহাপুরুষ হজরৎ মোহম্মদের ওম্মৎ।’ ফেরেশ্‌তাগণ জিজ্ঞাসা করিবেন—‘তোমরা কোন্ প্রকার সৎকার্য্য করিয়াছ যে এরূপ সৌভাগ্য পাইয়াছ?’ তাঁহারা বলিবেন—‘আমরা এমন কোন

—হদীছ বচন

সৎকার্য্য করি নাই ; তবে আমাদের মধ্যে দুই প্রকার অভ্যাস ছিল—(১) নির্জ্জন স্থানেও পাপ কার্য্য উপস্থিত হইলে আল্লার জন্য শরম করিয়া তাহা হইতে ক্ষান্ত থাকিতাম। (২) আমাদের জন্য আল্লা সামান্য জীবিকা দিলেও আমরা সন্তুষ্ট থাকিতাম। ফেরেশ্‌তাগণ এতচ্ছ্রবণে বলিবেন, 'এ সৌভাগ্য তোমাদের জন্যই উপযুক্ত হইয়াছে।' * * * (৪) মহাপুরুষ হজরৎ রসুলে [illegible] বলিয়াছেন—"মহাপ্রভু এই কথা ঘোষণা করিতেছেন—'আমি এমন ক্ষমতাশালী আল্লা যে আমা ব্যতীত আর কেহ নাই। যে ব্যক্তি আমার প্রদত্ত বিপদে 'ছবর' এবং সম্পদে 'শোকর' না করে এবং আমার কার্য্যে সন্তুষ্ট না হয় তাহাকে বলিয়া দাও সে আমার রাজ্য ছাড়িয়া গিয়া অন্য আল্লাকে অনুসন্ধান করুক।'" (৫) তাঁহার পবিত্র মুখে শুনা গিয়াছে—"আল্লা বলিতেছেন—'আমি 'তক্‌দীর' অর্থাৎ অদৃষ্ট নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি এবং 'তদ্‌বীর' অর্থাৎ উপায়ও স্থির করিয়া দিয়াছি এবং আমার সৃষ্ট পদার্থের পরিমাণ অটল করিয়া দিয়াছি এবং যাহা কিছু হইবে সমস্ত বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। যে ব্যক্তি আমার বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তাহার প্রতি আমি সন্তুষ্ট থাকি। এবং যে অসন্তুষ্ট হয় আমিও তাহার উপর ক্রুদ্ধ হই। আমার সে ক্রোধ অবশ্যই দেখিতে পাইবে।'" আল্লা আরও বলিতেছেন—"আমি মঙ্গল ও অমঙ্গল—ভাল ও মন্দ সৃষ্টি করিয়াছি। যাহাকে মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি এবং মঙ্গল যাহার হস্তে সহজে আসিবার উপায় করিয়াছি সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী। আর যাহাকে মন্দের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি এবং মঙ্গল যাহার হস্তে সহজে আসিবার উপায় করিয়াছি সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী। আর যাহাকে মন্দের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি এবং মন্দ যাহার হস্তে সহজে আসিবার উপায় করিয়া দিয়াছি সেই ব্যক্তি দুর্ভাগ্যগ্রস্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি, 'কেন ?' ও 'কি জন্য ?' বলিয়া তর্ক করে, তাহার জন্য শোক করিতে হয়।"

—মহাজন উক্তি

(১) কতকগুলি লোক মহাত্মা হজরৎ মুছা নবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনি আল্লাকে জিজ্ঞাসা করুন তিনি কিসে আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকিবেন ? আল্লা যাহাতে সন্তুষ্ট হন সেই কার্য্য আমাদিগকে করিতে হইবে।" প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল—"তোমরা আমার কার্য্যে সন্তুষ্ট থাক তাহা হইলে আমিও তোমাদের কার্য্যে সন্তুষ্ট থাকিব।" (২) মহাত্মা হজরৎ দাউদ নবীর প্রতি আল্লা সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন—'আমার বন্ধুগণকে বলিয়া দাও তাহারা যেন সাংসারিক দুশ্চিন্তা না করে। দুশ্চিন্তা,

মানব-হৃদয় নিরানন্দ করে—'মোনাজাৎ' বা নিভৃত-প্রার্থনায় মাধুর্য্য নষ্ট করে। 'হে দাউদ! আমার বন্ধুগণ যেন সর্ব্বদা 'রুহানী' হইয়া থাকে অর্থাৎ পারলৌকিক ব্যাপারে তৎপর থাকে, সংসারের কোন চিন্তা না করে এবং সংসারে যেন মন না দেয়।" (টীঃ ৪৬২) (৩) এক পয়গম্বর ছাহেব বিশ বৎসর যাবৎ দরিদ্রতার পীড়নে ক্ষুধিত, বিবস্ত্র এবং নানা দুঃখে জড়িত ছিলেন, অথচ তাঁহার প্রার্থনা আল্লার দরবারে গ্রাহ্য হইতেছিল না। পরিশেষে প্রত্যাদেশ হইয়াছিল—'হে পয়গম্বর! ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃষ্টি করিবার অগ্রে, তোমার অদৃষ্টে এইরূপ বিধান করিয়া রাখিয়াছি। তুমি কি এই ইচ্ছা কর যে তোমার জন্য আমি আকাশ পাতালের প্রকৃতি, বিশ্ব-রাজ্যের সম্বন্ধ নূতন ভাবে গঠন করি এবং যে আদেশ, সকলের জন্য দিয়াছি তাহা কি তোমার জন্য বদল করিব? তুমি যাহা ইচ্ছা কর তাহা হইবে কিন্তু আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহা হইবে না ইহাই কি তুমি আশা কর? আমি নিজ গৌরবের শপথ করিয়া বলিতেছি—তোমার অন্তরে যদি পুনরায় ঐরূপ চিন্তার উদয় হয় তবে তোমার নাম পয়গম্বরগণের তালিকা হইতে কাটিয়া দিব।' (৪) মহাত্মা আনেছ বলিয়াছেন—"আমি পূর্ণ বিশ বৎসর যাবৎ মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ছাঃ) এর সেবায় নিযুক্ত ছিলাম। সেই দীর্ঘ সময়ে আমি যাহা করিয়াছিলাম তজ্জন্য তিনি আমাকে কোন দিন এ কথা বলেন নাই যে—'তুমি ইহা কেন করিলে?' আর যাহা কিছু আমি করি নাই তজ্জন্যও তিনি বলেন নাই যে—'তুমি ইহা কর নাই কেন?' বরং অন্য কেহ যদি ঐ বিষয় লইয়া আমার সঙ্গে তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইত তবে বলিতেন—"আল্লার বিধানে যদি উহা অন্যরূপ বিধিবদ্ধ হইত তবে অবশ্যই তদ্রূপ হইত।" (৫) মহাত্মা হজরৎ দাউদ নবীর প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল—"হে দাউদ! তুমি কার্য্যের সমাপ্তি যে প্রকার ইচ্ছা কর, আমি কিন্তু অন্য প্রকার চাই। আমি যাহা ইচ্ছা করি তদনুসারেই কাজ হইবে তবে তুমিও যদি আমার ইচ্ছার উপর সন্তুষ্ট হইতে পার তবে তুমি যাহা চাহিতেছ তাহাও আমি দিব। কিন্তু যদি অসন্তুষ্ট হও তবে তোমার আকাঙ্ক্ষাই তোমাকে দুঃখিত করিবে ও কষ্ট দিবে। কাজতো আমারই ইচ্ছাতেই হইবে।' (৬) খলীফা ওমর এবনে আবদুল আজীজ বলিয়াছিলেন—"আল্লার বিধানে

টীকা—৪৬২ এই প্যারার প্রথম হইতে টীকা চিহ্ন পর্য্যন্ত অংশটী মূল গ্রন্থে পূর্ব্ববর্ত্তী প্যারার অন্তর্গত তারকা চিহ্ন স্থানে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা হইল।

যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা যেরূপ হউক না কেন তাহাতেই সন্তুষ্ট আছি।" তাঁহাকে অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'আপনি কি পাইতে চান?' তিনি বলিয়াছিলেন—"আল্লার আদেশ যাহা হইয়াছে তাহাই চাই।" (৭) মহাত্মা এব্‌নে মছউদ বলিয়াছেন—"আল্লা যাহা করেন নাই তাহা হইলে বড় ভাল হইত'—এবং 'তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা না হইলে উত্তম হইত' এইরূপ বলা অপেক্ষা জলন্ত অগ্নি উদরস্থ করা আমি অধিক পছন্দ করি।" (৮) বনী এছরায়েল বংশে এক বড় সাধু আবেদ ছিলেন। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া প্রাণান্ত পরিশ্রম সহকারে এবাদৎ কার্য্য করিতেছিলেন। এক রজনীতে স্বপ্নে দেখিলেন যে কোন ব্যক্তি যেন তাঁহাকে বলিতেছেন—'অমুক রমণী বেহেশ্‌তে তোমার সঙ্গিনী হইবেন।' সাধু সেই রমণীর সৎকার্য্যের গুরুত্ব জানিবার জন্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। রমণীর সন্ধান পাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তিনি ফরজ কাজ ব্যতীত অতিরিক্ত কার্য্য করিতেন না; অধিক রাত্রি জাগিয়া নমাজ পড়িতেন না বা বহুদিন ব্যাপিয়া রোজাও করিতেন না। সাধু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'দয়া করিয়া আমাকে অবগত করুন, আপনি অন্য কোন্ প্রকার সৎকার্য্য করেন।' রমণী বলিলেন 'আপনি যাহা দেখিলেন তদ্‌-ব্যতীত আর আমার অন্য কোন এবাদৎ নাই।' আবেদ বহু অনুরোধ করিলে তিনি বহু চিন্তার পর বলিলেন—'অন্য কোন সৎকার্য্য নাই তবে আমার একটি সামান্য অভ্যাস আছে। আমি যখন বিপদ আপদ বা পীড়ায় জড়িত হই, তখন আরাম পাইতে আমার মনে চায় না। যদি রৌদ্রে পতিত হই, তবে ইহা ইচ্ছা করি না যে ছায়া প্রাপ্ত হই। আবার শীতের মধ্যে পড়িলে রৌদ্রের আশাও করি না। আল্লা আমার ভাগ্যে যে ব্যবস্থা করেন তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকি।' সাধু আবেদ স্বীয় মস্তকে করাঘাত করিয়া বলিলেন—'হায়! ইহা সামান্য অভ্যাস নহে।' বাস্তবিক ইহা অসীম বাহাদুরী। এবাদৎ কার্য্যেও এরূপ বাহাদুরী প্রকাশ পায় না।

বিপদ আপদের আল্লার কাজে সন্তুষ্টি অসম্ভব নহে।

সন্তোষের পরিচয়। পাঠক! জানিয়া রাখ, এক শ্রেণীর পণ্ডিত লোকেরা বলিয়াছেন—"বিপদ আপদের নিষ্পেষণে পড়িলে এবং অভিলাষের বিপরীত পদার্থ পাইলে সন্তুষ্ট থাকা অসম্ভব কথা, তবে নিতান্ত পক্ষে অসন্তুষ্ট না হইলেও বরং 'ছবর' করা যায়, তদপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইতে কখনই পারা যায় না। তাঁহাদের এবম্বিধ উক্তি ভ্রমপূর্ণ। সচরাচর দেখা যায় প্রেম প্রবল হইলে প্রিয়তমের

সঙ্গে মিলনের পথে দুঃখ কষ্ট বা বিপৎপাত ঘটিলে তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হওয়া সম্ভব হয়। সুখাভিলাষের বিপরীত কার্য্য দুই কারণে সহ্য হয়।

ঐহিক বা পারলৌকিক সৌভাগ্যের পথে অভিলাষের বিপরীত কার্য্য দ্বিবিধ কারণে সহ্য হয়।

প্রথম কারণ—প্রেমের আসক্তি প্রবল হইলে মানব যখন একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া প্রিয়জনের খেয়ালে ডুবিয়া যায় তখন শারীরিক কষ্ট ও বেদনা জানিতে পারে না। রণক্ষেত্রে বীরপুরুষ যখন যুদ্ধজয়ের আশায় বিপক্ষকে হত্যা করিতে ধাবিত হয় তখন, অস্ত্রের আঘাতে শরীর ক্ষত বিক্ষত হইলেও সে বেদনা জানিতে পারে না। লোভনীয় পদার্থ প্রাপ্তির আশায় দৌড়িবার সময়ে পায়ে কাঁটা বিঁধিলেও সে বেদনা বুঝিতে পারা যায় না। ভয় ক্রোধ লোভ ইত্যাদি আভ্যন্তরিক উত্তেজনায় বিচলিত হইয়া চলিবার সময়ে ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা ভুলিয়া যায়। এখন মনোযোগ করিয়া বুঝ—সাধারণ মানুষের প্রতি প্রেম এবং দুনিয়ার লোভে মানবকে যখন সুখাভিলাষের বিপরীত দিকে পরিচালিত করিতে পারে তখন আল্লার প্রেমে এবং পরকালের সৌভাগ্য লোভে কেন করিতে পারিবে না? আল্লার প্রেম মানবীয় প্রেম অপেক্ষা অধিক আনন্দদায়ক এবং আভ্যন্তরিক গুণ ও সৎস্বভাবের সৌন্দর্য্য অবশ্যই বাহ্য সৌন্দর্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। **দ্বিতীয় কারণ**—প্রিয়তমের প্রদত্ত দুঃখ বলিয়া উহা সন্তোষের সহিত সহ্য করা হয়। প্রিয়তম ব্যক্তি স্বহস্তে কটু ঔষধ সেবন করিতে দিলে প্রেমিক তাহা সন্তোষের সহিত সেবন করে। এইরূপ, প্রিয়-জন যদি প্রেমিকের শরীরের কিছু রক্ত বাহির করিতে চায় তবুও তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আনন্দের সহিত স্বীয় রক্তপাত করিতে সে প্রবৃত্ত হয়। যাহা হউক, যদি বুঝা যায় যে, আল্লার আদেশে সন্তুষ্ট হইলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন তবে তাঁহার প্রদত্ত দরিদ্রতা, রোগ শোক বিপদ আপদ গ্রহণ করিতে মনে কেন সন্তোষ আসিবে না? সাংসারিক ধন-লোভী ব্যক্তি বাণিজ্যার্থে দেশ পর্য্যটনের পরিশ্রম, প্রবাসের কষ্ট, সমুদ্র যাত্রার ভয় এবং ঐ প্রকার নানা দুঃখ যন্ত্রণা সন্তোষের সহিত সহ্য করে। পারলৌকিক সৌভাগ্য-লোভী লোক কেন তদ্রূপ কষ্ট হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিবে না?

সন্তোষের-উন্নত-অবস্থা-বিষয়ক দৃষ্টান্ত ও মহাজন উক্তি—

(১) আল্লার বহু প্রেমিক লোক মহাত্মা ফতেহ্ মুছলীর বিবী মহোদয়ার ন্যায় 'রেজা' বা সন্তোষের উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন। একদিন ঘটনা ক্রমে বিবী মহোদয়ার হস্তের নখভাগ বিপর্য্যস্ত হইয়া খসিয়া গিয়াছিল।

অথচ তিনি হাস্য করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। মহাত্মা ফতেহ্ মুছলী পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন, ইহাতে কি তোমার বেদনা বোধ হইতেছে না।" ধর্ম্ম-প্রাণা বিবী মহোদয়া বলিলেন—"পুণ্যের আনন্দভরে আমার মন এতদূর উৎফুল্ল হইয়াছে যে বেদনা ভুলিয়া গিয়াছি।" (২) মহাত্মা ছহল তছ্তরী মহোদয়ের শরীরে জখম হইয়াছিল। সে জখমে তিনি ঔষধ প্রয়োগ করিতেন না। লোকে তাঁহাকে ঔষধ প্রয়োগ না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন—"হে বন্ধুগণ! তোমরা কি জাননা—'বন্ধুর প্রদত্ত জখমে বেদনা নাই।'" (৩) মহাত্মা জোনায়দ বলিয়াছেন—"আমি একদিন মহাত্মা ছর্‌রী ছক্‌তী রহমতুল্লাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'আল্লার প্রেমে আসক্ত ব্যক্তি কি কখন তাঁহার প্রদত্ত বিপদে দুঃখিত হন?' তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—'না, কখনই তিনি দুঃখিত হন না।' আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'যদি তিনি খড়্‌গাঘাত করেন?' তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—"এক আঘাত কেন, সহস্রর আঘাত করিলেও প্রেমিক ব্যক্তি দুঃখিত হন না।" (৪) এক জন আল্লার প্রেমিক ব্যক্তি বলিয়াছেন--"আল্লা যাহা ভালবাসেন আমিও তাহা ভালবাসি। আল্লা আমাকে দোজখে নিক্ষেপ করিতে চাহিলেও আমি সন্তুষ্ট আছি। তিনি সন্তুষ্ট হইলে, দোজখও আমি ভালবাসিতে পারি।" (৫) মহাত্মা বশর হাফী বলিয়াছেন—"বগ্‌দাদ শহরে এক ব্যক্তিকে হাজার যষ্টি প্রহার করা হইয়াছিল, তথাপি তাহার মুখ দিয়া একটী দুঃখ প্রকাশ হয় নাই। আমি তাঁহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমার প্রিয়তম আমার সম্মুখে থাকিয়া আমাকে দেখিতে-ছিলেন এবং আমার প্রহার দেখিয়া আনন্দিত হইতেছিলেন।' আমি বলিয়া-ছিলাম—'তুমি যদি তাঁহাকে স্বচক্ষে সম্মুখে দেখিতে পাইতে তবে কি করিতে?' আমার এই ইঙ্গিত শ্রবণ মাত্র সে ব্যক্তি এক চীৎকার ছাড়িয়া পঞ্চত্ব পাইয়া-ছিলেন। (৬) এই মহাত্মা এ কথাও বলিয়াছেন—"আমি 'মুরীদ' এইবার প্রথম ভাগে আপাদান নগরে যাইতেছিলাম। পথে এক পাগলকে ভূপৃষ্ঠে অনাবৃত স্থানে পতিত দেখিয়াছিলাম। অসংখ্য পিপীলিকা তাঁহার গাত্রে লাগিয়া মাংস খুলিয়া খাইতেছিল; এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার জীবন সংশয় ভাবিয়া তাঁহার মস্তকটী ক্রোড়ে স্থাপন করতঃ শিয়রে উপবেশন করিলাম, কিছুক্ষণ পরে তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করতঃ বলিতে লাগিলেন—'এ কেমন অনধিকার চর্চ্চা! আমি ও আমার প্রভুর মধ্যে অন্যের প্রবেশ!

কেমন

কেমন ধৃষ্টতা !!' (৭) কোর্আন্ শরীফে উক্ত হইয়াছে, যে সকল রমণী মহাত্মা হজরৎ ইয়ুসোফ নবীকে দর্শন করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার রূপ লাবণ্যে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে স্ব স্ব হস্তাঙ্গুলী কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন—অথচ টের পান নাই। (৮) তৎকালে মিছর দেশে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ পড়িয়াছিল। সাধারণ লোক ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইলে মহাত্মা হজরৎ ইয়ুছোফ নবীকে দর্শন করিতে যাইত এবং তাঁহার রূপ মাধুরী দর্শনে মোহিত হইয়া ক্ষুধার জ্বালা ভুলিয়া যাইত। আল্লার একটী সৃষ্ট পদার্থের সৌন্দর্য্যের একরূপ প্রভাব! এখন ভাবিয়া দেখ, যাহার অদৃষ্টে সেই সর্ব্বস্রষ্টা আল্লার সমগ্র সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে সে ব্যক্তি বিপদ আপদের কষ্ট ভুলিয়া যাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? (৯) এক ব্যক্তি অরণ্য প্রদেশে বাস করিত। তাহার এক কুকুর ছিল। সে দিবা রজনী প্রভুর দ্রব্য সামগ্রী পাহারা দিত। একটী গর্দ্দভ ছিল, যে প্রভুর দ্রব্যজাত বহন করিত। একটী মোরগ ছিল, সে রজনী প্রভাতের সংবাদ শুনাইত। ইতি মধ্যে গর্দ্দভের শব্দ শুনিয়া এক শার্দ্দুল রজনীযোগে আসিয়া গর্দ্দভের উদর চিরিয়া রক্ত পান করিল। প্রভাতে গৃহ স্বামী তদ্দর্শনে আল্লাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল—ইহার মধ্যে মঙ্গল আছে। পরদিন তাহার কুকুর, মোরগটীকে হত্যা করিল, তাহাতেও গৃহস্বামী আল্লাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল—ইহার মধ্যেও মঙ্গল আছে। পরদিন কুকুরটী হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল—লোকে বলিতে লাগিল ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক সে মারা পড়িয়াছে। গৃহস্বামী তখনও ধন্যবাদ দিয়া বলিল—ইহার মধ্যেও মঙ্গল আছে। পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ তাহার ঐ প্রকার মন্তব্য শুনিয়া বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল—'এই কয়েকটী মূল্যবান বস্তু আমাদের হস্ত পদের কাজ করিত। প্রত্যেকটী নষ্ট হওয়াতে তুমি আল্লার ধন্যবাদ সহকারে বলিতেছ 'ইহার মধ্যে মঙ্গল আছে! কি ছাই মঙ্গল হইল!' গৃহস্বামী অটলভাবে বলিল—'আল্লার ইচ্ছায় ইহা হইতেও মঙ্গল হইতে পারে।' তাহার পরে ঐ অরণ্য প্রদেশে দস্যুদল নিপতিত হইল। লোকের কথা, কুকুরের শব্দ, গৃহপালিত পশু পক্ষীর আওয়াজ শুনিয়া দস্যুদল প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করতঃ অধিবাসীদিগকে হত্যা করিয়া ধন সম্পত্তি লুটিয়া লইয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত গৃহস্থের বাড়ী বৃক্ষের অন্তরালে ছিল—কোন শব্দ শুনিতে না পাইয়া দস্যুদল সে গৃহের সন্ধান পায় নাই সুতরাং পরিবারবর্গ ধন ও প্রাণে রক্ষা পাইল। তখন গৃহস্বামী পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইয়া বলিল—'কোন্ কার্য্যে

জগতের মঙ্গল হয় তাহা আল্লাই ভাল জানেন এবং তিনি প্রত্যেক কার্য্যে মানবের মঙ্গলই করেন।' (১০) মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী ভ্রমণ করিতে করিতে এক গলিত-কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত অন্ধ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শরীরের উভয় পার্শ্ব অবশ, হস্ত পদ অকর্ম্মণ্য, অথচ তিনি কায়মনোবাক্যে আল্লাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিতেছেন—"হে করুণাময়! তুমি অন্যান্য লোককে যে সকল বিপদ আপদে জড়িত করিয়াছ, তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ দেই যে আমাকে তাহা হইতে রক্ষা করিয়াছ।" নবী মহোদয় সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাকে দেখিতেছি আল্লা বহু বিপদে জড়িত করিয়াছেন—আর এমন কোন্ গুরুতর বিপদ আছে যাহা হইতে তোমাকে আল্লা রক্ষা করিয়াছেন?" সে ব্যক্তি বলিয়াছেন—'আল্লার সম্বন্ধে যে জ্ঞান তিনি দয়া করিয়া আমার মনে জন্মাইয়া দিয়াছেন, ততটুকু জ্ঞানও (টীঃ ৪৬৩) তিনি যাহার অন্তরে দেন নাই তাহা অপেক্ষা আমি নিরাপদে আছি।" ইহা শুনিয়া নবী মহোদয় নিতান্ত প্রীত হইয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন এবং বলিলেন—'তোমার কথা বাস্তবিক ধ্রুব সত্য।' অতঃপর হজরৎ তাঁহার গাত্রে হস্ত বুলাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি সর্ব্ববিধ পীড়া হইতে নীরোগ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং অবশিষ্ট জীবন তাঁহার সঙ্গে বাস করিয়া আল্লার এবাদৎ করিয়াছিলেন। (১১) মহাত্মা শিব্‌লীকে উন্মাদগ্রস্ত বিবেচনা করিয়া কতকগুলি লোক তাঁহাকে চিকিৎসালয়ে লইয়া গিয়াছিল। সে সময়ে তাঁহার কয়েকজন বন্ধুলোক তাঁহাকে দর্শন করিতে সেই চিকিৎসালয়ে উপস্থিত হন। মহাত্মা শিব্‌লী তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কে?" তাঁহারা বলিয়াছিলেন—"আমরা আপনার বন্ধু, আপনাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম।" ইহা শুনিয়া তিনি তাঁহাদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। আগন্তুক লোকেরা প্রস্তরাঘাতের ভয়ে পলায়ন করিলেন। তখন মহাত্মা শিবলী তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—

টীকা—৪৬৩। "ততটুকু জ্ঞান" বলিয়া যে জ্ঞানের আভাষ দেওয়া গেল তাহা আর কিছু নহে, কেবল 'আমার জন্য যাহা ভাল ও হিতকর, আল্লা তাহাই করেন' এই কথাটী সুন্দররূপে বুঝা। সেই বুঝটুকু উক্ত পীড়িত ব্যক্তির মনে গাঢ় রূপে ছিল। সেই বুঝটুকু যাহাদের মনে নাই তাহারা নিজের হিত নিজেই নির্ব্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হয়। 'এ কাজে ভাল হইবেনা' 'সেই কাজে ভাল হইবে' 'এটা হিতকর না' 'সেটা হিতকর' এইরূপ বাছিয়া বেড়ান, এক মহা হয়রানী। তাহার পর কোন্ সময়ে কি প্রণালীতে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে—'শুভক্ষণ অশুভক্ষণ' বাছা, নিজের বুদ্ধিতে কার্য্যের উপকরণ নির্ব্বাচন ও সংগ্রহ করা এবং বাধা বিঘ্ন দূর করিতে প্রবৃত্ত হওয়া এ সমস্তই মহা বিড়ম্বনা। নিজের বলে করিতে গেলে যে কষ্ট হয় তাহার তুল্য বিপদ আর নাই।

"তোমরা আমার বন্ধু বলিয়া মিথ্যা দাবী করিতেছ। তোমরা যদি আমার বন্ধু হইতে তবে আমার প্রদত্ত দুঃখ হৃষ্টচিত্তে সহ্য করিতে।"

কোন কোন ব্যবহারকে সন্তোষের লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করা ভুল। কোন কোন লোক নিম্নলিখিত ব্যবহারকে সন্তোষের লক্ষণ বলিয়া মনে করেন,—যথা নিজের ত্রুটী বা দুর্ব্বলতা আল্লার সমীপে নিভৃতে নিবেদন না করা; নিজের অভাব মোচনের সাহায্য আল্লার স্থানে না চাওয়া; যাহা আছে তাহাতে তুষ্ট থাকা; পাপ ও ব্যাভিচার দর্শনে, উহা আল্লার আদেশে ঘটিতেছে বিবেচনায় তাহাকে মন্দ বলিয়া না জানা; যে স্থানে পাপ-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, অথবা মড়ক লাগিয়াছে, তাহা আল্লার বিধানে ঘটিয়াছে, বিবেচনায় তথা হইতে পলায়ন না করা। কিন্তু উক্ত প্রকার স্থলে চুপ থাকাকে সন্তোষ বলিয়া বিবেচনা করা ভুল।

মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (সাঃ) স্বয়ং আল্লার নিকট আত্ম-নিবেদন করতঃ প্রার্থনা করিয়াছেন এবং অপর লোককেও তদ্রূপ প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"'প্রার্থনা,' এবাদতের 'মগজ'।" বাস্তবিক পক্ষে, 'প্রার্থনার প্রভাবে, মানবের অন্তর মধ্যে, দীনতা, নম্রতা বিনয় প্রভৃতি সদ্গুণের জোওয়ার উঠে। তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্ত জল পান, ক্ষুধা দূর করণার্থ আহার, শীত নিবারণ জন্য শীত-বস্ত্র পরিধান, যেমন সন্তোষের বিরোধী নহে; তেমনই 'বিপদের কাঠিন্য' হইতে মুক্তি পাইবার জন্য 'প্রার্থনা' করা সন্তোষের বিপরীত নহে! বরং মহাপ্রভু যে পদার্থকে কোন ব্যাপারের 'কারণ' স্বরূপ সৃজন করিয়াছেন তাহা তৎ তৎ স্থলে ব্যবহার না করাই সন্তোষের বিপরীত।

বিপদমুক্তির প্রার্থনা সন্তোষের বিপরীত নহে

তাহার পর দেখ—পাপকে মন্দ বলিয়া না জানা এবং পাপ স্রোত দর্শনে বিচলিত না হইয়া তুষ্ট থাকা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? এ বিষয়ে স্পষ্ট নিষেধ আছে। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন—"নির্ব্বিকার মনে পাপ সহ্য করিলে পাপের অংশ-ভাগী হইতে হয়।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"সুদূর পূর্ব্বদেশে এক ব্যক্তি অন্যায় ভাবে হত হইলে যদি পশ্চিম দেশে কাহার মন তচ্ছ্রবণে বিচলিত না হয় তবে তাহাকে নরহত্যার সহযোগী বলিতে হইবে!"

পাপকে মন্দ বলিয়া না জানা অসঙ্গত

পাপকার্য্য যদিও আল্লার বিধান-চক্রের অন্তর্গত তথাপি উহার দুটী মুখ আছে। এক মুখ, মানুষের দিকে প্রসারিত, অন্য মুখ আল্লার বিধান-চক্রে পরিচালিত। পাপ কার্য্যের এক প্রান্ত মানুষের দিকে প্রসারিত কথার অর্থ এই যে উহা করা না করার ক্ষমতা মানবের হস্তেই আছে এবং পাপকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করা মানুষের এক স্বাভাবিক গুণ, সে গুণ আল্লার গুণাবলীর অন্তর্গত। পাপের অন্য প্রান্ত আল্লার বিধান-চক্রে পরিচালিত হইতেছে। ইহার অর্থ এই যে উহা আল্লার বিধানে এবং তাহারই বিধিবদ্ধ নিয়মে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। তিনি বিশ্ব সংসারের সর্ব্বত্র যেমন শীত, গ্রীষ্ম, উচ্চ, নীচ, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, জীবন, মরণ, ইত্যাদি 'দ্বন্দ্ব-অবস্থার' সৃষ্টি করিয়াছেন তদ্রূপ 'পাপ পুণ্যের'ও ব্যবস্থা করিয়াছেন, সুতরাং ইহ সংসার হইতে পাপ ও নাস্তিকতা অন্তর্হিত হইবার কোন উপায় নাই। এই জন্য এক পক্ষে পাপ সহ্য করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে, পাপ কার্য্য করা, না করা, সম্বন্ধে মানুষের ক্ষমতা আছে এবং আল্লা পাপকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, এই দুই কারণে পাপের প্রতি মানুষের ঘৃণা থাকাও আবশ্যক। এখন, আল্লাব বিধান-শৃঙ্খলা দৃষ্টে পাপ সহ্য করা, এবং নিজের স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ক্ষমতা দৃষ্টে পাপের প্রতি ঘৃণা করা, সহজ দৃষ্টিতে 'বিরুদ্ধ' বলিযা মনে হয় কিন্তু তাহা বিরুদ্ধ নহে। দেখ, কোন ব্যক্তি আমার শত্রু ছিল এবং সে আমার শত্রুরও শত্রু ছিল। উভয়ের সেই সাধারণ শত্রু মরিলে আমার মনে এক হিসাবে আনন্দ জন্মিবে কিন্তু অন্য দিক দিয়া দেখিলে দুঃখও উৎপন্ন হইবে। এ স্থলে আনন্দের 'কারণ' হইতে দুঃখের 'কারণ' সম্পূর্ণ পৃথক। আমার শত্রু মরিল; আমি নিরাপদ হইলাম, আমার বিপদের সংখ্যা কমিয়া গেল এই বিবেচনায় আনন্দ জন্মে। অন্য দিক দিয়া দেখ—আমার শত্রুর শত্রু যত দিন বর্ত্তমান ছিল ততদিন আমার শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া হয়রাণ রাখিয়াছিল; সুতরাং আমার শত্রু, পূর্ণ তেজে আমার অনিষ্ট করিতে অবসর পায় নাই, এখন সেই সাধারণ শত্রুর অভাব হওয়াতে আমার শত্রু প্রবল প্রতাপে আমার অনিষ্ট করিতে অবসর পাইবে, এই বিবেচনায় দুঃখ জন্মে। অতএব দেখ—আনন্দ ও দুঃখ বিভিন্ন 'কারণে' উৎপন্ন হওয়াতে পরস্পর বিরুদ্ধ হইল না। আনন্দ ও দুঃখ যদি একই কারণে উৎপন্ন হইত তবে বিরুদ্ধ হইত। এইরূপ পাপের সম্বন্ধে বিবেচনা কর। উহা আল্লার সৃষ্ট 'দ্বন্দ্ব অবস্থার' অন্তর্গত

স্থান ও কারণবিশেষে পাপকে যেমন সহ্য করা উচিত তেমনি পরিহার করা উচিত

বলিয়া তাহা সহ্য করা উচিত, কিন্তু যখন সেই পাপ-স্রোত কোন জনপদের মধ্যে প্রবল ভাবে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয় তখন তথা হইতে পলায়ন করা অত্যাবশ্যক। এ সম্বন্ধে মহাপ্রভু আল্লা বলিয়াছেন—

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا

"হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে এই গ্রাম হইতে বাহির কর। এ স্থানের অধিবাসী অত্যাচারী" (৫ পারা। সূরা নেছা। ১০ রোকু।) যে স্থানে পাপের প্রাদুর্ভাব অধিক হইয়াছে, পূর্ব্বকালের জ্ঞানী লোক সে স্থান ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার কারণ পাপের প্রভাব মানব-হৃদয়ে অলক্ষিত ভাবে প্রবেশ করে। কোন কোন সতর্ক-হৃদয়ে পাপ প্রবেশ করিতে না পারিলেও সে স্থানে যে বিপদ আপদ অবতীর্ণ হয় তাহা পাপী ও পুণ্যাত্মা সকলেরই উপর নিপতিত হয়। এই উপলক্ষে আল্লা মানবকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন—

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً

"পাপের ফেৎনা (বিপদ) হইতে সভয়ে পলায়ন কর; কেননা তোমাদের মধ্যে যাহারা পাপ করিয়াছে কেবল তাহাদের উপর খাস করিয়া বিপদ পতিত হইবে না (তোমাদের সকলের উপরেই পড়িবে।)" (৯ পারা। সূরা আন্‌ফাল। ৩ রোকু।)

যে স্থানে অবস্থান করিলে নিজের দৃষ্টি পর-স্ত্রীর উপরে পড়ে, তথা হইতে সরিয়া যাওয়া আল্লার বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার বিপরীত নহে। এই রূপ, যে নগরে খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হয় অথবা দুর্ভিক্ষ পড়ে তথা হইতে বাহির হইয়া যাওয়া সঙ্গত কিন্তু যে স্থানে মড়ক লাগে তথা হইতে পলায়ন করা নিষিদ্ধ। ইহার কারণ এই যে, সুস্থ লোক সে স্থান হইতে চলিয়া গেলে পীড়িত লোক সেবা-শুশ্রূষার অভাবে কষ্ট পাইয়া মারা পড়ে। মড়ক ভিন্ন অন্য বিপদ আপদ হইতে পলায়ন করা সঙ্গত। (টীঃ ৪৭)

মড়ক ভিন্ন অন্য বিপদ আপদ, বা অবৈধ বিপদ হইতে পলায়ন সঙ্গত।

টীকা—৪৬৪। বিনাশন পুস্তকে অষ্টম পরিচ্ছেদের শেষ তিন প্যারার উপরের প্যারা দ্রষ্টব্য।

বৈধ বিষয়ের জন্য তদ্‌বীর এবং আল্লার বিধানে সন্তুষ্টি চাই! যাহা হউক, বৈধ-বিষয়ের জন্য 'তদ্‌বীর' (আয়োজন-উদ্‌যোগ) করা কর্ত্তব্য। তদ্রূপ ব্যাপারে উদ্‌যোগ করিবার পরে আল্লার আদেশে যাহা ঘটে তাহাতে হৃষ্টচিত্তে সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য এবং সেই সময়ে ইহা অন্তরের সহিত বুঝিয়া লওয়া উচিত যে তন্মধ্যে মঙ্গল নিহিত আছে। (টীঃ ৩৭৫)

দশম পরিচ্ছেদ।

মৃত্যু-চিন্তা।

মৃত্যু চিন্তার কল্যাণ—প্রিয় পাঠক! এই কথাগুলি জানিয়া রাখ—আমাদের পরিণাম মৃত্যু; কবর আমাদের শয্যা; 'মোন্‌কর' 'নকীর' আমাদের কার্য্য-পরীক্ষক। মৃত্যুর পর পুনরুত্থান অবধারিত। পরিশেষে আমাদিগকে বেহেশ্‌তে বা দোজখে যাইতে হইবে। এই বিষয়গুলি যে ব্যক্তি জানিতে পারিয়াছে তাহার মস্তিষ্কে কিছুমাত্র বুদ্ধি থাকিলে সে মৃত্যু-চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা করিতে পারে না, এবং সে ব্যক্তি পরকালের পাথেয় সংগ্রহে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকে। এ সম্বন্ধে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিতে পারিয়াছে এবং ইহসংসারে পরকালের হিতকর কর্ম্ম করিয়াছে সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান।" যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে মৃত্যু-চিন্তা করে স্বভাবতঃ সে পরকালের পাথেয় সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়া থাকে এবং মৃত্যুর পরে কবরকে বেহেশ্‌তের উদ্যানের ন্যায় সর্ব্বদা বাসন্তিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত দেখিতে পাইবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে ভুলিয়া থাকে সে সাংসারিক ধনোপার্জ্জনে নিমগ্ন হয়—পরকালের পাথেয় সঞ্চয়ে উদাসীন থাকে এবং কবরকে সে অগ্নি-কুণ্ডের ন্যায় দেখিতে পায়। এই কারণে মৃত্যু-চিন্তার কল্যাণ অতীব মহৎ।

মানবের পরিণাম

টীকা—৩৭৫। 'তকদীর' ও 'তদ্‌বীর' সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী অষ্টম পারার শেষ হদীছ বচন দ্রষ্টব্য।

মৃত্যু চিন্তায় কল্যাণ সম্পর্কে হদীছ বচন—১। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল বলিয়াছেন—"ভোগ বিলাস বিনাশকারীর চিন্তা অধিক পরিমাণে কর।" এখানে 'ভোগ-বিলাস-বিনাশকারী' শব্দে মৃত্যুকে লক্ষ্য করিয়াছেন। ২। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"তোমরা মৃত্যুর অবস্থা যেরূপ জান, পশু পক্ষী যদি তদ্‌রূপ জানিত তবে তোমাদের কাহারও ভাগ্যে আর স্থূল-কায় জীবের মাংস ভক্ষণ ঘটিত না।" এ কথার অর্থ এই যে মৃত্যুভয়ে পশু পক্ষী দুর্ব্বল হইত—মোটা তাজা হইতে পারিত না। ৩। মহামাননীয়া বিবী আয়শা এক দিন মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হে রসুলুল্লা! ধর্ম্মযুদ্ধে হত 'শহীদ' লোকের সমান উচ্চ সম্মান কি অন্য কেহ পাইতে পারিবে?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—'হাঁ, যে ব্যক্তি প্রত্যহ বিশ বার মৃত্যু-চিন্তা করে সে ব্যক্তি পাইতে পারিবে।" ৪। এক দিন মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) কতকগুলি উপবিষ্ট লোকের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন। তাহাদের উচ্চ হাস্যে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। হজরৎ তাহাদিগকে সম্বোধন করতঃ বলিয়াছিলেন—'ভ্রাতৃগণ! এই সভাতে এমন বিষয়ের আলোচনা কর যাহা হাস কৌতুক মিটাইয়া দিতে পারে।' তাহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"সে বিষয়টী কিরূপ?" তিনি বলিয়াছিলেন—'উহা মৃত্যু।' ৫। মহাত্মা আনেছ বলিয়াছেন—"মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) আমাকে এক দিন সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—'হে আনেছ! অধিক পরিমাণে মৃত্যু-চিন্তা কর। মৃত্যু-চিন্তা তোমাকে পৃথিবীতে পরহেজগার বানাইবে, এবং উহা তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।" ৬। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) স্বয়ং বলিয়াছেন—"মৃত্যু উপযুক্ত উপদেশক।" ৭। একদা তাঁহার সম্মুখে ছাহাবাগণ কোন এক ব্যক্তির প্রশংসা করিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা বলতো, মৃত্যুর কথা উহার অন্তরে কি প্রকার আছে?" ছাহাবাগণ নিবেদন করিলেন—"হে রসুলুল্লা! আমরা মৃত্যুর আলাপ উহার মুখে কখনও শুনি নাই।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"তোমরা যেরূপ জান সে ব্যক্তি তদ্‌রূপ নহে।" ৮। মহাত্মা এব্‌নে ওমর বলিয়াছেন—"আমি ও অপর দশজন ছাহাবা একদিন মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) এর, সমীপে উপস্থিত ছিলাম। মদীনার আনছার সম্প্রদায়ের একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে রসুলুল্লা! কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা চতুর ও দয়ালু?' তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—'যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে মৃত্যু-চিন্তা করে এবং পর-

কালের পাথেয়ের প্রতি অতি লোলুপ হইয়া সর্ব্বদা তৎ সংগ্রহে নিযুক্ত থাকে।'''

মৃত্যু-চিন্তার কল্যাণ সম্বন্ধে মহাজন উক্তি ১। মহাত্মা এব্‌রাহীম তয়্‌মী বলিয়াছেন—"দুই বস্তু আমার মন হইতে সাংসারিক শান্তি হরণ করে; (ক) মৃত্যু-চিন্তা; (খ) আল্লার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার ভয়।" ২। মহাত্মা খলীফা ওমর এব্‌নে আবদুল আজীজ প্রত্যহ রজনী যোগে জ্ঞানী আলেম লোকদিগকে একত্র করিয়া মৃত্যু ও কেয়ামতের কথা শ্রবণ করিতেন এবং এমন সকরুণ স্বরে রোদন করিতেন যেন কোন শোকার্ত্ত লোকের সম্মুখে তাহার প্রিয়জনের শব-দেহ কবরস্থ করিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে। ৩। মহাত্মা হছন বছরী কোন লোকের সঙ্গে বসিলে কেবল মৃত্যু, দোজখ, ও পরকালের কথা লইয়া আলাপ করিতেন। ৪। একদা কোন স্ত্রীলোক মহামাননীয়া বিবী আয়শা ছিদ্দীকার সমীপে স্বীয় কঠিন অন্তরের অভিযোগ করিয়াছিল। বিবী মহোদয়া তাহাকে প্রভূত পরিমাণে মৃত্যু চিন্তা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। সে স্ত্রীলোক কিছুদিন মৃত্যু-চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়া বুঝিতে পারিল, তাহার হৃদয় ক্রমে কোমল হইতেছে—কাঠিন্য ঘুচিয়া যাইতেছে। অবশেষে উক্ত বিবী মহোদয়ার সমীপে গিয়া হৃদয়ের কোমলতা প্রাপ্তির জন্য আল্লাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়াছিল। ৫। মহাত্মা রবী খছীম নিজের গৃহ-মধ্যে একটী কবর খনন করিয়া লইয়াছিলেন। প্রতিদিন কয়েকবার সেই কবরে প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণ মৃত্যু-চিন্তা করিতেন। তিনি বলিয়াছেন ঘণ্টা কাল মৃত্যু-চিন্তা না করিলে তাঁহার হৃদয় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিত। ৬। খলীফা মহাত্মা ওমর এব্‌নে আবদুল আজীজ কোন লোক দেখিলে বলিতেন—"বহু পরিমাণে মৃত্যু-চিন্তা কর; তাহাতে দুই উপকার পাইবে; (ক) তুমি যদি দুঃখ দারিদ্রে বেষ্টিত থাক তবে মৃত্যু-চিন্তায় তোমার মনে শান্তি আসিবে। (খ) অপর পক্ষে তুমি যদি ধন-সম্পদের আরামে ডুবিয়া থাক তবে ধন-সম্পদ তোমার নিকট তিক্ত হইয়া পড়িবে।" ৭। মহাত্মা আবু ছোলায়মান দারানী বলিয়াছেন—"আমি হারুণের মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'আপনি কি মৃত্যু ভালবাসেন?' তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—'না, আমি মৃত্যু ভালবাসি না।' আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'তাহার কারণ কি?' তিনি বলিয়াছিলেন—'দেখুন, মানুষের নিকট কেহ অপরাধ করিলে, অপরাধী ব্যক্তি তাহার সহিত দেখা করিতে সাহস পায় না। আমি আল্লার

নিকট বহু অপরাধ করিয়াছি, কেমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস পাই? মৃত্যু ঘটিলেই যে তাঁহার দরগায় যাইতে হইবে।'"

মৃত্যু-চিন্তার ধারা—লোক ও কারণ ভেদে ত্রিবিধ। পাঠক, জানিয়া রাখ,—তিন প্রকার লোকের মনে মৃত্যু-চিন্তা উদয় হইলেও কারণের পার্থক্যে তাহাদের চিন্তাধারা সাধারণতঃ তিন প্রকার দেখা যায়। **প্রথম প্রকারের চিন্তাধারা**—সংসার-মত্ত লোকের মৃত্যু-চিন্তা। সংসার-মত্ত লোকেরা মৃত্যুকে সুখ-ভোগ-বিনাশক মনে করিয়া তৎপ্রতি অসন্তুষ্ট হয় এবং এই ভয় করে যে মৃত্যু আমাদিগকে সংসারের আনন্দ-সুখ হইতে বঞ্চিত করিবে। তাহারা মৃত্যুকে জঘন্য আপদ বলিয়া গালী দেয় এবং মনে করে মৃত্যু তাহাদিগকে গিলিবার মানসে লোলুপ হইয়া ক্রমশঃ নিকটে আসিতেছে। 'হায়! এই আপদ আমাদের হাত হইতে এমন সুখের দুনিয়া কাড়িয়া লইবে'—এই ধরণে মৃত্যু-চিন্তা করিলে আল্লা হইতে দূরবর্তী হইতে হয়। তবে যদি অন্য কোন ক্রমে দুনিয়ার উপর অসন্তুষ্টি জন্মে এবং দুনিয়ার উপর মন চটিয়া যায় তবে উপকার হইতে বঞ্চিত হইবে না। **দ্বিতীয় প্রকারের চিন্তাধারা**—পাপ হইতে 'তওবা' করিয়া সুপথে ফিরিয়া আসিতে অভিলাষী এবং অতীত পাপের ক্ষতি সংশোধনে প্রবৃত্ত লোকের মৃত্যু-চিন্তা। শীঘ্র মরিলে অতীত পাপের ক্ষতি পূরণে ব্যাঘাত হইবে। এই চিন্তায় এই শ্রেণীর লোকেরা মৃত্যুভয়ে ভীত হন। এইরূপ চিন্তার বশবর্তী হইয়া তাঁহারা অন্যান্য সর্ব্ববিধ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল পুণ্য অর্জ্জনে এবং অতীত পাপের ক্ষতি পূরণে তৎপর থাকেন। এই প্রকার মৃত্যু-চিন্তা অতি উত্তম কার্য্য। ইঁহারা মৃত্যুকে ঘৃণা করেন না—কেবল মৃত্যুর শীঘ্র আগমন পছন্দ করেন না। শীঘ্র মৃত্যু ঘটিলে পরকালের পাথেয় অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইবে না অথবা রিক্ত হস্তে পরকালে যাইতে হইবে—এই ভয়ে যদি কেহ মৃত্যুকে অপ্রিয় মনে করেন তবে কোন ক্ষতি নাই। **তৃতীয় প্রকারের চিন্তাধারা**—'আরেফ' লোকের মৃত্যু-চিন্তা। এই শ্রেণীর লোকের মৃত্যু-চিন্তা করিবার কারণ এই যে, তাঁহারা একথা সুন্দর মত জানেন যে আল্লার 'দীদার' মৃত্যুর পরে ঘটিবে। বন্ধু যে সময়ে দর্শন দিবেন বলিয়া 'ওয়াদা' (অঙ্গীকার) করিয়াছেন সে সময়টী কেহ ভুলিতে পারে না - সর্ব্বদা তাহার প্রতীক্ষা করিতে থাকে; বরং সেই শুভ সময় শীঘ্র আসুক বলিয়া আশাধারী হইয়া থাকে। এই কারণে মহাত্মা হোজায়ফা

মৃত্যু শয্যায় কহিয়াছিলেন—"বন্ধু প্রায় আসিয়া পড়িলেন; কেননা ওয়াদার সময় আসিল।" পশ্চাৎ তিনি এই বলিয়া আত্ম-নিবেদন করিলেন-'হে আল্লা! তুমি জান আমি সম্পদ অপেক্ষা অভাবকে ভাল বাসিয়াছি, সুস্থাবস্থা অপেক্ষা পীড়িতাবস্থা পছন্দ করিয়াছি এবং জীবন অপেক্ষা মরণকে অধিক ভালবাসিয়া থাকি; এইজন্য মিনতি করি মৃত্যু আমার নিকট সহজ কর তাহা হইলে আমি তোমার দর্শনে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব।"

উন্নত মৃত্যু-চিন্তা। এতদপেক্ষা আর এক শ্রেণীর উন্নত মৃত্যু-চিন্তা আছে। সে অবস্থায় লোকে মৃত্যুর প্রতি অসন্তুষ্টও থাকে না বা সন্তুষ্ট হইয়া শীঘ্র মৃত্যুকামনাও করে না। মৃত্যু বিলম্বে আসুক কি শীঘ্র আসুক সে দিকে মনোযোগ না দিয়া কেবল আল্লার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। মৃত্যু যখন আসিবে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে; নিজের স্বাধীন ক্ষমতা ও পছন্দ একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। এবম্বিধ লোক আল্লার বিধান সম্পূর্ণ 'তছলীম' (মান্য) করেন এবং 'রেজা' (সন্তোষ) এর চরমোন্নত শিখরে আরোহন করিয়া থাকেন। তাঁহারা মৃত্যু-চিন্তা করেন বটে কিন্তু মৃত্যুর খেয়ালটী সুখকর কি দুঃখকর তাহা তাঁহাদের মনের ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। তদ্রূপ নির্ব্বিকার-ভাব প্রাপ্তির কারণ এইযে তাঁহারা ইহ-সংসারে থাকিয়া জ্ঞানচক্ষে আল্লাকে দর্শন করিতে পান এবং সেই সুখে ডুবিয়া থাকেন। আল্লার 'জেকের' (স্মরণ) তাঁহাদের অন্তররাজ্য তন্ময় করিয়া রাখে, জীবণ-মরণ তাঁহাদের নিকট এক সমান বলিয়া বোধ হয়। তজ্জন্য সর্ব্বদা আল্লার স্মরণে ও প্রেমে ডুবিয়া থাকেন।

মৃত্যু-চিন্তার উন্নত অবস্থায় মৃত্যুর প্রতি অনুরাগ-বিরাগ-শূন্য-নির্ব্বিকার-ভাব দেখা যায়

মৃত্যু-চিন্তা মনে স্থায়ী জমান চাই। পাঠক! জানিয়া রাখ—মৃত্যু একটী গুরুতর বিষয়। ঠিক মৃত্যুকালে মানবের যে ক্ষতি ঘটিতে পারে তাহার সীমা নাই। এ কথা সকল লোকে জানে না, এবং এমন মোহমুগ্ধ অবস্থায় থাকে যে তাহা জানিতেও চায় না। কেহ কখন মরণের কথা মধ্যে মধ্যে স্মরণ করে বটে কিন্তু সে স্মরণ হৃদয়ের উপর কোন স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া যাইতে পারে না। সংসারাসক্তি তাহাদের হৃদয় এমন পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে যে, সে হৃদয়ে অন্য কোন পদার্থ স্থান পাইতে পারে না। এই কারণে সংসারমুগ্ধ লোকের মনে আল্লার

সংসার মুগ্ধ মনে ও মৃত্যু-চিন্তা-মগ্ন-মনে আল্লার তছবীহ ও জেকেরের প্রভাব-পার্থক্য

'জেকের' ও 'তছ্বীহ্' (স্মরণ ও স্তুতিপাঠ) মিষ্ট লাগে না। যথাবিহিত উপায়ে মৃত্যু-চিন্তা করিতে পারিলে আল্লার স্মরণ ও স্তুতি-পাঠ মিষ্ট লাগিতে পারে।

মৃত্যু-চিন্তার স্থায়ী প্রভাব মনে জন্মাইবার দ্বিবিধ উপায়-নিম্ন লিখিত দুই উপায়ে মৃত্যু-চিন্তা মনে স্থায়ী প্রভাব আনয়ন করিতে পারে। **প্রথম উপায়**—প্রত্যহ অন্ততঃ এক ঘণ্টাকাল নির্জ্জন স্থানে বসিয়া মন হইতে সংসারের খেয়ালগুলি দূর করিয়া দাও। তাহার পর, দুস্তর-বিজন-অরণ্যে-প্রবিষ্ট পথভ্রান্ত-পথিকের ন্যায় নিজের অবস্থা বানাও। অরণ্যের ভীষণ হিংস্র জন্তুর কবল হইতে পার হইবার জন্য পথিক ব্যাকুল হয়—অরণ্যের সুশীতল ছায়া, মনোহর পুষ্প, সুমিষ্ট ফলের দিকে মনোযোগ না দিয়া কি প্রকারে অরণ্যের বিভীষিকা পার হইবে সেই চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। তুমিও নিজকে তদ্রূপ অবস্থায় স্থাপন কর। দুনিয়ার লোভনীয় পদার্থের কথা ভুলিয়া গিয়া, এখাকার বিপদ আপদ ও বিভীষিকা পার হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাক এবং আল্লার স্থানে সাহায্য চাও। তাহার পর, মনে মনে বিবেচনা করিতে থাক যে—মৃত্যু আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। অদ্যই বোধ হয় মরিতে হইবে। এখন তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর—"হে মন! কেহ তোমাকে অন্ধকার পূর্ণ পাতালপুরীতে প্রবেশ করিতে আদেশ করিল। তথায় যাইবার পথে কোন খাল খন্দক আছে, কি শিলা প্রস্তর পতিত আছে, তোমার জানা নাই। তাই এই আদেশে, অন্ধকার পথে যাইতে তোমার হৃদয়ের রক্ত জল হইয়া যাইবে। মৃত্যুর পর তোমাকে এক গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করিতে হইবে—তথায় কি আছে এবং তোমাকে কোথায় পতিত হইতে হইবে তাহা একেবারে তোমার জানা নাই--সমস্ত গুপ্ত। কবরের মধ্যে তোমাকে কি বিপদে পড়িতে হইবে তাহাও অন্ধকারপূর্ণ-পাতালপুরী প্রবেশ অপেক্ষা অল্প ভয়ের কথা নহে। এমন স্থলে মৃত্যু, কবর, পরকাল প্রভৃতি অজ্ঞাত বিপদের কথা কি সাহসে ভুলিয়া রহিয়াছ?" **দ্বিতীয় উপায়**—ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। তোমার সময়ের যে সকল লোক মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের কথা স্মরণ কর। (১) তাহারা কেমন জাঁক জমকে ও প্রভুত্ব-প্রতাপে জীবন যাপন করিতেছিল—তাহারা সংসারে কত সুখ লুটিয়াছিল—ভোগ করিয়াছিল—ভাবিয়া দেখ। তাহাদের আকৃতি ও জীবন-যাপনের ধরণ তোমার মানস-চক্ষে আঁকিয়া লও এবং বিবেচনার চক্ষে দেখ, তাহারা মৃত্যুর কথা কি

প্রকারে ভুলিয়াছিল। সেই মোহময় ভুলের মধ্যেও রিক্ত-হস্ত অবস্থায় মৃত্যু হঠাৎ আসিয়া কেমন ক্ষিপ্রতার সহিত তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। (২) এখন কবরের মধ্যে তাহাদের আকৃতি কেমন হইয়াছে তাহাও একবার চিন্তা কর। চর্ম্ম, মাংস চক্ষু জিহ্বা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি পচিয়া গলিয়া একখানি হইতে অন্য খানি খসিয়া পড়িয়াছে এবং ক্রিমি কীটে পূর্ণ হইয়াছে। কবরে তাহার ঐ অবস্থা। (৩) এদিকে তাহার পরিত্যক্ত ধন মাল লইয়া দায়াদগণ কেমন ঝগড়া বাধাইয়াছে! দেখ—একজন অপরকে বঞ্চিত করিয়া, বা পরস্পর মিলিয়া জুলিয়া সে ধন আরামের সহিত ভোগ করিতেছে। তাহার প্রিয়তমা রমণীগণ তাহাকে ভুলিয়া অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে এবং তাহাদের সহিত আমোদ আহ্লাদে মত্ত রহিয়াছে। (৪) যাহা হউক, এইরূপে তোমার সমসাময়িক এক একটী মৃত লোকের কথা স্মরণ কর। তাহাদের জীবন চরিত ও ক্রীড়া কৌতুক, হাস্য, পরিহাস, উদাসীনতা ও মনোযোগিতা, নির্লিপ্তি ও কর্ম্মব্যাপৃতি লইয়া চিন্তা কর। (৫) তাহারা এমন এমন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল যে বিংশতি বৎসরেও তাহার পরিসমাপ্তি দুর্ঘট এবং সেই কার্য্য করিতে গিয়া বহু গুরুতর দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াছে। (৬) তাহার 'কাফনের' বস্ত্র প্রতিবেশী বস্ত্র-বিক্রেতার দোকানে পূর্ব্ব হইতেই আমদানী মৌজুদ ছিল অথচ তাহার সংবাদটীও সে নিজে জানিতে পারে নাই। (৭) এইরূপ চিন্তা করিয়া তুমি তোমার মনকে বলিবে—"হে মন! তুমিও তাহাদের মত সম্পূর্ণ অসাবধান, অদ্যাবধি স্বীয় পাথেয় প্রস্তুত করিতে পার নাই। তাহাদের মত তুমিও পরকালের প্রতি, অমনোযোগী, সংসার লোভী এবং নির্ব্বোধ। তবে, ইহা তোমার পক্ষে এক মহা সুযোগ ঘটিয়াছে যে তাহারা তোমার সম্মুখে মরিয়া গিয়াছে, এবং তোমাকে সতর্ক করিবার জন্য স্ব স্ব আত্ম-কাহিনী তোমার উপদেশের জন্য রাখিয়া গিয়াছে।"

فَاِنَّ السَّعِيْدَ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهٖ

"যে ব্যক্তি অপরের অবস্থা দেখিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে সে অবশ্যই সৌভাগ্যবান।" (৮) পশ্চাৎ নিজের চক্ষু, জিহ্বা, হস্ত, পদ, অঙ্গুলী প্রভৃতি পরিণাম চিন্তা কর। এ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরস্পর এক হইতে অপরটী খসিয়া পড়িবে। অল্প দিনের মধ্যে তোমার দেহ পোকা, পিপীলিকার খাদ্য হইবে। তাহারা আনন্দের সহিত তোমার

মানবদেহের পরিণাম

দেহ ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে। কবরের মধ্যে তোমার দেহের যে রূপ বীভৎস অবস্থা ঘটিবে তাহাও চিন্তা কর। তোমার এমন সুন্দর কমনীয় দেহ পচিয়া শড়িয়া গলিত হইবে—এমন দুর্গন্ধ হইবে যে তোমারই অন্তরঙ্গ লোক মুখে কাপড় চাপিয়া পলায়ন করিবে।

এই কথা কয়েকটী বা এই ধরণের বিষয় প্রত্যহ এক ঘণ্টা সময় মনে মনে চিন্তা কর। এরূপ চিন্তায় সম্ভবতঃ তোমার মনে মৃত্যুর সংবাদটী প্রবেশ করিতে পারে। মুখে 'মৃত্যু মৃত্যু' করিলে মন সে কথা স্বীকার করিবে না—তোমার মুগ্ধ মন সে খেয়াল আঁকিয়া লইতে পারিবে না। সর্ব্বদা লোকে মৃতদেহ কবরস্থ করিতে লইয়া যাইতেছে এবং তোমরাও তাহা স্বচক্ষে দেখিতেছ ও শুনিতেছ অথচ তোমাকেও যে একদিন মরিতে হইবে সে কথাটা তোমার মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। ইহার কারণ এইযে মৃত্যুর 'মজা' স্বয়ং তুমি চাখিতে পাও নাই। মানুষ যাহা জানিতে না পারে তাহার খেয়াল করিতে পারে না। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) একদিন 'খোৎবা' পাঠের সময়ে বলিয়াছিলেন—"সত্য করিয়া বল দেখি, এই মৃত্যু কি আমাদের ভাগ্যে বিধিবদ্ধ হয় নাই? এইযে মৃত লোক কবরে যাইতেছে তাহারা কি পুনরায় ফিরিয়া আসিবে? মৃতদেহ কি কবরে মাটী হইবে না? তাহাদের পরিত্যক্ত ধনধান্য অপর লোকে সুখে ভোগ করিতেছে ইহা স্বচক্ষে দেখিতেছ অথচ নিজের মৃত্যু কেন চিন্তা করিতেছ, না?"

মৃত্যুর কথা কেন লোকে ভুলিয়া যায়? অধিক দিন বাঁচিবার আশা এবং লম্বা লম্বা কাজ সমাপ্তির অভিলাষ জন্মিলে মানুষ মৃত্যুর কথা ভুলিয়া যায়।

জীবনের আশা খাটো করিবার কল্যাণ—প্রিয় পাঠক! বুঝিয়া রাখ—যে ব্যক্তি মনে করে, 'আমি দীর্ঘ জীবন পাইয়াছি—বহুদিন বাঁচিব'—তাহার দ্বারা পরকালের কোন কার্য্য হইয়া উঠে না। সে বিবেচনা করে—এখনও বহুদিন আছে, যখন ইচ্ছা তখনই করিয়া লইব, এখন কিছুদিন আমোদ আহ্লাদে দিনপাত করি।" এইরূপ 'এখন' না 'তখন' ভাবিয়া দীর্ঘ-জীবন-আশা-মুগ্ধ লোক পরকালের কর্ম্মে শৈথিল্য করিতে থাকে। যে ব্যক্তি মৃত্যুকে নিকটবর্ত্তী মনে করে সে সর্ব্বদা পরকালের কর্ম্মে মগ্ন থাকে। (টীঃ ৪৬৬) এইরূপ চিন্তা সর্ব্ববিধ সৌভাগ্যের মূল।

টীকা—৪৬৬। জ্ঞান ও জ্ঞানীর কথা সকল দেশেই এক প্রকার। সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানীগণ বলিতেছেন—"গৃহীতঃ ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ" ইহার অর্থ এই—যম যেন চুলের ঝুঁটী

(১) মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) মহাত্মা এব্‌নে ওমরকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া এই ভাবিবে যে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবার আশা নাই। আবার সন্ধার পর ইহা মনে করিবে যে প্রভাত পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারিব না। ইহকালে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লওয়া আবশ্যক। সুস্থ অবস্থায় পীড়ার কল্যাণ হস্তগত করা উচিত। আগামী কল্য তোমার ভাগ্যে কি ঘটিবে—আল্লার নিকট তোমার কি প্রাপ্য হইবে, তাহা তুমি জান না।" ২। আরও বলিয়াছেন—"তোমাদের দুটী অবস্থা দেখিয়া আমি যত ভয় পাই, তত ভয় আর অন্য কিছু হইতে পাই না—(ক) তোমরা প্রবৃত্তির আদেশ মত চল; এবং (খ) দীর্ঘ জীবনের আশা কর।" ৩। একবার মহাত্মা ওছামা এক মাসের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে তৎ পরিমাণে কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়াছিলেন, তচ্ছ্রবণে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—"ওছামা দীর্ঘ জীবনের আশা করে সুতরাং তাহার পক্ষে এক মাসের দ্রব্য সংগ্রহ করা বিচিত্র নহে। যে আল্লার হস্ত-মুষ্টির মধ্যে আমার জীবন আছে তাঁহার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি. আমি যখন চক্ষু মুদ্রিত করি তখন এই কথা মনে করি যে পুনরায় চক্ষু খুলিবার অগ্রেই বোধ হয় মরিয়া যাইব এবং নয়নোন্মিলন করিলে ভয় হয়, নয়ন মুদ্রিত করিবার অগ্রেই আমার মৃত্যু ঘটিবে। মুখে এক লোকমা অন্ন স্থাপন করিবার সময় মনে হয় ইতি-মধ্যে মৃত্যু আসিবে মুখের অন্ন মুখেই রহিয়া যাইবে গলার নীচে নামিতে পারিবে না।" ইহা বলিবার পর তিনি পুনরায় বলিলেন—'হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা যদি বুদ্ধিমান হও তবে নিজকে মৃত বলিয়াই জান। যে আল্লার হস্ত-মুষ্টির মধ্যে আমার জীবন ও প্রাণ আছে তিনি তোমাদের সম্বন্ধে যে 'ওয়াদা' করিয়াছেন তাহা অতি নিশ্চয়ই আসিবে। তাহা হইতে কখনই পলাইতে পারিবে না।" (৪) শরীরের স্বাভাবিক গতি ক্রমে কখনও যদি মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) এর ওজু ভঙ্গের কারণ ঘটিত তবে তৎ-ক্ষণাৎ তিনি ধুলী দ্বারা 'তৈয়ম্মম' করিয়া লইতেন। ছাহাবাগণ যদি বলিতেন—'হে রসুলুল্লা! জল অনতিদূরে আছে এমন স্থলে ওজু করার অগ্রে 'তৈয়ম্মম'

- হদীছ বচন

ধরিয়া টানিতেছে এমন মনে করিয়া ধর্ম্ম কাজ করা উচিত। তবে এই শ্লোকার্দ্ধে, ধর্ম্ম-কাজ করিবার কালে মনকে কিরূপ ভাবাক্রান্ত করিতে হইবে তাহাই বলিতেছেন। আর মূলগ্রন্থে মৃত্যু নিকটবর্ত্তী বলিয়া চিন্তা করাকে ধর্ম্ম-কাজের কারণ বলা হইতেছে অর্থাৎ মৃত্যু আসিয়া ধরিল এরূপ চিন্তা করিলে ধর্ম্ম-কাজ না করিয়া অন্য কিছুই করিতে পারা যায় না।

করিবার কারণ কি ?' তদুত্তরে তিনি বলিতেন—'জল সংগ্রহ পূর্ব্বক ওজু করিবার অগ্রেই যদি মরিয়া যাই তবে ওজু-হীন অবস্থায় মরিতে হইবে।' (৫) মহাত্মা আবদুল্লা এব্‌নে মছউদ বলিয়াছেন—একদা মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ছাঃ) ভূতলে একটী চতুষ্কোণ চিত্র অঙ্কন করতঃ তাহার মধ্যস্থলে একটী সরল রেখা টানিয়াছিলেন এবং সেই সরল রেখার উভয় পার্শ্বে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাপাত করেন এবং চতুষ্কোণ চিত্রের বহির্ভাগে আর একটী গোল রেখা টানিয়া বলিয়াছিলেন—"এই চতুষ্কোণ-চিত্রের মধ্যে যে সরল রেখা দেখিতেছ, উহাকে মনুষ্য মনে কর, চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের ঘেরকে মৃত্যু বলিয়া ধরিয়া লও। এই মৃত্যু-রেখার বাহিরে পলায়নের কোন উপায় নাই। যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা, অভ্যন্তরস্থ সরল-রেখার উভয় পার্শ্বে অঙ্কিত দেখিতেছ তাহা মানবের বিপদ আপদ। এক বিপদ হইতে রক্ষা পাইলে দ্বিতীয় বিপদে পড়িতে হয়; না হয় তৃতীয় বিপদে অবশ্যই পড়িতে হইবে। পরিশেষে মৃত্যু অবধারিত। চতুষ্কোণ রেখার বাহিরে যে গোল দাগ দেখিতেছ উহা মানুষের আশা ভরসা। মানব প্রত্যহ এমন কার্য্যের আশা করে যাহার ফল আল্লা ভিন্ন অন্যে জানে না। কিন্তু মৃত্যুর পর মানবকে তাহার ফলাফল ভোগ করিতে হইবে।" ৬। তিনি অন্য এক সময়ে বলিয়াছেন—"মানব প্রত্যহ বৃদ্ধত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে দুই পদার্থ প্রত্যহ যৌবনের দিকে ধাবিত হইতেছে—(ক) ধনলোভ এবং (খ) বাঁচিবার আশা।" ৭। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী এক দিন কোন বৃদ্ধকে কোদালী হস্তে ভূমি খনন করিতে দেখিয়া আল্লার দরবারে, বৃদ্ধের হৃদয় হইতে আশা বাহির করিয়া লইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তদনুসারে আল্লা বৃদ্ধের মন হইতে আশা দূর করিয়া দিয়াছিলেন। বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ কোদালীখানি এক পার্শ্বে ফেলিয়া দিয়া বিশ্রামার্থে শয়ন করিল। কিছুক্ষণ পরে নবী মহোদয় পুনরায় আল্লার দরবারে নিবেদন করিলেন—"হে আল্লা! বৃদ্ধের মনে পুনরায় আশা ফিরাইয়া দাও।" আল্লাও তাহাই করিলেন। বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কোদালীখানি গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। নবী মহোদয় বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার কি হইয়াছিল ?' বৃদ্ধ বলিয়াছিল—'আমার মনে হঠাৎ এই কথা জাগিল—পরিশ্রম করিতে করিতে বৃদ্ধ হইলাম তথাপি পরিশ্রম ঘুচিল না। কত দিন বাঁচিব ? শীঘ্র মরিতে হইবে—আর পরিশ্রমে প্রয়োজন কি ? এখন কিছু কাল শান্তি ভোগ করি।

এই কথা মনে করিয়া শয়ন করিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ পরে মনে জাগিল—মরণ তো হইবে ঠিক, তবে যতদিন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে ততদিন আহার করিতেই হইবে। এই কথা মনে উদয় হওয়াতে পুনরায় উঠিলাম ও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম।' ৮। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) একদিন উপস্থিত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা কি বেহেশ্‌তে যাইতে চাও?' সকলে সমস্বরে বলিয়াছিলেন—"হে রসুলুল্লা! অবশ্যই বেহেশ্‌তে যাইতে চাই।" তখন তিনি বলিতে লাগিলেন "আশা খাটো কর; মৃত্যুকে সর্ব্বদা চক্ষের উপর রাখ; এবং আল্লার জন্য শরমের মত শরম কর।"

৯। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীয় ভ্রাতাকে লিখিয়াছিলেন—"অতঃপর, অবগত হও দুনিয়া নিদ্রা বিশেষ এবং পরকাল চৈতন্যের জগৎ। এই উভয়ের মধ্যে মৃত্যু অবস্থিত। আমরা যে জগতে আছি—তাহা বিশৃঙ্খল খেয়াল মাত্র।" —মহাজন উক্তি

দীর্ঘ জীবনাশার কারণ—পাঠক! জানিয়া রাখ—মানব দুইটী কারণে দীর্ঘ জীবনের আশা করে। (১) সংসারাসক্তি; (২) অজ্ঞানতা।

প্রথম—সংসারাসক্তি। দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা যখন সতেজ হইতে থাকে তখন উহাকে ছাড়িয়া যাওয়া বড়ই কঠিন হয়। মৃত্যু আসিয়া হঠাৎ মানবকে আক্রমন করে এবং লোভনীয়া দুনিয়া হইতে তাহাকে দূরে লইয়া যায়। এই কারণে মৃত্যুকে লোকে ভাল বাসে না। আবার দেখ, মৃত্যু, মানব-প্রকৃতির বিপরীত। যে পদার্থ প্রকৃতির বিরুদ্ধ তাহা মনে চায় না—তাহা হইতে পলাইতে চায়। এবং যাহা প্রকৃতি চায় তাহা গ্রহণ করিতে হৃদয়কে ফুস্‌লাইতে থাকে। হৃদয়ও সর্ব্বদা প্রবৃত্তির ফুস্‌লানী শুনিয়া, হিতকর জ্ঞানে তাহার ছবী নিজের উপর ক্রমে ক্রমে আঁকিয়া লইতে থাকে। এইজন্য দীর্ঘজীবন, ধনৈশ্বর্য্য, স্ত্রী পরিবার ও সন্তান সন্ততি চিরকালের জন্য হস্তগত রাখা আবশ্যক বলিয়া হৃদয় মানিয়া লয়—পরিশেষে পরামর্শদায়িনী-প্রবৃত্তির-শক্র মৃত্যুকে ভয় করিতে শিখে। কালে কস্মিনে মৃত্যুচিন্তা কোন সূত্রে হৃদয়ে উদয় হইলে তৎক্ষণাৎ প্রবৃত্তি তাহা ভুলাইয়া দেয়। এবং গলাবাজী করিয়া বলিতে থাকে—"ওহে! এখনও বহু সময় অবশিষ্ট আছে। ইতিমধ্যে মৃত্যুর বন্দোবস্ত প্রচুর করিয়া লইতে পারিবে।" বয়স অধিক হইতে লাগিলে বলিতে থাকে—'এখন কি হইয়াছে? বার্দ্ধক্য আসিতে না আসিতে সমস্ত ঠিক করিয়া দিব; ভাবনা করিও না—কিছু প্রতীক্ষা কর'। বার্দ্ধক্য আসিলেও বলিতে থাকে—'একটু

থাম, এই গৃহখানি আরম্ভ করা হইয়াছে, সমাপ্ত করিয়া লই ; এই বালকের বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য একখানি জাহাজ সংগ্রহ করিয়া দিয়া উহার উপার্জ্জনের পথটী খুলিয়া দেই। এই ক্ষেত্রে জল সেচনের একটা উপায় করিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হই। হাতের এই কার্য্য গুলি সমাধা করিয়া দিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছি। ঐ সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া দিলে মনের টান আর কোন দিকে থাকিবে না ; সুতরাং এবাদতে প্রচুর সময় পাইব এবং তাহার মধ্যে মাধুর্য্য ও সুস্বাদ পাইতে পারিব। আরও দেখ, অমুক ব্যক্তি আমার শক্রতা করিয়া ক্ষতি করিয়াছে—তাহার প্রতিশোধ না লইলে মনে কাঁটা বিন্ধিয়া থাকিবে। একটু ছবর কর মোকদ্দমা দায়ের করিয়া তাহাকে শাস্তি দিয়া মনটা ঠাণ্ডা করিয়া লই।' এইরূপ কথায় সে ব্যক্তি সমস্ত কার্য্য নিঃশেষে সমাপ্ত করিয়া দুনিয়া হইতে নিশ্চিন্ত হইতে চায়। কিন্তু সংসারের কর্ম্মগুলি শিকলের পেচের মত জড়িত আছে—এক কার্য্যে হাত দিলে আর দশটা ব্যাপার সেই টানে আসিয়া উপস্থিত হয়। এ কথা হয়তো সে নির্ব্বোধ জানে না ; এবং ইহাও জানে না যে সমস্ত কাজ কাম সারিয়া দুনিয়া হইতে অবসর লওয়া অসম্ভব কথা। বাস্তবিক সংসার হইতে অবসর লইতে হইলে তুমি যে অবস্থায় থাক না কেন এবং হাতের কাজ অসম্পন্ন থাকুক না কেন ঝটিতি ত্যাগ করিয়া বসিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু নির্ব্বোধ সাংসারিক লোক এ কথা বুঝে না। যাহা হউক, নিশ্চিন্ত হইবার মানসে একটী কাজ সমাধার পর অন্য একটী কাজে হাত দিয়া চূড়ান্ত নিশ্চিন্তর আশা করিতে লাগিলে, মৃত্যু অলক্ষিতে আসিয়া ধরিবে। মৃত্যু ঠিক সময়েই আসিবে—অগ্রেও আসিবে না বা পশ্চাতেও আসিবে না। মানুষ সাংসারিক অভিলষিত কাজ-সাধনে তন্ময় হইয়া থাকে—মৃত্যুর আগমন-চিন্তা একেবারেই করে না সুতরাং মৃত্যু কর্ত্তৃক হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া অপ্রস্তুত অবস্থায় মারা পড়ে। মৃত্যু ধ্রুব অবধারিত। পূর্ব্ব হইতে তাহার আগমন-প্রতীক্ষা করিলে হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া রিক্ত হস্তে পরকালে যাইতে হয় না। বরং পূর্ব্ব হইতে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিলে পরকালের পাথেয় সংগ্রহের উপায় হইতে পারে। যাহা হউক, মৃত্যু আসিয়া ধরিলে মনের লম্বা লম্বা আশার কার্য্যগুলি অপূর্ণ থাকিয়া যাওয়াতে পূর্ণ মাত্রায় ক্ষোভ রহিয়া যায়। এই কারণে অধিকাংশ দোজখী লোক ক্ষোভ ও অনুশোচনার চীৎকার সহকারে অভিযোগ করিতে থাকিবে। কেবল দুনিয়ার প্রতি আসক্তি তাহাদের ঐরূপ অনুশোচনার কারণ।

সংসারাসক্তির কারণেই মানুষের মধ্যে পরকালের অসতর্কতা জন্মিয়া থাকে। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) বলিয়াছেন—"যে বস্তুকে তুমি ভালবাসিতে চাও, ভালবাস কিন্তু পরিণামে তাহা তোমা হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।"

দ্বিতীয়—অজ্ঞানতা। মানুষ অজ্ঞানতার জন্য দীর্ঘ জীবনের আশা করে। যৌবনের উপর ভরসা করা বড়ই একটা নির্ব্বুদ্ধিতা। তোমরা কি দেখিতেছ না যে বহু লোক বৃদ্ধ হইবার অগ্রেই যৌবন কালে মরিয়া যাইতেছে? হাজার হাজার যুবক ও বালক প্রতি বৎসর মরিতেছে। প্রত্যেক শহর ও গ্রামে দেখা যায় বৃদ্ধের সংখ্যা যুবক ও বালক-সংখ্যা অপেক্ষা অল্প। ইহার অর্থ এই যে, অল্প লোকই বৃদ্ধ হইয়া মরিতে পায়। আর একটী ভুল এই যে, লোকে সুস্থাবস্থায় হঠাৎ-মৃত্যু অসম্ভব মনে করিয়া থাকে। হঠাৎ-মৃত্যু অসম্ভব কথা হইলেও হঠাৎ পীড়িত হওয়া অসম্ভব কথা নহে। সমস্ত পীড়াই হঠাৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুস্থ শরীরে হঠাৎ পীড়া আসিলে শরীর পীড়িত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সুস্থ ও সবল শরীরে মৃত্যু যদি অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাও তবে পীড়িত ও দুর্ব্বল শরীরে অসম্ভব বলিয়া কেমনে উড়াইয়া দিবে? যাহা হউক, এ কথাটী ধ্রুব বিশ্বাস করিয়া লও--মৃত্যু আমাদের সম্মুখে সূর্য্য সদৃশ, উহার প্রতাপ আমাদের উপর পতিত আছে। একথায় ইহা মনে করিও না যে মৃত্যু, ছায়ার ন্যায় আমাদের অগ্রে অগ্রে যাইতেছে। এবং ছায়াকে যেমন আমরা ধরিতে পারি না মৃত্যুকেও তদ্রূপ ধরিতে পারিব না। এরূপ তুলনা করিও না; বরং সূর্য্য-কিরণের ন্যায় মৃত্যু আমাদিগকে ঘেরিয়া আছে।

দীর্ঘ-জীবনাশার ঔষধ—পাঠক স্মরণ কর, যে কারণে রোগ উৎপন্ন হয় সেই কারণটী বিনাশ করিতে পারিলে রোগ অবশ্যই দূর হয়। দীর্ঘ জীবনাশা জন্মিবার কারণ তুমি বেশ চিনিয়াছ অতএব এখন সেই কারণ-বিনাশে তৎপর হও।

দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, যাহা দীর্ঘ জীবনাশার এক বৃহৎ কারণ, তাহা বিদূরণের ব্যবস্থা, 'বিনাশন পুস্তকে'র 'পঞ্চম পরিচ্ছেদে' লিখা গিয়াছে। তদনুসারে অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে চলিতে পারে। যাহা হউক, সংক্ষেপে কথা এই, যে ব্যক্তি দুনিয়ার পরিচয় পাইয়াছে সে কখনই দুনিয়ার প্রতি অনুরক্ত হইতে পারে না। দুনিয়ার সুখ ভোগ ও আরাম কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট দিনের জন্য অবধারিত। মৃত্যু আসিলেই সে সুখ ও সন্তোষ লোপ পায়।

এ কথা বিবেচনার মধ্যে না আসিলেও চতুর্দ্দিকে চক্ষের উপর দেখা যাইতেছে, দুনিয়া অশান্তিপূর্ণ। দুনিয়া কখনই অভাব ও বিপদ আপদ হইতে শূন্য নহে। এথায় কাহারও ভাগ্যে অবিমিশ্র সুখ মিলে না। আবার এ কথাও ভাবিয়া দেখ—পরকাল অনন্ত-দীর্ঘ এবং দুনিয়া নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। যে ব্যক্তি পরকালের দীর্ঘতা ও ইহ-জীবনের অল্পতা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে, সে ব্যক্তি বুঝিতে পারিবে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সুখ লইয়া অনন্ত পরকালের সুখ ত্যাগ করা, জাগরিত অবস্থায় লক্ষ 'দীনার' ত্যাগ করিয়া ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নে এক কপর্দ্দক প্রাপ্তি অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর। দুনিয়ার অবস্থাকে নিদ্রার সহিত তুলনা করা হয়। 'মানব নিদ্রিত অবস্থায় আছে যখন মরিবে তখন জাগিয়া উঠিবে।'

মানবের 'অজ্ঞানতা' যথার্থ **তফক্কোর** (সদ্‌ভাব-চিন্তন) ও পূর্ণ **'মারেফৎ"** হইতে ঘুচিতে পারে। (টীঃ ৪৬৭) যাহাহউক, সর্ব্ববিধ অজ্ঞানতা দূর এবং পূর্ণ 'মারেফৎ' লাভ করিবার সৌভাগ্য সকলের অদৃষ্টে না ঘটিলেও মানুষকে এতটুকু বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক যে—'মৃত্যু মানবের ক্ষমতাধীন নহে। উহা যখন তখন আসিতে পারে। তদ্‌ব্যতীত, যৌবন 'স্বাস্থ্য', বল বা অন্য কোন পদার্থের উপর মানব স্বীয় জীবনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ভরসা বান্ধিতে পারে না, আর ভরসা করিলেও সে সকল পদার্থ মৃত্যুকে ঠেকাইতে পারিবে না।'

দীর্ঘ জীবনাশার শ্রেণী ভেদ—পাঠক! জানিয়া রাখ—দীর্ঘ জীবন সম্বন্ধে মানবের আশার বহু পার্থক্য আছে। ১। কেহ চিরকাল দুনিয়াতে থাকিতে বাসনা করে। ইহার প্রমাণ এইযে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۚ

"তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ (এমন কি) হাজার বৎসর বাঁচিবার আশা করে।" (১ পারা। সূরা বকর। ১১ রোকূ।) অধিকাংশ লোক বৃদ্ধ হইবার আশা করে। ২। আবার কেহ এক বৎসরের অধিক বাঁচিতে চায় না সুতরাং আগামী বৎসরের জন্য কোন আয়োজন উদ্‌যোগ

টীকা—৪৬৭। অত্র গ্রন্থের 'পরিত্রাণ পুস্তকে' সপ্তম পরিচ্ছেদে 'তফক্কোরের' বিবরণ এবং 'দর্শন পুস্তকে' মারেফতের আলোচনা আছে। সবিশেষ জানিতে হইলে উহা দ্রষ্টব্য।

করে না। ৩। আবার কেহ এক দিনের অধিক জীবনাশা করে না, সুতরাং আগামী কল্যের আয়োজন করিতেও চায় না। মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী বলিয়াছেন—'আগামী কল্যের জন্য জীবিকা জমা করিও না। পরমায়ু অবশিষ্ট থাকিলে জীবিকাও অবশ্যই পাইবে। জীবন কল্য পর্য্যন্ত না থাকিলে অপরের জীবিকার জন্য কেন তুমি পরিশ্রম-কষ্ট ভোগ করিবে?" ৪। কোন কোন ব্যক্তি একটী নিশ্বাস ফেলিবার সময় পর্য্যন্ত বাঁচিবার আশা করিতে পারেন না। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) পলক পর্য্যন্ত বাঁচিবার আশা করিতে পারেন নাই। এই জন্য ওজু ভঙ্গ হইলে তিনি মনে করিতেন—জল হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই প্রাণ বাহির হইতে পারে এবং বিনা ওজুতে মরিতে হইবে এই ভয়ে তিনি ওজু ভঙ্গ হইবা মাত্র মৃত্তিকা দ্বারা 'তৈয়ম্মম' করিয়া লইতেন। ৫। আবার কোন কোন ব্যক্তি চক্ষের উপর মৃত্যুকে সর্ব্বদা দণ্ডায়মান দেখিতে পান। একদিন মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ﷺ) মহাত্মা 'মোজ'কে ঈমানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"কোন দ্রব্য হস্তগত হইলে আমার ভয় হয় মৃত্যু তখনই তাহা আমার হাত হইতে ছিনিয়া লইবে।" মহাত্মা আছ্ওয়াদ হাব্শী নমাজ পড়িবারকালে দক্ষিণে ও বামে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'আপনি কি দেখিতেছেন?' তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—'যম কোন্ পথে আসিতেছে তাহাই দেখিতেছি।'

ফল কথা, দীর্ঘ বা হ্রস্ব জীবনের সম্বন্ধে আশা লইয়া মানুষের মধ্যে বহু শ্রেণী-ভেদ ঘটিয়াছে। যে ব্যক্তি এক মাসের অধিক বাঁচিবার আশা না রাখে সে ব্যক্তি চল্লিশ দিন বাঁচিবার আশাধারী ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম। এই উভয় শ্রেণীর লোকের কার্য্য ও ব্যবহার মধ্যে তদ্রূপ দীর্ঘাশার প্রভাব, সুস্পষ্ট দেখা যায়। দেখ—এক ব্যক্তির দুই ভ্রাতা বিদেশে আছে, তন্মধ্যে একজন এক মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে বলিয়া জানা গিয়াছে এবং অপর ভ্রাতা এক বৎসর পরে আসিবে। এমন স্থলে যে ভ্রাতা এক মাসের মধ্যে আসিবে তাহার অভ্যর্থনার জন্য উদ্যোগ আয়োজন অবশ্যই অগ্রে করা হয় এবং যে ভ্রাতা বৎসরান্তে আসিবে তাহার জন্য আয়োজনে নিশ্চয় বিলম্ব করা হইবে।

আসন্ন-মৃত্যুর জন্য আয়োজন কর—প্রস্তুত হও। যাহা হউক, যাহার মনে যমের সহিত শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবার ভয় আছে সে ব্যক্তি মৃত্যুর আয়োজনার্থ শীঘ্র শীঘ্র সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিতে তৎপর থাকে। তদ্রূপ

ব্যক্তি এক মুহূর্ত্ত অধিক জীবিত থাকিতে পাইলে মহা সুযোগ মনে করে এবং সেই মুহূর্ত্তের পূরা সদ্ব্যবহার করা লয়। ১। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) বলিয়াছেন—"পাঁচ ব্যাপার অন্য পাঁচ ব্যাপারের অগ্রে পাইলে সদ্ব্যবহারের মহা সুযোগ মনে করা উচিত। বার্দ্ধক্য আসিবার অগ্রে যৌবনের সদ্ব্যবহার; রোগ আসিবার পূর্ব্বে স্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার; অভাব ঘটিবার পূর্ব্বে সঙ্গতির সদ্ব্যবহার, কর্ম্ম ব্যাপৃতির পূর্ব্বে অবসর-কালের সদ্ব্যবহার; মৃত্যু আসিবার পূর্ব্বে জীবনের সদ্ব্যবহার।" ২। তিনি আরও বলিয়াছেন—"স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছলতা এই দুইটী 'নেআমৎ' (সম্পদ) এই ধরণের যে তাহা প্রাপ্ত হইলে অধিকাংশ স্থলে মানব ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে।" ৩। ছাহাবাগণের মধ্যে কাহারও মনে সংসার-মোহের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) তখনই তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে বলিতেন—"মৃত্যু আসিতেছে কাহারও জন্য সৌভাগ্য আনিতেছে, কাহারও জন্য দুর্ভাগ্য।"

—হদীছ বচন

১। মহাত্মা হোজায়ফা বলিয়াছেন—প্রত্যহ প্রাতে 'প্রস্থান! প্রস্থান!' বলিয়া আকাশবাণী হয়। ২। মহাত্মা দাউদ তাঈকে ঊর্দ্ধশ্বাসে নমাজের দিকে দৌড়িতে দেখিয়া লোকে দৌড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন—"নগর-দ্বারে সৈন্য সকল আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে সঙ্গে না লইয়া তাহারা প্রস্থান করিবে না।" অর্থাৎ নগর প্রান্তে কবর স্থানে মৃত ব্যক্তি, জীবিত লোকের প্রতীক্ষা করিতেছে। জীবিত লোক সমস্তই মরিয়া গেলে "কেয়ামৎ" (পুনরুত্থান) হইবে। ৩। মহাত্মা আবু মুছা আশআরী মহোদয় বৃদ্ধ বয়সে চরিত্রোন্নতির নিমিত্ত ঘোরতর পরিশ্রম সহকারে 'রেয়াজৎ' সাধনা) করিতে আরম্ভ করেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তত কঠিন পরিশ্রম না করিলে ক্ষতি কি? উত্তরে তিনি বলেন—"দেখ, ঘোড়দৌড়ের মাঠে অশ্ব গুলি দৌড় আরম্ভ করিলে মাঠের শেষ ভাগে গিয়া শরীরের সমস্ত বল প্রয়োগ পূর্ব্বক প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হয়। এখন আমার বয়সের শেষ—জীবন-প্রান্তরের শেষ প্রান্তে আসিয়াছি। মৃত্যু-রূপ লক্ষ্য-স্থান নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এখন রেয়াজৎ (সাধনা) করিতে পরিশ্রমের কোন অংশে ত্রুটী করা কর্ত্তব্য নহে। আপ্রাণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করা আবশ্যক।"

—মহাজন উক্তি

জীবন-গ্রন্থি-ছিন্ন-কালে মৃত্যু-যন্ত্রণা—পাঠক! জানিয়া রাখ—মৃত্যু-কালে, অন্য কোন পারলৌকিক ক্ষতি না ঘটিয়া কেবল যদি জীবনগ্রন্থি ছিঁড়িয়া যাওয়ার যন্ত্রণা পাইতে হইত তবেও সেই যন্ত্রণার কথা স্মরণ করিলে দুনিয়ার সমস্ত সুখ সন্তোষ বিস্বাদ হইয়া পড়িত। যদি এই ভয় হয় যে কোন দুর্দ্ধর্ষ সিপাহী কোন গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করিয়া লৌহ-দণ্ডের আঘাতে তাহার শরীরের অস্থি মাংস চূর্ণ বিচূর্ণ করতঃ হত্যা করিবে তবে সে গৃহস্থ কখনই আহার নিদ্রায় মনোযোগ দিতে পারে না। সিপাহীর আগমন এবং লৌহ দণ্ডাঘাতে হত্যা-করণ ধ্রুব সত্য না হইলেও সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া গৃহস্থ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া থাকে কিন্তু যমের আগমন এবং জীবন-গ্রন্থি ছিঁড়িয়া প্রাণ বাহির-করণ ধ্রুব সত্য। এই নিশ্চিত কষ্ট সিপাহীর সম্ভাবিত দণ্ডাঘাত অপেক্ষা ভীষণতর যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু মানুষ মোহ-ভ্রমে পতিত আছে বলিয়া সে ভয় হৃদয় পর্য্যন্ত প্রবেশ করে না। সকল দেশের সমস্ত জ্ঞানী লোক একবাক্যে বলিয়াছেন যে 'জীবনগ্রন্থি' ছিঁড়িবার কালে যে কষ্ট জন্মে তাহা তলওয়ার দ্বারা টুকরা টুকরা হইবার কষ্ট অপেক্ষা কঠিনতর। তল্‌ওয়ার যে স্থানে প্রবেশ করে তথাকার চর্ম্ম মাংসাদি কর্ত্তিত হইয়া বিভক্ত হইয়া পড়ে সুতরাং তথাকার জীবনীশক্তি ও স্পর্শ-শক্তি কেবল সেই দুঃখ ও কষ্ট অনুভব করে। কিন্তু অগ্নি দ্বারা শরীরের কোন অংশ দগ্ধ হইলে তাহার সন্তাপ সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত ও পরিব্যাপ্ত হয়। এই জন্য তল্‌ওয়ারের আঘাত অপেক্ষা অগ্নি দ্বারা দহনে অধিক কষ্ট জন্মে। প্রাণ বা জীবনী শক্তি শরীরের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে। সেই প্রাণ ছিঁড়িয়া বাহির করিতে গেলে তাহার প্রভাব বা চোট দেহের সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া পড়ে, সুতরাং তদুৎপন্ন যন্ত্রণাও দেহের সকল অংশে সমান ভাবে উৎপন্ন হয় এবং সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৎপ্রভাবে অবশ হইয়া পড়ে—হস্ত পদ যেমন নড়িতে পারে না বাক্‌যন্ত্রও তদ্রূপ চলিতে পারেনা—নীরব থাকে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও তদ্রূপ অবস্থা ঘটে। বুদ্ধিও স্বাভাবিক অবস্থা হারায়।

মৃত্যু যন্ত্রণা সম্বন্ধে হদীছ ও মহাজন উক্তি—মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা মুমূর্ষু ব্যক্তি ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারে না, কেবল নবীগণ অলৌকিক জ্ঞান-প্রভাবে তাহা জানিতে পারিয়াছেন। * * * ১। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল স্বয়ং মৃত্যু-শয্যায় এই প্রার্থনা করিতেছিলেন—

اللهم هون على محمد سكرات الموت

"হে আল্লা! মোহম্মদের উপর মৃত্যু-যন্ত্রণা সহজ কর।
—হদীছ বচন

২। মহা-মাননীয়া বিবী আয়শা ছিদ্দীকা বলিয়াছেন—"দেহ হইতে জীবন বিচ্ছিন্ন হইবার সময়ে যন্ত্রণা কিছু কমিতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। কেননা মহা-নবী হজরৎ রচুল এর দেহ হইতে জীবন বহির্গত হইবার সময়ে মৃত্যু-যন্ত্রণা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সেই সময়ে তিনি বলিতেছিলেন—"হে আল্লা! শিরা ও অস্থিখণ্ডের অভ্যন্তর হইতে তুমি জীবনী-শক্তি টানিয়া বাহির করিতেছ—এই যন্ত্রণা আমার উপর কিছু সহজ কর।" ৩। তিনি মৃত্যু-যাতনা ও কষ্টের অবস্থা বর্ণনা করিবার কালে বলিয়াছেন—"তল্‌ওয়ার দ্বারা ক্রমাগত তিন শত আঘাত করিতে থাকিলে যেরূপ যন্ত্রণা হয় মৃত্যু-যাতনাও তদ্রূপ।" ৪। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—"যে মৃত্যু সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও অল্প যন্ত্রণাদায়ক তাহাতেও যেরূপ কষ্ট উপস্থিত হয় তাহাও গোক্ষুর কাঁটার ন্যায় 'তিন কালা' লোহার কাঁটা চক্ষুর মধ্যে গভীর ভাবে ফুটাইয়া টানাটানি কালে উৎপন্ন কষ্টের সমান।" (টীঃ ৪৬৮) ৫। একজন রোগী মৃত্যু শয্যায় যাতনা পাইতেছিল। এমন সময়ে মহাপুরুষ হজরৎ রচুল তথায় শুভাগমন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"ইহার যন্ত্রণা আমি দেখিতে পাইতেছি—ইহার শরীরের প্রত্যেক শিরা, ধমনী ও স্নায়ুসূত্র পৃথক পৃথক ভাবে যাতনা ভোগ করিতেছে।" ৬। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—"হঠাৎ-মৃত্যু মুছলমানের পক্ষে আরাম এবং কাফেরগণের পক্ষে ক্ষোভ।"

টীকা—৪৬৮। মূল গ্রন্থে 'খছক' শব্দ লিখা আছে তাহার দুই অর্থ (১) গোক্ষুর কাঁটা নামক বিখ্যাত 'তিন কাঁটা' ঔষধজাত দ্রব্য। (২) তদাকারে গঠিত লোহ কণ্টক। ইহা পদাতিক শত্রু সৈন্যের পদে বিদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিবার অভিপ্রায়ে পথে নিক্ষিপ্ত হইত। কিন্তু ইহা শরীরের কোন অঙ্গে ফুটিলে ও টানাটানি করিলে কঠিন যাতনা হয় তাহা লইয়া গোল বাধিয়াছে। কোন পুস্তকে 'পশম' লিখিত আছে। অন্য পুস্তকে অন্য কিছু আছে। কিন্তু সে সকল শব্দ লইলে অর্থ বাহির হয় না। তজ্জন্যই বোধ হয় কিমিয়ার উর্দ্দু অনুবাদক উহাকে লৌহ-কণ্টক বিবেচনা করিয়া পদে ফুটানের কথা স্বীয় অনুবাদে গ্রহণ করিয়াছেন। পদতল স্থূল চর্ম্মে আচ্ছাদিত তথায় ফুটিলে কষ্ট হইলেও নিতান্ত সামান্য হইতে পারে। আমরা 'পশম' শব্দকে কলমের বানান ভুল মনে করিয়া 'চশম' চক্ষু ধরিয়া লইলাম। অতিরিক্ত স্বাধীনতা পাইলে আমরা "চক্ষে বড়শী ফুটাইয়া টানাটানির কথা" লিখিতাম কিন্তু মহাপুরুষ হজরৎ রচুল এর বাক্য বলিয়া অসত্য সংযোগের ভয়ে তত স্বাধীনতায় ক্ষান্ত রহিলাম। পাঠকগণ নিজে নিজে ঐরূপ একটা সাদৃশ্য অনুমান করিবেন।

৭। উক্ত গ্রন্থে আরও কথিত হইয়াছে—"মহাত্মা হজরৎ মুছা নবীর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"মৃত্যু-যাতনা কি প্রকার দেখিতে পাইতেছ?" তিনি নিবেদন করিয়াছিলেন—"জীবিত পক্ষীকে, জলন্ত কটাহে ভাজিতে লাগিলে, সে উড়িয়া পলাইতে পারে না বা মরিয়া, যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না; সে তখন যেরূপ যাতনা পায় মৃত্যু-যাতনা তদ্রূপ বুঝিতে পারিতেছি। (টীঃ ৪৬৯)

১। মহাত্মা হজরৎ ঈছা নবী স্বীয় সঙ্গী 'হাওয়ারীন'দিগকে বলিয়াছিলেন—"হে বন্ধুগণ! তোমরা আল্লার স্থানে প্রার্থনা কর যেন তিনি আমার উপর মৃত্যু-যন্ত্রণা সহজ করেন। মৃত্যু-যন্ত্রণা কিরূপ কঠিন ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া সেই ভয়ে আমি জীবন্মৃত হইয়া আছি।"

– মহাজন উক্তি

(টীঃ ৪৭০) ২। মহাত্মা আলী করমুল্লা বলিয়াছেন—"হে মুছলমান ভ্রাতৃগণ! কাফেরগণের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে তাহাদের তলওয়ারে কাটা পড়িয়া মারা যাও; কেননা মৃত্যু-শয্যায় থাকিয়া যাতনা ভোগ করা অপেক্ষা হাজার হাজার তল্ওয়ারের আঘাত-জনিত মৃত্যুকে আমি অধিক সুখকর মনে করি।" ৩। বনী এছরায়েল সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক একদিন কোন গোরস্থানে গিয়া আল্লার দরবারে প্রার্থনা সহকারে বলিয়াছিল—"হে বিশ্বপতি! এই মৃতগণের একজনকে জীবিত করিয়া তোল।" মহাপ্রভু তাহাদের প্রার্থনা পূরণ করিয়া একজনকে জীবিত ও উত্থাপিত করিয়া দিলেন। সে ব্যক্তি বলিতে লাগিল—"হে ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা আমার নিকট কি চাও? আমি পঞ্চাশ বৎসর হইতে মরিয়াছি কিন্তু মৃত্যু-কালে যে কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি তাহার তেজ অদ্যাবধি ঠাণ্ডা হয় নাই—সেই যন্ত্রণা সামলাইয়া অদ্যাবধি প্রকৃতিস্থ হইতে পারি নাই।" ৪। একজন প্রধান ছাহাবা বলিয়াছেন—"মুছলমানের মধ্যে যাঁহারা 'রেয়াজৎ' (সাধনা) ও মদজুহাদের কল্যাণে যে উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহাদের উপর করুণাময় দয়া করিয়া মৃত্যু-যাতনা কঠিন করতঃ তৎপ্রভাবে তাঁহাদিগকে সৌভাগ্যের সেই উন্নত শিখরে টানিয়া লন—এবং কাফেরগণের মধ্যে যাঁহারা পৃথিবীতে কোন সৎকর্ম্ম করিয়া থাকে, মহাবিচারক

মুছলমান ও সদাচারী কাফেরের মৃত্যু-যন্ত্রণার পার্থক্য

টীকা—৪৬৯। ছয় নম্বরের এই হদীছ বচনটী মূল গ্রন্থে পরবর্ত্তী প্যারার তারকা চিহ্নিত স্থানে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা হইল।

টীকা—৪৭০। এই প্যারার প্রথম হইতে টীকা চিহ্ন পর্য্যন্ত অংশটী মূল গ্রন্থে পূর্ব্ববর্ত্তী প্যারার তারকা চিহ্নিত স্থানে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা হইল।

আল্লা সেই সৎকার্য্যের বিনিময়ে, মৃত্যুকালে তাহাদের প্রতি মৃত্যু-যাতনা লঘু করিয়া দেন, তদুপায়ে তাহাদের সৎকার্য্যের প্রতিদান পৃথিবীতেই শোধ হইয়া যায়।" * * * ৫। মহাত্মা কাব-অল-আহবার একদিন মহাত্মা ওমর ফারুককে মৃত্যু-যাতনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"ঘন কণ্টকাকীর্ণ একটী শাখা উদরস্থ হইলে এবং তাহার প্রত্যেক কাঁটা দেহের প্রতি শিরা, ধমনী, রগ ও স্নায়ু-সূত্রে ফুটিয়া গেলে বলপূর্ব্বক সেই শাখা টানিয়া বাহির করিবার সময়ে যেরূপ কষ্ট হয় মৃত্যু-যাতনা তদ্রূপ।"

মৃত্যু যন্ত্রণা ভিন্ন মৃত্যুকালীন অন্যান্য ত্রিবিধ বিভীষিকা— পাঠক! জানিয়া লও, প্রাণ-বিচ্ছেদের সময় যে ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় তদ্ব্যতীত আরও তিনটি ভীষণ বিভীষিকা মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে। **প্রথম বিভীষিকা**—হজরৎ আজরায়েল বা যমের ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে - মহাত্মা হজরৎ এব্রাহীম নবী একদিন 'মালাকোল মওৎকে' (মৃত্যুরাজকে) বলিয়াছিলেন—"তুমি পাপীর প্রাণ হরণকালে যে মূর্ত্তি ধারণ কর আমাকে সেই মূর্ত্তি একবার দেখাও।" মৃত্যুরাজ (টীঃ ৪৭১) বলিয়াছিলেন—"আপনি সে ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিবেন না। তথাপি নবী মহোদয় তদ্দর্শনে জেদ্ করিলে তিনি অগত্যা সেই মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। দেখা গেল এক দীর্ঘকায় স্থূলদেহ ভীষণাকার ব্যক্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান, শরীর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ,

পাপীর প্রাণ-হরণ-কালে মৃত্যুরাজের ভীষণ মূর্ত্তি

টীকা—৪৭১। 'আজরায়েল' নামক ফেরেশ্তার উপরে মানবের প্রাণ সংহারের ভার অর্পিত আছে। এই ফেরেশ্তার অপর নাম 'মালাকোল মওৎ' (আরবী 'মালাক' শব্দের অর্থ ফেরেশ্তা' Angel বা স্বর্গীয় দূত।) কি উপায়ে কোন সময়, কাহার প্রাণ সংহার করিতে হইবে তাহার বিস্তৃত আদেশ সহ এক বৎসরের যাবতীয় মৃত্যু-তালিকা তিনি শাবান চান্দের পনরই রজনীতে আল্লার নিকট হইতে পাইয়া থাকেন এবং সারা বৎসর ধরিয়া প্রাণ হরণ কালে তিনি এই ন্যস্ত আদেশ সুচারুরূপে পালন করিয়া থাকেন। প্রত্যেক 'ওহী' বা সংবাদ বহনের আদেশ 'জেবরায়েল্' ফেরেশ্তা যেমন আল্লার ইচ্ছামত সময়ে পাইয়া তাহা পালন করেন, তেমনই যদি 'মালাকোল্ মওৎ' প্রত্যেক মৃত্যুর সময় আল্লার নিকট হইতে মৃত্যুর আদেশ পাইয়া প্রাণ সংহার করিতে আসিতেন তবে 'মালাকোল্ মওৎ' অর্থে 'মৃত্যু-দূত' শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত বলা যাইতে পারিত। কিন্তু একই সময়ে অগণিত স্থানে অগণিত রকমের মৃত্যু, আজরায়েলের সুদক্ষ পরিচালনায় শৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ হইতেছে। তাঁহার উপর ন্যস্ত এই কার্য্যের গুরুত্ব, ব্যাপকতা, বৈচিত্র্যতা এবং নিয়মানুগ পরিসমাপ্তির নিপুণতা বিচারে 'মালাকোল্ মওৎ' অর্থে 'মৃত্যু-দূত' অপেক্ষা 'মৃত্যু-রাজ' শব্দই বোধ হয় মরহুম অনুবাদক সাহেব অধিক পছন্দ করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করা যায়। এই হিসাবে 'মৃত্যু-রাজ' অর্থে 'মালাকোল মওৎ'কে আল্লার অধীনে একজন সুদক্ষ মৃত্যু-নায়ক বা মৃত্যু-পরিচালক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। 'মৃত্যু-রাজ'

মস্তকে মোটামোটা কৃষ্ণকেশ কণ্টকবৎ উর্দ্ধদিকে উত্থিত, পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ; সধূম অগ্নি শিখা মুখ হইতে ঝলকে ঝলকে নির্গত হইতেছে—সেই ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি দর্শনে নবী মহোদয় হতজ্ঞান হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে মৃত্যুরাজও স্বীয় স্বাভাবিক আকার ধারণ করিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করতঃ বলিলেন—"ভাই মৃত্যু-রাজ! পাপী লোকদিগকে তোমার ঐ ভীষণ আকার প্রদর্শনই তাহাদের পক্ষে প্রচুর শাস্তি।" পাঠক! জানিয়া রাখ, পাপীলোক মৃত্যুরাজকে পূর্ব্বোক্তরূপ ভীষণ আকারে দর্শন করে। কিন্তু সাধু ধর্ম্মভীরু লোক তাঁহাকে মনোরম আকারে দর্শন করিয়া থাকে। সাধু লোকেরা যে সকল আরাম ভোগ করিতে পায় তাহা ছাড়িয়া দিলেও মৃত্যুরাজের সুন্দর ও মনোরম আকার দর্শনেই তাহাদের পুণ্যের প্রচুর পুরস্কার বলিতে হইবে।

সাধুর প্রাণ-হরণ-কালে মৃত্যুরাজের মনোরম মূর্ত্তি

প্রাণ-হরণে ক্ষিপ্রতা বা কষ্টদায়ক ধীরতা মৃত্যু-রাজের ইচ্ছাধীন নহে। মহাত্মা হজরৎ ছোলায়মান নবী একদিন মৃত্যুরাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তুমি লোকের প্রতি সমবিচার কর না কেন?—একজনের প্রাণ শীঘ্র খুলিয়া লও আবার অপরকে বহুক্ষণ 'তড়্‌পাইয়া তড়্‌পাইয়া' মারিয়া থাক।" ফেরেশ্‌তা মহোদয় বলিয়াছিলেন—"এ সম্বন্ধে আমার কোনই ক্ষমতা নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির নামের তালিকা আমাকে দেওয়া হয়। তাহাতে যে ধরণে প্রাণহরণের আদেশ লেখা থাকে আমি তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকি।

মৃত্যুরাজের নিকট বৎসরের মৃত্যু তালিকা। কোন এক ছাহাবা বলিয়াছেন—শাবান চাঁদের ১৫ই রজনীতে মৃত্যুরাজ এক তালিকা প্রাপ্ত হন; সেই তালিকায় বৎসরের মধ্যে যত লোক মরিবে তাহাদের নাম লিখিত থাকে। ঐ সকল লোকের মধ্যে কেহ তৎকালে দালান-কোঠা নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত আছে; কেহবা বিবাহের আনন্দোৎসবে মত্ত আছে; কেহবা ঝগড়া

শব্দে 'মালাকোল মওৎ'কে মৃত্যু ব্যাপারে রাজার ন্যায় অসীম ক্ষমতাশালী ও আল্লার সহিত সংশ্রবহীন স্বাধীন মনে করিবার কোনও কারণ নাই। কেন না বাঙ্গলা ভাষায় 'রাজ' শব্দের প্রয়োগে শুধু 'রাজা'ই বুঝায় না। রাজপথ, রাজদণ্ড, রাজহাঁস, রাজযোগ, 'রাজযক্ষ্মা, রাজঘোটক প্রভৃতি শব্দের অর্থই ইহার প্রমাণ।—(প্রকাশক।)

বিবাদে প্রমত্ত আছে; কেহবা মামলা মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছে। এরূপ লোকের নামও সেই মৃত্যু তালিকায় লিপীবদ্ধ থাকে।” (টীঃ ৪৭২)

মৃত্যুরাজের আবির্ভাব অপরিহার্য্য—তৎসম্বন্ধে মহাজন উক্তি।

মহাত্মা ওহাব মোনাব্বে একটি সুন্দর উপদেশ পূর্ণ কাহিনী বলিতেন। সেই কাহিনী এথাঁয় লেখা গেল। ১। কোন দেশে এক অতুল ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। তিনি একদা অশ্বারোহণে বায়ু সেবনে বহির্গত হইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। পরিচারকগণ পর্য্যটনোপযোগী পরিচ্ছদ উপস্থিত করিল। সে পোশাক পছন্দ হইল না। বহুমূল্য উৎকৃষ্ট পোশাক আনিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্যগণ তাহাই আনিল কিন্তু রাজার পছন্দ হইল না। সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল মণিমুক্তা খচিত বিচিত্র পরিচ্ছদ কয়েক প্রস্থ উপস্থিত করা হইল। রাজা তন্মধ্য হইতে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা মনোলোভা তাহাই স্বহস্তে বাছিয়া লইয়া পরিধান করতঃ মনের সাধে দেহ সাজাইলেন। অশ্বশালা হইতে অত্যুৎকৃষ্ট অশ্ব আনিতে আদেশ করিলেন—অশ্বপাল উৎকৃষ্ট ঘোটক উপস্থিত করিল। তাহা রাজার পছন্দ হইল না। তদপেক্ষা মহামূল্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘোটক মনোহর সাজ-সজ্জায় সাজাইয়া আনিতে আদেশ দিলেন। পরিচারকগণ শতাধিক পরমোৎকৃষ্ট অশ্ব মণি-মুক্তা-খচিত সাজে সজ্জিত করিয়া উপস্থিত করিল। রাজা তন্মধ্য হইতে মনোমত সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্ব বাছিয়া লইলেন ও অপূর্ব্ব পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া বিচিত্র অশ্বে আরোহন করিলেন। সৈন্যগণ অপূর্ব্ব সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া অতুল প্রতাপে মহা আড়ম্বরে দুর্গ হইতে বহির্গত হইল। রাজার দুই পার্শ্বে ও অগ্র পশ্চাৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। এই সমস্ত দেখিয়া রাজার হৃদয় অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিল। সাধারণ লোকের দিকে দৃষ্টি পাত করিতেও ঘৃণা বোধ করিতে লাগিলেন। ‘নকীব’গণ রাজার যশোগানে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। চোবদার রাজার প্রস্থান জ্ঞাপন করতঃ উচ্চ কণ্ঠে ‘হঠ যাও’ বলিয়া হাঁক ছাড়িল। রাজার অশ্ব বায়ুবেগে উড়িবার মানসে সম্মুখের ক্ষুরদ্বয় শূন্যে উত্থিত করিল। এমন সময়ে কোথা হইতে এক দীন দরিদ্র ছিন্ন-বস্ত্র-পরিহিত অপরিচিত লোক রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অভিনন্দন ও অভিবাদন পূর্ব্বক বলিল—“মহারাজের জয় হউক। অধীন কিছু নিবেদন করিবার অভিপ্রায়ে এথায় আগমন করিয়াছে। দয়া করিয়া শুনিলে চরিতার্থ হইব।” রাজা

টীকা—৪৭২। এই প্যারাটী মূল গ্রন্থে পরবর্ত্তী দ্বিতীয় প্যারার শেষে তারকা চিহ্নিত স্থানে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা গেল।

অহঙ্কারে স্ফীত ও ক্রোধে অন্ধ হইয়া দরিদ্রকে প্রহার পূর্ব্বক তাড়াইয়া দিবার ইঙ্গিত করিলেন। দণ্ডধারী চোবদার দণ্ডহস্তে ধাবিত হইল। সৈন্যগণ তল্‌ওয়ার উত্তোলন করতঃ সেনাপতির মুখপানে চাহিল। কিন্তু সে দরিদ্রের বদন মণ্ডল হইতে এমন এক অলৌকিক সাহসের জ্যোতিঃ বহির্গত হইল যে অনুচর পার্শ্বচর সকলেই চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। স্বয়ং রাজা, অপরিচিতের সাহস দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। অপরিচিত দরিদ্র লোকটী সহসা রাজার অশ্ব-বল্‌গা ধারণ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। রাজা ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া পার্শ্বচরদিগকে দরিদ্রের ধৃষ্টতার শাস্তি দিতে আদেশ দিলেন কিন্তু সকলেই স্তম্ভিত; শাস্তি দিবে কে?' ইতিমধ্যে দরিদ্র সসম্মানে নরপতিকে অভিবাদন করতঃ বলিল—"মহারাজের জয় হউক, হুজুরের শ্রীচরণে আমার কিছু বক্তব্য আছে।" রাজা হতবুদ্ধির ন্যায় বলিলেন—'আচ্ছা আমি ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিলে তোমার কথা শুনিব।' ছদ্মবেশী-দরিদ্র অশ্ব-বল্‌গা পূর্ব্ববৎ হস্তে রাখিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—"মহারাজের জয়! তাহা হইবে না এখনই দয়া করিয়া শুনিতে হইবে।" রাজা বলিলেন—"আচ্ছা আমি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া শুনিতেছি।" দরিদ্র বলিল—"আজ্ঞা, তাহাও হইবে না। এই অবস্থাতেই শুনিতে হইবে।" রাজা মন্ত্র-মুগ্ধবৎ সম্মত হইলেন। "দরিদ্র, রাজার কাণে কাণে বলিল—'আমি, 'মালাকোল্ মওৎ'—মৃত্যুর রাজা। এখনই তোমার প্রাণ হরণ করিব।" শুনিবা মাত্র রাজার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল,—বদন মণ্ডলের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল; মুখে আর কথা সরিল না; অতি কষ্টে বলিলেন—'অল্প সময়ের অবসর দিউন আমি স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের নিকট হইতে বিদায় হইয়া আসি।'" মৃত্যু-রাজ বলিল—"তাহাও হইবে না।" ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ বাহির করিয়া লইলেন। রাজার দেহ অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইল। ২। মৃত্যু-রাজ তথা হইতে যাইয়া একজন দরিদ্র মুছলমানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বলিলেন—'একটি গুপ্ত কথা আপনাকে শুনাইতে চাই।' মুছলমান বলিলেন—'আচ্ছা বলুন।' যমরাজ কাণে কাণে বলিলেন—"আমি, 'মালাকোল মওৎ।'" মুছলমান নিতান্ত প্রীতির সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—'আসিতে আজ্ঞা হউক, আমি বহুদিন হইতে আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। এখনই আমাকে সঙ্গে লউন।' মৃত্যু-রাজ বলিলেন—'যে সকল প্রয়োজনীয় কাজ আপনার হাতে আছে তাহা অগ্রে সমাপ্ত করিয়া লউন।' মুছলমান বলিলেন—'মহাপ্রভুকে দর্শন করাই আমার

এখন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কাজ, তদপেক্ষা প্রয়োজনীয় কাজ আর নাই।" তখন মৃত্যু-রাজ বলিলেন—'যে ভাবে আপনার প্রাণ বাহির হওয়া বাঞ্ছনীয় সেই অবস্থা আপনি গ্রহণ করুন, আমি প্রাণ খুলিয়া লইতেছি।' মুছলমান বলিলেন--'তবে একটু বিলম্ব করুন; আমি প্রথমে ওজু করিয়া লই—পরে নমাজ আরম্ভ করি। যে সময়ে আমি স্বীয় মস্তক আল্লার সম্মুখে ভূতলে স্থাপন করিব, তখন আপনি আমার প্রাণ বাহির করিয়া লইবেন। 'মালাকোল মওৎ' তাহাই করিলেন।

৩। উক্ত মহাত্মা আরও একটী গল্প বলিতেন—কোন দেশে এক মহাবল পরাক্রান্ত বাদশা ছিলেন। ধরাতলে তাঁহার ন্যায় পরাক্রমশালী নরপতি তৎকালে আর ছিল না। 'মালাকোল মওৎ' তাঁহার প্রাণ হরণ করিয়া আকাশে উপস্থিত হইলে ফেরেশ্‌তাগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন--'হে মৃত্যু-রাজ! মানুষের প্রাণ হরণ করিবার সময়ে কখনও কি তোমার মনে দয়া জন্মিয়াছিল?' মৃত্যু-রাজ বলিলেন—হাঁ, একদিন একটী গর্ভবতী রমণী বিজন অরণ্যে অসহায় পতিত ছিল। তেমন সময়ে তাহার একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। ঠিক সেই সময়ে ঐ রমণীর প্রাণ হরণ করিতে আমার প্রতি আদেশ হয়। আদেশ প্রাপ্তি মাত্র তাহার জীবন শেষ করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই সদ্য-প্রসূত অসহায় সন্তানের দুরবস্থা দর্শনে আমার মনে দয়ার আবির্ভাব হইয়াছিল।' ফেরেশ্‌তা-গণ বলিলেন—'এই বাদশাকে তো তুমি ভূতলের সকল নরপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিয়াছ।' মৃত্যু-রাজ বলিলেন—'হাঁ, তাহাও দেখিয়াছি।' ফেরেশ্‌তা-গণ বলিলেন—'এই বাদশা, সেই শিশু, যাহাকে তুমি বিজন অরণ্যে অসহায় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলে।' মৃত্যু-রাজ চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার মুখ হইতে সহসা নির্গত হইল—"আল্লার পবিত্র নাম বিঘোষিত হউক, তিনি দয়ালু, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে—তিনি দয়া করিয়া থাকেন।" * * *

৪। মহাত্মা আমশ বলিয়াছেন—একদিন 'মালাকোল মওৎ' মহাত্মা হজরৎ ছোলায়মান নবীর দরবারে ছদ্মবেশে গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার এক অমাত্যের প্রতি তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। ছদ্ম-বেশী 'আজরাইল' সভা হইতে বাহির হইয়া গেলে, সেই অমাত্য, নবী মহোদয়কে আগন্তুকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারে যে তিনি 'মৃত্যু-রাজ'। তখন অমাত্যের মনে ভীষণ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। সে মনে করিল—হয়তো "আমার প্রাণ-হরণ বাসনায় আমার উপর মৃত্যু-রাজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবেন।"

অমাত্য নিতান্ত ভীত হইয়া নবী মহোদয়ের নিকট প্রার্থনা করিল—"আপনি বায়ুকে আদেশ করুন তিনি আমাকে পলকের মধ্যে হিন্দুস্থানের কোন নিভৃত পর্ব্বত কন্দরে লইয়া যান। আমি সেই সুদূরপর্ব্বত কন্দরে গেলে মৃত্যু-রাজ আমাকে খুঁজিয়া পাইবে না।" নবী মহোদয় বায়ুকে আদেশ করিবামাত্র অমাত্যকে পলকের মধ্যে হিন্দুস্থানের এক সুদূর পর্ব্বত-কন্দরে স্থাপন করিয়া গেল। কয়েক দিন পরে হজরৎ আজরাইল পুনরায় নবী মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি মৃত্যু-রাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'সে দিন আপনি অমুক অমাত্যের প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন কেন?' মৃত্যু-রাজ নিবেদন করিয়াছিলেন—'হিন্দুস্থানের অমুক পর্ব্বত কন্দরে, সেই দণ্ডে, তাহার প্রাণ হরণের আদেশ ছিল অথচ তাহাকে আপনার দরবারে উপস্থিত দেখিয়াছিলাম। তৎদণ্ডে কেমন করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহার প্রাণ লইব সেই চিন্তায় আমি অভিভূত হইয়াছিলাম। যাহা হউক, আমার প্রতি যে আদেশ ছিল তাহা প্রতিপালনার্থ আমি হিন্দুস্থানের সেই নিভৃত পর্ব্বত কন্দরে প্রবেশ করিয়া দেখি, তৎপূর্ব্বেই আপনার অমাত্য তথায় উপস্থিত আছে। ইহা আমার নিকট বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল।' যাহা হউক, এ স্থলে যে সকল কথা লেখা গেল তৎসমুদয় হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে—সকলের সঙ্গেই মৃত্যুর সাক্ষাৎ হইবে—মৃত্যু হইতে কেহই পলাইতে পারিবে না।

মৃত্যুকালীন দ্বিতীয় বিভীষিকা—পাপ-পুণ্য লিপিকারী ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের ভীষণ-মূর্ত্তি দর্শন। মৃত্যু সময়ে সেই ফেরেশ্‌তাদ্বয়কে স্বচক্ষে দেখিতে পাওয়া যাইবে। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—মৃত্যু সময়ে পাপ-পুণ্য-লিখক উভয় ফেরেশ্‌তা মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিকে ফেরেশ্‌তাদ্বয় বলিবেন—

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا

(আল্লা তোমাকে মঙ্গল দিয়া পুরস্কৃত করুন। আমাদের সম্মুখে তুমি সৎকার্য্য করিয়া আমাদিগকে বড় আরাম দিয়াছ।' কিন্তু পাপী লোককে সেই ফেরেশ্‌তাদ্বয় বলিবেন—

لَا جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا

('আল্লা তোমাকে মঙ্গল দিয়া পুরস্কৃত না করুন।) তুমি আমাদের চক্ষুর উপর বহু পাপ করিয়াছ। এই কথা শুনিলে পাপীর চক্ষু এমন ভাবে উর্দ্ধ দিকে খুলিয়া যাইবে যে তাহা আর বন্ধ হইবে না।"

মৃত্যুকালীন তৃতীয় বিভীষিকা—মৃত্যু সময়ে লোকে বেহেশ্‌ৎ কিম্বা দোজখের মধ্যে পরকালের বাসস্থান, দেখিতে পায়। মৃত্যু-রাজ, তখন পুণ্যাত্মা লোককে বেহেশ্‌তে তাহার বাসস্থান দেখাইয়া বলিতে থাকে—"হে আল্লার প্রিয় ব্যক্তি! তোমাকে খোশ-খবর শুনাইতেছি যে তুমি বেহেশ্‌তের মধ্যে মহা সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইবে।" অপর পক্ষে পাপীদিগকে দোজখের স্থান দেখাইয়া বলিতে থাকে-"হে আল্লার শত্রু! ঐ দেখ—দোজখ। উহার মধ্যে তোমাকে অতি শীঘ্র যাইতে হইবে।

তুলনায় পার্থিব বিভীষিকা নগণ্য। যাহা হউক, এই তিন প্রকার বিভীষিকা-দর্শনে যে কষ্ট উৎপন্ন হইবে তাহা মৃত্যু-যন্ত্রণার সহিত মিলিত হইয়া দ্বিগুণ প্রখর হইয়া উঠিবে। (হে আল্লা! মৃত্যুকালীন উভয় যন্ত্রণা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।) ইহকালে মানুষ যত বড় কঠিন বিভীষিকার সম্মুখে পড়ুক না কেন তৎসমুদয় কবরের বিভীষিকা এবং তৎ-পশ্চাতের বিভীষিকা অপেক্ষা নিতান্ত তুচ্ছ হইবে।

—মৃতদেহ কবরে স্থাপন মাত্র—

মৃত ব্যক্তির সহিত কবরের কথাবার্ত্তা—সত্যবাদী নবীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবী মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (দঃ) বলিয়াছেন—"মৃত ব্যক্তিকে কবরে স্থাপন করা মাত্র কবর বলিবে—"হে আদম-সন্তান! তুমি কি জন্য আমার কথা ভুলিয়াছিলে? তোমার জানা নাই যে আমি দুঃখ, কষ্ট, অন্ধকার ও নির্জ্জনতার গৃহ? আমার পেটে নানা কীট পূর্ণ আছে। এ কথা তুমি কেমনে ভুলিলে? আমার পার্শ্ব দিয়া যাইবার কালে কেন এত ভয় করিয়াছিলে--কেন এক ধাপ আগে, আবার এক ধাপ পাছে হাটিয়া ছিলে?" মৃতাত্মা সাধু ও ধার্ম্মিক হইলে তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন অলক্ষিত ব্যক্তি উত্তর দিবে---"হে কবর! তুমি কি বলিতেছ? এ ব্যক্তি নিজে সাধু সচ্চরিত্র ছিলেন; পরন্তু অপরকে সাধু হইতে পরামর্শ দিয়াছেন—সৎকর্ম্ম করিতে সকলকে উপদেশ দিয়াছেন এবং অপকর্ম্ম হইতে নিষেধ করিয়াছেন।" তখন কবর বলিবে—'আচ্ছা! তবে আমি এখন ইহার নিকট বেহেশ্‌তের উদ্যান রূপে পরিণত হইতেছি।' যাহা হউক, পরিশেষে মৃতব্যক্তির দেহ অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিবে, এবং তাহার আত্মা আকাশের দিকে উড়িয়া যাইবে। * * * মহাত্মা আব্দুল্লা এব্‌নে ওবায়েদ বলিয়াছেন—"মহাপুরুষ

হজরৎ রসূল (ﷺ) এর মুখে শুনা গিয়াছে যে—মৃত ব্যক্তিকে কবরে স্থাপন করিলে সে জীবিত লোকের পদধ্বনি শুনিতে পায় কিন্তু তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে পায় না, কেবল কবরের কথা শুনিতে পায়। কবর বলে—'হে মানব! লোকের মুখে আমার বিভীষিকার কথা কি শুন নাই? বহুবার শুনিয়াছ; তথাপি আমার নিকট আসিবার আয়োজন কর নাই কেন?''' (টীঃ ৪৭৩)

মৃত ব্যক্তির সহিত নিকটবর্ত্তী কবরস্থ মৃতাত্মার কথাবার্ত্তা— অন্য এক হদীছে উক্ত হইয়াছে—মৃত ব্যক্তিকে কবরে স্থাপন করিবামাত্র তাহার উপর শাস্তি আরম্ভ হয়। নিকটবর্ত্তী কবরস্থ মৃতাত্মা নব মৃতকে সম্বোধন করতঃ বলিতে থাকে—'ওগো! তোমরা তো আমাদের আসিবার বহু পরে আসিলে, কিছুদিন পৃথিবীতে থাকিতে পাইয়াছিলে—আমাদের পরিণামও স্বচক্ষে দেখিয়াছ তথাপি কেন সাবধান হইতে পার নাই? আমাদিগকে মরিতে দেখিয়া কি তোমরা বুঝিতে পার নাই যে আমাদের সৎকর্ম্ম করিবার সুযোগ ও ক্ষমতা বন্ধ হইয়াছে। আমাদের পর তোমরা তো সৎকর্ম্মের প্রচুর সময় পাইয়াছিলে! যে সৎকার্য্য আমাদের হাত হইতে ছুটিয়া গিয়াছিল তেমন কর্ম্ম তো তোমরা অবাধে এই অবসরে করিয়া লইতে পারিতে।' এই প্রকার তিরস্কার-ধ্বনি গোরস্থানের প্রত্যেক গর্ত্ত হইতে উত্থিত হইতে থাকিবে।

মৃতের সৎকার্য্য কর্ত্তৃক গোর আজাব রোধের চেষ্টা ও উক্তি। হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—সাধুলোক কবরে স্থাপিত হইবা মাত্র, সৎকার্য্য সমূহ তাহার চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া দাঁড়ায় এবং কবরের শাস্তি হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়। 'গোরআজাব' পায়ের দিক হইতে আসিতে থাকিলে নমাজ সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বাধা দেয় এবং বলিতে থাকে—'এ ব্যক্তি আল্লার নমাজে দণ্ডায়মান হইতেন।' শিওরের দিক হইতে শাস্তি আসিতে লাগিলে, রোজা বাধা দিয়া বলিতে লাগে—'পৃথিবীতে ইনি আল্লার জন্য প্রচণ্ড ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিয়াছেন। শরীরের পার্শ্ব হইতে শাস্তি আসিতে লাগিলে 'হজ ও জেহাদ' বলিতে থাকে—'ইনি আল্লার পথে সর্ব্বাঙ্গ খাটাইয়া পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করিয়াছেন।' হস্তের দিক হইতে শাস্তি আসিতে লাগিলে 'দান খয়রাৎ' সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বাধা প্রদান পূর্ব্বক বলিতে

টীকা- ৪৭৩। এই প্যারার তারকা চিহ্নিত স্থান হইতে শেষাংশটী মূলগ্রন্থে পরবর্ত্তী দ্বিতীয় প্যারার শেষে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা হইল।

থাকে—'হে শাস্তির ফেরেশ্‌তা! ক্ষান্ত হও; ইনি এই হস্তে আল্লার পথে বহু লোকের অভাব অনাটন ঘুচাইয়াছেন।' অতঃপর শান্তির ফেরেশ্‌তা মৃতাত্মাকে বলিতে থাকে—'তুমি সুখে থাক—তোমার মঙ্গল হউক।' তদনন্তর করুণার ফেরেশতা আগমন করতঃ তাহার জন্য কবর—মধ্যে বেহেশ্‌তী ফরশ্‌ বিছাইয়া দেন এবং কবরকে দৃষ্টি-সীমা পর্য্যন্ত বাড়াইয়া উহাকে বেহেশ্‌তের আলোক-মালায় উদ্‌ভাসিত করিয়া দেন। সেই আলোক পুনরুত্থানের দিন পর্য্যন্ত সমান ভাবে কবরকে প্রদীপ্ত রাখিবে। ***

—মৃতদেহ কবরে স্থাপন অন্তে—

মোনকের ও নকীর ফেরেশ্‌তার আগমন ও প্রশ্ন—মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (ﷺ) বলিয়াছেন—"মৃত ব্যক্তিকে কবরে স্থাপন করিলে তথায় দুই ফেরেশ্‌তা উপস্থিত হন। তাঁহাদের আকৃতি ঘোর কৃষ্ণ, চক্ষু নীল বর্ণ; একজনের নাম 'মোন্‌কের' দ্বিতীয়ের নাম 'নকীর'। পয়গম্বর সম্বন্ধে মৃত ব্যক্তির কিরূপ বিশ্বাস আছে তৎবিষয়ে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন। মৃত লোক মুছলমান হইলে তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত ধরণে উত্তর দিয়া থাকে—"পয়গম্বরগণ আল্লার দাস। মানব জাতিকে শিক্ষা দানের জন্য মধ্যে মধ্যে আল্লা তাঁহাদিগকে জগতে পাঠাইয়াছেন। আমি এই কথার সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লা একক এবং হজরৎ **মোহম্মদ** (ﷺ) তাঁহার দাস ও রসুল।" এই উত্তর শুনিলে কবর মৃত ব্যক্তির দৃষ্টিতে সহস্তর গজ লম্বা ও সহস্তর গজ চওড়া হইয়া যায়; এবং বেহেশ্‌তের আলোক-মালায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। তখন মৃত নর নারীকে বলা হয়—'তোমরা বিবাহ বাসরে নব বর-বধুর ন্যায় সুখে নিদ্রা যাও, তোমাদের সে সুখনিদ্রা কেয়ামৎ পর্য্যন্ত কেহ ভাঙ্গিতে পারিবে না। তবে তোমরা যাহাকে ভালবাস তাহাদের আগমনে অবশ্যই জাগিবে ও সঙ্গ-সুখ ভোগ করিতে পাইবে।' অপর পক্ষে, মৃতাত্মা মুছলমান না হইয়া কপটী মোনাফেক হইলে সে 'মোন্‌কের নকীরে'র প্রশ্নের উত্তরে বলিবে—'পয়গম্বর কি প্রকার পদার্থ তাহা আমি কিছুই জানিনা। লোকের মুখে শুনিয়াছি পয়গম্বরগণ, পৃথিবীতে যেন কি এক প্রকার অসম্ভব কথা বলিয়া বেড়াইতেন, আমিও সেই কথা শুনিয়াছিলাম এবং তদুত্তরে কি বলিতাম—এখন কিছুই

কবরে প্রকৃত মুছলমানের মৃতদেহের অবস্থা

কবরে মোনাফেকের মৃতদেহের অবস্থা

মনে নাই।' তখন কবরের মৃত্তিকাকে উভয় পার্শ্ব হইতে আসিয়া মৃতকে চাপিয়া ধরিতে আদেশ দেওয়া হইবে। আদেশ প্রাপ্তি মাত্র মৃত্তিকা মৃত ব্যক্তিকে এমন কঠিন ভাবে চাপিয়া ধরিবে যে তাহার অস্থি পঞ্জর প্রস্তরবৎ জমিয়া যাইবে এবং তদুপরি নানাবিধ শাস্তি আরম্ভ হইবে; সেই শাস্তি 'কেয়ামৎ' পর্য্যন্ত সমান ভাবে থাকিবে।

'মোনকের ও নকীর' ফেরেশ্‌তার আকৃতি—একদা মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) মহাত্মা ওমরকে বলিয়াছিলেন—'হে ওমর! তুমি যখন মরিবে, তখন তোমার আত্মীয় তোমাকে গোছল দিয়া—কাফন পরাইয়া চারি গজ দীর্ঘ ও সওয়া গজ প্রস্থ কবর মধ্যে প্রোথিত করতঃ সকলে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইবে। ওদিকে তোমার নিকট 'মোন্‌কের নকীর' ফেরেশ্‌তা আসিয়া উপস্থিত হইবে; তাহাদের কথা বজ্রধ্বনির তুল্য ভয়ঙ্কর; চক্ষু বিদ্যুতের ন্যায় ভীষণোজ্জ্বল; ঘন-কৃষ্ণ কেশ-পাশ পদ পর্য্যন্ত আলুলায়িত; লম্বা লম্বা তীক্ষ্ণ দন্ত-পংক্তি দ্বারা কবরের মৃত্তিকা খনন ও বিদারণ করিবে; কবর মধ্যে নামিয়া হস্ত দ্বারা তোমাকে হেলাইতে থাকিবে। বলতো তখন তোমার অবস্থা কেমন হইবে?' মহাত্মা ওমর তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে রসুলুল্লা! তখন আমার বুদ্ধি আমার সঙ্গে থাকিবে কি না?' তিনি বলিলেন—"তোমার বুদ্ধি প্রকৃতিস্থ থাকিবে।" মহাত্মা ওমর বলিলেন—'তবে আমার ভয় নাই—আমি তাহাদের প্রশ্নের সদুত্তর দিব।'

কবরের মধ্যে কাফেরের প্রতি প্রদত্ত শাস্তির বিবরণ—হদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে—"কবরের মধ্যে কাফেরের প্রতি শাস্তি দানের জন্য দুইজন ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত হইবেন; তাঁহারা উভয়ে অন্ধ ও বধির। উভয়ের হস্তে উষ্ট্রের-পান-পাত্র-'নান্দে'র ন্যায় স্থূল লৌহ-মুদ্গর থাকিবে। ফেরেশ্‌তাদ্বয় তদ্দ্বারা কেয়ামৎ পর্য্যন্ত অবিরাম প্রহার করিতে থাকিবে। শাস্তিদাতা উভয় ফেরেশ্‌তার চক্ষু নাই যে যাতনা দেখিয়া দয়া করিবে; আবার কর্ণ নাই যে তাহাদের ক্রন্দন ধ্বনি-শ্রবণে মন কিঞ্চিৎ নরম হইবে।" * * * মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) বলিয়াছেন—'কবরে কাফেরের প্রতি শাস্তি দিবার জন্য ৯৯টী বিষধর অজগর সর্প নিযুক্ত করা হইবে। তোমরা কি জান সেই অজগর সর্প কি প্রকার? প্রত্যেক অজগরের ৯৯টী করিয়া মস্তক

ও মুখ থাকিবে। উহারা একযোগে ৯৯ মুখ দিয়া কাফেরকে কেয়ামৎ পর্য্যন্ত দংশন করিতে থাকিবে। (টী: ৪৭৪)

প্রত্যেক ব্যক্তির উপর কবর-মৃত্তিকার চাপ—মহামান্নীয়া হজরৎ বিবী আয়শা ছিদ্দীকার মুখে শুনা গিয়াছে যে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ছাঃ) বলিয়াছেন—'কবর প্রত্যেক ব্যক্তিকে চাপিয়া ধরে; কোন ব্যক্তি কবরের চাপ হইতে বাঁচিতে পারিবে না; যদি কেহ বাঁচিতে পারিত তবে ছাদ এবনে মোআজ বাঁচিত।' মহাত্মা আনেছ বলিয়াছেন—"মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ছাঃ) এর প্রিয়তমা-দুহিতা হজরৎ বিবী জয়নব মানবলীলা সম্বরণ করিলে তাঁহাকে কবরস্থ করিবার কালে হজরতের বদন মণ্ডল ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছিল। পরে কন্যাকে কবরে রাখিয়া বাহির হইবার কালে তাঁহার বদন মণ্ডলের বর্ণ নিতান্ত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, দেখিয়া আমি নিবেদন করিয়াছিলাম--'হে রসুলুল্লা! কি কারণে আপনার অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল?" তিনি বলিয়াছিলেন—'কবরের চাপ ও তদন্তর্গত শাস্তির কথা স্মরণ হওয়াতে ভয়ে আমার শরীরের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরে যখন সংবাদ পাইলাম জয়নবের প্রতি কবরের শাস্তি ও চাপ আল্লা সহজ করিয়াছেন তখন আনন্দের চিহ্ন মুখে প্রকাশ পাইল।'" যাহা হউক, কবরে মৃত ব্যক্তিকে চাপিয়া ধরিবার সময়ে যে শব্দ হয় তাহা মানুষের কর্ণগোচর না হইলেও অন্য জীব জন্তু শুনিতে পায়।

কবরের শাস্তি পরকালের অধিক শাস্তির পরিচায়ক। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (ছাঃ) বলিয়াছেন—'কবর, পরলোক যাত্রার প্রথম ধাপ। এই ধাপ নিরাপদে পার হইতে পারিলে তৎপরবর্ত্তী পথ নিতান্ত সহজে চলিতে পারা যায়। যে ব্যক্তি কবর পার হইতে কষ্ট পায়, তাহাকে তৎপরবর্ত্তী পথ চলিতে আরও অধিক কষ্ট পাইতে হয়।'

—কবরে অবস্থান কাল অন্তে—

কবরের পরবর্ত্তী বিপদ—পাঠক! কবরের বিপদ বিভীষিকা পার হইবার পর যে সকল বিপদের সহিত সাক্ষাৎ হয় তাহাদের প্রথমটী প্রলয়ের শৃঙ্গ-ধ্বনি। তাহার পর হিসাবের জন্য জীবিতোত্থানের বিপদ; হিসাবের

টীকা--৪৭৪। এই প্যারার তারকা চিহ্নিত স্থান হইতে শেষাংটী মূলগ্রন্থে পরবর্ত্তী প্যারার শেষে ছিল। শৃঙ্খলার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন করা হইল।

দিনের দীর্ঘতা, প্রখর গ্রীষ্ম, পিপাসার যন্ত্রণা, সেই কঠিন সময়ে পাপ কার্য্যের জন্য প্রশ্ন, কার্য্যতালিকা দক্ষিণ হস্তে বা বাম হস্তে প্রাপ্তি; এবং কার্য্যের জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনা, তুলাদণ্ডে সৎকর্ম্মের সারত্ব ও অসারত্বের ওজন, পাপ পুণ্যের ওজন, হক্‌দার, পাওনাদার ও উৎপীড়িত লোকের ক্ষতিপূরণ করিবার দায়; পোলছেরাৎ পার হইবার বিভীষিকা, দোজখের ভীষণ যন্ত্রণা, শাস্তিদাতা ফেরেশ্‌তাগণের ভীষণ আকৃতি, ধিক্কারের 'তওক', অগ্নি-শৃঙ্খল, 'জকুম' নামক বিষবৃক্ষ, সর্প-বৃশ্চিকাদির দংশন, প্রভৃতি নানাবিধ শাস্তির বিভীষিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়।

দোজখের শাস্তি দুই প্রকার—(১) শারীরিক শাস্তি এবং (২) আধ্যাত্মিক শাস্তি। শারীরিক শাস্তির অবস্থা 'এহ্‌ইয়া-অল-উলুম' নামক গ্রন্থের শেষ ভাগে বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। তৎস্থানে উপযুক্ত যুক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষরূপে জানিতে বাসনা রাখেন তাঁহারা উক্ত গ্রন্থে দেখিতে পারেন। মৃত্যুর পরিচয়—মৃত্যু কি পদার্থ? এবং আত্মার পরিচয় উহা মৃত্যুর পর কি অবস্থায় থাকে? এ সব কথা 'দর্শন পুস্তকে' মোটামুটী বলা গিয়াছে। যাঁহারা আধ্যাত্মিক শাস্তির অবস্থা জানিতে চান তাঁহারা যেন 'দর্শন পুস্তকে' অনুসন্ধান করেন। শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শাস্তির কথা পুনরুক্তির ভয়ে লিখা গেল না। পবিত্রাত্মা সাধু লোক স্বপ্নে মৃত ব্যক্তির যে সকল অবস্থা জানিতে পারিয়াছেন সুধু তাহাই এ স্থলে প্রকাশ করিয়া আমরা গ্রন্থ সমাপ্ত করিব।

মৃতাত্মার অবস্থা পরোক্ষ দর্শনে অথবা স্বপ্নে ইহজগতে জানা সম্ভবপর। জীবিত লোক, জাগরিত অবস্থায় পরোক্ষ দর্শনে অথবা নিদ্রা-যোগে স্বপ্নে মৃতাত্মার অবস্থা জানিতে পারে বটে কিন্তু সে জ্ঞান এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে লব্ধ হয় না। তাহার কারণ এইযে মৃতাত্মা যে রাজ্যে গিয়াছে—সে রাজ্যের কোন দ্রব্যের উপর ইন্দ্রিয়ের অধিকার নাই। ইহলোকেই দেখ—গভীর অন্ধকারে চক্ষু দেখিতে পায় না, নির্ব্বাত স্থানে কর্ণ কিছুই শুনিতে পায় না, সেইরূপ এই ইন্দ্রিয়গুলি পরজগতে গিয়া কোন কাজ করিতে পারে না। আবার দেখ—এক ইন্দ্রিয়ের জ্ঞাতব্য বিষয়ের উপর অন্য ইন্দ্রিয়ের কোন অধিকার নাই। চক্ষু বর্ণ দেখিতে পায়—শব্দের সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারে না। কর্ণ শব্দ শুনিতে পায়—বর্ণ দেখিতে পারে না।

ইহজগতের পঞ্চেন্দ্রিয় পরজগতে অকর্ম্মণ্য ও পারলৌকিক সংবাদ লাভে অক্ষম

তদ্রূপ ইহ জগতের পঞ্চেন্দ্রিয়, পরজগতের কোন পদার্থই জানিতে পারে না। তথায় ইন্দ্রিয়গুলি একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়—কোনই কাজ করিতে পারে না।

মানবের ইন্দ্রিয়াতীত শক্তিবিশেষই পরজগতের ব্যাপার জানিতে সক্ষম। মানবের মধ্যে ইন্দ্রিয়াতীত এমন এক বিশেষ 'শক্তি বা পদার্থ' আছে তাহা পরজগতের ব্যাপার অবগত হইতে পারে। কিন্তু সেই 'পদার্থ বা শক্তি' ইহজগতে জীবিতকালে ইন্দ্রিয়াদির ব্যস্ততায় এবং সাংসারিক কর্ম্ম-ব্যাপৃতির কোলাহলে মাথা লুকাইয়া গুপ্তভাবে থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় মানব-মন কিছুক্ষণের জন্য কর্ম্ম-ব্যাপৃতি হইতে একটু অবসর পায় তখন মানবের সেই গুপ্ত শক্তি বা পদার্থ—মৃত ব্যক্তির আত্মার দিকে কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হয়, সুতরাং মৃতাত্মার অবস্থা মানবের নিকট স্বপ্নে প্রকাশ হইতে থাকে। মৃত ব্যক্তি যখন জীবিত ছিল, তখন সেই 'পদার্থ বা শক্তি' তাহার মধ্যেও 'গুপ্ত' ছিল। দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাহা 'ইন্দ্রিয়াদির ব্যস্ততা' এবং 'কর্ম্মব্যাপৃতির চাপ' হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত হয় সুতরাং মৃতাত্মাও জীবিত লোকের খবর পাইতে পারে—এমন কি আমাদের সৎকার্য্যের সংবাদ পাইয়া সন্তুষ্ট এবং পাপ কার্য্যের খবর পাইয়া দুঃখিত হইতে থাকে। এই মর্ম্মের কথা পবিত্র হদীছ শরীফে বহুবার উক্ত হইয়াছে।

—ইহা ইহজগতে কেবল নিদ্রিত অবস্থায় এবং মরণান্তে মুক্তাবস্থায় সম্পূর্ণ কার্য্যকরী

মৃত ও জীবিতের অবস্থা পরস্পরের নিকট গোচরীভূত হয়—লওহ্ মহ্ফুজের মধ্যবর্ত্তিতায়। যাহা হউক, প্রকৃত কথা এই—মৃতের অবস্থা জীবিত লোকের নিকট এবং জীবিত লোকের সংবাদ মৃতাত্মার নিকট কেবল 'লওহ মহ্ফুজ' (নিরাপদরক্ষিত ফলক) এর মধ্যবর্ত্তিতায় প্রকাশ পায়। আমাদের আদ্যন্ত অবস্থা এবং মৃতাত্মার সমস্ত অবস্থা 'লওহ্ মহ্ফুজে' অঙ্কিত আছে। নিদ্রিত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি শিথিল হয়—কর্ম্মব্যাপৃতি কমিয়া যায় সুতরাং জীবিত আত্মার পর্দ্দা কিঞ্চিৎ শিথিল হওয়াতে 'লওহ্ মহ্ফুজের দিকে তাহার সংযোগ কিছু পরিষ্কার হইয়া যায়। তখন 'লওহ্ মহ্ফুজ'-মধ্যস্থ মৃতাত্মার ছবী নিদ্রিত ব্যক্তির হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হয়। অপর পক্ষে মানব দেহত্যাগ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় লুপ্ত হয় সুতরাং কর্ম্ম-ব্যাপৃতিও সম্পূর্ণ ঘুচিয়া যায় তখন 'লওহ্ মহ্ফুজের' দিকে মৃতাত্মার সংযোগ-পথ নির্ম্মুক্ত হয়। এখন দেখ—নিদ্রাত্মার মুখ 'লওহ্ মহ্ফুজের' দিকে, আবার মৃতাত্মার মুখও সেই দিকে খুলিয়া যাওয়াতে 'লওহ্ মহ্ফুজের' মধ্য-

বর্ত্তিতায় মৃতাত্মার সংবাদ জীবিতাত্মায় এবং জীবিতাত্মার সংবাদ মৃতাত্মায় পরস্পর যাতায়াত করিতে থাকে।

লওহ্ মহ্ফুজ কি এবং কোন্ পদার্থের সদৃশ—'লওহ্ মহফুজকে' একখণ্ড চিত্রিত দর্পণের ন্যায় কল্পনা কর। তন্মধ্যে বিশ্ব জগতের সমস্ত পদার্থের চিত্র বর্ত্তমান আছে। মানুষের আত্মা—জীবিত লোকের আত্মাই হউক বা পরলোকগত মৃত লোকের আত্মাই হউক—চিত্রহীন দর্পণের তুল্য। চিত্রিত দর্পণের সম্মুখে, চিত্রহীন সাদা দর্পণ স্থাপিত হইলে যেমন সাদা দর্পণের মধ্যে চিত্রিত দর্পণস্থ ছবী প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ 'লওহ্ মহ্ফুজস্থ' ছবীগুলি জীবিত বা মৃত লোকের আত্মার মধ্যেও প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠক! 'লওহ্ মহফুজ' কোন্ পদার্থের সদৃশ ইহা জানিবার ইচ্ছা থাকিলে তুমি নিজের মধ্যে অনুসন্ধান কর। বিশ্ব সংসারস্থ সকল পদার্থের নমুনা মহাপ্রভু তোমার মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন; তজ্জন্যই সমস্ত পদার্থ চিনিতে তোমাদের অধিকার আছে। কিন্তু তোমরা নিজকে চিনিতে পরাঙ্মুখ রহিয়াছ। নিজকেই যখন চিনিতে পারিলে না তখন অন্যকে কেমন করিয়া চিনিতে পারিবে? দেখ—'লওহ্ মহফুজের' একটী নমুনা 'হাফেজ'গণের মস্তিষ্ক। তাঁহারা সমগ্র কোর্‌আন্ শরীফ স্মরণ করিয়া রাখেন। এমন কি সমগ্র কোর্‌আন তাঁহাদের মস্তিষ্ক মধ্যে এমন ভাবে চিত্রিত হইয়া থাকে, যে তাঁহারা প্রত্যেক পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা কেন, প্রতি ছত্র প্রতি অক্ষর তাঁহাদের মস্তিষ্কে অঙ্কিত দেখিতে পান। কোন ব্যক্তি 'হাফেজে'র মস্তিষ্ক উন্মোচন করিয়া পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলে উহাকে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাগে বিভাগ করতঃ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে থাকিলেও উহার মধ্যে কোর্‌আন বা অন্য কিছু লিখিত বা অঙ্কিত দেখিতে পাইবে না। যাহা হউক, বিশ্ব সংসারের সমস্ত ব্যাপার 'লওহ্ মহফুজে' লিখিত আছে, এ কথার অর্থ তোমরা ঐরূপ সাদৃশ্যে বুঝিয়া লইবে। 'লওহ্ মহফুজে' অনন্ত ব্যাপারের চিত্র লিখিত আছে। চক্ষু অসীম নহে—সসীম। সীমাবদ্ধ স্থানে অসীম অনন্ত ব্যাপারের চিত্র লিখিত হওয়া এই জড় জগতে অসম্ভব কথা, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে অসম্ভব নহে। আল্লা যেমন তোমার সদৃশ নহেন তদ্রূপ তাঁহার হস্ত, পদ, মুখ বা তাঁহার 'লওহ্' (তখ্‌তী) কলমাদি তোমার হস্ত পদাদির বা তোমার তখ্‌তী কলমের অনুরূপ নহে। যাহা হউক, এতক্ষণ ধরিয়া যাহা লিখা গেল তাহার উদ্দেশ্য এইযে, তুমি বুঝিতে পারিবে—আমাদের অবস্থা মৃতাত্মার

নিকট এবং তাহাদের সংবাদ আমাদের নিকট প্রকাশ পাইয়া থাকে। জীবিত লোক নিদ্রাযোগে মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে সুখের অবস্থায় বা কষ্টের মধ্যে দেখিতে পায়। সুখে দেখিলে মোটামুটী বুঝা যায়, সে ব্যক্তি পরকালে সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে কিন্তু কষ্টের মধ্যে দেখিলে বুঝিতে হইবে সে অসুখে ও কষ্টে আবদ্ধ আছে। মৃত লোকের আত্মা জীবিত থাকে। ইহা মনে করিও না যে মৃত্যু হইলেই মানবাত্মা একেবারে বিনাশ পাইল, বরং সুখেই হউক বা দুঃখেই হউক মৃত্যুর পরেও বর্ত্তমান থাকে। এই কথা আল্লা বলিতেছেন—

মৃত লোকের আত্মা অবিনশ্বর

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ط

فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط

"যাহারা আল্লার পথে হত হইয়াছে তাহাদিগকে মৃত বিবেচনা করিও না বরং জীবিত (মনে কর) তাহারা তাহাদের প্রভুর স্থানে জীবিকা পাইতেছে এবং আল্লা তাহাদিগকে দয়া করিয়া যাহা দান করিয়াছেন তাহাতে আনন্দিত আছে।" (৪ পারা। সুরা আল্ এমরান। ১৭ রোকূ)

স্বপ্নে পরিজ্ঞাত কতিপয় মৃতাত্মার অবস্থা বর্ণনা। (১) মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (ﷺ) বলিয়াছেন—'আমাকে যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়াছে সে যেন বাস্তবিক আমাকে জীবিত দর্শন করিল। কেননা শয়তান আমার আকার ধরিতে পারে না।" (২) মহাত্মা ওমর বলিয়াছেন—"আমি মহাপুরুষ হজরৎ **রসুল** (ﷺ) কে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম তিনি যেন আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আমি নিবেদন করিলাম—'হে রসুলুল্লা আমা হইতে কি ত্রুটী প্রকাশ পাইয়াছে?' তিনি বলিলেন—'রোজা রাখিয়া পত্নীর মুখ চুম্বন না করিয়া কি থাকিতে পার না?'" মহাত্মা ওমর আজীবন তদ্রূপ কার্য্য আর করেন নাই। যদিও তদ্রূপ কার্য্য হারাম নহে, তবে না করাই উত্তম। সাধারণ লোকের পক্ষে যে কার্য্য সঙ্গত, তাহা হইতেও ছিদ্দীক লোক দূরবর্ত্তী থাকেন। (৩) মহাত্মা

আব্বাছ বলিয়াছেন—"আমি মহাত্মা ওমর ফারুককে ভক্তি করিতাম, তিনিও আমাকে ভালবাসিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিবার আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এক বৎসর পরে স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম যে তিনি দুই হস্তের তালুদ্বারা চক্ষুদ্বয় ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—'এখন অবসর পাইলাম। আল্লা করীম (করুণাময়) ও রহীম (দয়াময়) না হইলে বড় বিপদে পড়িতাম।'" (৪) মহাত্মা আব্বাছ বলিয়াছেন—"'আমি স্বপ্নে আবু লহবকে দোজখের অগ্নি মধ্যে জ্বলিতে দেখিয়া তাঁহার অবস্থা কেমন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তিনি বলিয়াছিলেন—'সর্ব্বদা এইরূপ দোজখে পুড়িতেছি, কেবল সোমবারের রজনীতে অগ্নি-যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইয়া থাকি। ঐ রজনীতে মহাপুরুষ হজরৎ রস্থল (ﷺ) এর জন্ম হয়—সেই সংবাদ শুনিয়া আমি এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলাম যে একজন গোলামকে স্বাধীনতা দিয়াছিলাম—সেই কারণে সোমবারের রজনীতে আমি আরামে থাকিতে পাই।'" (৫) খলীফা ওমর এব্নে আবদুল আজীজ বলিয়াছেন "আমি স্বপ্নে মহাপুরুষ হজরৎ রস্থল (ﷺ) কে হজরৎ আবুবকর ও হজরৎ ওমরের সঙ্গে একত্র উপবিষ্ট দেখিয়া আমি তাঁহাদের নিকটে বসিয়াছিলাম। হঠাৎ হজরৎ আলী ও হজরৎ মোবীয়াকে তথায় উপস্থিত হইতে দেখিলাম। তাঁহারা দুইজন এক গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। পরক্ষণেই দেখিলাম হজরৎ আলী গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন—'আল্লার শপথ, আমার হক সাব্যস্থ হইল।' তাহার কিছুক্ষণ পরে হজরৎ মোবীয়া গৃহ হইতে সত্বর নিক্রান্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন—'আল্লার শপথ, আমি ক্ষমা পাইয়াছি।' (৬) হজরৎ ইমাম হোছেন শহীদ হইবার অগ্রে একদা রজনীযোগে মহাত্মা এব্নে আব্বাছ নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া—

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"নিশ্চয়ই (আমরা) আল্লার জন্য প্রস্তুত এবং নিশ্চয়ই তাঁহার দিকে সকলের প্রত্যাবর্ত্তন।" (টীঃ ৪৭৫) পাঠ করিতে থাকেন। পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—ব্যাপারটা কি? তিনি বলিয়াছিলেন—'দুরাত্মা লোকেরা

টীকা—৪৭৫। মুছলমান লোক মৃত্যু বা বিপদ দেখিলে বা শুনিলে উক্ত আয়াৎ—'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন—পাঠ করেন।

হজরৎ হোছেনকে হত্যা করিয়াছে।' তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি কি প্রকারে জানিতে পারিলেন?' তিনি বলিলেন—'আমি মহাপুরুষ হজরৎ রসুল [ﷺ] কে দেখিলাম তাঁহার নিকটে শোণিতপূর্ণ এক শিশী আছে। তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'দেখ, আমার ওম্মত আমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিল! তাহারা আমার সন্তান হোছেনকে কাটিয়া ফেলিল! এই শিশীর মধ্যে তাঁহার এবং তৎসঙ্গীগণের শোণিত আছে। বিচারের জন্য আল্লার দরবারে লইয়া যাইতেছি।' এই স্বপ্নের চব্বিশ দিন পরে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে বাস্তবিক হজরৎ ইমাম হোছেনকে জালেম লোকেরা হত্যা করিয়াছে। (৭) কোন ব্যক্তি মহাত্মা আবুবকর ছিদ্দীককে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'আপনি সর্ব্বদা স্বীয় জিহ্বার দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া বলিতেন—এই মাংসের টুক্‌রা আমার উপর কঠিন কঠিন কার্য্যের ভার চাপাইয়াছে। তদুত্তরে তিনি বলিলেন—"হাঁ এই টুক্‌রা দ্বারা "লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্ ('আল্লা ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই') এই কাল্‌মা পড়িয়াছি। তদ্‌বিনিময়ে আল্লা বেহেশ্‌ৎ আমার সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন।" (৮) মহাত্মা ইয়ুছোফ এব্‌নোল্ হোছেনকে কেহ স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'আল্লা আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিলেন?' তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—'আমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন।' সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'কোন্ সৎকার্য্যের জন্য?' তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—'সত্য কথা আমি কখনও হাসীতামাসার সঙ্গে মিলাই নাই।' (৯) মহাত্মা মনুছুর এব্‌নে এছমাইল বলিয়াছেন—"আমি একদা মহাত্মা আবদুল্লা বস্ত্র বিক্রেতাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আল্লা তাঁহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? তিনি বলিয়াছিলেন—'যে সকল পাপ আমি স্বীকার করিয়াছিলাম করুণাময় তৎসমুদয় আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। কিন্তু একটী পাপ স্বীকার করিতে আমার বড় লজ্জা হইয়াছিল। মহাপ্রভু তজ্জন্য উত্তাপের মধ্যে আমাকে দাঁড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমার শরীর হইতে এত ঘর্ম্ম বাহির হইতে লাগিল যে বদন মণ্ডলের মাংস সমস্ত গলিয়া পড়িল।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'সে পাপটী কি প্রকার ছিল?' তিনি বলিলেন—'আমি একদিন এক বালককে দেখিয়া তাহাকে বড় ভালবাসিয়াছিলাম। আল্লার সৌন্দর্য্যের দিকে মন না দিয়া বালকের সৌন্দর্য্যের দিকে মন দিয়াছিলাম এই অপরাধ মহাপ্রভুর সম্মুখে স্বীকার করিতে আমার বড় লজ্জা হইয়াছিল।'"

(১০) মহাত্মা আবু জাফর ছন্দগানী বলিয়াছেন—"আমি একদা স্বপ্নে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) কে কতকগুলি ছুফী লোকের সঙ্গে একত্র উপবিষ্ট দেখিয়াছিলাম ; ইতি মধ্যে আকাশ হইতে দুইজন ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হইলেন, একের হস্তে আফ্‌তাবা (বদ্‌না), অপরের হস্তে তশ্‌ৎ (চিলিম্‌চী) ছিল। তাঁহারা আসিয়া প্রথমে হজরতের পবিত্র হস্ত ধোওয়াইয়া দিলেন। পশ্চাৎ ছুফীগণও স্ব স্ব হস্ত ধুইলেন। অবশেষে ফেরেশ্‌তাদ্বয় আমার সম্মুখে বদ্‌না ও তশ্‌ৎ রাখিলেন। আমি হস্ত ধুইবার ইচ্ছা করিতেছি, ইতিমধ্যে কেহ আমার হস্তে জল ঢালিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন—'এ ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহে।" আমি হতাশ মনে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) এর সমীপে নিবেদন করিলাম—'হে রসুলুল্লা ! আমি আপনার পবিত্র হদীছে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়কে ভালবাসে, সে ব্যক্তি সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। আমি এই সম্প্রদায়কে হৃদয়ের সহিত ভালবাসি।' আমার কথা শুনিয়া হজরৎ আমাকে ছুফী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সাব্যস্থ করিয়া আমার হস্ত ধোওয়াইয়া দিতে অনুমতি করিলেন।" (১১) কোন ব্যক্তি মোজমী নামক এক সাধু দরবেশকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'আপনি পরলোকে কি দেখিলেন ?" তিনি বলিলেন—"পরহেজগার (বৈরাগ্যাবলম্বী) লোক ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল হস্তগত করিল।" (১২) অন্য একজন লোক মহাত্মা জারারাহ এব্‌নে আবু উফী মহোদয়কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'কোন্‌ কার্য্য আপনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গলকর দেখিলেন ?' তিনি বলিয়াছিলেন—"আল্লার কার্য্যে সন্তুষ্ট থাকা' এবং 'আশা খাটো করা' এই দুটী সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলদায়ক দেখিলাম।" (১৩) মহাত্মা ইয়াজেদ এব্‌নে মজ্‌উর বলিয়াছেন—"আমি মহাত্মা আজরাঈ রহমতুল্লাকে স্বপ্নে দেখিয়া বলিয়াছিলাম—'যে সৎকার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গলকর তাহা দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিউন, আমি তাহার অনুষ্ঠান করিয়া আল্লার প্রিয়পাত্র হইব।' তিনি বলিয়াছিলেন—'জ্ঞানী আলেমের মর্য্যাদা অপেক্ষা উন্নত মর্য্যাদা আমি দেখিতে পাই নাই ; তাঁহাদের গৌরবের নীচে শোক-দুঃখ ভারাক্রান্ত লোকের সম্মান দেখিয়াছি।'" ইয়াজেদ একজন বিখ্যাত সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন ; ঐ স্বপ্ন দর্শনের পর হইতে তিনি সর্ব্বদা রোদন করিতেন। অধিক অশ্রু-পাতে তিনি পরিশেষে অন্ধ হইয়াছিলেন। (১৪)মহাত্মা এব্‌নে আয়িনীয়া স্বপ্নে তাঁহার ভ্রাতাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'করুণাময় আল্লা তোমার

সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।" তিনি বলিয়াছিলেন—'যে পাপের জন্য আমি তাঁহার স্থানে ক্ষমা প্রর্থনা করিয়াছি তাহা তিনি দয়া করিয়া ক্ষমা করিয়াছেন—আর যে পাপের ক্ষমা চাই নাই তাহা হইতে মুক্তি পাই নাই।" (১৫) মহামাননীয়া বিবী জোবেদা খাতুন মহোদয়াকে কোন সাধু স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'আপনার সহিত আল্লা কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? তিনি বলিয়াছিলেন—"করুণাময় আমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন।' সাধু, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'যে ধন-রাশি আপনি মক্কা শরীফের পথে 'নহর' (প্রণালী) খননে ব্যয় করিয়াছিলেন—সেই ধনের কল্যাণে কি আল্লা আপনাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন?' তিনি বলিয়াছিলেন—"সে ধনের জন্য নহে। সে ধনের পুণ্য ধন-স্বামী দাতাগণ পাইয়াছেন। আমি কেবল আমার সঙ্কল্পের (নীয়তের) কল্যাণে অনুগ্রহ পাইয়াছি।' (১৬) মহাত্মা ছুফিয়ান শূরীকে কোন সাধু লোক স্বপ্নে দেখিয়া, আল্লা তাঁহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি এক পদ 'পোল ছেরাতের' উপর স্থাপন করিলে অন্য পদ বেহেশ্‌তের মধ্যে পতিত হইয়াছিল।" (১৭) মহাত্মা আহ্‌মদ এব্‌নেল হাওয়ারী এক রজনীতে স্বপ্নে তাঁহার মৃত পত্নীকে নিতান্ত সৌন্দর্য্যশালিনী ও লাবণ্যময়ী দেখিতে পান—তাঁহার বদন মণ্ডলের জ্যোতিঃ অসামান্য উজ্জ্বলতার সহিত ঝকমক্ করিতেছে। তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমার সৌন্দর্য্য এত উজ্জ্বল হইবার কারণ কি?' তিনি বলিয়াছিলেন—'আপনার মনে থাকিতে পারে, অমুক রজনীতে আপনি আল্লার স্মরণে নিমগ্ন থাকিয়া বড় রোদন করিয়াছিলেন; অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হইতেছিল। আমি অশ্রু-জলের কিঞ্চিৎ গ্রহণ করতঃ মুখ মণ্ডলে লেপন করিয়াছিলাম; তাহারই কল্যাণে আমার এরূপ সৌন্দর্য্য উৎপন্ন হইয়াছে।' (১৮) মহাত্মা কাতানী বলিয়াছেন—"আমি মহাত্মা জোনয়দ বগ্‌দাদীকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'করুণাময় আল্লা আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন?' উত্তর দিলেন—'আল্লা আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। আমি সাধারণ লোকদিগকে যে উপদেশ দিয়াছিলাম এবং মুরীদদিগকে যে শিক্ষা দিয়াছিলাম তাহা কোন কাজে লাগে নাই—কেবল শেষ রজনীতে নির্জ্জন অবস্থায় যে দুই রকাৎ নমাজ পড়িতাম তাহার কল্যাণে আল্লা আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন।'" (১৯) মহামাননীয়া বিবী জোবেদা খাতুন মহোদয়াকে কোন সাধু স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'আল্লা

আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন ?'—তিনি বলিয়াছিলেন—"নিম্নলিখিত চারিটী কাল্‌মার জন্য আমাকে আল্লা দয়া করিয়াছেন—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اُفْنِيْ بِهَا عُمْرِيْ * لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اُدْخِلُ بِهَا قَبْرِيْ * لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اُخْلُوْ بِهَا وَحْدِيْ * لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَلْقِيْ بِهَا رَبِّيْ *

"আল্লা ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই' এই কাল্‌মা পড়িতে পড়িতে আমি যেন আমার জীবন ফানা (শেষ) করিতে পারি। 'আল্লা ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই' এই কাল্‌মার সহিত যেন আমি আমার কবরে যাইতে পারি। 'আল্লা ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই' এই কালমা এখলাছের (শুদ্ধ-সঙ্কল্পের) সহিত যেন আমার একত্ব-বিশ্বাসের মধ্যে থাকে। 'আল্লা ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই' এই কাল্‌মার প্রভাবে আমি যেন আমার প্রভুর দর্শন পাই।" (২০) কোন সাধু মহাত্মা বশ্‌রহাফী মহোদয়কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আল্লা আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন' তিনি বলিয়াছিলেন—আল্লা আমার উপর করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—'তুমি এত অতিরিক্ত মাত্রায় আমার জন্য ভয় করিয়া এখন আমার নিকটে আসিতে তোমার লজ্জা হয় না ?'" (২১) কোন সাধু ব্যক্তি মহাত্মা আবু ছোলায়মানকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'মহাপ্রভু আল্লা তোমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন ?' তিনি বলিলেন—'করুণাময় আল্লা আমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু একজন ধার্ম্মিক লোক আমার দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া অপরকে দেখাইয়াছিলেন ইহাতে আমার যত ক্ষতি হইয়াছে অন্য কোন ব্যাপারে তত ক্ষতি হয় নাই।' (২২) মহাত্মা আবু ছঈদ খাব্বরাজ বলিয়াছেন—তিনি স্বপ্নে ইব্‌লীছ শয়তানকে দেখিয়া প্রহার মানসে যষ্টি উত্তোলন করিয়াছিলেন কিন্তু শয়তান তাহাতে কিছু মাত্র ভীত হইয়াছিল না। ইতিমধ্যে আকাশ-বাণী হইয়াছিল—"শয়তান লাঠী দেখিয়া ভয় করে না—হৃদয়স্থ ঈমানের

আল্লার করুণা-লাভের কলেমা

নুর (আলোক) দেখিয়া শয়তান ভয় পায়।" (২৩) মহাত্মা মছরুহী বলিয়াছেন—"আমি স্বপ্নে শয়তানকে দেখিয়া বলিয়াছিলাম—'মানুষ দেখিতে তোমার লজ্জা হয় না ?' সে বলিল 'এ সমস্ত লোক মানুষ নহে। যদি ইহারা মানুষ হইত তবে আমি ইহাদিগকে খেলার 'ফুটবলের' মত এক লাথী দিয়া এ দিকে, এক লাথী দিয়া সে দিকে চালাইতে পারিতাম না যাঁহারা মানুষ তাঁহাদিগকে দেখিবা মাত্র আমি পীড়িত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ি।'" এখানে ছুফী লোকদিগকে মানুষ বলিয়া শয়তান লক্ষ্য করিয়াছিল। (২৪) মহাত্মা আবু ছঈদ খাররাজ বলিয়াছেন—"আমি দামেশক নগরে বাস করিবার কালে এক রজনীতে স্বপ্নে মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ)-কে দেখিয়াছিলাম—তিনি মহাত্মা আবুবকর ছিদ্দীক ও মহাত্মা ওমর ফারুকের স্কন্ধে বাহু রাখিয়া শুভাগমন করিতেছেন। তখন আমি স্বীয় বক্ষস্থলে অঙ্গুলীর আঘাত করিতে করিতে তাঁহার প্রশংসা সূচক এক কবিতা গান করিতেছিলাম। মহাপুরুষ হজরৎ রসুল (দঃ) বলিলেন—'এরূপ কার্য্যে লাভ অপেক্ষা ক্ষতি অধিক।'" (২৫) মহাত্মা শিবলীর মৃত্যুর তিন দিন পরে কোন সাধু তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া, আল্লা তাঁহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—'আল্লা আমার হিসাব বড়ই কঠিন ভাবে লইতে আরম্ভ করেন। ইহাতে আমি হতাশ হইয়া পড়ি। আমার এই অবস্থা দেখিয়া অবশেষে তিনি আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন।" (২৬) মহাত্মা ছুফিয়ান ছুরীকে কোনও সাধু স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"মহাপ্রভু আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন ?" তিনি বলিলেন—'আল্লা আমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন।' সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবদুল্লা মোবারক কি অবস্থায় আছেন ?' বলিলেন—'প্রতিদিন তিনি দুইবার আল্লার সন্দর্শন পাইয়া থাকেন।' (২৭) কোন সাধু, মহাত্মা মালেক আনেছকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'মহাপ্রভু আপনার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিলেন'—তিনি বলিলেন—"আমি মহাত্মা ওছমান গনীর নিকট যে কালমা শিখিয়াছিলাম তাহার কল্যাণে আল্লা আমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন। উক্ত মহাত্মা মৃত লোককে কবরে যাইতে দেখিলে বলিতেন—

আল্লার অনুগ্রহ লাভের কলেমা

سُبْحَانَ اللهِ الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ

'ছোব্‌হানাল্লাহেল্‌ হাইয়েল্লাজী লা ইয়ামুতো।' (অর্থ—আল্লার পবিত্রতা বিঘোষিত হউক। আল্লা সর্ব্বদাই জীবিত; তিনি কখনই মরিবেন না।) তাঁহার নিকট আমি এই কাল্‌মা শিখিয়াছিলাম।" (২৮) মহাত্মা হছন বছরী যে রজনীতে দেহত্যাগ করেন ঠিক সেই রজনীতে একজন সাধু স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে,—আকাশের সমস্ত দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। আকাশ-বাণী হইতে লাগিল—'মহাত্মা হছন বছরী আল্লার দর্শন পাইলেন।' তৎকালে সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়াছিল। (২৯) মহাত্মা জোনয়দ বগ্‌দাদী স্বপ্নে শয়তানকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—'হে ইব্‌লীছ! তুমি মানুষ দেখিয়া লজ্জা কর না?' সে বলিয়াছিল—'ইহারা মানুষ নহে। শোনীজীয়া গ্রামে যাঁহারা আছেন; তাঁহারাই মানুষ, তাঁহারা আমাকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছেন।' স্বপ্ন দর্শনের পর তিনি শোনীজীয়া অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রাতে তথায় গিয়া মছজেদে প্রবেশ করতঃ দেখিলেন—তথাকার লোকেরা জানুর উপর মস্তক স্থাপন করতঃ ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। তাঁহারা মহাত্মা জোনয়দকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন-"হে জোনয়দ, তুমি দুরাচার শয়তানের কথায় বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হইও না।" (৩০) মহাত্মা ওৎবাতোল গোলাম মহোদয় স্বপ্নে বেহেশ্‌তের পরম রূপবতী এক হুরীকে দেখিয়াছিলেন। হুরী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'দেখুন, আপনার প্রতি আমি প্রেমাসক্ত হইয়া আছি। সাবধান এমন কর্ম্ম করিবেন না যাহাতে আমা হইতে বঞ্চিৎ হন।' মহাত্মা বলিয়াছিলেন—'আমি দুনিয়াকে তিন তালাক দিয়াছি কখনই সে দিকে যাইব না।' (৩১) মহাত্মা আবু আইয়ুব ছজস্তানী একদিন কোন কলহ-প্রিয় লোকের মৃতদেহ দেখিয়া তাহার জানাজার নমাজে যোগ না দিবার অভিপ্রায়ে গৃহের উপর 'তালায়' আরোহণ করিয়াছিলেন। সেই মৃতাত্মাকে, কোন সাধু পুরুষ স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'আল্লা তোমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন?' মৃতাত্মা বলিল—'করুণাময় আমার উপর অনু-গ্রহ করিয়াছেন।' অনন্তর সেই মৃতাত্মা বলিয়াছিলেন—'আপনি আবু আইয়ুবকে বলিয়া দিবেন—'যদি তোমাদের হাতে আমার প্রভুর খাজানাখানায় অনুগ্রহ বণ্টনের ভার দেওয়া হইত তবে খরচ হইবার ভয়ে তোমরা চিরকালের জন্য সমস্ত বন্ধ করিয়া দিতে।''' (৩২) যে রজনীতে মহাত্মা হজরৎ দাউদ তাঈ দেহত্যাগ করেন সেই রাত্রে এক সাধু স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন আকাশের ফেরেশ্‌তাগণ ব্যস্ততার সহিত যাতায়াত করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে তিনি ফেরেশ্‌তাগণকে

জিজ্ঞাসা করিলেন অদ্য কোন্ পুণ্য-রজনী? তাঁহারা বলিলেন—'অদ্য দাউদ তাঈ পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বেহেশ্‌ৎ সাজান হইতেছে।" (৩৩) মহাত্মা আবু ছঈদ শহাম বলিয়াছেন—"আমি বিখ্যাত ধনী ছহল ছাবুকীকে স্বপ্নে দেখিয়া খাজা (টীঃ ৪৭৬) সম্বোধনে কিছু বলিতে যাইতেছিলাম—ইতিমধ্যে তিনি আমার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—'খাজার প্রভুত্ব উড়িয়া গিয়াছে—মান সম্ভ্রম চুলায় গিয়াছে' আমি বলিলাম—আপনার সেই কাজ কাম—দান দক্ষিণা কি হইল? তিনি বলিলেন—'সে সব আমার কোন কাজে আসে নাই, কেবল একটী বৃদ্ধা আমার নিকট একদিন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একটী তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিল এবং আমিও যত্নের সহিত তদুত্তর দিয়াছিলাম তাহাই কাজে আসিয়াছে। (৩৪) মহাত্মা রবী এব্‌নে ছোলায়মান, ইমাম শাফেঈ মহোদয়কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন -'আল্লা আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন?' তিনি বলিয়াছিলেন—'স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়া উজ্জ্বল লাবণ্য বিশিষ্ট মুক্তা আমার উপর বর্ষণ করিয়াছেন।' (৩৫) এক সময়ে ইমাম শাফেঈর সম্মুখে এক কঠিন কার্য্য উপস্থিত হয়; বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি তাহা উদ্ধার করিতে পারেন নাই; হতাশ মনে শয়ন করিলে স্বপ্নে দেখিতে পান—এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন "হে মোহাম্মদ ইদ্‌রীছ! পড়—

اَللّٰهُمَّ اِنِّي لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَّ لَا

نَفْعًا وَّ لَا مَوْتًا وَّ لَا حَيٰوةً وَّ لَا نُشُوْرًا

وَ لَآ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اٰخُذَ اِلَّا مَا اَعْطَيْتَنِيْ وَ لَا

اَتَّقِيْ اِلَّا مَا وَقَيْتَنِيْ اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنِيْ لِمَا

تُحِبُّ وَ تَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ وَ الْعَمَلِ فِيْ عَافِيَةٍ

টীকা—৪৭৬। 'খাজা' পারশী শব্দ। ইহার অর্থ (১) কর্ত্তা (গৃহ স্বামী); (২) ছরদার; (৩) পীর, (৪) ধনী, (৫) বিচারপতি, (৬) (তুরান দেশে) ছৈয়দ বংশীয় লোকের খেতাব, (৭) বাদশার অন্তঃপুর রক্ষক নপুংসক দাসের খেতাব, (৮) বাদশার উজীরের খেতাব।

'হে আল্লা! নিশ্চই আমার জীবনের সম্বন্ধে আমার কোন ক্ষমতা নাই; আমার লাভ ক্ষতি মৃত্যু পরমায়ু বা পুনরুত্থানের কোন ক্ষমতা নাই—এবং যদি দান না কর তবেও গ্রহণের ক্ষমতা নাই—এবং তুমি যাহা ত্যাগ করাইয়াছ তদ্ব্যতীত আমার কিছু পরিত্যাগের ক্ষমতাও নাই। হে আল্লা, যে কথা ও কাজ তুমি ভালবাস এবং যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হও তাহার এবং শান্তির সুযোগ দাও।"

কার্য্য সহজ-সিদ্ধ হইবার কলেমা

স্বপ্নে এই ব্যাপার দর্শনের পর তিনি জাগরিত হইয়া উক্ত কালেমা পড়িয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে, দিন বাড়িলে, দেখিলেন তাঁহার সেই কার্য্যটী সহজ হইয়া গিয়াছে। পাঠক! এই দোআ তোমাদেরও মনে রাখা আবশ্যক। (৩৬) মহাত্মা ওৎবাতোল গোলামকে কোন সাধু স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'আল্লা আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন?' মহাত্মা স্বপ্নেই বলিয়াছিলেন—"যে দোআটী আমি দেওয়ালে লিখিয়া দিতেছি তাহার কল্যাণে আল্লা আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন।" সাধু জাগরিত হইয়া দেখিয়াছিলেন—নিম্নলিখিত দোআটী প্রাচীরে লিখিত আছে—

আল্লার ক্ষমা লাভের দোআ

يَا هَادِيَ الْمُضِلِّيْنَ وَيَا رَاحِمَ الْمُذْنِبِيْنَ
وَيَا مُقِيْلَ عَثَرَاتِ الْعَاثِرِيْنَ اِرْحَمْ
عَبْدَكَ ذَا الْخَطَرِ الْعَظِيْمِ وَالْمُسْلِمِيْنَ كُلَّهُمْ
اَجْمَعِيْنَ وَاجْعَلْنَا مَعَ الْاَحْيَاءِ الْمَرْزُوْقِيْنَ
الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ
وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ
اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ *

"হে

"হে (আল্লা তুমি) পথভ্রান্তদিগের পথ প্রদর্শক; এবং হে (আল্লা তুমি) পাপীদিগের প্রতি করুণাকারী, এবং হে (আল্লা তুমি) দুর্ব্বলচেতা উদ্‌ভ্রান্ত-দিগের সুমতি বিধায়ক; হে আল্লা! তোমার এই ভীতিবিহ্বল দাসের প্রতি এবং সমস্ত মুসলমানের প্রতি করুণা কর। এবং আমাকে ও তাহাদিগকে নবীগণ, ছিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও ছালেহ লোকের দলভুক্ত কর, তাঁহারা তোমার নেআমতরূপ জীবিকা পাইতেছেন (আমাদিগকেও তাহার অংশী কর।) আমীন! হে বিশ্বজগতের প্রভু, আমীন!